রচনা-সংগ্রহ

প্রথম খণ্ড

রচনা-সংগ্রহ

প্রথম খণ্ড

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ ॥ কলিকাতা ১২

প্রথম প্রকাশ—শ্রাবণ, ১৩৬৫

প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলিকাতা ১২।

মুদ্রাকর—কার্ত্তিকচন্দ্র পাণ্ডা
মুদ্রণী
৭১, কৈলাস বসু স্ট্রীট
কলিকাতা ৬।

বর্ণলিপি—খালেদ চৌধুরী
ব্লক এবং প্রচ্ছদ ও ফোটোচিত্র মুদ্রণ :
ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও
বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

মূল্য { ~~কাগজের বাঁধাই—নয় টাকা~~
রেক্সিনে বাঁধাই—দশ টাকা

উপন্যাস

ধাত্রীদেবতা

মা ও পিসীমার

শ্রীচরণে

লাভপুর, বীরভূম
দেবীপক্ষ
১৩৪৬

ষষ্টিবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে গৃহীত ফোটো

ফোটো : অজিতমোহন গুপ্ত

বাংলা দেশের কৃষ্ণাভ কোমল উর্বর ভূমি-প্রকৃতি বর্তমান বেহারের প্রান্তভাগে বীরভূমে আসিয়া অকস্মাৎ রূপান্তর গ্রহণ করিয়াছে। রাজরাজেশ্বরী অন্নপূর্ণা ষড়ৈশ্বর্য পরিত্যাগ করিয়া যেন ভৈরবীবেশে তপশ্চর্যায় মগ্ন। অসমতল গৈরিকবর্ণের প্রান্তর তরঙ্গায়িত ভঙ্গীতে দিগন্তের নীলের মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে; মধ্যে মধ্যে বনকুল আর খৈরিকাঁটার গুল্ম; বড় গাছের মধ্যে দীর্ঘ তালগাছ তপস্বিনীর শীর্ণ বাহুর মত ঊর্ধ্বলোকে প্রসারিত। বীরভূমের দক্ষিণাংশে বক্রেশ্বর ও কোপাই—দুইটি নদী মিলিত হইয়া কুয়ে নাম লইয়া মুর্শিদাবাদে প্রবেশ করিয়া ময়ূরাক্ষীর সহিত মিলিত হইয়াছে।

এই কুয়ের পলিমাটির সুবিধা গ্রহণ করিয়াই লাঘাটা বন্দরের বাঁড়ুজ্জে-বাড়ির সাত-আনির মালিক কৃষ্ণদাসবাবু দেবীবাগ নামে শখের বাগানখানা তৈয়ারি করিয়াছিলেন। নানা প্রকার ফল ও ফুলের গাছগুলি পরিচর্যায় ও চরভূমির উর্বরতায় সতেজ পুষ্টিতে বেশ ঘন হইয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে। বাগানের মধ্যে একটি পাকা কালীমন্দির, একটি মেটে দুই-কুঠরি বাংলো-ঘর, একখানি রান্নাঘর; মধ্যে মধ্যে ছায়াঘন গাছের তলায় বসিবার জন্ম পাকা আসনও কৃষ্ণদাসবাবু তৈয়ারি করাইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার অকালমৃত্যুতে গ্রাম হইতে এতদূরে, এই নির্জনে বাগানের শোভা ও সুখ উপভোগ করিবার মত বয়স্ক উত্তরাধিকারীর অভাবেও বাগানখানা ম্লান নিস্তেজ হয় নাই, বরং বেশ একটু বন্য হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তবুও চারিদিকের গৈরিক অনুর্বর রুক্ষ প্রকৃতির মধ্যে বাগানখানির শ্যামশোভায় চোখ জুড়াইয়া যায়।

বাগানের মধ্যে কালীবাড়ির পাকা বারান্দায় বসিয়া কৃষ্ণদাসবাবুর পুত্র শিবনাথ একটা ধনুকে জ্যা-রোপণ করিয়া টান দিয়া ধনুকটার সামর্থ্য পরীক্ষা করিতেছিল। অনতিদূরে মন্দিরের উঠানে তাহাদের রাখাল শম্ভু বাউরী বসিয়া নিবিষ্টচিত্তে প্রভুর মুখের দিকে চাহিয়া ছিল। প্রভু এবং ভৃত্য দুইজনেই বালক, বয়স তেরো-চৌদ্দর বেশি নয়। এক পাশে খান দুই ছোট বাঁশের লাঠি ও কতকগুলা পাথর জমা করা রহিয়াছে। এগুলি তাহার যুদ্ধের সরঞ্জাম। গ্রামের অপর পাড়ার ছেলেদের সহিত সে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছে। পূজার সময় হইতেই দুই পাড়ার কিশোর-রাষ্ট্রের মধ্যে অসন্তোষ এবং বিদ্বেষ পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছিল। দুই পাড়ার প্রতিমার শ্রেষ্ঠত্ব লইয়া তর্ক হইতে এ বিরোধের সূত্রপাত। দুই পাড়ার প্রতিমাই অবশ্য একই কারিগরের গড়া, তবুও তো

তাহার ভালমন্দ আছে। এ বিষয়ে কোন মীমাংসা না হওয়ায় ওপাড়ার ছেলেরা দাবি করিয়াছিল, তাহাদের প্রতিমা অধিক জাগ্রত। সে বিষয়ে শিবনাথের পাড়ার পরাজয় হইয়াছে, কারণ ওপাড়ার মানসিক বলিদান হয় বাহান্নটি আর তাহার পাড়ায় মাত্র আটটি। এই শোচনীয় পরাজয়ের হাত হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য শিবনাথ ওপাড়ার ছেলেদের ফুটবল-ম্যাচে চ্যালেঞ্জ করিয়াছিল। ম্যাচে শিবনাথের পাড়া জিতিল, কিন্তু সেই হইল যুদ্ধের সূত্রপাত। ম্যাচে হারিয়া ওপাড়ার ছেলেরা শিবনাথের দলের একটি ছেলের মাথা ফাটাইয়া দিল। শিবনাথ ওপাড়ার দলপতির কাছে চরম পত্র পাঠাইল, যদি অবিলম্বে অন্যায়-আঘাতকারিগণ ক্ষমা প্রার্থনা না করে, তবে তাহারাও ইহার প্রতিশোধ লইবে।

তাহার পরই খণ্ডযুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গেল, ওপাড়ার ছেলেরা এপাড়ায় আসিলেই ইহারা বন্দী করিবার চেষ্টা করে, বন্দীত্ব স্বীকার না করিলে যুদ্ধ শুরু হয়। এপাড়ার ছেলেরা ওপাড়ায় গেলে বেশ ঘা কতক খাইয়া বাড়ি ফেরে। শেষ পর্যন্ত শিবনাথ শক্তির চরম পরীক্ষার জন্য বিপক্ষকে প্রকাশ্য যুদ্ধে আহ্বান করিল। উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে রণাঙ্গন নির্দিষ্ট হইয়াছে ওই গৈরিক প্রান্তর। বাল্যমনের চাপল্য এবং খেয়ালের অন্তরালে শিবনাথের মনে আরও একটা বস্তু ছিল, সেটা তাহার শিক্ষার বৈশিষ্ট্য। ইহারই মধ্যে স্কুলপাঠ্য পুস্তক ছাড়াও সে আরও অনেক বই পড়িয়া ফেলিয়াছে। অসমতল রণক্ষেত্রের কথা মনে হইতেই তাহার রাজসিংহের কথা মনে পড়িয়া গেল। বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ' সে পড়িয়াছে। ওই অসমতল খোয়াইগুলি, ও তো ঠিক পার্বত্য পথের মত। সে অবিলম্বে মনে মনে রাজসিংহের পদ্ধতিতে আপন সৈন্য-সমাবেশপদ্ধতি ছকিয়া লইল, এবং কয়জন বন্ধুকে লইয়া বেশ করিয়া দেখিয়া শুনিয়া নিপুণ সেনাপতির মতই সৈন্য-সমাবেশ করিল। পথের দুই পাশের অদূরবর্তী খোয়াইয়ের মধ্যে তাহার দলস্থ ছেলেদের লুকাইয়া রাখিল। কিছু দূরে সম্মুখে প্রকাশ্যভাবে জনকয়েককে লইয়া সে যেন শত্রুপক্ষের প্রতীক্ষা করিয়া রহিল। ফলও হইল আশানুরূপ, শত্রুপক্ষীয়েরা শিবনাথকে ক্ষীণবল দেখিয়া হৈ-হৈ করিয়া তাহাদের সমীপবর্তী হইবামাত্র পশ্চাতের লুক্কায়িত দল আত্মপ্রকাশ করিয়া পশ্চাৎভাগ আক্রমণ করিল। পাঁচ মিনিটের মধ্যে শিবনাথের জয় হইয়া গেল, শত্রুপক্ষ ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল। শিবনাথ শুধু অগ্র ও পশ্চাৎ ভাগের কথাই ভাবিয়াছিল, দুই পাশের মুক্ত পথ অবরোধের কথা ভাবে নাই। সেই পথ দিয়া শত্রুরা যে যেমন পারিল পলায়ন করিল। বন্দী হইল জনকয়েক, জনকয়েক পলায়ন-পথে কাঁকরে পা হড়কাইয়া পড়িয়া আহত হইল, বাকি দলের পশ্চাতে শিবনাথের দল দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া অনুসরণ করিল। বন্দী যাহারা হইয়াছিল, শিবনাথ তাহাদের সহিত মন্দ ব্যবহার করিল না, সসম্মানে সকলের সহিত সন্ধি করিয়া

আপনার বাগানের কিছু ফল উপহার দিয়া বিদায় করিল। তাহাদের সহিত শিবনাথের বা তাহাদের পাড়ার আর কোন বিরোধ নাই। শিবনাথ স্বীকার করিয়াছে, তাহাদের পাড়ার ঠাকুর শ্রেষ্ঠ; তাহারা স্বীকার করিয়াছে, শিবনাথের পাড়ার ফুটবল-টীম শ্রেষ্ঠ এবং শিবনাথ শ্রেষ্ঠ। এখন শিবনাথ বসিয়া আছে বিপক্ষদলের দলপতির প্রতীক্ষায়। কিন্তু অনুসরণকারীরা এখনও কেহ ফিরে নাই। শিবনাথ সঙ্কল্প করিয়াছে, দলপতির সহিতও বন্দী পুরুরাজের মতই ব্যবহার করিবে। কিন্তু তাহার মন্ত্রী ও সেনাপতি—সেই পা-বাঁকা কানাই আর রজনীকে পাইলে তাহাদের দন্তে তৃণ করাইয়া ছাড়িবে।

শম্ভু বলিল, ওরা আর আসবে না বাবু। সন্‌জে হয়ে এল, চলেন, বাড়ি যাই। সেই কখন আইচেন বলেন দেখি!

শিবনাথ এইবার মুখ তুলিয়া চাহিল, সত্যই আর বেলা নাই, সূর্য পাটে বসিয়াছে, পূর্ব দিগন্ত অস্পষ্ট হইয়া আসিতেছে। সে বারান্দার উপর উঠিয়া দাঁড়াইয়া চারিদিক লক্ষ্য করিয়া দেখিয়া বলিল, তা হলে সব গেল কোথায় বল্ দেখি?

শম্ভু বিজ্ঞভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, বাড়ি চলে গিয়েছে সব। খিদে নেগেছে, আর সব যে যার বাড়ি গিয়েছে।

মীমাংসাটা শিবনাথের মনঃপূত হইল না, যুদ্ধ করিতে আসিয়া ক্ষুধার তাড়নায় সৈন্যসামন্তেরা বাড়ি চলিয়া যাইবে কি! সে একটু চিন্তা করিয়া বলিল, তুই একবার গাছে চড়ে দেখ্ দেখি, কোথাও কাউকে দেখা যায় কি না! ওই বয়ড়াগাছটাতে ওঠ্, অনেকটা লম্বা, অনেক দূর দেখতে পাবি।

শম্ভু স্বচ্ছন্দে দীর্ঘ গাছটার কাণ্ড বাহিয়া উঠিয়া গেল, ঠিক সরীসৃপের মত। গাছের প্রায় শীর্ষদেশে উঠিয়া সে চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়া বলিল, কোথা পাবেন আজ্ঞে! উ ঠিক সব মুড়ি খেতে বাড়ি চলে গিয়েছে।

শিবনাথ হতাশ হইয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। শম্ভু গাছ হইতে নামিয়া আসিতেছিল। শিবনাথ দিগন্তের দিকে দৃষ্টি ফেলিয়া বেশ সুর করিয়া আবৃত্তি করিল, The boy stood on the burning deck. ক্যাসাবিয়াঙ্কার কথা তাহার মনে পড়িয়া গিয়াছে। ক্যাসাবিয়াঙ্কা আপনার স্থান ছাড়িয়া এক পা সরিয়া যায় নাই। সমুদ্র সে দেখে নাই, যুদ্ধজাহাজও কখনও দেখে নাই, কিন্তু তবু তাহার চোখের সম্মুখে ক্যাসাবিয়াঙ্কার ছবি ফুটিয়া উঠিল। নীল জল, জলন্ত জাহাজ, তাহার মধ্যে দাঁড়াইয়া কিশোর ক্যাসাবিয়াঙ্কা। তাহার চারিপাশে দাউ-দাউ করিয়া আগুন জলিতেছে। তাহার দীর্ঘ চুল অগ্ন্যুত্তপ্ত বাতাসে দুলিতেছে।

And shouted but once more aloud,
'My father ! must I stay ?'
While o'er him fast through sail and shroud,
The wreathing fires made way.

সহসা তাহার কল্পনায় বাধা পড়িল। ও কি! দুইটা বড় শিয়ালে একটা কচি বাছুর মুখে করিয়া লইয়া আসিতেছে! না, শিয়াল তো নয়। জানোয়ার দুইটা আরও অনেক বড়। দেখিতে শিয়ালের মত হইলেও শিয়ালের ভঙ্গীর সহিত অনেক পার্থক্য; শিয়াল তো এমন লেজ সোজা করিয়া চলে না। তাহাদের গমন-ভঙ্গী তো এমন দৃপ্ত নয়। মুখের চেহারার সঙ্গেও তো শিয়ালের মুখাকৃতি ঠিক মেলে না। সে সতর্কতা প্রকাশ করিয়া শম্ভুকে ডাকিল, শম্ভু! শম্ভু!

কণ্ঠস্বরের ভঙ্গিমায় শম্ভু চকিত হইয়া উঠিয়া সাড়া দিল, কি? সে ঝপ করিয়া খানিকটা উঁচু হইতেই লাফ দিয়া মাটিতে পড়িল। শিবনাথ অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া বলিল, দেখেছিস!

শম্ভু বলিল, এঃ, কাজ সেরে ফেলিয়েছে শালারা। মরে গিয়েছে বাছুরটা।

শিবনাথ প্রশ্ন করিল, শেয়াল তো নয়, হেঁড়োল নাকি রে?

আজ্ঞে হ্যাঁ। বড়া পাজি জাত। এঃ, রক্ত পড়েছে দেখেন দেখি!

শিবনাথ ধনুকটা নামাইয়া বলিল, মারব এক তীর?

না। যাক, শালারা চলে যাক। তেড়ে আসবে, ছিঁড়ে ফেলাবে আমাদিকে। বাঘের জাত তো।

নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া উভয়ে জানোয়ার দুইটার দিকে চাহিয়া রহিল। শিবনাথ মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখিতেছিল। তাহার বার বার মনে হইতেছিল, বন্দুকটা থাকিলে আজ সে ওই দুইটাকে শিকার করিয়া ফেলিতে পারিত। জানোয়ার দুইটা বাছুরটাকে মুখে করিয়া চলিয়াছে। সে চলার ভঙ্গিমার মধ্যে বিজয়গর্ব, আনন্দের আভাস। বাগানখানা পার হইয়াই উদাসী পুকুর, প্রকাণ্ড দীঘি মজিয়া এখন চাষের জমিতে পরিণত হইয়াছে। পুকুরটার সু-উচ্চ পাড়গুলি বনকুল খৈরি শেওড়া শিমুল তাল প্রভৃতি গাছ ও গুল্মের ঘন সমাবেশে এখন দুর্ভেদ্য জঙ্গলে পরিণত। জানোয়ার দুইটা সেই পাড়ের নীচেই বাছুরটাকে ফেলিয়া বসিয়া হাঁপাইতে আরম্ভ করিল।

শিবনাথের কৌতূহল ধীরে ধীরে বাড়িয়া উঠিতেছিল, রাশিয়ার বরফাচ্ছন্ন মেরুপ্রদেশের বিবরণের মধ্যে উল্‌কের কথা পড়িয়াছে—উল্‌ক, হায়েনা, নেকড়েবাঘ, হুড়ার।

সে বলিল, চল্, একটু এগিয়ে দেখি।

কৌতূহল শম্ভুরও বাড়িতেছিল, সে বলিল, গাছের আড়ালে আড়ালে চলেন।

গাছের আড়ালে আড়ালে আসিয়া অনেকটা নিকটেই পৌঁছানো গেল। শিবনাথ দেখিল, জানোয়ার দুইটা জিভ বাহির করিয়া হাঁপাইতেছে। আশ্চর্য, সে মুখব্যাদান-ভঙ্গিমার মধ্যে স্পষ্ট হাসির রেখা পরিস্ফুট! জানোয়ার হাসে! হাঁ, হাসে, বাড়ির কালুয়া কুকুরটার মুখেও আনন্দের আতিশয্যে এমন ভঙ্গী দেখা দেয়, সেও হাসে। একটু পরেই একটা জানোয়ার অদ্ভুত শব্দ করিয়া উঠিল, আবার, আবার। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছিল, তবুও অস্পষ্ট আলোকে শিবনাথ দেখিতে পাইল, ছোট ছোট কুকুরছানার মত কয়টা ছানা একটা গর্ত হইতে কুঁ-কুঁ শব্দ করিতে করিতে বাহির হইয়া আসিল।

শম্ভু বলিল, বাচ্চা হয়েছে শালাদের। একটা দুটো তিনটে। দেখেন দেখেন, মজা দেখেন, বাচ্চাগুলোর তেজ দেখেন।

বাছুরটার ক্ষতস্থান হইতে নির্গত রক্তধারা চাটিতে চাটিতে ছানাগুলি বিবাদ শুরু করিয়া দিয়াছিল। পরস্পরকে তাড়াইয়া দিয়া প্রত্যেকেই একা খাইতে চায়। যে বাধা পাইতেছে, সে-ই ক্রুদ্ধ বিক্রমে গোঙাইয়া উঠিতেছে। বড় জানোয়ার দুইটা তেমনই বসিয়া আছে, বাচ্চাগুলির দিকে চাহিয়া এখনও তেমনই হাসিতেছে। অল্প কিছুক্ষণ পরেই ধাড়ী দুইটা মৃত পশুশাবকটাকে টানিয়া লইয়া বুকের দুই পাশ ছিঁড়িয়া খাইতে আরম্ভ করিল। সঙ্গে সঙ্গে শাবকগুলার সে কি গর্জন!

শম্ভু বলিল, চলেন, আর লয়। এই সময়ে আমরা চলে যাই। খেতে লেগেছে বেটারা, এইবার মারামারি করবে। আঁধারও হয়ে এল। খোয়াইগুলোর ভেতরে আবার সাপ-খোপ বেরুবে।

শিবনাথের কৌতূহল মেটে নাই, পশু দুইটার আহার-আত্মসাতের কলহ দেখিবার জন্য প্রবল আগ্রহ হইতেছিল, কিন্তু সে আর আপত্তি করিতে পারিল না। তাহার মায়ের সুন্দর কঠিন মুখের দৃষ্টি তাহার মনশ্চক্ষে ভাসিয়া উঠিল।

গাছের আড়ালে আড়ালে আত্মগোপন করিয়া বাগানের গাড়ি-চলা পথটা ধরিয়া হারা গ্রামের দিকে অগ্রসর হইল। সরল সোজা পথটার দুই ধারে আমগাছের , পূর্বে লাল কাঁকর বিছানো ছিল, এখন সে কাঁকরের উপর কুশ ও কুঁচি ঘাস থটিকে অপরিচ্ছন্ন করিয়া তুলিয়াছে। ওদিকে ক্রুদ্ধ পশু দুইটার কলহ-গর্জনে সন্ধ্যাটা ভয়াল হইয়া উঠিতেছে। চলিতে চলিতে শিবনাথ বলিল, আচ্ছা শম্ভু, হেঁড়োলের বাচ্চা পোষ মানে না?

শম্ভু বলিয়া উঠিল, দাঁড়ান, কাল সনূজের মুখে ধাড়ী দুটো যখন বেরিয়ে যাবে, খন একটা ধরে নিয়ে যাব।

পুলকিত হইয়া শিবনাথ বলিল, ও দুটোকে আমি মেরে দিতে পারি বন্দুক পেলে। তা বন্দুক যে ছুঁতে দেন না মা।

শম্ভু বলিল, সাঁওতালদিগে বললে তীরিয়ে মেরে দেবে।

শিবনাথ থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, শোন্ শোন্, খেলা করছে বোধ হয়। কিন্তু দেখেছিস, ঠিক যেন মানুষের মত কথা বলছে। হাসছে—রাগছে—কাতরাচ্ছে, সব বোঝা যাচ্ছে।

তখন তাহাদের কলহ-গর্জন থামিয়া গিয়াছে, পিতামাতা এবং শাবক তিনটির আনন্দ-কলরবে অন্ধকার বাগানখানা মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে।

শম্ভু দাঁড়াইয়া শুনিল, সত্যই হ্যা-হ্যা রবের মধ্যে যেন হাসির আভাস ফুটিয়া উঠিতেছে। সে বলিল, কি বলছে বেটারা ওরাই জানে—খুব খেতে পেয়েছে কিনা।

গ্রামে যখন তাহারা প্রবেশ করিল, তখন ঘরে ঘরে আলো জ্বলিতে শুরু করিয়াছে। পথের উপর গাঢ় অন্ধকার। গ্রামের দেব-মন্দিরে-মন্দিরে কাঁসর-ঘণ্টা ধ্বনিত হইতেছে। শিবনাথ আশ্বস্ত হইল, তাহার মা পিসীমা এখন ঠাকুরবাড়িতে; সে তাড়াতাড়ি বই লইয়া পড়িতে বসিয়া যাইবে। পথেই তাহাদের কাছারি-বাড়িতে তখন আলো জ্বলিয়াছে। শিবনাথ একেবারে তাহার পড়ার ঘরে গিয়া উঠিল, টেবিলের উপর রক্ষিত আলোটার মৃদু শিখাটাকে উজ্জ্বল করিয়া দিয়া একখানা বই হাতে করিয়া বসিয়া পড়িল। পরক্ষণেই সেখানাকে রাখিয়া দিয়া ডিক্‌শনারিখানা খুলিয়া বাহির করিল—Wolf—Erect-eared straight-tailed harsh-furred tawny-grey wild carnivorous quadruped, the Abyssinian Wolf, the Antarctic Wolf, the maned Wolf and the Prairie Wolf—আর কিছু নাই। কিন্তু নেকড়ে তো এ দেশেও পাওয়া যায়। এমন অসম্পূর্ণ বিবরণে শিবনাথের মন ভরিল না। সে ক্ষুণ্ণমনে বইখানি বন্ধ করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পর আবার ডিক্‌শনারি খুলিয়া বাহির করিল টাইগার, রয়াল বেঙ্গল টাইগার পৃথিবীর বাঘেদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, বিক্রমে দুর্জয়, অপার সাহস,—বাঘেদের রাজা।

সমস্ত বিকালটা কোথায় ছিলি রে শিবু?

শিবনাথ চমকিত হইয়া বইখানা রাখিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার পিসীমা গৃহদেবতার নির্মাল্য হাতে লইয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার সঙ্গে মাকে না দেখিয়া শিবনাথ আশ্বস্ত হইয়া উৎসাহভরেই বলিল, আজ দুটো হেঁড়োল দেখলাম পিসীমা।

শিবনাথের মাথায় নির্মাল্য স্পর্শ করাইয়া পিসীমা প্রশ্ন করিলেন, কোথায়?

আমাদের দেবীবাগের পাশেই বাসা করেছে। আজ একটা বাছুর মেরে মুখে করে নিয়ে এল। এঃ, যে রক্তটা পড়ছিল!

মুশকিল করলে তো! বাছুর ছাগল ভেড়া মেরে মেরে সর্বনাশ করবে দেখছি।

তিনটে ছোট ছোট এইটুকু—

শিবনাথের কথা আর শেষ হইল না, দ্বারপথের দিকে সহসা দৃষ্টিপাত করিয়াই সে নীরব হইয়া গেল। দুয়ারের সম্মুখেই তাহার মা কখন আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

মা বলিলেন, কিন্তু ওপাড়ার ছেলেদের সঙ্গে মারামারি করেছ কেন শিবু?

শিবনাথ সম্মুখে অভয়দাত্রী পিসীমার উপস্থিতির ভরসায় সাহস করিয়া বলিল, মারামারি কেন করব? যুদ্ধ করেছি।

যুদ্ধ?

হ্যাঁ, যুদ্ধ। ওরা যুদ্ধ করবে বলে এই দেখ পত্র দিয়েছে। সে নিজের পকেট হইতে বিপক্ষের যুদ্ধপ্রস্তাব গ্রহণ করার সম্মতি-পত্রখানা বাহির করিল।

কিন্তু যুদ্ধ কিসের জন্যে? এক গ্রামে বাড়ি, ভাইয়ের মত সকলে—

পিসীমা একবার বাধা দিয়া বলিলেন, বেশ করেছে। ওদের বাপেরা চিরকাল আমাদের হিংসে করে এসেছে, এখনও অপমান করবার সুযোগ পেলে ছাড়ে না। এখন থেকেই আবার ছেলেদের আক্রোশ দেখ না!

মা হাসিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, না না ঠাকুরঝি, দেশে ঘরে ঝগড়া করা কি ভাল? তা হলে জানোয়ারে আর মানুষে তফাত কি?

শিবনাথ মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া ভাবিতেছিল নেকড়েগুলার কলহের কথা। এক-এক সময় মাকে তাহার এত ভাল লাগে।

পরদিন বেলা আটটা তখনও বাজে নাই। শিবনাথদের কাছারি-বাড়ির দক্ষিণ-দুয়ারী প্রকাণ্ড খড়ের বাংলোটার বারান্দায় তক্তাপোশের উপর নায়েব সিংহ মহাশয় সেরেস্তা বিছাইয়া বসিয়া ছিলেন। চাকর সতীশ টেরা ঘুরাইয়া শণের দড়ি পাকাইতেছিল। চাপরাসী কেষ্ট সিং ঘরের মধ্যে মাথার পাগড়িটা ঠিক করিয়া লইতেছিল।

বাংলোটার সহিত সমকোণ করিয়া পূর্ব দিকে আর একখানা ছোট খড়ো বাংলো। ওই ঘরগুলিতে চাকর-চাপরাসী থাকে। এই ঘরটার বারান্দার চাল-কাঠামোর বাঁধা দুইখানা পালকি ঝুলিতেছে। পালকি দুইখানার নাম আছে—একখানা 'কর্তা-সওয়ারী' একখানা 'গিন্নী-সওয়ারী', অর্থাৎ একখানা বাড়ির কর্তার জন্য, অপরখানি বাড়ির গিন্নীর

জন্ত নির্দিষ্ট। গিন্নী-সওয়ারীটার সাজসজ্জা জাঁকজমক বেশি; ভিতরটা লাল শালু দিয়া মোড়া, ছাদের চাঁদোয়ার পাশে পাশে ঝুটা-মতির ঝালর। কাছারি-বাড়ির সম্মুখেই কাঠা কয়েক জায়গা ঘেরিয়া ফুলের বাগান। এক দিকে এক সারি নারিকেলগাছ; মধ্যে বেল, জুঁই, করবী, জবা, কামিনী, স্থলপদ্ম প্রভৃতি গাছের কেয়ারি। ঠিক মধ্যস্থলে একটি পাকা বেদী। বাগানের পরই বিঘা দেড়েক স্থান প্রাচীর-বেষ্টনীর মধ্যে তকতক করিতেছে। এইটি খামার-বাড়ি। এক দিকে এক সারিতে গোটা তিনেক ধানের হামার। বাগানের পাশেই খামার-বাড়ি যেখানে আরম্ভ হইয়াছে, সেইখানেই একটি ফটক। ফটকের দুই পাশের থামের গায়ে দুইটি লতা, এইটি মালতী ও অপরটি মধুমালতী, উপরে উঠিয়া তাহারা জড়াইয়া একাকার হইয়া গিয়াছে। বাড়িটার পূর্ব গায়েই বাঁড়ুজ্জে-বাবুদের শখের পুকুর শ্রীপুকুরের দক্ষিণ পাড়ে আর একটা বাড়ি,—বাবুদের গোশালা, চাষ-বাড়ি ও শূন্য একটি আস্তাবল।

পিসীমা আসিয়া দাঁড়াইলেন। পিছনে নিত্য-ঝি। নায়েব সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। চারিদিকে একবার সূক্ষ্ম দৃষ্টি বুলাইয়া লইয়া পিসীমা প্রশ্ন করিলেন, কেষ্ট সিং কোথা গেল?

পাগড়িটা জড়াইতে জড়াইতে কেষ্ট সিং তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আজ্ঞে!

পিসীমা প্রশ্ন করিলেন, শম্ভু কোথায়? গোরুবাছুরকে সব খেতে দেওয়া হয়েছে?

পুরু চশমাটা নাকের ডগায় টানিয়া দিয়া ভ্রূ ও চশমার ফাঁক দিয়া এদিক ওদিক দেখিয়া সিংহ মহাশয় হাঁকিলেন, শম্ভু! শম্ভু!

কেষ্ট সিং ততক্ষণে দ্রুতপদে শম্ভুর খোঁজে চলিয়া গিয়াছে।

পিসীমা বলিলেন, এ খোঁজটা সকালেই নিতে হয় সিং মশায়, গো-সেবায় অপরাধ হলে হিন্দুর সংসারে অভিসম্পাত হয়।

নায়েব মাথা চুলকাইয়া কি বলিতে গেলেন, কিন্তু তাহার পূর্বেই পিসীমা বলিলেন, সতীশ, কাছারি-ঘরটা খোল্ তো।

কয়েক বৎসর পূর্বে কৃষ্ণদাসবাবুর মৃত্যু হইয়াছে। তাহার পর হইতে কাছারি কক্ষখানি বন্ধই আছে। নাবালক ছেলে সাবালক হইলে এ ঘর আবার নিয়মিত খোলা হইবে, ব্যবহৃত হইবে। সতীশ তাড়াতাড়ি চাবি খুলিয়া দিল। পিসীমা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া নিস্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ঘরখানি পূর্বের মতই সাজানো রহিয়াছে। প্রকাণ্ড লম্বা ঘরখানার ঠিক মধ্যস্থলে একখানা আবলুস কাঠের টেবিল, তাহার পিছনে একখানা ভারী কাঠের সেকালের চেয়ার, টেবিলের দুই পাশে দুইখানা প্রকাণ্ড তক্তাপোশ ঘরের দুই প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। তক্তাপোশের উপর ফরাশ বিছানোই

আছে, ফরাশের উপর সারি সারি তাকিয়া, ঘরের দেওয়ালে বড় বড় দেবদেবীর ছবি, ঠিক দুয়ারের মাথায় সে-আমলের মন্দিরের আকারের একটা ক্লক টকটক করিয়া চলিতেছিল। রুপার আলবোলাটি পর্যন্ত একটা তেপায়ার উপর পূর্বের মতই রক্ষিত, নলটি টেবিলের উপর পড়িয়া আছে, যেন মালিক কোথায় কার্যান্তরে উঠিয়া গিয়াছেন।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া পিসীমা বলিলেন, জানলাগুলো খুলে দে, ঘরে রোদ আসুক।

সে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া নায়েবকে বলিলেন, বগতোড়ের মহেন্দ্র গণকের কাছে একটা লোক পাঠাতে হবে। খোকার কুষ্ঠি দেখে একটা শান্তি, আর—

এক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া পিসীমা বলিলেন, তাকে আপনি আসতে লিখে দিন।

তারপর আবার বলিলেন, মহালে মহালে লোক পাঠানো হয়েছে?

নায়েব বলিলেন, আজ্ঞে হ্যাঁ, পরশু লোক চলে গিয়েছে সব।

পিসীমা আর দাঁড়াইলেন না, কাছারি-বাড়ির সংলগ্ন শ্রীপুকুরের বাঁধা ঘাটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। মাঝারি আকারের সমচতুষ্কোণ পুকুরটির চারিপাশে তালতরুশ্রেণী সীমানা নির্দেশ করিয়া প্রাচীরের মত দাঁড়াইয়া আছে। পিসীমা দেখিলেন, ঠিক বিপরীত দিকে এক দল ভদ্রলোক কি যেন করিতেছে! তাহাদের সঙ্গে একটা টেবিলের মত কি একটা টানিতে টানিতে লইয়া চলিয়াছে, হাঁ, শিকলই তো।

পিসীমা বেশ উচ্চকণ্ঠেই প্রশ্ন করিলেন, কারা ওখানে?

কেহ উত্তর দিল না। পিসীমা কাছারির দিকে মুখ ফিরাইয়া ডাকিলেন, সিং মশায়!

নায়েব সিংহ মহাশয় তাড়াতাড়ি আসিয়া দাঁড়াইলেন। পিসীমা পদশব্দে তাঁহার আগমন অনুমান করিয়া বলিলেন, দেখে আসুন তো, কি হচ্ছে ওখানে আমার সীমানার মধ্যে!

কথাটা তিনি তাঁহার স্বাভাবিক উচ্চকণ্ঠেই বলিলেন। এবার ওদিকে হইতে উত্তর আসিল, সাহা-পুকুরের সীমানা জরিপ হচ্ছে।

শ্রীপুকুরের ওপাশেই সাহা-পুকুর, পুকুরের শরিকদের মধ্যে পাড়-বাঁটোয়ারা লইয়া একটা মামলা চলিতেছিল। কথাটা সকলেই জানিত।

পিসীমা বলিলেন, তা আমার সীমানার মধ্যে শেকল পড়ল কেন? শেকল তুলে নাও ওখান থেকে।

ওপাড়ার বৃদ্ধ শশী রায় বলিলেন, আমরা তো তোমাদের সীমানা খেয়ে ফেলি নি, তুলেও নিয়ে যাই নি—

বাধা দিয়া পিসীমা বলিলেন, তুলে নিন শেকল আমার সীমানা থেকে।

তাঁহার কণ্ঠস্বরে ও আদেশের দৃঢ় ভঙ্গিমায় সকলেই একটু চকিত হইয়া উঠিল। বৃদ্ধ শশী রায় গাঁজাখোর, তিনি ক্ষিপ্তের মত বলিয়া উঠিলেন, আচ্ছা হারামজাদা মেয়ে যা হোক!

কঠিন কণ্ঠে সঙ্গে সঙ্গে এদিক হইতে উচ্চারিত হইল, কেষ্ট সিং, ওই জানোয়ারটাকে ঘাড় ধরে আমার সীমানা থেকে বের করে দিয়ে এস।

পিসীমার উচ্চ কঠিন কণ্ঠস্বর শুনিয়া কেষ্ট সিং প্রায় নায়েবের সঙ্গেই আসিয়া লাঠি হাতে দাঁড়াইয়া ছিল। বিনা বাক্যব্যয়ে সে ওপাড়ের দিকে চলিয়া গেল। পিসীমা বলিলেন নায়েবকে, আপনি যান, সরকারী লোক যিনি জরিপ করতে এসেছেন, তাঁকে বলুন, আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই।—বলিয়াই তিনি কাছারি-বাড়িতে ঢুকিয়া সতীশকে বলিলেন, সতীশ, কাছারি-ঘর খুলে দে, আর পাশের খোকার পড়ার ঘরের মধ্যের দরজা খুলে দিয়ে পর্দাটা ফেলে দে। খোকা কোথায়? ডেকে দে।

আস্তাবলটার আড়ালে গা-ঢাকা দিয়া শিবনাথ শম্ভুর সহিত ফিসফিস করিয়া পরামর্শ করিতেছিল—সেই নেকড়ের বাচ্চা ধরিবার পরামর্শ। তাহার মনের মধ্যে বাঘ পুষিবার শখ নেশার মত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। রাত্রে স্বপ্নে পর্যন্ত ওই শাবকগুলি মন-গহনে খেলা করিয়াছে।

শম্ভুর উৎসাহও প্রবল, সে বলিল, উ ঠিক হবে আজ্ঞে। এই ঠিক ঝিকিমিকি বেলাতে ওদের মা-বাবাতে বেরিয়ে যাবে। আমরা অমুনি গত্ত থেকে বার করে নিয়ে আসব।

শিবনাথ একটু চিন্তা করিয়া প্রশ্ন করিল, আর বেশি থাকে না তো? পরক্ষণেই তাহার মনে পড়িল, সে পড়িয়াছে, মাংসাশী হিংস্র জন্তুরা কখনও দশজনে মিলিয়া ঘর বাঁধিয়া থাকে না। তাহার মায়ের কথাটাও মনে পড়িল, মানুষ ও জানোয়ারে তফাতের কথা। কিন্তু ইউরোপে নেকড়েরা দল বাঁধিয়া শিকার করে। সে আবার চিন্তিত হইয়া প্রশ্ন করিল, আচ্ছা, ওরা দল বেঁধে থাকে না?

না। একসঙ্গে দুটোর বেশি থাকে না। আমাদের মাঝিকে জিজ্ঞেস করুন কেনে।

মাঝি, অর্থাৎ শিবনাথদের সাঁওতাল কৃষাণ।

শম্ভু আবার বলিল, একটো বগি-দা নিয়ে যাব, থাকেই যদি, এক কোপে বলিদান দিয়ে দোব আজ্ঞে।

শিবনাথও চট করিয়া একটা অস্ত্রের সন্ধান করিয়া ফেলিল, ক্রিকেটের উইকেট, বল্লমের কাজ করিবে। মনে তাহার উত্তেজনা জাগিয়া উঠিল, থাকেই যদি, যুদ্ধ করিবে।

ঠিক সেই সময়েই পিসীমার কণ্ঠস্বর তাহার কানে আসিয়া পৌছিল, খোকা কোথায়? ডেকে দে।

সরকারী কানুনগো আসিয়া কাছারি-ঘরে বসিলেন। শিবনাথ উভয় ঘরের মধ্যে পর্দাটা ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। ভিতরের ঘর হইতে আদেশ হইল, নমস্কার কর শিবনাথ।

তাঁহার কথা শেষ হইবার পূর্বেই শিবনাথ নমস্কার করিয়াছিল, সে বলিল, করেছি পিসীমা।

কানুনগোবাবু বলিলেন, আমাকে কিছু বলবেন?

পিসীমা ভিতর হইতে বলিলেন, হ্যাঁ। আমার সীমানার মধ্যে শেকল আনবার পূর্বে আমাকে কি জানাবারও দরকার নেই? আমি স্ত্রীলোক, আইনের কথা ভাল জানি না, আইন কি আপনাদের তাই?

কানুনগো একটু ইতস্তত করিয়া বলিলেন, হ্যাঁ, ম্যাপ অনুযায়ী জরিপ করলে জানাবার ঠিক দরকার হয় না।

প্রশ্ন হইল, ম্যাপ অনুসারেই কি জরিপ করেছেন?

কানুনগো জবাব দিলেন, না, ওঁদের কহত-মতই আমি জরিপ করছিলাম। আর ওঁরা ঠিক আপনার সীমানা জরিপ করাচ্ছিলেন না, তালগাছের বেড়ার জন্যে ওপাশে যেতে অসুবিধে হচ্ছিল, তাইতে আপনার সীমানার—

এবার পিসীমা বাধা দিয়া বলিলেন, সীমানা আমার নয়, নাবালকের; এই ছেলেটির অভিভাবক সরকার-তরফ থেকে জজসাহেব, আমি তাঁরই প্রতিনিধি।

কানুনগো ভদ্রলোক অভিভূত হইয়া পড়িতেছিলেন, স্ত্রীলোকের নিকট তিনি এমন প্রশ্নোত্তর প্রত্যাশা করেন নাই। তিনি বলিলেন, আমারই দোষ, আপনাদের অনুমতি নেওয়া সত্যই আমার উচিত ছিল, তার জন্যে—

আবার বাধা দিয়া পিসীমা বলিলেন, আপনি সরকারের কর্মচারী, আমাদের মান্যের ব্যক্তি। আপনাকে জবাবদিহি করতে আমি ডাকি নি; আমি শুধু ওইটুকু জানতে চেয়েছিলাম।

কানুনগো বলিলেন, না না, ওই বুড়ো ভদ্রলোকটির কথায় আমার লজ্জার সীমা নেই, আপনি যদি এর প্রতিকার চান—

তাঁহার কথায় বাধা দিয়া উত্তর আসিল, উনি গাঁজাখোর, তা ছাড়া ওপর দিকে থুতু ছুঁড়ে লাভ তো হয় না, সে নিজের গায়েই এসে পড়ে। আর আমার বাপ কি ছিলেন, সে তো এ চাকলার লোকের অজানা নয়। মামলা করে টাকার ডিক্রী নেওয়া চলে, সম্মানের ডিক্রী নিতে যাওয়া ভুল।

কানুনগো চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া বলিলেন, তা হলে আমি উঠি ?

এবার শিবনাথ একটু অগ্রসর হইয়া আসিয়া বলিল, একটু চা খেয়ে যান।

কানুনগো হাসিয়া বলিলেন, না না খোকা, সে দরকার হবে না।

ভিতর হইতে অনুরোধ হইল, আমাদের হিন্দুর ঘর, তার ওপর আমরা জমিদার, আপনি অতিথি, সরকারী কর্মচারী, আপনি না খেলে বুঝব, আপনি অসন্তুষ্ট হয়েছেন আমাদের ওপরে।

কানুনগো এ কথার জবাব দিতে পারিলেন না।

শিবনাথ বলিল, চা দেওয়া হয়েছে আপনার।

কানুনগো মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন, ছোট একটি টেবিলের উপর রুপার রেকাবিতে মিষ্টান্ন এবং ধূমায়িত চায়ের কাপ শোভা পাইতেছে। দুয়ারের পাশে, হাতে গাড়ু, কাঁধে গামছা লইয়া চাকর দাঁড়াইয়া আছে।

কানুনগো চলিয়া গেলে পিসীমা বাহির হইয়া আসিলেন। বারান্দায় একজন দীর্ঘাকৃতি ভদ্রলোক দাঁড়াইয়া ছিলেন, তিনি শৈলজা-ঠাকুরানীকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, ভাল আছেন ?

সুযোগ পাইয়া শিবনাথ আবার শম্ভুর সন্ধানে খামার-বাড়ির দিকে চলিয়া গেল।

পিসীমা ভদ্রলোকটিকে বলিলেন, এস ভাই, এস, কি ভাগ্যি আমার, লক্ষ্মীর বরপুত্রের পায়ের ধুলো আজ সকালেই আমার ঘরে পড়ল! কবে এলে তুমি, ভাল ছিলে ?

ভদ্রলোকটি এই পাড়ারই, রামকিঙ্করবাবু, লক্ষপতি ব্যবসায়ী, কলিকাতায় থাকেন।

রামকিঙ্করবাবু বলিলেন, পরশু এসেছি। আজ সকালেই বৈঠকখানার দোরে দাঁড়িয়ে এই হাঙ্গামাটা শুনলাম, শুনে তাড়াতাড়ি এলাম, যদি কোন দরকারে লাগতে পারি।

পিসীমা স্মিতমুখে আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, বেঁচে থাক ভাই, ধনে পুত্রে বাড়বাড়ন্ত হোক তোমার। তোমাদের পাঁচজনেরই তো ভরসা করি।

রামকিঙ্কর হাসিয়া বলিলেন, ভরসা আপনাকে কারও করতে হবে না ঠাকরুন-দিদি। লোকে আপনাকে আড়ালে ঠাট্টা ক'রে বলে, ফৌজদারির উকিল। তা দেখলাম, উকিলের চেয়েও বড় আপনি, আপনি ব্যারিস্টার।

পিসীমা হাসিলেন, বলিলেন, আমায় তা হলে এবার কলকাতা থেকে গাউন আর টুপি এনে দিও, আর মামলা থাকলে খবর দিও।

রামকিঙ্করবাবু বলিলেন, মামলা একটা নিয়েই এসেছি ঠাকরুন-দিদি। তবে এ মামলায় আপনি জজসাহেব, একেবারে হাইকোর্ট, এর আর আপীল নেই।

পিসীমা বলিলেন, তাই তো বলি, ব্যবসাদার কি বিনা গরজে কোথাও পা বাড়ায়! বেনেতী বুদ্ধি পেটে পেটে হয় তাদের। কি, বল শুনি!

রামকিঙ্করবাবু বলিলেন, আমার মা-মরা ভাগ্নীটিকে আপনাকে নিতে হবে। শিবনাথের আপনি বিয়ে দিচ্ছেন শুনলাম।

পিসীমা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, তারপর ধীরে ধীরে বলিলেন, এখন এ কথার জবাব দিতে পারলাম না ভাই, কাল জবাব দোব।

রামকিঙ্করবাবু এ উত্তর প্রত্যাশা করেন নাই, তিনি ঈষৎ উষ্ণভাবে বলিলেন, কেন, আপনাদের জমিদারের ঘরের উপযুক্ত হবে না আমার ভাগ্নী?

পিসীমার মুখচোখ রাঙা হইয়া উঠিল, কিন্তু আত্মসংবরণ করিয়া তিনি বলিলেন, ঠিক উলটো ভাবছি ভাই, ভাবছি—হাতির খোরাক যোগাতে কি আমার শিবনাথ পারবে? লক্ষপতির ঘরের মেয়ে আমাদের মত ছোট জমিদারের ঘরে খাপ খাবে? তা ছাড়া তার মা আছে, তারও একটা মত চাই।

রামকিঙ্করবাবু একটু অপ্রতিভ হইয়া গিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, না, না, আপনার দাদার, আমাদের ঠাকুরদার প্রতাপে বাঘে-বলদে এক ঘাটে জল খেয়েছে; তার ছেলে শিবনাথ, সে বাঘিনী হলেও বশ মানাবে। ওই দেখুন না।

সম্মুখেই প্রশস্ত অঙ্গনের মধ্যে তখন শিবনাথ একটা ঘোড়াকে শাসন করিতেছিল। কাহার একটা ছোট ঘোড়া, কিন্তু দুরন্তপনায় সে খাটো নয়, ক্রমাগত পিছনের পা দুইটা ছুঁড়িয়া সওয়ার শিবনাথকে ফেলিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছিল।

শিবনাথ হুকুম করিতেছিল শম্ভুকে, দে তো রে একটা খেজুরের ডাল ভেঙে কাঁটাসুদ্ধ।

রামকিঙ্করবাবু হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন, শুনছেন?

পিসীমার মুখও আনন্দোজ্জ্বল হইয়া উঠিল, তিনি ডাকিলেন, শিবু, অ শিবু, নেমে আয়।

শিবু বলিল, দাঁড়াও না, বেটার পা ছোঁড়াটা একবার বের করে দিই।

পিসীমা বলিলেন, কার ঘোড়ায় চেপেছিস, মা শুনলে রাগ করবে।

সম্মুখেই এক প্রৌঢ় আধা-ভদ্র মুসলমান দাঁড়াইয়া ছিল, সে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া বলিল, আমারই ঘোড়া মা, আমি আপনাদের প্রজা মা! আপনার মহল দোগাছির মোড়ল আমি।

পিসীমার মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল, তিনি বলিলেন, তুমিই সবজান শেখ।

প্রৌঢ় বলিল, আপনাদের গোলাম তাঁবেদার আমি মা।

পিসীমা রামবাবুকে বলিলেন, তুমি কাল সকালে একবার এসো ভাই রাম, নাস্তির কুষ্টিটাও নিয়ে এসো। আজ আর দেরি হয়ে গেল, কাল সকালে জলখাবারের নেমন্তন্ন রইল।

রামকিঙ্কর হাসিয়া বলিলেন, তাই আসব। কিন্তু সে মিষ্টি তো আমার ঘটকালির পাওনা। আজকের—

পিসীমা হাসিয়া বলিলেন, বেশ তো, দু থালা খাবে।

রামকিঙ্কর হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন। পিসীমার মুখের হাসি মিলাইয়া গেল, মুখখানা কঠোর হইয়া উঠিল ; তিনি ডাকিলেন, শিবনাথ, নেমে এস।

শিবু, 'শিবনাথ' সম্বোধন এবং সম্ভ্রমপূর্ণ ভাষায় আদেশ শুনিয়া বুঝিয়াছিল, এ আদেশ অলঙ্ঘনীয়। সে ঘোড়া হইতে নামিয়া কাছারির বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল।

সবজান আসিয়া বলিল, প্রথমেই হুজুরের সঙ্গে দেখা, হুজুরকে সেলাম করতেই হুজুর বললেন, ওই পিসীমা রয়েছেন, হোথা যাও, আমি তোমার ঘোড়াটা দেখি।—বলিয়া সে এইবার শিবনাথের সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া দুই হাতে প্রসারিত একখানি লাল রেশমী রুমালের উপর পাঁচটি টাকা নজর হাজির করিল।

শিবনাথ চাহিয়া ছিল পিসীমার মুখের দিকে, সেখানে কখন কি ইঙ্গিত সে পাইল সে-ই জানে, সে টাকা পাঁচটি স্পর্শ করিয়া বলিল, নায়েববাবুর সেরেস্তায় দাও।

সবজান করজোড়ে বলিল, আমাকে রক্ষা করতে হবে হুজুর। আমার খাজনা নিতে হুকুম দিতে হবে।

শিবনাথ পিসীমার মুখের দিকে চাহিয়া ছিল। পিসীমার মুখ গভীর গাম্ভীর্যে থমথম করিতেছিল।

সবজান বলিল, হুজুর।

শিবনাথ একবার সবজানের দিকে চাহিয়া দেখিল, তাহার চোখের কোণে কোণে অশ্রু জমা হইয়া উঠিতেছে। সে বলিয়া উঠিল, বেশ তো, খাজনা দাও না তুমি।—বলিয়াই সে বলিল, পিসীমা!

পিসীমার অনুমতি প্রার্থনায় সবজানও একান্ত অনুনয়পূর্ণ কণ্ঠে বলিল, মা!

পিসীমা হাসিয়া বলিলেন, মালিকের হুকুম হয়ে গিয়েছে সবজান, সে তো আর 'না' হয় না।

সবজান বার বার সেলাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। পিসীমা বলিলেন, দু ফোঁটা চোখের জলে তুমি আমার কাছে রেহাই পেতে না সবজান। আরও একটু শিক্ষা তোমায় আমি দিতাম। যাক, কিন্তু স্বীকার করে যাও, জমিদারের লোককে বিনা কারণে অপমান আর কখনও—

সবজান বলিয়া উঠিল, আমরাও তো আপনার ছেলে মা।

পিসীমার ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি বলিলেন, কথার ওপর কথা বলতে নেই সবজান। ছেলে তো তোমরা নিশ্চয়ই, কিন্তু অবাধ্যতার জন্যে তোমাদের ওই মালিক শিবনাথের পিঠেও মারের দাগ দেখতে পাবে। এস শিবনাথ।

শিবনাথের হাত ধরিয়া পিসীমা চলিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পর সতীশ চাকর মাটির বাসনে করিয়া জলখাবার আনিয়া বলিল, শেখজী, আপনার জলখাবার।

নায়েবের সম্মুখে ছোট একটা কাগজের টিপ ফেলিয়া দিয়া সতীশ নায়েবকে বলিল, শেখজীর বিদেয়।

নায়েব পড়িল, চিরকুটে লেখা রহিয়াছে, দোগাছির মণ্ডল সবজান শেখের বিদায়ের জন্য এক জোড়া কাপড় ও চাদর আনিয়া দিতে হইবে। সহি করিয়াছেন শিবনাথের মাতা, আর এক পাশে একটা ঢেরা-সহি, ওইটুকু পিসীমার হুকুম ; পিসীমা অল্প পড়িতে জানেন, কিন্তু লিখিতে জানেন না।

তিন

সন্ধ্যায় নীচের তলার দরদালানে বসিয়া ননদ ও ভ্রাতৃজায়ার মধ্যে কথা হইতেছিল। একখানি গালিচার উপর বসিয়া পিসীমা পায়ে তেল লইতেছিলেন। পাশে একখানি ডালায় গোটা সুপারি ও জাঁতি রহিয়াছে। এপাশে শিবনাথের মা হ্যারিকেনের আলোর সম্মুখে বসিয়া মঞ্জুরি-সহিযুক্ত টিপের সহিত জমাখরচের খাতা মিলাইয়া দেখিতেছিলেন, অনুজ্জ্বল আলোকেও তাঁহার দেহবর্ণ মোমের মত শুভ্র মনে হইতেছিল। খাতাখানি বন্ধ করিয়া তিনি বললেন, ঠিক আছে ঠাকুরঝি।

পিসীমা বলিলেন, বেশ, সতীশকে দিয়ে দাও।

সতীশ দাঁড়াইয়াই ছিল, সে খাতাপত্র লইয়া গেল।

পিসীমা বলিলেন, কিছুদিন থেকেই ভাবছি বউ, মনের আমার বড় সাধ, বলি বলি করেও তোমায় বলি নি।

অন্তরাল হইতে শুনিলে, এখনকার এই পিসীমাকে প্রাতঃকালের সেই পিসীমা বলিয়া চেনা যায় না, ভাষায় ভঙ্গিমায় কোনখানে মেলে না। এখনকার ভাষায় ভঙ্গিমায় কেমন একটি সকরুণ দীনতার আবেদন সুস্পষ্ট, সংশয় করিবার অবকাশ পর্যন্ত হয় না।

শিবনাথের মা বলিলেন, শিবনাথের বিয়ের কথা বলছ ঠাকুরঝি ? চমকিয়া উঠিয়া পিসীমা বলিলেন, শুনেছ তুমি বউ ? কে বললে তোমাকে ?

শিবনাথের মা একটু হাসিলেন, বলিলেন, সকলের কাছেই শুনছি। তুমি আমাকেই কেবল বল নি, নইলে বলেছ তো পাড়ার সকলকেই।

পিসীমা বলিলেন, আমি তো কাউকে বলি নি বউ।

শিবনাথের মা আবার হাসিলেন। হাসিতে হাসিতেই বলিলেন, ইচ্ছে করে হয়তো বল নি। কিন্তু তোমার সাধের কথা কখন যে বেরিয়ে গেছে, সে তুমি জানতে পার নি ভাই।

পিসীমা বলিলেন, বড় সাধ আমার বউ, ছোট্ট একটি বউ এনে ঘর করি। বাড়ির মেয়ের মত ঘুরঘুর করে বেড়াবে, শিবুকে দেখে ঘোমটা দেবে না, তার সঙ্গে ঝগড়া করবে। দাদারও আমার তাই সাধ ছিল, দুই ভাই-বোনে কত পরামর্শ করেছি।

শিবনাথের মা চুপ করিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ উত্তরের প্রতীক্ষা করিয়া পিসীমা বলিলেন, বউ!

নতমুখে শিবনাথের মা বলিলেন, ভাবছি ভাই।

পিসীমা বলিলেন, এইজন্যই তোমায় আমি বলি নি বউ। ছেলে তো তোমার। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া তিনি নীরব হইলেন।

শিবনাথের মা বলিলেন, না, শিবনাথ তোমার।

যেন শিহরিয়া উঠিয়া পিসীমা বলিলেন, না না বউ, তোমার, শিবু তোমার। আমার, এ কথা বোলো না, আমার হলে থাকবে না। থাকল না তো ভাই, একদিনে স্বামী-পুত্র গেল। আমার মনে হয় কি জান বউ, মনে হয়, তোমার বৈধব্যের জন্যেও আমি দায়ী।

ঝরঝর করিয়া চোখের জলে তাঁহার বুকের বস্ত্রাঞ্চল ভাসিয়া গেল।

শিবনাথের মা বলিলেন, কেঁদো না ভাই ঠাকুরঝি, এক্ষুনি হয়তো শিবু এসে পড়বে, তারপর সেও উপদ্রব করবে। তোমার কান্না দেখলে তার উপদ্রব বাড়ে যেন তোমার ওপর।

সচকিত হইয়া পিসীমা বলিলেন, কই শিবু তো এখনও ফেরে নি!

বাহিরে দুয়ারের গোড়ায় সতীশ দাঁড়াইয়া ছিল, সে বলিল, কই, বাবু তো এখনও ফেরেন নি, মাস্টার মশায় বসে আছেন।

সঙ্গে সঙ্গে পিসীমা উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, রাত্রি কটা হল সতীশ? কেষ্ট সিংকে বল, আলো নিয়ে—

মা বাধা দিয়া বলিলেন, রাত্রি বেশি হয় নি। কিন্তু শিবনাথকে শাসন করা দরকার হয়েছে ঠাকুরঝি।

পিসীমা বলিলেন, খুব শাসন করো তুমি আজ, কিছু বলব না আমি ভাই, আমি

ওপরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে বসে থাকব। সেইজন্যেই তো সকাল সকাল বিয়ে দিতে চাই আমি। জান তো আমার বাপেদের গুষ্টি। হয়তো বয়ে যাবে কখন।

মা বলিলেন, সে কথার কথা ঠাকুরঝি, ছেলেকে শাসনে রাখলে বেগড়ায় তার সাধ্যি কি! আমার যে ভাই, অনেক সাধ শিবনাথের ওপর, আমি যে বড় বিখ্যাত লোকের মা হতে চাই।

পিসীমা বলিলেন, বিয়ে হলে কি তা হয় না বউ? সে তো ভাগ্যের ফল।

মা বলিলেন, ভাগ্যই হয়তো হবে। বাবাকে আমার চিঠি লিখেছিলাম আমি, তিনিও তাই লিখেছেন। লিখেছেন, শৈলজা-মায়ের সাধে বাধা দিও না, সে তোমার অধর্ম হবে।

হর্ষোৎফুল্ল কণ্ঠে ব্যগ্রতাভরে পিসীমা বলিয়া উঠিলেন, তাই লিখেছেন তিনি বউ, তাই লিখেছেন? এত বিবেচনা না হলে মানুষ বড় হবে কেন? তা ছাড়া, আর একটা কথা কি জান বউ, আমার তো এই অদৃষ্ট, তোমারও অদৃষ্ট তো ভাল বলতে পারব না, নইলে এমন রাজার মত স্বামীকে এই বয়সে হারাবে কেন? তাই ভাবি, একটি ভাগ্যমানী মেয়ের ভাগ্যের সঙ্গে শিবুকে বেঁধে দিই।

বাহিরে শিবনাথের আস্ফালন শোনা গেল, বন্দুক থাকলে, জান কেষ্ট, ঠিক ওটাকে মেরে আনতাম।

মা বলিলেন, তুমি ওপরে যাও ঠাকুরঝি।

শৈলজা উঠিলেন, কিন্তু যাইতে যাইতে বলিলেন, বেশ করে কান মলে দিও, যেখানে সেখানে চড়-টড় মেরো না যেন।

শিবনাথ ঘরে ঢুকিল। হাতে একটা উইকেট স্টিক, বগলে একটা নেকড়ের বাচ্চা! শাবকটাকে উঠানে ছাড়িয়া দিয়া বলিল, বল দেখি রতনদি, কিসের বাচ্চা এটা?

রতনদিদি এ বাড়ির পুরাতন পাচিকা। রতন ইশারা করিয়া দেখাইয়া দিল মাকে। কিন্তু শিবনাথের উৎসাহের সীমা ছিল না। সে বলিল, ওকি, হাত দিয়ে কী দেখানো হচ্ছে? দেখ না, একটা হেঁড়োলের বাচ্চা ধরে এনেছি। হেঁড়োল—ইংরিজীতে বলে উল্ফ, হায়েনা। ডু ইউ নো? ইউ ডোণ্ট নো। আবার হাত নাড়ে! শোন না, উদোসীর পারে একটা গর্ত থেকে ধাড়ী দুটো বেরিয়ে গেল, আর আমরা গর্তটা উইকেট দিয়ে খুঁড়ে—

মা আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া ডাকিলেন, শিবনাথ!

শিবনাথ মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া অপেক্ষাকৃত ম্লানস্বরে বলিল, নেকড়ের বাচ্চা ধরে এনেছি মা। হাতটা কামড়ে ছিঁড়ে দিয়েছে কিন্তু, এই দেখ।

রক্তাক্ত হাতটা সে মায়ের সম্মুখে প্রসারিত করিয়া ধরিল। মা তাহার হাতের দিকে চাহিয়া দেখিলেন না, তিনি একদৃষ্টে ছেলের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। শিবু বলিয়া উঠিল, পিসীমা কোথায় রতনদি? তারপরই আরম্ভ করিল, পিসীমা, হেঁড়োলের বাচ্চা ধরে এনেছি, দেখবে এস। আমার হাতটা কামড়ে কী করে দিয়েছে দেখে যাও। উঃ—

মা তাহার কান টানিয়া ধরিয়াছিলেন, কিন্তু হাসিয়া ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন, বড় শয়তান হয়েছিস শিবু, নেকড়ের বাচ্চা যদি পিসীমা নাই দেখে, তবে হাতে যে কামড়ে দিয়েছে, সেটা দেখে যাক।

উপরের বারান্দায় তখন পিসীমার পদধ্বনি ধ্বনিত হইতেছিল।

মা বলিলেন, রতন, উনুনে জল গরম করতে দাও দেখি। কেষ্ট, ডাক্তারখানা থেকে এক শিশি আইডিন নিয়ে এস চট করে, ওদের লালায় বিষ থাকে।

তারপর ছেলের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, তোমার ওপর বড় অসন্তুষ্ট হয়েছি শিবু, যদি ধাড়ীটা তোমায় ধরত, তবে কী হত বল তো?

পিসীমা ততক্ষণে আসিয়া পড়িয়াছিলেন, বলিলেন, ডাক্তারকে ডেকে আন কেষ্ট।

শিবু বলিল, এই দেখ পিসীমা।

তুমি আমার সঙ্গে কথা কয়ো না শিবু।

মা বলিলেন, কালই এটাকে ছেড়ে দিয়ে আসবে।

শিবুর মুখ শুকাইয়া গেল, সে বলিল, ছেড়ে দিয়ে আসব?

হ্যাঁ, নেকড়ের বাচ্চা পুষে কী হবে? ওরা হিংস্র পশু। আর পাখি পশু পাশা—এ তিন কর্মনাশা। তোমার এখন পড়ার সময়, বুঝলে? তা ছাড়া হিংসা করা আমি পছন্দ করি না।

শিবু দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ঘাড় নাড়িয়া ইঙ্গিতে বলিল, বেশ।

মা বলিলেন, বাচ্চাটাকে একটু দুধ দাও দেখি।

নেকড়ের বাচ্চাটা এক কোণে দাঁড়াইয়া হিংস্রভাবে ফ্যাসফ্যাস করিতেছিল। কেষ্ট বাচ্চাটাকে লইয়া চলিয়া গেল।

পিসীমা এতক্ষণে বলিলেন, আমি কাল কাশী যাব বউ। আমায় তুমি রেহাই দাও ভাই।

শিবনাথ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে থাকিতে অকস্মাৎ আরম্ভ করিল, হাতটা যে বড় জ্বালা করছে রতনদি, উঃ! মা বলছিল, বিষ আছে ওদের।

পিসীমা ও-বারান্দায় বসিয়া ছিলেন, তিনি উঠিলেন।

মা হাসিয়া বলিলেন, কিছু হয় নি, বস তুমি, ভারি শয়তান ওটা।

ভাইপো এবং পিসীমার মধ্যে এই ধারায় কতক্ষণ যে মান-অভিমানের পালা চলিত, তাহা বলা কঠিন। এ বাড়ির পক্ষে এই অভিমানের পালা নিতান্তই সাধারণ ঘটনা। তবে পিসীমার অভিমান ক্রোধে পরিণত হইলেই বিপদ। সমস্ত সংসারটার সেদিন আর লাঞ্ছনার শেষ থাকে না। আজিকার ঘটনাও যে অভিনয়ের মধ্য দিয়া কোথায় গিয়া দাঁড়াইত, কে জানে। কিন্তু দৈবক্রমে অকস্মাৎ একটি ছেদ পড়িয়া গেল। বাড়ির বাহির-দরজাতেই কাহার সুগম্ভীর কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হইয়া উঠিল, তারা, তারা, কল্লেয়ান কর মায়ী!

সে কণ্ঠস্বর শুনিয়া শিবু উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, ছুটিয়া সে বাহিরের দরজার দিকে আগাইয়া গিয়া ডাকিল, গোঁসাই-বাবা!

বাবা হামার রে!

পরক্ষণেই বিশালকায় প্রৌঢ় সন্ন্যাসী শিবুকে ছোট একটি শিশুর মত কোলে তুলিয়া লইলেন। মানুষটি প্রায় সাড়ে ছয় ফুট লম্বা, তেমনই পুষ্ট এবং বলিষ্ঠ শরীর, মুখে একমুখ দাড়ি আবক্ষপ্রসারিত, হাতে প্রকাণ্ড একটা চিমটা।

শিবুর মা বলিলেন, নিত্য, আসন এনে দাও রামজীদাদার জন্যে। আসুন দাদা, আসুন।

পরক্ষণেই শিবুকে সন্ন্যাসীর বক্ষোলগ্ন দেখিয়া বলিলেন, নাম শিবু, নাম; সন্ন্যাসী নারায়ণের সমান, আর তোমার বয়স হয়েছে, নাম, প্রণাম কর।

শিবুকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন, তব তো হামি আর তুম্‌হার বাড়ি আসবে না ভাই-দিদি।

শৈলজা-ঠাকুরানী বলিলেন, কিন্তু শিবুর যে অপরাধ হবে দাদা।

না ভাই-দিদি, হোবে না, হোবে না। কার্তিকদাদা গণেশদাদা দুর্গামায়ীর কোলে নাচে না ভাই-দিদি?

শিবুকে তিনি গভীরতর স্নেহে বুকে চাপিয়া ধরিলেন।

এই সন্ন্যাসীটি পূর্বে ছিলেন সৈন্যদলের একজন হাবিলদার। বহু যুদ্ধে তিনি গিয়াছিলেন,—মণিপুরের রাজবংশকে উচ্ছেদ করিবার জন্য যে খণ্ডযুদ্ধ হইয়াছিল তাহাতে তিনি ছিলেন; মিশরে প্রেরিত সৈন্যদলের মধ্যে ইনি একজন; আফগানিস্তান এবং বর্মাতেও অনেকদিন কাটাইয়া আসিয়াছেন। শরীরের কয়েক স্থানেই গভীর ক্ষতচিহ্ন আজও বর্তমান। তাঁহার ঝুলির মধ্যে তিন-চারিখানি মেডেল সযত্নে রক্ষিত আছে। একদা কোন এক অজ্ঞাত কারণে সহসা সৈন্যদলের পদ ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছিলেন। তারপর পনেরো-ষোলো বৎসর পূর্বে একদিন এই গ্রামের মহাতীর্থস্থল, মহাপীঠ বলিয়া খ্যাত অট্টহাস দর্শনে আসিয়া কৃষ্ণদাসবাবুর সহিত

বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হন। কৃষ্ণদাসবাবু তাঁহার ওই শখের দেবীবাগে সন্ন্যাসীর জন্য আশ্রম তৈয়ারি করিয়া দিয়া তাঁহাকে স্থাপন করেন। বাগানের কালীমন্দির প্রতিষ্ঠাও এই সন্ন্যাসী-বন্ধুর প্রেরণায় এবং প্রয়োজনে। কৃষ্ণদাসবাবুর দিক দিয়াও সন্ন্যাসীর নিকট প্রাপ্ত উপকারের পরিমাণ বড় কম নয়। সন্ন্যাসীটি অদ্ভুত কর্মী, তাঁহারই পরিশ্রমে এবং ওই প্রান্তরে দিবারাত্রি অবস্থানের জন্যই এমন দেবীবাগ গড়িয়া উঠিয়াছিল। শৈশব হইতেই শিবু গোঁসাই-বাবার বড় প্রিয়, সংসারের মধ্যে প্রিয়তম বস্তু বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পূর্বে সন্ন্যাসী সন্ধ্যায় আহারের জন্য কৃষ্ণদাসবাবুর সঙ্গে বাগান হইতে বাড়িতে আসিতেন। কখন গোঁসাই-বাবা আসিবেন—সেই প্রতীক্ষায় শিবু পড়া শেষ করিয়া বসিয়া থাকিত, গোঁসাই-বাবা আসিয়া গল্প বলিবেন। সন্ন্যাসীর পার্থিব সঞ্চয়ের ঝুলিটি সামান্যই, কিন্তু গল্পের ঝুলি অসামান্যরূপে বৃহৎ—রূপকথা, যুদ্ধের গল্প, বিচিত্র দেশের কথা তিনি অদ্ভুত সুন্দরভাবে বলিতে পারেন। এমনই ভাবে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী এবং স্বপ্নপ্রবণ একটি শিশু—দুইজনে মিলিয়া এক স্নেহের স্বর্গলোকের সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছিল, সে স্বর্গলোক আজও অটুট আছে। তবে সেকালের মত অহরহ মুখর নয়, ওই পরিত্যক্ত দেবীবাগের মত নির্জন হইলেও এখনও মধ্যে মধ্যে তাহারা যায় আসে, দেখা হয়। সন্ন্যাসী এখন এই গ্রামেরই সাধারণ দেবস্থান মহাপীঠ অট্টহাসের গদিয়ান হইয়া আছেন। অবসর কম, তবুও মধ্যে মধ্যে কৃষ্ণদাসবাবুর বাড়ির সংবাদ না লইয়া পারেন না; শিবুও মধ্যে মধ্যে তাঁহার কাছে ছুটিয়া গিয়া পড়ে।

বৃদ্ধ ও বালকের মিতালির প্রগাঢ়তা দেখিয়া শৈলজা-ঠাকুরানী হাসিয়া বলিলেন, দাদা, এইবার তোমার ভরত রাজার মত অবস্থা হল।

সন্ন্যাসী একটু হাসিলেন। তারপর বলিলেন, মৃগশিশু তো ভাগবে, উ হামি জানি। কিন্তু ভাই, দেখো, যোগসাধনমে ভজনপূজনমে না না মিলে নন্দলাল, দোনো বাহু মিলকে ঘুমে দুনিয়াভোর বালক-গোপাল। নন্দলাল যখন মিলছে না ভাই, তখন বালক-গোপালকে ছাড়ি ক্যায়সে কহো?

শিবু কথাটার অর্থ বুঝিয়াছিল; রামায়ণ মহাভারত সে পড়িয়াছে। তাহার মনটা ব্যথিত এবং অভিমানেও কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। সে আপন বাহুবন্ধন শিথিল করিয়া গোঁসাই-বাবার কোল হইতে উঠিয়া যাইবার জন্য সুযোগের প্রতীক্ষা করিয়া রহিল। এই অভিমানের কিছুমাত্র আভাসও সে দিতে চায় না।

এ সুযোগ সন্ন্যাসীই তাহাকে দিলেন, বলিলেন, যাও, পড়ো হামার বাবা, হামি তোমার পড়ার ঘরমে যাবো থোড়া বাদ।

শিবু নীরবে চলিয়া গেল। সন্ন্যাসী বলিলেন, একটি কথা হামি বলতে এসেছি দিদি। শিবুর সাদির কথা শুনলাম ভাই আজ।

শিবুর মা মৃদু হাসিয়া বলিলেন, এর মধ্যে গাঁ রটে গেছে?

না ভাই, রামকিঙ্করবাবুর মা—গিন্নীমা বললেন হামাকে। দিয়ে দে ভাই, দিয়ে দে সাদি। উ কন্যাকে ললাট বহু সুপ্রসন ললাট ভাই, বহুত ভাগ্যমানী কন্যা। এই বাতটি বলনে লিয়ে হামি আসিয়াছি ভাই। কল্লেয়ান হবে শিবুর।

শৈলজা-ঠাকুরানী ব্যগ্রভাবে প্রশ্ন করিলেন, নাত্তির হাত তুমি দেখেছ দাদা?

হাঁ ভাই, হাতের রেখা ললাটরেখা বহুত প্রশস্ত আছে দিদি। আউর ভাই দেখো, রামকিঙ্করবাবু আজকাল ই জাগাকে প্রধান আদমি। শিবুর হামার বল বাড়বে, সহায় হোবে।

শৈলজা-ঠাকুরানী প্রাণ খুলিয়া কথাটায় সায় দিলেন না, শুধু বলিলেন, হুঁ।

শিবুর মা বিনীত হাসি হাসিয়া বলিলেন, তা বটে দাদা; কিন্তু সংসারে কি আর কেউ কারও ভাগ্য পরিবর্তন করে দিতে পারে?

সঙ্গে সঙ্গেই কথাটা ঘুরাইয়া দিয়া তিনি বলিলেন, যান, এখন আপনার বাবার কাছে যান, বুড়ো গোপাল আপনার গল্প শোনবার জন্যে ছটফট করছে যে!

সন্ন্যাসী আপন ভ্রমের কিছু আভাস পাইয়াছিলেন, আর তাঁহারও মন শিবুর সহিত গল্প করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিল, তিনি উঠিলেন।

কিছুক্ষণ পরই তাঁহার উচ্চ কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হইয়া উঠিল, দন-ন-ন-ন দন-ন-ন-ন। যুদ্ধের গল্প হইতেছে, কামান ছুটিতেছে। বিস্মিতনেত্রে শিবু তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া আছে। গল্প হইতেছে মণিপুর যুদ্ধের।

টিকেন্দ্রজিৎ বড়া ভারী বীর। মণিপুর রাজাকে ভাই উনকে সেনাপতি। কি ভাই খিটির-মিটির হইলো রেসিডেন-সাবকো সাথ, বাধিয়ে গেলো লড়াই। হামি লোক তো গেলো ভাই, শহরকে বাহারমে তো ছাউনি বইঠ গিয়া। উস্‌কে বাদ কামানসে গোলা ছুটনে লাগা—দন-ন-ন-ন দন-ন-ন-ন।

তারপর সেই আধা-হিন্দী আধা-বাংলা ভাষার বর্ণনার মধ্য দিয়া যুগযুগান্তর পার হইয়া শ্রোতা এবং বক্তা উভয়েই মণিপুর যুদ্ধক্ষেত্রের মধ্যে গিয়া উপস্থিত হয়। নির্ভীক সেনাপতির মতই সেই গোলাগুলিসঙ্কুল যুদ্ধক্ষেত্রে তাহারা বিচরণ করে। খর্বাকৃতি বলিষ্ঠকায় অমিতবীর্য টিকেন্দ্রজিৎ তাহাদের মুখামুখি আসিয়া দাঁড়ান। শহরের দুয়ার ভাঙিয়া পড়ে, উন্মত্ত ব্রিটিশ সৈন্যদল বন্দুকের ডগায় বেয়নেট বাগাইয়া ধরিয়া শহরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া লুণ্ঠন আরম্ভ করিয়া দেয়।

হামি অওর চার আদমি লাথিকে মারে দরোয়াজা তোড়কে এক ঘরমে ঘুস গেইলো। হুঁয়া মিলা হামকো এতনা বড়া এক সোনেকা পাত।

সোনার পাত!

হাঁ, সোনেকা পাত, উ হামি লেই লিয়া হামারা পাতলুনকে নীচে।

কোন্ যুদ্ধের গল্প হচ্ছে? আর দেরি কত, রাত্রি যে অনেকটা হয়ে গেল?—শিবুর মা আসিয়া দুয়ারে দাঁড়াইলেন। গল্পের গতিস্রোতে একটা ছেদ পড়িল। আবার আসিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া তবে সন্ন্যাসী সেদিন মুক্তি পাইলেন।

রাত্রে পিসীমা শিবনাথের সহিত কথা কহিতেছিলেন। শিবনাথ এখনও পিসীমার ঘরেই শোয়, শিবনাথকে অন্য কাহারও নিকট রাখিয়া পিসীমার ঘুম হয় না। শিবনাথের মাতামহ থাকেন বেহারে, সেখানে সরকারী চাকরি করেন, তাঁহার ছেলেরা সকলেই কৃতবিদ্য। শিবনাথের মা ছেলেকে শিক্ষিত করিবার অভিপ্রায়ে এবং এই বংশের ধারা—জমিদারসুলভ দর্প, জেদ, উচ্ছৃঙ্খলতা, কঠোরতা ও বিলাসপরায়ণতা—হইতে ছেলেকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে বহুবার সেখানে পাঠাইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। পিসীমা মুখে কিছু বলিতেন না, কিন্তু কাশী যাইবার উদ্যোগ করিতে বসিতেন। শিবনাথের মা অগত্যা নিরস্ত হইয়াছিলেন।

প্রতিবেশিনী অন্তরঙ্গ কেহ কেহ বলিতেন, তা তোমাকে একটু সহ্য করতে হবে বইকি, এই জমিদারী সম্পত্তি, তুমি বউ-মানুষ চালাবে কেমন করে?

শিবনাথের মা হাসিতেন, অধিকাংশ সময়েই এ কথার উত্তর দিতেন না। একবার কাহাকে বলিয়াছিলেন, সম্পত্তির ভাগ্যে যাই থাক, ঠাকুরঝি যে সেখানে পাগল হয়ে যাবে, ওর যে ভরত রাজার দশা হয়েছে, মমতায় যে অন্ধ হয়ে পড়েছে।

সে কথা পিসীমার কানে উঠিতে বিলম্ব হয় নাই, তারপর সে তুমুল কাণ্ড! পিসীমা কাশী যাইবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলেন। এ বাড়ির অন্নজল পর্যন্ত ত্যাগ করিলেন। শিবনাথের মা, সম্বন্ধে বড় হইয়াও, একরূপ পায়ে ধরিয়া নিরস্ত করেন।

পিসীমা বলিয়াছিলেন, কিসের মায়া? কার মায়া? যার এক বিছানায় স্বামী-পুত্র মরে, রাজার মত ভাই মরে যায়, সে আবার মায়া করবে কার? তবে আছি শুধু তোমার জন্যে, তুমি আমার দাদার স্ত্রী, শিবুর মা, তোমার লাঞ্ছনা হবে, পাঁচজনে বিষয়-সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে বিদেয় করে দেবে, সেইজন্যে পড়ে আছি।

শিবনাথের মা সে কথা অস্বীকার করিতে পারেন নাই।

আজ শৈলজা-ঠাকুরানী বলিলেন, এমন কর তো আমি কাশী চলে যাব শিবু। কোন্ দিন তুমি খুন হয়ে বসে থাকবে, সে আমি দেখতে পারব না।

শিবু বলিয়া উঠিল, ইউ আর এ কাওয়ার্ড।

বিরক্তিভরে পিসীমা বলিলেন, যা বলবি বাংলা করে বল্ বাপু, আমার বাবা কখনও ইংরিজী জানত না।

শিবু বলিল, তুমি একটি কাপুরুষ। বন্দুকটা দাও না, হেঁড়োলটাকেই মেরে

আনব। দন-ন-ন-ন দন-ন-ন-ন। জান, কামানের মুখে বড় বড় শহর ভেঙে চুরমার হয়ে যায়?

পিসীমা বলিলেন, মা তোর আজ দুঃখ করছিল, কেঁদে ফেললে বেচারী।

শিবু চকিত হইয়া বলিল, কেন?

পিসীমা বলিলেন, বলছিল, আমি যা চাই, শিবু তা হল না।

শিবু বলিল, কেন, প্রথম বছর মা আমার হাতে রাখী বেঁধে দিয়েছিল তিরিশে আশ্বিন, আমি সেই থেকে তো বিলিতী জিনিস কিনি না। পড়াও তো করি, এবারও থার্ড হয়েছি। আচ্ছা, আর জীব-হিংসে করব না।

পিসীমা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, আর একটি কথা বলি শোন্, চারদিক থেকে তোর বিয়ের সম্বন্ধ আসছে।

শিবনাথের মনে রঙ ধরিয়া গেল, সে বলিল, বিয়ে হবে নাকি আমার?

পিসীমা হাসিয়া বলিলেন, এই মাঘ মাসেই বিয়ে হবে। তা কোথায় বিয়ে করবি বল্ দেখি? হৃদয়বাবু পুলিস সাহেব ধরেছে তার নাতনীর জন্যে, নবীনবাবু উকিল তো ধরেই আছে। আজ আবার রামকিঙ্করবাবু এসেছিল ওর ভাগী নাস্তির জন্যে।

শিবনাথ বলিয়া উঠিল, দূ—র, ওর পোঁটা পড়ে নাকে।

পিসীমা হাসিয়া বলিলেন, ছোটবেলায় সে সবারই নাকে পড়ে রে। তোরও তো পড়ত। অন্য মেয়েরও পড়ে। বড় হলে কি পড়বে?

শিবনাথ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, ভারি বকে ওটা পিসীমা। সেদিন আমাকে গাল দিয়েছিল 'মুখপোড়া' বলে।

হাসিয়া পিসীমা বলিলেন, ছেলেমানুষ রে, ওর কি জ্ঞান আছে? সেদিন যে আমাদের বাড়িতেই তোর পিঠে চেপে বলেছিল, ঠাকুরদাদা গালে কাদা বাগবাজারের দই, ঠাকুরদাদার সঙ্গে দুটো মনের কথা কই। সে কেমন মিষ্টি করে বলেছিল বল্ দেখি?

শিবনাথ চুপ করিয়া রহিল। গ্রাম-সম্পর্কে শিবনাথের সহিত নাস্তির ঠাকুরদা-নাতনী সম্বন্ধ।

পিসীমা বলিলেন, গণকদের কাছে শুনেছি, আজ রামজীদাদাও বললেন, মেয়ের ভাগ্য নাকি খুব ভাল, অবৈধব্য যোগ আছে। আর ধনস্থান পুত্রস্থান খুব ভাল, সহজে এমন মেলে না। মেয়ে দেখতেও ভাল, রঙ ফরসা, নাকটিই একটু থ্যাদা।

শিবনাথ ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল, যা মন হয় তোমাদের তাই কর বাপু, বিয়ে একটা হলেই হল।

চার

পরদিন প্রাতঃকালে রামকিঙ্করবাবু শিবনাথের বাড়ির ভিতর প্রবেশ করিতে করিতেই শুনিতে পাইলেন, শৈলজা-ঠাকুরানী বলিতেছেন, গাছ একটা সামান্য জিনিসই বটে বউ, কিন্তু এ মান-অপমানের কথা, ইজ্জতের কথা, এখানে তুমি কথা কয়ো না।

কণ্ঠস্বরে সুকঠোর দৃঢ়তা প্রকাশ পাইতেছিল। কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া আবার তিনি বলিলেন, এ আমার বাপের বংশের অপমান। দাদা আমাকে বলতেন, শৈল, না খাব উচ্ছিষ্ট ভাত, না দিব চরণে হাত। এ আমাদের পিতৃপুরুষের শিক্ষা। মাথা নীচু করে জবরদস্তি তো কারও সইতে পারব না।

রামকিঙ্করবাবু ডাকিলেন, ঠাকরুন-দিদি রয়েছেন নাকি?

ভিতর হইতে আহ্বান আসিল, এস ভাই, এস।

নায়েব সিংহ মহাশয় বহির্দ্বার পর্যন্ত আগাইয়া আসিয়াছিলেন। রামবাবু ভিতরে গিয়া দেখিলেন, চাপরাসী কেষ্ট সিং এবং আরও কয়েকজন পাইক কোন কাজের জন্য যেন প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

পিসীমা একখানা গালিচার আসনের উপর বসিয়া ছিলেন; আর একখানা বিস্তৃত আসন দেখাইয়া দিয়া তিনি রামবাবুকে বলিলেন, এস ভাই।

তারপর বলিলেন, কেষ্ট সিং, গাছ আটক করতে পারবে তোমরা?

কেষ্ট সিং বলিল, না জখম হলে তো ফিরব না মা।

রামবাবু বলিলেন, কি হল ঠাকরুন-দিদি?

পিসীমা বলিলেন, ও-পাড়ার শশী রায় কালকের সে অপমান ভুলতে পারে নি ভাই। আজ ওদের পুকুর-পাড়ে আমাদের বহুকালের দখলী একটা গাছ আছে, সেটা কাটতে লাগিয়েছে।

রামবাবু বলিলেন, মকদ্দমা হলে যে আপনারা ঠকবেন, যার জায়গা গাছ তারই হয়।

পিসীমা বলিলেন, গাছ যখন আমার দখলে আছে, তখন তার তলার মাটিও তা হলে আমার। সবই তো দখলের প্রমাণের ওপর ভাই। কিন্তু সে তো পরের কথা। আজ যে শিবনাথের মাথা হেঁট হবে, তার কি? বিষয় বাপের নয়, বিষয় দাপের।

রামবাবু বলিলেন, চাপরাসী দরকার হয় তো আমার চাপরাসী—

বাধা দিয়া পিসীমা বলিলেন, থাক ভাই, এখন নয়। শিবুর বিয়ে যদি ভগবান তোমার ঘরেই লিখে থাকেন, তখন যত পারবে করবে।

তারপর আবার হাসিয়া বলিলেন, তখন দরকার হলে বেয়াইকেও বলব, তোমাকেও লাঠি ধরতে হবে বেয়াই।

নায়েব বলিলেন, তা হলে ওরা চলে যাক ?

একটু চিন্তা করিয়া পিসীমা বলিলেন, না, জখম হয়ে ফিরে এলে তো আমার মান রক্ষা হবে না। তার চেয়ে কাটুক ওরা গাছ। আপনি আমার এখানকার মহলের সমস্ত পাইক আর লাঠিয়ালকে ডাক দিন। পঞ্চাশখানা গাড়ি যোগাড় করে রাখুন। কাটা গাছ ঘরে তুলে আনুক, একটি পাতাও যেন ওরা না নিয়ে যেতে পারে। ওই গাছের কাঠেই আমার রান্না হবে।

কেষ্ট সিং ও পাইকরা চলিয়া গেল।

পিসীমা নায়েবকে বলিলেন, একবার মুখুজ্জে-ভায়েদের ওখানে যান দেখি, খাজনা ওরা আপোসে দেবে কি না জিজ্ঞাসা করে আসুন। আর গণকের যদি পুজো শেষ না হয়ে থাকে, তবে ধীরে-সুস্থেই করতে বলুন, তাড়াতাড়ি নেই।

নায়েব চলিয়া গেলেন।

রামবাবু হাসিয়া বলিলেন, নাস্তি কাল কি বলেছে জানেন ? বড্ড পান খায় নাস্তি, তাই মা বললেন, জানিস, শিবনাথের সঙ্গে তোর বিয়ে হবে, তার পিসীমাকে তো জানিস, দেশের লোকে ভয় করে, সে তোকে পান খাওয়াবে এমনই করে ? নাস্তি বেটী ভারি দুষ্টু তো, সে বললে, না, দেবে না ! না দিলেই হল আর কি !

পিসীমা হাসিয়া বলিলেন, মিলবে ভাল তা হলে, যেমন শিবু, তেমনই নাস্তি।

ঘরের মধ্য হইতে শিবনাথের মা মৃদুস্বরে বলিলেন, আমার কিন্তু একটি শর্ত আছে ঠাকুরঝি। বিয়ের পর বউ কিন্তু আমার এখানে থাকবে।

বাহির হইয়া আসিয়া তিনি জলখাবার লইয়া রামকিঙ্করবাবুর সম্মুখে নামাইয়া দিলেন।

রামকিঙ্করবাবু বলিলেন, নাস্তির মা নেই। আপনাদের শুধু শাশুড়ী হিসেবেই পাবে না, মাও হবেন আপনারা। আপনাদের কাছেই থাকবে সে।

জল-খাওয়া শেষ করিয়া রামবাবু বলিলেন, তা হলে গণককে একবার—

পিসীমা বলিলেন, তুমি কুষ্টিটা রেখে যাও ভাই, আমি দেখিয়ে রাখব।

রামবাবু হাসিয়া কোষ্ঠীটা রাখিয়া দিয়া বলিলেন, আগে থেকেই যদি গণককে টাকা খাইয়ে থাকি ঠাকরুন-দিদি ?

পিসীমা বলিলেন, তবে সে ভবিতব্য, আর এই দুই বিধবার মন্দ অদৃষ্টের ফল। তা ছাড়া আর কি বলব !

রামবাবু চলিয়া গেলেন।

পিসীমা নিত্যকালী-ঝিকে ডাকিয়া বাসনের হিসাব লইতে বসিলেন। নিত্য বলিল, খাগড়াই বাটিটা শুধু পাওয়া যায় নি, সেটা সকালবেলাই দাদাবাবু নিয়ে গিয়েছেন সেই হেঁড়োলের বাচ্চাকে দুধ খাওয়াতে।

পিসীমা বলিলেন, বউ, শিবু তো জল খেতে এল না! নিত্য, দেখে আয় তো শিবুকে। মতির মা কোথায় গেল? আমার তেল-গামছা নিয়ে আয়।

নিত্য বাটিটা হাতে করিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল, পড়া সেরে দাদাবাবু সেই হেঁড়োলের বাচ্চা ফিরিয়ে দিতে গিয়েছেন।

পিসীমা চমকিয়া বলিয়া উঠিলেন, একা?

না, শম্ভুও সঙ্গে গিয়েছে। নায়েববাবু বারণ করেছিলেন, তা শোনেন নি; বলেছেন, মায়ের হুকুম, এটাকে নিজে ছেড়ে দিয়ে এসে তবে জল খাব। নায়েব পাইক দিতে চেয়েছিলেন, তাকে ঢিল মেরে তাড়িয়ে দিয়েছেন।

পিসীমা ভ্রাতৃজায়াকে বলিলেন, কি যে তোমার শিক্ষার ধারা বউ, তুমিই বোঝ ভাই।

শিবনাথের মা হাসিয়া বলিলেন, দিনের বেলা, শম্ভু সঙ্গে আছে, ভয় কি?

পিসীমা বলিলেন, বাঘ-ভালুকের ভয়ের কথা বলছি না ভাই, শাক্ত জমিদারের ঘরের ছেলেকে তুমি মালা জপাতে চাও নাকি? থাকতই বা হেঁড়োলের বাচ্চাটা! দাদার আমার জানোয়ার ছিল কত!

অপরাহ্ণে বাড়ির সমস্ত দরজা বন্ধ করিয়া গণক বসিয়া কোষ্ঠী বিচার করিল। হৃদয়বাবু পুলিস সাহেবের নাতনীর কোষ্ঠীও ভাল, কিন্তু অবশেষে জয় হইল ওই নাত্তির। নাত্তির অবৈধব্য যোগ আছে। আঠারো হইতে বিশ বৎসরের মধ্যে শিবনাথের মৃত্যুতুল্য ফাঁড়া। নাত্তির সহিতই বিবাহ স্থির হইয়া গেল।

আপত্তি তুলিলেন শিবুর গৃহশিক্ষক। ছুটির শেষে তিনি আসিয়া বিবাহের কথা শুনিয়া ভ্রূ কুঁচকাইয়া গম্ভীর হইয়া উঠিলেন। তারপর আপনার দাড়িতে বার কয়েক হাত বুলাইয়া 'না'-এর ভঙ্গীতে ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, নো, আই ওণ্ট অ্যাল্যাও ইট। চোদ্দ বছরের ছেলের বিয়ে! অ্যাবসার্ড।

শিবুকে তিনি আদেশ করিলেন, ডোণ্ট ম্যারি।

পিসীমা বিব্রত হইয়া মাস্টারকে ডাকিয়া বলিলেন, হ্যাঁ বাবা রতন, বিয়েতে আপত্তি করেছ তুমি? শিবু একেবারে বেঁকে বসেছে।

মাস্টারের নাম রামরতনবাবু, লোকে অন্তরালে তাঁহাকে পাগল বলিয়া থাকে; এককালে পঠদ্দশায় তাঁহার মাথা নাকি সত্য-সত্যই খারাপ হইয়াছিল। মাস্টার যেন

কত গোপনীয় কথা বলিতেছেন, এমনই ভঙ্গীতে বলিলেন, দেখুন, একটা ছড়া বলি, আমরা হলাম কুম্ভকার জাতি, আমাদের জাতের ছড়া। কুম্ভকারে ধূম্রাকার—ধূম্রাকারে মেঘাকার—মেঘাকারে জলাকার, বুঝলেন? কুম্ভকার হাঁড়ি পোড়ালে আর জল হল। কেন? না, হাঁড়ি পোড়ালে হল ধোঁয়া, ধোঁয়া থেকে মেঘ, মেঘ থেকে জল। আজ শিবুর বিয়ে দেবেন, বিয়ে দিলেই বউ আসবে, বউ এলেই শিবু পড়বে না ভাল করে; বাস্, তা হলেই সব মাটি। বাল্যবিবাহ অবশ্য আমি ভালই বলি, কিন্তু এত বাল্যকালে নয়।

পিসীমা বলিলেন, অল্পবয়সে শিবুর ফাঁড়া আছে মাস্টার, তা ছাড়া আমাদের ভাগ্য তো দেখছ। তাই একটি ভাগ্যমানী মেয়ের ভাগ্যের সঙ্গে শিবুকে আমি জড়িয়ে দিতে চাই।

মাস্টার গম্ভীর হইয়া উঠিলেন, বার কয়েক দাড়িতে হাত বুলাইয়া বলিলেন, জানেন পিসীমা, ও আমি অনেক দেখেছি, ওতে আমি বিশ্বাস করি না। আমার একটাই ছেলে হয়েছিল, সেটা মারা গেছে। বড় মেয়েটা বিয়ের পরেই বিধবা হয়েছে। অথচ কোষ্ঠীতে তার কিছুই লেখা ছিল না। ভাগ্যের নাম হল অদৃষ্ট, ও কি অঙ্ক কষে ধরা যায়, না, রাশিচক্রের মধ্যে দিয়ে দেখা যায়?

পিসীমা চুপ করিয়া রহিলেন। তিনি এই মানুষটিকে বিশেষ সম্মান করিয়া চলেন। এই উদার লোকটি অন্তরে অন্তরে শিবু এবং শিবুর জন্য সমগ্র পরিবারটির প্রতি যে অকৃত্রিম শুভেচ্ছা পোষণ করিয়া থাকেন, সেই শুভেচ্ছার বলেই তিনি এ সংসারে অলঙ্ঘনীয় হইয়া উঠিয়াছেন।

কিছুক্ষণ পর পিসীমা বলিলেন, কিন্তু কথা দিয়ে ফেলেছি মাস্টার, এখন কি আর অমত করা ভাল?

মাস্টার বলিলেন, বেশ তো, কথা পাকা হয়ে থাক, তারপর বিয়ে হবে পাঁচ বছর পরে। শিবুকে আমি বড়মানুষ গড়ে তুলব পিসীমা।

মাস্টার উঠিয়া পড়িলেন। বাড়ির বাহিরে আসিতেই রতন-পাচিকা বলিল, শুনুন মাস্টার মশায়। রতন তাহার অপেক্ষাতেই দাঁড়াইয়া ছিল।

রতন বলিল, মামীমা—শিবুর মা বললেন, বিয়েতে অমত করবেন না। পিসীমা বড় আঘাত পাবেন। আর বললেন, বিয়ে হয়ে শিক্ষার পথে বাধা হয় তা ঠিক, কিন্তু বিয়ে হয়েও মানুষ শিক্ষিত হয়, বড় হয়। একটু কঠিন হয়, কিন্তু কঠিনকে ভয় করতে গেলে কি চলে?

মাস্টার দাড়িতে হাত বুলাইয়া বলিলেন, হুঁ, মায়ের কথা ঠিক বলেই মনে হচ্ছে। হুঁ তা বটে। মা যখন বলেছেন—। মাস্টার আবার ফিরিলেন, পিসীমা!

পিসীমা বিরক্ত হইয়াই বসিয়া ছিলেন। তিনি উত্তরে মাস্টারের দিকে ফিরিয়া চাহিলেন মাত্র। মাস্টার বলিলেন, না, হয়ে যাক বিয়ে, যখন কথা দেওয়া হয়েছে আর আপনি ইচ্ছে করেছেন, হয়ে যাক; তারপর দেখা যাবে। কিন্তু একশো টাকার বই কিনে দিতে হবে বিয়ের খরচ থেকে।

পিসীমা হাসিয়া ফেলিলেন, বলিলেন, তোমাকে কিন্তু আমি বিয়েতে বরের মাস্টারের উপযুক্ত সাজে সাজিয়ে পাঠাব। গরম কোট, শাল, এই সব গায়ে দিতে হবে। চটের সেই অলেস্টার কিন্তু গায়ে দিতে পাবে না।

মাস্টারের সত্য-সত্যই একটা চটের মত কাপড়ের ওভার-কোট আছে। মাস্টার বলিলেন, তা তো পরতেই হবে পিসীমা, সে তো হবেই। কিন্তু ওই বাইনাচ খেমটা, ওগুলো করতে পাবেন না। খুব করে গরিব লোকদের খাওয়াতে হবে।

বেশ; তুমি যাতে অমত করবে, সে হবে না।—পিসীমা প্রসন্ন মনেই মাস্টারের নির্দেশ মানিয়া লইতে রাজী হইলেন।

মাস্টার আসিয়া পড়ার ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, নাঃ, বিয়েটা করে ফেল্ শিবু। আর্লি ম্যারেজ এক হিসাবে ভাল—গুড। করে ফেল্ বিয়ে।

শিবুর জবাব দিবার কিছু ছিল না, কারণ মাস্টারের আদেশ শিরোধার্য করিলেও বিবাহের প্রতি তাহার বিদ্বেষ তো ছিলই না, বরং অনুরাগই ছিল। এ কথার কোন জবাব না দিয়া শুধু হাতের বইখানা রাখিয়া দিয়া আর একখানা বই সে তুলিয়া লইল। রাখিয়া-দেওয়া বইখানা তুলিয়া মাস্টার দেখিলেন 'মেঘনাদবধ কাব্য'। চোখ তাঁহার দীপ্ত হইয়া উঠিল, বলিলেন, এ গ্রেট বুক।—বলিয়াই তিনি আবৃত্তি আরম্ভ করিলেন—

> "সম্মুখ সমরে পড়ি বীরচূড়ামণি
> বীরবাহু চলি গেলা যবে যমপুরে
> অকালে; কহ হে দেবী অমৃতভাষিণী
> কোন্ বীরবরে বরি সেনাপতি পদে
> পাঠাইলা রণে পুনঃ রক্ষকুলনিধি
> রাঘবারি।"

আবার, যখন বড় হবি, যখন মিল্টন পড়বি, দেখবি, তাঁরও 'প্যারাডাইস লস্টে'র প্রথমে এমনই করেই তিনিও জিজ্ঞাসা করছেন, তাঁরও কবিতার ছন্দের এমনই সুর। এই যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ, এ মাইকেল মিল্টনের কাব্য থেকেই নিয়ে বাংলায় ঢেলেছিলেন। মিল্টন মহাকবি, কিন্তু শেষ বয়স তাঁর বড় কষ্টে গিয়েছে, অন্ধ হয়েছিলেন। গ্রেট মেনদের লাইফ একখানা পড়ে ফেল্, বুঝলি? তুই রবীন্দ্রনাথের বই কি কি পড়েছিস? 'কথা ও কাহিনী'খানা পড়েছিস?

সোৎসাহে ঘাড় নাড়িয়া শিবু বলিল, ওটা পড়েছি সার্। কিন্তু পণ্ডিত মশায় যে বড় নিন্দে করেন রবীন্দ্রনাথের।

উত্তরে খুব গোপনীয় সংবাদের মত মাস্টার ছাত্রের কানে কানে কহিলেন, রবীন্দ্রনাথ ইজ এ গ্রেট পোয়েট। ম—স্ত বড় কবি। অ্যাণ্ড তোদের পণ্ডিত মশায় নোজ নাথিং।

আপনি রবীন্দ্রনাথকে দেখেছেন, শান্তিনিকেতন তো আপনাদের বাড়ির খুব কাছে?

রাজার মত, দেবতার মত রূপ, কতবার দেখেছি। জানিস শিবু, যখন মন খারাপ হয়, চলে যাই শান্তিনিকেতনে।—মাস্টার উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলেন।

আপনি সুরেন্দ্রনাথকে দেখেছেন? বক্তৃতা শুনেছেন?

একটা ভলক্যানো—আগ্নেয়গিরি, বুঝলি? এই তো সেদিন বোলপুর এসেছিলেন, তোর যে অসুখ হয়ে গেল, নইলে নিয়ে যেতাম।

এবার আমায় শান্তিনিকেতন নিয়ে যেতে হবে সার্।

যাবি তুই আমাদের বাড়ি শিবু? কঙ্কালী-পুজোর সময় চৈত্র-সংক্রান্তিতে যদি যাস, এত মাংস খাওয়াব তোকে, তোর পেট ফেটে যাবে। জানিস, আমরা হলাম বৈষ্ণবমন্ত্র-উপাসক, আমাদের তো কেটে মাংস খাওয়াতে নেই। কিন্তু ওই পুজোর সময় চার-পাঁচ শো বলিদান হয়, তখন মাংসের অভাব হয় না। শান্তিনিকেতন দেখবি, আমাদের বাড়ি দেখবি। অবিশ্যি আমাদের বাড়ি ভাল নয়, গরিব লোকের বাড়ি তো। কিন্তু এককালে আমরা গরিব ছিলাম না, ব্যবসাতে সব লোকসান হয়ে গেল। ফুঁ দিয়ে আলো নিবিয়ে দিলে যেমন হয়—নলিনীদলগতজলমতিতরলং, বুঝলি?

শিবু বলিল, আমি এবার ঠিক যাব কিন্তু, তখন গরম বললে শুনব না। আপনিও পিসীমার কথায় সায় দেবেন, তা হবে না।

মাস্টার বলিলেন, তুই একটা ইডিয়েট। কোন্ জায়গায় কথা মানতে হয়, কোন্ জায়গায় মানতে হয় না, জেদ ধরতে হয় খুব করে, সেটা ঠিক বুঝতে পারিস না।

ঘড়িটা পাশের হল-ঘরে ঢং ঢং করিয়া বাজিতে আরম্ভ করিল। মাস্টার চকিত হইয়া বলিলেন, এঃ নটা বেজে গেল!

অঙ্ক কষা হল না যে সার্!—শিবুও চকিত হইয়া উঠিল।

গাড়ু ও গামছা পাড়িয়া মাস্টার বলিলেন, আজ সন্ধ্যেবেলা কেবল অঙ্ক, কেবল অঙ্ক। সতীশ, সতীশ, তেল নিয়ে আয়। বেশি করে আনবি, বলবি, মহিষাসুরের মত দেহ, সেই উপযুক্ত দাও।

মাস্টার স্নান করিতে যাইবেন দেড় মাইল দূরবর্তী ঝরনায়। ফিরিবার সময় প্রকাণ্ড একটি গাড়ু ভরিয়া জল আনিবেন, সেই জল ছাড়া অন্য জল তিনি পান করেন না। স্কুলেও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলে ওই জলাধার।

পাঁচ

বাঁড়ুজ্জেরা ক্ষুদ্র জমিদার; সাত আনায় শিবনাথের আয় হাজার চারেক টাকা। তবে পাকা বন্দোবস্ত অনেক আছে; পালকি-বহনের বেহারা চাকরান জমি ভোগ করে, মহলে পাইকদের জমি দেওয়া আছে, সদরে কাজ করিবার জন্যও চারজন পাইকের কায়েমী বন্দোবস্ত; নাপিত, বৃত্তিভোগী পুরোহিত, দেবত্তরের পূজক, এমন কি গয়া শ্রীক্ষেত্র কাশী প্রভৃতি তীর্থস্থলের পাণ্ডারা পর্যন্ত জমি ভোগ করেন। গৃহদেবতার ফুল যোগাইবার ভারও একজনকে দেওয়া আছে, চাকরানভোগী বাদ্যকরকে নিত্য সকাল-সন্ধ্যায় 'টেকরা' বাজাইতে হয়, সেজন্য মালিককে চিন্তা করিবার প্রয়োজন নাই।

যাক, জমিদার ক্ষুদ্র হইলেও শিবনাথের বিবাহটা হইল বিপুল সমারোহে। শিবনাথের বাপের বিবাহের ফর্দ বাহির করিয়া পিসীমা ফর্দ করিতে বসিলেন।

নায়েব বলিয়াছিলেন, অভয় দেন তো একটা কথা বলি মা।

পিসীমা বলিলেন, খরচের কথা বলবেন আপনি?

হ্যাঁ মা, সে আমল আর এ আমল, তার ওপর এই বাজার, জিনিসপত্র অগ্নিমূল্য, আদায়পত্রের এই অবস্থা, হয়তো ঋণ করতে—

নায়েব কোন সায় না পাইয়া কথা অর্ধ-সমাপ্ত রাখিয়াই নীরব হইয়া গেলেন। শিবনাথের মাও পাশে বসিয়া ছিলেন, তিনি বলিলেন, আপনি ঠিক কথা বলেছেন সিং মশায়, বারুদের কারখানা, কি খেমটা-নাচ, এই রকম কতকগুলো খরচা, সে অপব্যয়।

স্থানীয় মহলের বহু পুরাতন গোমস্তা প্রতাপ মুখুজ্জে বসিয়া ছিলেন, তিনি বলিলেন, সে ঠিক বউমা, ওগুলো অপব্যয় বইকি।

পিসীমা বলিলেন, মতির মা, আমার তেল-গামছা বের কর তো, বেলা অনেক হয়ে গেল।

নায়েব বলিলেন, তা হলে ফর্দ-টর্দ কি রকম কি হবে?

পিসীমা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, তোমরা ঠিক কর সব। কই রে মতির মা, কোথায় গেলি? অ মতির মা! হারামজাদী গেল কোথায়? কে? কারা ওখানে দাঁড়িয়ে?

কেষ্ট সিং আসিয়া বলিল, আজ্ঞে ২১৯ নম্বরের মুচী আর বাগদী প্রজারা।

কি, বলে কি সব?

প্রাণকৃষ্ণ বায়েন ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া জোড়হাতে বলিল, আজ্ঞে মা, আমরা বাবুর বিয়ের বাজনার বায়না নিতে এসেছি। বাগদীরা এসেছে রায়বেঁশের জন্তে।

পিসীমা তাহাদের কোন কথা কহিলেন না, ডাকিলেন নিত্যাকে, নিত্য, দেখ্ তো, মতির মা গেল কোথায়?

প্রাণকৃষ্ণ বলিল, আমাদের রোশনচৌকি আর ঢোলের বাজনা আর কেউ নেয় না, কিন্তু আমাদের বাবুর বিয়েতে আমরা যেন বাদ না পড়ি।

কৃষ্ণবর্ণ বিশালকায় প্রৌঢ় রামভল্লা, জোড়হাতে পাশে দাঁড়াইয়া ছিল, সে শুধু বলিল, আমরাও মা, আমরা রায়বেঁশে।

মতির মা এতক্ষণে তেল-গামছা আনিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল।

পিসীমা বলিলেন, তোকে জবাব দিলাম আমি মতির মা। তোর কাজে বড় অবহেলা হয়েছে।

তাহার হাত হইতে গামছাটা টানিয়া কাঁধে ফেলিয়া তিনি রুক্ষই স্নান করিতে চলিয়া গেলেন।

ইহার পর আর ফর্দ হওয়া সম্ভব নয়। নায়েব গোমস্তা উঠিয়া গেল, শিবনাথের মা শুধু একটু হাসিলেন। প্রজারা দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাদের তিনি বলিলেন, তোমাদের বায়না হবে বইকি বাবা, তোমাদের বাবুর বিয়েতে কি তোমাদের বাদ দেওয়া যায়?

তাহারা কৃতার্থ হইয়া প্রণাম করিল, অপ্রতিভের মত হাসিতে লাগিল।

মা বলিলেন, রতন, এদের সব জলখাবার দাও তো।

কেষ্ট সিং বলিল, আয় সব, উঠোনে সারি দিয়ে আঁচল পেতে দাঁড়া।

অবশেষে শৈলজা-ঠাকুরানীর ফর্দমতই আয়োজন, অনুষ্ঠান, সমারোহ করিয়াই বিবাহ হইল। রায়বেঁশে, ঢুলীর বাজনা, ব্যাণ্ড, ব্যাগপাইপ, নাচ, তরজা, আলো, চতুর্দোল, শোভাযাত্রা কিছুই বাদ পড়িল না। ব্রাহ্মণ শূদ্র ইতর-জাতি সকলেরই নিমন্ত্রণ হইল। আয়োজন-অনুষ্ঠানে কিছু ঋণ করা ভিন্ন উপায় ছিল না। সমস্ত এস্টেটের আয়ের অর্ধেক টাকাতেও এ কুলাইবার কথা নয়। কিন্তু কৌশলপরায়ণা এই জমিদারকন্যা এমন করিয়া ব্যবস্থা করিলেন যে, নায়েব গোমস্তা পর্যন্ত বিস্মিত না হইয়া পারিল না। উদ্যোগের প্রারম্ভেই এস্টেটের উকিলদিগকে লোক পাঠাইয়া আনিয়া যে সব মকদ্দমা চলিতেছিল, তাহারই অগ্রিম কিছু কিছু টাকা লইয়া বারো শত টাকার সংস্থান করিলেন।

নায়েবকে বলিলেন, এ টাকার সঙ্গে আপনাদের সম্বন্ধ কি? এ তো বকেয়া পাওনা টাকা, এ হল এস্টেটের মজুত তহবিল; মামলা-খরচের টাকা আমি নিলাম না, সে তো আপনার মজুতই রইল উকিলের কাছে।

হাজার টাকা ঋণ করিতে হইল।

পাকস্পর্শের দিন শিবনাথকে ও নববধূকে তিনি কাছারি-ঘরের বারান্দায় বসাইয়া দিয়া মহলের সমস্ত প্রজাকে বউ দেখাইলেন। পাশে নিজে দাঁড়াইয়া রহিলেন, ওপাশে নায়েব ও যাবতীয় গোমস্তা হাজির ছিল। বধূর পিছনে নিত্য-ঝি দাঁড়াইয়া ছিল। প্রকাণ্ড একখানা কাঁসার পরাত বর-বধূর পায়ের নিকট একটা তেপায়ার উপর রক্ষিত ছিল, দেখিতে দেখিতে টাকায় সেটা ভরিয়া গেল। রাত্রি নয়টার সময় শেষ প্রজাটি চলিয়া গেল। তখন নয় বৎসরের নববধূটি চেয়ারের হাতলের উপর ঘুমাইয়া ঢলিয়া পড়িয়াছে।

পিসীমা বলিলেন, পরাত তোলো কেষ্ট সিং।

বাড়ির মধ্যে শিবনাথের মা টাকা গনিয়া থাক থাক করিয়া সাজাইয়া তুলিলেন। গণনা করিয়া দেখা গেল, সাত শত উনপঞ্চাশ টাকা উঠিয়াছে।

আত্মীয়-কুটুম্বেরা কলরব করিতেছিল। একজন প্রৌঢ়া বলিলেন, ওগো পিসীমা, তোমরা এবার হিসেব-নিকেশ শেষ করো বাপু। ফুলশয্যে আর কখন হবে? বউ তো তোমার ঘুমিয়ে কাদার মত পড়ে আছে।

পিসীমা বলিলেন, একটু দাঁড়াও না। সিং মশায়, আয়রন-চেস্ট খুলুন।

লক্ষ্মীর ঘরের মধ্যে সে-আমলের সিন্দুকের ধরনের ভারী আয়রন-চেস্ট, নায়েব ও অপর গোমস্তা দুইজন মিলিয়া ডালাটা টানিয়া তুলিল। পিসীমা বলিলেন, এই সিন্দুক দাদা আমার একা এক টানে টেনে তুলতেন।

সিন্দুকে তালা-চাবি বন্ধ করিয়া পিসীমা সোরগোল বাধাইয়া তুলিলেন, বাজনা বন্ধ কেন? কেষ্ট সিং, রোশনচৌকি বাজাতে বলো। কই গো, বউমারা সব কোথায় গেলে?

দেখিতে দেখিতে রোশনচৌকির বাজনা বাজিয়া উঠিল।

পিসীমা বলিলেন, নায়েববাবু, সন্দেশের ঘরের ভাঁড়ারীকে বলুন, লুচি মিষ্টি ফুলশয্যের ঘরে পাঠিয়ে দিক, মেয়েরা খাবে সব। পাঁচথুপীর বউমা, তোমার ওপর ভার রইল, যাঁরা না খাবেন, তাঁদের ছাঁদা দিও তুমি।

বহির্দ্বারে মোটা ভারী গলায় শব্দ হইল, তারা তারা, মা হামার আনন্দময়ী!

কে? রামজীদাদা?

হাঁ হামার দিদি। আনন্দময়ী আজ হামাকে আনন্দ দিলেন দিদি। হামার শিবু বাবা আজ গৃহী হইল রে। আমি যে মায়ীকে আশীর্বাদী মালা আনিয়েছি ভাই।

তিনি বস্ত্রাঞ্চল মুক্ত করিয়া বাহির করিলেন দুইগাছি সযত্নরচিত বনমল্লিকার মালা। সমস্ত প্রাঙ্গণটা গন্ধে ভরিয়া গেল।

যাও দাদা, ওপরে যাও তুমি, আশীর্বাদ করে এসো।

সন্ন্যাসী শুধু মালা দুইগাছিই দিলেন না, দুইটি টাকা বধূর হাতে দিয়া বলিলেন, ভাগ্যমানী লছমী হবন হামার মায়ী।—বলিয়া টাকা দেওয়ার জন্য কেহ কোন অভিযোগ করিবার পূর্বেই তিনি একটু দ্রুতই ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। ফুলশয্যার উৎসব আরম্ভ হইল।

পাঁচথুপীর বউ পিসীমাকে ডাকিল, একবার তুমি এসো পিসীমা, দেখে যাও।

পিসীমা উত্তর দিলেন না, মুক্ত অঙ্গনে আকাশের দিকে মুখ তুলিয়া তিনি দাঁড়াইয়া ছিলেন। রতন আসিয়া বলিল, একবার চলুন পিসীমা, মজা দেখবেন চলুন। বউ কিছুতেই উঠছিল না, শিবনাথ কষে কান মলে দিয়েছে।

সে হাসিয়া উৎসবক্লান্ত বাড়িখানাকে মুখরিত করিয়া তুলিল। পিসীমা বলিলেন, বউ কোথায়?

রতন বলিল, শুয়েছেন তিনি, কিছুতেই উঠলেন না। বোধ হয়—! সে চুপ করিয়া গেল।

পিসীমা বলিলেন, কাঁদছে? আরও কি বলিতে গিয়া তিনি বলিতে পারিলেন না, পর-মুহূর্তেই দ্রুতপদে উপরে গিয়া শয়নঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন।

শিবনাথ তখন ঘরের মধ্যে ভ্রাতৃবধূদের অনুরোধমাত্রেই সোৎসাহে গান আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। আবার কিছুক্ষণ পরে পিসীমার দরজা খোলার শব্দ হইল। পিসীমা ক্লান্ত রুদ্ধস্বরে ডাকিলেন, কে আছ নীচে?

কে উত্তর দিল, আজ্ঞে, আমি মা—শ্রীপতি, বেলেড়া মৌজার গোমস্তা।

হুকুম হইল, কেষ্ট সিংকে বলে দাও ফুলশয্যার ঘরের দোরে পাহারা থাকতে।

মা উপহার দিয়াছেন—বধূকে একখানি রামায়ণ ও শিবুকে একটি রূপা-বাঁধানো কলম।

ছয়

বিবাহ নির্বিঘ্নে শেষ হইয়া গেল।

পূর্বের কথামত সঙ্গে সঙ্গেই দ্বিরাগমন শেষ করিয়া বধূকে কাছে রাখা হইয়াছে। নান্তির কষ্টের কোন কারণ নাই। শ্বশুরবাড়ির জানালা খুলিয়া বাপের বাড়ির জানালার মানুষ চেনা যায়, কথা কওয়াও চলে। সকালে একবার, বিকালে একবার সেখানে যাওয়ার ছুটি তো দেওয়াই আছে। তাহার উপর সুযোগ পাইলেই নান্তি পলাইয়া গিয়া দিদিমাকে দেখিয়া আসে। তাহার উপর কাজের ভারও পড়িয়াছে—পান সাজা, পূজার ফুল বাছা এবং শিবনাথের জামা-কাপড় গুছাইয়া রাখার ভার পিসীমা তাহাকে দিয়াছিলেন। কিন্তু মা শিবনাথের জামা-কাপড় রাখিবার ভারটি লইতে দেন নাই, তাহার পরিবর্তে সন্ধ্যায় পিসীমার পায়ে তেল দিবার কাজ দিয়াছেন। রাত্রে বউ শোয় মায়ের কাছে।

ফাল্গুন মাস। গোমস্তারা সকলে পৌষ-কিস্তির আদায়ের হিসাব দিতে আসিয়াছে। মৌজা বেলেড়ার গোমস্তার ইরসাল অর্থাৎ সদরে পাঠানো টাকার পরিমাণ খুব কম হওয়ায় পিসীমা আদেশ করিলেন, আদায় না হয়ে থাকে, তুমি নিজে দিয়ে পূরণ করে দাও; তারপর আদায় করে নেবে।

জোড়হাত করিয়া গোমস্তা শ্রীপতি দে বলিল, পাঁচ টাকা মাইনের কর্মচারী আমি, মহলের টাকা কি আমার ঘরে আছে মা?

পিসীমা প্রশ্ন করিলেন, সরকারের ঘরে কম দিয়ে কি শিবনাথ মাপ পাবে? তার জমিদারি থাকবে কি করে?

নায়েবও দাঁড়াইয়া ছিলেন। তিনি বলিলেন, রাজার রাজস্বটা তো দিতে হবে বাপু, জমিদারের মুনাফা না হয় বলতে পার, দিতে পারলাম না।

গোমস্তা বলিল, বড় গাছে বড় ঝড়ই লাগে মা। আপনাদের সহ্য না করে উপায় কি? প্রজার এবার বড় দুরবস্থা।

পিসীমা বলিলেন, সে শুনলে নাবালকের এস্টেট চলবে না শ্রীপতি, চৈত্র-কিস্তিতে টাকা আমার আদায় চাইই। আদায় না হলে তোমাকে হ্যাণ্ডনোট লিখে দিতে হবে।—বলিয়া পিসীমা স্নানে বাহির হইয়া গেলেন। কথাগুলি অন্দরের মধ্যেই হইতেছিল। নায়েব ও শ্রীপতি চলিয়া যাইতেছিল, শিবনাথের মা বারান্দায় বাহির হইয়া আসিয়া ডাকিলেন, শ্রীপতি!

শ্রীপতি ফিরিয়া সসম্ভ্রমে বলিল, মা!

মা নীচে আসিয়া দরদালানের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, শোনো তো বাবা, এদিকে একবার। সিং মশায়, আপনিও শুনুন।

নায়েব ও শ্রীপতি উভয়ে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতেই মা মৃদুস্বরে প্রশ্ন করিলেন, সত্যিই কি প্রজাদের দুর্দশা এবার খুব বেশি?

শ্রীপতি জোড়হাত করিয়া বলিল, আমি মিথ্যে কথা বলি নি মা। আপনি তদন্ত করে দেখুন।

মা বলিলেন, আর একটা কথা আমি জিজ্ঞেস করব বাবা, সত্যি উত্তর দিও। আচ্ছা, শিবুর বিয়েতে প্রজাদের কাছে কৌশল করে টাকা আদায় করায় কি দুর্নাম হয়েছে বাবা?

শ্রীপতি নীরব হইয়া রহিল।

মা আবার প্রশ্ন করিলেন, নায়েববাবু!

নায়েব বলিলেন, ও কথা বাদ দিন মা, সংসারে দশ রকমের মানুষ আছে, দশ রকম বিশ রকম বলে, ও কথায় কান দিতে গেলে কি চলে?

মা বলিলেন, আমি টাকাটা ফিরিয়ে দিতে চাই।

শ্রীপতি বলিল, না তা হয় না, সকলেই তো তা বলে না, আর তাতে কি তাদের অপমান করা হবে না? অবশ্য আপনাদের কাছে তাদের আর মান-অপমান কি?

মৃদু হাসিয়া মা বলিলেন, না না, ও কথা বোলো না বাবা, আঙুলের ছোট-বড় বাছা চলে না, মানুষেরও তাই, অবস্থার ছোট-বড়তে ছোট-বড় হয় না। যাকগে, আসুন আপনারা।

নায়েব যাইতে যাইতে বলিলেন, আমারই হয়েছে মরণ শ্রীপতি, এক মালিক যান উত্তরে তো আর একজন যাবেন দক্ষিণে। ছেলেটা বড় হলে যে বাঁচি।

সে সময় দোলের ছুটি, শিবনাথ তাহার ঘরের মধ্যে বসিয়া একটা পিতলের পিচকারিতে ন্যাকড়া জড়াইতেছিল। দোল আসিতেছে, রঙ খেলিতে হইবে। নয় বৎসরের নাত্তি পাশে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল। সিঁড়ির উপর হইতেই মা প্রশ্ন করিলেন, শিবু আছিস?

ঘরের মধ্যে ঠিক পাশেই বধূর অস্তিত্ব স্মরণ করিয়া শিবুর মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, সে শুষ্কস্বরে বলিয়া উঠিল, অ্যাঁ!

নাত্তি কিন্তু অপ্রতিভ বা বিব্রত হইল না, সে চুপ করিয়া গুঁড়ি মারিয়া খাটের এক কোণে আত্মগোপন করিয়া বসিল। মা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দরজাটা বন্ধ করিয়া দিলেন। শিবু ভয়ে শুকাইয়া গেল।

মা বলিলেন, তোকে একটা কথা বলব শিবু।

শিবু মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। মা বলিলেন, গোমস্তারা বলছিল, এবার নাকি বড় দুর্বৎসর, ফসল ভাল হয় নি। প্রজারা খাজনা দিতে পারছে না।

শিবু মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, এবার তা হলে খাজনা নিও না মা।

মা বলিলেন, সে ছেড়ে দেবার মত অবস্থা তো আমাদের নয়; তা ছাড়া জজসাহেবকে প্রতি বৎসর নাবালকের এস্টেটের হিসেব দিতে হয়, তিনি হয়তো তা মঞ্জুর করবেন না। সে কথা আমি বলি নি বাবা। আমি বলছিলাম যে, এই দুর্বৎসরে প্রজাদের কাছে বিয়ের সময় টাকা আদায় করায় লোকে খুব দুর্নাম করছে।

মায়ের কথা শুনিতে শুনিতে শিবুর মুখ কখন চিন্তায় গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছিল। সে ধীরে ধীরে বলিল, সেটা খুব খারাপ হয়েছে মা।

মা ছেলের মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, সেইটে তাদের ফিরে দিতে হবে শিবু। তোর পিসীমাকে বলে তাঁকে এইটেতে রাজী করাতে হবে।

শিবু বলিল, পিসীমাকে আমি রাজী করাব মা। একবেলা না খেলেই পিসীমা ঠিক মত দেবে।

শোন্, বিয়ের টাকা ফিরে দিতে গেলে প্রজাদের অপমান করা হবে। তার চেয়ে সবার খাজনা থেকে এবার এক টাকা করে মাপ দেওয়ার হুকুমটা তোকে পিসীমার কাছে করিয়ে নিতে হবে। অধিকাংশ লোকই এক টাকা করে দিয়েছে। বলবি, আমার বিয়ের বছর এক টাকা করে মাপ দিলে প্রজারা চিরদিন নাম করবে আর আশীর্বাদ করবে।

বেশিও তো কজন দিয়েছে মা। পাঁচ টাকা দিয়েছে যোগী মোড়ল, খুদী মোল্যান, আরও কে কে, সব লেখা আছে সিং মশায়ের কাছে।

তারা অভাবী নয় শিবু, তারা ও কৌশল না করলেও দিত। তুই ওই এক টাকা মাপের হুকুমটাই করিয়ে নে।

মা আর দাঁড়াইলেন না, যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, আজই বলিস নি যেন পিসীমাকে। গোমস্তারা সব আজ সন্ধ্যের সময় চলে যাবে, কাল বলবি। নইলে তারা বকুনি খেয়ে মরবে, পিসীমা ভাববে, ওরাই সব তোকে ধরে পড়েছে।

মা চলিয়া গেলেন। বউও সঙ্গে সঙ্গে মাথায় একরাশ ঝুল মাখিয়া গুটিগুটি বাহির হইয়া হাসিতে হাসিতে শিবুর পিঠে গুম করিয়া একটা কিল মারিয়া বাহির হইয়া পলাইল।

পরদিন বেলা তখন নয়টা হইবে। বউ উপরে পুতুল খেলিতে খেলিতে অঝোর-ঝরে কাঁদিতে কাঁদিতে নামিয়া আসিল। শিবনাথ তাহার বড় চীনামাটির পুতুলটা ভাঙিয়া দিয়াছে।

পিসীমা ডাকিলেন, শিবনাথ!

তখন শিবনাথ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়াই দুমদুম করিয়া নামিয়া আসিতেছিল, সে সিঁড়ি হইতেই আরম্ভ করিল, বিলিতী পুতুল কেন খেলবে ও?

রোষক্ষুব্ধ বধূ জ্বলন্ত তুবড়ির মত বলিয়া উঠিল, বেশ করব, খুব করব। আমি বিলিতী খেলব, তাতে ওর কি?

শিবনাথ গম্ভীরস্বরে আদেশ করিল, নিত্য, ওপর থেকে আমার সরু বেতগাছাটা আন তো।

বধূটি অকস্মাৎ পাগলের মত জিব বাহির করিয়া অতি বিকৃতভাবে শিবনাথকে ভেঙাইয়া উঠিল, অ্যাঁই, অ্যাঁই, অ্যাঁই।

পিসীমা দাঁড়াইয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছিলেন। মাও হাসিতেছিলেন, কিন্তু এবার তিনি শাসনের স্বরে বলিয়া উঠিলেন, বউমা! যাও, ঘরের মধ্যে যাও।

পিসীমা বলিলেন, নিত্য, নায়েববাবুকে বলে আয় অনন্ত বৈরাগীর কাছে লোক পাঠিয়ে দিতে, সে যেন তার দোকানে যা পুতুল আছে নিয়ে আসে, বউমার যেটা পছন্দ হবে বেছে নেবে।

শিবনাথ বলিল, বিলিতী হলে অনন্তকে আমি বাড়ি ঢুকতে দোব না।

ঘরের মধ্য হইতে বউ বলিয়া উঠিল, না দেবে না, একা ওর বাড়ি কিনা!

মা সেলাই করিতে করিতে বলিলেন, বউমা, তোমায় চুপ করে থাকতে হয়।

উত্তর দিতে না পারিয়া বউ শিবনাথের দিকে চাহিয়া নিঃশব্দে ছোট একটি ভেংচি কাটিয়া দিল।

শিবনাথ বলিল, ওই দেখ, আবার আমায় ভেংচি কাটছে, আমি বেত দিয়ে ওর পিঠের চামড়া তুলে দোব।

মা বলিলেন, শিবু, মেয়েমানুষের গায়ে হাত তো তুলতেই নেই, মুখে 'মারব' বলাও দোষের কথা। ও কথা আর বোলো না।

সতীশ চাকর আসিয়া দাঁড়াইল। সতীশের একটা অদ্ভুত স্বভাব, বাড়িতে কলরব বা কোন উত্তেজনার আভাস পাইলে সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। তাহা স্তিমিত হইয়া শান্ত না হওয়া পর্যন্ত কোনও কথা সে বলে না, তা সে যত গুরুতর প্রয়োজনীয় বিষয়ই হউক না কেন। সে বলে, মিছিমিছি চেঁচিয়ে কি করব? গোলমালে কি কথা শোনা যায়? তাহার এই বাক্যসংযমের ফলও একটা হইয়াছে, সে আসিয়া দাঁড়াইলে সকলের

দৃষ্টি তাহার প্রতি আকৃষ্ট হয়, বাড়ির লোকেই প্রশ্নজ্ঞাপক স্বরে তাহাকে সম্বোধন করে, সতীশ!

ওইটুকুতেই যথেষ্ট, বাকিটুকু উহ্যই থাকিয়া যায়; সতীশও আপনার প্রয়োজন ব্যক্ত করে। পাচিকা রতন-ঠাকরুন তাহার নাম দিয়াছে, ভগ্নদূত।

সতীশ দাঁড়াইতেই মা হাসিয়া প্রশ্ন করিলেন, কি চাই বাবা সতীশ?

আজ্ঞে তেল। মাস্টার মশায় এসেছেন।

বধূ রোষভরে বলিল, আমি মাস্টার মশায়কে বলে দোব।

মা তিরস্কারপূর্ণ স্বরে বলিলেন, ছি!

মাস্টার মশায়ের ছুটি ফুরুল নাকি? আবার তো এই সামনে দোলের ছুটি। আবার ছুটি হলেই তো মাস্টার ছুটবে বাড়ি। বুঝলে মাসীমা, দেখেছি আমি মাস্টারের বাড়ি যাওয়া। ঠিক যেন একটি কেউ চাষাভূষা চলেছে খালি পায়ে ভুমভুম করে।—রতন সে দৃশ্য স্মরণ করিয়া হাসিয়া ফেলিল, বক্তব্যটি আর শেষ করিতে পারিল না।

শিবু তাড়াতাড়ি আসিয়া দেখিল, মাস্টার দাড়িতে হাত বুলাইতে বুলাইতে অস্বাভাবিক গম্ভীর মুখে পদচারণা করিতেছেন। শিবুকে দেখিয়াই তিনি আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন, ওয়েল, শিবু!

সার্!

ওয়েল, মাই বয়, ক্যান ইউ টেল মি,—হোয়াট শ্যাল আই সে? হ্যাঁ, বলতে পারিস শিবু, মানুষের মান বড় অথবা অর্থ বড়?

এত সহজ প্রশ্ন মাস্টার মহাশয় করিবেন, এ শিবু ভাবে নাই, সে হাসিয়া মুহূর্তে উত্তর দিল, মানই সকলের চেয়ে বড়, প্রাণের চেয়েও বড় সার্।

মাস্টার উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, ইয়ে—স। এই উত্তরই আমি শুনতে চেয়েছিলাম। গড ব্লেস ইউ, মাই বয়।

এবার শিবুর হাত ধরিয়া তিনি বলিলেন, দেন আই বিড ইউ গুডবাই, মাই বয়; আই হ্যাভ রিজাইন্‌ড। স্কুলের কাজে আমি রিজাইন দিয়েছি।

এমন একটা সংবাদের আকস্মিক রূঢ়তায় শিবু স্তম্ভিত নির্বাক হইয়া গেল। মাস্টার গম্ভীরভাবে আবার পদচারণা করিতে করিতে বলিলেন, আমায় অপমানিত হতে হচ্ছে শিবু। আমি রিজাইন দিয়েছি। সে আর আমি উইথ্‌ড্র করতে পারি না। এই জন্যেই আমি ছুটি নিয়েছিলাম। বাড়ির সকলে আপত্তি করছে, বন্ধুবান্ধব সকলে বারণ করছে, কিন্তু তারা ঠিক বলছে না। ইউ, ওন্‌লি ইউ, মাই বয়, ঠিক উত্তর দিয়েছ। আই অ্যাম গ্লাড।

শিবুর চোখে জল আসিয়াছিল; এই শিক্ষকটির সঙ্গে এমন একটি নিবিড় মমতার বন্ধনে সে আবদ্ধ হইয়া গিয়াছে যে, সে বন্ধনে অস্ত্রোপচারের ছুরিকা-স্পর্শমাত্রেই তাহার অন্তর অসহ্য বেদনায় আতুর হইয়া উঠিল। একটা চেয়ারের মাথায় মুখ রাখিয়া সে ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। তাহার মাথায় হাত দিয়া মাস্টার তাহাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়া দিতে পারিলেন না, তাঁহারও চোখ হইতে ঝরঝর করিয়া জল শিবুর মাথায় আশীর্বাদের মতই ঝরিয়া পড়িল। অনেকক্ষণ পর তিনি বলিলেন, কাঁদিস নি শিবু। এর উপায় নেই। এ হল দুর্বলতা। ম্যান ইজ বর্ন টু ডাই। মরেই যায় মানুষ, তাতেও বিচলিত হতে নেই। জানিস, চাকরির অভাবে আমাকে অনেক কষ্ট করতে হবে? কিন্তু এ আমাকে সহ্য করতে হবে।

ব্যাপারটা সামান্যই। স্কুলের ম্যানেজিং কমিটীর সভ্য-নির্বাচনে মাস্টার উপযুক্ততা বিচার করিয়া স্কুলের মালিক ও সেক্রেটারিদের মনোনীত প্রার্থীকে ভোট না দিয়া অপর ব্যক্তিকে ভোট দিয়াছে। লোকটি উপযুক্ত কেন, উপযুক্ততম প্রার্থী। কিন্তু স্কুলের মালিকপক্ষ তাঁহাকে চান না। তাঁহাদের পিছনে পিছনে যাইবেন না, তাঁহাদের সম্মুখে আসিয়া পথরোধ করিয়া দাঁড়াইবেন বলিয়াই তাঁহাদের ধারণা। এই কারণেই মালিকপক্ষ মাস্টারের উপর রুষ্ট হইয়া ক্ষমাপ্রার্থনা দাবি করিয়াছেন, অন্যথায় অক্ষমতার অপবাদে তাঁহাকে পদচ্যুত করিবার স্থিরসংকল্প লইয়া বসিয়া আছেন। মাস্টার কয়েকদিন ছুটি লইয়া অনেক চিন্তা করিয়াছেন, তাঁহার পরিবারবর্গের সকলে, বন্ধুবান্ধব, হিতাকাঙ্ক্ষী সকলেই তাঁহাকে ক্ষমাপ্রার্থনা করিবার উপদেশ দিয়াছেন; কিন্তু সে তাঁহার মনোমত হয় নাই. তিনি নিজেই ইস্তফাপত্র দাখিল করিয়া বসিয়াছেন।

সংবাদটা শুনিয়া এ সংসারটা সত্য-সত্যই প্রিয়বিয়োগাতুর সংসারের মত দুঃখ-বেদনায় আচ্ছন্ন ম্লান হইয়া গেল। পিসীমা তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, বাবা রতন, তুমি যাবে কেন? আমার শিবুকে নিয়ে তুমি থাক। যতখানি পারি তোমায় পুষিয়ে দোব।

আজ আর মাস্টার পূর্বের সে তেজোচ্ছ্বসিত মাস্টার নন, শান্ত ধীর অচঞ্চল। আহার বন্ধ করিয়া মাস্টার মুখ তুলিয়া পিসীমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, না, শিবুর এস্টেটের তাতে ক্ষতি হবে। শিবু তো আমার শুধু ছাত্রই নয় পিসীমা, ওর সঙ্গে আমার হিন্দু আমলের গুরুশিষ্য সম্বন্ধ। আমি আর চাকরিও করব না। বাড়িতে গিয়ে চাষ করব। জানেন, আমাদের এক কবি বলেছেন—'চাহি না স্বর্গের সুখ নন্দনকানন, মুহূর্তেক পাই যদি স্বাধীনতা-ধন'? স্বাধীন জীবনের জন্য যদি কিছু কষ্ট-স্বীকারই করতে হয়, সে করতে হবে।

পিসীমা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, তা হলে শিবু কার কাছে পড়বে, তুমিই একটা ঠিক করে দিয়ে যাও বাবা।

দরকার নেই পিসীমা, শিবুকে অন্য মাস্টার ঠিক পথে নিয়ে যেতে পারবে না। তারা লেখাপড়া শেখাতে পারবে, কিন্তু মানুষ করতে পারবে না। শিবু নিজেই পড়ে যাবে, মাই শিবু ইজ এ গুড বয়।

শিবু ম্লান মুখে দেওয়ালে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, সে বলিল, আমার আর প্রাইভেট মাস্টার চাই না, আমি নিজেই পড়ব।

পিসীমা কোন প্রতিবাদ করিলেন না। কিন্তু তাঁহার মনটা বেশ সন্তুষ্ট হইল না। পরদিনই মাস্টার বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় বলিলেন, বড় হয়ে আমায় ভুলবি না তো শিবু?

শিবুর চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। মাস্টার হাসিয়া বলিলেন, তুই ভুলবি না, সে আমি জানি। আচ্ছা, মাঝে মাঝে আমি আসব। তুই কিন্তু একবার যাস। গেলে আমি ভারি খুশী হব। আচ্ছা, আসি।

শিবু আজ জাতিভেদ মানিল না, মাস্টারের পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিল। মাস্টারও সে প্রণাম লইতে দ্বিধা করিলেন না, আকাশের দিকে মুখ তুলিয়া তিনি বলিলেন, গড ব্লেস ইউ, মাই বয়। ডোণ্ট ফরগেট, লাইফ ইজ নট অ্যান এম্পটি ড্রীম।

সাত

দ্বিপ্রহরে নায়েব ও গোমস্তাদের ডাকাইয়া খাজনা আদায়ের ব্যবস্থার বিষয় পিসীমা পরামর্শ করিতেছিলেন।

নায়েব বলিলেন, সুদ না থাকাতেই প্রজাদের এই মতিগতি। তারা বুঝছে, খাজনা দিলেই তো বেরিয়ে যাবে। যতদিন টাকাটা তারা নিজেরা খেলিয়ে নিতে পারে, তাই তাদের লাভ। ধরুন, এ বছর দিলেও সেই দশ টাকা দিতে হবে, দু বছর পরেও সেই দশ টাকা। আগে দিলেই এখানে লোকসান। মহলে সুদ চলতি করুন।

পিসীমা বলিয়া উঠিলেন, ছি সিং মশায়!

নায়েব মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিলেন, দোগাছি মহলের কাগজে প্রজাদের কারও চোদ্দ, কারও দশ, কারও বিশ বছরের খাজনা বাকি। একজনের দেখলাম ছাপ্পান্ন বছরের খাজনা বাকি। সুদ না হলে—

পিসীমা বাধা দিয়া বলিলেন, আর কখনও আপনি ও প্রস্তাব করবেন না সিং মশায় বাপ-পিতামহ যা করেন নি, তা করা হতে পারে না। কিন্তু হরিশ, তোমার মহলে এমনধারা বাকি কেন?

হরিশ বলিল ছাপ্পান্ন বৎসর যার বাকি, আর খাজনা সামান্য, বছরে চার আনা করে। ওরা বলে, জমিদার যখন আসবেন, তখন একসঙ্গে হুজুরকে দোব—এই আমাদের নিয়ম। বহুদিন তো ও-মহলে মালিক যান নি। শুনেছি, বাবুর পিতামহ—আপনার পিতা—কর্তাবাবু গিয়েছিলেন।

পিসীমা বলিলেন, হুঁ।

তারপর কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, খাজনা আদায় করতেই হবে। ধরে এনে বসিয়ে রেখে খাজনা আদায় কর। ফসল থাকলে আটক কর, খাজনা না দিলে তুলতে কি বেচতে দিও না। প্রত্যেক মৌজায় আর একজন করে চাপরাসীর বন্দোবস্ত করে দিন সিং মশায়। গোমস্তাদের বিদায় দিবার সময় আবার তাহাদিগকে বলিলেন, নাবালকের এস্টেট বলে ভয় করে কাজ কোরো না তোমরা। মালিক তোমাদের ঘুমিয়ে আছেন, বিপদে পড়ে ডাকলেই সাড়া পাবে।

সকলে চলিয়া গেল। পিসীমা ভাবিতেছিলেন, শিবুকে একবার মহলে ঘুরাইয়া আনিলে হয়। মালিককে পাইলে গোমস্তাদের ভরসা বাড়ে, প্রজারাও মালিক পাইলে খুশী হয়। অনেক সময় অনাদায় বা প্রজা-বিদ্রোহের মধ্যে গোমস্তাদের চক্রান্ত থাকে। স্কুলের কোন একটা ছুটি দেখিয়া দিন কয়েকের জন্য মাত্র। তিনি ঝিকে ডাকিয়া বলিলেন, নিত্য, শিবু কোথায় রে?

নিত্য উপরের বারান্দা পরিষ্কার করিতেছিল, সে বলিল, দাদাবাবু নিকছেন পিসীমা।

গোমস্তারা চলিয়া যাইতেই বউটি আসিয়া পিসীমার কোলের কাছে বসিয়া পড়িল। ফিক করিয়া হাসিয়া বলিল, ও পগু লিখছে পিসীমা।

পিসীমা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল, তুমি গিয়েছিলে বুঝি ?

বউ বলিল, আমাকে যে ডাকলে! পড়ে শোনালে আমাকে। অনেক লিখেছে পিসীমা। মায়ের নামে লিখেছে, সে কত কি—'পারিজাত ফুল তব চরণের'—এই সব।

পিসীমা সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, আর কি লিখেছে ?

বউ বলিল, তারপর দেশ দেশ করে কত সব লিখেছে!

পিসীমা বলিলেন, এইটি ওর মাথায় ঢোকালে ওর মা।

বউ এদিক ওদিক চাহিয়া বলিল, কাল সকালে যে দুজনে কথা হচ্ছিল সব।—প্রজাদের দুর্দশা, সেই বিয়ের নজরের টাকা সব ফিরে দিতে হবে। হ্যাঁ পিসীমা, আপনাকে বলে নি, এক টাকা করে খাজনা ছেড়ে দিতে হবে ?

পিসীমা কোন উত্তর দিলেন না। আবার ফিক করিয়া হাসিয়া বউটি বলিয়া উঠিল, আমার নামেও পগু লিখেছে পিসীমা, আমাকে আবার লিখেছে 'সখি'।—বলিয়া সে মুখে কাপড় চাপা দিয়া খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। কিন্তু সে হাসি অকস্মাৎ স্তব্ধ হইয়া গেল। পিসীমার মুখের দিকে চাহিয়া সে ভয়ে বিবর্ণ হইয়া উঠিল। পিসীমাকে আর কিছু বলিতে তাহার সাহস হইল না। সে অতি সন্তর্পণে উঠিয়া দিদিমার বাড়ি পলাইয়া গেল।

নিত্য ডাকিল, পিসীমা তোমায় ডাকছেন দাদাবাবু।

শিবনাথ কবিতা লিখিতেছিল, বলিল, হুঁ।

কিছুক্ষণ পরে সে বাহির হইয়া আসিল, বারান্দায় নিত্য তখনও কাজ করিতেছিল। শিবনাথ প্রশ্ন করিল, পিসীমা কোথায় ?

নিত্য একখানা কাপড় কুঁচাইয়া তুলিতেছিল, সে বলিল, নীচে দরদালানে।

শিবু আবার প্রশ্ন করিল, গোমস্তারা সব চলে গেছে ?

নিত্য বলিল, হ্যাঁ।

শিবনাথ তরতর করিয়া নীচে আসিয়া দরদালানে পিসীমার কোলের কাছে বসিয়া পড়িল। পিসীমা যেমন বসিয়া ছিলেন, তেমনই বসিয়া রহিলেন, কোনও সাড়া দিলেন না।

শিবনাথ তখনও কবিতা লেখার মেজাজেই ছিল, সে এত লক্ষ্য করিল না। সে বলিল, একটা কথা আছে পিসীমা।

পিসীমা একটু যেন নড়িলেন। শিবনাথ বলিল, এবার আমার বিয়ের জন্যে সমস্ত প্রজাদের এক টাকা করে খাজনা—

পিসীমা বলিলেন, মাপ দিতে হবে ?

শিবু আশ্চর্য হইয়া পিসীমার মুখের দিকে চাহিল।

অতি কঠিন কণ্ঠে পিসীমা বলিলেন, না, সে হয় না।

তাঁহার চোখে অদ্ভুত দৃষ্টি, শিবু ভয়ে চোখ নামাইয়া লইল। পিসীমার চোখের সম্মুখে পৃথিবী অর্থহীন হইয়া গিয়াছে। শিবু মায়ের নামে পত্র লিখিয়াছে, বধূর নামে লিখিয়াছে, আর তিনি কেউ নন! সমস্ত পৃথিবীটাই আজ মিথ্যা হইয়া যাইতেছে!

বাড়ির সকলে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। শৈলজা-ঠাকুরানী যেন অপরিমিত কঠোর রুক্ষ গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছেন। বিষয়-কর্মে কোন পরামর্শ দেন না, কিন্তু পরামর্শ বা আদেশ না লইয়া কাজ করিলেও রক্ষা নাই। খাজনা মাফ হয় নাই, বরং শাসন-সূত্র কঠোর আকর্ষণে এমন হইয়া উঠিয়াছে যে, স্পর্শমাত্রেই যেন টঙ্কার দিয়া উঠে; পৌষ-কিস্তিতে যে টাকা কম আদায় হইয়াছিল, চৈত্র-কিস্তিতে সে টাকা পূরণ হইয়া উঠিয়া আসিল। পূজায় এখন পিসীমার বেশি সময় অতিবাহিত হয়। সেই সময়টুকুই সর্বাপেক্ষা শঙ্কার সময়। এতটুকু শব্দ বা কথার সাড়া পাইলেই তিনি যেন ক্ষিপ্ত হইয়া উঠেন, ভর্ৎসনা-তিরস্কারের আর বাকি রাখেন না। বউটি ভয়ে শুকাইয়া উঠিয়াছে।

সেদিন পূজার ফুলের থালা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, এরই নাম ফুল বাছা ? এই তোমার দুর্বো বাছা হয়েছে ? শিবপুজোর বেলপাতায় চক্র রয়েছে!

শিবনাথও সময়ে সময়ে বিদ্রোহ করিয়া উঠে, তাহার সহিত কোন কিছু বাধিলেই সে নিরম্বু উপবাস আরম্ভ করিয়া দেয়। একমাত্র শিবনাথের মা হাসিমুখে সম্মুখে দাঁড়াইয়া ছিলেন। সমস্ত কিছু অগ্ন্যুদ্গারের মধ্যে তিনি শ্বেতবরনা গঙ্গার মত সুশীতল বক্ষ পাতিয়া দাঁড়াইলেন। সেখানে পড়িয়া অগ্নিকণাগুলি অঙ্গার হইয়া মিলাইয়া যাইত।

সকল বিষয়েই পিসীমার অসন্তোষ। খাইতে বসিয়া আহার ফেলিয়া দিয়া উঠিয়া পড়েন। পান খাইবার সময়েও বিপদ বাড়িয়া উঠে। পান মুখে করিয়া ফেলিয়া দিয়া বধূকে তিরস্কার করেন, কিছু শেখ নি মা তুমি ? এর নাম পান সাজা ? ছি ছি, কাল থেকে পান আর খাব না আমি, তুমি যদি পান সাজ।

এদিকে বধূটিকে লইয়া বিপদ বাড়িয়া উঠিল। সে ক্রমাগত দিদিমার বাড়ি যাইতে আরম্ভ করিল। বাঁড়ুজ্জেদের খিড়কির পুকুরের পশ্চিম পাড়ের বাড়িগুলির মধ্যে একটা গলি দিয়া সহজেই নাতির মামার বাড়ি যাওয়া যায়। কিন্তু গলিপথটা আবর্জনাময়, ঘাটে যাইবার অবকাশ পাইলেই সে সেই পথে পলাইয়া যায়।

ক্রমে ক্রমে শিবনাথের মার হাসির মাধুর্য যেন শান্ত হইয়া আসিতেছিল। পিসীমার উত্তাপ ধীরে ধীরে শীতল হইতেছিল।

জ্যৈষ্ঠ মাস। প্রখর রৌদ্রে সমস্ত যেন পুড়িয়া যাইতেছিল, আকাশের নীলিমা বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। খাওয়া-দাওয়ার পর সকলে রুদ্ধ ঘরের মধ্যে ঘুমাইয়া আছে। খুট করিয়া পিসীমার ঘরের দরজাটা খুলিয়া বউটি বাহির হইয়া আসিল।

কিছুক্ষণ পরে নিঃশব্দে দরজাটা খুলিয়া পিসীমাও বাহির হইয়া এ দরজা, ও দরজা, খিড়কির দরজা দেখিয়া একটু বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। দরজাগুলি ভিতর হইতে বন্ধ; কাহারও বাহির হইয়া যাওয়ার লক্ষণ পাওয়া গেল না।

তিনি ধীরে ধীরে উপরে উঠিয়া গেলেন। শিবুর ঘরের জানালায় একটা ছিদ্র দিয়া দেখিলেন, বধূ শিবনাথের কাছেই রহিয়াছে।

শিবনাথ তাহাকে আদর করিতেছে, আর সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছে, গোবরডাঙার বাবুদের বাড়িতে বিয়ে হলে এ জ্বালা তো হত না! দিন রাত পিসীমা বকছে আমায়। দিদিমাও বলছিল তাই।

শিবনাথ মুখ মুছাইয়া সান্ত্বনা দিয়া বলিল, আজ আবার একটা কবিতা লিখেছি, শোন।

বধূর মুখে হাসি দেখা দিল, সে বলিল, পড়, পড়, তুমি বেশ পড় কিন্তু।

শিবনাথ পড়িতে আরম্ভ করিল—

শৈশব সাধ তুই, কাহিনীর কন্যা,
তোর হাসিতে মানিক ঝরে, মতিঝরা কান্না।

বউ হাসিয়া বলিল, কার, আমার?—বলিয়া শিবনাথের গায়ে হাসিয়া ঢলিয়া পড়িল। শিবনাথ চট করিয়া তাহার মুখে চুম্বন করিয়া বসিল। নাস্তি মুখ মুছিতে মুছিতে বলিল, কি রকম ভাত-ভাত গন্ধ তোমার মুখে! পান খাও না কেন?

শিবু বলিল, তুমি দাও না কেন?

বউ বলিল, খাবে?

শিবু সাগ্রহে বলিল, দাও। কে, কে?

কাহার পদধ্বনি বারান্দায় ধ্বনিত হইয়া সিঁড়ির মুখে মিলাইয়া গেল। উভয়ে উভয়ের মুখের দিকে উৎকণ্ঠিতভাবে চাহিয়া রহিল। নীচে বারান্দায় পিসীমা ডাকিলেন, নিত্য, নিত্য!

নাস্তি সভয়ে জিভ কাটিয়া ত্রস্তপদে নীচে গিয়া দরদালানে কৃত্রিম ঘুমে বিভোর হইয়া পড়িয়া রহিল।

সমস্ত অপরাহ্নটা শিবুর বুক গুরগুর করিতেছিল। কিন্তু বেশ শান্তভাবেই

কাটিয়া গেল। রাত্রে বৈঠকখানায় সে পড়িতেছে, এমন সময় নিত্য-ঝি আসিয়া ডাকিল, দাদাবাবু, দাদাবাবু, শিগগির আসুন। পিসীমার ফিট হয়েছে।

শিবু ব্যাকুলভাবে প্রশ্ন করিল, কি করে?

শুয়ে ছিলেন, মা ডাকতে গিয়ে দেখেন, জ্ঞান নেই, দাঁতি লেগে গিয়েছে। কেষ্ট সিং কোথায় গেল? নায়েববাবু, ডাক্তারকে ডাকতে হবে যে?

দরদালানের ঘরে পিসীমা নিথর অবস্থায় পড়িয়া ছিলেন। শ্বাস-প্রশ্বাস অতি মৃদু। শিবনাথের মা নিজে মাথায় ও মুখে চোখে জলসিঞ্চন করিতেছিলেন। নিত্য বাতাস করিতেছে। শিবনাথ উৎকণ্ঠিত বিবর্ণ মুখে কাছে বসিয়া আছে।

ডাক্তার নাড়ী দেখিয়া প্রশ্ন করিল, হঠাৎ এ রকম কেন হল? কখনও কখনও কি এ রকম হয়?

শিবনাথের মা বলিলেন, না। আজ পনরো বছরের মধ্যে হয় নি। তবে পনরো বছর আগে ফিটের ব্যারাম ছিল ঠাকুরঝির। এক দিনে এক বিছানায় ওর স্বামী আর ছেলে মারা গিয়ে এ অসুখ হয়েছিল। তারপর শিবু হল, সে আজ পনরো বছর। শিবুকে পেয়ে—

পিসীমা একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া অল্প একটু নড়িলেন।

শিবনাথের মা ডাকিলেন, ঠাকুরঝি!

ক্লান্ত মৃদুস্বরে পিসীমা সাড়া দিলেন, যাই।

আট

দিন তিনেক পরের কথা। পিসীমা তখনও অসুস্থ। কাহারও সহিত কথা তেমন বলেন না, বিশেষ বউকে দেখিলে যেন জ্বলিয়া যান।

শিবনাথ কাছারির বারান্দায় দাঁড়াইয়া ছিল। পাশের রাস্তা দিয়া জনপাঁচেক পাঞ্জাবী পাঁচ-ছটা ঘোড়া লাগাম ধরিয়া লইয়া যাইতেছিল; শিবনাথ তাড়াতাড়ি গিয়া ফটকে দাঁড়াইল।

একজন বৃদ্ধ পাঞ্জাবী জিজ্ঞাসা করিল, বাবু হ্যায় খোকাবাবু?

শিবনাথ হাসিয়া বলিল, হ্যায়। কেন?

পাঞ্জাবী বলিল, ঘোড়া বেচনে আসিয়াছি হামলোক। বাবু হামারা পাশ এক ঘোড়া লিয়া, বহুত রোজ হুয়া, উ ঘোড়া মালুম হোতা বাতেল হো গেয়া। নয়া বহুত আচ্ছা ঘোড়া হ্যায় হামারা পাশ।

পাঞ্জাবী ফটকের মধ্যে প্রবেশ করিল। শিবনাথ ফিরিয়া আসিয়া বারান্দায় চেয়ারের উপর বসিল।

বৃদ্ধের পিছনে তাহার ঘোড়াগুলিকে লইয়া দলবলও কাছারি-বাড়ির প্রাঙ্গণে আসিয়া প্রবেশ করিল। বৃদ্ধ হাসিমুখে নায়েববাবুকে অভিবাদন করিয়া বলিল, সেলাম বাবুজী, তবিয়ত আচ্ছা?

নায়েব একটু হাসিয়া বলিলেন, হ্যাঁ, ভাল। বহুদিন পর যে?

পাঞ্জাবী বলিল, হাঁ, বহুত রোজকে বাদ, সাত বরিষ হো গেয়া। মালিকবাবু— হুজুর হামারা কাঁহা হ্যায়, সেলাম তো ভেজিয়ে, রমজান শেখ আয়া হ্যায়। উ ঘোড়া হামারা কিধর হ্যায়?

নায়েব নীরব হইয়া রহিলেন। শিবনাথ দেখিতেছিল ঘোড়াগুলিকে, ছয়টি ঘোড়া—একটি সাদা, একটি কালোয় সাদায় মিশ্রিত, তিনটি লাল, একটি কালো। অস্থির চঞ্চল ভঙ্গি ওই কালো ঘোড়াটির, ঘাড়ে কেশরের মত চুল, লেজটাও বোধ হয় মাটিতে ঠেকে, কিন্তু লেজ ঈষৎ উচ্চে তুলিয়া রাখে। সর্বদাই সে ঘাড় নামায় আর তোলে, মুহুর্মুহু মাটিতে পা ঠুকিয়া হ্রেষারবে স্থানটা মুখরিত করিয়া তুলিতেছিল। শিবনাথের বুকের মধ্যে বাসনা তোলপাড় করিতেছিল। ওই ঘোড়াটার পিঠে সওয়ার হইয়া বাতাসের বেগে—সে কি আনন্দ! তাহার পিতার গল্প মনে পড়িল। শ্যামপুর মহল এখান হইতে পঁচিশ ক্রোশ পথ, সেখান হইতে তাঁহার পিতার অসুখের সংবাদ পাইয়া কয় ঘণ্টার মধ্যে আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন।

পাঞ্জাবীর উচ্চকণ্ঠের চকিত ধ্বনিতে তাহার চমক ভাঙিল, আরে হায় হায় মেরে নসিব, মালিক হামারা নেহি হ্যায় !

নায়েব কখন মৃদুস্বরে স্বর্গীয় মালিকের মৃত্যু-সংবাদ তাহাকে দিয়াছেন।

থাকিতে থাকিতে শিবনাথের মাকে মনে পড়িয়া গেল। সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া পড়িল। সেবার বাইসিক্ল কিনিবার সময় মায়ের কথা মনে পড়িল। তিনি বলিয়াছিলেন, বিলাসের শেষ নেই শিবু, যত বাড়াবে তত বাড়বে, অথচ তৃপ্তি তোমার কখনও হবে না। এবার কিনে দিলাম, কিন্তু ভবিষ্যতে নিজের মনকে নিজে শাসন কোরো।

পাঞ্জাবী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, ওহি কালা ঘোড়াঠো হাম লে আয়ে থে। হামারা মালিকজাদা কাঁহা দেওয়ান-সাব—এহি এহি, হাঁ হাঁ, হাম বহুত ছোটে দেখা থা। সেলাম হামারা হুজুর মালিক, হামারা কসর তো মাফ হোয় জনাব, হাম আপকো পহেলেই নেই পছানা।

শিবনাথকে দাঁড়াইতে হইল। সে বলিল, তোমরা এখানে খাওয়া-দাওয়া করো। নায়েববাবু, এদের সিদের বন্দোবস্ত করে দিন।

পাঞ্জাবী বলিল, হাঁ হুজুরকে সওয়ার হোনেকা উমর তো হো গেয়া। লে লেজিয়ে হুজুর, আপকে বাবাকে নামকে চিজ।

শিবনাথ বলিল, না।

নায়েবও সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন, বাবু ছেলেমানুষ খাঁ সাহেব। এত বড় ঘোড়া নিয়ে কি করবেন ? পড়ে-টড়ে গেলে—

পাঠান হা-হা করিয়া কৌতূহলভরে হাসিয়া উঠিল।—গির যাবেন বাবুসাব ! তব একঠো ছোটা—

নিয়ে এস কালো ঘোড়া।—শিবনাথ আদেশ করিল। আদেশের ধ্বনির বাধা পাইয়া পাঠান নীরব হইয়া গেল। শিবনাথ লাফ দিয়া বাগানের বেদীর উপর উঠিয়া আঙুলের ইশারা করিয়া বলিল, হিঁয়া লে আও।

পাঠান হাসিয়া নায়েববাবুকে বলিল, শেরকে বাচ্চা জনাব, শেরই হোতা হ্যায় তারপর ওদিকে মুখ ফিরাইয়া হাঁকিল, লে আও রে কালা বাচ্চেঠো।

একটি লম্বা-চওড়া জোয়ান পাঠান ঘোড়াটির মুখ ধরিয়া আনিয়া বেদীটার পাশে দাঁড় করাইল। পাঠান বলিল, দেখিয়ে হুজুর, হামারা লড়কাকে লড়কা—পন্‌রা বরিষ উমর—পাঞ্জাবসে সওয়ার হোকে চলা আয়া হিঁয়া।

তারপর সে ঘোড়ার লাগাম ও রেকাব ঠিক করিয়া দিয়া শিবনাথকে কোলে তুলিয়া ঘোড়ার পিঠে তুলিয়া দিতে গেল। শিবনাথ পিছাইয়া গিয়া বলিল, হঠ,

যাও তুম।—বলিয়াই সে বেদীর উপর হইতে লাফ দিয়া ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হইয়া বসিল।

পাঠান আনন্দে করতালি দিয়া উঠিল। বলিল, বহুত আচ্ছা হ্যায়, বহুত আচ্ছা!

শিবনাথ ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া আকর্ষণ করিতেছিল।

পাঠান বলিল, থোড়া ঠহরিয়ে হুজুর। তারপর সে নাতিকে আদেশ করিল, লে আও তো রে ঘুঙুর।

ঘোড়ার পায়ে ঘুঙুর বাঁধিয়া দিয়া সে বলিল, আব বাঁশি তো ফুকারো রহমৎ।

শিবনাথকে বলিল, বিবিকে নাচ দেখ্ লিজিয়ে পহেলে।

বাঁশির স্বর বাজিয়া উঠিতেই অশ্বিনীর পা উঠা-নামার সঙ্গে সঙ্গে তালে তালে ঘুঙুরগুলি ঝুমঝুম শব্দে বাজিতে আরম্ভ করিল।

নায়েব শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। এতক্ষণ কোন কথা বলিবার অবকাশ পর্যন্ত পান নাই। কিছুক্ষণ দেখিয়া-শুনিয়া তিনি অন্দরের মধ্যে শিবনাথের মায়ের নিকট গিয়া হাজির হইলেন। পিসীমা অসুস্থ অবস্থায় কয়দিন শয্যাশায়িনী হইয়াই আছেন। আর এ ক্ষেত্রে শিবনাথের মাতা ভিন্ন অপরের দ্বারা শিবনাথকে প্রতিনিবৃত্ত করা যাইবে না।

সম্মুখেই নিত্য-ঝিকে দেখিয়া বলিলেন, নিত্য, মা কোথায় দেখো তো। শিগগির—শিগগির ডেকে দাও।

মা নিকটে ভাঁড়ার-ঘরের মধ্যেই ছিলেন, তিনি বাহির হইয়া আসিলেন, কি সিং মশায়? এমন ভাবে এলেন যে?

মহা বিপদ হয়েছে মা, কর্তাবাবুকে যে পাঠান ঘোড়া বেচত, সেই পাঠান ঘোড়া নিয়ে এসেছে। বাবু দেখে খেপে উঠেছেন, কালো রঙের এক প্রকাণ্ড ঘোড়া কিনতে বসেছেন, দুশো-আড়াইশো টাকা চান। তা ছাড়া, ঘোড়া থেকে পড়লে আর রক্ষে থাকবে না।

মা বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন, শিবনাথ ঘোড়া কিনছে?

হ্যাঁ মা, আমি বারণ করবার ফাঁক পেলাম না। প্রকাণ্ড এক কালো ঘোড়া—

মা ডাকিলেন, নিত্য!

মা!

শিবনাথকে ডেকে আন্ তো। বলবি, এক্ষুনি ডাকছি আমি, তার জন্যে দাঁড়িয়ে আছি আমি।

নিত্য চলিয়া গেল। নায়েব বলিলেন, আমি সরে যাই মা। আমার থাকাটা ভাল হবে না।

মা কোন কথা বলিলেন না, তাঁহার শুভ্র মুখ রাঙা হইয়া উঠিয়াছিল। নায়েব

চলিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পর শিবনাথ আসিয়া বাড়ি ঢুকিল। মুখ তুলিয়া মায়ের দিকে চাহিয়া সে বলিল, কি বলছ?

মা দেখিলেন, শিবনাথের শ্যামবর্ণ কিশোর মুখখানি থমথম করিতেছে।

মা বলিলেন, তুমি নাকি ঘোড়া কিনছ শিবনাথ?

শিবনাথ অকুণ্ঠিতভাবে উত্তর দিল, হ্যাঁ।

মা তেমনই স্বরে বলিলেন, না, ঘোড়া কিনতে হবে না।

শিবনাথ মাথা হেঁট করিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল, কিন্তু আদেশপালনের জন্য কোন ব্যগ্রতা তাহার দেখা গেল না। মাও নীরব। কিছুক্ষণ পর মা দৃঢ়স্বরে বলিলেন, যাও, নায়েববাবুকে বলোগে, ওদের পাঁচটা টাকা দিয়ে বিদেয় করে দিতে। দুশো-আড়াইশো টাকা দিয়ে ঘোড়া কেনবার মত অবস্থা আমাদের নয়।

শিবনাথ যাইবার জন্য ফিরিল।

কিন্তু কি মনে করিয়া মা আবার ডাকিলেন, শিবু, শোনো, শুনে যাও।

শিবু ফিরিল। মা তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া সস্নেহে বলিলেন, ছি বাবা, সংসারে কি মনের বাসনাকে প্রবল করতে আছে! জেনে রেখো, ভোগ করে বাসনা কখনও কমে না, বাড়ে। আরও চাই, আরও চাই—এ অশান্তির চেয়ে বড় অশান্তি আর নেই। তুমি আড়াইশো টাকা দিয়ে ঘোড়া কিনবে, কিন্তু ভাবো তো, কত লোক আড়াইটা পয়সার অভাবে খেতে পায় না সংসারে! যাও, বলে দাও লোকটিকে—আমার মা বারণ করলেন।

শিবনাথ চোখ মুছিয়া জোর করিয়া মুখে হাসি আনিয়া বলিল, তাই বলিগে মা।

কাছারিতে আসিয়া শিবনাথ পাঠানকে এ কথা বলিতে পারিল না, তাহার কেমন লজ্জা করিতেছিল। নায়েবকে বলিয়া দিয়া সে পড়ার ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। চোখ হইতে তাহার টপটপ করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতেছিল।

বাহিরে মৃদুভাষী নায়েবের সকল কথা সে শুনিতে পাইতেছিল না।

পাঠানের উচ্চ কণ্ঠস্বর সে স্পষ্ট শুনিতে পাইল, সেলাম দেওয়ান সাব, যাতা হ্যায় তব।

ফিরে নিয়ে যেও না। কত দাম ঘোড়ার?

শিবু দ্রুতপদে বাহির হইয়া আসিল। কাছারির বারান্দায় দাঁড়াইয়া পিসীমা প্রশ্ন করিতেছেন, রোগশীর্ণ চোখে একটা অস্বাভাবিক প্রখর দীপ্তি।

পাঠান চিনিতে ভুল করিল না, সে দৃপ্তা মূর্তিকে চিনিতে ভুল হইবার কথাও নয়। আভূমিনত সেলাম করিয়া বলিল, দুই শও পঁচিশ মায়ী।

একতাড়া নোট নায়েবের হাতে দিয়া পিসীমা বলিলেন, আড়াইশো টাকা আছে। দাম একটা ঠিক করে নিয়ে দিয়ে দিন।

শিবনাথ বুকের কাছে দাঁড়াইয়া ছিল। তাহাকে বলিলেন, চড়্ ঘোড়ায় শিবু, আমি দেখি।

শিবু লাফ দিয়া বেদীর উপর হইতে ঘোড়ায় চড়িয়া বসিল। একজন পাঠান ঘোড়ার মুখ ধরিয়া রাস্তা ধরাইয়া দিতেই ঘোড়া ঘাড় বাঁকাইয়া উচ্চ পুচ্ছভঙ্গির সঙ্গে ডুলকি চালে চলিয়া দেখিতে দেখিতে দৃষ্টির বাহির হইয়া গেল।

পিসীমা বলিলেন, কেষ্ট সিং, আস্তাবল সাফ করাও। তারপর স্থিরদৃষ্টিতে পথের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। মিনিট বিশেক পরে শিবু ফিরিল, ধূলিধূসরিত দেহ, মাথার পিছন হইতে পিঠ বাহিয়া রক্ত ঝরিতেছিল।

পিসীমা আশঙ্কাভরে প্রশ্ন করিলেন, পড়ে গিয়েছিলি শিবু?

ঘোড়া হইতে নামিতে নামিতে শিবনাথ বলিল, লাগে নি পিসীমা, পেছনে মাথাটা একটু কেটে গিয়েছে শুধু।

পাঠান বলিল, ঘোড়া তো শয়তান নেহি হ্যায় এইসা!

শিবনাথ বলিল, না, বদমাশ নয়, রাস্তায় একটা ছোট বাঁধ ছিল, ও মেরে দিলে এক লাফ, আমি ঠিক বুঝতে পারি নি আগে, উলটে পড়ে গেলাম। সেখানটায় বালি ছিল, না হলে লাগত। একটা পাথরে শুধু মাথাটা কেটে গেল।

নায়েব একটা টিপ লইয়া সম্মুখে ধরিয়া বলিলেন, ঘোড়ার খরচটা সই—

টিপটা ফেলিয়া দিয়া পিসীমা বলিলেন, আপনাদের এস্টেটের টাকা নয় সিং মশায়,—এ আমার নিজের টাকা।

শিবনাথ শিশুর মত তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া ছিল। কতদিন পর পিসীমা তাহাকে বুকের মধ্যে গভীর আবেগে চাপিয়া ধরিলেন, ক্ষতস্থানটিতে হাত বুলাইতে আরম্ভ করিলেন।

সে আবেষ্টনের মধ্যে শিবনাথ হাঁপাইয়া উঠিয়াছিল। সে ডাকিল, পিসীমা।

পিসীমার চোখ দিয়া জল পড়িতেছিল।

নয়

শিবুকে লইয়া পিসীমা বাড়িতে ফিরিলেন হাসিমুখে। কয়দিন পর সকলে তাঁহার হাসিমুখ দেখিয়া আজ আশ্বস্ত হইয়া বাঁচিল।

হাসিমুখেই পিসীমা বলিলেন, শিবুকে তুমি কিছু বলতে পাবে না বউ। আমি ওকে ঘোড়া কিনে দিয়েছি। ও ফিরিয়েই দিচ্ছিল।

মা বলিলেন, তোমার ওপর কিছু বলবার আমি কে ঠাকুরঝি? শিবু তো তোমারই। তবে আমি বারণ করি কেন জান?

পিসীমা বলিলেন, সে আমি জানি। তুমি আমার চেয়ে অনেক বেশি বোঝ, সে কি আমি জানি না ভাই? শিবু এখন যতদিন পড়বে, ঘোড়ার কাছ দিয়ে যেতে পাবে না, একবার করে চড়বে শুধু। কেমন?

শেষ প্রশ্নটা করা হইল শিবনাথকে। সেও সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় নাড়িয়া সুবোধ শিশুর মত বলিল, হ্যাঁ।

রতনদিদি বলিল, এখন যা বলবে, তাতেই 'হ্যাঁ'। ঘোড়া পেয়েছে আজ, আজ শিবুর মত সুবোধ ছেলে ভূ-ভারতে নেই।

বাড়ির সকলেই তাহার কথার ভঙ্গিমায় প্রাণ খুলিয়া হাসিয়া উঠিল, এমন কি শিবনাথের মা পর্যন্ত।

এই সময় গৃহদেবতার পূজক অক্ষয় মুখুজ্জে আসিয়া বলিলেন, কই গো, গিন্নী কই? ইয়েকে বলে, কাল থেকে যে পুজোর বাসনগুলো মাজা হয় নাই।

অক্ষয় এই গ্রামেরই লোক, গ্রাম-সম্পর্কে নাস্তির দাদামহাশয় হয়, তাই সে নাস্তিকে 'গিন্নী' বলিয়া ডাকিয়া থাকে, নাস্তি তাহাতে রাগে, সেই তাহার পরিতৃপ্তি।

বলিতে ভুলিয়াছি, সেই দিন হইতে বধূর উপর নূতন কয়টি কাজের ভার পড়িয়াছে, তাহার মধ্যে দেবপূজার বাসন-মার্জনা একটি।

পিসীমা বলিলেন, বউমা কোথায় রে?

নিত্য আজ হাসিতে ভয় করিল না, কৌতুকভরে হাসিয়া বলিল, বউমা তোমার পালিয়েছে পিসীমা, খিড়কির পাড়ের গলি দিয়ে। আমি ডাকলাম, ও বউদিদি!— বউদিদি বোঁ-বোঁ করে দৌড়।

অক্ষয় বলিল, গিন্নী শিবনাথের ঘর করবে না মাসীমা, আমাকেই ওর পছন্দ—

অক্ষয়ের কথা শেষ হইল না, কঠোরকণ্ঠে পিসীমা বলিলেন, ও রকম ঠাট্টা আর কখনও যেন তোমার মুখে না শুনি অক্ষয়।

অক্ষয় আঁতকাইয়া উঠিয়া বলিল, হুঁ—তা বটে, হুঁ—তা আর—হুঁ—

'হুঁ' কথাটি অক্ষয়ের মুদ্রাদোষ। পিসীমা বলিলেন, নিত্য, যা ডেকে আন্ তো বউমাকে।

তারপর ভ্রাতৃজায়াকে বলিলেন, বউমাকে নিয়ে তো বড় বিপদ হল বউ।

জবাব দিল অক্ষয়, এটি তাহার স্বভাব, উপস্থিত থাকিলে সে দুই কথা বলিবেই, সে বলিল, হুঁ—তা বিপদ বইকি, হুঁ—

রূঢ়স্বরে পিসীমা বলিলেন, আপনার কাজে যাও অক্ষয়। সকল তাতেই কথা কওয়া—কি বদ স্বভাব তোমার!

রতন ইশারা করিয়া অক্ষয়কে প্রস্থান করিতে ইঙ্গিত করিল।

নিত্য ফিরিয়া আসিল একা। পিসীমা কঠোরস্বরেই প্রশ্ন করিলেন, বউমা কই?

নিত্য একটু ইতস্তত করিতেছিল, পিসীমা অসহিষ্ণুভাবে আবার প্রশ্ন করিলেন, কোথায় বউমা?

নিত্য বলিল, ওদের লোক আসছে, সব বলবে।

পিসীমা বলিলেন, ওদের লোক ওদের কথা বলবে। তোকে যা জিজ্ঞেস করছি, তার উত্তর দে।

নিত্য বলিল, এলেন না বউদিদি।

এল না!

না।

কি বললে!

সে ওদের লোক এসে—

নিত্য!

পিসীমার স্বরের প্রতিধ্বনিতে বাড়িখানা গমগম করিয়া উঠিল, নিত্য চমকিয়া উঠিল।

সে এবার বিবর্ণ মুখে বলিল, বউদিদি ও-বাড়িতেই থাকবেন এখন, বড় হলে—

হুঁ। আর কি কথা হয়েছে?

পুজোর বাসন মাজতে গিয়ে বালিতে বউদিদির হাত মেজে গেছে।

আর কি কথা হয়েছে?

আর পিসশাশুড়ীর এত বকাঝকা কি ওই কচি মেয়ে সইতে পারে?

নান্তির দিদিমার বাড়ির একজন প্রবীণা মহিলা আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, নান্তির দিদিমা বললেন, নান্তি এখন ওইখানেই থাকবে। বড়-সড় হোক, তারপর আসবে। নান্তির বাক্স-টাক্সগুলো পাঠিয়ে দিতে বললেন।

পিসীমা কি বলিতে গেলেন, কিন্তু আত্মসম্বরণ করিয়া আবার বলিলেন, শিবুর মা রয়েছে, বল।

তিনি ধীরে ধীরে উঠিয়া চলিয়া গেলেন। শিবনাথের মাকেও কিছু বলিতে হইল না, শিবনাথই এক বিপর্যয় বাধাইয়া তুলিল। নান্তির বাক্স-পেঁটরা সমস্ত নিজেই বাহির করিয়া আনিয়া বারান্দায় হাজির করিল। তারপর বিবাহের যৌতুক—ঘড়ি, চেন, আংটি, বোতাম, সোনার কলম, রুপার দোয়াত, যাহা কিছু নিজের নিকট ছিল, সমস্ত বাক্সের উপর ফেলিয়া বলিল, নিয়ে যান।

মহিলাটি, এমন কি বাড়ির সকলে পর্যন্ত বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল, শিবনাথের মায়ের মুখে কথা ছিল না।

শিবনাথ বলিল, আমার পিসীমার কথা শুনে যে না থাকতে পারবে তার ঠাঁই এ বাড়িতে হবে না। নিয়ে যান সব।

সে উঠিয়া চলিয়া গেল।

বাড়ির বাহির-দরজা হইতে কে বলিল, নিয়ে এস সব লক্ষ্মীপুরের বউ, গৌরদাস যাচ্ছে।—নান্তির দিদিমার কণ্ঠস্বর।

অকস্মাৎ একটা বিপর্যয় ঘটিয়া গেল। সমস্ত দিনটা বাড়িখানা থমথম করিতে লাগিল। সন্ধ্যায় পিসীমা বলিলেন, শিবুর আমার আবার বিয়ে দোব বউ।

শিবুর মা হাসিয়া বলিলেন, তোমার শিবু, আমায় কেন জিজ্ঞেস করছ ঠাকুরঝি? কিন্তু শিবু আরও একটু বড় হোক, অন্তত ম্যাট্রিক পাসটা করুক।

একটুখানি নীরব থাকিয়া পিসীমা বলিলেন, নাঃ, সে পারব না; যাই করুক, ও আমার শিবুর বউ।

শিবনাথের মা কোন কথা বলিলেন না, নীরবে শুধু একটু হাসিলেন।

কিছুক্ষণ পর আবার পিসীমা বলিলেন, অন্যায় বোধ হয় আমারই হল বউ।

মা বলিলেন, না।

পিসীমা বলিলেন, শিবুর মনে হয়তো কষ্ট হয়েছে, সে বোধ হয় আমারই ওপর অভিমান করে—

মা বলিলেন, না। শিবু তোমাকে ভুল বুঝবে না, তুমি শিবুকে ভুল বুঝো না ভাই।

পিসীমা বলিলেন, বউমার জন্যে ঘর খাঁ-খাঁ করছে ভাই।

দশ

ঘটনাটা হয়তো সামান্য এবং নগণ্য, কিন্তু বৈশাখের অপরাহ্নের ছোট সামান্য একটুকরা মেঘের মত দেখিতে দেখিতে বিপুল পরিধিতে পরিণতি লাভ করিয়া যেন কালবৈশাখীর সৃষ্টি করিয়া তুলিল। এক দিকে পিসীমা অন্য দিকে নান্তির দিদিমা। পিসীমার সমস্ত আক্রমণ বধূর উপর ; তিনি বলেন, পরকে বলবার আমার অধিকার কি ? তারা তো আমার কি আমার বংশের অপমান করে নি, করেছে ওই বউ।

নান্তির দিদিমা বলেন, ঘর তো আমার নান্তির, নান্তির শাশুড়ী বললে নান্তি সইতে পারত, কিন্তু ও কোথাকার কে ?

শিবনাথের মা বার বার দৃঢ়কণ্ঠে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, না, এ বাড়ির মালিক ঠাকুরঝি। আমি শিবনাথকে দশ মাস দশ দিন গর্ভে ধরেছি, কিন্তু ঠাকুরঝি তাকে পনরো বছর পালন করছেন বুকে করে। ও রকম কথা যে বলবে, তার ভুল।

পিসীমা ডাকিলেন, শিবনাথ !

শিবনাথ পাশেই দাঁড়াইয়া ছিল। সে যেন অকস্মাৎ বড় হইয়া উঠিল, গভীর আন্তরিকতাপূর্ণ স্বরে সে উত্তর দিল, তোমার হুকুমও যা, আমার বাবার হুকুমও তাই পিসীমা।

পিসীমা সেদিন এক নিমেষে যেন জল হইয়া গেলেন। মা সস্নেহ দৃষ্টিতে ছেলের দিকে চাহিয়া রহিলেন, তাঁহার চোখে জল আসিতেছিল। পিসীমা শিবুকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, আমার দাদা কি বলতেন জান বউ, বলতেন—ভগ্নী আর যজ্ঞোপবীতে কোন তফাত নেই।

পরিতুষ্টির আর তাঁহার সীমা ছিল না। হাসিমুখেই দিন চলিতেছিল। দিন কয় পর তিনি বলিলেন, বউমাকে আমি নিয়ে আসব বউ। আমার বউ—

শিবনাথও কাছেই বসিয়া ছিল, সে বলিল, না। সে হবে না পিসীমা। ওরা নিয়ে গেছে, ওরাই দিয়ে যাবে।

শিবনাথের মা বলিলেন, শিবনাথ ঠিক বলেছে ঠাকুরঝি।

পিসীমা চুপ করিয়া রহিলেন।

নিত্য-ঝি আসিয়া বলিল, এক গামলা গুড় বের করলাম, আর করব ?

পিসীমা হা-হা করিয়া হাসিয়া গড়াইয়া পড়িলেন, তাঁহার হাস্যধ্বনির মধ্যে নিত্যর অবশিষ্ট কথা ঢাকা পড়িয়া গেল। হাসিতে হাসিতেই তিনি বলিলেন, পোড়ারমুখীর মুখটা দেখ !

নিত্যর মুখে কয় স্থানে গুড় লাগিয়া মুখখানা বিচিত্রিত হইয়া উঠিয়াছে।

মা ও শিবনাথ মৃদু একটু হাসিল মাত্র।

নায়েব বাহির হইতে ডাকিলেন, নিত্য!

পিসীমা বলিলেন, দরদালানে আসন পেতে দে মতির মা। আসুন সিং মশায়। তিনি উঠিয়া গেলেন।

নায়েব বলিলেন, মহলের প্রজারা এসেছে সব ধানের জন্যে।

পিসীমা প্রশ্ন করিলেন, ধানের জন্যে?

আজ্ঞে হ্যাঁ, অধিকাংশ লোকেরই ঘরে এবার খাবার নেই। গত বৎসর অজন্মা গেছে।

হুঁ। যা হয়েছিল, সেটুকু জমিদার মহাজনেই গ্রাস করেছে।

তারপর জানালার ফাঁক দিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া বলিলেন, এবার তো দেখছি অনাবৃষ্টি হল। শ্রাবণের পনেরো দিন চলে গেল, এখনও বর্ষা নামল না।

নায়েব বলিলেন, সেই কথাই আমি ভাবছিলাম। এই সম্পত্তি মাথায়, তার ওপর সংসার-খরচ, ধান হাতছাড়া করা ঠিক হবে না।

কিন্তু এ সময়ে প্রজাকে না রাখলে তো চলবে না, সে যে অধর্ম হবে। তারপর একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, একটা হামার সংসার-খরচের জন্যে রেখে দুটো হামার খুলে দিন।

নায়েব বলিলেন, আশ্বিনের লাট তো মাথার ওপর, অষ্টম আছে কার্তিক মাসে।

পিসীমা বলিলেন, ভগবান আছেন সিং মশায়। ওগো রতন, আর একবার ভাত চড়াতে হবে, মহল থেকে প্রজারা এসেছে।

নায়েব চলিয়া যাইতেছিলেন, পিসীমা বলিলেন, দাঁড়ান একটু। ওপাড়ার চাটুজ্জেদের মেয়ের বিয়ে, আধ মণ মাছ, দু গাড়ি কাঠ তাদের দিতে হবে। মহলে গোমস্তাকে বরাত করে দিন।

নায়েব চলিয়া গেলেন। জলখাওয়া শেষ করিয়া শিবনাথ কাছে আসিয়া বলিল, আমাকে কিছু ধান দিতে হবে পিসীমা।

ধান? ধান নিয়ে কি করবি?

শিবনাথ বলিল, আমরা একটা দরিদ্র-ভাণ্ডার করব। সবারই কাছে কিছু কিছু ধান চাল ভিক্ষে করে—

পিসীমা বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন, ভিক্ষে করে?

হ্যাঁ, চেয়ে নিয়ে এক জায়গায় জমা করব গরিবদের জন্যে।

পিসীমা রূঢ়ভাবে ভ্রাতৃজায়ার দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, এসব বুঝি তোমার শিক্ষা বউ ?

শিবনাথের মা হাসিয়া বলিলেন, এ তো কুশিক্ষা নয় ভাই।

পিসীমা বলিলেন, এ বাড়ির ছেলের পক্ষে সুশিক্ষা নয় ভাই।

তারপর শিবুকে বলিলেন, ধান আমি তোমায় দিচ্ছি শিবু, তুমি নিজের কাছারিতে বসে নিজে হাতে দান কর।

শিবনাথ বলিল, একা আমরা কজনের দুঃখ দূর করব পিসীমা ? একটা গল্প বলি শোনো পিসীমা : একজন চাষার সাত ছেলে ছিল। কিন্তু ভাই-ভাইয়ের মধ্যে একবিন্দু মিল ছিল না। একদিন তাদের বাপ কতকগুলো সরু সরু কাঠি এনে—

পিসীমা বলিলেন, ও গল্প আমি জানি শিবনাথ, কিন্তু আমাদের বংশ আগাছার ঝাড় নয়, এ বংশ আমাদের শালগাছের জাত। যতক্ষণ খাড়া থাকবে, একা একাই ছায়া দেবে, ডালে পাতায় বহু পাখিকে আশ্রয় দেবে।

শিবনাথ বলিল, অহঙ্কার করা ভাল নয় পিসীমা।

পিসীমা বলিলেন, অহঙ্কার কার কাছে করলাম ? এ তোমাকে আমি শিক্ষা দিচ্ছি। আমাদের বংশে প্রকাশ্যে দান কেউ করে নি, বাবা বলতেন, নামের লোভে দানে পুণ্য হয় না। অভাবী গেরস্থের বাড়িতে সকালে মুটেতে মাথায় করে তত্ত্ব নিয়ে যেত, বলত—আপনাদের অমুক কুটুমবাড়ি থেকে আসছি।

শিবনাথ চুপ করিয়া রহিল।

পিসীমা বলিলেন, আচ্ছা, ধান আমি দোব, কিন্তু তুমি ওসবের মধ্যে থাকতে পাবে না, অপর যারা করছে করুক।

শিবনাথ বলিল, আমাকে যে সেক্রেটারি করেছে সব।

মা বলিলেন, বেশ তো শিবু, সেক্রেটারি অন্য কেউ হবে। নামটাই তো বড় নয়, আর তোমার এবার পরীক্ষার বৎসর, ওতে পড়ারও ক্ষতি হবে।

শিবনাথের কথাটা বোধ হয় মনঃপূত হইল না, সে নীরবে কম্পাসের কাঁটার অগ্রভাগ দিয়া দেওয়ালে একটা পরিকল্পনাহীন চিত্র আঁকিতে আরম্ভ করিল।

পিসীমা বলিলেন, লোহার দাগ দিও না, ঋণ হয়।

নায়েব রাখাল সিং বহুদর্শী ব্যক্তি। তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হইল। আশ্বিনের মালখাজনা কোনরূপে মহল হইতে হইলেও কার্তিক ষন্মাহের টাকার কিছুই আদায় হইল না। গত বৎসর অজন্মা গিয়াছে, এ বৎসরও অধিকাংশ কৃষিক্ষেত্র বন্ধ্যার মত কঠিন উষর হইয়া পড়িয়া আছে। অথচ অষ্টমে বাঁড়ুজ্জে-বাবুদের অনেক টাকা দেয়।

ঘরের ধান পর্যন্ত প্রজাদের দেওয়া হইয়াছে। পিসীমা চিন্তার গাম্ভীর্যে গভীর হইয়া উঠিলেন। কপালের চিন্তা রেখাগুলি সর্বদাই সুস্পষ্টরূপে প্রকটিত হইয়া থাকে।

নায়েব বলিলেন, ঋণ ছাড়া আর কোন উপায় তো নেই মা।

শিবনাথের মা বলিলেন, আমার গয়না বিক্রি করে টাকার ব্যবস্থা করুন।

পিসীমা তিরস্কারপূর্ণস্বরে বলিয়া উঠিলেন, ছি বউ, আমাকে তুমি এ কথা শোনালে? তুমি আমার দাদার স্ত্রী, আমার ঘরের লক্ষ্মী, ভগবান তোমায় আভরণহীনা করেছেন, তার ওপরে আমার হাত নেই। আমি তোমার অলঙ্কার বেচব? ছি!

মা হাসিয়া বলিলেন, এটা নেহাত মিথ্যে অপমান-বোধ ঠাকুরঝি। ঋণ করার চেয়ে সে অনেক ভাল। তুমিও তো তোমার গয়না তোমার ভাইয়ের বিপদের সময় বিক্রি করে টাকা দিয়েছ।

দিয়েছি, তুমি আর আমি সমান নয় ভাই। আর ভগবান করুন, ভবিষ্যতে যেন আমার কথার দাম কখনও বুঝতে না হয়। নইলে আমার কথা একেবারে মূল্যহীন নয়। আপনি ঋণের ব্যবস্থা দেখুন সিং মশায়, যোগীন্দ্রবাবু উকিলকে পত্র দিন।

নায়েব বলিলেন, তিনি বিয়ের দরুন কিছু টাকা পাবেন। আর সুদের হার যোগীন্দ্রবাবুর বড় বেশি। আমি বলছিলাম, বাবুর মামাশ্বশুরকে—

পিসীমা রুক্ষ দৃষ্টিতে নায়েবের দিকে চাহিয়া বলিলেন, আপনি যোগীন্দ্রবাবুকে চিঠি লিখুন গিয়ে।

নায়েব বলিলেন, বাবুকে একবার জিজ্ঞাসা—

মা বলিলেন, না।

নায়েব চলিয়া গেলেন।

শিবনাথ দোতলায় খাটের উপর বসিয়া 'আঙ্ক্‌ল টম্‌স কেবিন' পড়িতেছিল। বইখানা সে স্কুলে প্রাইজ পাইয়াছে। এতদিন পড়িবার অবকাশ হয় নাই। পূজার ছুটি পাইয়া সে বইখানা পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল। প্রথম বার পড়িয়া সমস্ত বেশ বুঝিতে পারে নাই, আখ্যানভাগ একবার পড়িয়া তৃপ্তিও হয় নাই, সে আবার বইখানা পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল।

জীবনে সে প্রথম উপন্যাস পড়িয়াছে—'আনন্দমঠ'। পড়িয়াছে নয়, শুনিয়াছে—মা তাহাকে পড়িয়া শুনাইয়াছিলেন। সেদিন পিসীমা বাড়িতে ছিলেন না। কোন পর্বোপলক্ষে গঙ্গাস্নানে গিয়াছিলেন। মায়ের কাছে শিবনাথের ঘুম আসিতেছিল না।

মা হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি রে, ঘুম আসছে না?

শিবনাথ বলিয়াছিল, না।

মা বলিয়াছিলেন, গল্প বলি একটা, শোন্।

শিবনাথ বিরক্ত হইয়া বলিয়াছিল, না। আর 'এক ছিল রাজা' শুনতে ভাল লাগে না আমার।

মা আলমারি খুলিয়া একখানি বই টানিয়া লইয়া বসিলেন, তবে এ বই পড়ি, শোন্। বঙ্কিমবাবুর 'আনন্দমঠ'।

রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া গেল, বই শেষ হইলে মা প্রশ্ন করিয়াছিলেন, কেমন লাগল?

শিবুর চোখে জল ছলছল করিতেছিল। তখন শিবু থার্ড ক্লাসে পড়িত। তারপর বঙ্কিমচন্দ্রের সমস্ত বই পড়িয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কিছু কিছু পড়িয়াছে। কিন্তু 'আনন্দমঠ' তাহার জীবনের আনন্দ। এতদিন পর আজ 'আঙ্কল টম্‌স কেবিন' পড়িয়া সেই ধারার আনন্দ পাইয়াছে।

একটা হুইস্‌ল বাঁশি তীব্রস্বরে কোথায় বাজিয়া উঠিল। শিবনাথ চকিত হইয়া সম্মুখের দিকে চাহিল, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইল না। বাঁশিটা আবার বাজিল।

আবার শিবনাথ চারিদিকে ভাল করিয়া দেখিল। সঙ্গে সঙ্গে বাঁশিটা আবার বাজিয়া উঠিল। এবার শিবনাথের নজরে পড়িল, রামকিঙ্কর-বাবুদের মুক্ত জানালায় দাঁড়াইয়া নাস্তি হাসিতেছে। নাস্তিই বাঁশি বাজাইয়া তাহাকে ইঙ্গিত করিয়াছে।

শিবনাথের মুখেও হাসি ফুটিয়া উঠিল। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত পরেই সে গম্ভীর হইয়া জানালাটা বন্ধ করিয়া দিল।

শিবু!—পিসীমা ঘরে প্রবেশ করিলেন।

শিবনাথ জানালাটা বন্ধ করিয়া তখনও খাটের উপর ফিরিয়া আসিতে পারে নাই।

পিসীমা বলিলেন, জানালাটা বন্ধ করলি কেন? ঘরে আলো আসুক না।

শিবনাথ বিব্রতভাবেই বলিল, না, থাক্।

তোর ওই এক ধারা, যেটি আমি বলব, সেইটিতেই—না।

তিনি নিজে গিয়া জানালাটা খুলিয়া দিলেন, বউ তখনও জানালায় দাঁড়াইয়া ছিল। পিসীমা দেখিয়া বলিলেন, বউমা দাঁড়িয়ে নয়?

শিবু নীরব হইয়াই রহিল।

পিসীমা বলিলেন, তাই বুঝি জানালা বন্ধ করে দিলি?

শিবনাথ এ কথারও কোন জবাব দিল না।

বউ তখন পলাইয়াছে। পিসীমা বলিলেন, বউমার কি ছিরি হয়েছে! ছি ছি! মাথার চুলগুলো উড়ছে! কালো কাপড়! কেই বা দেখে, যত্ন করে! বুড়ো দিদিমা, সে নিজে অক্ষম, তারই যত্ন কে করে, সে আর কত করবে! শুধু ঝগড়া করতেই পারে!

শিবনাথকে কি বলিতে আসিয়াছিলেন, সে আর তাঁহার বলা হইল না। নীচে

নামিয়া যাইতে যাইতেই তিনি ডাকিতে আরম্ভ করিলেন, নিত্য! নিত্য! নিত্য কোথায় গেল বউ?

নিত্য ওদিক হইতে সাড়া দিতেছিল, যাই পিসীমা।

নিত্য আসিতেই বলিলেন, এক কাজ কর্ দেখি, ঠাকুরবাড়ির দরজায় তুই চুপ করে বসে থাক্। বউমা যখন এই পথ দিয়ে যাবে, আমায় ডেকে দিবি।

ঘণ্টা দুয়েক পরই বধূ বন্দিনী হইল। বেচারী খেলা করিতে বাহির হইয়াছিল, নিত্যর নিকট সংবাদ পাইবামাত্র তিনি বাহির হইয়া গিয়া ডাকিলেন, বউমা, দাঁড়াও।

নান্তির পা দুইটি যেন মাটিতে পুঁতিয়া গেল। পিসীমা তাহার হাত ধরিয়া বাড়িতে প্রবেশ করিলেন। বউ ভয়ে কাঁপিতেছিল।

শিবনাথের মা দরদালানে সেলাইয়ের কাজ করিতেছিলেন, পিসীমা বউকে আনিয়া কাছে বসাইয়া দিয়া বলিলেন, মাথার শ্রী দেখ, কাপড়ের দশা দেখ!

বউ ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল। পিসীমা আবার বলিলেন, চুল বেঁধে দাও, আর তোমারই শাড়ি একখানা পরিয়ে দাও।—বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

শিবনাথের মা বউয়ের চুল বাঁধিতে বাঁধিতে আরম্ভ করিলেন, দেখ মা, হিন্দুর ঘরের মেয়ে তুমি, হিন্দুর ঘরের বউ, শ্বশুর-শাশুড়ী এঁদের দেখতে হয় বাপ-মায়ের মত।

নান্তির এইখানেই যত ভয়, সে উপদেশ কিছুতেই শুনিতে পারে না, সে রূঢ়ভাবেই হউক, আর মিষ্ট কথাতেই হউক। কিন্তু আজ উপায় ছিল না, পিছনে শাশুড়ী, হাতে চুলের মুঠি। অগত্যা সে ঘাড় নাড়িয়া পোষা পাখিটির মত উত্তর দিল, হুঁ।

শিবনাথের মা বলিলেন, নড়ছ কেন এত? স্থির হয়ে বস, সিঁথি বেঁকে যাচ্ছে যে! তুমি সাবিত্রীর গল্প জান?

নান্তি বলিল, জানি, কিন্তু আপনি বলুন না, গল্প আমার ভারি ভাল লাগে।

সাবিত্রীর উপাখ্যান আরম্ভ হইল, শেষ হইল। চুল-বাঁধা শেষ করিয়া শাশুড়ী একখানা ঢাকাই শাড়ি বাহির করিয়া বউকে পরাইয়া মুখ মুছাইয়া সিঁদুরের টিপ পরাইয়া দিলেন।

কিছুক্ষণ পর পিসীমা ফিরিয়া আসিয়া চারিদিক চাহিয়া বলিলেন, বউমা চলে গেছে?

রতন বলিল, বোধ হয় গিয়েছে। এইখানেই ছিল, কই, নেই তো!

বউ তখন সন্তর্পণে পানের ঘরে ঢুকিয়া পানের বাটা খুলিয়া পান চুরি করিতেছিল। পিসীমার কণ্ঠস্বর শুনিয়া সে তাড়াতাড়ি দুই গালে দুইটা পান পুরিয়া আঁচলে আরও দুইটা বাঁধিয়া লইল, তারপর নিঃশব্দে উপরে উঠিয়া শিবনাথের ঘরের মধ্যে লুকাইয়া পান চর্বণ করিতে বসিল।

সাবিত্রী-উপাখ্যানেরই ফল, না, মনের খেয়াল—কে জানে ! নাস্তির মনে হইল, শিবনাথের ঘরখানা পরিষ্কার করা দরকার। কুঁচিকাঠির সরু ঝাঁটা উপরের দরদালানেই থাকে, নাস্তির তাহা জানা ছিল, সে ঝাঁটা-গাছটা আনিয়া ঘর পরিষ্কার করিতে আরম্ভ করিল। ঘর পরিষ্কার শেষ করিয়া বিছানা ও টেবিল গুছাইয়া ফেলিল। তারপর চারিদিক চাহিয়া দেখিল, দেওয়ালে ছবিগুলার গায়ে বড় ঝুল জমিয়া আছে। সে একটা চেয়ারের উপর দাঁড়াইয়া ছোট ঝাঁটাগাছটা দিয়া ঝুল ঝাড়িবার মনস্থ করিল। কিন্তু চেয়ারের উপর উঠিয়াও নাস্তির হাতের ঝাঁটা ততদুর পৌছিল না। চেষ্টা করিয়াও হতাশ হইয়া বেচারী অনেক মাথা খাটাইয়া আলনা হইতে একখানা চাদর টানিয়া লইল। সেটার এক প্রান্ত গুটাইয়া ছবির গায়ে ছুঁড়িয়া মারিল। তাহাতেই কাজ হইল, গুটানো চাদর খুলিয়া ছবির গায়ের ঝুল পরিষ্কার হইয়া গেল। গঙ্গাবতরণখানা পরিষ্কার হইল। অহল্যা-উদ্ধারখানা পরিষ্কারই আছে। শিবাজীর ছবিখানার উপর এবার নাস্তি চাদরের তালটা ছুঁড়িয়া মারিল। সঙ্গে সঙ্গে ছবিখানা স্থানচ্যুত হইয়া মেঝের উপর ঝনঝন শব্দে ভাঙিয়া পড়িল।

নিত্য-ঝি দোতলাতেই অন্য ঘরে কাজ করিতেছিল, শব্দ শুনিয়া সে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই চীৎকার করিয়া উঠিল, ওগো, বউদিদি খুন হয়েছে গো, কাচে কেটে রক্তগঙ্গা হয়েছে গো !

নাস্তি হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া ছিল। নীচের তলা হইতে মা পিসীমা ছুটিয়া আসিলেন ; তাঁহারাও যেন হতভম্ব হইয়া গেলেন। নাস্তির বুকের কাপড়খানা রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। এক মুহূর্ত নিস্তব্ধ থাকিয়া শিবনাথের মা তাড়াতাড়ি আসিয়া নাস্তিকে নাড়া দিয়া ডাকিলেন, কোথায় কেটে গেছে বউমা ? এত রক্ত—

নাস্তি কাঁপিতেছিল, সে সভয়ে বলিল, পানের পিচ, রক্ত নয়।

চারিটা পান মুখে পুরিয়া ঝাঁট দিতে নাস্তির মুখ হইতে উছলিয়া পানের রস ক্রমাগত বুকের কাপড়ে পড়িয়া এমন হইয়াছে। শিবনাথের মা হাসিয়া বলিলেন, ভয় নেই, রক্ত নয়।

পিসীমা বধূর কথা শুনিতে পাইয়াছিলেন, তিনি রূঢ়কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, ছবি ভাঙল কি করে।

নাস্তি ভয়ে চুপ করিয়া রহিল। পিসীমা আবার বলিলেন, মাথায় এত ঝুল কোথা থেকে লাগল, মুখে হাতে এত ধুলোই বা লাগল কি করে ?

নাস্তি এবার সভয়ে বলিল, ঘর ঝাঁট দিতে—

বধূর কথা শেষ হইতে না হইতে পিসীমা কঠিনভাবে বলিয়া উঠিলেন, গৌরীর তপস্যা হচ্ছিল ! পতিব্রতার স্বামীসেবা হচ্ছিল !

সত্যই নাস্তির নাম গৌরী।

বাহিরে দিনান্তের অন্ধকার ছায়ামূর্তিতে তখন পৃথিবীর বুকে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, ঘরখানার মধ্যে সে যেন কায়া গ্রহণ করিতেছিল। মুহূর্তে মুহূর্তে ঘরখানাও নীরবতায় রাত্রির মত গভীর হইয়া উঠিতেছিল; কাহারও মুখে কথা ছিল না, শ্বাসপ্রশ্বাস ছাড়া জীবনের অন্য সমস্ত স্পন্দন যেন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

পিসীমা বলিলেন, নিত্য, বউমাকে সঙ্গে করে ওর দিদিমার বাড়ি দিয়ে আয়।

কয়দিন পরেই নাস্তির দিদিমা নাস্তিকে লইয়া তাঁহাদের কলিকাতার বাসায় চলিয়া গেলেন। সেখান হইতে যাইবেন কাশী। তিনি নাস্তির সম্পর্কে শিবুর মা ও পিসীমার যে একটা সম্মতি লওয়ার প্রয়োজন অথবা পালনীয় রীতি ছিল, সেটুকুও মানিলেন না।

পিসীমা গর্জন করিয়া উঠিলেন। মা হাসিলেন।

কিন্তু সেই দিন সন্ধ্যাতেই পিসীমা বলিলেন, বউমাকে আমাদের ছেড়ে দেওয়া ভাল হল না বউ। শিবুর মন-খারাপ হবে।

মা হাসিয়া বলিলেন, তুমি পাগল ভাই ঠাকুরঝি।

পিসীমা বলিলেন, না ভাই বউ, তুমি লক্ষ্য করে দেখো, শিবু আমার কত বড় হয়ে উঠেছে। কেমন গোঁফের রেখা দিয়েছে, দেখেছ?

মা আবার হাসিলেন।

এগারো

পিসীমার একাগ্র সতৃষ্ণ দৃষ্টির ভুল হইবার কথা নয়, ভুলও হয় নাই! সত্যই শিবনাথ বড় হইয়া উঠিয়াছে, তাহার দেহের একটা সুস্পষ্ট পরিবর্তন আজ সহজেই চোখে পড়ে। তাহার বাল্যরূপ যেন ভাঙিয়া কে নূতন ভঙ্গিতে—নূতন রূপে গড়িয়া তুলিতেছিল। দেহখানি দীর্ঘ ভঙ্গিমায় ঈষৎ শীর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, সর্ব অবয়বের মধ্যে দৃঢ়তার প্রতিবিম্ব ধীরে ধীরে প্রভাতে প্রথম দণ্ডের সূর্যকিরণের মত ক্রম-বিকাশমান। বাল্য ও কৈশোরের সন্ধিক্ষণে এ পরিবর্তন সকলের মধ্যেই প্রকাশ পায়, পাঁচ বৎসর হইতে পনেরো বৎসরের মধ্যে মানুষের পরিবর্তন কখনও চোখে ধরা পড়ে না। কিন্তু তাহার পরই কয় মাসের মধ্যেই এমন সুস্পষ্ট পরিবর্তন দেখা দেয় যে, চারিপাশের মানুষ বিস্মিত না হইয়া পারে না।

শিবনাথের আচরণের মধ্যেও পরিবর্তন দেখা দিয়াছিল। চোখের দৃষ্টিতে, পদক্ষেপের ভঙ্গিতে, কথা বলার ধারার মধ্যে গাম্ভীর্য মন্থর-গতিতে আত্মপ্রকাশ করিতেছিল। প্রথম বর্ষার গৈরিকবর্ণ জলধারায় আধভরা ছোট নদীর রূপের সঙ্গে এ রূপের একটা সাদৃশ্য আছে। খেলার ছলে আর তাহাকে অতিক্রম করা যায় না, সম্ভ্রমভরে নিজেকে প্রস্তুত রাখিয়া সে জলে নামিতে হয়।

তাহার ম্যাট্রিক পরীক্ষা শেষ হইয়া গিয়াছে। বিপুল অবসরে সে আবার বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ লইয়া বসিল।

সেদিন পিসীমা বলিলেন, হ্যাঁ রে শিবু, তুই মাঠে গিয়ে একা বসে বসে কি ভাবিস, বল্ তো?

শিবনাথ হাসিয়া বলিল, কে-বললে তোমাকে?

যেই বলুক, সঙ্গী-সাথী বাদ দিয়ে একা কি করিস?

কি আর করব? মাঠ দেখি, নদী দেখি, আকাশ দেখি।

তার মানে? ঘোড়ায়ও আর চড়িস না?

ভাল লাগে না পিসীমা।

পিসীমার মুখ ভারী হইয়া উঠিল। মাও সেখানে আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। শিবনাথ মাকে বলিল, আমার একটি জিনিস করে দেবে মা?

পিসীমা বলিলেন, তোমার কাজে বড় ঢিল পড়েছে রতন, গেছ বেলা ছুটোর সময়, আর এলে এই সন্ধ্যে লাগিয়ে! এর মানে কি বাছা?—বলিতে বলিতেই তিনি বাহির হইয়া চলিয়া গেলেন।

রতন কোন উত্তর দিল না, শুধু বলিল, কার ওপর চটল ঠাকরুন আজ ?

মা বলিলেন, মাঠে একা কি ভাবিস শিবু, পিসীমা তোর বলছিল আমায় ?

শিবু মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, 'আনন্দমঠে'র সেইখানটা মনে আছে মা —মা যা ছিলেন, মা যা হইয়াছেন ? আমি তাই দেখতে চেষ্টা করি মা।

মা ছেলের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, চোখে তাঁহার একটি শুভ্র হর্ষোজ্জল দীপ্তি।

শিবনাথ বলিল, বুঝতে পারি না মা। সে মূর্তিও কল্পনা করতে পারি না। সেই আকাশ, সেই নদী, সেই মাঠ, ফসল—

মা বলিলেন, দেশ কি মাটি শিবনাথ ? দেশকে খুঁজতে হয় গ্রামের বসতির মধ্যে, শহরের মধ্যে। তুই আমাদের পটো-পাড়াটা দেখেছিস শিবু ?

আর তো পটোরা নেই, সব মরে গেছে, কজন ছিল পালিয়ে গেছে।

আমার বিয়ের পরও আমি দেখেছি শিবু, ওই পটো-পাড়ার কি চলতি ! বড় বড় জোয়ান পট দেখিয়ে গান করত, মাটির পুতুল বেচত মেয়েরা। যে জায়গা দিনরাত্রি হাসি গান আনন্দে মুখর হয়ে থাকত, লক্ষ্মীর কৃপায় সুন্দর হয়ে থাকত, সেই জায়গা আজ কি হয়েছে ! ওইখানে ভেবে দেখ, মা কি ছিলেন কি হয়েছেন !

শিবু মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

কেষ্ট সিং আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, ঘোড়ায় জিন দেওয়া হয়েছে, পিসীমা দাঁড়িয়ে আছেন কাছারিতে।

শিবনাথ রুক্ষ দৃষ্টিতে কেষ্ট সিংয়ের দিকে চাহিয়া বলিল, খুলে দিতে বল জিন।

মা বলিলেন, না। যাও কেষ্ট, বাবু যাচ্ছেন।

কেষ্ট চলিয়া গেল।

শিবু বলিল, কেমন পাগল বল তো !

মা বলিলেন, গুরুজন সম্বন্ধে শ্রদ্ধা করে কথা বলতে হয় শিবু। যাও, গায়ে জামা দিয়ে চলে যাও। পিসীমা তোমার আমার চেয়েও বড়, তাঁর মনে দুঃখ দিও না।

শিবনাথ আর কথা কহিল না, উঠিয়া জামা গায়ে দিবার জন্য চলিয়া গেল।

রতন বলিল, হল কি গো মামীমা ?

পাচিকা হইলেও রতন এ বাড়ির মেয়ের মত, তাহার মা এই বাড়িতে কাজ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার মৃত্যুর পর সে কাজ করিতেছে। রতনের মা শৈলজা-ঠাকুরানীকে বলিতেন—দিদি, শিবনাথের পিতাকে বলিতেন—দাদা। সেই সূত্রেই রতন এ বাড়ির ভাগ্নী, শৈলজা-ঠাকুরানী তাহার মাসীমা, শিবনাথের মাকে সে বলে—মামীমা।

শিবনাথের মা বলিলেন, হয় নি কিছু, মাঝে মাঝে তো মন-খারাপ হয় ঠাকুরঝির, সেই রকম কিছু হয়েছে। এটুকু তিনি ঘুরাইয়া বলিলেন।

রতন বলিল, ওই নাও, আবার পেয়াদা এসে হাজির।

সতীশ চাকর আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, সে বলিল, আজ্ঞে, বাবুকে ডাকছেন পিসীমা। নায়েববাবুকে বকছেন, মুহুরীবাবুকে বকছেন, বাবুকে কাগজপত্র দেখানো হয় না বলে।

শিবনাথ বলিল, চল চল, আর বক্তৃতা করতে হবে না।

বৈঠকখানায় পিসীমা নায়েবকে সত্য-সত্যই তিরস্কার করিতেছিলেন, নায়েব নত-মস্তকে দাঁড়াইয়া হাসিমুখেই সমস্ত সহ্য করিতেছিলেন। শিবনাথ আসিতেই পিসীমা বলিলেন, তুমি আর ছোট ছেলে নও শিবনাথ, আপনার বিষয় আপনি এইবার দেখে-শুনে নাও। আমি আর পারব না।

শিবনাথ সে কথার জবাব দিল না, সে বলিল, এই, ঘোড়া নিয়ে আয়।

সহিস ঘোড়া আনিয়া কাছে দাঁড় করাইতেই শিবনাথ সওয়ার হইয়া বসিয়া বলিল, ঘোড়াটাকে নাচাব, দেখবে পিসীমা ?

পিসীমা বলিলেন, না। তোমাকে সকালে বিকেলে কাছারিতে বসতে হবে কাল থেকে শিবনাথ।

তারপর সতীশ চাকরকে বলিলেন, কাছারি-ঘর পরিষ্কার কর সতীশ। শিবনাথ কাল থেকে টিপ সই করে দেবে, তবে টিপ মঞ্জুর হবে নায়েববাবু।

শিবনাথ তখন ঘোড়ায় চড়িয়া বাহির হইয়া গিয়াছে। পিসীমা বলিলেন, ওকে এইবার গড়ে তোলবার ভার আপনার সিং মশায়।

নায়েব হাসিয়া বলিলেন, কাঁটার মুখে শান দিয়ে ধারালো করতে হয় না মা, আপনি সব ঠিক হয়ে যাবে।

পরদিন সকালে পিসীমা নিজে শিবনাথের হাত ধরিয়া কাছারি-ঘরে বসাইয়া দিলেন। কাছারি-ঘর ঝাড়া-মোছা হইয়াছে, ফরাশের উপর সাদা চাদরের পরিবর্তে আজ রঙিন ছাপানো চাদর শোভা পাইতেছিল, তাকিয়াগুলিরও ওয়াড় পালটানো হইয়াছে। তেপায়ার উপর রুপার ফরসি সযত্নমার্জনায় ঝকমক করিতেছিল। এ টেবিলের উপর একখানি আলুন্দের রঙিন চাদর বিছানো। তক্তাপোশের উপর মধ্যস্থলে ছোট একখানি গালিচা দিয়া শিবনাথের আসন প্রস্তুত হইয়াছিল, সম্মুখে প্রাচীনকালের কাঠের হাত-বাক্স। বাক্সটির দক্ষিণ দিকে বিচিত্র গঠনের রুপার একটি দোয়াতদানিতে দোয়াত ও কলম রক্ষিত ছিল। শিবনাথকে বসাইয়া দিয়া পিসীমা বলিলেন, দুটি কথা মনে

রেখো, কারও কাছে মাথা নিচু কোরো না, আর পিতৃ-পুরুষের কীর্তি-বৃত্তি লোপ কোরো না।

তিনি আর দাঁড়াইলেন না, দ্রুতপদে বাহির হইয়া চলিয়া গেলেন, ভাল করিয়া তাঁহার মুখ কেহ দেখিতে পাইল না। শিবনাথ আসনে বসিয়া চারিদিকে একবার চাহিয়া দেখিল। নায়েব সম্মুখে দাঁড়াইয়া ছিলেন, ভূমিষ্ঠ হইয়া তাহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, এই টিপটা সই করে দিন।

টিপটি নানা দেবতার পূজার খরচের ফর্দ। শিবনাথ বলিল, এত পুজো হঠাৎ?

নায়েব বলিলেন, আপনি আজ প্রথম কাছারিতে বসবেন, তারই জন্যে পুজোর ব্যবস্থা।

কেষ্ট সিং আসিয়া নত হইয়া অভিবাদন জানাইয়া বলিল, ২১৯ নম্বরের মোড়ল প্রজারা এসেছে।

নায়েব প্রশ্ন করিলেন, ৫৯ নম্বরের প্রজারা আসে নি এখনও?

আজ্ঞে না, তবে এসে পড়ল বলে।

বাহিরের বারান্দায় কতকগুলি পদশব্দ শুনিয়া কেষ্ট দরজার বাহিরে আসিয়া ফিরিয়া গিয়া বলিল, আজ্ঞে, ৫৯ নম্বরেরও সব এসে পড়েছে।

নায়েব বলিলেন, ডাক সব।

শিবনাথ প্রশ্ন করিল, প্রজারা কেন নায়েববাবু?

নায়েব উত্তর দিবার পূর্বেই দুই তৌজির দশজন মণ্ডল আসিয়া প্রণাম করিল। শিবনাথও হাত তুলিয়া প্রতিনমস্কার জানাইল।

যোগীন্দ্র মণ্ডল বলিল, অনেকদিন পরে কাছারি-ঘরে আমাদের রাজাকে দেখলাম হুজুর।

শিবনাথের মনের মধ্যে কেমন একটা উত্তেজনা জাগিয়া উঠিতেছিল; মুখ প্রদীপ্ত, চোখ জ্বলজ্বল করিতেছিল।

৫৯ নম্বরের তৌজির নগেন্দ্র বলিল, আমরা পিতৃহীন হয়েছিলাম, এতদিন পরে আজ আমরা বাপ পেলাম।

এইবার তাহারা নজর হাজির করিল।

শিবনাথের দেহের সমস্ত রক্ত দ্রুতবেগে মাথায় উঠিতেছিল। ওই সব তাহার বেশ ভাল লাগিতেছিল; শুধু তাহাই নয়, তাহার মন অহঙ্কারের নামান্তর আত্মপ্রসাদে ভরিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল, সত্যই সে যেন একটি রাজা, এই প্রজাগুলির দণ্ডমুণ্ডের কর্তা; তাহার একবিন্দু হাসির পুরস্কারে উহারা কৃতার্থ হইয়া যায়, হয়তো তাহাদের মঙ্গলও হয়। সে গম্ভীরভাবে নায়েবকে বলিল, মোড়লদের জলখাবারের ব্যবস্থা করে দিন।

নায়েব বলিলেন, সতীশ বাড়ির মধ্যে গেছে।

আবার একটু মৃদু হাসিয়া শিবনাথ বলিল, তোমরা আজ এখানে খেয়ে তবে যাবে, এ তো তোমাদেরই ঘর।

সত্যই প্রজারা যেন কৃতার্থ হইয়া গেল।

নায়েব বলিলেন, আজ্ঞে হ্যাঁ, তা তো বটেই।

যোগীন্দ্র বলিল, আপনার অন্নেই তো বেঁচে আছি হুজুর।

নগেন্দ্র বলিল, মায়ের গর্ভ থেকে আপনার মাটিকেই আশ্রয় করেছি আমরা, আপনার বাড়ির পেসাদ তো আমাদের ভাগ্যের কথা।

বেলা দশটার সময় শিবনাথ বাড়িতে ফিরিল সংযত সম্ভ্রমপূর্ণ পদক্ষেপে, মর্যাদাপূর্ণ গাম্ভীর্যের অনভ্যস্ত আবরণ অতি সাবধানতার সহিত সে রক্ষা করিয়া চলিয়াছিল। কালো কাঠের হাত-বাক্সটি সতীশ কাঁধে করিয়া পিছন পিছন আসিতেছিল। শিবনাথ একেবারে আপনার ঘরের মধ্যে গিয়া উঠিল। টেবিলের উপর তাহার প্রিয় বই দুইখানি পড়িয়া আছে—'আনন্দমঠ' ও 'আঙ্কল টম্‌স কেবিন'। অকস্মাৎ নিদ্রাভঙ্গে সচকিতের মত সে টেবিলের নিকট দাঁড়াইয়া গেল। নীচে মা কি বলিতেছিলেন, তাহার কানে কথাগুলি আসিয়া পৌঁছিল।

একটি ভিক্ষে চাইব ঠাকুরঝি, তোমার কাছে।

কি, বল?

আজ থেকে শিবুকে সংসারের মধ্যে টেনে নিয়ে এসো না ভাই, ওকে লেখাপড়া শিখতে দাও।

শিবনাথ রুদ্ধশ্বাসে কান পাতিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পর পিসীমা বলিলেন, এতে কি পড়ার ক্ষতি হবে বউ ?

হবে।

বেশ, তবে শিবনাথের পড়াই শেষ হোক। তোমার ছেলে আমি কেড়ে নিতে চাই না ভাই।

ও কথা বলছ কেন ঠাকুরঝি? শিবনাথ তো তোমারই।

আমার!

শিবনাথ পিসীমার মুখে এক বিচিত্র হাসি কল্পনা করিয়া লইতে পারিল, সে হাসি পিসীমা মাঝে মাঝে হাসেন। পিসীমা আবার বলিলেন, কেনা পুতুল মনের মতন হয় না ভাই বউ, সে পরের হাতের গড়া।

শিবনাথ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। কোন একটা সুনির্দিষ্ট ব্যথিত কারণ যে ইহার মূলে ছিল, তাহা নয়, তবুও তাহার মা ও পিসীমার কথাগুলি শুনিয়া সে

দীর্ঘনিশ্বাস না ফেলিয়া পারিল না। ক্যান্‌ভাসের ঈজি-চেয়ারখানায় সে চোখ বুজিয়া শুইয়া পড়িল।

কিশোর মন তাহার শরতের আকাশের বলাকার মত পক্ষবিস্তার করিয়া এক সুদীর্ঘ যাত্রায় যেন উড়িয়া চলিয়াছে। উত্তরোত্তর উর্ধ্বে উঠিয়া সে বোধ করি নিরন্তর সন্ধান করিতেছিল, কোথায় মানসলোক। মধ্যে মধ্যে এক অজ্ঞাত আকর্ষণে তাহার মন আজিকার কাছারি-ঘরখানির দিকেও আকৃষ্ট হইতেছিল।

হঠাৎ তাহার মনে পড়িয়া গেল গৌরীকে। ছোট চঞ্চলা গৌরী আজ যদি থাকিত, তবে বড় ভাল হইত। সে সশ্রদ্ধ বিস্ময়ে তাহার আজিকার মর্যাদাময় রূপের দিকে চাহিয়া থাকিত। আবার ধীরে ধীরে তাহার মন-বলাকা উত্তর-দিগন্তের মানসের দিকে নিবদ্ধ হইল।

তাহার স্থূল দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল স্বামী বিবেকানন্দের ছবির দিকে। সে আলমারি খুলিয়া স্বামীজীর 'বীরবাণী'খানি বাহির করিয়া খুলিয়া বসিল।

এই 'বীরবাণী'র কয়েকটি বাণী কার্পেটের উপর বুনিয়া দিবার জন্যই মাকে কাল সে বলিতে চাহিয়াছিল—আমার একটি জিনিস করে দেবে মা? কিন্তু সে কথা বলিতে পিসীমা অবসর দেন নাই। আজ সে নিজে ভুলিয়াছিল, আবার সেই কথাটা তাহার মনে পড়িল। মায়ের হাতে রচিত এই বাণী তাহার চোখের উপর অহরহ সে জাগাইয়া রাখিবে।

বারো

শিবুর মায়ের কথাই থাকিল।

সাত-আনির বাঁড়ুজ্জে-বাবুদের কাছারি-ঘর একদিনের জন্য উন্মুক্ত হইয়া আবার বন্ধ হইয়া গেল। বিষয়-সম্পত্তির বন্দোবস্ত যেমন ছিল, তেমনই রহিল। পরদিন প্রাতঃকালেই শিবুর মা নায়েবকে ডাকিয়া বলিলেন, দেখুন, খরচপত্রের টিপ যেমন ঠাকুরঝি আর আমি সই করছিলাম, তেমনই হবে। শিবু সই করবে না।

রাখাল সিং শুধু বিস্মিতই হইলেন না, একটু বিরক্তও হইলেন ; তিনি দীর্ঘকাল ধরিয়া ঐকান্তিক কামনায় চাহিয়া আসিতেছেন একটি মনিব—যে মনিব নারী নয়, সবল দুঃসাহসী উদার ; যে মনিবের চারিপাশে ঐশ্বর্যের আড়ম্বর থাকিবে, অথচ সে অমিতব্যয়ী হইবে না ; লোকে যাহাকে ভয় করিবে, অথচ দুর্নাম থাকিবে না। এই কিশোর ছেলেটিকে লইয়া তেমনই একটি মনিব গড়িয়া তুলিবার আকাঙ্ক্ষা তিনি এই দীর্ঘকাল ধরিয়া পোষণ করিয়া আসিতেছেন। তিনি হইবেন তাহার মন্ত্রী, উপদেষ্টা, অপরিজ্ঞাত পরিচালক। শৈলজা-ঠাকুরানীর এই বন্দোবস্তে তাঁহার মনের আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণের সম্ভাবনায় তাঁহার উৎসাহ এবং আনন্দের আর পরিসীমা ছিল না। তাই শিবুর মায়ের এই বিপরীত আদেশে তিনি বিরক্ত না হইয়া পারিলেন না, এবং সে বিরক্তি তাঁহার ভ্রূকুটি-ভঙ্গিমায় আত্মপ্রকাশ করিল। ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সিংহ প্রশ্ন করিয়া বসিলেন, কেন ? কাল বাবু কাছারিতে বসলেন, প্রজারা সব জেনে গেল, তাদের জমিদার নিজে কাজকর্মের ভার নিলেন—

বাধা দিয়া মা বলিলেন, শিবুর এখনও কাজকর্মের ভার নেবার বয়েস হয় নি সিং মশায়, তার পড়াশুনার সবই বাকি। এই তো, পরীক্ষার খবর বেরুলেই তাকে বাইরে পড়তে যেতে হবে।

রাখাল সিং একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, বাবুকে কি আরও পড়াবেন নাকি ?

হাসিয়া মা বলিলেন, পড়বে না ? না পড়লে মানুষ হবে কি করে সিং মশায় ? শিবুকে আমি এম. এ. পর্যন্ত পড়াব। মূর্খ জমিদারের ছেলে তাকে যেন কেউ না বলে।

অন্তরের বিরক্তি আর গোপন করিতে না পারিয়া রাখাল সিং বলিয়া ফেলিলেন, তা হলে বিষয়-সম্পত্তি রক্ষা করা দায় হয়ে উঠবে মা।

কেন ?

যে রকম দিনকাল পড়েছে, তাতে শক্ত মালিক না হলে বিষয়-সম্পত্তি কারও থাকবে না মা।

মা হাসিয়া বলিলেন, আমরা স্ত্রীলোক বলে আপনি ভয় করছেন ?

মাথা চুলকাইয়া নায়েব বলিলেন, তা একটু করছি বইকি মা।

পিসীমা একমনে রামায়ণের একটি পৃষ্ঠাই এতক্ষণ ধরিয়া পড়িতেছিলেন, তিনি আর বোধ হয় থাকিতে পারিলেন না। বইখানা বন্ধ করিয়া উঠিয়া বলিলেন, তুমি বুঝতে পারছ না বউ, সিং মশায় ভাল কথাই বলছেন। এই বিষয়-সম্পত্তি, বাড়ির মান-সম্ভ্রম কীর্তি-বৃত্তি—এ বজায় রাখা কি স্ত্রীলোকের কাজ, না, চাকর-বাকরের কাজ ?

দৃঢ় অথচ মিষ্ট কণ্ঠে শিবুর মা বলিলেন, সব বজায় থাকবে ঠাকুরঝি।

বিস্মিত হইয়া ভ্রাতৃজায়ার মুখের দিকে চাহিয়া শৈলজা-ঠাকুরানী বলিলেন, তুমি রাখতে পারবে ? তোমার সাহস হচ্ছে ?

অবিচল কণ্ঠে মা বলিলেন, পারব, সে সাহস আমার আছে।

মুহূর্তে শৈলজা-ঠাকুরানীর একটা অদ্ভুত রূপান্তর ঘটিয়া গেল, আক্রোশ-ভরা স্থির দৃষ্টিতে ভ্রাতৃজায়ার মুখের দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন, তা হলে এতদিন আমি তোমার হাত থেকে সব কেড়ে নিয়ে রেখেছিলাম, বল।

শিবুর মা বলিলেন নায়েবকে, আমরা স্ত্রীলোক বলে আপনাকে ভয় করে কাজ করতে হবে না। ঠাকুরঝি রয়েছেন, আমি রয়েছি, সব দায়িত্ব আমাদের। যান, কাজকর্ম দেখুন গিয়ে এখন।

ক্ষুদ্র ঘটনাটির এমন একটি তিক্ত পরিণতির সম্ভাবনায় রাখাল সিংও অস্বস্তি এবং শঙ্কা বোধ করিতেছিলেন. তিনি অনুমতি পাইবামাত্র যেন স্থানত্যাগ করিয়া পলাইয়া বাঁচিলেন।

শৈলজা-ঠাকুরানী এবার কঠোরতর স্বরে প্রশ্ন করিলেন, কথার আমার জবাব দাও বউ।

শিবুর মা বলিলেন, দোব। সিং মশায় নায়েব হলেও তাঁর সামনে জবাব কি আমি দিতে পারি ভাই ? সম্পত্তি তোমার বাপের, শিবু তোমার বাপের বংশধর, অধিকার তোমার যে আমার চেয়ে অনেক বেশি। তুমি কেড়ে কেন রাখবে ভাই, তোমার ভার তুমিই নিয়েছিলে, এখন যদি তুমি ভয় কর, আমি তোমার পেছন থেকে তোমায় সাহায্য করব, এই কথাই বলছি।

ভ্রাতৃজায়ার মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া শৈলজা-ঠাকুরানী বলিলেন, মিষ্টি কথাটা তুমি বেশ শিখেছিলে বউ। যাক এখন আমার উত্তর শোন, এককালে সম্পত্তি আমার বাপের ছিল, কিন্তু আজ সে সম্পত্তি তোমার ছেলের। তোমার ছেলে বলেই তো আজ আমার কথার ওপর তুমি কথা চালালে !

আমি তো অন্যায় কথা কিছু বলি নি ঠাকুরঝি। আমি বলছি, শিবুর লেখাপড়া

শেখা দরকার। সে দেশের কাছে মান্যগণ্য হোক, বিদ্বান হোক—সেটা কি তুমি চাও না?

আমি কি চাই, না চাই, সে জেনে তো কোন লাভ নেই ভাই। আমি তো তোমাদের একটা পোষ্য ছাড়া আর কিছু নই।—কথাটা বলিতে বলিতেই শৈলজা-ঠাকুরানী স্থানত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। এই অভিমান তাঁহার অমোঘ অস্ত্র। তাঁহার এই সর্বহারা জীবনে একটি সম্পদ অটুট অক্ষয় ছিল, তাঁহার অভিমান কোনদিন অবহেলিত হয় নাই। তাঁহার বাপ ভাই এককালে সহস্র ক্ষতি বরণ করিয়া তাঁহার অভিমান রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহাদের অবর্তমানে শিবুর মা তাঁহার সকল অধিকার শৈলজা-ঠাকুরানীর চরণে বিসর্জন দিয়াও সে অভিমান বজায় রাখিয়া আসিতেছেন। কিন্তু আজ সন্তানের ভবিষ্যৎ লইয়া মতদ্বৈধের মধ্যে আপনার অধিকার কোনমতেই বিসর্জন দিতে পারিলেন না। শৈলজা-ঠাকুরানী চলিয়া গেলেন, তিনিও অবিচলিত চিত্তে ভাঁড়ার ঘরে প্রবেশ করিয়া আপন কার্যে মনোনিবেশ করিলেন।

মামী!—পাচিকা রতন একটা বাটি হাতে ঘরে ঢুকিয়া ডাকিল, মামী!

কে, রতন? কি চাই, তেল?

আর একটু পেলে ভাল হয়; না হলেও ক্ষতি নেই। একটা কথা বলছিলাম।

কি, বল।

ধীরে-সুস্থে মানিয়ে ওর মত করালেই পারতে। রাগ-রোষ করবে।

কেন রতন, আমি কি শিবুর মা নই?

রতন অপ্রস্তুত হইয়া গেল; শুধু অপ্রস্তুতই নয়, বিস্মিতও হইল। একটু পরে ঈষৎ হাসিয়া বলিল, মামীরও তা হলে রাগ হয়!

শিবুর মা কোন উত্তর না দিয়া নীরবে রতনের বাটিতে খানিকটা তেল ঢালিয়া দিলেন। ঠিক এই সময়েই নিত্য বাহিরে ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া ডাকিল, পিসীমা! পিসীমা!

কেহ উত্তর দিল না। মা বাহির হইয়া আসিয়া বলিলেন, কি রে নিত্য?

নিত্য বলিল, নায়েববাবুতে আর কেষ্ট সিং চাপরাসীতে তুমুল ঝগড়া লাগিয়েছে মা।

কে? কার সঙ্গে ঝগড়া করছে?—পিসীমা এবার বাহির হইয়া আসিলেন।

আজ্ঞে, নায়েববাবুতে আর কেষ্ট সিং চাপরাসীতে।

ঝগড়া? কিসের? কেন, বাড়ির কি মাথা-ছাতা কেউ নেই মনে করেছে নাকি?

পিসীমা গম্ভীর মুখে বাহির হইয়া গেলেন, নিত্যও অভ্যাসমত তাঁহার পিছনে পিছনে ছুটিল।

পিসীমা কাছারি-বাড়িতে আসিয়া দেখিলেন, রাখাল সিং এবং কেষ্ট সিং উভয়েই লজ্জিত নত মস্তকে নীরবে বসিয়া রহিয়াছে। বারান্দার মধ্যস্থলে একখানা চেয়ারের উপর ক্রুদ্ধ আরক্তিম মুখে গম্ভীরভাবে বসিয়া আছে শিবু। মুহূর্তে পিসীমা সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়া লইলেন, পুলকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্যাপার কি রে শিবু?

গম্ভীর মুখেই শিবু উত্তর করিল, কিছু না পিসীমা, তুমি বাড়ি যাও। যা ব্যবস্থা করবার আমি করছি।

নিতান্ত অকারণে ঝগড়া।

রাখাল সিং ক্ষুব্ধ মনে কাছারিতে আসিয়া ভাবিতেছিলেন, এখানে আর কাজ করা উচিত নয়। মালিক যেখানে থাকিয়াও নাই, সেখানে কাজ করার অর্থ হইতেছে —নিজেকে অকারণে বিপন্ন করা। একটা ফৌজদারী দাঙ্গা বাধিলে সেখানে মর্যাদা বজায় থাকে না; এ বাড়ির কর্তৃত্ব স্ত্রীলোকের হাতে বলিয়া সর্বদা শঙ্কিত হইয়া থাকিতে হয়; এমন কি, মৌখিক আস্ফালনে কেহ চোখ রাঙাইয়া গেলেও সকল ক্ষেত্রে তাহার প্রত্যুত্তর দিবার উপায় পর্যন্ত নাই। এখানে কাজ করা আর উচিত নয়।

ঠিক এই সময়েই কেষ্ট সিং আসিয়া বলিল, হুকুম দেন নায়েববাবু, রূপলাল বাগদীকে আমি গলায় গামছা বেঁধে নিয়ে আসব।—উত্তেজনায় ক্রোধে সে উদ্যতফণা সাপের মত ফুলিতেছিল।

নায়েবের মুখ নিদারুণ বিরক্তিতে বিকৃত হইয়া উঠিল, তাঁহার ইচ্ছা হইল, এখনই এই মুহূর্তে কাজে জবাব দিয়া আসিবেন।

কেষ্ট সিং উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল, বেটা বাগদী আজ ভোরে আমাদের কালীসায়ের পুকুরে আট-দশ সের একটা মাছ মেরেছে। খবর পেয়ে বেটার বাড়ি গিয়ে দেখলাম, উঠোনে বড় বড় মাছের আঁশ পড়ে রয়েছে। আমি তাকে ধরে নিয়ে আসছিলাম, বেটার মনিব বেণী চাষা—সে এসে আমাকে আইন দেখায়, বলে, চুরি করে থাকে—থানায় খবর দাও, তুমি ধরে নিয়ে যাবার কে? হুকুম দেন, রূপো বেটাকে গলায় গামছা দিয়ে নিয়ে আসব। আর বেণী চাষার আমাদের খাসখামারে গাছ কোথায় আছে দেখুন, কাটব।

নায়েব বলিলেন, হুকুম দিতে পারব না বাপু, তুমি মালিকের কাছে যাও।

কই, দাদাবাবু কই? তাঁর কাছে যাই আমি।

মা-পিসীমার কাছে যাও। কালকের ব্যবস্থা সমস্ত রদ হয়ে গিয়েছে। বাবু এখন পড়তে যাবেন কলকাতা, মা-পিসীমার হুকুমমতই সংসার চলবে।

কেষ্ট সিং কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল, বেশ, আমি আর কাজকম্ম করব না মশায়, আমার মাইনে-পত্তর মিটিয়ে দেন।

নায়েব এবার অকারণে ক্রুদ্ধ হইয়া চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, তা আমাকে কি বলছ হে বাপু, যাও না, মালিকদের কাছে গিয়ে বল না।

কেষ্ট সিংও এবার ক্রোধভরে বলিয়া উঠিল, মালিকের কাছে কেন যাব আমি? আমি চাপরাসী, আপনি নায়েব, আমি আপনাকে বললাম, মালিকের কাছে যেতে হয়, জজসাহেবের কাছে যেতে হয়, আপনি যান। দেন, আমার মাইনে মিটিয়ে দেন।

হুঙ্কার দিয়া রাখাল সিং বলিলেন, আমিও আর চাকরি করব না হে বাপু, তুমি আমাকে চোখ রাঙাচ্ছ কি?

কেষ্ট সিং সমানে গলা চড়াইয়া বলিল, সে কথা আমাকে বলছেন কি মশায়? সে কথা আপনি মালিককে বলুন গিয়ে।

নিত্য-ঝি আসিয়াছিল শ্রীপুকুরের ঘাটে, সে চিৎকার শুনিয়া কৌতূহলভরে কাছারিতে উঁকি মারিয়া দেখিল, নায়েব ও কেষ্ট সিং আরক্ত নেত্রে দুই যুদ্ধোদ্যত পশুর মত গর্জন করিতেছে। সে ছুটিয়া বাড়ির দিকে চলিয়া গেল।

নায়েব তক্তাপোশে একটা প্রকাণ্ড চাপড় মারিয়া বলিল, সে কথা তুমি আমাকে বলবার কে হে? জান, তুমি চাপরাসী, আমি নায়েব?

মেঝেতে লাঠিটা ঠুকিয়া কেষ্ট সিং বলিল, আলবত বলব, একশো বার বলব। আমাকে বললেই বলব।

ঠিক এই সময়েই শিবু কাছারিতে প্রবেশ করিল। তাহার মুখ চিন্তান্বিত, অতিমাত্রায় ধীর গতি, দৃষ্টি স্বপ্নাতুর; অন্তরলোকের যে রথীর ইঙ্গিতে জীবন-রথ পথ বাহিয়া ছুটিয়া চলে, সে রথী যেন মন-তুরঙ্গের বল্গারজ্জু সংযত করিয়া স্থির হইয়া এক স্থানে দাঁড়াইয়া আছে। সকালেই সে গিয়াছিল তাহাদের সমাজ-সেবক-সমিতির একটি অধিবেশনে। গতবর্ষায় অনাবৃষ্টির জন্য দেশে ফসল নাই, পুষ্করিণীতে জল নাই, বৈশাখের প্রারম্ভেই গ্রীষ্মের নিদারুণ প্রখরতায় দেশটা যেন পুড়িয়া যাইতেছে। সমাজ-সেবক-সমিতির অনেকদিন হইতেই একটি দরিদ্র-ভাণ্ডার খুলিবার সঙ্কল্প আছে, কিন্তু কার্যে পরিণত করিবার মত উদ্যোগ কোন দিন হয় নাই। এবার আগামী দুই-এক মাসের মধ্যেই দুর্ভিক্ষ আশঙ্কা করিয়া কয়েকজন বয়স্ক নেতা এই অধিবেশন আহ্বান করিয়াছিলেন।

অধিবেশন হইতে ফিরিবার পথে শিবু ভাবিতেছিল একটা কবিতার কথা। পদ্যপাঠের কবিতা, কোন ইংরেজী কবিতার অনুবাদ। এক নিরুদ্দিষ্ট সন্তানের মাতা

এক পৃথিবীপর্যটককে ব্যাকুল আগ্রহে তাঁহার সন্তানের সন্ধান জিজ্ঞাসা করিতেছেন। মা বলিতেছেন, আমার সন্তান নগণ্য নয়, পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের মেলার মধ্যেও তাহাকে চেনা যায়।

পর্যটক বর্ণনা করে নানা মহামানবের কথা, বক্তার কথা বলে। মা বলেন, না, সে নয়।

পর্যটক বলে, এক মহাযুদ্ধের মধ্যে এক মহাবীরকে আমি দেখেছি—। মা বলেন, না, সে নয়, সে নয়।

ঈশ্বরের ধ্যানমগ্ন এক সন্ন্যাসী, মুখে স্বর্গীয় জ্যোতি—

না, সেও নয়।

তবে? চিন্তা করিয়া পর্যটক বলে, এক দ্বীপে কুষ্ঠাশ্রমে দেখেছি এক মহাপ্রাণকে, তিনি ওই রোগীদের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছেন; তাঁকেও সে ব্যাধি আক্রমণ করতে ছাড়ে নি, তবু তাঁর ক্লান্তি নেই, বিরক্তি নেই।

ব্যাকুল আগ্রহে মা বলিলেন, সেই—সেই—সেই আমার সন্তান।

সমাজ-সেবক-সমিতির আবেষ্টনের মধ্যে কবিতাটি অকস্মাৎ মনে পড়িয়া গিয়াছে। তাহার ইচ্ছা হইল, হেডমাস্টার মহাশয়ের নিকট গিয়া মূল কবিতাটি কাহার জানিয়া কবিতাটি একবার পড়িবে। কিন্তু কাছারিতে প্রবেশ করিয়াই এই কোলাহলের আঘাতে তাহার চিন্তাধারা ছিন্ন হইয়া গেল, মুহূর্তে সে যেন সচেতন হইয়া উঠিল, তাহার মন-তুরঙ্গ যেন কশাঘাতে চকিত হইয়া বাতাসের বেগে ছুটিল।

কি, হয়েছে কি সিং মশায়? নায়েববাবুর মুখের ওপর তুমিই বা এমন চিৎকার করছ কেন কেষ্ট সিং?

রাখাল সিং এবং কেষ্ট সিং উভয়েই মুহূর্তে নির্বাক হইয়া গেল। উভয়েই খুঁজিতেছিল, কেন তাহারা বিবাদ করিতেছিল, কারণটা কি?

শিবু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল, কি, ব্যাপারটা কি? বাড়ির ইজ্জত-মর্যাদা আপনারা সব ডুবিয়ে দেবেন নাকি?

সতীশ চাকর তাড়াতাড়ি কাছারি-ঘর খুলিয়া একখানা চেয়ার বাহির করিয়া দিয়া বলিল, আজ্ঞে ঝগড়া যে কি, তা ওঁরাই জানেন; উনিও বলছেন, আমি কাজ করব না; কেষ্ট সিংও বলছে, আমি চাকরি করব না।

আরক্তিম গম্ভীর মুখে শিবু প্রশ্ন করিল, কেন?

সকলেই নীরব, কেহই এ কথার জবাব দেয় না। ঠিক এই অবসরেই পিসীমা আসিয়া আরক্তিমমুখ শিবুকে দেখিয়া পুলকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্যাপার কি রে শিবু?

শিবু উত্তর দিল, কিছু না পিসীমা, তুমি বাড়ি যাও। যা ব্যবস্থা করবার আমি করছি।

রাখাল সিং এবার বলিলেন, আমাদের দুজনেরই দোষ মা। মিছিমিছি খানিকটা বকাবকি হয়ে গেল। তা এমন হয়, মন তো সব সময় ঠিক থাকে না মানুষের।

পাচিকা রতন কখন আসিয়াছিল, কেহ লক্ষ্য করে নাই; সে বলিল, শিবু, নায়েববাবু কেষ্ট সিং দুজনেই পুরনো লোক, ওঁদের দোষ-ঘাট হলে তার বিচার করবেন পিসীমা। তুমি ওতে হাত দিও না, তুমি বরং বাড়ি এস।

শিবু, পিসীমা, নায়েব, কেষ্ট সিং সকলেই রতনের কথায় আকৃষ্ট হইয়া দেখিলেন, কথা রতনের নয়, রতনের পিছনে ঈষৎ অবগুণ্ঠন টানিয়া দাঁড়াইয়া শিবুর মা।

শৈলজা-ঠাকুরানীই বিচার করিলেন। উদ্ধত প্রজা বেণী মণ্ডল এবং রূপলাল বাগদীর অন্যায় আচরণের শাস্তিমূলক ব্যবস্থাও তিনি করিলেন। কিন্তু বাড়ি ফিরিলেন রুদ্ধমুখ অগ্নিগর্ভ আগ্নেয়গিরির মত রূপ লইয়া। অগ্ন্যুদ্গার নাই, কিন্তু অসহনীয় উত্তাপ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। জ্যোতির্ময়ী—শিবুর মা যে কৌশলে তাঁহার মাথায় সর্বময় কর্তৃত্বের কণ্টক-মুকুট পরাইয়া দিয়া তাঁহাকেই লঙ্ঘন করিয়া চলিয়া আসিয়াছেন, তাহাতে সমস্ত অন্তর ক্ষোভে ক্রোধে পুড়িয়া গেলেও মুখে সে ক্ষোভ, সে ক্রোধ প্রকাশ করিবার পথ ছিল না।

অপরাহ্নে তিনি ভ্রাতৃজায়াকে ডাকিয়া বলিলেন, দেখ বউ, কিছুদিন থেকেই মনে মনে সঙ্কল্প করেছি, কিন্তু বলি নি, বলতে পারি নি। তুমি বুদ্ধিমতী হলেও ছেলেমানুষ, তার ওপর বাড়ির বউ ছিলে। এখন তুমি একটু ভারিক্কিও হয়েছ, আর এখন তুমি শিবনাথের মা। তুমি নিজে এবার বিষয়-সম্পত্তি বেশ চালাতে পারবে। আমাকে ভাই এইবার ছেড়ে দাও, আমি কাশী যেতে চাই।

জ্যোতির্ময়ী অল্পক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন, বেশ, তা হলে আমাকেও নিয়ে চল। আমিও তোমার সঙ্গে যাব।

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া শৈলজা-ঠাকুরানী বলিলেন, তুমি কোথায় যাবে আমার সঙ্গে?

ম্লান হাসি হাসিয়া জ্যোতির্ময়ী বলিলেন, না গেলে আমি এখানে কার ভরসায় থাকব?

কি, কি, কি বললে তুমি বউ?—শৈলজা-ঠাকুরানী গর্জন করিয়া উঠিলেন, এতবড় অমঙ্গলের কথা তুমি বললে! কার ভরসায় তুমি থাকবে? একা শিবু তোমার শত পুত্রের সমান, শতায়ু হয়ে বেঁচে থাক্ সে; তুমি বলছ, কার ভরসায় থাকবে?

শিবু এখনও ছেলেমানুষ, তার ওপর সাত-আট বছর এখন তাকে বিদেশে থাকতে হবে, সেইজন্যে বলছি ভাই। এ সম্পত্তি তো আমার চালাবার ক্ষমতা নেই।

খুব আছে। তুমি নিজে কাল বলেছ, তোমার সে ক্ষমতা আছে, আজ আমি দেখেছি, তোমার সে ক্ষমতা আছে।

জ্যোতির্ময়ী চুপ করিয়া রহিলেন। ননদের প্রকৃতির সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল; তিনি বুঝিলেন, এইবার অগ্ন্যুদ্গার আরম্ভ হইবে এবং অগ্নি নিঃশেষে বাহির হইয়া গেলেই সব শান্ত হইবে।

শৈলজা-ঠাকুরানী বলিলেন, তুমি নিজের জেদ বজায় রাখবার জন্তে নিজে গিয়ে কাছারি-বাড়িতে দাঁড়ালে! ছি ছি ছি! তোমার একটু সমীহ হল না! জান, তুমি কে? আজ দাদা থাকলে কি হত, তুমি জান?

মৃদুস্বরে জ্যোতির্ময়ী এবার বলিলেন, আমার দোষ আমি স্বীকার করছি ঠাকুরঝি।

দোষ স্বীকার করিলে, বিশেষত অপরাধীর মত নতমস্তকে দোষ স্বীকার করিলে, সে দোষ লইয়া আর মানুষকে দণ্ড দেওয়া যায় না; কিন্তু শৈলজা-ঠাকুরানীর মনের ক্ষোভ তখনও মিটে নাই। কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া তিনি আবার আরম্ভ করিলেন, দোষ তোমার নয়, দোষ আমার। তোমার ঘরে তোমার বিষয়ে আমার কর্তৃত্ব করতে যাওয়া আমারই দোষ। আমি নির্লজ্জ, আমি বেহায়া, তাই এত কথার পরেও আজ নায়েব-চাপরাসীর ঝগড়ার কথা শুনে আমি দেখতে গেলাম, কেন, কিসের জন্তে ঝগড়া! তুমি শিবুকে উঠিয়ে নিয়ে এলে। কেন, আমি যখন সেখানে উপস্থিত রয়েছি, তখন শিবু অন্যায় বিচার করবে, এমন ভয় তোমার হল কেন? লেখাপড়া! লেখাপড়া না শিখলে যেন—

তাঁহার বাক্যস্রোতে বাধা পড়িল। নায়েব রাখাল সিং হন্তদন্ত হইয়া আসিয়া বলিলেন, পিসীমা! তাঁহার হাতে একখানা লালরঙের খাম।

জ্যোতির্ময়ীর দৃষ্টি প্রথমেই সেখানার উপর পড়িয়াছিল, তিনি শঙ্কিত কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, ওটা কি সিং মশায়? টেলিগ্রাম?

হ্যাঁ মা। আমি তো পড়তে জানি না, পিওনটা বললে, বাবু পাস হয়েছে ফার্স্ট ডিভিশনে। সে দাঁড়িয়ে আছে বকশিশের জন্তে।

মুহূর্তে শৈলজা-ঠাকুরানী ভ্রাতৃজায়াকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, লক্ষ্মী লক্ষ্মী—আমার লক্ষ্মী তুমি বউ। শিবু তোমার ছেলে, আমার বাপের বংশের মুখ উজ্জ্বল করলে।

জ্যোতির্ময়ীর চোখ দিয়া জল পড়িতেছিল, তিনি সজল চক্ষে হাসিমুখে বলিলেন, শিবু কই, শিবু?

নিত্য-ঝি ছুটিয়া উপরে শিবুর পড়ার ঘরের দিকে চলিয়া গেল, আমি খবর দিয়ে আসি দাদাবাবুকে, বকশিশ নোব দাদাবাবুর কাছে।

বকশিশ শব্দটা কানে আসিতেই পিওনের কথাটা জ্যোতির্ময়ীর মনে পড়িয়া গেল, তিনি বলিলেন, পিওনকে কি দেওয়া হবে ঠাকুরঝি?

একটা টাকাই ওকে দিয়ে দিন সিং মশায়।

দুড়দুড় শব্দে সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া শিবু নীচে আসিয়া ছোঁ মারিয়া টেলিগ্রামখানা লইয়া খুলিয়া পড়িল, পাস্‌ড ইন দি ফার্স্ট ডিভিশন, মাই বেস্ট ব্লেসিংস—রামরতন।

শিবুর উচ্ছ্বাস যেন বাড়িয়া গেল। সে বলিল, মাস্টার মশায়—আমার মাস্টার মশায় টেলিগ্রাম করেছেন পিসীমা। রামরতন—রামরতন লেখা রয়েছে।

মাস্টার—আমাদের মাস্টার?—বিস্মিত হইয়া পিসীমা প্রশ্ন করিলেন, মাস্টার কলকাতা গেল কি করে?

জ্যোতির্ময়ী বলিলেন, কোন কাজে গিয়া থাকবেন হয়তো।

পিসীমা বলিলেন, টাকা দিলে তো মাস্টার নেবে না, তাকে আমি সোনার চেন আর ঘড়ি দোব এবার। সে গরিব মানুষ, তবু খবরটা পেয়ে খরচ করে টেলিগ্রাম করেছে তো!

আমি গোঁসাই-বাবাকে খবর দিয়ে আসি পিসীমা। আমার বাইসিক্লটা? নিত্য, ছুটে গিয়ে বল তো কাছারিতে আমার বাইসিক্লটা বের করতে। আমার জামা?

শিবু তাড়াতাড়ি আবার উপরে উঠিয়া গেল।

শৈলজা-ঠাকুরানী বলিলেন, ঠাকুরদের সব পুজো দিতে হবে বউ, বাবা বৈদ্যনাথের পুজোর টাকাটা এখুনি কাপড় ছেড়ে তুলে ফেলি। আর সব দেবতার পুজো, সে তো কাল ভিন্ন হবে না।

জ্যোতির্ময়ী বলিলেন, বৈশাখ মাস, গ্রামের ঠাকুর-দেবতার সব সন্ধ্যেয় শীতল-ভোগের ব্যবস্থা কর না ঠাকুরঝি।

বেশ বলেছ বউ, ও কথাটা আমার মনেই ছিল না। আর তোমার মত বুদ্ধি আমার নেই, সে কথা মন খোলসা করে স্বীকার করছি ভাই।

জামা গায়ে দিয়া শিবু নামিয়া আসিয়া বলিল, আমার বন্ধুদের কিন্তু ফীস্ট দিতে হবে। তিরিশ টাকা লাগবে, তারা সব হিসেব করে রেখেছে।—বলিতে বলিতেই সে বাহির হইয়া গেল। পিসীমা পূজার টাকা পৃথক ভাগে চিহ্নিত করিয়া রাখিয়া দিয়া বাহিরে আসিয়া বলিলেন, আমার পাগলী বউমা আজ বাড়িতে নেই ভাই, সে থাকলে তার আবদারটা একবার দেখতে! সেও হয়তো বলত, আমাকে এই দিতে হবে, ওই দিতে হবে!

জ্যোতির্ময়ী কোন উত্তর দিলেন না, শুধু একটু স্নেহের হাসি হাসিলেন। রতন অগ্রসর হইয়া আসিয়া বলিল, মামীমা, এইবার কিন্তু বউকে নিয়ে এস বাপু, বউ না হলে আর ঘর মানাচ্ছে না। বউও তো আর নেহাত ছোটটি নেই, এগারো বছর বোধ হয় পার হল।

শৈলজা-ঠাকুরানী বলিলেন, একখানা চিঠি লেখ তো ভাই বউ। এই বোশেখ মাসেই আমার বউ পাঠিয়ে দিতে হবে।

জ্যোতির্ময়ী তাঁহার অভ্যাসমত হাসি হাসিয়া বলিলেন, কাল লিখব ঠাকুরঝি।

শৈলজা-ঠাকুরানী বিরক্ত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, তোমার ওই হাসি দেখে সময় সময় আমার রাগ ধরে ভাই বউ। কেন, কাল লিখবে কেন? আজ লিখলে দোষটা কি শুনি?

জ্যোতির্ময়ী বলিলেন, শিবুর এখন পড়ার সময়, বউমাও এখন ছেলেমানুষ; থাকুক না, সে আরও কিছুদিন। আর আমরা তো বউমাকে পাঠাই নি ভাই, তাঁরাই নিয়ে গেছেন জোর করে। পাঠিয়ে তাঁরাই দেবেন নিজে থেকে।

শৈলজা-ঠাকুরানী বলিলেন, সে কথা সত্যি। কিন্তু—। কথাটা না বলিয়াই তিনি চুপ করিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পর আবার বলিলেন, বেশ, বউমাকে আমার শিবুর পাসের খবরটা দাও। লিখে দাও, বাবা বিশ্বনাথের কাছে যেন পুজো দেয়। আর কিছু টাকা—পঁচিশটা টাকা তাকে পাঠিয়ে দাও। তার দিদিমার যেন টাকার অভাব নেই, কিন্তু আমাদের বউ তো।

সত্য-সত্যই শৈলজা-ঠাকুরানীর চিত্ত আজ ছোট্ট নাতির জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। আশ্চর্যের কথা, নাতি চোখের সম্মুখে থাকিলে সামান্য ত্রুটিতে তাহার উপর রাগ হইয়া যায়, কিন্তু চোখের আড়ালে গেলে শিবনাথের বধূর উপর তাঁহার মমতার আর সীমা থাকে না। মনে হয়, শিবুর বউ একটু আদরিণী চঞ্চলা না হইলে মানাইবে কেন! আর একটু দুরন্ত জেদী অভিমানিনী না হইলে শিবু বশ্যতা স্বীকার করিবে কেন!

প্রখর গ্রীষ্মের রৌদ্রের তেজ তখনও কমে নাই, বাতাস যেন অগ্নিসাগরে স্নান করিয়া বহিয়া আসিতেছে। তাহার মধ্যে শিবু চলিয়াছিল। বাইসিক্লটা বেশ জোরেই চলিতেছিল, কিন্তু শিবনাথের যেন তাহাতেও তৃপ্তি হইতেছিল না। সে রেসের ঘোড়ার জকির মত বাইসিক্লটার উপর গুঁড়ি হইয়া পড়িয়া প্রাণপণে প্যাড্‌ল করিতেছিল। সহজ অবস্থাতেই বাইসিক্ল অথবা ঘোড়ায় চড়িয়া কখনও ধীর গতিতে চলিতে চায় না, দুরন্ত গতিতে অবাধ প্রান্তরে গাড়ি চালাইয়া অথবা ঘূর্ণির মত পাক দিয়া ফেরা তাহার অভ্যাস। সেই অভ্যাসের উপর আজ মনের গতি উৎসাহের আতিশয্যে দুর্নিবার হইয়া উঠিয়াছে।

তাহার মনে পড়িতেছিল হেডমাস্টার মহাশয়ের কথা। যেদিন তাহারা ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিবার জন্য স্কুল হইতে বিদায় গ্রহণ করে, সেদিন তিনি বলিয়াছিলেন, ওয়েল, মাই বয়েজ, আই উইশ ইউ সাক্‌সেস ইন দি একজামিনেশন, গুড লাক ইন লাইফ! আজ দশ বছর ধরে তোমরা এই স্কুলটির মধ্যে খাঁচার পাখির মত বন্দী হয়ে ছিলে, আজ তোমাদের পাখায় উপযুক্ত বল সঞ্চিত হয়েছে, কণ্ঠে স্বর-লয়-তান পেয়েছে; তাই তোমাদের পৃথিবীর বুকে মুক্তি দিচ্ছি। সম্মুখে তোমাদের বিশ্ববিদ্যালয়, সেখানে গিয়ে

তোমরা কৃতকার্য হও। গ্রামকে জেনেছ, দেশকে জান, পৃথিবীকে জান, আপন জীবনের পথ করে নাও। তারপর হাসিয়া আবার বলিয়াছিলেন, তোমরা আর বয়েজ থাকবে না, এবার জেণ্টল্‌মেন—জেণ্টল্‌মেন অ্যাট লার্জ হবে।

সে এখন জেণ্টল্‌ম্যান, বালক নয়, কিশোর নয়, জেণ্টল্‌ম্যান—ভদ্রলোক, সর্বত্র একটি সম্মানের আসন তাহার জন্য নির্দিষ্ট হইয়া গিয়াছে। গাড়িটার দ্রুতবেগহেতু উভয় পার্শ্বের পারিপার্শ্বিক সনসন করিয়া পিছনের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে, ভাল করিয়া কিছু দেখা যায় না। কিন্তু শিবুর মনে হইল, সকল লোক সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া আছে। সহসা আপনা হইতেই গতিবেগ শিথিল হইয়া আসিল। একটা বিপন্ন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া গাড়ির উপর সে সোজা হইয়া বসিল। তাহার বধূকে মনে পড়িয়া গিয়াছে—নাস্তি, গৌরী। সে থাকিলে আজ বিস্ময়ে পুলকে বার বার তাহার দিকে অবগুণ্ঠনের অন্তরাল হইতে সহাস্য দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিত। সে নিশ্চয় বলিত, হ্যাঁ, ও পাস করতে পারত কিনা, আমার পয়ে পাস হয়েছে। তাহাকে আজ একখানা চিঠি দিতে হইবে। মন আবার চকিত হইয়া উঠিল, শুধু নাস্তিকে নয়, অনেক জায়গায় চিঠি দিতে হইবে। যেখানে যত—

হো সবুজ গাড়িকা আসোয়ার!—পিছন হইতে কাহার কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিল, হো সবুজ গাড়িকা আসোয়ার!

শিবু হাসিয়া ব্রেক কষিল। কমলেশ, এ কমলেশ ছাড়া আর কেহ নয়। কমলেশ ও তাহার গাড়ি একসঙ্গে আসিয়াছিল, কমলেশের গাড়ির রঙ চকোলেট রঙের, তাহার গাড়ির রঙ সবুজ। কমলেশ পিছনে পড়িলে ওই বলিয়াই হাঁক দেয়। বেচারা কমলেশ নাস্তিকে লইয়া এই বিরোধের পর হইতে তাহাদের বাড়িতে যাইতে পারে না। আর তাহারও কেমন বাধ-বাধ ঠেকে।

সশব্দে কমলেশের গাড়িখানা পাশে আসিয়া থামিল। শিবু সহাস্যে বলিল, শুনেছ?

নিশ্চয়। নইলে পলাতক আসামীকে এমনই ভাবে ধরার জন্যে ছুটি! তারপর এমন ঊর্ধ্বশ্বাসে চলেছ কোথায়?

দেবীমন্দিরে। মাকে প্রণাম করে আসি, গোঁসাই-বাবাকে প্রণাম করে আসি।

চল।

চলিতে চলিতে কমলেশ বলিল, চল না, দিন কতক বেড়িয়ে আসি। মামা এসেছেন কিনা, তিনি বললেন, যাও না, শিবুকে নিয়ে কাশী ঘুরে এস না দিন কতক।

শিবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, বলতে পারছি না এখন।

এতে ভাববার কি আছে?

অনেক। সে পরে হবে এখন।—বলিতে বলিতেই সে গাড়ি হইতে নামিয়া পড়িল। দেবীর স্থানে তাহারা আসিয়া পড়িয়াছে। কমলেশও নামিয়া পড়িল।

নিবিড় জঙ্গলে ঘেরা আশ্রম—বহুকালের প্রাচীন তন্ত্রসাধনার স্থান। রামজী সাধু সদাপ্রজ্বলিত ধুনির সম্মুখে একটি ছোট বাঁধানো আসনের উপর বসিয়া ছিলেন। দেবীমন্দিরের পূজক পুরোহিত কয়েকজন পাশে বসিয়া গল্প করিতেছিল। শিবু ঝড়ের মত আসিয়া বলিল, গোঁসাইবাবা, আমি পাস হয়েছি, ফার্স্ট ডিভিশনে পাস হয়েছি।

সাধু মুহূর্তে আসন ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িয়া শিবুকে শিশুর মত বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, জিতা রহো বেটা, বাবা হামার।

শিবু বলিল, ছাড়, তোমাকে প্রণাম করি। মাকে প্রণাম করি।

সন্ন্যাসী আশীর্বাদ করিয়া দেবীর আশীর্বাদী বিল্বপত্রের মালা শিবুর গলায় পরাইয়া দিয়া বলিলেন, বাস্, এখুন আপনা কাজ করো বেটা, বাপ-দাদাকে গদ্দিমে বৈঠো, জিমিদারি দেখো, দুষ্ট্‌কে দমন করো, শিষ্ট্‌কে পালন করো।

কমলেশ মৃদু মৃদু হাসিতেছিল। শিবু আরক্তিম মুখে সন্ন্যাসীকে বলিল, এখন আমি পড়ব গোঁসাই-বাবা।

হাঁ! বাহা বাহা, বেটা রে হামার! উ তো ভাল কথা রে বাবা। তা তুমার জিমিদারি কৌন্ চালাবে বাবা?

এখনই আমার জমিদারি দেখবার সময় হয়েছে নাকি?

হা-হা করিয়া হাসিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন, আরে বাপ রে বাপ রে! এখুনও তুমি ছোট আছ বাবা? জানিস রে বাবা, আকব্বর বাদশা বারো বরষ উমরসে হিন্দুস্থানকে রাজ চালায়েছেন। লিখাপঢ়িভি না শিখিয়েছিলেন আকব্বর শা। তবভি কেতনা লড়াই উনি জিতলেন, তামাম হিন্দুস্থান উনি জয় করিয়েছিলেন।

কমলেশ বলিল, ছত্রপতি শিবাজীও লেখাপড়া জানতেন না।

করজোড়ে নমস্কার করিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন, আরে বাপ রে, মহারাজ শিউজী—মায়ী ভবানীকে বরপুত্র। জিজ্জাবাই মা-ভবানীকে সহচরী—জয়া কি বিজয়া কোই হবে। হিন্দুধরমকে উনি রাখিয়েছেন রে বাবা। হামার পণ্টন যব পুনামে ছিলো ভাই, তখুন দেখিয়েছি হামি উন্‌কে কীর্তি।

শিবু বলিল, আজ সন্ধ্যেবেলায় কিন্তু যেতে হবে, লড়াইয়ের গল্প বলতে হবে।

সন্ন্যাসী সৈনিকের মত ভঙ্গিতে বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইয়া হাঁকিয়া উঠিলেন, টানান্‌শান।

কমলেশ হাসিয়া বলিল, অ্যাটেন্‌শন।

শিবু মুখ না ফিরাইয়াই বলিল, জানি। সে মুগ্ধ দৃষ্টিতে সন্ন্যাসীর বীরভঙ্গিমার দিকে চাহিয়া ছিল। সন্ন্যাসী আবার হাঁকিলেন, রাট বাট ট্রান। সঙ্গে সঙ্গে রাইট অ্যাবাউট

টার্ন করিয়া হাসিয়া বলিলেন, সন্ঝাতে কুইক ম্রাচ করিয়ে যাবে হামি বাবা। এখুন তুমি লোক কুইম ম্রাচ করো। এহি বাজল বিউগল। মুখে তিনি অতি চমৎকার বিগ্‌লের শব্দ নকল করিতে পারেন। কিন্তু বিগ্‌ল বাজানো আর হইল না, তিনি বিস্মিত হইয়া কাহাকে প্রশ্ন করিলেন, আরে আরে, তুমি কাঁদছিস কেনে মায়ী ?

শিবু ও কমলেশ বিস্মিত হইয়া পিছন ফিরিয়া দেখিল, একটি প্রৌঢ়া নিম্নজাতীয়া স্ত্রীলোক পিছনে দাঁড়াইয়া নিঃশব্দে কাঁদিতেছে। কমলেশ ব্যগ্রভাবে প্রশ্ন করিল, ফ্যালার মা, কাঁদছিস কেন তুই ?

ফ্যালা কমলেশের বাড়ির মাহিন্দার, গোরুর পরিচর্যা করে। ফ্যালার মা কমলেশকে দেখিয়া ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল, ওগো বাবু গো, ফেলা আমার সরদ-গরম হয়ে মাঠে পড়ে রইছে গো। ওগো, গোঁসাই-বাবাকে বলে দাও একবার গাড়িখানি দিতে।

অনেক প্রশ্ন করিয়া বিবরণ জানা গেল, ফ্যালা কমলেশদেরই আদেশক্রমে মাটির জালা আনিবার জন্য তিন ক্রোশ দূরবর্তী গ্রামে কুমোর-বাড়ি গিয়াছিল, ফিরিবার পথে সহসা অসুস্থ হইয়া এই দেবীমন্দিরেরই অনতিদূরে জ্ঞানশূন্যের মত পড়িয়া আছে। সংবাদ পাইয়া বিধবা মা ও তরুণী পত্নী সেখানে গিয়াছিল, কিন্তু ফ্যালার মত জোয়ানকে তুলিয়া আনিবার মত সাধ্য তাহাদের হয় নাই। তাই পুত্রবধূকে সেখানে রাখিয়া সে এই নিকটবর্তী দেবীস্থানেই ছুটিয়া আসিয়াছে। ফ্যালার মা কমলেশের পা দুইটি জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া কহিল, ওগো বাবু, তুমি গোঁসাই-বাবাকে বলে দাও গো।

কমলেশকে বলিতে হইল না, সন্ন্যাসী বলিলেন, আরে হারামজাদী বেটী, তু কানছিস কেনে ? চল্, কাঁহা তুমার লেড়কা, হামি দেখি।—বলিয়া নিজেই বলদ দুইটা খুলিয়া গাড়িতে জুতিয়া ফেলিলেন।

শিবু বলিল, দাঁড়াও গোঁসাই-বাবা, কতকগুলো খড় দিয়ে দিই। বাঁশগুলো বেরিয়ে আছে, পিঠে লাগবে যে।

প্রকাণ্ড জোয়ান, মাটিতে পড়িয়া আছে একটা সদ্য-কাটা গাছের মত। মাথার শিয়রে তরুণী বধূটি ভয়ে উদ্বেগে মাটির পুতুলের মত বসিয়া আছে। মধ্যে মধ্যে রোগী অনুনাসিক সুরে চাহিতেছে, জঁল।

চারিদিকে লাল কাঁকরের প্রান্তর ধুধু করিতেছে। বৈশাখের—বিশেষ করিয়া এ বৎসরের নিদারুণ গ্রীষ্মের উত্তাপ মানুষের দেহেরও জলীয় অংশ শোষণ করিয়া লইতেছে। কোথাও জলের চিহ্ন নাই। সন্ন্যাসী বলিলেন, কাঁহাসে জল আনলি রে মায়ী।

বধূটি নীরব হইয়া রহিল, ফ্যালার মা বলিল, আজ্ঞে, জল কোথা পাব বাবা ?

শিবু তিরস্কার করিয়া বলিল, ওখানে বললি না কেন যে, জল খেতে চাচ্ছে? যাই আমি সাইক্লে করে নিয়ে আসি।

সন্ন্যাসী আঙুল দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তব ও জল কাঁহাসে আইলো রে? ওহি যে মাটি ভিঁজা!

উ মাথায় বমি করেছে। আখের রস খেয়েছে কিনা, এই রোদে মেতে উঠেছে প্যাটে। তাই তুলে ফেলিয়েছে। মাটেও যেয়েছে কবার মাথায়।

ফ্যালা অসাড়ের মত পড়িয়াই কহিল, চাঁর-বাঁর। হাতখানা তুলিয়া বুড়া আঙুলটা মুড়িয়া চারিটা আঙুল মেলিয়া ধরিল, কিন্তু পরক্ষণেই হাতখানা আপনি এলাইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল।

হাঁ, বমিভি হইয়াছে!—সন্ন্যাসী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, হায় হায় বেটা, এতনা বড়া বীর, এক পরশমে—আঃ, হায় হায় রে!

জল—শিবু বাইসিক্লের ব্রেক কষিয়া নামিয়া জলপাত্রটা বাড়াইয়া দিল।

ফ্যালা আকুল আগ্রহে দুই হাত বাড়াইয়া চাহিল, জঁল জঁল, দেঁ দেঁ, আঁমাকে দেঁ।

মায়ের হাত হইতে পাত্রটা কাড়িয়া লইয়া ঢকঢক করিয়া জল পান করিতে আরম্ভ করিল। সে তৃষ্ণা যেন মিটিবার নয়, ওই দগ্ধ প্রান্তরের তৃষ্ণার মত যেন একখানা মেঘ সে নিঃশেষে পান করিতে পারে।

ফ্যালার মা বলিল, এইবারে উঠতে পারবি বাবা ফ্যালা? আস্তে আস্তে গাড়িতে ওঠ্ দেখি।

শিবু ও কমলেশ একসঙ্গেই বলিয়া উঠিল, না না, আমরা ধরি, উঠিস্ নি তুই।

মুহূর্তে সন্ন্যাসী তাঁহার বিশাল বাহু প্রসারণ করিয়া পথরোধ করিয়া বলিলেন, রহো। হাম দেতা হ্যায়। অবলীলাক্রমে ফ্যালার বিশাল দেহখানি দুই হাতে শিশুর মত গাড়িতে উঠাইয়া দিলেন। তারপর বলিলেন, তুমি গাড়ি নিয়ে যেতে পারবি রে ফ্যালাকে মায়ী?

একটু লজ্জিতভাবেই ফ্যালার মা বলিল, তা পারব আজ্ঞে, আমরা ছোটনোকের মেয়ে।

সন্ন্যাসী গম্ভীরভাবে শিবু ও কমলেশকে বলিলেন, বাড়ি চলে যাও তুমি লোক। উসকে মত্ পরশ করো।

কেন?

কলেরা হয়েছে উসকো বেটা।

কলেরা? তবে তুমি ছুঁলে যে?

হাসিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন, হামি যে সন্ন্যাসী রে বেটা। হামি যদি মর্ যাই, তব কৌন্ ক্ষতি হোবে রে বেটা? কৌন্ দুখ পাবে?

শিবুর চোখ মুহূর্তে জলে ভরিয়া উঠিল। সে মুখ ফিরাইয়া লইয়া সঙ্গে সঙ্গে বাইসিক্লের প্যাড্‌লে পা দিল। সন্ন্যাসী ডাকিলেন, শুন রে, এ বাবা হামার, শুন শুন।

শিবু পিছন ফিরিয়াই অপেক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সন্ন্যাসী বলিলেন, নেহি রে বাবা, হামি যায়কে খুব গরম পানিসে সব ধো দেবে—আচ্ছা কর্কে, থোড়া চুন দেকে মর্দন কর্ দেবে। উসকে বাদ ভস্‌ম ডলেগা অঙ্গমে।

শিবু ও কমলেশ আশ্চর্য হইয়া গেল। স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের কথা তাহাদের মনে পড়িয়া গেল।

শিবু ঘাড় নাড়িয়া বলিল, তুমি তা হলে মিছে কথা বল, তুমি নিশ্চয় লেখাপড়া জান।

হা-হা করিয়া হাসিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন, লেখাপঢ়ি—ক খ, ইংরি এ বি—উ হামি জানে না রে বেটা। ই সব হামি পল্টনমে শিখিয়েছিলো বেটা।

শিবু বাইসিক্লে উঠিতে উঠিতে বলিল, যেও সন্ধ্যেবেলা।

মাফ করো বাবা। আজ হামি যাবে না।

শিবু আপত্তি করিতে যাইতেছিল, কিন্তু কমলেশ বলিল, আজ সন্ধ্যেতে আমাদের সমিতির সকলকে আবার ডাকলে হয় না?

ঠিক কথা। শিবুর মন উদ্যমে ভরিয়া উঠিল। সে সানন্দে সন্ন্যাসীকে বলিল, তা হলে কাল।

সন্ন্যাসী নিষ্কৃতি পাইয়া যেন বাঁচিয়া গেলেন। মরণের স্পর্শ—তাহাকে কি বিশ্বাস আছে, যদি কোথাও কোনখানে একবিন্দু লুকাইয়া থাকে! গেলেই তো শিবু ঝাঁপ দিয়া বুকে আসিয়া পড়িবে। দেবীর আশ্রমে প্রবেশ করিয়া তিনি হাঁকিলেন, আরে ভোলা, লে আও তো থোড়াসে চুনা। আওর গরম পানি বানাও তো এক কলস।

ভোলা দাঁতে দাঁত ঘষিয়া আপন মনেই বলিল, দেখ, বেটা শেয়ালমারার খেয়াল দেখ। এই গরমে এক কলস গরম পানি!

সন্ন্যাসী অপর একজনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, এ ভাগনা শিরপত, বানাও তো ভাই আচ্ছা তরেসে এত ছিলম গাঁজা।

চৌদ্দ

পরদিন প্রভাতেই শোনা গেল, ফ্যালা ডোম মারা গিয়াছে। এইখানেই শেষ নয়, রাত্রেই আরও দুইজন আক্রান্ত হইয়াছে—ফ্যালার সেই তরুণী বধূটি এবং অপর বাড়ির একজন।

শুধু এই গ্রামই নয়, জেলার চারিদিকে মহামারীর আক্রমণ নাকি শুরু হইয়া গিয়াছে। এই প্রখর গ্রীষ্মের ইতিহাস, ভয়াবহ কাহিনীর মত মানুষের মনে আজও গাঁথিয়া আছে। প্রভাত না হইতেই আকাশে দ্বাদশ সূর্যের উদয়; মনে হয়, উত্তাপে ধরিত্রী যেন চৌচির হইয়া ফাটিয়া যাইবে। কোথাও একবিন্দু সবুজের চিহ্ন নাই, দিগন্ত পর্যন্ত প্রান্তর তৃণশূন্য, রক্তাভ মাটি উত্তাপে যেন আরও লাল হইয়া উঠিয়াছে। যেন কোন তৃষ্ণার্ত রাক্ষসী আকুল তৃষ্ণায় তাহার বিরাট জিহ্বাখানা মেলিয়া ধরিয়াছে। অন্নহীন, জলহীন দেশ। মহামারী আগুনের মত যেন প্রান্তরের শুষ্ক তৃণদল দগ্ধ করিয়া এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত চলিয়াছে।

ফ্যালার মা বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদিতেছিল। দাওয়ার এক দিকে রোগাক্রান্ত বধূটি ছটফট করিতেছে। ফ্যালার দশ-বারো বছরের ছোট ভাইটা আঁচলে কতকগুলা মুড়ি লইয়া চিবাইতে চিবাইতে বলিতেছিল ওই বধূটিকে, শালীর নেকামো দেখ, ঘর-দুয়ার সব ময়লা করে ফেলালে। উঠে উঠে ঘাটে যা বলছি, হারামজাদী।

শিবু আসিয়া উঠানে দাঁড়াইল। কমলেশ এবং সমাজ-সেবক-সমিতির অন্য ছেলেরা এখন স্কুলে গিয়াছে—মর্নিং স্কুল। শিবুকে দেখিয়াই ফ্যালার মা তারস্বরে কাঁদিয়া উঠিল, ওগো বাবু আমার কি হবে? পোড়া প্যাটের ভাত কি করে জুটবে গো?

শিবু সান্ত্বনা দিয়া বলিল, ভয় কি ফ্যালার মা, ভগবান আছেন, তিনিই ব্যবস্থা করবেন।

ওগো, আজ কি খাব বাবুমাশায় গো? ঘরে যে চাল নাই।

আজই চাল নাই! শিবু স্তম্ভিত হইয়া গেল, একদিনের আহারের মত সম্পদও নাই ইহাদের!

ফ্যালার মা বিনাইয়া বিনাইয়া কান্নার মধ্যেই বলিতেছিল, ঘরে যে কয়টি চাল ধান ছিল, সেগুলি সব বেচিয়া দুইটি টাকা দিতে হইয়াছে ফ্যালার শববাহকদের। বাঁচিয়াছিল মাত্র আনা চারেক পয়সা, তাহার দুই আনা লইয়াছে ফ্যালার বড় ভাই, আর দুই আনা লইয়াছে ওই ছোট ছোঁড়াটা। এ নাকি তাদের প্রাপ্য ভাগ। আর ঘরে যখন কলেরা হইয়াছে, তখন মদ না খাইলেই তাহারা বাঁচিবে কিসের জোরে?

শিবু ছোট ছোঁড়াটাকে চোখ রাঙাইয়া বলিল, দে, পয়সা মাকে দে; ভাত জুটছে না, মদ খাবে হারামজাদা!

ছোঁড়াটা তড়াক করিয়া লাফ দিয়া ছুটিয়া পলাইয়া গেল। ওদিকে বধূটি কাতর স্বরে চিৎকার করিয়া উঠিল, জল, ওগো, একটু জল দাও গো। মেয়েটির স্বর এখনও অনুনাসিক হয় নাই। তাহার হাতে একটা শূন্য ভাঁড়। ভাঁড়টায় জল দেওয়া হইয়াছিল, সে জল ফুরাইয়া গিয়াছে।

শিবু বলিল, একটু জল দে ফ্যালার মা।

ওগো, আমার হাত-পা সব প্যাটের ভেতর ঢুকেছে গো। আমি খাব কি মা গো?

তার ভাবনা তোকে ভাবতে হবে না। খাবার চালের আমি ব্যবস্থা করে দোব।

শিবু!

শিবু চমকিত হইয়া ফিরিয়া দেখিল, পিছনে দাঁড়াইয়া তাহার পিসীমা, সঙ্গে কেষ্ট চাপরাসী ও নায়েব।

তুমি কেন এলে পিসীমা? আমি যাচ্ছি।

যাচ্ছি নয়, এখুনি আয়, আমার সঙ্গে আয়।

এখুনি? আচ্ছা, চল।—শিবু আর আপত্তি করিল না, শৈলজা-ঠাকুরানীর পিছনে পিছনে বাড়ির দিকে পথ ধরিল। পথে ওদিক হইতে একটা লোক চিৎকার করিতে করিতে আসিতেছে, খা খা খা, ডারকৌয়ো ডাকছে বাবা। লে লে, খেয়ে লে। খা খা। তারপরই একটা বিকট হাসি—হা-হা-হা।

ওপাড়ার ভদ্রবংশের সন্তানই একজন, বিকৃতমস্তিষ্ক গাঁজাখোর। কলেরা আরম্ভ হইয়াছে শুনিয়া পরমানন্দে মাতিয়া উঠিয়াছে। তাই এমনই 'খা খা' করিয়া চিৎকার করিতে করিতে চলিয়াছে। শিবুদের সঙ্গে দেখা হইতেই তাহার কৌতুক যেন বাড়িয়া গেল। শিবুরা অতিক্রম করিতেই পিছন হইতে সে আবার চিৎকার করিয়া উঠিল; খা খা, লে, সব বাবুদিগে খা। নির্বংশ করে খা বাবা।

পিসীমা শিহরিয়া উঠিলেন, শিবু হাসিল। বিরক্ত হইয়া পিসীমা বলিলেন হাসছিস যে তুই বড়? ডাক তো কেষ্ট সিং, ওকে।

বাধা দিয়া শিবু বলিল, না। বলুক না, বললেই কি কিছু হয় সংসারে?

কিন্তু তুই ওদের বাড়িতে গেলি কেন?

বাড়িতে গেলেই বা, তাতে কি হল? রোগ তো ছুটে এসে ধরে না।

তুই জানিস?

জানি। আমি পড়েছি বইয়ে। জিজ্ঞেস করো গোসাই-বাবাকে, নাড়লেও কিছু হয় না, যদি সাবধান হয় মানুষ।

আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিয়া পিসীমা বলিলেন, তুই কি রুগী ঘেঁটেছিস নাকি?

হাসিয়া শিবু বলিল, না। কিন্তু গোঁসাই-বাবা কাল ফ্যালাকে কোলে করে তুলেছিল। তারপর চুন দিয়ে ফুটন্ত জলে শরীর ধুয়ে ফেললে। ওদের পল্টনে সব শিখিয়েছিল কিনা।

পিসীমা এ কথার কোন উত্তর দিলেন না, নীরবে চলিতে চলিতে বলিলেন, দেখ দেখি অলুক্ষণে ডাক—খা খা। ভদ্রলোকের ছেলে!

দেখ মা, দেখ, ওই এক ভদ্দনোক—ভদ্দনোকের ছেলে, আবার তোমার ছেলেও ভদ্দনোকের ছেলে। ছেরজীবী হোক মা, সোনার দোত-কলম হোক মা, কে গরিবের বেপদে এমন করে গিয়ে দাঁড়ায়, বল?

ওই ফ্যালার মা। তাহাকে পিছনে আসিতে দেখিয়া পিসীমা বলিলেন, তুই কোথায় যাবি?

আজ্ঞেন, বাবু বললেন, চাল দেবেন।

আসতে হবে না, আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি এখুনি।

ফ্যালার মা ফিরিতেই পিসীমা বলিয়া উঠিলেন, আমি গলায় দড়ি দোব শিবু, নয় পাথর দিয়ে মাথা ঠুকে মরব।

শৈলজা-ঠাকুরানী কঠিন জেদ ধরিয়া বসিলেন, বল্ তুই, আমার পায়ে হাত দিয়ে বল্, এমন করে রোগের মাঝখানে যাবি না।

শিবু চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার কানে এখনও বাজিতেছে, ছেরজীবী হোক মা, সোনার দোত-কলম হোক, কে এমন করে গরিবের বেপদের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ায়, বল? উহারা কি এমনই করিয়াই মরিবে? উঃ, কি কঠিন, কি ভীষণ মৃত্যু!

শৈলজা-ঠাকুরানী বলিলেন, বল্, আমার পায়ে হাত দিয়ে বল্।

শিবু এবার উত্তর দিল, ওতে কিছু হয় না পিসীমা। গেলেই কিছু ক্ষতি হয় না।

পিসীমা দারুণ আক্রোশভরা কণ্ঠে বলিলেন, বড়লোকের মা হবেন, বড়লোকের মা হবেন, বড়লোকের মা হবেন! রত্নগর্ভা আমার! আমি জানি না কিছু, যা মন হয় মায়ে-পোয়ে করুক।

তিনি আরও কি বলিতে যাইতেছিলেন, এই সময়ে রাখাল সিং আসিয়া বলিলেন, কি বিপদ করলেন দেখুন দেখি বাবু! একশো লোক এসে হাজির হয়েছে, বলে, আমরা চাল নোব। গাঁয়ে কোথাও আমাদের খাটতে নেয় নি। বাবু আমাদের খেতে দেবে।

পিসীমা শিবুকে বলিলেন, ওই শোন্, ওদের পাড়াতে ব্যামো হয়েছে বলে কেউ ওদের খাটতে নেয় নি। আর তুই ওদের বাড়িতে যাবি?

শিবু কোন উত্তর না দিয়া বাহিরের দিকে চলিয়া গেল। পিসীমা কাতরভাবে

রাখাল সিংহের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, এ আমি কি করব বলুন তো সিং মশায় ? ওকে আমি কেমন করে ধরে রাখি ?

রাখাল সিং মাথা চুলকাইয়া বলিলেন, তাই তো মা, এ তো মহাসঙ্কটের ব্যাপার ! মহামারী, আর কিছু নয় !

শৈলজা বলিলেন, আপনি ঘরদোরের ব্যবস্থা করুন সিং মশায়। আমি কালই এখান থেকে বউ আর শিবুকে নিয়ে অন্য কোথাও সরে যাব। সদরের শহরেই না হয় বাড়ি ভাড়া করে থাকব কিছুদিন।

এ প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া রাখাল সিং বলিলেন, আজ্ঞে হ্যাঁ, এ বেশ ভাল যুক্তি।

জ্যোতির্ময়ী আসিয়া দাঁড়াইল। শৈলজা দেবী সহসা অত্যন্ত মিনতির সুরে বলিলেন, তুমি যেন আর 'না' কোরো না বউ, শিবুকে নিয়ে না পালালে আর উপায় নেই।

বেশ, তোমার যখন সাহস হচ্ছে না, তখন আমিই বা কোন্ সাহসে থাকতে বলব, বল। এখন যে লোকগুলি এসেছে, ওদের কি—? কথা অসমাপ্ত থাকিলেও ইঙ্গিতে কথাটা সম্পূর্ণ এবং সুসমাপ্ত।

শৈলজা বলিলেন, দিতে হবে বইকি। দোরে যখন এসেছে, শিবুর নাম করে যখন এসেছে, তখন না দিলে চলে? শতখানেক লোক বললেন না সিং মশায়? আড়াই মণ চাল দাও বের করে।

সতীশকে ও নিত্যকে চালগুলি বহিয়া আনিতে বলিয়া পিসীমা কাছারি-বাড়িতে আসিয়া দেখিলেন, শুধু বিপন্ন দরিদ্র অস্পৃশ্যের দলই বসিয়া নাই, বারান্দায় একদল ছেলে শিবুকে কেন্দ্র করিয়া জটলা করিতেছে। কমলেশ আসিয়াছে, এমন কি যাত্রা-থিয়েটার-পাগল কায়স্থদের চুলওয়ালা ছেলেটি আসিয়াছে। পাড়ার দশ-বারো বছরের শ্যামুও আসিয়া বসিয়া আছে। ওই চুলওয়ালা যাত্রা-পাগল ছেলেটিই তখন বলিতেছিল, তা একখানা গান-টান বাঁধ, নইলে ভিক্ষে করবে কি বলে, হরিবোল বলে নাকি ?

ভিক্ষে ? ভিক্ষে কিসের শিবু ?

এই এদের খাওয়াবার জন্যে ভিক্ষে করব পিসীমা।

ভিক্ষে করতে হবে না, আমি ওদের চাল দিচ্ছি।

সে তো আজ দিলে, কিন্তু একদিন দিলেই তো হবে না। এখন কদিন দিতে হবে কে জানে ! তাই প্রত্যেক বাড়িতে আমরা ভিক্ষে করব।

সতীশ ও নিত্য চাল লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল, কহিল, চাল কোথায় রাখব ?

শিবু মুহূর্তে একটা কাণ্ড করিয়া বসিল, সে আপনার কোঁচার কাপড়টা খুলিয়া প্রসারিত করিয়া দিয়া বলিল, দাও পিসীমা, এতেই দাও। তুমিই দাও প্রথম ভিক্ষে।

নিতান্ত সাধারণ সামান্য ঘটনা, কিন্তু পিসীমার মনে, জানি না কেমন করিয়া, অতি অসাধারণ অসামান্য হইয়া উঠিল, একটা ভাবের আবেশে যেন তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল, তিনি নীরবে কম্পিত হস্তে পাত্র উজাড় করিয়া চাল শিবুর প্রসারিত বস্ত্রাঞ্চলে ঢালিয়া দিলেন।

ছোট্ট শ্যামু, তাহাকেও বোধ করি ভাবাবেগের ছোঁয়াচ লাগিয়া গেল, সে পুলকে হাততালি দিয়া উঠিল, জয় পিসীমার জয়!

সমবেত ছেলেরাও একবার জয়ধ্বনি দিয়া উঠিল।

পিসীমা বাড়ি ফিরিলেন এক অদ্ভুত অবস্থায়। নিতান্ত অবসন্ন অসহায়ের মত, কিন্তু মনে কোন ক্ষোভ নাই, ক্রোধ নাই।

বউ, শিবু যে যাবে, এমন বলে তো মনে হয় না ভাই।

যাবে বইকি ; তুমি বললে যাবে না, এ কি হয়?

যাবে না ভাই। তুমি বললেও যাবে না। আর মন্দ কাজও তো শিবু আমার করছে না। লক্ষ্মীজনার্দনের চরণোদক আর আশীর্বাদী এনে রাখো তো ভাই ; স্নান করলে ওর মাথায় দিতে হবে।

অপরাহ্নের দিকে গ্রামের অবস্থা ভয়াবহ হইয়া উঠিল। আরও চারজনের ব্যারাম হইয়াছে। ডোমপাড়া হইতে বিস্তৃত হইয়া আসিয়া মুচীপাড়া ও বাউরীপাড়ায় সংক্রামিত হইয়াছে। শিবু একটু গা-ঢাকা দিয়াই পাড়াটার মধ্যে ঘুরিয়া আসিল। সমস্ত পাড়াটা স্তব্ধ, লোক নীরবে কলের পুতুলের মত কাজ করিতেছে। মুচীপাড়ায় দুইজন, বাউরী-পাড়ায় একজন, ডোমপাড়ায় নূতন একজন। ডোমের সেই বধূটি এখনও বাঁচিয়া আছে, যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছে আর চিৎকার করিতেছে, জল—জল!

বাড়িতে কেহ নাই, বুড়ী ফ্যালার মা তাহার অপর দুইটি ছেলেকে লইয়া পলাইয়াছে। মেয়েটি বিছানা হইতে গড়াইয়া দাওয়ার ধুলায় আসিয়া পড়িয়াছে—ধূলিধূসরিত দেহ, আলুলায়িত চুল ধুলায় ধুলায় রুক্ষ পিঙ্গল। শিবুর চোখে জল আসিল।

জল! ওগো বাবু, একটুকুন জল দ্যান গো মাশায়! জল!—তৃষ্ণার্ত জিহ্বা বাহির করিয়া সে জল চাহিল। শিবু ভাবিতেছিল, জল—জল কোথায় পাওয়া যায়? কে পিছন হইতে তাহাকে আকর্ষণ করিয়া ডাকিল, এস, তুমি পালিয়ে এস, নইলে চললাম আমি পিসীমার কাছে।

তাহার অনুচর বাড়ির মাহিন্দার শম্ভু বাউরীর মা। শম্ভুরা আজ তিন পুরুষ

তাহাদের বাড়ির চাকর। শম্ভুর মাও তাহাদের বাড়ির এঁটোকাঁটা পরিষ্কার করে। তাহাকে এ পাড়ায় ঘুরিতে দেখিয়া প্রৌঢ়া ছুটিয়া তাহাকে ধরিয়া লইয়া যাইতে আসিয়াছে। শিবু যেন একটা উপায় পাইল। সে বলিল, শম্ভুর মা, একটু জল আন্ দেখি।

না, তুমি পালিয়ে এস। নইলে আমি পিসীমার কাছে যাব।

আগে তুই জল আন্, তবে যাব।

তুমি ওই ওকে ছোঁবা নাকি?

না রে না, তুই আন্ তো।

শম্ভুর মা চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরই একটা মালসা ভরিয়া জল লইয়া ফিরিয়া নিজেই দাওয়ার উপর খানিকটা দূরে নামাইয়া দিয়া মেয়েটাকে বলিল, ওই খা, রইল জল। তারপর শিবুকে কহিল, এইবারে বাড়ি চল দেখি।

শিবু দাওয়ায় উঠিয়া মালসাটি মেয়েটির কাছে সরাইয়া দিল। তারপর শম্ভুর মায়ের সহিত যাইতে যাইতে বলিল, এত দূরে দিলে খাবে কি করে?

বেশ আসবে গড়াগড়ি দিয়ে। তুমি কিন্তু আচ্ছা বট বাপু! হেই মা রে! পরানে ভয়-ডর নাই গো! আবার দাঁড়ালে কেনে?

মেয়েটা পশুর মত মুখ ডুবাইয়া মালসায় চুমুক দিতেছে। শিবু ফিরিতে ফিরিতে বলিল, পিসীমাকে যেন বলিস নি।

শ্রীপুকুরের ঘাটের দরজা দিয়া কাছারিতে প্রবেশ করিয়াই শিবু দেখিল, একজন কন্স্টেব্‌ল ও তাহার পিছন পিছন দুইটি যুবক ওদিকের সদর-রাস্তার দরজা দিয়া কাছারিতে প্রবেশ করিতেছে। কন্স্টেব্‌লটি শিবুকে সেলাম করিয়া বলিল, এহি বাবুলোক আসিয়েসেন। দারোগাবাবু আপকে পাশ ভেঁজিয়ে দিলেন।

আপনি শিবনাথবাবু?—অপেক্ষাকৃত বয়স্ক যুবকটি সম্মুখে আসিয়া প্রশ্ন করিল।

কৌতূহলী হইয়া শিবনাথ বলিল, আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনারা কোথায় এসেছেন?

আমরা মেডিক্যাল স্টুডেণ্ট, ভলাণ্টিয়ার হয়ে এসেছি। আপনাদের এখানে কলেরার কাজ করব।

মেডিক্যাল ভলাণ্টিয়ার! শিবু আশায় উদ্দীপনায় সাহসে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। কোথেকে আসছেন?

আপাতত সিউড়ী থেকে; এসেছি আমরা কলকাতা থেকে। আপনাদের ডিস্ট্রিক্ট-বোর্ডের চেয়ারম্যান ডিস্ট্রিক্টে কলেরার ওআর্ক করবার জন্যে একটা অ্যাপীল দিয়েছিলেন কাগজে। আমরা তাই এসেছিলাম। আজ সকালে এখানকার খবর

পেয়ে আমাদের এখানে পাঠিয়ে দিয়েছেন। থানায় উঠেছি আমরা, সাব-ইন্‌স্পেক্টার বললেন, আপনার কাছে সব খবর পাওয়া যাবে। কতজন রোগী এখানে?

এখন ছজন, একজন কাল রাত্রেই মরে গেছে।

চলুন, দেখে আসি।

আমি এই দেখে আসছি।

আচ্ছা, আমাদের একবার দেখিয়ে দেবেন চলুন।

একটু কিছু খেয়ে নেবেন না? একটু খাবার আর চা?

খাব বইকি, কিন্তু ফিরে এসে। আগে একবার দেখে আসি, এসে খাব। আমরা কিন্তু আপনার এখানেই থাকব। থানায় থাকতে ভাল লাগছে না।

শিবু পুলকিত হইয়া উঠিল, শুধু পুলকিত বলিলেই ঠিক হয় না, তাহার বুকে ক্ষণপূর্বের সঞ্চারিত আশ্বাস-উৎসাহ দ্বিগুণিত হইয়া উঠিল। সে বলিল, সত্যি এখানে থাকবেন আপনারা?

নিশ্চয়। দুজন লোক পাঠিয়ে দিন তো; না, এই যে সিপাইজী, আমাদের জিনিসপত্রগুলো এখানে পাঠিয়ে দিতে বলবে দারোগাবাবুকে। আমরা এখানেই থাকব। বুঝলে?

কন্‌স্টেব্‌ল চলিয়া গেল। তাহারাও বাহির হইয়া গেল। বাড়ি বাড়ি ঘুরিয়া সর্বশেষে সেই বধূটিকে দেখিতে গিয়া দেখিল, সে কখন গড়াইয়া আসিয়া দাওয়া হইতে নীচে উঠানে পড়িয়া গিয়াছে।

চকিত হইয়া বড় ডাক্তারটি প্রশ্ন করিল, এ বাড়ির লোক?

কেউ নেই, পালিয়েছে।

ডাক্তার আর কথা বলিল না, ক্লেদাক্ত মেয়েটিকে দুই হাতে তুলিয়া সযত্নে বিছানায় শোয়াইয়া দিল। তারপর ছোট ছেলেটিকে বলিল, একটা ইন্‌জেক্‌শন ঠিক কর তো।

তাহারা ইন্‌জেক্‌শন দিতে বসিল, শিবু মাথার শিয়রে বসিয়া সযত্নে তাহার মুখে জল দিতে আরম্ভ করিল। ডাক্তার বলিল, দেখুন, রুগী ঘাটছেন, হাত-টাত যেন মুখে দেবেন না। ওইটুকু সাবধান। বাড়িতে ওষুধ দিয়ে হাত ধুয়ে ফেলতে হবে, কাপড়-চোপড় ওষুধের জলে দিতে হবে।

কাছারি-বাড়িতে ফিরিয়াই শিবু দেখিল, পিসীমা গম্ভীরমুখে দাঁড়াইয়া আছেন। সে তাহা গ্রাহ্যই করিল না, হাসিমুখে বলিল, পিসীমা, এঁরা ডাক্তার, কলকাতা থেকে এসেছেন কলেরার চিকিৎসা করতে, সেবা করতে। উঃ, সে যে কি রকম যত্নের সঙ্গে দেখলেন, কেমন করে যে নাড়লেন ঘাটলেন, সে যদি দেখতে!

তার সঙ্গে তুমিও নাড়লে ঘাটলে তো?

শিবু কিছু বলিবার পূর্বেই ডাক্তার বলিয়া উঠিল, ভয় কি পিসীমা, আমরা ওষুধ দিয়ে হাত-পা ধুয়ে ফেলব। গরম জলে স্নান করব। কাপড়-চোপড় পর্যন্ত ওষুধে ডুবিয়ে দোব। কোনও ভয় করবেন না আপনি।

পিসীমাও পরম আশ্বাসভরে বলিলেন, দেখো বাবা, ও ভারি চঞ্চল। তোমাদের পেয়ে আমার তবু ভরসা হল। তোমার নাম কি বাবা?

আমি সুশীল, আর এর নাম পূর্ণ। আর আপনি আমাদের পিসীমা। আমাদের কিন্তু অনেকটা গরম জল চাই পিসীমা।

পিসীমা দ্রুত বাড়ির দিকে চলিয়া গেলেন। কেষ্ট সিং সতীশ উভয়েই তাঁহার অনুসরণ করিল।

পনেরো

সুশীল মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র। এবার সে শেষ পরীক্ষা দিয়াছে, এখনও ফল বাহির হয় নাই। পূর্ণ পড়ে ক্যাম্পবেল মেডিক্যাল স্কুলে। তাহার পড়া শেষ হইতে এখনও এক বৎসর বাকি। পূর্ণ ছেলেটি বড় শান্ত, প্রায়ই কথা কয় না; কথায় কথায় শুধু একটু মিষ্ট হাসি হাসে। সুশীল তাহার বিপরীত; অদ্ভুত ছেলে, জীবনে পথ চলিতে কোনখানে এতটুকু বাধা যেন তাহার ঠেকে না, কোন কথা বলিতে তাহার দ্বিধা হয় না। শিবনাথের বিবাহ হইয়াছে শুনিয়া তাহার আর বিস্ময়ের সীমা রহিল না; সে বলিয়া উঠিল, শিবনাথবাবুর বিয়ে হয়ে গেছে নাকি? ছি ছি ছি, বলছেন কি?

শিবনাথের লজ্জা হইল। পূর্ণ মুখে একটুখানি মিষ্ট হাসি মাখিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। জ্যোতির্ময়ীও হাসিলেন। কিন্তু পিসীমা রুষ্ট হইয়া উঠিলেন. তিনি বলিলেন, কেন বাবা, ছি ছি কেন? শিবু তো বিয়েই করেছে, বিয়ে তো সংসারে সবাই করে।

সুশীল অপ্রস্তুত হইল না। সে বলিল, এত সকালে বিয়ে দিয়েছেন! শিবনাথ-বাবুর পড়া শেষ হতেই এখনও অনেক দেরি, উপার্জনের কথা দূরে থাক্।

উপার্জন শিবু না করলেও বউয়ের ভরণপোষণ চলবে বাবা। আর তোমাদের ও হাল-ফ্যাশানের ধাড়ী বউ আমাদের সংসারে চলে না।

তা হলেও পিসীমা, বাল্যবিবাহ ভাল নয়। ডাক্তারী শাস্ত্রেও নিষেধ করে।

আমাদের কবিরাজী শাস্ত্রে নিষেধ করে না বাবা। সে মতে গৌরীদান প্রশস্ত।

হা-হা করিয়া হাসিয়া সুশীল বলিল, তর্কে পিসীমা কিছুতেই হারবেন না। তা বেশ, আমাদের বউ দেখান। বউকে বুঝি ঘরের মধ্যে বোরকা এঁটে বন্ধ করে রেখেছেন?

পিসীমার মনের উত্তাপ ইহাতে লাঘব হইল না। তিনি বলিলেন, আমরা কি বোরকা পরে আছি বাবা, না ঘরের দরজা এঁটে আলোর পথ বন্ধ করে রেখেছি যে, বউকে বন্ধ করে রাখব?

জ্যোতির্ময়ী মনে মনে শঙ্কিত হইয়া উঠিতেছিলেন, তিনি তাড়াতাড়ি বলিলেন, বউমা থাকলে তোমরা দেখতে পেতে বইকি বাবা; তিনি এখানে নেই, কাশীতে আছেন।

কাশীতে বিয়ে দিয়েছেন বুঝি?

না না, বউমার দিদিমা কাশী গেছেন, বউমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেছেন। বউমার

বাপের বাড়ি এই গ্রামেই, এই আমাদের বাড়ির পাশেই। ওই যে পাকা বাড়ির মাথাটা দেখা যাচ্ছে, ওইটে।

অ্যাঁ! বলেন কি? এ তো ভারি মজার ব্যাপার! বউ বাপের বাড়ি গেলে শিবনাথবাবু জানালায় দাঁড়িয়ে কথা কইবেন!

মৃদুভাষী পূর্ণ এবার বলিল, অনেকটা বেলা হয়ে গেল; চলুন, একবার রুগী দেখে আসি। আর নতুন কেস হয়েছে কি না খবর নেওয়া দরকার।

কাছারি-বাড়িতে প্রবেশ করিয়াই সপ্রশংসকণ্ঠে বলিল, বাঃ, বেশ ঘোড়াটি তো, বিউটিফুল হর্স! কার ঘোড়া?

সহিস ঘোড়াটায় চড়িয়া ঘুরাইয়া আনিয়া এখন মুখের লাগাম ধরিয়া ঘুরাইতেছিল। শিবু নিয়মিত চড়ে না, অথচ ঘোড়া বসিয়া থাকিলেই বিগড়াইয়া যায়, এইজন্য এই ব্যবস্থা। সুশীলের প্রশ্নের উত্তরে শিবু লজ্জিত হইয়াই বলিল, আমার ঘোড়া। বিবাহ-প্রসঙ্গে সুশীলের মন্তব্য শুনিয়া তাহার মনে হইল, ঘোড়ার অধিকারত্বের জন্যও সুশীল তীক্ষ্ণ মন্তব্য না করিয়া ছাড়িবে না।

সুশীল সবিস্ময়ে বলিল, আপনার ঘোড়া? এই ঘোড়ায় আপনি চড়তে পারেন?

এবার শিবু হাসিয়া উত্তর দিল, পারি বইকি।

ওঃ, আপনি দেখছি গ্রেট ম্যান—ওয়াইফ, ঘোড়া! হোয়াট মোর? আর কি আছে?

শিবু কোন কিছু বলিবার পূর্বেই অহঙ্কৃত কণ্ঠস্বরে কেষ্ট সিং বলিল, আজ্ঞে, বাইসিক্ল আছে, পালকি আছে।

পালকি! ওয়াণ্ডারফুল! মনে হচ্ছে, যেন মোগল-সাম্রাজ্যে চলে এসেছি—ইন্ দি ল্যাণ্ড অ্যাণ্ড পিরিয়ড অব দি গ্রেট মোগল্স্।

সুশীলের কথার মধ্যে শিবনাথ যেন একটা তীক্ষ্ণ আঘাত অনুভব করিতেছিল; সে এবার ঈষৎ উত্তাপের সহিতই জবাব দিল, সে যুগ কিন্তু এই ফিরিঙ্গী যুগের চেয়ে অনেক ভাল ছিল সুশীলবাবু। উই হ্যাড আওয়ার ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ইন দি ল্যাণ্ড অ্যাণ্ড পিরিয়ড অব দি গ্রেট মোগল্স্।

এবার পূর্ণ কথা বলিল, চমৎকার বলেছেন শিবনাথবাবু! এবার জবাব দিন সুশীলদা।

সুশীল হাসিয়া বলিল, বেলা হয়ে যাচ্ছে, আগে চল, রুগী দেখে আসি, তারপর হবে। কিন্তু আপনার আর সব সহচর কই শিবনাথবাবু? আপনি কি একাই আপনাদের সেবক-সমিতি নাকি?

আমি এসেছি শিবনাথদা। কাছারি-ঘরের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল সেই ছোট্ট ছেলেটি—শ্যামু। কাছারি-ঘরের ছবিগুলো দেখছিলাম আমি।

শিবনাথ খুশী হইয়া বলিল, তুই আসবি, সে আমি জানি। তুই একবার সকলকে ডাক দিয়ে আয় তো, চাল তুলতে হবে।

শ্যামু ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল, আমি তোমাদের সঙ্গে যাই না শিবনাথদা ?

সুশীল তাহার পিঠ চাপড়াইয়া বলিল, সেনাপতির আদেশ মান্য করাই হল সৈনিকের সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ। যাও, তোমাদের সেনাপতি যা বলছেন, তাই কর।

কোথায় মড়াকান্না উঠিয়াছে,—কোন্ একটা রোগী মরিয়াছে। বাকি পল্লীটা নিস্তব্ধ। আপন আপন দাওয়ার উপর সকলে বিবর্ণমুখে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছে। পল্লীটার প্রথমেই শম্ভুদের বাড়ি; শিবনাথ প্রশ্ন করিল শম্ভুর মাকে, পাড়া কেমন আছে রে শম্ভুর মা ?

সে কম্পিতকণ্ঠে উত্তর দিল, ওগো বাবু, ভয়ে কাঁপুনি আসছে গো ; বলতে যে লারছি। কাল রেতে আবার ছজনার হইছে গো।

শিবনাথ শিহরিয়া উঠিল, ছজনের ?

সুশীল প্রশ্ন করিল, কেউ মরেছে নাকি ? কাঁদছে—ওই যে ?

তিনজনা মরেছে বাবু। মুচীদের একজনা, বাউরী একজনা, আর ডোমেদের সেই ছেলেটা ; ডোমেরা সব পালিয়েছে বাবু, মড়া ফেলে পালিয়েছে। ঘরেই কুকুরে মড়া নিয়ে ছেঁড়াছিঁড়ি করছে। ওই দেখ কেনে, মাথার ওপর শকুনি উড়ছে, দেখ কেনে !

শম্ভুর মা শিহরিয়া উঠিয়া ভয়ে কাঁদিয়া ফেলিল, কি হবে বাবু ? কি করব বলেন দেখি ? কোথা যাব ?

শিবনাথ চিন্তিতমুখে বলিল, খুব ভয় হচ্ছে তোদের শম্ভুর মা ? এক কাজ কর্, আমাদের বাগানে কালীমায়ের ঘরের পাশে যে ঘর আছে, সেখানে গিয়ে ছেলেপিলে নিয়ে থাক্। কেমন ?

পূর্ণ আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল, শকুনির দল পাক খাইয়া খাইয়া নীচের দিকে নামিয়া আসিতেছে। ঘৃণায় বিকৃতমুখে সে বলিল, কি বিশ্রী ! একেবারে বীভৎস !

সুশীল বলিল, আচ্ছা, ডোমেদের সেই বউটি একা আছে, তাকে জ্যান্ত খেয়ে ফেলবে না তো ? চলুন, তাকেই আগে দেখে আসি।

সমস্ত পল্লীটা জনহীন। দূরে বোধ করি মুচীপাড়ার কান্নার রোল, সে রোলকেও ছাপাইয়া এ পাড়ার একটা বাড়িতে শকুন ও কুকুরের কলহ-কলরব। ফ্যালাদের বাড়ির উঠানেও কয়টা শকুন বসিয়া বসিয়া ওই মেয়েটিকে দেখিতেছে, তাহার মৃত্যু-প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে। মেয়েটি আতঙ্কে বোধ হয় মরিয়াই গিয়াছে।

সুশীল এক লাফে দাওয়ায় উঠিয়া তাহাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া বলিল, বেঁচে আছে। জল, ওয়াটার-বট্‌ল থেকে জল দিন তো শিবনাথবাবু; সাবধান, ওটাতে যেন ছোঁয়া না লাগে।

মেয়েটির সেই ভাঁড়টায় জল ঢালিয়া লইয়া মুখে চোখে জল দিতেই তাহার চেতনা হইল। কিন্তু অলস অর্থহীন দৃষ্টি।

কিছু খেতে দেওয়া দরকার। পূর্ণ, একটু গ্লুকোজ দাও তো।

বাবু! ডাক্তারবাবু!

পাঁচ-সাতজন লোক আসিয়া দাঁড়াইল—অন্য রোগীর বাড়ির লোক।

আমাদের বাড়িতে আসেন মাশায়।

আপনি ওর মুখে একটু একটু করে গ্লুকোজ-ওয়াটার দিন। ভালই আছে, বেঁচে যাবে বলে মনে হচ্ছে। চলো পূর্ণ, আমরা অন্য রুগী দেখি। শিবনাথবাবু, একে একটা পাউডার দিয়ে দেবেন জলের সঙ্গে।

সুশীল উঠিয়া পড়িল, পূর্ণও তাহার অনুসরণ করিল।

শিবনাথ একা বসিয়া তাহার মুখে অল্প অল্প করিয়া জল ঢালিয়া দিতে আরম্ভ করিল। সম্মুখেই খোলা মাঠ, এই প্রাতঃকালেই দিক্‌চক্রবাল ঘোলাটে হইয়া উঠিয়াছে। পৃথিবীর বুক হইতে আকাশ পর্যন্ত বায়ুস্তর ধূলিকণায় পরিপূর্ণ। সহসা সে পায়ে স্পর্শ অনুভব করিয়া চমকিয়া উঠিল। কাতর দৃষ্টিতে মেয়েটি তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আছে, চোখ দুইটি হইতে জলের ধারা গড়াইয়া পড়িতেছে; মেয়েটিই হিমশীতল হাত দিয়া তাহার পা ধরিয়াছে।

শিবনাথ ব্যস্ত হইয়া বলিল, কাঁদছ কেন তুমি? তুমি তো ভাল হয়ে গেছ।

ক্ষীণ কণ্ঠে মেয়েটি বলিল, ওগো বাবু, আমাকে জ্যান্ত খেয়ে ফেলাবে গো!

সে ফোঁপাইয়া উঠিল। সম্মুখে উঠানে তখনও একটা শকুনি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া বসিয়া ছিল।

শিবনাথ বলিল, ওর ব্যবস্থা এখুনি হচ্ছে, ভয় কি তোমার, তোমাকে না হয় ঘরের মধ্যে শুইয়ে দিয়ে যাচ্ছি।

সে শিহরিয়া বলিয়া উঠিল, ওগো না গো, ঘরের ভেতর আঁধার কোণে যদি সে বসে থাকে?

কে?—শিবু আশ্চর্য হইয়া গেল।

সে।

ও। শিবু এতক্ষণে বুঝিল, সে ক্যালার কথা বলিতেছে। অনেক ভাবিয়া সে বলিল, তোমার বাপ-মা কেউ নেই?

আছে, কিন্তুক সংমা বাবাকে আসতে দেবে না বাবু।

তবে? আচ্ছা, ওষুধটা খেয়ে নাও দেখি। হাঁ কর, হ্যাঁ।

শিবনাথ ভাবিতেছিল, কি উপায় করা যায়! মেয়েটিকে আগলাইয়া এখানে থাকা তো সম্ভবপর নয়। তাদের বাড়িতে লইয়া যাওয়াও চলে না।

কি হবে বাবু মাশায়?—মেয়েটির চোখ আবার জলে ভরিয়া উঠিয়াছে।

দেবতার নাম করবে, ভগবানের নাম করলে তো ভূত আসতে পারে না।

মেয়েটি এবার আশ্বস্ত হইয়া বলিল, আমাকে চণ্ডীমায়ের একটুকুন পুষ্প এনে দেবা বাবু? তা হলে আমি খুব থাকতে পারব।

শিবু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, তা দোব এনে। এখন একটা কাগজে রামনাম লিখে তোমার মাথার শিয়রে দিয়ে যাচ্ছি। তুমি ঘরে শোবে চলো।

তাহাকে ঘরে শোয়াইয়া দিয়া, শিবু পকেট হইতে কাগজ পেন্সিল লইয়া রামনাম লিখিয়া দিল। কাগজটি মাথায় ঠেকাইয়া সেটি শিয়রে রাখিয়া দিয়া পরম নিশ্চিন্তে সে চোখ বুজিল। বেচারী শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। শিবু তাহাকে শিশুর মতই বহন করিয়া আনিলেও এই নাড়াচাড়ার পরিশ্রমেই তাহার অবসাদ আসিয়াছে। শিবু দরজাটি ভেজাইয়া বাহির হইয়া আসিল।

বাবু!—মেয়েটি আবার ডাকিল।

কি? আবার ভয় করছে?

না।

তবে?

ঈষৎ লজ্জার হাসি হাসিয়া মেয়েটি বলিল, চারটি মুড়ি দেবা বাবু? বড় ক্ষিদে নেগেছে।

সর্বনাশ! মুড়ি এখন খেতে আছে? ও-বেলায় বরং বার্লি এনে দোব।

সে-বাড়ি হইতে বাহির হইয়াই শিবুর সেই বিকৃতমস্তিষ্ক গাঁজাখোরটির সহিত দেখা হইয়া গেল। সে তখন পাশের বাড়ির উঠানের দলবদ্ধ শকুনির দলকে ঢেলা মারিয়া কৌতুক করিতেছিল। ঢেলা মারিলেই শকুনির দল পাখা মেলিয়া খানিকটা সরিয়া যায়, ঢেলাটা চলিয়া গেলে তাহারা আবার গলা বাড়াইয়া পাখা ফুলাইয়া তাড়া করিয়া আসে।

শিবু হাসিয়া বলিল, কি হচ্ছে?

সে মুখ বিকৃত করিয়া বলিল, আজ্ঞে, বেটাদের ফলার লেগে গিয়েছে। এঃ খেছে দেখুন কেনে! পেটটা ফুটো করে ফেলেছে, ফুটোর ভেতর গলাটা ঢুকিয়ে ঢুকিয়ে খেছে। এঃ!

সত্যই সে দৃশ্য বীভৎস, ভয়াবহ। শিবনাথ চিন্তিতমুখে বলিল, কিন্তু কি করা যায় বলুন দেখি? গ্রামের ভেতরই যে শ্মশান হয়ে উঠল!

কেউ যদি কিছু না বলে, তা হলে আমি মাশায় ফেলে দিতে পারি।

আপনি পারেন?

হ্যাঁ, ঠ্যাঙে দড়ি বেঁধে বেটাকে হুই লাঘাটার ধারে দিয়ে আসব টেনে ফেলে।

আপনি দেবেন?

তা খুব পারি মাশায়। পুঁতে দিতে বলেন, তাও পারি; থাকুক বেটা উঠোনেই গাড়া। কিন্তু শেষে যদি গাঁয়ের লোকে পতিত করে?

আমি যদি আপনার সঙ্গে পতিত হয়ে থাকি?

দেখেন! কই, পৈতে ছুঁয়ে দিব্যি করেন দেখি।

হাসিয়া শিবনাথ পৈতা বাহির করিয়া শপথ করিল। পাগল মহা উৎসাহিত হইয়া বলিল, চলেন তবে, একগাছা দড়ি নিয়ে আসি।

বাউরীপাড়ার মধ্যে প্রবেশ করিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইতেই সুশীল ও পূর্ণের সহিত দেখা হইয়া গেল, তাহাদের সঙ্গে শ্যামুও আসিয়া জুটিয়াছে। একা শ্যামুই, আর কেহ নাই। শিবনাথ সর্বাগ্রে শ্যামুকেই প্রশ্ন করিল, কই রে, আর সব কই?

সুশীল হাসিয়া বলিল, আপনার সৈন্যবাহিনী সব পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছে।

শ্যামু বলিল, প্রায় সব গাঁ ছেড়ে পালাচ্ছে শিবুদা। দেখগে, কমলেশদা আর তার বড়মামা এসে বসে আছেন তোমাদের বাড়িতে। তোমাকেও কাশী যেতে হবে।

শ্যামুও একটু ব্যঙ্গের হাসি হাসিল।

শিবনাথ উত্তপ্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু সে উত্তাপ অন্তরে আবদ্ধ রাখিয়াই সুশীলকে প্রশ্ন করিল, এদিকে সব কেমন দেখলেন?

চিন্তিতমুখে সুশীল বলিল, ক্রমশই গুরুতর হয়ে দাঁড়াচ্ছে শিববাবু, একটা কাজ অবিলম্বে করা দরকার—প্রিভেন্‌শনের ব্যবস্থা। যাদের বাড়িতে রোগ হয়েছে, তাদের সঙ্গে পাড়ার সংস্রব বন্ধ করতে হবে। জল—জলের ছোঁয়াচ আগে বন্ধ করতে হবে। তারা যেন পুকুরে নেমে জল খারাপ করতে না পারে। পুকুরে পুকুরে পাহারা রাখতে হবে। রুগীর বাড়ির প্রয়োজনমত জল তারাই তুলে তাদের পাত্রে ঢেলে দেবে, আর চিকিৎসার জন্যে ইনট্রাভেনাস স্যালাইনের ব্যবস্থাও করতে হবে।

শিবু চিন্তান্বিত হইয়া পড়িল, তাহার সহায় বন্ধুবান্ধব কেহ নাই। একা সে কি করিবে? বুকের মধ্যে বল যেন কমিয়া আসিতেছে। এই এতগুলি লোকের খাদ্য ইহাদের জীবনমরণ-সমস্যার সমাধান সে একা কি করিয়া করিবে?

পাগল নীরবতা ভঙ্গ করিল, দড়ি আন বাবু।

সুশীল প্রশ্ন করিল, দড়ি কি হবে?

উনি ওই মড়াটাকে ফেলে দেবেন পায়ে বেঁধে।

গাঁজার কিন্তু চারটে পয়সা লাগবে বাবু। আচ্ছা করে কষে এক দম দিয়ে, দিয়ে আসছি ব্যাটাকে গাঁছাড়া করে।

পাগল যুদ্ধের ঘোড়ার মত রীতিমত অস্থির হইয়া উঠিয়াছে।

সুশীল সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল, আপনি গাঁজা খান নাকি?

গাঁজা খাই, মদ খাই, চরস খাই, সিদ্ধি খাই, কেলে সাপের বিষ পেলে তাও খাই।

বলেন কি?—সুশীলের বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না।

দিয়ে দেখুন কেনে। বাবু তো খুব হয়েছেন, কোট কামিজ জুতো! কই, স্থান দেখি একটা টাকা, নেশা করি একবার পেট ভরে।

আচ্ছা, তাই চলুন, একটা টাকাই দোব আপনাকে, কিন্তু আমাদের সামনে বসে নেশা করতে হবে।

কাছারিতে ফিরিতেই রাখাল সিং বলিলেন, গোঁসাই-বাবা তিন মণ চাল পাঠিয়েছেন দেবার জন্যে।

সেই যাত্রা-পাগল চুলওয়ালা বন্ধুটিও বসিয়া আছে; সে বলিল, কই হে, আমাদের কাজ-টাজ দাও:

শিবু আশ্বাসের দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। রাখাল সিং আবার বলিলেন, আপনার মামাশ্বশুর এসে বসে আছেন।

শিবু বলিল, বলে দিন গিয়ে, আমি কাশী যাব না।

মাথা চুলকাইয়া সিং মহাশয় বলিলেন, কিন্তু গেলেই যেন ভাল হত বাবু, এই রোগ—

না।

তা আমার বলাটা কি ভাল দেখায়, আপনি নিজে—

বাধা দিয়া শিবু বলিল, আমার হাতে-পায়ে রুগীর ছোঁয়াচ, এ নিয়ে এখন কি করে বাড়ির মধ্যে যাব?

রাখাল সিং অগত্যা সংবাদ বহন করিয়া লইয়া গেলেন। সুশীল বলিল, কিন্তু বউ আপনার রাগ করবে শিবনাথবাবু।

শিবু চিন্তা করিতেছিল, আরও লোক কোথায় পাওয়া যায়! সুশীলের কথাটা তাহার কানে গেলেও শব্দার্থ তাহাকে লজ্জিত অথবা পুলকিত করিতে পারিল না। শিবনাথের মনের মধ্যে এত লোকের ভিড় দেখিয়া, কলরব শুনিয়া ছোট্ট গৌরী

সসঙ্কোচে অবগুণ্ঠন টানিয়া যেন কোন্ অন্ধকার কোণে নিতান্ত অনাদৃতার মতই পড়িয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। সুশীলের হাত ধরিয়া শিবনাথ বলিল, চলুন, একবার থানায় যাব, চৌকিদারের সাহায্য না পেলে পুকুর পাহারা দেওয়ার কাজ হয়ে উঠবে না।

চুলওয়ালা বন্ধুটি বলিল, গান-টান বেঁধেছ হে? সুরটা করে ফেলতাম তা হলে।

শিবু সুশীলকে লইয়া বাহির হইয়া গেল। পাগল বিরক্তিভরে বলিল, এই দেখ, ডাকব তো বলবে, পিছু ডাকলে। আমি এখন দড়ি পাই কোথা বল দেখি!

পাগলের কথায় কেহ কান দিল না। পাগল বসিয়া থাকিতে থাকিতে সহসা উঠিয়া গোশালার দিকে চলিয়া গেল। গোরু-বাঁধা দড়ি নিশ্চয় আছে।

দিন তিনেক পরে।

শিবু আশ্চর্য হইয়া গেল যে, এই ভয়ঙ্কর মৃত্যু-বিভীষিকার মধ্যে মানুষ যা ছিল তাই আছে, একবিন্দু পরিবর্তন কাহারও হয় নাই। একটা গলিপথে যাইতে যাইতে সে শুনিল, সেই যে কথায় আছে, 'কোলে মরবে, জোলে ফেলবে, তবু না পুষুনি দোব'—সেই বিত্তান্তের বিত্তান্ত। শৈলজা ঠাকরুন বউয়ের হাড়ীর ললাট ডোমের দুর্গতি করবে, দেখো তোমরা, আমি বলে রাখলাম। ওই একমাত্ত ছেলে, মামাশ্বশুর এসে কাশী নিয়ে যেতে চাইলে; কি অন্যায়টা সে বলেছিল! তা এই মহামারণের মধ্যে ছেলেকে রেখে দিলে, তবু যেতে দিলে না, পাছে বউয়ের সঙ্গে ভাব হয়!

শৈলজা ঠাকুরানীর নাম শুনিয়াই সে দাঁড়াইয়া মন্তব্যটা শুনিল। মনটা তাহার ভালই ছিল, আজ এই ভয়াবহ বিশৃঙ্খলার মধ্যেও সকল কাজেই একটা শৃঙ্খলা আসিয়াছে। চৌকিদারের সাহায্যে পুকুরগুলি রক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে, চুলওয়ালা বন্ধুটি ও শ্যামু চাল সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ওই অকেজো ঘৃণ্য পাগল করে সকলের চেয়ে বড় কাজ—একটি নয়, একটি একটি করিয়া তিনটি শবের গতি সে করিয়াছে। ডিস্ট্রিক্ট-বোর্ড হইতে প্রেরিত এক ভদ্রলোক ম্যাজিক-ল্যাণ্টার্ন সহযোগে কলেরার বিষয়ে বক্তৃতা দিতে আসিয়াছেন। সকলের চেয়ে বড় কথা, তাহার পিসীমা ও মা তাহার কাজের গুরুত্ব বুঝিয়াছেন, অভয়দাত্রীর মত তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া আশীর্বাদ করিয়াছেন। শিবু এই সমালোচনা শুনিয়া একটু হাসিল।

সমালোচকটি কঠোর সমালোচক, সত্য কথা বলিতে দুর্গা-ঠাকরুন কোন দিনই পশ্চাৎপদ হয় না। হাঁজার যুক্তি-তর্কেও তাঁহার মতের পরিবর্তন হয় না, টুকরা টুকরা করিয়া তাঁহার যুক্তিগুলি খণ্ডন করিলেও না; আপন মন্তব্যও কখনও তিনি প্রত্যাহার করেন না। যে যাহাই বলিয়া থাক, তিনি সেই আপনার কথাই বলিয়া যান। কিন্তু আজিকার এ কথাটার মধ্যে খানিকটা যেন সত্য ছিল। রামকিঙ্করবাবু এবং কমলেশ

শিবনাথকে কাশী লইয়া যাইবার জন্য প্রস্তাব করিতেই পিসীমা বলিলেন, বেশ, শিবনাথকে বলো; আমি তো তাকে নিয়ে সরে যেতেই চেয়েছিলাম, কিন্তু সে-ই গেল না। তাকেই বলো।

রামকিঙ্করবাবু বলিলেন, আপনারা পাঠালে শিবনাথ যাবে না, এ কি কখনও হয়? সে কি এর মধ্যে স্বাধীন হয়েছে নাকি?

কথাটা শৈলজা-ঠাকুরানীকে গিয়া বিঁধিল। কথাটার সরলার্থ হইতেছে, আপনারাই আসলে পাঠাতে চান না, শিবনাথের মতটা নিতান্তই একটা অজুহাত। তিনি সে কথা প্রকাশ না করিয়া রামকিঙ্করেরই কথার জবাব দিলেন, শিবনাথ স্বাধীন না হলেও বড় হয়েছে, তার মত এখন ফেলা চলে না। আর একটা কথা কি জান, ছেলে ছোটই হোক আর বড়ই হোক, ভাল কাজ করলে বাধা কি করে দোব, বল? শিবু তো অন্যায় কিছু করে নি।

অবরুদ্ধ ক্রোধে রামকিঙ্কর অন্তরে অন্তরে ফুলিয়া উঠিলেন, তিনি বলিলেন., অন্যায় না হোক বিপদ আছে। শিবুর জীবন নিয়ে আর আপনারা ইচ্ছামত খেলা করতে পারেন না।

শৈলজা ঠাকুরানীও মুহূর্তে মাথা খাড়া করিয়া সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, খেলা! শিবুর জীবন নিয়ে আমরা খেলা করছি! এমন অপ্রত্যাশিত অকল্পিত অভিযোগের উত্তর তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড খুঁজিয়াও পাইলেন না। উন্নতমস্তকে দৃপ্তদৃষ্টিতে শুধু আপনার নিষ্কলুষ মহিমাকে ঘোষণা করিয়া রামকিঙ্করবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

উত্তর আসিল গৃহান্তরাল হইতে। জ্যোতির্ময়ী উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, খেলাই। এক বয়সে মানুষ পুতুল নিয়ে খেলা করে, পুতুল খেলার বয়স গেলে ভগবান দেন রক্তমাংসের পুতুল মানুষকে খেলবার জন্যে। সে খেলায় বাধা দেবার অধিকার তো কারও নেই।

রামকিঙ্করের প্রকৃতি দুর্দমনীয় প্রভুত্বের আত্মম্ভরিতার মত্ততায় পরিপূর্ণ, সংসারে প্রতিবাদ বা বাধা পাইলে তিনি আত্মহারা হিংস্র হইয়া উঠেন। এ উত্তরে তাঁহার চোখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল; বলিলেন, জানেন, শিবুর জীবনের ওপর একটা দুগ্ধপোষ্য বালিকার জীবন নির্ভর করছে?

এবার শৈলজা ঠাকুরানী বলিলেন, জানি না? হিন্দুর মেয়ে, বৈধব্য ভোগ করছি, আমরা সে কথা জানি না? শিবুর ওপর অধিকার যা আছে, সে সেই বালিকারই আছে, তোমার নেই। সে অধিকার জারি করতে পারে শুধু সেই।

বাহির হইতে গলার সাড়া দিয়া রাখাল সিং বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিলেন এই মুহূর্তটিতেই, সবিনয়ে আক্ষেপ করিয়া বলিলেন, বাবু তো কাশী যাবেন না বলে দিলেন। তিনি ডাক্তারকে নিয়ে থানায় গেলেন কি কাজে। আমি বার বার—

গম্ভীরভাবে রামকিঙ্কর বলিলেন, থাক। এসো কমলেশ।

তিনি কমলেশের হাত ধরিয়া অগ্রসর হইলেন। শৈলজা-ঠাকুরানী বলিলেন, অধিকার শুধু তো শিবুর ওপর তোমাদেরই নেই, শিবুর বউয়ের ওপর অধিকার আমাদেরও আছে। আমার বউ পাঠিয়ে দেবে তোমরা।

রামকিঙ্করবাবু ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, তার ওপর যা অধিকার, সে কেবল শিবুরই আছে। শিবনাথ যখন যাবে সে দাবি নিয়ে, তখন সে আসবে।

কমলেশের হাত ধরিয়া দৃপ্ত ক্রুদ্ধ পদক্ষেপে রামকিঙ্করবাবু চলিয়া গেলেন। পিসীমা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, আমার বউ এই মাসেই আমি আনব, কে ঠেকায় আমি দেখব!

জ্যোতির্ময়ী বলিলেন, না, এর পর আর সে হয় না ঠাকুরঝি।

দুর্গা-ঠাকুরানী ঘরে বসিয়া এই কথারই সমালোচনা করিতেছিলেন। শুধু শৈলজা-ঠাকুরানী নয়, জ্যোতির্ময়ীও বাদ গেলেন না। শিবু কিন্তু সমালোচনা শুনিয়া রাগ করিল না, হাসিল। আশ্চর্য, এই কর্ম-সমারোহের মধ্যে পড়িয়া শিবু অনুভব করে, মানুষের প্রতি স্নেহ শ্রদ্ধা অনুকম্পা ঘৃণা আক্রোশ—এ যেন সে ভুলিয়াই গিয়াছে।

ঠাকুর-বাড়িতে আসরের ব্যবস্থা করিতে হইবে, সন্ধ্যায় সেখানে ম্যাজিক-ল্যাণ্টার্ন দেখানো হইবে।

তাহার আর দাঁড়াইয়া দুর্গা-ঠাকুরানীর সমালোচনা শুনিয়া উপভোগ করিবার সময় হইল না, হাসিতে হাসিতেই সে অগ্রসর হইল।

ঢাক বাজিতেছে। সদর রাস্তায় রাস্তায় ঢাক বাজাইয়া কেহ বোধ হয় কিছু ঘোষণা করিয়া চলিয়াছে। বোধ হয় সামাজিক কোন অনুশাসন। সরকারী কাজের ঘোষণা হইলে ঢেঁড়ি বাজিয়া থাকে, সামাজিক ঘোষণায় বাজে ঢাক। কিসের ঘোষণা? সহসা এই বিপর্যয়ের মধ্যে সমাজ সচেতন হইয়া উঠিল কেমন করিয়া?

রক্ষেকালীর পুজো হবে, পরশু আমাবস্যের দিন। চাঁদা লাগবে, চাল লাগবে সব। দেবাংশী দোরে মালসা পেতে দেবে, সরষে-পোড়া ছড়িয়ে দেবে।

দুর্গা-ঠাকুরানীও বাহির হইয়া আসিয়াছিলেন। দুইটি হাত জোড় করিয়া উদ্দেশে অনাগত দেবীকে প্রণাম জানাইয়া বলিলেন, এইবার আসল বিহিতটি হল। মা আসবেন, এসে এক রেতে তেড়ে বার করবেন গাঁ থেকে। এই কি বলে গো, এই ইয়ে গাঁয়ে এক মাস কলেরা, শেষে যেদিন রক্ষেকালী পুজো হল, সেদিন রেতে পথে পথে সে কি কান্না মা! তারপর এই ভোরবেলাতে এই কালো বিভীষণ চেহারার এক মেয়ে এক চেটাই বগলে গাঁ থেকে বেরিয়ে গেল।

শিবনাথ হাসিয়া বলিল, কে দেখেছিল ?

অঃই, অঃই ঠাট্টা আরম্ভ হল ! তোমরা বাবা এখনকার ছেলে, তোমাদের কাজটাই তোমাদের কাছে বড়, আর সব ঠোঁট উলটনো আর ঠাট্টা, সব মিছে কথা। তা বাবা, মিছেই বটে বাবা, মিছেই বটে। তোমরা বড়লোক, তোমরা বিদ্বেন, তোমরা পরোপকারী, তোমরা সব; আর আমরা ছোটলোক, আমরা পাজী, আমরা ছুঁচো, আমরা মুখ্যু, হল তো বাবা !

শিবু একেবারে হতবাক নিস্তব্ধ হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া চলিয়া গেল। দুর্গা-ঠাকুরানী আর দাঁড়াইলেন না, বাড়ি ফিরিলেন। ফিরিতে ফিরিতে এবার বিজয়-গর্বে সদম্ভে বলিলেন, দেখ দেখি, বলে কিনা, আমরাই সব করছি। বলি, তুই কে রে বাপু, তুই কে ?

শিবনাথ ক্ষুণ্ণমনেই চলিতে চলিতে অকস্মাৎ আবার হাসিয়া উঠিল। দুর্গা-ঠাকুরানীর রণ-কৌশলটি বড় ভাল। চমৎকার !

ষোলো

বিষয়-সম্পত্তির দিকে শৈলজা-ঠাকুরানীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টির কথা কাহারও অবিদিত নয়, একটা কুটাও তিনি নষ্ট হইতে দেন না। কিন্তু বাড়ির শতরঞ্জি ও বাসন—এই দুই দফা হইল শৈলজা-ঠাকুরানীর প্রাণ। লোকে বলে, ও হল সোনার কৌটোর ভোমরা-ভোমরী; ঠাকরুনের প্রাণ আছে ওর মধ্যে। তিনি সাধ্যমত এই জিনিসগুলি বাহির করেন না।

শিবু চিন্তিত হইয়াই শতরঞ্জির জন্য বাড়ি ঢুকিল। পিসীমা উনান-শালে দাঁড়াইয়া ছিলেন; কড়ায় কি একটা হইতেছে। শৈলজা-ঠাকুরানী বলিলেন, দেখ্ তো শিবু, বার্লি কি আর পুরু হবে?

বার্লি? তুমি নিজে বার্লি করছ নাকি?—শিবনাথ আশ্চর্য হইয়া গেল, রোগীদের জন্য বার্লি প্রস্তুত করিতেছেন পিসীমা নিজে!

হ্যাঁ রে, আমি খানিকটা তোদের কাজ করে দিই। হাতেরও আমার সার্থক হোক।

সত্যই পিসীমার একটা পরিবর্তন হইয়াছে। শিবনাথ যেদিন এই বিপদের আবর্তের মধ্যে কোন বাধা-বিপত্তি না মানিয়া ঝাঁপ দিয়া পড়িল, সেদিন আপনার অদৃষ্টকে শত ধিক্কার দিয়া সভয়ে তিনি তাঁহার সংস্কারের গণ্ডি হইতে এক পদ বাহিরে বাড়াইয়াছিলেন। তারপর রামকিঙ্করের সঙ্গে দ্বন্দ্বের ফলে দুরন্ত জেদে তিনি শিবুকে উৎসাহ দিতে অগ্রসর হইলেন। অগ্রসর হইয়া কিন্তু তিনি সংসারকে নূতন দৃষ্টিতে, নূতন ভঙ্গিতে দেখিলেন; আর্ত পীড়িত ব্যক্তিগুলির মুখে শিবনাথের জয়ধ্বনি, শিবনাথের কর্মশক্তি, সুশীল ও পূর্ণের নির্ভীক প্রাণবন্ত সেবা তাঁহাকে মানুষের আর এক রূপ দেখাইয়া দিল। তিনি জ্যোতির্ময়ীকে আসিয়া বলিলেন, বউ, 'যা দেখি নি বাপের কালে, তাই দেখালে ছেলের পালে'! কি দেখলাম ভাই বউ! আর আমার শিবুর জয়গান যে শুনলাম, সে আর কি বলব তোমাকে! চলো, আজ তোমাকে আমি দেখিয়ে নিয়ে আসব।

সত্য-সত্যই তিনি এ বাড়ির সংস্কারের গণ্ডিকে অতিক্রম করিলেন, একবার দ্বিধা করিলেন না; সাত-আনির জমিদার-বাড়ির বধূকে সঙ্গে লইয়া প্রকাশ্য পথে পথে গ্রামের নিকৃষ্টতম পল্লীর বুকের মধ্যে গিয়া দাঁড়াইলেন!

দেখো, তোমার শিবুর কাজ দেখো।

জ্যোতির্ময়ীর চোখে জল আসিল। শিবনাথবাবুর মা ও পিসীমাকে দেখিয়া কতকগুলি স্ত্রী ও পুরুষ আসিয়া প্রণাম করিয়া জোড়হাত করিয়া দাঁড়াইল; কৃতজ্ঞতা প্রকাশের তাহাদের ভাষা নাই। একজন বলিল, বাবুর আমাদের সোনার দোত-কলম হবে মা, হাজার বছর পেরমায় হবে।

পিসীমার চোখও জলে ভরিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, শিবুরা সব কোথায় রে?

আজ্ঞেন, ডাক্তারবাবুরা সব রুগী দেখে চলে যেলেন। বাবু যেলেন ওই ডোমেদের বউটাকে দেখতে।

ডোমেদের বউটি সারিয়া উঠিয়াছে। সম্পূর্ণ নীরোগ না হইলেও, জীবনের আশঙ্কা তাহার আর নাই। পিসীমা বলিলেন, চলো, দেখে আসি।

বধূটির উঠানে শিবনাথ বিব্রত হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। মেয়েটি দাওয়ার উপর দেওয়ালে ঠেস দিয়া বসিয়া নাকী সুরে শিশুর মত আবদার জুড়িয়া দিয়াছে, না না, উ আমি আর খাব না, ছাই, আঠা আঠা, জলের মতন। আমাকে আজ মুড়ি দিতে হবে।

শৈলজা ও জ্যোতির্ময়ী আসিতেই কিন্তু মেয়েটির আবদার বন্ধ হইয়া গেল। সে তাড়াতাড়ি লজ্জাভরে মাথার ঘোমটা টানিয়া নতমস্তকে বসিয়া রহিল। শিবনাথ হাসিয়া বলিল, মুড়ি খাবার জন্যে কাঁদছে।

জ্যোতির্ময়ী হাসিলেন। পিসীমা বলিলেন, তুই কচি খুকী নাকি যে, মুড়ি খাবার জন্য কাঁদছিস?

শিবনাথ হাসিয়া বলিল, চলো চলো। আজ পাঁচ দিন থেকে 'মুড়ি মুড়ি' করছে। কাল থেকে আর কিছুতেই বার্লি খাবে না। আমি এসে কোন রকমে খাওয়াই। তা দোব, কাল ওকে চারটি মুড়ি দোব।

শৈলজা ও জ্যোতির্ময়ী পিছন ফিরিতেই মেয়েটি অস্বীকারের ভঙ্গিতে সবেগে ঘাড় নাড়িল, না না না।

শিবুর প্রিয়ানুষ্ঠানে সাহায্য করায় আনন্দই শুধু নয়, অন্তরের মধ্যে প্রেরণাও শৈলজা ঠাকুরানী অনুভব করিয়াছিলেন। তাই তিনি বার্লি প্রস্তুত করিতে বসিয়াছেন। দেখিয়া শিবুর অন্তর গর্বে আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সভয়ে সে আসিয়াছিল শতরঞ্চি চাহিতে, মনে মনে পিসীমার প্রসন্নতাসাধনের জন্য বাছা বাছা স্তুতিবাদ রচনাও করিয়াছিল; কিন্তু এক মুহূর্তে সে সব ভুলিয়া গেল। বিনা স্তুতিতে নির্ভয়ে বলিল, খান দুয়েক শতরঞ্চি দিতে হবে যে পিসীমা; বড় দুখানা হলেই হবে।

শতরঞ্চি? কেন, শতরঞ্চি কি হবে?

আজ সন্ধ্যেবেলা যে কলেরার লেক্‌চার হবে ঠাকুর-বাড়িতে। দেখবে, কলেরার বীজাণুর চেহারা কেমন, কেমন করে ওরা জলের মধ্যে বৃদ্ধি পায়! সব ছবিতে দেখতে পাবে, শুনতে পাবে সব।

অত্যন্ত প্রিয়বস্তুগুলির মমতা কিন্তু সহজে যাইবার নয়। পিসীমার ললাট কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, শতরঞ্চি বার করলে আর রক্ষে থাকবে না শিবু। এই আবার পরশু রক্ষেকালীর পুজো হবে শ্মশানে। ওরা আবার সব চাইতে আসবে।

বেশ তো, দেবে, ওদেরও দেবে।

তারপর? ছিঁড়লে, নষ্ট হলে, কে দেবে আমাকে?

জিনিস কি চিরকাল থাকে পিসীমা, নষ্ট তো একদিন হবেই।

পিসীমা বার বার অস্বীকার করিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, না শিবু, ওতে আমাদের বাড়ির তিন-চার পুরুষের কত কাজ হয়েছে, ও আমার লক্ষ ব্রাহ্মণের পায়ের ধুলো-মাখা জিনিস বললেও বাড়িয়ে বলা হয় না। ওসব আমি এমন করে নষ্ট হতে দিতে পারি না। ও আমার কল্যেণী জিনিস, কত মান-সম্মানের জিনিস ও বাবা। বার বার ঘাড় নাড়িয়া অস্বীকার করিয়া কথাটা তিনি শেষ করিলেন।

শিবু চুপ করিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিল, পরের দোরে আমাকে চাইতে যেতে হবে?

পিসীমাও এবার কিছুক্ষণ গম্ভীরমুখে দাঁড়াইয়া থাকিয়া অবশেষে বলিলেন, যা ইচ্ছে হয় করগে বাবা, আমার কি? থাকলে তোমারই থাকবে, গেলে তোমারই যাবে। তখন তোমাকে কেউ দেবে না। তখন আমার কথা স্মরণ কোরো।

বালিটা এবার নামিয়ে ফেলো পিসীমা। আর গাঢ় হলে চলবে না। কড়াটা নামাইয়া দিয়া শৈলজা-ঠাকুরানী বলিলেন, শতরঞ্জি কিন্তু বেশ করে কাচিয়ে পরিষ্কার ক'রে দিতে হবে আমার। আর সেই একটু একটু ছেঁড়া শতরঞ্জি দোব, ভাল চাইলে আমি দোব না। সে আমি আগে থেকে বলে দিচ্ছি।

আচ্ছা আচ্ছা, তাতেই হবে। তা হলে নায়েববাবুকে আর কেষ্ট সিংকে পাঠিয়ে দিই আমি।—শিবু হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। এটুকু প্রতিবাদ নিতান্তই তুচ্ছ, শৈলজা-ঠাকুরানীর উপযুক্ত প্রতিবাদই নয়। সে হাসিমুখেই বাড়ি হইতে বাহির হইল। শৈলজা-ঠাকুরানী বলিলেন, বালি নিতে তা হলে কাউকে পাঠিয়ে দে।

বাহির হইতেই শিবু বলিল, শ্যামুকে পাঠিয়ে দিচ্ছি এক্ষুনি।

বৈঠকখানায় সকলে যেন একটু অধিক চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে; শ্যামু উচ্ছ্বাসভরে বলিয়া উঠিল, মেলাই—অনেক চাল এসেছে শিবুদা। বিস্তর চাল হয়ে গেল।

হাসিয়া সুশীল বলিল, আপনার জয়জয়কার শিববাবু। আপনার শ্বশুরবাড়ি থেকে আজ বারো মণ চাল আসছে। রামকিঙ্করবাবু ন মণ, কমলেশবাবু তিন মণ। ইউ হ্যাভ ওয়ান দি ব্যাট্‌ল। তাঁরা নিশ্চয় আপনার কাজের মর্যাদা বুঝেছেন।

চুলওয়ালা ছেলেটি বলিল, ওসব চাল মশায়, বড়লোকী চাল। সকলের চেয়ে বেশি দেওয়া হল আর কি।

সুশীল ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল, ওটা আপনার অন্যায় কথা। মানুষের দানকে এমন করে ছোট করে দেওয়াটা অত্যন্ত অন্যায়, ইতরতা বললেই বোধ হয় ঠিক হয়।

ছেলেটি গর্জন করিয়া উঠিল, নিশ্চয় বলব বড়লোকী চাল, আলবত বলব। টাকার জোরে নাম কেনবার মতলব। ওসব আমরা খুব বুঝি। তাঁরা তো নিজেরা সব দেশ ছেড়ে প্রাণ বাঁচিয়েছেন। হ্যাঁ, জানতাম, তাঁরা যদি না যেতেন, কি কাজের মর্যাদা বুঝে যদি ফিরে আসতেন, তবে বুঝতাম।

পাগলও বসিয়া ছিল। সে সপ্রশংস মুখে ছেলেটির মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, অ্যাই, তবে বুঝতাম। হ্যাঁ হ্যাঁ বাবা, মড়াগুলান সব একা ফেললাম, এসেছে কোন বাবুভাই? খেয়ে ফেলাবে, সব হাম করে ধরে খেয়ে ফেলাবে! তাতেই তো বলি, খা খা, সব খেয়ে লে বাবা।—বলিয়া হা-হা করিয়া সে হাসিয়া উঠিল।

পূর্ণ শিবনাথকে বলিল, আপনার একখানা চিঠি এসেছে শিবনাথবাবু।

সুশীল আশ্চর্য মানুষ, সে মুহূর্তে উত্তপ্ত আলোচনাটাকে একেবারে পরিত্যাগ করিয়া পরিহাস-হাস্য হাসিয়া শিবনাথকে বলিল, এ বিউটিফুল এন্‌ভেলপ, কামিং ফ্রম বেনারস।—বলিয়া সে পকেট হইতে পত্রখানা বাহির করিয়া ধরিল, শুঁকে দেখব নাকি? নাঃ, ঘ্রাণে অর্ধভোজন হয়ে যায়। এর রূপ রস গন্ধ সবই ষোলো আনাই আপনার, এবং এর ভাগ দেওয়া যায় না। নিন।

চিঠি! কাশীর চিঠি! গৌরীর চিঠি! শিবনাথের মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। দেহের রক্তস্রোতে উত্তেজনার স্পর্শ লাগিয়া গিয়াছে। তবুও বাহিরে সে এতটুকু লক্ষণ প্রকাশ না করিবার অভিপ্রায়েই চিঠিখানা পকেটে রাখিয়া বলিল, পরশু আবার রক্ষেকালীর পুজো হচ্ছে, শুনেছেন তো? আবার একটা কাণ্ড হবে আর কি, রাত্রি জেগে মদ মাংস খাবে সব।

খাবে তো তাতে হয়েছে কি?—চুলওয়ালা ছেলেটি এতক্ষণ ধরিয়া মনে মনে ফুলিতেছিল, সুশীলের অত্যন্ত আকস্মিক প্রসঙ্গান্তরে যাওয়াটাও তাহাকে অত্যন্ত আঘাত করিয়াছিল। সে কি এতই তুচ্ছ ব্যক্তি? তাই সুযোগ পাইবামাত্র সে গর্জন করিয়া উঠিল, খাবে তো তাতে হয়েছে কি?

পাগলও তাহাকে সমর্থন করিয়া বলিল, অ্যাই, তাতে হয়েছে কি? মদ মাস লইলে কালীপুজো হয়? কালী কালী ভদ্দকালী বাবা!

পাগলের কথায় নয়, ছেলেটির কথায় সকলে অবাক হইয়া গেল, সুশীল হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল; চুলওয়ালা ছেলেটি নাটকীয় ভঙ্গিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, ধর্মকে যেখানে হেণ্টা-কেণ্টা করা হয়, সেখানে আমি কাজ করি না, চললাম আমি।

পূর্ণ বলিল, বাস্তবিক সুশীলদা, আপনি ভয়ানক আঘাত করেন লোককে।

সুশীল শিবনাথকে বলিল, আপনি চিঠিখানা পড়ুন শিববাবু; আমার প্রাণটা হাঁপিয়ে উঠছে কিন্তু। কৃচ্ছ্রসাধন অকারণে করার কোন মানে হয় না।

পাগল বলিল, পয়সা গ্যান বাবু গাঁজার। না, 'তেলি হাত পিছলে গেলি', ফুরুত ধা!—সেও বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

অত্যন্ত নিরালায় নিরুদ্বিগ্ন হইয়া সে চিঠিখানা খুলিল। ডোমেদের বউটিকে বার্লি খাওয়াইয়া সে চিঠিখানা খুলিয়া বসিল। দীর্ঘ চিঠি, কিন্তু শিবনাথ নিরাশ হইল, গৌরী নয়, কমলেশ লিখিয়াছে। অনেক কথা—গৌরীর কথাই। কমলেশ লিখিয়াছে, যখন গাড়ি হইতে নামিলাম, তখন গৌরী দরজার আড়ালে দাঁড়াইয়া ছিল। তুমি আসিয়াছ ভাবিয়াই সে ছুটিয়া বাহিরে আসে নাই। তারপর যখন আমি একা বাড়ি ঢুকিলাম, তখন অত্যন্ত শুষ্ক হাসি হাসিয়া আমাকে প্রণাম করিয়া সেই যে লুকাইল, আর তাহাকে বহুক্ষণ দেখিলাম না। দিদিমার সহিত কথায় ব্যস্ত ছিলাম, এতটা লক্ষ্যও করি নাই। ঝি আসিয়া সংবাদ দিল, গৌরীদিদিমণি কাঁদিতেছে, তাহার নাকি মাথা ধরিয়াছে। ঝি হয়তো বুঝে নাই, কিন্তু আমি বুঝিয়াছিলাম। তাড়াতাড়ি উপরে গেলাম, সে তখন চোখ মুছিতে মুছিতে বিছানা তুলিতেছে। সে নিজ হাতে বিছানা পাতিয়াছিল, সেই বিছানা সে নিজেই তুলিতেছিল।

গৌরী, সেই ছোট্ট চঞ্চলা বালিকা গৌরী তো আর নাই। বিবাহের পর আজ দুই বৎসর হইয়া গেল, এতদিনে সে অনেকটা বড় হইয়াছে। দুই বৎসরেরও কয় মাস বেশি। সে গৌরী বাঁশি বাজাইয়া তাহাকে ডাকিয়াছিল, এ গৌরী তাহার জন্য কাঁদিয়াছে। তাহার সমস্ত অন্তর সমস্ত চিত্ত এক মুহূর্তে গৌরীময় হইয়া উঠিল। গৌরী জীবনের প্রথম শয্যা রচনা করিয়া সেই শয্যা আপন হাতে তুলিয়া ফেলিয়াছে।

কি হল বাবু, মুখ-চোখ তোমার রাঙা হয়ে গেইছে? উ কি বটে?—ডোমেদের বউটি শিবনাথের মুখের দিকে সবিস্ময়ে চাহিয়াছিল।

শিবনাথ জোর করিয়া একটু হাসিয়া বলিল, ও একখানা চিঠি রে।

চিঠি? সেই ডাকঘরে আসে, লয় মাশায়? উ কি চিঠি বটে?

ও একখানা চিঠি, তুই শুনে কি করবি?

রুগ্না মেয়েটির শীর্ণ পাণ্ডুর মুখে যেন ক্ষীণ রক্তাভা ফুটিয়া উঠিল, কৌতুকোজ্জ্বল দৃষ্টিতে সে এবার বলিল, গৌরীদিদি দিয়েছে, লয় বাবু? তাতেই মুখ-চোখ রাঙা হয়ে গেইছে।

মেয়ে জাতটাই অদ্ভুত, রাঙা মুখ-চোখ দেখিয়া স্বচ্ছন্দে অনুমান করে প্রেমের চিঠি। মৃত্যুরোগপীড়িত মুখেও রক্তের ঝলক ছুটিয়া আসে, চোখ কৌতুকে নাচে।

মেয়েটি বলিল, গৌরীদিদি তো আমার ননদ হয় মাশায়। সে তো ওই বাড়িতেই কাজ করত। আমি এইবার তোমাকে জামাইবাবু বলব।

শিবনাথ চিঠির পৃষ্ঠা উল্টাইয়া পড়িল, সংসারে সমাজের প্রতি কর্তব্য যেমন আছে, স্ত্রীর প্রতিও তেমনই কর্তব্য আছে। গৌরী এমন কি অপরাধ করিয়াছে, যাহার জন্য তুমি তাহাকে এমনভাবে অবহেলা কর? আজ এক বৎসর সে এখানে আসিয়াছে, এতদিনের মধ্যে তুমি তাহাকে একখানা পত্র লেখ নাই। অন্তত পাসের খবরটাও তো দেওয়া উচিত ছিল।

শিবনাথ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল, মনে মনে অপরাধ স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। উচিত ছিল বইকি। তাহারই কি ইচ্ছা হয় নাই? কিন্তু এ অপরাধের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছে যে গৌরী আর গৌরীর স্নেহান্ধ দিদিমা!

ওঃ, জামাইবাবু, গৌরীদিদি যে অ্যানেক চিঠি নিখেছে গো! গান নেখে নাই? একটি গান বলেন কেনে, শুনি।

শিবনাথ এবার অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিল, মেয়েটার স্পর্ধার কি সীমাও নাই? সে রুক্ষদৃষ্টিতে মেয়েটার দিকে একটা দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া বাড়ি হইতে বাহির হইয়া আসিল। দেহ-মন তাহার এক অসহনীয় পীড়ায় পীড়িত হইতেছে, বুকের মধ্যে গভীর উদ্বেগের মত একটা আবেগে হৃৎপিণ্ড ধকমক করিয়া দ্রুতবেগে স্পন্দিত হইতেছে, চিত্ত অসীম ব্যাকুলতায় অস্থির অধীর।

এই কর্মোদ্দীপনা, এই জয়ধ্বনি, তাহার বাড়িঘর সব যেন বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছে। গৌরী—গৌরী, কাশী যাইবার জন্য তাহার মন অধীর হইয়া উঠিল। তাহার নিশ্বাস অস্বাভাবিকরূপে উষ্ণ, হাতে পায়ে আগুনের উত্তাপ।

বাবু!—একটি জীর্ণ-শীর্ণ বৃদ্ধা হাতজোড় করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল।

কি?—রুক্ষস্বরে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া শিবনাথ বলিল, কি? চাই কি?

একখানি তেনা, পুরনো-ঝুরনো কাপড়।

না না না—মুহূর্তে আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিয়া শিবনাথ কঠোর স্বরে চিৎকার করিয়া উঠিল। সভয়ে বৃদ্ধা পথ হইতে সরিয়া দাঁড়াইল। উঃ, সংসারের এই হতভাগ্যদের সমস্ত দায়িত্ব যেন তাহার! তাহাদের জীবনমরণ ভরণপোষণ সমস্ত কিছুর দায় যেন তাহাকেই একা বহন করিতে হইবে!

তাহার উত্তেজিত উচ্চ কণ্ঠস্বর শুনিয়াই পাশের পুকুরের ঘাটটা হইতে পাহারায় নিযুক্ত চৌকিদারটা ছুটিয়া আসিয়া বলিল, আপনি একবার আসুন বাবু, ভোলা মুচী জোর করে নেমে বিছানা কেচে দিলে জলে। শুনলে না মাশায়, ক্ষ্যাপার মত হয়ে যেয়েছে।

কি? জোর করে নেমে রুগীর বিছানা কেচে দিলে জলে?—শিবনাথ ক্রোধে আত্মহারা হইয়া ভোলা মুচীর বাড়ির দিকে অগ্রসর হইল; ক্রোধে মাথায় তাহার আগুন জ্বলিতেছে।

ছড়ি, একগাছা ছড়ি।—থমকিয়া দাঁড়াইয়া চৌকিদারটাকে সে বলিল, নিয়ে আয় ভেঙে একগাছা ছড়ি।

সভয়ে করুণকণ্ঠে সে বলিল, আজ্ঞে বাবু, তার পরিবার—

নির্মম রুক্ষস্বরে শিবনাথ আদেশ করিল, নিয়ে আয় ভেঙে ছড়ি।

কঠোর ক্রুদ্ধ পদক্ষেপে ভোলার বাড়িতে প্রবেশ করিয়া সে ডাকিল, ভোলা!

সম্মুখেই দাওয়ার উপরে ভোলা বসিয়া ছিল স্ত্রীর মৃতদেহ কোলে করিয়া। শিবনাথকে দেখিয়া সে হা-হা করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, বাঁচাতে লারলেন বাবু মাশায়, সাবিত্তি আমার চলে গেল গো! সে মৃতদেহটা ফেলিয়া দিয়া উন্মত্তের মত শিবুর পায়ে আসিয়া আছাড় খাইয়া পড়িল। কে যেন শিবুকে চাবুক দিয়া আঘাত করিল। সে নিঃশব্দে মাথাটি নীচু করিয়া একেবারে কাছারি-বাড়িতে পলাইয়া আসিল।

সুশীল মুগ্ধনেত্রে আকাশের দিকে চাহিয়া বসিয়া ছিল, রক্তসন্ধ্যার সঞ্চারে সমস্ত আকাশটা লাল, আকাশে মেঘ দেখা দিয়াছে। শিবনাথের মুখের দিকে চাহিয়া পূর্ণ শঙ্কিত কণ্ঠস্বরে বলিয়া উঠিল, এ কি শিবনাথবাবু, কি হল? আপনার মুখ এমন—

ভোলা মুচীর স্ত্রী মারা গেল। উঃ, কি কান্না!

শিবনাথ অকস্মাৎ কাঁদিয়া ফেলিল। কাঁদিয়া সে খানিকটা শান্তি পাইল।

পূর্ণ সবিস্ময়ে বলিল, আপনি কাঁদছেন শিবনাথবাবু?

সুশীল মুখ ফিরাইয়া শিবনাথের দিকে চাহিল, কান্নাটা সংসারে লজ্জার কথা শিবনাথবাবু, সে নিজের দুঃখেই হোক আর পরের দুঃখেই হোক। দুঃখটা মোচন করতে পারাটাই হল সকলের চেয়ে বড় কথা। কেঁদে কি করবেন? ইট ইজ চাইল্‌ডিশ অ্যাণ্ড ফুলিশ অ্যাট দি সেম টাইম।

শিবনাথ বলিল, আমার শরীর এবং মন দুইই বেশ ভাল লাগছে না সুশীলবাবু। আমি বাড়ির মধ্যে যাচ্ছি।

হাত-পা ধুয়ে যান। ডোণ্ট ফর্‌গেট।

শিবু বাড়ির মধ্যে আসিয়া সেই সন্ধ্যার মুখে ঘরের মেঝের উপরেই শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িল। যখন সে উঠিল, তখন ঠাকুর-বাড়িতে ম্যাজিক-ল্যাণ্টার্ন লেকচার আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। মন অনেকখানি পরিষ্কার হইয়াছে, তবুও সদ্যবিস্মৃত মর্মন্তুদ বেদনার স্মৃতি ও আবেগকম্পিত দীর্ঘশ্বাসের মত দীর্ঘনিশ্বাস মধ্যে মধ্যে অজ্ঞাতসারেই যেন ঝরিয়া পড়িতেছিল।

সুশীল তাহাকে দেখিয়া বলিল, এই যে, শরীর সুস্থ হয়েছে?

লজ্জিতভাবেই শিবনাথ বলিল, হ্যাঁ।

ইট ইজ এসেন্‌শিয়াল টু বি ইন্‌ডিফারেণ্ট। দুঃখকে জয় করবার ওই একমাত্র পন্থা শিবনাথবাবু।

মানুষের মৃত্যু, লোকটার ওই বুক-ফাটা শোক—

যে মরেছে, সে তো বেঁচে গেছে। মনে আছে আপনার, সেদিন বলেছিলেন, এ যুগের চেয়ে মোগল যুগ ভাল ছিল, কারণ তখন আমাদের স্বাধীনতা ছিল? এ পরাধীন দেশে কুকুর বেরালের মত জীবন নিয়ে কি সুখ সে পেত বলুন? তার জন্যে কেঁদে কি করবেন?

শিবনাথ তাহার মুখের দিকে সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিল। বক্তা তখন বলিতেছিল, আমাদের দেশে বছর বছর এই কলেরায় কত লোক মরে, জানেন? হাজারে হাজারে কুলোয় না, লক্ষ লক্ষ। লক্ষ লক্ষ লোক মরে কুকুরের মত, বেরালের মত মরে। তার কারণ কি?

সুশীল বিচিত্র হাসি হাসিয়া মৃদুস্বরে শিবনাথকে বলিল, পরাধীনতা।

বক্তা বলিল, আমাদের কুসংস্কার আর আমাদের অজ্ঞতা, মূর্খতা।

সুশীল বলিল, আসুন, এইবার মিথ্যে কথা আরম্ভ হল; ও আর শুনে লাভ নেই। দাসজাতি আবার কবে বিজ্ঞ হয়? জ্ঞানে বিজ্ঞানে বঞ্চিত রাখাই যে পরাধীনতার ধর্ম।

মহামারীর প্রকোপ অবশ্য কমিয়া আসিয়াছে। তাহার সর্বনাশা গতি রুদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু তবুও এই অবস্থাতেও শ্মশানে রক্ষাকালীর পূজার আড়ম্বর-আয়োজন দেখিয়া সুশীল ও পূর্ণ বিস্মিত না হইয়া পারিল না।

সকাল হইতেই ঢাক বাজিতেছে, দুপুরবেলায় আসিল সানাই এবং ঢোল। মধ্যে মধ্যে সমবেত বাদ্যধ্বনিতে ভাবী পূজার বার্তা ঘোষণা করিতেছে। দিনের বেলায় মহাপীঠে পূজা বলি হইয়া গেল। তান্ত্রিক অক্ষয় লাল কাপড় পরিয়াছে, কপালে প্রকাণ্ড একটা সিঁদুরের ফোঁটা কাটিয়া লোকের বাড়ি বাড়ি আতপ সন্দেশ সুপারি পৈতা সিঁদুর পয়সা সংগ্রহ করিয়া ফিরিতেছে। সংগৃহীত চাল এবং অর্থে নাকি সমারোহের একটা ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইয়া যায়। প্রত্যেক গৃহস্থের একজন নিরম্বু উপবাস করিয়া রহিয়াছে, রাত্রে পূজা ও বলি হইয়া গেলে তবে তাহারা জলগ্রহণ করিবে। উপবাসীদের অধিকাংশই বাড়ির গৃহিণী বা প্রবীণতমা স্ত্রীলোক। শিবনাথের বাড়িতে শৈলজা ঠাকুরানী উপবাস করিয়া আছেন। পাগলও আজ পূজার সমারোহে মাতিয়া উঠিয়াছে, আজ সকাল হইতে সে এখানে আসে নাই।

বেলা তখন তিনটা হইবে। রৌদ্রের প্রখরতায় তখনও আগুনের উত্তাপ, পৃথিবী

যেন পুড়িয়া যাইতেছে। পাগল তখন কোন্ গ্রামান্তর হইতে একটা প্রকাণ্ড কালো রঙের পাঁঠা ঘাড়ে লইয়া গ্রামে ফিরিল। মুখ পাংশু বিবর্ণ, চোখ দুইটি কোটরগত, সর্বাঙ্গ স্বেদাপ্লুত, কাছারির বারান্দা হইতে তাহার এই অবস্থা দেখিয়া সুশীল শিহরিয়া উঠিল। সে ব্যগ্র হইয়া ডাকিল, বাবু ও বাবু, শুনুন শুনুন। একটু বিশ্রাম করে যান।

হাত নাড়িয়া পাগল সংক্ষেপে বলিল, উঁহু, কালীপুজোর পাঁঠা।

তা হোক না। একটু বিশ্রাম করুন, একটু জল খান।

উঁহু। উপবাস, উপবাস আজকে।—পাগল চলিয়া গেল।

সুশীল বলিল, অদ্ভুত! পাগলের ভক্তি দেখলেন?

শিবনাথ বলিল, হাজার হলেও ভদ্রবংশের সন্তান তো! ওদের বংশই হল তান্ত্রিকের বংশ; ওদের জমিদারিও আছে।

আপনাদের এখানে অনেক তান্ত্রিক আছেন, না? তন্ত্রের মধ্যে একটা ভয়াল রোমান্টিসিজ্‌ম্ আছে, আমার ভারি ভাল লাগে। গাঢ় অন্ধকার, জনহীন মৃত্যু-বিভীষিকাময়ী শ্মশান, শবাসনে বসে—উঃ, আমার শরীরে রোমাঞ্চ দেখা দিয়েছে, দেখুন।

আমাদের দেশটাই হল তান্ত্রিকের দেশ। এককালে তন্ত্রসাধনার মহা সমারোহ ছিল আমাদের দেশে।—শিবনাথ গৌরবের হাসি হাসিল।

সুশীল বলিল, চলুন, আজ যাব আপনাদের কালীপুজো দেখতে। অনেক তান্ত্রিক থাকবেন তো?

শিবনাথ বলিল, থাকবেন বইকি অনেক হাতুড়ে তান্ত্রিক, তবে তাঁরা কি আর সাধক! সাধকে সাধনা করেন গোপনে। সে অন্য জিনিস।

তা হোক। তবু যাব, চলুন।

সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইতে হইতেই সেদিন গ্রামের বাড়িতে বাড়িতে দরজা বন্ধ হইয়া গেল। গ্রামখানা নিস্তব্ধ নীরব, গ্রাম হইতে দূরে নদীর ধারে শ্মশানে কলরব কোলাহল উঠিতেছে। আজ নাকি গ্রামের পথে পথে মহাকালী রাক্ষসী মহামারীকে প্রহারে জর্জরিত করিয়া বিতাড়িত করিবেন। রাক্ষসী নাকি করুণ সুরে বিলাপ করিয়া ফিরিয়া বেড়াইবে। একটা ভয়াতুর আবহাওয়ায় গ্রামখানা ভয়ার্ত শিশুর মত চোখ বুজিয়া কাঠের মত পড়িয়া আছে।

সুশীল বলিল, চলুন এইবার।

শিবু এ কয়দিন সুশীল ও পূর্ণের সহিত কাছারি-বাড়িতেই শুইয়া থাকে। সে বলিল, চুপিচুপি চলুন। কেষ্ট সিং কি নায়েববাবু যেন জানতে না পারেন, এখুনি হাউমাউ করে উঠবেন।

অমাবস্যার অন্ধকার, উর্ধ্বলোকে আকাশের বুকে তারার আলোকও স্পষ্ট নয়, দীর্ঘকাল অভিসিঞ্চনহীন অস্নাত পৃথিবীর সারা অঙ্গ বেড়িয়া ধূলার আস্তরণ পড়িয়াছে; সেই আস্তরণের অন্তরালে তারাগুলি বিবর্ণ, অস্পষ্ট। নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে তিনটি কিশোর নীরবেই চলিয়াছিল, একটা ভয়ঙ্কর কিছুর সহিত দেখা হওয়ার সতর্ক শঙ্কিত কৌতূহলে তাহারা ব্যগ্র উন্মুখ হইয়াই ছিল।

গোঁ—গোঁ! মৃদু কিন্তু ক্রুদ্ধ গর্জনধ্বনি। কুকুর, একটা কুকুর কোথা হইতে একটা শবের ছিন্নাঙ্গ লইয়া আসিয়া আহারে ব্যস্ত। মানুষের আগমনে বাধা অনুভব করিয়া নরমাংসের আস্বাদন-উগ্র জানোয়ারটা গর্জন করিতেছে; কয়েক পদ অগ্রসর হইয়াই—ও কি, মানুষের মত উপু হইয়া সারি দিয়া বসিয়া? ওঃ, শকুনি কয়টা, কুকুরটার মুখের ওই মাংসখণ্ডের প্রলোভনে বসিয়া আছে। দূরে কোথায় শৃগালে কোলাহল জুড়িয়াছে—শবদেহ লইয়া কলহ। মুক্ত প্রান্তরপথ এইবার ঘন জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, দুইধারে প্রকাণ্ড বড় বড় শিমুল আর অর্জুন গাছ; উপরের আকাশ পর্যন্ত দেখা যায় না। অমাবস্যার অন্ধকারেও মানুষের দৃষ্টি চলে, কিন্তু এ যেন তমোলোক, অতলস্পর্শী অন্ধকারে সব হারাইয়া যায়, আপনাকেও বোধ করি অনুভব করা চলে না। এই অন্ধকারের মধ্যে ক্ষুদ্র একটা নালা বহিয়া নদীতে গিয়া মিশিয়াছে, নালাটার উপর একটা সাঁকো। সাঁকোটার একটা থামের পাশে দীর্ঘকার ওটা কি? তিনজনেই থমকিয়া দাঁড়াইল। মানুষ, হাঁ মানুষ, দীর্ঘকায় একটা লোক নীরবে দাঁড়াইয়া আছে। হাতে একটা কি রহিয়াছে!

সুশীল প্রশ্ন করিল, কে?

হা-হা-হা-হা করিয়া হাসিয়া সে বলিল, ডর লাগিয়েছে বেটা? কৌন্ রে তু বাচ্ছা?

গোঁসাই-বাবা!—শিবু ছুটিয়া গিয়া তাঁহার হাত ধরিল।

শিবু! বাবা রে, তু এতনা রাতে? আর ই কৌন—ডাগদার বাবা-লোক?

সন্ন্যাসীই, শিবুর গোঁসাই-বাবাই বটে।

আমরা পুজো দেখতে যাচ্ছি গোঁসাই-বাবা। কিন্তু তুমি এখানে এমন করে দাঁড়িয়ে ছিলে কেন?

বহুত বঢ়িয়া আঁধিয়ার রে বাবা। মিশরকে লড়াইয়ে বেটা, একদিন একঠো বনের ভিতর এইসিন আঁধিয়ার দেখিয়েছিলো। হামি একা এক চিট্‌টি লেকে দুসরা ছাউনিমে যাতা রহা। দুশমন হামার পিছে লাগলো। উ রোজ এই আঁধিয়ার হাম্‌কো বাঁচাইলো বাবা। উ রাত হামার মনমে আসিয়ে গেলো, ওহি লিয়ে। নীরব হইয়া সন্ন্যাসী আবার একবার সেই প্রগাঢ় অন্ধকার দেখিয়া লইলেন, তারপর আবার বলিলেন, আও রে বাবা।

সুশীল অত্যন্ত মৃদুস্বরে কি বলিল, শিবনাথ বুঝিতে না পারিয়া বলিল, কি ?

সুশীল বলিল, মিলিটারি ডিসিপ্লিন-ট্রেনিঙের কথা বলছি।

সে অন্ধকার পার হইয়াই খানিকটা আসিয়া শ্মশান। শ্মশানে আলোর মালা, মানুষের মেলা। এখানে ওখানে দল বাঁধিয়া বসিয়া গিয়াছে ভক্তের দল, গোল হইয়া বসিয়া স্খলিতকণ্ঠে চিৎকার করিতেছে, মধ্যে মদের বোতল। কোথাও চলিতেছে গাঁজা। শ্মশানের মধ্যস্থলে একটা মাটির বেদীর উপর কালীপ্রতিমা। পুরোহিত সম্মুখে বসিয়া একটি জবার অঞ্জলি লইয়া বোধ হয় ধ্যানস্থ। গোঁসাই-বাবা গিয়া পুরোহিতের পাশে আসন করিয়া বসিলেন, জপ আরম্ভ করিবেন।

সুশীল প্রতিমার দিকে চাহিয়া বলিল, এ দেবতার এই হল উপযুক্ত পূজামণ্ডপ। শ্মশানের মাঝখানে, ওপরে অনাবৃত আকাশ, চারিপাশে শেয়াল-কুকুরের চিৎকার; এ না হলে মানায় না।

পূর্ণ মুগ্ধভাবে বলিল, অপূর্ব মূর্তি! এমন পরিকল্পনা বোধ হয় কোন দেশে কোন কালে হয় নি!

শিবনাথের মনে পড়িয়া গেল, সে বলিল, "কালী—অন্ধকারসমাচ্ছন্না কালিমাময়ী। হৃতসর্বস্ব, এইজন্য নগ্নিকা। আজি দেশের সর্বত্র শ্মশান—তাই মা কঙ্কালমালিনী। আপনার শিব আপনার পদতলে দলিতেছেন।...মা যা হইয়াছেন।"

সুশীল অদ্ভুত দৃষ্টিতে শিবনাথের মুখের দিকে চাহিয়া ছিল। শিবনাথ একটু বিস্ময় বোধ করিলেও হাসিয়া বলিল, 'আনন্দমঠ'। পড়েন নি ?

পড়েছি।

তবে এমন করে চেয়ে রয়েছেন যে ?

এবার সুশীল সহজ হাসি হাসিয়া বলিল, বড় ভাল কথা মনে পড়েছে আপনার। প্রণাম করুন মাকে।

তিনজনে দেবীপ্রতিমাকে প্রণাম করিল। সুশীল প্রশ্ন করিল, প্রণামের মন্ত্র ?

অর্ধপথেই বাধা দিয়া শিবনাথ হাসিয়া বলিল, জয়ন্তী মঙ্গলা কালী—ওসব ছেলেবেলায় শিখেছি আমরা।

হাসিয়া সুশীল বলিল, ঠকে গেলেন শিবনাথবাবু। হল না, ও মন্ত্রে 'আনন্দমঠে'র দেবতাকে প্রণাম করা হয় না।

শিবনাথ বলিল, বন্দে মাতরম্।

সুশীল বলিল, হ্যাঁ, বন্দে মাতরম্।

পূর্ণ বলিল, এবার চলুন, বাড়ি ফেরা যাক। রাত্রি অনেক হল।

আবার সেই অন্ধকার পথ। সহসা সুশীল বলিল, আপনার বিয়ে যদি না হত শিবনাথবাবু!

হাসিয়া শিবনাথ বলিল, কেন বলুন তো?

আমার বোন দীপার সঙ্গে আপনার বিয়ে দিতাম। ভারি চমৎকার মেয়ে! তা ছাড়া কত কাজ করতে পারতেন দেশের!

শিবু কোন উত্তর দিল না, তিনজনেই নীরব। নীরবেই আসিয়া তাহারা কাছারি-বাড়িতে উঠিল। সুশীল এতক্ষণে হাসিয়া বলিল, তাই তো শিবনাথবাবু, কলেরা-সুন্দরীর সঙ্গে দেখা হল না পথে। তার কথাটা একদম ভুলেই গিয়েছিলাম।

সত্যই, সে কথা কাহারও মনেই ছিল না। একটা ভাবাবেশের মধ্যে এতটা পথ তাহারা চলিয়া আসিয়াছে।

সতেরো

মাসখানেক পর। জ্যৈষ্ঠের প্রথম সপ্তাহ পার হইয়া যায়, প্রকৃতি সুস্থির হইয়াছে।

কালবৈশাখীর ঝড়ের মত যে বিপর্যয়টা গ্রামখানির উপর আসিয়া পড়িয়াছিল, সে বিপর্যয় শান্ত হইয়াছে। মহামারী থামিয়াছে। তাহার উপর উপর্যুপরি কয়েকদিন ঝড়বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, বর্ষণস্নিগ্ধ প্রকৃতির রূপও পরিবর্তন হইয়াছে, রৌদ্রের উত্তাপে আর সে আগুনের জ্বালার মত জ্বালা নাই, দাহ নাই, প্রান্তরে প্রান্তরে পথে পথে আর সে ধূলার ঘূর্ণি উঠে না, ধূসর মরুভূমির মত ধরিত্রীবক্ষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তৃণাঙ্কুর দেখা দিয়াছে, দূর হইতে সমস্ত মাঠটা এখন সবুজ বলিয়া মনে হয়, কাছে গেলে সে রঙ মায়ার মত মিলাইয়া যায়, শুধু সদ্যোদ্গত তৃণাঙ্কুরগুলি বিচ্ছিন্নভাবে ঝিকমিক করে। হাল-বলদ লইয়া চাষীরা মাঠে পড়িয়াছে, আউশ ধানের বীজ ফেলার সময়, আর যে নিশ্বাস ফেলিবার সময় নাই।

রাখাল সিং বীজধানের হিসাব করিতেছিলেন। কেষ্ট সিং বাড়ির কৃষাণদের শাসন আরম্ভ করিয়াছে, বলি, জমি ক কাঠা চষেছ, সারই বা ক গাড়ি ফেলেছ যে, একেবারে এসে খাবার ধানের জন্যে রাঘব-বোয়ালের মত হাঁ করে দাঁড়ালে?

কৃষাণদের মুখপাত্র বাহারুদ্দিন শেখ বলিল, তা, বলতে পার সিংজী, ই কথা তুমি বলতে পার। তবে ইটাও তো ভাল সমঝ করতে হবে যে, গ্যাশের হালটা কি গেল! ইয়ার মধ্যে কাম-কাজ কি করা যায়, সিটা তুমিই ভালা বল।

অন্য একজন বলিল, আর বাপু, আজ সব মুখে হাসি দেখা দিয়াছে, কথা ফুটেছে, এতদিন বলে হাত-পা সব প্যাটের ভিতর সেঁদালছিল। ছেলেন আমাদের বাবু, আহা-হা, আল্লার দোয়ায় বাবু আমার আমির-বাদশা হবেন, বাবু ছেলেন তাই বাঁচলাম, চাষ-আবাদ করবার লাগি আবার এসে দাঁড়ালাম। তুমি বল কি সিংজী, তার ঠিকানা নাই!

রাখাল সিং বলিলেন, তা হলে তিরিশ বিঘে জমির আউশের বীজ তোমরা এক বিশই বার করে দাও। আর তোমরা শোনো বাপু, এখন জানাচ্ছি, পাঁচ টিনের বেশি খোরাকী ধান দিতে পারব না। হুকুম নেই, যেতে হয় যাও পিসীমার কাছে।

শিবনাথ নিতান্ত অন্যমনস্কভাবে শ্রান্ত অলস পদক্ষেপে কাছারিতে প্রবেশ করিল। সুশীল ও পূর্ণ চলিয়া গিয়াছে। শিবনাথ এখন একা পড়িয়াছে। এই কঠিন এবং অবিশ্রাম পরিশ্রমের ফলে তাহার শরীর অল্প শীর্ণ হইয়া গিয়াছে, অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ বলিয়া ভ্রম হয়; মাথার চুলগুলিও কাটিবার অবসর হয় নাই, পারিপাট্য ও প্রসাধন-যত্নের

অভাবে চুলগুলি অবিন্যস্ত রুক্ষ, মৃদু বাতাসে সেগুলি অল্প অল্প কাঁপিতেছিল, চোখের দৃষ্টি চিন্তাপ্রবণ।

শিবনাথকে দেখিয়াই বাহারুদ্দিন ও অপর কৃষাণগণ সসম্ভ্রমে উঠিয়া সেলাম করিল। বাহারুদ্দিন বলিল, হুজুর রইছেন, আমাদের হুজুরের কাছে আমরা দরবার করছি। আমরা কি বাল-বাচ্চা নিয়ে না খেয়ে মরব নাকি? হুকুম দিয়ে যান হুজুর, না হলে আমরা যাব কোথা?

শিবনাথের চিন্তায় বাধা পড়িল, সে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া জিজ্ঞাসুনেত্রে বোধ করি সকলের দিকেই চাহিল। বাহারুদ্দিন আড়ম্বর করিয়া আর একটা বক্তৃতা ভাঁজিবার উপক্রম করিতেছিল, কিন্তু রাখাল সিং বলিলেন, থাম হে বাপু তুমি। ওসব হুজুর, দয়াল, মা-বাপ বলে আমড়াগাছি করতে হবে না তোমাকে।

শিবনাথের বিরক্তিব্যঞ্জক ভ্রূকুটি কৌতুকে প্রসন্ন হইয়া উঠিল, সে হাসিয়া বলিল, হুজুর, দয়াল, তারপর দরবার, এগুলো তো বাহারুদ্দিন ভাল কথাই বলছে সিং মশায়, যাকে আপনাদের এস্টেটে বলে—আদব-কায়দাদোরস্ত কথা। কিন্তু ব্যাপারটা কি?

রাখাল সিং বলিলেন, কথাতে ভালই বটে, কিন্তু মতলবটি যে খারাপ। আপন কাজ হাসিলের জন্যে, স্বার্থের জন্যে ওসব হুজুর, দয়াল, দরবার, এ তো ভাল নয়।

কিন্তু সংসারে বড়লোকমাত্রেই তো গরিবলোকের কাজ হাসিল আর স্বার্থের জন্যেই কেবল হুজুর আর দয়াল সেজে বসে আছে। কাজের দায় না থাকলে আর কে কাকে হুজুর বলে, বলুন? তারপর হল কি আপনাদের?

রাখাল সিং এ মন্তব্যে মনে মনে বিরক্ত হইয়া উঠিলেন ও আলোচনাটা বন্ধ করিয়া দিয়াই কাজের কথা উপস্থাপিত করিলেন। এখনও এবার মাঠে চাষের কাজকর্ম একেবারে কিছুই হয় নাই বলিলেই চলে, মাঠে এক গাড়ি সার পর্যন্ত ফেলা হয় নাই; বৃষ্টির পর এই সবে কাজকর্মের প্রারম্ভ, এখন হইতেই কৃষাণের দল অত্যন্ত বেশি পরিমাণে ধান ধার চাহিতেছে। সম্মুখে এখন সমগ্র বিরাট বর্ষাটাই পড়িয়া আছে, সমস্ত বর্ষাভোর তাহাদের খাদ্যের ধান ধার দিতে হইবে, কৃষাণ ছাড়া ভাগজোতদার আছে, অভাবী প্রজা আছে, সকলকেই রক্ষা করিতে হইবে। সুতরাং কৃষাণদের দাবির পরিমাণ ধান তো দেওয়া হইতেই পারে না, এমন কি তাঁহাদের মতে এখন ধান দেওয়াই উচিত নয়। কৃষাণেরা চাষের কাজ আরম্ভ করুক, কাজ দেখিয়া পরে ধান দেওয়া যাইবে। শেষে রাখাল সিং বলিলেন, তবে দানছত্র খুলে দেন, সে আলাদা কথা।

বাহারুদ্দিন সঙ্গে সঙ্গে এক সেলাম করিয়া বলিল, হুজুরের আমার অভাব কি? দানছত্রই কি খুলতে হুজুর আমার পারেন না? এই যে হুজুর দিলেন খেতে এই সব

বাউড়ী-ডোম-মুচীদের, আল্লার দরবার তাকাত চলে গেল খবর, লেখা হল সিখানে ; এই বছরই দেখবেন, আল্লা ক্ষ্যাতে কি ফসলটা ফলিয়ে দ্যান।

শিবনাথ বলিল, না না বাহারুদ্দিন, খেতে একা আমি দিয়েছি—এ কথা তোমাকে কে বললে ? গ্রামের সকলেই দিয়েছেন আপন আপন সাধ্যমত। এ কথা তোমরা যেন আর বোলো না। তোমরা আমাদের বাড়ির লোক, তোমাদের মুখে এ কথা শুনলে দোষ দেবে আমাকেই।

আজ্ঞে না হুজুর, এমন অন্যায় কথা বলব কেনে, বলুন ? দিয়েছেন বইকি যার যার যেমন সাধ্যি, তবে হুজুর, 'ঘি লইলে তো মাড়ন' হয় না, মাথা লইলে কাজ হয় না, আপনি হলেন সেই মাথা, সেই ঘি।

যাকগে। এখন তোমরা ধান চাচ্ছ, তা একটু কম-সম করেই নাও না। পরে আবার নেবে। যখন তোমাদের দরকার হবে, পাবে। এ তো তোমরা ভিক্ষে নিচ্ছ না, ধার নিচ্ছ ; ফসল হলে আবার শোধ দেবে।

আগাম হুজুর, আগাম আপনার ধানটি শোধ করব, তবে আমরা ঘর লিয়ে যাব। শোধ দিয়ে ফেরত না পাই, হাত-পা ধুয়ে ঘর যাব হুজুর।

তা হলে তাই দিন নায়েববাবু, যা দিতে চাচ্ছেন আর কিছু বেশি দিন, একটা মাঝামাঝি করে দিন, ওরাও তো আমাদেরই মুখ চেয়ে আছে, অভাব হলে ওরা আর যাবে কোথায় বলুন ?

অ্যাই ! হুজুরের চাষ-কাম করছি, দোসরা কার দুয়ারে আমরা হাত পাততে যাব, বলেন ?

শিবনাথ আর কথা না বাড়াইয়া শ্রীপুকুরের ঘাটের দিকের বারান্দায় আসিয়া একখানা ডেক-চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিল। এদিকটা অপেক্ষাকৃত নির্জন, সম্মুখেই কাজল-কালো জলভরা পুকুরটির ধারে ধারে শালুক ও রক্তকমলের জলজ-লতায় ফুল ফুটিয়াছে, পানাড়ির পাতলা পাতার ঘন দলের মধ্যে অসংখ্য ছোট ছোট সাদা ফুল আকাশভরা তারার মত ফুটিয়া আছে, মাঝে মাঝে কলমী-লতার বেগুনী রঙের ফুল দুই-চারিটাও দেখা যায়। জলের ধারে বাতাসও অপেক্ষাকৃত স্নিগ্ধ।

তাহার জীবনে যেন অবসাদ আসিয়াছে, এই মাসখানেকের প্রবল উত্তেজনায় কর্মসমারোহের পর কেমন যেন নীরব শান্ত হইয়া গিয়াছে শিবনাথ। সুশীল ও পূর্ণ চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু সাহচর্যের এমন একটা আস্বাদ তাহারা দিয়া গিয়াছে যে, আর তাহার এখানকার বন্ধুদের সাহচর্য তেমন মধুর এবং রুচিকর মনে হয় না। সে বসিয়া বসিয়া কর্মমুখর দিন কয়টির কথা ভাবে ; ভাবিতে ভাল লাগে, মন গৌরবে আনন্দে ভরিয়া উঠে। একটা গৌরবময় ভবিষ্যৎ কল্পনা করিতে মন অধীর হইয়া পড়ে।

প্রাসাদ নয়, ধন-সম্পদ নয়, গাড়ি নয়, ঘোড়া নয়, বিশাল জমিদারি নয়, কৃচ্ছ্রসাধনধন্য ত্যাগের দীপ্তিতে উজ্জ্বল ভাস্বর জীবন। সে কল্পনার মধ্যে তাহার পিসীমা তাহার জন্য কাঁদিয়া সারা হন, মা ম্লানমুখে অশ্রুসজলনেত্রে তাহার যাত্রাপথের দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকেন, নিরুদ্ধ অশ্রুসাগর বুকে করিয়া গৌরী উদাসিনীর মত পিছনে পড়িয়া থাকে, আর সে চলে সম্মুখের আহ্বানে; দুর্গম পথ, আকাশে দুর্যোগ, আলোক নিবিয়া আসিতেছে, অন্ধকার—প্রগাঢ় অন্ধকার; দুইপাশে ঘন বন, বনপথের অন্ধকার অতলস্পর্শী সূচীভেদ্য, সে অন্ধকারের মধ্যে আপনাকেও অনুভব করা যায় না, অগ্র নাই পশ্চাৎ নাই, তবু সে চলে। সে অন্ধকারের ওপারে আলোকিত শ্মশানে শ্মশানকালী—মা যা হইয়াছেন।

কল্পনার সঙ্গে অদ্ভুতভাবে সেদিনের বাস্তব স্মৃতি মিশিয়া এক হইয়া যায়।

তাহার মনে পড়িল, সেই রাত্রেই ওই 'মা যা হইয়াছেন' আলোচনাপ্রসঙ্গে 'আনন্দমঠের' কথা উঠিয়াছিল—

"সেই অন্তশূন্য অরণ্যমধ্যে, সেই সূচীভেদ্য অন্ধকারময় নিশীথে, সেই অননুভবনীয় নিস্তব্ধ মধ্যে শব্দ হইল, 'আমার মনস্কাম কি সিদ্ধ হইবে না?' উত্তরে অন্ধকার অরণ্যের মধ্য হইতে অশরীরী বাণীর প্রশ্ন ধ্বনিত হইল, 'তোমার পণ কি?' 'পণ আমার জীবন সর্বস্ব।' 'জীবন তুচ্ছ; সকলেই ত্যাগ করিতে পারে।' 'আর কি আছে? আর কি দিব?' তখন আবার উত্তর হইয়াছিল, 'ভক্তি।'" সুশীল বলিয়াছিল, দেশ কি বাইরে শিবনাথবাবু? দেশের বসতি মানুষের মনে, মাটি মা হয়ে ওঠেন ওই ভক্তির স্পর্শে, মৃন্ময়ী চৈতন্যরূপিণী চিন্ময়ী হয়ে ওঠেন ওই সাধনায়।

তাহার তরুণ বক্ষখানি ভাবাবেগে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল।

বাবু! জামাইবাবু!

কণ্ঠস্বরে চকিত হইয়া মুখ ফিরাইয়া দেখিল, অর্ধ-অবগুণ্ঠনবতী একটি মেয়ে তাহাকে ডাকিতেছে। সেই ডোমেদের বধূটি। মেয়েটির মুখে একটি শীর্ণতার ছায়া এখনও বিদ্যমান, তবুও সে অনেকটা সারিয়া উঠিয়াছে। বধূটি রূপবতী নয়, শ্রীমতী; তার ঈষৎ দীর্ঘ দেহখানি পাথরে খোদা মূর্তির মত সুগঠিত, রোগের শীর্ণতার মধ্যেও নিটোল লাবণ্য একেবারে মুছিয়া যায় নাই। এখন আবার সে লাবণ্য স্বাস্থ্যের স্পর্শে সজীব সতেজ হইয়া উঠিতেছে। শিবনাথ তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিতেই সে ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, আপনকার কাছে আবার এলাম বাবু, বেপদে পড়ে আর কার কাছে যাব বলেন?

বিপদ! আবার কি বিপদ হল তোমার?

মেয়েটি মুখ নীচু করিয়া বলিল, আমাকে একটি কাজ দেখে দ্যান বাবু, উ বাড়িতে আর আমি থাকতে লারছি।

শিবুর মনে পড়িয়া গেল মেয়েটির ভূতের ভয়ের কথা। সে হাসিয়া বলিল, ভূত-টুত সংসারে নেই বাপু, ওসব মিথ্যে কথা। ওই তো এতদিন এ বাড়িতেই—

বাধা দিয়া মেয়েটি বলিল, আজ্ঞে না বাবু, ভূত লয়, শাশুড়ী ভাশুর দেওর এরা আমাকে বড় জ্বালাইছে মাশায়; রেতে নিশ্চিন্দি ঘুমোবার জো নাই।

কেন?—শিবুর মন উত্তপ্ত হইয়া উঠিল।

মেয়েটির ঠোঁট দুইটি এবার থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, সে এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিল না। কিছুক্ষণ পরে মৃদুস্বরে ধীরে ধীরে বলিল, আমাকে বলে বাবু, ওই ভাশুরকে সেঙা করতে।

শিবনাথ আশ্চর্য হইয়া গেল, কেবল আশ্চর্য নয়, পুনর্বিবাহে মেয়েটির অসম্মতি দেখিয়া তাহার স্নেহ যেন খানিকটা বাড়িয়া গেল। সে বলিল, তুমি কি আর বিয়ে করবে না?

নতমুখেই মেয়েটি বলিল, না। আপুনি একটি কাজ দেখে দ্যান, সেখানেই কাজ করব, পড়ে থাকব আমি।

কোথায় কাহার বাড়িতে কাজ খুঁজিতে যাইবে সে? চিন্তিতমুখেই শিবনাথ বলিল, আচ্ছা, দেখি।

এবার চোখের জল মুছিয়া বধূটি অল্প একটু হাসিয়া বলিল, এমন করে কি ভাবছিলা জামাইবাবু?

কখন?

এই আমি এলাম, চার-পাঁচ বার ডাকলাম, শুনতেই পেলে না মাশায়। দুই ঘুড়ির মতন মনটি যেন আকাশে উড়ে বেড়াইছে।

শিবনাথ একটু হাসিল, কি উত্তর সে তাহাকে দিবে? কি বুঝিবে সে?

মেয়েটি এবার ফিক করিয়া হাসিয়া বলিল, নাস্তিদিদির কথা ভাবছিলা বুঝি?

শিবনাথের দৃষ্টি রূঢ় হইয়া উঠিল, একটা ইতরশ্রেণীর নারীর রহস্যালাপে তাহার আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগিল; আর একদিন মেয়েটা এইভাবে রহস্যালাপের চেষ্টা করিয়াছিল। মেয়েটি সে দৃষ্টির আঘাতে সঙ্কুচিত হইয়া গেল, বিনয় করিয়া নিবেদনের ভঙ্গিতে বলিল, রাগ করলেন জামাইবাবু? আপুনি আমাদের জামাইবাবু কিনা, তাতেই বললাম মাশায়।

আত্মসম্বরণ করিয়াও শিবনাথ ঈষৎ রূঢ়স্বরেই বলিল, আচ্ছা, যা তুই এখন।

আমার লেগে একটি কাজ দেখে দিয়েন মাশায়; ডোমের মেয়ে, ময়লা মাটি নদ্দমা পরিষ্কার যা বলবেন তাই করব আমি।

হুঁ।—শিবনাথ কথা বন্ধ করিবার অভিপ্রায়েই সংক্ষেপে কহিল, হুঁ। আবার সে মুখ ফিরাইয়া আকাশের দিকে চাহিয়া ছিন্ন চিন্তাসূত্রের প্রান্তের সন্ধান করিতে বসিল। মেয়েটা কিছুক্ষণ নীরবে কাপড়ের আঁচলে পাক দিয়া ধীরে ধীরে, যেমন অজ্ঞাতসারে আসিয়াছিল, তেমনই অজ্ঞাতসারেই চলিয়া গেল। শিবনাথ মুখ ফিরাইয়া দেখিল, মেয়েটি চলিয়া গিয়াছে। তাহার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল, না, এমন রূঢ় হওয়া ভাল হয় নাই।

মেয়েটির আত্মীয়তার সুরটি বড় মিষ্ট। সে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। মনটা এই এতটুকু হেতুকে অবলম্বন করিয়াই কেমন বিমর্ষ হইয়া গেল। ছিন্ন চিন্তার সূত্র কোথায় হারাইয়া গিয়াছে, শিবনাথ সে সূত্রের সন্ধান আর পাইল না। আবার একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে চোখ বুজিল। গৌরীর প্রতি অবিচারের অপরাধ আর সে বাড়ায় নাই। গৌরীকে পত্র দিয়াছে। এইবার গৌরীর পত্র আসিবে। পত্র আসিবার সময় হইয়াছে, চিঠি বিলি হইবারও তো সময় হইয়া আসিল। শিবনাথ একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল, ডাকিল, কেষ্ট সিং!

পত্র-রচনায় নিবিষ্টচিত্ত কিশোরী গৌরীর মূর্তি তাহার মনের মধ্যে বিনা ধ্যানেই জাগিয়া উঠিল। কিশোরী গৌরী, পরনে তাহার নীলাম্বরী, অধরকোণে মৃদু হাসি, চিঠি লিখিতে লিখিতে আপনি তাহার মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছে।

কেষ্ট আসিয়া দাঁড়াইতেই শিবনাথ বলিল, পথের ওপর একটু নজর রেখো তো, পিওন এলে চিঠি থাকলে নিয়ে আসবে আমার কাছে।

চিঠি লইয়া স্বয়ং শৈলজা ঠাকুরানী আসিয়া দাঁড়াইলেন, তোর চিঠি শিবনাথ।

সুন্দর একখানি খামের চিঠি, ইংরেজীতে ঠিকানা লেখা। শিবনাথের বুকটা ধড়াস করিয়া উঠিল। সে কম্পিত হাত বাড়াইয়া দিয়া চিঠিখানা গ্রহণ করিল।

শৈলজা ঠাকুরানী প্রশ্ন করিলেন, কোথাকার চিঠি রে? বউমা চিঠি দিয়েছেন বুঝি?

পোস্ট-অফিসের ছাপই শিবনাথ দেখিতেছিল, ম্লান হাসি হাসিয়া সে বলিল, না, কলকাতা থেকে আসছে। বোধ হয়—

চিঠিখানা বাহির করিয়া দেখিয়া বলিল, হ্যাঁ, সুশীলবাবুই লিখেছেন।

সুশীল?

হ্যাঁ।

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া পিসীমা বলিলেন, বউমা চিঠিপত্র তো লেখেন না?

না।

তুই? তুই তো দিলে পারিস।

শিবনাথ এ কথার উত্তর দিল না; সত্য বলিতেও শঙ্কা হইতেছিল, মিথ্যা বলিতেও মন চাহিতেছিল না। আবার শৈলজা ঠাকুরানী বলিলেন, তুই চিঠি না দিলে সে কি নিজে থেকে প্রথমে পত্র দিতে পারে.?

শিবনাথের মুখ-চোখ রাঙা হইয়া উঠিল, সে এবার অকুণ্ঠিত দৃষ্টিতে পিসীমার মুখের দিকে চাহিয়া অকারণে দৃঢ়স্বরে উত্তর দিল, আমি চিঠি দিয়েছি।

পিসীমা স্তম্ভিতভাবে শিবনাথের মুখের দিকে চাহিয়া আহতকণ্ঠে বলিলেন, সে কথা তুই এমনভাবে বলছিস কেন শিবনাথ? আমি দুষ্যভাবে কিছু বলি নি।

ইহার পর শিবনাথ আর উত্তর দিতে পারিল না, সে গভীর মনোযোগের সহিত সুশীলের চিঠিখানার উপর ঝুঁকিয়া পড়িল। দীর্ঘ পত্র—কলিকাতায় কখন কোন্ ট্রেনে শিবনাথ যাইবে জানাইবার জন্য বার বার লিখিয়াছে। সে স্টেশনে থাকিবে, তাহাদের বাড়িতেই তাহাকে প্রথম উঠিতে হইবে। "দীপা তো অসীম আগ্রহ আর কৌতূহল লইয়া আপনার অপেক্ষা করিয়া আছে। আপনার অভ্যর্থনার জন্য সে একখানা নূতন শাড়িই কিনিয়া ফেলিয়াছে। তাহার ধারণা, আট বছর বয়সেই সে অনেক বড় হইয়া উঠিয়াছে, আর কি ভদ্রলোকের সম্মুখে ফ্রক পরা যায়!"

শিবনাথের মুখে হাসি দেখা দিল। শৈলজা-ঠাকুরানী এই অবসরে কখন সেখান হইতে চলিয়া গিয়াছেন।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বঞ্চনা অথবা বঞ্চনার সম্ভাবনায় মানুষ প্রাণপণ শক্তি লইয়া তাহার প্রতিকারের জন্য যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া দাঁড়ায়, উচ্চকণ্ঠে সে আপনার দাবি লইয়া কলহ করে; কিন্তু যেদিন অকস্মাৎ আসে চরম বঞ্চনা, আপনার সর্বস্ব এক মুহূর্তে আপনার অজ্ঞাতে পরহস্তগত হইয়া যায় বা হারাইয়া যায়, সেদিন একান্ত শক্তিহীন হতভাগ্যের মত নীরবে তাহা মাথা পাতিয়া লওয়া ছাড়া আর গত্যন্তর থাকে না। শিবুর রক্তাভ মুখের উত্তাপ আর ওই কয়টি দৃপ্ত কথায় সুরের মধ্যে যেন লুকাইয়া ছিল কালবৈশাখীর মেঘের বিদ্যুৎ আর বজ্রধ্বনি; শৈলজা ঠাকুরানীর জীবনের প্রাসাদখানিকে যেন একেবারে চৌচির করিয়া দিল। বঞ্চনার বেদনায় তিনি ক্ষীণ আর্তনাদ পর্যন্ত করিলেন না, সংসারের কাহারও কাছে কথাটা প্রকাশ পর্যন্ত করিলেন না, নীরবে নতশিরে আসিয়া পূজার ঘরে প্রবেশ করিলেন।

অস্বাভাবিক বিলম্বে জ্যোতির্ময়ী দুইবার আসিয়া ননদকে পূজায় নিযুক্ত দেখিয়া ফিরিয়া গেলেন, তৃতীয় বারে আসিয়া কথা কহিবার প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিলেন।

অত্যন্ত শান্তকণ্ঠে শৈলজা ঠাকুরানী বলিলেন, আমার জন্যে দাঁড়িয়ে আছ?

জ্যোতির্ময়ী বলিলেন, বেলা যে অনেক হল ঠাকুরঝি।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া তিনি বলিলেন, যাই।

ধীরে ধীরে প্রণাম সারিয়া পূজার সরঞ্জামগুলি নিজেই পরিষ্কার ও গোছগাছ করিতে করিতে বলিলেন, ওপর আর নীচে—দু দিকে একসঙ্গে চোখ রাখা যায় না বউ।

জ্যোতির্ময়ী তাঁহার হাত হইতে বাসনগুলি টানিয়া লইয়া বলিলেন, চল না ভাই, একবার তীর্থ করে আসি।

শৈলজা ঠাকুরানী বলিলেন, যাব। শিবুর ঘর পেতে দিয়ে একেবারে যাব ভাই।

জ্যোতির্ময়ী কথাটা সহজভাবেই গ্রহণ করিলেন, হাসিয়া বলিলেন, শিবুর ঘর গোছগাছ করে শেষ করতে পারবে তুমি? তোমার সাজানোই শেষ হবে না।

শৈলজা ঠাকুরানী হাসিলেন, বলিলেন, বউমাকে আনবার জন্যে আজই চিঠি দোব আমি। নিজের বউকে অন্যের ওপর রাগ করে বাইরে ফেলে রাখা আমাদের ভুল হচ্ছে ভাই। শিবুর দুঃখ হয়, বোধ হয় রাগও হয়।

জ্যোতির্ময়ী ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, না। তাঁরা নিয়ে গেছেন, তাঁরাই পাঠিয়ে দিন। আমরা আনতে পাঠাব কেন?

না, পাঠাতে হবে। চিরকাল তুমি আমার কথা মেনে এসেছ বউ, এ কথাটাও তোমাকে মানতে হবে। তুমি 'না' বলতে পাবে না।

ননদের মুখের দিকে সবিস্ময়ে চোখ ফিরাইয়া জ্যোতির্ময়ী বলিলেন, তোমায় কি কেউ কিছু বলেছে ঠাকুরঝি?

বার বার ঘাড় নাড়িয়া অস্বীকার করিয়া শৈলজা বলিলেন, না না না। কার ক্ষমতা আমাকে কিছু বলে, আমি বড় বাপের মেয়ে, আমি বড় ভাইয়ের বোন, আমি শিবুর পিসীমা।

তুমি আমায় লুকোচ্ছ ঠাকুরঝি।

না না ভাই। আজ পুজোয় বসে ইষ্টদেবতার মূর্তি মনে আনতে পারলাম না বউ, বার বার বউমাকেই আমার মনে পড়ল। তুমি 'না' বোলো না, বউমাকে আমি আনব। সে আমার ঘরের লক্ষ্মী, আর শিবুও আমার বড় হয়েছে।

জ্যোতির্ময়ীর চোখও ধীরে ধীরে জলে ভরিয়া উঠিল। বধূকে লইয়া তাঁহার মনের মধ্যে একটা গ্লানি অহরহ জমিয়া থাকিত। সে গ্লানি আজ যেন নিঃশেষে ধুইয়া মুছিয়া গেল।

আঠারো

শৈলজা ঠাকুরানী অত্যন্ত প্রশান্তভাবেই সকল ব্যবস্থা করিলেন। পত্র সেই দিনই লেখা হইয়াছিল। তিনি নিজে বলিয়াছিলেন, নায়েব লিখিয়াছিলেন।—"বধূমাতা বারো পার হইয়া তেরোয় পড়িয়াছেন, এইবার তাঁহার ঘর বুঝিয়া লইবার সময় হইয়াছে। আমি বহু দুঃখকষ্টে শিবনাথকে মানুষ করিয়াছি, তাহার বিবাহ দিয়াছি। এইবার তাহার সংসার পাতাইয়া দিয়াই আমার কাজ শেষ হইবে। আমার জীবনের দুঃখকষ্টের কথা আপনারা জানেন, আমিও এইবার বিশ্বনাথের শরণ লইতে চাই। বধূমাতার হাতে সংসার তুলিয়া দিতে পারিলেই আমি নিশ্চিন্তমনে কাশীবাস করিতে পারিব। সেইজন্য লিখি, এই মাসের মধ্যে একটি শুভদিন দেখিয়া বধূমাতাকে এখানে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলে পরম সুখী হইব।"

চিঠি আজ কয়েকদিনই হইল ডাকে দেওয়া হইয়াছে। এখন তিনি শিবুর শুইবার ঘরখানি পরম যত্নের সহিত মাজিয়া ঘষিয়া উজ্জলতর করিয়া তুলিতে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। ঘরে কলি ফিরানো হইয়া গিয়াছে, জানালায় দরজায় রঙ দেওয়া হইতেছে, রঙের কাজ শেষ হইলে কাঠ-কাটরার আসবাবে বার্নিশ দেওয়া হইবে। রঙ-মিস্ত্রী বলিল, মা, ঘরখানা তেল-রঙ দিয়ে বেশ চমৎকার করে লতা ফুল এঁকে দিই না কেন, দেখবেন, কি বাহার খুলবে ঘরের!

লতা ফুল! শৈলজা-ঠাকুরানী বলিলেন, বেশ তো, কিন্তু তোমরা ওই ওদের বাড়িতে যে গোলাপফুল এঁকেছ, ও চলবে না। ও বাপু বিশ্রী হয়েছে।

পদ্মফুল এঁকে দিব মা, আপনার পছন্দ না হয়, আমাদের মেহনত বরবাদ যাবে, দাম দিবেন না আপনি।

তেল-রঙ করিয়া দিবারই অনুমতি হইয়া গেল। সেদিন সকালে শিবুকে ডাকিয়া বলিলেন, এই ছবিগুলো পছন্দ করে দে তো শিবু। এক বোঝা ছবি লইয়া অনন্ত বৈরাগী দাওয়ার উপর বসিয়া ছিল। শৈলজা দেবীর এই ভাবান্তরের হেতু অপরে না জানিলেও শিবুর অজানা ছিল না। এই প্রগাঢ় মমতার বহিঃপ্রকাশের অন্তরালে সকরুণ বৈরাগ্যের বিপরীতমুখী স্রোতোবেগের উচ্ছ্বসিত প্রবাহ তাহার চিত্তলোকের তটভূমিতে আঘাত করিয়া যেন অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল। মনে মনে লজ্জা ও অনুতাপের আর অবধি ছিল না। কিন্তু প্রকাশ্যে ক্ষমা চাহিয়া এই ঘটনাটিকে স্বীকার করিয়া লওয়ার লজ্জা বরণ করিয়া লইতেও সে কোনমতে পারিতেছিল না। এ লজ্জা যেন ওই অপরাধের লজ্জা হইতেও গুরুতর। অন্তরে অন্তরে অত্যন্ত সহজ ভঙ্গিতে আত্মসমর্পণের একটি পরম

ক্ষণের জন্য সে সর্বান্তঃকরণে লালায়িত হইয়া ফিরিতেছিল। আহ্বানমাত্রেই সে পিসীমার কোলের কাছে বসিয়া পড়িল।

অনন্ত বৈরাগী ছবির বোঝা শিবনাথের সম্মুখে আগাইয়া দিল। কাঠের ব্লকে ছাপানো দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী, যুগলমিলন প্রভৃতি দেবতার মূর্তি। শিবনাথ দেখিয়া দেখিয়া বলিলেন, এর মধ্যে তোমার কোনগুলো পছন্দ শুনি? দেখি তোমার সঙ্গে আমার পছন্দের মিল হয় কি না!

বিচিত্র হাসি হাসিয়া পিসীমা বলিলেন, তোদের পছন্দের সঙ্গে কি আমাদের পছন্দের কখনও মিল হয় রে। তোরা এককালের, আমরা সেই আর এককালের।

শিবনাথের চিত্তলোকের তটভূমিতে এ একটি পরম উচ্ছ্বসিত তরঙ্গের আঘাত, তবুও সে কোনমতে আত্মসম্বরণ করিয়া হাসিয়া বলিল, তাই কি হয়! আমার শিক্ষা, আমার রুচি, সব কিছুই তো তোমার কাছ থেকে আমি পেয়েছি। দেখো তুমি, কখনও তোমার আমার পছন্দের গরমিল হবে না। আচ্ছা, আমি বলে দিচ্ছি, এ ছবির একখানাও তোমার পছন্দ হয় নি।

শৈলজা ঠাকুরানী স্বল্প বিস্ময়ের সহিত বলিলেন, না, আমার পছন্দ হয় নি শিবু।

হাসিয়া শিবনাথ বলিল, তোমার মনের কথা আমি যে টের পাই।

অকস্মাৎ পিসীমার চোখের কূল ছাপাইয়া দুই বিন্দু জল ঝরিয়া পড়িল। শিবনাথ মৃদুস্বরে বলিল, আমার ওপর তুমি রাগ করেছ?

তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া শৈলজা ঠাকুরানী বলিলেন, অনন্ত, এ ছবি তুমি নিয়ে যাও, কাল-পরশুর মধ্যে রবিবর্মার ছবি এনে দিতে পার তো নিয়ে এস। যাও, তুমি এখন যাও।

অনন্ত চলিয়া গেলে শিবনাথ আবার বলিল, তুমি আমার ওপর রাগ করেছ?

পিসীমা হাসিয়া বলিলেন, তুই খানিকটা পাগলও বটে শিবনাথ।

কই, আমার গায়ে হাত দিয়ে বল দেখি।

না।—ত্রস্তভাবে পিসীমা বলিয়া উঠিলেন, না। গায়ে হাত দিয়ে শপথ করে কি কোন কথা বলতে আছে!

শিবনাথ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া রহিল; পিসীমার ওই চকিত ভঙ্গির মধ্যে উত্তেজনার আভাস পাইয়া প্রসঙ্গটা লইয়া অগ্রসর হইতে তাহার শঙ্কা হইল। শৈলজা ঠাকুরানী সস্নেহে তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া বলিলেন, জানিস, লুণ্ঠন-ষষ্ঠীর কথাতে আছে, সোনার ষষ্ঠীর মূর্তি নিয়ে গিয়েছিল ইঁদুরে। গেরস্থের বাড়িতে ছিল বউ আর মেয়ে; বউ সন্দেহ করলে, মেয়ে চুরি করেছে সোনার ষষ্ঠীমূর্তি। মেয়ে মনের তাপে তার একমাত্র ছেলের মাথায় হাত দিয়ে দিব্যি করলে। অপরাধ নেই, পাপ নেই,

তবু ওই ছেলের মাথায় হাত দিয়ে শপথ করার অপরাধে তার ছেলেটি তিন দিনের দিন হঠাৎ মরে গেল। গায়ে হাত দিয়ে, মাথায় হাত দিয়ে শপথ করতে আছে রে! তবে রাগ আমি তোর ওপর করি নি।

শিবনাথ এ কথারও কোন উত্তর দিল না, অভিমানের আবেগে তাহার মন ভরিয়া উঠিতেছিল, এমন কোন্ অপরাধ সে করিয়াছে যে, তাহার মার্জনা নাই? আর এ কি সত্যই অপরাধ?

পিসীমা আবার বলিলেন, হ্যাঁ, দুঃখ খানিকটা আমার হয়েছিল, কিন্তু দুঃখ যার জীবনে সমুদ্রের মত আদি-অন্তহীন, শিশিরবিন্দুর মত এক বিন্দু দুঃখ যদি তার ওপর বাড়ে, তাতে কি আর কিছু যায় আসে রে? সে আমি ভুলে গেছি। বউমাকে যে পাঠাতে লিখেছি, সেও রাগের বশে নয়; সে আমার সাধ, সে আমার কর্তব্য, আর বউমার ওপর রাগ-অভিমান করাও আমার ভুল। সে বালিকা, তার অপরাধ কি? তাকে শিখিয়ে পড়িয়ে তার হাতে সংসার তুলিয়ে না দিলে আমাদের হঠাৎ কিছু হলে সংসার ধরবে কে? সংসার তো তারই। সংসারের ওপর আমাদের অধিকার তো ভগবান কেড়ে নিয়েছেন, এখন জোর করে বউমার সংসারে বউমাকে বাদ দিয়ে মালিক হতে গেলে ভগবান যে ক্ষমা করবেন না বাবা।

শিবু কোন উত্তর না দিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া চলিয়া গেল। কিন্তু পিসীমার এত দীর্ঘ সস্নেহ কৈফিয়তেও তাহার মনের অভিমান দূর হইল না। বরং বার বার তাহার মনে হইল, সংসার-জীবনে তাহার প্রয়োজন নাই। থাক্ হতভাগিনী গৌরী তপস্বিনীর মত, সেও ব্রহ্মচারীর মত জীবনটা কাটাইয়া দিবে। কাছারি-বাড়িতে আসিয়া সে শ্রীপুকুরের সম্মুখে বারান্দায় ডেক-চেয়ারের উপর বসিল। তাহার কল্পনার বৈরাগ্যের স্পর্শ লাগিয়া সমস্ত পৃথিবীই যেন গৈরিকবসনা হইয়া উঠিতেছিল।

জ্যৈষ্ঠের তৃতীয় সপ্তাহ পার হইয়া গিয়াছে, আকাশে মেঘের আনাগোনা শুরু হইয়াছে। গুমট গরম। বসিয়া থাকিতে থাকিতে শিবনাথের সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজিয়া উঠিল। একখানা পাখা হইলে ভাল হইত। সে ডাকিল, সতীশ!

সতীশ বোধ হয় ছিল না, নায়েব রাখাল সিং উত্তর দিলেন, ডাকছেন আপনি?

না না, আপনাকে নয়, সতীশকে ডাকছিলাম।

সতীশ তো নেই; কোথায় যেন—এই—এই একটু আগে এখানে ছিল।—বলিতে বলিতে নায়েব নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

হাসিয়া শিবনাথ বলিল, থাক্, কিছু বলি নি আমি। আমি একখানা পাখা খুঁজছিলাম।

সে নিজেই পাখার সন্ধানে উঠিল। নায়েব বলিলেন, কাছারি-ঘরে চাবি দেওয়া রয়েছে, আমি বরং আমার পাখাখানা এনে দিই।

পাখাখানা আনিয়া শিবনাথের হাতে দিয়া নায়েব দাঁড়াইয়াই রহিলেন। শিবনাথ সেটুকু লক্ষ্য করিয়া বলিল, কিছু বলবেন আমাকে ?

গম্ভীরভাবে নায়েব বলিলেন, বলছিলাম একটি কথা। কিছু দোষ নেবেন না যেন। আমি এ বাড়িকে আপনার বাড়ি বলেই মনে করি।

শ্রদ্ধার সহিত আগ্রহ প্রকাশ করিয়া শিবনাথ বলিল, বলুন। কোন্ সঙ্কোচ করবেন না আপনি।

রাখাল সিং বলিলেন, দেখুন, আপনি নিজেই একবার কাশী যান। নইলে দেখতে শুনতে বড়ই কটু ঠেকছে। তা ছাড়া লোকের মিথ্যে রটনায় কুটুম্বে কুটুম্বে মনোমালিন্য বেড়ে যাবারই সম্ভাবনা। এরই মধ্যে নানা লোক নানা কথা কইতে আরম্ভ করেছে।

শিবনাথ এ কথার কোন উত্তর না দিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া নীরব হইয়া রহিল। কি উত্তর দিবে সে ? মনের অভিমান কাল-বৈশাখীর মেঘের মত মুহূর্তে মুহূর্তে কুণ্ডলী পাকাইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া সমস্ত অন্তরই যেন আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছিল। জীবনের দেনা শোধ না করিলে উপায় কি ! অতীতের স্নেহের ঋণ শোধ করিতে যদি তাহাকে ভবিষ্যৎ বিকাইয়া দিয়াও দেউলিয়া হইতে হয়, তবে তাহাই তাহাকে করিতে হইবে।

রাখাল সিং বলিলেন, আজই ধরুন, রামকিঙ্করবাবুদের ম্যানেজার আমাকে কথায় কথায় বললেন, শিবনাথবাবুর নাকি আবার বিয়ে দেবার ব্যবস্থা হচ্ছে ? আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম, কে বললে এ কথা ? ম্যানেজার বললেন, যতই গোপনে কথাবার্তা হোক হে, এ কথা কি আর গোপনে থাকে ! আমরা শুনতে সবই পাই। শুধু আমরা কেন, কাশীতে গিন্নীমার কাছে পর্যন্ত এ খবর পৌঁছে গিয়েছে।

শিবনাথ এবার চমকিয়া উঠিল, বলেন কি ? এমন কথাও লোকে বলতে পারে ? কিন্তু এ যে মিথ্যে কথা।

মিথ্যে তো বটেই, সে কি আমি জানি না ? কিন্তু লোকের মুখে হাতই বা দেবেন কেমন করে, বলুন ?

লোকে না হয় বললে, কিন্তু সে কথা ওঁরা বিশ্বাস করলেন কি করে ? আমাকে কি এত নীচ মনে করেন ওঁরা ? আমার মা পিসীমা কি এত বড় অন্যায় করতে পারেন বলে ওঁদের ধারণা ?

রাখাল সিং মাথা চুলকাইয়া বলিলেন, তা অবিশ্যি— ; তবে কি জানেন, ঝগড়া-বিবাদের মুখে নানা অসম্ভব কথা লোকে বলেও থাকে, আবার না বললেও লোকে রটনা করলে অপর পক্ষ বিশ্বাসও করে থাকে।

'নারীদেবতা' রচনাকালে গৃহীত ফোটো

বেশ, তবে তাঁদের সেই বিশ্বাসই করতে দিন। যে অপরাধ আমি করি নি, সে অপরাধের অপবাদের জন্যে আমি কারও কাছে কৈফিয়ত দিতে পারব না। সেজন্যে কাশী যাওয়ার আমার কোনও প্রয়োজন নেই। এ কথা আগে জানলে আমি পিসীমাকেও চিঠি লিখতে দিতাম না।

কিন্তু বউমায়ের অপরাধ কি বলুন? রামের পাপে—

মধ্যপথেই বাধা দিয়া শিবনাথ বলিয়া উঠিল, অপরাধ তো তারই। আমাদের বাড়ি থেকে সেই তো চলে গেছে নিজে হতে। কেউ কি তাড়িয়ে দিয়েছিল তাকে? আর আজও তো তাকে আসতে বারণও করে নি কেউ? রাম যখন বনে গেলেন, তখন সীতা তো নিজে থেকেই বনে গিয়েছিলেন, বারণ তো সকলেই করেছিল, কিন্তু তিনি তা শুনেছিলেন?

রাখাল সিং এবার হাসিয়া ফেলিলেন, মুখ ফিরাইয়া সে হাসি তিনি শিবুর নিকট গোপন করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু শিবুর দৃষ্টি এড়াইল না, শিবু অত্যন্ত গম্ভীরভাবে বলিল, আপনি হাসছেন, কিন্তু হিন্দুর মেয়ের আদর্শ হল এই।

রাখাল সিং হাসিয়াই বলিলেন, বউমায়ের বয়েস কি বলুন দেখি? সেটুকু বিবেচনা করুন।

শিবনাথ সে কথার কোন জবাব না দিয়া বলিল, আমি কাশী যাব না সিং মশায়। আমার মা-পিসীমার অপমান করে আমি কোন কাজ করতে পারি না। তবে বিয়ে আমি আর করব না, করতে পারি না, এইটে জেনে রাখুন।

রাখাল সিং ক্ষুণ্ণমনেই ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন। শিবনাথ শ্রীপুকুরের কালো জলের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। মৃদু বাতাসে বিক্ষুব্ধ কালো জলের ঢেউয়ের মাথায় রৌদ্রচ্ছটা লক্ষ লক্ষ মানিকের মত জ্বলিতেছে। হঠাৎ তাহার মনে পড়িয়া গেল, বিবাহের পরই সে গৌরীকে লক্ষ্য করিয়া 'বধূ' নামে একটি কবিতায় লিখিয়াছিল, 'মণি-ঝরা হাসি তোর, মতি-ঝরা কান্না।' সেই গৌরী তাহার পত্রের উত্তর পর্যন্ত দিল না, লোকের রটনায় বিশ্বাস করিয়া সে তাহাকে অবিশ্বাস করিয়া বসিল; অপরাধ তাহার নয়?

বসিয়া থাকিতে থাকিতে সহসা সে উঠিয়া ডাকিল, কেষ্ট সিং! বাইসিক্লটা বের কর তো।

বাইসিক্লে উঠিয়া সে পোস্ট-অফিস রওনা হইয়া গেল, ডাক আসিবার সময় হইয়াছে।

চিঠি নাই।

শিবু গাড়িটায় চড়িয়া লক্ষ্যহীন গতিতে চলিল। সহসা একটা নীচজাতীয়া

স্ত্রীলোক ছুটিয়া তাহার গাড়ির সম্মুখে আসিয়া কদর্য ভঙ্গীতে চিৎকার করিয়া উঠিল, বাবু নোক, সাধু নোক, ভাল নোক আমার! বল বলছি, আমার বউকে কোথায় সরিয়ে দিলা, বল বলছি? আমার সোমথ বউ। এ তোমারই কাজ।

এ কি, সে ডোমপাড়ায় আসিয়া পড়িয়াছে! চিৎকার করিতেছে ফ্যালার মা! শিবু আশ্চর্য হইয়া গাড়ি হইতে নামিয়া বলিল, কি বলছিস তুই ফ্যালার মা?

কি বলছি? জান না কিছু, নেকিনি? কাল রেতে বউ আমার কোথা পালাল, বল তুমি?

শিবনাথ এবার বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গেল। ফ্যালার বউ পলাইয়া গিয়াছে! আর সে সংবাদ সে জানে!

ফ্যালার মা শিবনাথের নীরবতা লক্ষ্য করিয়া দ্বিগুণ তেজে জ্বলিয়া উঠিল, চুপ করে রইলে যে, বলি চুপ করে রইলে যে? বল তুমি বলছি, নইলে চেঁচিয়ে আমি গাঁ গোল করব, বাবুদের কাছে নালিশ করব। কলেরায় সেবা করতে—

চুপ কর্ বলছি, চুপ কর্ হারামজাদী। নইলে মারব গালে ঠাস করে এক চড়।

ফ্যালার বড় ভাই—বধূটির প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হেলারাম আসিয়া মাকে ধমকাইয়া সরাইয়া দিয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। অতি বিনয়ের সহিত হাত দুইটি জোড় করিয়া কহিল, আজ্ঞেন বাবু মাশায়, উ হারামজাদীর কথা আপুনি ধরবেন না মাশায়; উ অমুনি বটে। তা বউটিকে বার করে দেন দয়া করে; আপুনি তাকে বাঁচিয়েছেন, যখুনি আপুনি ডাকবেন, তখুনি সে যাবে, ঘাড় একাশী করে আমরা পাঠিয়ে দোব।

শিবনাথের ইচ্ছা হইল, মুহূর্তে এই কদর্য লোকটার বুকের উপর ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া তাহাকে নখ দিয়া টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া দেয়। দুরন্ত ক্রোধে দেহের রক্ত যেন টগবগ করিয়া ফুটিতেছিল। অতি কষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া বাইসিক্লের হ্যাণ্ডেলটা দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল। মানুষ এত জঘন্য, এত কদর্য, এত ঘৃণ্য!

হেলা আবার সবিনয়ে বলিল, বাবু মাশায়!

শিবনাথ বলিল, সরে যা তুই আমার সুমুখ থেকে। সরে যা বলছি, সরে যা।

তাহার দৃপ্ত মর্যাদাময় কণ্ঠস্বরের সে আদেশ যেন অলঙ্ঘনীয়, হেলা সভয়ে সরিয়া আসিয়া এক পাশে দাঁড়াইল। ফ্যালার মা কিন্তু ছাড়িল না, সে বলিল, বলেন মাশায়, দয়া করে।

গাড়িতে উঠিতে উঠিতে শিবু সেই কণ্ঠস্বরে সেই ভঙ্গিতে বলিল, আমি জানি না।

এমন একটা কল্পনাতীত কদর্য গ্লানিকর মিথ্যার আঘাতে শিবনাথের ক্ষোভ হইল অপরিসীম, ক্রোধেরও তাহার অবধি ছিল না, কিন্তু লজ্জা এবং ভয় হইল তাহার

সর্বাপেক্ষা অধিক,—তাহার মা, তাহার পিসীমা কি বলিবেন! এ লজ্জার আঘাত তাঁহারা সহ্য করিবেন কি করিয়া! তাহার মায়ের গৌরব-বোধের কথা তো সে জানে, এতটুকু অগৌরবের আশঙ্কায় তিনি যে জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিতে পারেন। আর তাহার পিসীমা! বংশের কলঙ্ক তাঁহার পাহাড়ের চূড়ার ন্যায় উচ্চ মস্তকে বজ্রের মত আসিয়া পড়িবে।

বাড়িতে আসিয়া একেবারে পড়ার ঘরে গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া বসিল। কিছুক্ষণ পরে শৈলজা ঠাকুরানী ও জ্যোতির্ময়ী আসিয়া বন্ধ দুয়ারে আঘাত করিয়া তাহাকে ডাকিলেন, শিবু!

শিবু দরজা খুলিয়া দিতেই ঘরে প্রবেশ করিয়া জ্যোতির্ময়ী তাহার মুখের দিকে চাহিয়া এক বিচিত্র হাসি হাসিয়া বলিলেন, এইটুকুতেই তুই কাঁদছিস শিবু?

শৈলজা ঠাকুরানীর মুখ থমথমে রাঙা; তিনি কহিলেন, ও হারামজাদীর পিঠের চামড়া তুলিয়ে দিতে ইচ্ছে করছে বউ। কিন্তু তুমি যে কি বোঝ, সে তুমিই জান। ও আমি ভাল বুঝি না।

জ্যোতির্ময়ী হাসিয়া বলিলেন, শিবের মুখেই বিষ তুলে সবাই দেয় ঠাকুরঝি, হাড়ের মালা তাঁরই গলায় পরিয়ে দেয়, কিন্তু সে সব পবিত্র হয় শিবের গুণে। আর ওই সব মানুষের উপকার করার ওই তো আশীর্বাদ। ভেবে দেখ তো সীতার অপবাদের কথা। প্রজাতে বলতে বাকি রেখেছিল কি? কিন্তু সীতার মহিমা কি তাতে এতটুকু ম্লান হয়েছে? বরং লোকের মনের কালির সুমুখে দাঁড়িয়ে তাঁর মহিমা হাজার গুণ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

শিবু এবার অসঙ্কোচে প্রশান্ত দৃষ্টি তুলিয়া মা ও পিসীমার মুখের দিকে চাহিল; তাহার ক্ষুব্ধ তপ্ত মন এই পরম সান্ত্বনার কথা কয়টিতে মুহূর্তে শান্ত স্নিগ্ধ হইয়া জুড়াইয়া গিয়াছে। সে বলিল, দুঃখের চেয়ে ভয় হয়েছিল আমার বেশি, পাছে—

পাছে আমরা ওই কথা বিশ্বাস করি?—জ্যোতির্ময়ী হাসিলেন।

শৈলজা দেবী তাহাকে কাছে টানিয়া লইয়া বলিলেন, তোর ছায়া দেখে যে আমরা তোর মনের কথা জানতে পারি রে ক্ষ্যাপা ছেলে; তুই অন্যায় করলে আমাদের মন যে আপনি তোর ওপর আগুন হয়ে উঠত। আর তোকে কি আমরা তেমনই শিক্ষাদীক্ষাই দিয়েছি যে, এতবড় হীন কাজ তুই করবি!

শিবুর টেবিলের উপর একখানা বই খোলা অবস্থায় পড়িয়া ছিল, জ্যোতির্ময়ী বইখানি তুলিয়া দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন, এই কবিতাটা পড়ছিলি বুঝি—'ভক্ত কবীর সিদ্ধপুরুষ খ্যাতি রটিয়াছে দেশে'?

কবীরের মত মহামানবের জীবন-কাহিনীর সহিত নিজের জীবন মিলাইয়া দেখার লজ্জায় শিবনাথ এবার লজ্জিত হইয়া মৃদুস্বরে বলিল, হ্যাঁ।

কবিতাটা পড়ে শোনা তোর পিসীমাকে। শোন ঠাকুরঝি, মহাধার্মিক মহাপুরুষ কবীরকে কি অপবাদ দিয়েছিল, শোন।

শিবু আবেগকম্পিত কণ্ঠে কবিতাটা পড়িয়া গেল। পিসীমার চোখ অশ্রুসজল হইয়া উঠিল, তিনি সস্নেহে শিবুর মাথায় হাত রাখিয়া বলিলেন, তোর কলঙ্কও এমনি করে একদিন ধুয়ে মুছে যাবে, আমি আশীর্বাদ করছি। আয় এখন, স্নান করবি, খাবি আয়। যে ভয় আমার হয়েছিল কথাটা শুনে! আমি ভাবলাম, যে অভিমানী তুই, হয়তো কি একটা অঘটন ঘটিয়ে বসে থাকবি। আমরা চারদিকে খুঁজে বেড়াচ্ছি, আর তুই ঘরের মধ্যে বসে কাঁদছিস!

মনের গ্লানি মুছিয়া গেল, কিন্তু কথাটা শিবু কোন রকমেই ভুলিতে পারিল না। সে সেইদিনই সুশীলকে পত্র লিখিয়া বসিল। ঘটনাটা জানাইয়া লিখিল, "আপনারা ভাগ্যবান, দেশ-সেবার পুরস্কার-লাভ আপনাদের করিতে হয় নাই। আমার ভাগ্যে পুরস্কার জুটিল পঙ্কতিলক। আক্ষেপ হইয়াছিল প্রচুর, কিন্তু খাইবার সময় মা মহাভারতের নল-রাজার জীবনের একটা ঘটনার কথা মনে করাইয়া দিলেন। বনবাসী নল, একদিন বনের মধ্যে আগুনের বেড়াজালে বন্দী উত্তাপে মৃতপ্রায় একটি সাপকে দেখিয়া, দয়ার্দ্র হৃদয়ে ছুটিয়া গিয়া সাপটাকে সেই অগ্নিকুণ্ড হইতে উদ্ধার করিলেন। উদ্ধার করিবার পরই প্রতিদানে সাপটা স্বভাববশে নলকে দংশন করিল। সঙ্গে সঙ্গে অপূর্ব রূপবান নল হারাইলেন তাঁহার রূপ। কাহিনীটি শুনিয়া মনের আক্ষেপ নিঃশেষে দূর হইয়া গিয়াছে। কিন্তু দেশসেবার নামে যে ভয় জন্মিয়া গেল!"

চিঠিখানা ডাকে পাঠাইয়া সন্ধ্যার দিকে সে শ্রান্তিতে অবসাদে যেন এলাইয়া পড়িল। দেহ-মনের উপর দিয়া একটা ঝড় বহিয়া গিয়াছে। সেই শ্রীপুকুরের উপরের বারান্দায় বসিয়া নক্ষত্রখচিত আকাশের দিকে চাহিয়া এই আজিকার কথাই ভাবিতেছিল। অদ্ভুত মানুষ ইহারা, কৃতজ্ঞতা বলিয়া কোন কিছুর ধার ধারে না, বৃহৎ মহৎ কিছু কল্পনা করিতে পারে না, জানে শুধু আপনার স্বার্থ। উহাদের সর্বাঙ্গে কলুষের কালি, মনে সেই কালির বহ্নিদাহ; যাহাকে স্পর্শ করে, সে প্রেমেই হউক আর অপ্রেমেই হউক, তাহার অঙ্গে কালি লাগিবেই, বহ্নিদাহের স্পর্শে অঙ্গ তাহার ঝলসিয়া যাইবে। ফ্যালার মা, ফ্যালার বড় ভাই, ইহাদের কথা ছাড়িয়া দিলেও, ওই মেয়েটি—ওই মেয়েটিও তো তাহাই। এই সেদিন সে বলিয়া গেল, সে আর বিবাহ করিবে না। চোখের জল পর্যন্ত ফেলিয়া গেল। কিন্তু কয়দিন না যাইতেই সে গৃহত্যাগ করিয়া পলাইল। রাত্রির অন্ধকারে গোপনে গৃহত্যাগ যখন সে করিয়াছে, তখন নিঃসঙ্গযাত্রায় সন্ন্যাসিনী সে হয় নাই। সে হইলে, তাহাকেও তো সে কথা বলিয়া যাইত। পরমাত্মীয়ের মত জীবনের সকল সুখ-দুঃখের কথা বলিয়া এ কথাটা গোপন করিবার হেতু কি?

কিন্তু সেদিন তাহাকে অত্যন্ত রূঢ়ভাবে সে ফিরাইয়া দিয়াছে। মনটা তাহার সকরুণ হইয়া উঠিল। যে জীবনটাকে সে মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া বাঁচাইয়াছে, সেই জীবনটিকে হারাইয়া তাহার মনে হইল, একান্ত নিজস্ব এক পরম মূল্যবান বস্তু তাহার হারাইয়া গিয়াছে। মেয়েটার উপর ঘৃণারও তাহার অবধি রহিল না।

সুশীলের পত্রের জন্য শিবনাথ উদ্‌গ্রীব হইয়াই ছিল। পৃথিবীর ধূলায় অঙ্গ ভরিয়া গেলে আকাশগঙ্গার বর্ষণে সে ধূলা ধুইয়া যাওয়ার চেয়ে কাম্য বোধ হয় আর কিছু নাই। ধরিত্রীর বুকে প্রবাহিতা গঙ্গার জলেও মাটির স্পর্শ আছে, কিন্তু আকাশলোকের মন্দাকিনীর বারিধারায় সে স্পর্শাপবাদটুকুও নাই। আজ শিবনাথের কাছে সুশীলের পত্রের সান্ত্বনা-প্রশংসা সেই মন্দাকিনীধারার মতই পবিত্র কাম্য হইয়া উঠিয়াছিল। সেদিন শিবনাথ কেষ্ট সিংকে পোস্ট-অফিসে পাঠাইয়া উৎকণ্ঠিতচিত্তে তাহার প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া ছিল। কেষ্ট সিং চিঠি হাতেই ফিরিল।

ব্যগ্র হইয়া শিবনাথ চিঠিখানা তাহার হাত হইতে লইয়া মুহূর্তে খুলিয়া ফেলিল। এ কি! এ কাহার হাতের লেখা। কাশী, নীচে পত্রলেখকের নাম—গৌরী দেবী! গৌরী! গৌরী পত্র লিখিয়াছে! তাহার মুখ-চোখ লাল হইয়া উঠিল, বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ড ধকধক করিয়া বিপুল বেগে চলিতেছে, হাত-পা ঘামিয়া উঠিয়াছে। উঃ, দীর্ঘদিন পরে গৌরী পত্র লিখিয়াছে! চিঠিখানা সে তাড়াতাড়ি পড়িয়া গেল।

আষাঢ়ের আকাশে কি প্রলয়ান্ধকার ঘনায়মান হইয়া মেঘ জমিয়া আসিল! দ্বিপ্রহরের আলো যেন মুছিয়া গিয়াছে, শিবনাথের চোখের সম্মুখে সমস্ত সৃষ্টি অমানিশায় ঢাকা পৃথিবীর মত অর্থহীন বোধ হইল। পায়ের তলায় মাটি দুলিতেছে। গৌরীর কাছেও এই ডোমেদের প্রদত্ত অপবাদের কথা পৌঁছিয়াছে। গৌরী সে কথা বিশ্বাস করিয়াছে, সে লিখিয়াছে, "মনে করিয়াছিলাম, বিষ খাইয়া মরিব। কিন্তু দিদিমার কথায় মন মানিল, কেন মরিব? দিদিমা বলিলেন, মনে কর্, তোর বিবাহ হয় নাই। কত কুলীনের মেয়ে কুমারী-জীবন কাটাইয়া গিয়াছে, তুইও মনে কর্, সেই কুমারীই আছিস। আমিও সেই মনে করিয়াই বুক বাঁধিয়াছি। যে লোক একটা ঘৃণ্য অস্পৃশ্য ডোমের মেয়ের মোহে আপনাকে হারাইয়া ফেলে, তাহার সহিত কোন ভদ্রকন্যা ভদ্ররমণীর বাস অসম্ভব।—দাদা এই কথাটা বলিয়া দিলেন।"

বজ্রের অগ্নি সে অনায়াসে সহ্য করিয়া ভাবিয়াছিল, বজ্রাঘাতকে জয় করিলাম; কিন্তু তখন সে অগ্নির পশ্চাতের ধ্বনির কথা ভাবে নাই। অগ্নিকে সহ্য করিয়াও ধ্বনির আঘাতে তাহার সমস্ত স্নায়ুমণ্ডলী বিক্ষুব্ধ কম্পিত হইয়া উঠিল, শিবনাথ দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ডেক-চেয়ারটার উপর বসিয়া পড়িল, যেন সে ভারকেন্দ্র হারাইয়া পড়িয়াই গেল।

কেষ্ট সিং চলিয়া যায় নাই, সে কাছেই দাঁড়াইয়া ছিল। শিবনাথের এই অবস্থান্তর লক্ষ্য করিয়া সে কোন অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া ব্যাকুল ভাবে প্রশ্ন করিল, দাদাবাবু! বাবু!

শিবনাথ হাতের ইশারা করিয়া তাহাকে চলিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিল; কেষ্ট সিং সে ইঙ্গিতের আদেশ অবহেলা করিয়া আবার ব্যাকুলকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, কোথাকার চিঠি দাদাবাবু, কি হয়েছে?

একটি গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মুখ তুলিয়া শিবনাথ বলিল, ও আমার এক বন্ধুর চিঠি। একটা দেশলাই আনতে পার? জলদি।

দেশলাই কেষ্ট সিংয়ের কাছেই ছিল, শিবনাথ একটি কাঠি জ্বালিয়া চিঠিখানার এক প্রান্তে আগুন ধরাইয়া দিল। প্রথমে ধীরে ধীরে, ক্রমে বর্ধিত শিখায় আগুন সমস্ত পত্রখানাকে কালো অঙ্গারে পরিণত করিয়া গ্রাস করিয়া ফেলিল।

সুশীলের পত্র আসিল আরও দুই দিন পরে। মনের মধ্যে প্রচণ্ড আঘাতের বেদনার তীব্রতা ধীরে ধীরে প্রশান্ত হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু দুঃখ এবং অভিমানে মন এখনও পরিপূর্ণ; বরং একটি নিস্পৃহ বৈরাগ্যের উদাসীনতা উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিয়াছে। এই কয়েকদিনের মধ্যেই একটা পরিস্ফুট পরিবর্তনের লক্ষণ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। পিসীমা মনে মনে শঙ্কিত হইয়া যে কোন উপায়ে গৌরীকে আনিবার সঙ্কল্প করিতেছিলেন। জ্যোতির্ময়ী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সকলের অলক্ষ্যে খুঁজিতেছিলেন অন্তর্নিহিত রহস্যটি, যে রহস্য কুয়াশার মতো শিবনাথকে বেষ্টন করিয়া তাহাকে এমন অস্পষ্ট করিয়া তুলিতেছে।

সুশীলের পত্রখানি পড়িয়া শিবনাথের মুখে মেঘাচ্ছন্ন আকাশে আকস্মিক সূর্যপ্রকাশের মত দীপ্তি ফুটিয়া উঠিল। সুশীল লিখিয়াছে—"দেশের কাজে আপনার ভয় হইয়া গেল বন্ধু? কিন্তু এমন তো আমি ভাবি নাই। মনে আছে আপনার সেই শ্মশানের কথা? 'আনন্দমঠে'র দেবতাকে আমায় দেখাইয়াছিলেন—'মা যা হইয়াছেন'! হৃতসর্বস্বা, নগ্নিকা, হস্তে খড়্গ খর্পর, পদতলে আপন মঙ্গল দলিত করিয়া আত্মহারা নৃত্যপরা রূপ। এ ভয়ঙ্করীকে সেবার ফলে যে প্রসাদ মানুষের ভাগ্যে জোটে, সে প্রসাদ কি সুমধুর হয় বন্ধু? আপন মঙ্গল যাহার আপন পদে দলিত, ভক্তকে বিতরণ করিতে মঙ্গল সে পাইবে কোথায়? অপবাদ অপমান লাঞ্ছনা নির্যাতন বিষাক্ত অস্থিকণ্টকের মত চারিদিকে বিস্তৃত, প্রণাম করিতে গেলেই যে ললাটে ক্ষতচিহ্ন না আঁকিয়া ছাড়িবে না। আবার পরম ভক্তের ভাগ্যে জোটে কি জানেন? সর্বনাশীর লোল রসনায় জাগিয়া উঠে আকুল তৃষ্ণা। তাহার স্কন্ধে পড়ে খড়্গাঘাত, ভক্তের রক্তে পূর্ণ হয় দেবীর

খর্পর। তৃষ্ণা না মিটিলে দেবী প্রসন্না আত্মস্থা হইবেন কেন? স্বেচ্ছাচারিণীর সম্বিৎ না ফিরিলে তো রাজরাজেশ্বরীরূপে আত্মপ্রকাশে ইচ্ছা জাগিবে না বন্ধু।"

অদ্ভুত! শিবনাথের মনে হইল, চিঠিখানার অক্ষরে অক্ষরে যেন বিপুল শক্তির বীজকণা লুকানো রহিয়াছে। তাহার অন্তরে উদাসীন নিস্পৃহতার বিপুল শূন্যতায় সে বীজকণাগুলি ছড়াইয়া পড়িয়া আলোকে বাতাসে জ্যোতির্ময় প্রাণময় করিয়া তুলিল। শেষের দিকে সুশীল লিখিয়াছে—"আপনি আর দেশে বসিয়া কেন? কলেজ খুলিতে আর কয়দিনই বা বিলম্ব! আপনি এখানে চলিয়া আসুন। গ্রাম ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া দেশের বিশ্বরূপ দেখিতে পাইবেন।" বিপুল আগ্রহে শিবনাথ উঠিয়া দাঁড়াইল। দুঃখ অভিমান এই বায়ুপ্রবাহের স্পর্শে কর্পূরের ন্যায় উবিয়া গিয়াছে। তরুণ মনের চঞ্চল স্পন্দন-স্পন্দিত পদক্ষেপে আজ আবার আসিয়া সে বাড়িতে প্রবেশ করিল।

শৈলজা দেবী পুরোহিতকে লইয়া পাঁজি দেখাইতেছিলেন। শিবনাথ আসিয়া বলিল, ভালই হয়েছে, দেখুন তো ভটচাজ মশায়, আমার কলকাতা যাবার একটা দিন।

পিসীমা বলিলেন, সেই সবই দেখলাম বাবা, তিনটে ভাল দিন চাই। একটা হল চৌঠো, একটা নউই, একটা হল ষোলোই।

শিবনাথ বলিল, ওই চৌঠোই আমি কলকাতায় যাব।

উঁহু, চৌঠো যেতে হবে তোমাকে কাশী, নউই সেখান থেকে ফিরবে বউমাকে নিয়ে। তারপর ষোলোই যাবে তুমি কলকাতায়।

শিবনাথ তারস্বরে প্রতিবাদ করিল না, কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া মৃদু অথচ দৃঢ়স্বরে বলিল, না, কাশী আমি যাব না; আমি ওই চৌঠো তারিখে কলকাতায় যাব।—বলিতে বলিতে সে আপন ঘরের দিকে চলিয়া গেল। পিসীমাও সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া আসিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ডাকিলেন, শিবনাথ!

অনাবিল প্রসন্ন মুখে শিবনাথ বলিল, পিসীমা!

কাশী তুই কেন যাবি না? আমার ওপর রাগ করে?

তোমার ওপর রাগ করে? আমি কি তোমার ওপর রাগ করতে পারি পিসীমা?

স্থির দৃষ্টিতে শিবনাথের মুখের দিকে চাহিয়া পিসীমা বলিলেন, আমি নাকি বউমাকে দেখতে পারি না লোকে বলে, আমি নাকি তাকে স্বামীর ঘর থেকে পর্যন্ত বঞ্চিত করতে চাই, এই জন্যে?

শিবনাথও অকুণ্ঠিত দৃষ্টিতে পিসীমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, কখনও ক্ষণেকের জন্যে মনে কি হয়েছে, জানি না পিসীমা; তবে এমন ধারণা আমার মনের মধ্যে নেই, এই কথা আমি ভগবানের নাম নিয়ে বলতে পারি।

তবে ? তুই কাশী যাবি না কেন ?

তার অন্য কারণ আছে পিসীমা, সে তুমি জানতে চেও না।

আমাকে যে জানতে হবেই শিবু, আমি যে চোখের উপর দেখছি, তুই আর একটি হয়ে গেছিস। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে তোর যেন সম্বন্ধ নেই,—তোর মা, আমি পর্যন্ত তোর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তোর জবাব পাই, কিন্তু সাড়া পাই না।

জ্যোতির্ময়ী আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন। শৈলজা দেবী বলিলেন, এস বউ, এস। জ্যোতির্ময়ী কোন জবাব দিলেন না, নীরবে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

শিবনাথ কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিল, সে আমায় একখানা চিঠি লিখেছে, সে এখানে আসবে না, আসা নাকি তার পক্ষে অসম্ভব।

অসম্ভব! কেন? আমি রয়েছি বলে?—আর্তস্বরে শৈলজা দেবী বলিলেন, আমায় তুই লুকোস নি শিবু, সত্যি কথা বল্।

না।

তবে ?

মুখ নত করিয়া শিবনাথ বলিল, ডোমের মেয়ের মোহে যে আপনাকে হারায়, তার সঙ্গে কোন ভদ্রকন্যার বাস অসম্ভব।

এতক্ষণে জ্যোতির্ময়ী বলিলেন, চিঠিখানা দেখাবি আমায় ?

সে চিঠি আমি পুড়িয়ে ফেলেছি।

এ কলঙ্ক স্খালন না হলে তুমি যেন বউমার সঙ্গে দেখা করো না শিবনাথ—এই আমার আদেশ রইল।

শৈলজা দেবী কিন্তু কাঁদিয়া ফেলিলেন, বলিলেন, না না বউ, বউমাকে আর ফেলে রেখো না, শিবনাথের জীবনে আর অশান্তির শেষ থাকবে না। ও-বাড়ির শিক্ষার সঙ্গে এ-বাড়ির মিল হবে না। আর সে এতটুকু মেয়ে, সে কি এমন কথা লিখতে পারে! নিশ্চয় অন্য কেউ লিখিয়েছে। আমার কথা শোন, বউমাকে নিয়ে এস।

জ্যোতির্ময়ী কঠিন দৃঢ়স্বরে বলিলেন, না।

শিবনাথ বলিল, চৌঠোই আমি কলকাতায় যাব।

অসংখ্য খুঁটিনাটি সংগ্রহ করিয়া শৈলজা দেবী জ্যোতির্ময়ীকে বলিলেন, বউ, তুমি নিজে হাতে আমার শিবুর জিনিসপত্র গুছিয়ে দাও। তোমার হাতের স্পর্শ সকল জিনিসে মাখানো থাক্, মায়ের হাতের স্পর্শ আর অমৃত—এই দুয়ের কোন প্রভেদ নেই।

জ্যোতির্ময়ীর অন্তস্তলে এই কাজটি করিবার বাসনা আকুল আগ্রহে উচ্ছ্বসিত হইতেছিল, কিন্তু শৈলজা দেবীর সম্মুখে সে বাসনা প্রকাশ না করাটাই যেন তাঁহার অভ্যাসে পরিণত হইয়া গিয়াছে। কোনমতে তিনি আপনাকে সম্বরণ করিয়া রাখিয়া-ছিলেন। শৈলজা দেবী বলিবামাত্র তিনি হাসিমুখে ছুটিয়া আসিলেন। শৈলজা বিস্মিত হইয়া বলিলেন, চোখে যে জল দেখা দিলে ভাই বউ! না না, কেঁদো না, শিবু তোমার পড়তে যাচ্ছে।

আনন্দে জ্যোতির্ময়ীর চোখ ফাটিয়া জল দেখা দিয়াছিল। শত অভ্যাস, অপরিমেয় সংযম সত্ত্বেও এ জল তিনি রোধ করিতে পারেন নাই। আপন আত্মজ পূর্ণিমার চাঁদকে দেখিয়া সমুদ্রে যে উচ্ছ্বাস জাগে, বিজ্ঞান তাহার যে ব্যাখ্যাই করুক, মাতৃহৃদয়ের উচ্ছ্বাসের সঙ্গে তাহার একটা সাদৃশ্য আছে।

চৌঠা আষাঢ়, বেলা সাড়ে দশটার মধ্যে মাহেন্দ্র যোগ, যাত্রার পক্ষে অতি শুভক্ষণ। বড় ঘরের বারান্দায় এ বাড়িতে চিরদিন যাত্রার শুভকর্ম নির্বাহ হইয়া থাকে; আজও সেই বারান্দায় জলপূর্ণ সিন্দুর-চিহ্নাঙ্কিত মঙ্গলকলস স্থাপিত হইয়াছে, কলসের মুখে দুইটি আম্রপল্লব। এক পাশে একটা সের দুই ওজনের কাতলামাছ রাখা হইয়াছে, মাছটির মাথায় সিন্দুরের মঙ্গলচিহ্ন আঁকা। বাড়ির কোথাও কোন কলসী ঘড়া বালতি জলশূন্য রাখা হয় নাই; ঝাঁটা টুকরিগুলি বাড়ির বাহিরের চালায় সরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। পিসীমা একটি পাত্রে দই ধান দূর্বা দেবতার নির্মাল্য লইয়া পশ্চিমমুখে দাঁড়াইয়া শিবুর কপালে একে একে ফোঁটা দিলেন, ধান্য দূর্বা দেবনির্মাল্য দিয়া আশীর্বাদ করিলেন। তারপর তাহার মাথায় হাত দিয়া দুর্গানাম জপ শেষ করিয়া বলিলেন, বউ, তুমি ফোঁটা দাও।

মা সজলচক্ষে আসিয়া পাত্র হাতে দাঁড়াইলেন। শিবুর উৎসাহের সীমা ছিল না, কিন্তু মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া সহসা তাহার উৎসাহপ্রদীপ্ত চোখ দুইটি জলে ভরিয়া উঠিল। মাকে পিসীমাকে প্রণাম করিয়া সে পূর্ণ মঙ্গলকলসকে প্রণাম করিল, তারপর গৃহদেবতা নারায়ণশিলার মন্দিরে, শিবমন্দিরে, দুর্গামন্দিরে প্রণাম করিয়া আপনার গৃহখানিকে পশ্চাতে রাখিয়া সম্মুখের পথে অগ্রসর হইল।

বুকের মধ্যে অসীম উৎসাহ, তরুণ পক্ষ বিস্তার করিয়া বিহঙ্গশিশু যে উৎসাহে ঊর্ধ্ব হইতে ঊর্ধ্বতর লোকে অভিযান করিতে চাহে, সেই উৎসাহেই সে দীর্ঘ দ্রুত পদক্ষেপে চলিয়াছিল। সহসা একবার দাঁড়াইয়া পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল, বড় দরজার মুখে একদৃষ্টে তাহার গমনপথের দিকে চাহিয়া মা ও পিসীমা দাঁড়াইয়া আছেন। শিবনাথের চোখ আবার জলে ভরিয়া উঠিল, মা-পিসীমার চোখের জল সে দেখিতে না পাইলেও তাহার উষ্ণ স্পর্শ অনুভব করিল। সজল চোখেই হাসিয়া সে হাত

নাড়িয়া একবার সম্ভাষণ জানাইয়া আবার তেমনই পদক্ষেপে সম্মুখের পথে অগ্রসর হইল।

ট্রেনখানা স্টেশনে ঢুকিতেছিল। শিবনাথ চট করিয়া কোঁচাটাকে সাঁটিয়া মালকোঁচা মারিয়া গলার চাদরখানাকে কোমরে বাঁধিয়া ফেলিল। শম্ভু, কেষ্ট ও নায়েব রাখাল সিং তাহাকে তুলিয়া দিতে আসিয়াছিলেন। রাখাল সিং তাড়াতাড়ি বলিলেন, শম্ভু কেষ্ট এরাই সব ঠিক করে দিচ্ছে। আপনি আবার—

শিবনাথ সে কথায় কান দিল না, নিজেই তাড়াতাড়ি এক হাতে ব্যাগ, অন্য হাতে আর একটা জিনিস লইয়া একখানা কামরায় উঠিয়া পড়িল। বাকি জিনিসগুলি শম্ভু ও কেষ্ট সিং বহিয়া আনিলে সে গাড়ির ভিতর হইতে টানিয়া লইয়া সেগুলি গুছাইয়া রাখিয়া জানালার ভিতর দিয়া মুখ বাড়াইয়া হাসিল।

ট্রেন ছাড়িয়া দিল।

সমস্ত পারিপার্শ্বিক বৃত্তাকারে ঘুরিতে ঘুরিতে দৃষ্টির পশ্চাতে কোন্ যবনিকার অন্তরালে মিলাইয়া যাইতেছে। লাইনের এক ধারে বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র, মাঠে গাঢ়-সবুজ ধানের বীজচারাগুলি বর্ষার ইঙ্গিত বহিয়া বেগবান-পূবে-বাতাসে হিল্লোল তুলিয়া তুলিয়া দুলিতেছে। অন্য দিকে গ্রামখানি পিছনের দিকে ঘুরিতে ঘুরিতে ছুটিয়া চলিয়াছে। তাহাদের চিলেকোঠা আর দেখা যায় না, স্বর্ণবাবুদের বাড়িটাও ক্রমে শ্যামসায়রের বাগানের ঘন শ্যামশোভার আড়ালে ডুবিয়া গেল।

ঝড়ের বেগে ট্রেন চলিয়াছে। জানালায় মুখ রাখিয়া বসিয়া থাকিতে থাকিতে শিবনাথের গান করিতে ইচ্ছা হইল। কত গান গাহিল—এক এক লাইন। তবে বার বার গাহিল ওই একটি লাইন—"এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি, সকল দেশের সেরা সে যে আমার জন্মভূমি।"

গান করিতে করিতে আবার তাহার মনে পড়িল তাহাদের বহির্দ্বারে দণ্ডায়মানা মা ও পিসীমাকে, তাহার গমনপথের দিকে নিবদ্ধ তাঁহাদের সজল একাগ্র দৃষ্টি। ট্রেনের শব্দ, কামরার মধ্যে যাত্রীদের কোলাহল, সব কিছু তাহার নিকটে যেন বিলুপ্ত হইয়া গেল। চোখে পড়িল অনেক,—কত নদী কত গাছ কত জঙ্গল কত জলা কত মাঠ কত গ্রাম কত স্টেশন কত লোক ; কিন্তু মনে কিছুই ধরিল না।

রাত্রি আটটায় ট্রেন আসিয়া হাওড়ায় পৌঁছিল। বিপুল বিশালপরিধি সারি সারি সুদীর্ঘ টিনের শেড, চারিদিকে মাথার উপরে আলো, আলো আর আলো, কাতারে কাতারে মানুষ, কত বিচিত্র শব্দ ; বর্ণ-বৈচিত্র্যের অপূর্ব সমাবেশ, কর্মতৎপরতার প্রচণ্ড ব্যস্ততায় মুখরা এই কলিকাতা! এত বিশাল, এত বিপুল! এই ঘূর্ণ্যাবর্তের

মধ্যে সে কোথায় কেমন করিয়া আপন স্থান করিয়া লইবে! অকস্মাৎ কে যেন তাহাকে স্পর্শ করিয়া বলিল, এই যে, এখানে আপনি!

সে সুশীল। শিবনাথ আশ্বস্ত হইয়া হাসিয়া বলিল, উঃ আমি দিশেহারা হয়ে গিয়েছিলাম, এত আলো, এত ঐশ্বর্য!

হাসিয়া সুশীল বলিল, আমরা কিন্তু যে তিমিরে সেই তিমিরেই। আমাদের বাড়িতে ইলেক্‌ট্রিক-লাইট নেই।

উনিশ

শ্রাবণের শেষ, আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া মেঘের সমারোহ জমিয়া উঠিয়াছে। কলেজের মেসের বারান্দায় রেলিঙের উপর কনুইয়ের ভর দিয়া দাঁড়াইয়া হাত দুইটির উপরে মুখ রাখিয়া শিবনাথ মেঘের দিকে চাহিয়া ছিল। মাঝে মাঝে বর্ষার বাতাসের এক-একটা দুরন্ত প্রবাহের সঙ্গে রিমিঝিমি বৃষ্টি নামিয়া আসিতেছে, বৃষ্টির মৃদু ধারায় তাহার মাথার চুল সিক্ত, মুখের উপরেও বিন্দু বিন্দু জল জমিয়া আছে। পাতলা ধোঁয়ার মত ছোট ছোট জলীয় বাষ্পের কুণ্ডলী সনসন করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, একের পর এক মেঘগুলি যেন এদিকের বড় বড় বাড়িগুলির ছাদের আড়াল হইতে উঠিয়া ওদিকের বাড়িগুলির ছাদের আড়ালে মিলাইয়া যাইতেছে। নীচে জলসিক্ত শীতল কঠিন রাজপথ—হ্যারিসন রোড। পাথরের ইটে বাঁধানো পরিধির মধ্যেও ট্রামলাইনগুলি চকচক করিতেছে। একতলার উপরে ট্রামের তারগুলি স্থানে স্থানে আড়াআড়ি বাঁধনে আবদ্ধ হইয়া বরাবর চলিয়া গিয়াছে। তারের গায়ে অসংখ্য জলবিন্দু জমিয়া জমিয়া ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। এই দুর্যোগেও ট্রামগাড়ি মোটর মানুষ চলার বিরাম নাই। বিচিত্র কঠিন শব্দে রাজপথ মুখরিত।

বৎসর অতীত হইতে চলিল, তবুও কলিকাতাকে দেখিয়া শিবনাথের বিস্ময়ের এখনও শেষ হয় নাই। অদ্ভুত বিচিত্র ঐশ্বর্যময়ী মহানগরীকে দেখিয়া শিবনাথ বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গিয়াছিল। সে বিস্ময়ের ঘোর আজও সম্পূর্ণ কাটে নাই। তাহার বিপুল বিশাল বিস্তার, পথের জনতা, যানবাহনের উদ্ধত ক্ষিপ্র গতি দেখিয়া শিবনাথ এখনও শঙ্কিত না হইয়া পারে না। আলোর উজ্জ্বলতা দোকানে পণ্যসম্ভারের বর্ণ-বৈচিত্র্যে বিচ্ছুরিত হইয়া আজও তাহার মনে মোহ জাগাইয়া তোলে; স্থান কাল সব সে ভুলিয়া যায়। মধ্যে মধ্যে ভাবে, এত সম্পদ আছে পৃথিবীতে—এত ধন, এত ঐশ্বর্য!

সেদিন সে সুশীলকে বলিল, কলকাতা দেখে মধ্যে মধ্যে আমার মনে হয় কি জানেন, মনে হয়, দেশের যেন হৃৎপিণ্ড এটা; সমস্ত রক্তস্রোতের কেন্দ্রস্থল।

সুশীল প্রায়ই শিবনাথের কাছে আসে, শিবনাথও সুশীলদের বাড়ি যায়। সুশীল শিবনাথের কথা শুনিয়া হাসিয়া উত্তর দিল, উপমাটা ভুল হল ভাই শিবনাথ। আমাদের চিকিৎসাশাস্ত্রের মতে, হৃৎপিণ্ড অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে রক্ত সঞ্চালন করে, সঞ্চার করে, শোষণ করে না। কলকাতার কাজ ঠিক উল্টো, কলকাতা করে দেশকে শোষণ। গঙ্গার ধারে ডকে গেছ কখনও? সেই শোষণ-করা রক্ত ভাগীরথীর টিউবে

টিউবে বয়ে চলে যাচ্ছে দেশান্তরে, জাহাজে জাহাজে—ঝলকে ঝলকে। এই বিরাট শহরটা হল একটা শোষণযন্ত্র।

এ কথার উত্তর শিবনাথ দিতে পারে নাই। নীরবে কথাটা উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। সুশীল আবার বলিল, মনে কর তো আপনার দেশের কথা—ভাঙা বাড়ি, কঙ্কালসার মানুষ, জলহীন পুকুর, সব শুকিয়ে যাচ্ছে এই শোষণে।

তারপর ধীরে ধীরে দৃঢ় আবেগময় কণ্ঠে কত কথাই সে বলিল, দেশের কত লক্ষ লোক অনাহারে মরে, কত লক্ষ লোক থাকে অর্ধাশনে, কত লক্ষ লোক গৃহহীন, কত লক্ষ লোক বস্ত্রহীন, কত লক্ষ লোক মরে কুকুর-বেরালের মত বিনা চিকিৎসায়। দেশের দারিদ্র্যের দুর্দশার ইতিহাস আরও বলিল, একদিন নাকি এই দেশের ছেলেরা সোনার ভাঁটা লইয়া খেলা করিত, দেশে বিদেশে অন্ন বিতরণ করিয়া দেশজননী নাম পাইয়াছিলেন—অন্নপূর্ণা। অফুরন্ত অন্নের ভাণ্ডার, অপর্যাপ্ত মনিমাণিক্য-স্বর্ণের স্তূপ। শুনিতে শুনিতে শিবনাথের চোখে জল আসিয়া গেল।

সুশীল নীরব হইলে সে প্রশ্ন করিল, এর প্রতিকার?

হাসিয়া সুশীল বলিয়াছিল, কে করবে?

আমরা।

বহুবচন ছেড়ে কথা কও ভাই, এবং সেটা পরস্মৈপদী হলে চলবে না।

সে একটা চরম উত্তেজনাময় আত্মহারা মুহূর্ত। শিবনাথ বলিল, আমি—আমি করব।

সুশীল প্রশ্ন করিল, তোমার পণ কি?

মুহূর্তে শিবনাথের মনে হইল, হাজার হাজার আকাশস্পর্শী অট্টালিকা, প্রশস্ত রাজপথ, কোলাহল-কলরবমুখরিত মহানগরী বিশাল অরণ্যে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে। অন্ধকার অরণ্যতলে দূর হইতে যেন অজানিত গম্ভীর কণ্ঠে কে তাহাকে প্রশ্ন করিতেছে, তোমার পণ কি? সর্বাঙ্গে তাহার শিহরণ বহিয়া গেল, উষ্ণ রক্তস্রোত দ্রুতবেগে বহিয়া চলিয়াছিল; সে মুহূর্তে উত্তর করিল, ভক্তি।

তাহার মনে হইল, চোখের সম্মুখে এক রহস্যময় আবরণীর অন্তরালে মহিমমণ্ডিত সার্থকতা জ্যোতির্ময় রূপ লইয়া অপেক্ষা করিয়া আছে। তাহার মুখ-চোখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। প্রদীপ্ত দৃষ্টিতে সে সুশীলের মুখের দিকে চাহিয়া অপেক্ষা করিয়া রহিল।

সুশীলও নীরব হইয়া একদৃষ্টে বাহিরের দিকে চাহিয়া বসিয়া ছিল, শিবনাথ অধীর আগ্রহে বলিল, বলুন সুশীলদা, উপায় বলুন।

বিচিত্র মিষ্ট হাসি হাসিয়া সুশীল বলিল, ওই ভক্তি নিয়ে দেশের সেবা কর ভাই, মা পরিতুষ্ট হয়ে উঠবেন।

শিবনাথ ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল, আপনি আমায় বললেন না!

বলব, আর একদিন।—বলিয়াই সুশীল উঠিয়া পড়িল। সিঁড়ির মুখ হইতে ফিরিয়া আবার সে বলিল, আজ আমাদের ওখানে যেও। মা বার বার করে বলে দিয়েছেন; দীপা তো আমাকে খেয়ে ফেললে।

দীপা সুশীলের আট বছরের বোন, ফুটফুটে মেয়েটি, তাহার সম্মুখে কখনও ফ্রক পরিয়া বাহির হইবে না। সুশীল তাহাকে বলিয়াছে, শিবনাথের সঙ্গে তাহার বিবাহ হইবে। সে শাড়িখানি পরিয়া সলজ্জ ভঙ্গিতে তাহার সম্মুখেই দূরে দূরে ঘুরিবে ফিরিবে, কিছুতেই কাছে আসিবে না; ডাকিলেই পলাইয়া যাইবে।

বারান্দায় দাঁড়াইয়া মৃদু বর্ষাধারায় ভিজিতে ভিজিতে শিবনাথ সেদিনের কথাই ভাবিতেছিল। ভাবিতে ভাবিতে দীপার প্রসঙ্গে আসিয়াই মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল; এমন একটি অনাবিল কৌতুকের আনন্দে কেহ কি না হাসিয়া পারে!

কি রকম? আকাশের সজল মেঘের দিকে চেয়ে বিরহী যক্ষের মত রয়েছেন যে? মাথার চুল, গায়ের জামাটা পর্যন্ত ভিজে গেছে, ব্যাপারটা কি?—একটি ছেলে আসিয়া শিবনাথের পাশে দাঁড়াইল।

তাহার সাড়ায় আত্মস্থ হইয়া শিবনাথ মৃদু হাসিয়া বলিল, বেশ লাগছে ভিজতে। দেশে থাকতে কত ভিজতাম বর্ষায়!

ছেলেটি হাসিয়া বলিল, আমি ভাবলাম, আপনি বুঝি প্রিয়ার কাছে লিপি পাঠাচ্ছেন মেঘমালার মারফতে। বাই দি বাই, এই ঘণ্টা দুয়েক আগে, আড়াইটে হবে তখন, আপনার সম্বন্ধী এসেছিলেন আপনার সন্ধানে—কমলেশ মুখার্জি।

চকিত হইয়া শিবনাথ বলিল, কে?

কমলেশ মুখার্জি। চেনেন না না কি?

শিবনাথ গম্ভীর হইয়া গেল। কমলেশ! ছেলেটি হা-হা করিয়া হাসিয়া বলিল, আমরা সব জেনে ফেলেছি মশায়। বিয়ের কথাটা আপনি স্রেফ চেপে গেছেন আমাদের কাছে। আমাদের ফীস্ট দিতে হবে কিন্তু।

শিবনাথ গম্ভীর মুখে নীরব হইয়া রহিল।

সামান্যক্ষণ উত্তরের প্রতীক্ষায় থাকিয়া ছেলেটি বলিল, আপনি কি রকম লোক মশায়, সর্বদাই এমন সিরিয়াস অ্যাটিচুড নিয়ে থাকেন. কেন বলুন তো? এক বছরের মধ্যে আপনার এখানে কেউ অন্তরঙ্গ হল না? ইট ইজ স্ট্রেঞ্জ।

শিবনাথের ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। কমলেশের নামে, তাহার এখানে আসার সংবাদে তাহার অন্তর ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। তবুও সে আত্মসম্বরণ করিয়া বলিল,

কি করব বলুন, মানুষ তো আপনার স্বভাবকে অতিক্রম করিতে পারে না। এমনিই আমার স্বভাব সঞ্জয়বাবু।

সঞ্জয় বারান্দার রেলিঙের উপর একটা কিল মারিয়া বলিল, ইউ মাস্ট মেণ্ড ইট, আমাদের সঙ্গে বাস করতে হলে দশজনের মত হয়ে চলতে হবে।—কথাটা বলিয়াই সদর্প পদক্ষেপে সে চলিয়া গেল। ঘরের মধ্যে তখন কোন একটা কারণে প্রবল উচ্ছ্বাসের কলরব ধ্বনিত হইতেছিল।

শিবনাথ একটু হাসিল, বেশ লাগে তাহার এই সঞ্জয়কে। তাহারই সমবয়সী সুন্দর সুরূপ তরুণ, উচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ, যেখানে হৈচৈ সেখানেই সে আছে। কোন রাজার ভাগিনেয় সে; দিনে পাঁচ-ছয় বার বেশ পরিবর্তন করে, আর সাগর-তরঙ্গের ফেনার মত সর্বত্র সর্বাগ্রে উচ্ছ্বসিত হইয়া ফেরে। ফুটবল খেলিতে পারে না, তবুও সে ফরোয়ার্ড লাইনে লেফ্‌ট আউটে গিয়া দাঁড়াইবে, চিৎকার করিবে, আছাড় খাইবে; অভিনয় করিতে পারে না, তবুও সে কলেজের নাটকাভিনয়ে যে কোন ভূমিকায় নামিবে; কিন্তু আশ্চর্যের কথা, গতি তাহার অতি স্বচ্ছন্দ, কাহাকেও আঘাত করে না, আর সে ভিন্ন কোন কলরব-কোলাহল যেন সুশোভনও হয় না।

কিন্তু কমলেশ কি জন্য এখানে আসিয়াছিল? যে তাহার সহিত সম্বন্ধ স্বীকার করিতে পর্যন্ত লজ্জা করে, সে কি কারণে এখানে আসিল? নূতন কোন আঘাতের অস্ত্র পাইয়াছে কি? তাহার গৌরীকে মনে পড়িয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে মাথার উপরের আকাশের দুর্যোগ তাহার অন্তরে ঘনাইয়া উঠিল। একটা দুঃখময় আবেগের পীড়নে বুকখানা ভরিয়া উঠিল।

সিঁড়ি ভাঙিয়া দুপদাপ শব্দে কে উঠিয়া আসিতেছিল, পীড়িত চিত্তে সে সিঁড়ির দিকে চাহিয়া রহিল। উঠিয়া আসিল একটি ছেলে, পরনে নিখুঁত বয়েজ-স্কাউটের পোশাক, মাথার টুপিটি পর্যন্ত ঈষৎ বাঁকানো; মার্চের কায়দায় পা ফেলিয়া বারান্দা অতিক্রম করিতে করিতেই বলিতেছে, হ্যালো সঞ্জয়, এ কাপ অব্ হট টী মাই ফ্রেণ্ড, ওঃ, ইট ইজ ভেরি কোল্ড!

ছেলেটির গলার সাড়া পাইয়া ঘরের মধ্যে সঞ্জয়ের দল নূতন উচ্ছ্বাসে কলরব করিয়া উঠিল। ছেলেটির নাম সত্য, শিবনাথের সঙ্গেই পড়ে। চালে-চলনে কায়দায়-কথায় একেবারে যাহাকে বলে নিখুঁত কলিকাতার ছেলে। আজও পর্যন্ত শিবনাথ তাহার পরিচিত দৃষ্টির বাহিরেই রহিয়া গিয়াছে।

ধীরে ধীরে শিবনাথের উচ্ছ্বসিত আবেগ শান্ত হইয়া আসিতেছিল; মেঘমেদুর আকাশের দিকে চাহিয়া সে উদাস মনে কল্পনা করিতেছিল একটা মহিমময় নিপীড়িত ভবিষ্যতের কথা। গৌরী তাহাকে মুক্তি দিয়াছে, সেই মুক্তির মহিমাতেই সে মহামন্ত্র পাইয়াছে, 'বন্দে মাতরম্, ধরণীম্ ভরণীম্ মাতরম্'।

পিছনে অনেকগুলি জুতার শব্দ শুনিয়া শিবনাথ বুঝিল, সঞ্জয়ের দল বাহির হইল,—হয় কোন রেস্তোরাঁয় অথবা এই বাদল মাথায় করিয়া ইডেন গার্ডেনে।

হ্যালো, ইজ ইট টু ইউ আর ম্যারেড?—সত্যের কণ্ঠস্বরে শিবনাথ ঘুরিয়া দাঁড়াইল; সম্মুখেই দেখিল, একদল ছেলে দাঁড়াইয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে, দলের পুরোভাগে সত্য, কেবল সঞ্জয় দলের মধ্যে নাই। শিবনাথের পায়ের রক্ত যেন মাথার দিকে ছুটিতে আরম্ভ করিল।

সে সঙ্কুচিত ভঙ্গিতে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া অকুণ্ঠিত স্বরে উত্তর দিল, ইয়েস, আই অ্যাম ম্যারেড।

এমন নির্ভীক দর্পিত স্বীকারোক্তি শুনিয়া সমস্ত দলটাই যেন দমিয়া গেল, এমন কি সত্য পর্যন্ত। কয়েক মুহূর্ত পরেই কিন্তু সত্য মাত্রাতিরিক্ত ব্যঙ্গভরে বলিয়া উঠিল, শেম!

ছেলের দল হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

দলটার পিছনে আপনার ঘরের দরজায় বাহির হইয়া সঞ্জয় ডাকিল, ওয়েল বয়েজ, টী ইজ রেডি। বাঃ, ও কি, শিবনাথবাবুকে নিয়ে আসছ না কেন, হি ইজ নট অ্যান আউট্‌কাস্ট; এ কি, শিবনাথবাবুর মুখ এমন কেন? ইট ইজ ইউ সত্য, তুমি নিশ্চয় কিছু বলেছ। না না না, শিবনাথবাবু, আপনাকে আসতেই হবে, ইউ মাস্ট জয়েন আস।

চায়ের আসরটা জমিয়া উঠিল ভাল। মনের মধ্যে যেটুকু উত্তাপ জমিয়া উঠিয়াছিল, সেটুকু ধুইয়া মুছিয়া দিল ওই সঞ্জয়। ঘরের মধ্যে বসিয়া স্টোভের শব্দে সত্য এবং অন্যান্য ছেলেদের কথা হাসি সে শুনিতে পায় নাই। চায়ের জলটা নামাইয়া ফুটন্ত জলে চা ফেলিয়া দিয়া সত্যদের ডাকিতে বাহিরে আসিয়াই শিবনাথের মুখ দেখিয়া ব্যাপারটা অনুমান করিয়া লইয়াছিল। সমস্ত শুনিয়া সে শিবনাথের পক্ষ লইয়া সপ্রশংস মুখে বলিল, দ্যাটস লাইক এ হিরো, বেশ বলেছেন আপনি শিবনাথবাবু। বিয়ে করা সংসারে পাপ নয়। বিয়ে করা পাপ হলে স্কাউট হওয়াও সংসারে পাপ।

এমন ভঙ্গিতে সে কথাগুলি বলিল যে, দলের সকলেই, এমন কি সত্য পর্যন্ত, না হাসিয়া পারিল না। সঞ্জয় বলিল, সত্য, তুমি 'শেম' বলেছ যখন, তখন শিবনাথবাবুর কাছে তোমাকে অ্যাপলজি চাইতে হবে—ইউ মাস্ট।

অল রাইট। ভুলের সংশোধন করতে আমি বাধ্য, আই অ্যাম এ স্কাউট, শিবনাথবাবু।

শিবনাথ তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিল, না না না, আমি কিছু মনে করি নি। ইউ আর ফ্রেণ্ডস।

সার্টেন্‌লি।

ইউ মাস্ট প্রুভ ইট, বোথ অব ইউ।—একজন বলিয়া উঠিল।

সত্য বলিল, হাউ ? প্রমাণ করতে আমরা সর্বদাই প্রস্তুত।

বক্তা বলিল, তুমি দু টাকা দাও, আর শিবনাথবাবু দু টাকা।

সঞ্জয় বলিয়া উঠিল, নো, নট শিবনাথবাবু, কল হিম্‌ শিবনাথ। সত্য দু টাকা, শিবনাথ দু টাকা, অ্যাণ্ড মাই হাম্বল সেল্‌ফ দু টাকা। নিয়ে এস খাবার।

সত্য বলিল, অল রাইট, কিন্তু নট এ কপার ইন মাই পকেট নাউ ; এনি ফ্রেণ্ড টু স্ট্যাণ্ড ফর মি ?

শিবনাথ বলিল, আই স্ট্যাণ্ড ফর ইউ মাই ফ্রেণ্ড। চার টাকা এনে দিচ্ছি আমি। সে বাহির হইয়া গেল।

সঞ্জয় হাঁকিতে আরম্ভ করিল, গোবিন্দ, গোবিন্দ ! গোবিন্দ মেসের চাকর।

শিবনাথ টাকা কয়টি সঞ্জয়ের হাতে দিতেই সত্য নাটকীয় ভঙ্গিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আমার একটা অ্যামেণ্ডমেণ্ট আছে। উই আর এইট, আটজনে দু টাকা সিনেমা, এক টাকা ট্রাম অ্যাণ্ড টী দেয়ার, আর থ্রী রুপিজ এখানে খাবার।

অধিকাংশ ছেলেই কলরব করিয়া সায় দিয়া উঠিল। সঞ্জয় বলিল, অল রাইট, তা হলে এখানে শুধু চা ; খাওয়া-দাওয়া সব সিনেমায়। কিন্তু চার আনার সীট বড় ন্যাস্টি, আট আনা না হলে বসা যায় না। চাঁদা বাড়াতে হবে শিবনাথ, তুমি তিন, সত্য তিন, আমি তিন ; ন টাকার পাঁচ টাকা সিনেমা, চার টাকা খাবার।

শিবনাথও অমত করিল না, পরম উৎসাহভরেই সে আবার টাকা আনিতে চলিয়া গেল। এ মেসে আসিয়া অবধি সুশীল ও পূর্ণের আকর্ষণে সে সকলের নিকট হইতে একটু দূরে দূরেই ছিল। সুশীল, পূর্ণ ও তাহাদের দলের আলোচনা, এমন কি হাস্য-পরিহাসেরও স্বাদ-গন্ধ সবই যেন স্বতন্ত্র ; তাহাদের ক্রিয়া পর্যন্ত স্বতন্ত্র। সে রসে জীবন-মন গম্ভীর গুরুত্বে থমথমে হইয়া উঠে। এমন কি, মাটির বুক হইতে আকাশের কোণ পর্যন্ত যে অসীম শূন্যতা, তাহার মধ্যেও সে রসপুষ্ট মন কোন এক পরম রহস্যের সন্ধান পাইয়া অসুচ্ছ্বসিত প্রশান্ত গাম্ভীর্যে গম্ভীর হইয়া উঠে। আর সঞ্জয়ের দলের আলাপ-আলোচনা মনকে করে হালকা রঙিন, বুদ্বুদের মত একের পর এক ফাটিয়া পড়ে, আলোকচ্ছটার বর্ণবিন্যাস মনে একটু রঙের ছাপ রাখিয়া যায় মাত্র। তাই আজ এই আকস্মিক আলাপের ফলে সঞ্জয়দের সংস্পর্শে আসিয়া শিবনাথ এই অভিনব আস্বাদে উৎফুল্ল না হইয়া পারিল না।

এবারে আপনার ঘরের মধ্যে আসিয়া সে চকিত হইয়া উঠিল, সুশীল তাহার সীটের উপর বসিয়া আছে। নীরবে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সে বাহিরের মেঘাচ্ছন্ন আকাশের দিকে চাহিয়া ছিল। শিবনাথ তাহার নিকটে আসিয়া মৃদুস্বরে বলিল, সুশীলদা !

হ্যাঁ।

কখন এলেন ? আমি এই তো ওঘরে গেলাম।

আমিও এই আসছি। তোমার সঙ্গে কথা আছে।

বলুন।—শিবনাথ একটু বিব্রত হইয়া পড়িল।

দরজাটা বন্ধ করে দাও।

শিবনাথ দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া আবার কাছে আসিয়া কুণ্ঠিতস্বরে বলিল, দেরি হবে ? তা হলে ওদের বলে আসি আমি।

না। তোমার কাছে টাকা আছে ?

কত টাকা ?

পঞ্চাশ।

না। আমার কাছে দশ-পনরো টাকা আছে মাত্র।

তাই দাও, দুটো টাকা তুমি রেখে দাও। না, এক টাকা রেখে বাকি সব দাও।

শিবনাথ আবার বিব্রত হইয়া পড়িল। তাহার নিজের ও সত্যর দেয় দুই টাকা যে এখনই লাগিবে!

সুশীল ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল, তাড়াতাড়ি কর শিবনাথ, আরজেণ্ট। পঞ্চাশ টাকায় দুটো রিভল্‌ভার। জাহাজের খালাসী তারা, অপেক্ষা করবে না।

শিবনাথ এক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া বাক্স খুলিয়া বাহির করিল সোনার চেন। চেনছড়াটি সুশীলের হাতে দিয়া বলিল, অন্তত দেড়শো টাকা হওয়া উচিত। বাকি টাকাটাও কাজে লাগাবেন সুশীলদা।

বিনা দ্বিধায় চেনছড়াটি হাতে লইয়া সুশীল উঠিয়া বলিল, আর একটা কথা, এদের সঙ্গে যেন বেশি রকম মেলামেশা কোরো না।—বলিতে বলিতেই সে দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া গেল।

পরদিন প্রাতঃকাল।

এখনও বাদল সম্পূর্ণ কাটে নাই। শিবনাথ অভ্যাসমত ভোরে উঠিয়া পূর্বদিনের ন্যায় বারান্দার রেলিঙের-উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। সিক্ত পিচ্ছিল রাজপথে তখনও ভিড় জমিয়া উঠে নাই। শিয়ালদহ স্টেশন হইতে তরিতরকারি, মাছ, ডিমের ঝুড়ি মাথায় ছোট ছোট দলে বিক্রেতারা বাজার অভিমুখে চলিয়াছে; দুই-একখানা গোরুর গাড়িও চলিয়াছে। এইবার আরম্ভ হইবে ঘোড়ার গাড়ি, রিক্‌শ, ট্যাক্সির ভিড়। যাত্রীবাহী ট্রেন এতক্ষণ বোধ হয় স্টেশনে আসিয়া গিয়াছে।

শিবনাথের বর্ষার এই ঘনঘটাচ্ছন্ন রূপ বড় ভাল লাগে। সে দেশের কথা

ভাবিতেছিল, কালীমায়ের বাগানখানির রূপ সে কল্পনা করিতেছিল, দূর হইতে প্রগাঢ় সবুজবর্ণের একটা স্তূপ বলিয়া মনে হয়। মধ্যের সেই বড় গাছটার ডাল বোধ হয় এবার মাটিতে আসিয়া ঠেকিবে। আমলার গাছের নূতন চিরল চিরল ছোট ছোট পাতাগুলির উজ্জ্বল কোমল সবুজবর্ণের সে রূপ অপরূপ! বাগানের কোলে কোলে কাঁদড়ের নালায় নালায় জল ছুটিয়াছে কলরোল তুলিয়া। মাঠে এখনও অবিরাম ঝরঝর শব্দ, এ জমি হইতে ও-জমিতে জল নামিতেছে। শ্রীপুকুর এতদিনে জলে থৈথৈ হইয়া ভরিয়া উঠিয়াছে। ঘোড়াটার শরীর এ সময় বেশ ভরিয়া উঠিবে; দফাদার পুকুরে এখন অফুরন্ত দলদাম। পিসীমা এই মেঘ মাথায় করিয়াও মহাপীঠে এতক্ষণ চলিয়া গিয়াছেন। মা নিশ্চয় বাড়িময় ঘুরিতেছেন, কোথায় কোন্‌খানে ছাদ হইতে জল পড়িতেছে তাহারই সন্ধানে।

সিঁড়িতে সশব্দে কে উঠিয়া আসিতেছিল, শিবনাথের মনের চিন্তা ব্যাহত হইল। সে সিঁড়ির দুয়ারের দিকে চাহিয়া রহিল। এ কি সুশীলদা! সুশীল আসিতেছিল যেন একটা বিপুল বেগের উত্তেজনায় অস্থির পদক্ষেপে। মুখ চোখ যেন জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে।

গ্রেট নিউজ শিবনাথ!—সে হাতের খবরের কাগজটা মেলিয়া ধরিল।

"ইউরোপের ভাগ্যাকাশে যুদ্ধের ঘনঘটা। সেরাজেভো শহরে অস্ট্রিয়ার যুবরাজ প্রিন্স ফার্ডিনাণ্ড এবং তাঁহার স্ত্রী অজ্ঞাত আততায়ীর গুলির আঘাতে নিহত। আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে অস্ট্রিয়ান গবর্মেণ্টের সার্ভিয়ার নিকট কৈফিয়ত দাবি। যুদ্ধসজ্জার বিপুল আয়োজন।"

শিবনাথ সুশীলের মুখের দিকে চাহিল। সুশীল যেন অগ্নিশিখার মত প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে।

শিবনাথ বলিল, সার্ভিয়ার মত ছোট একফোঁটা দেশ—

বাধা দিয়া সুশীল বলিল, ক্ষুদ্র শিশিরকণায় সূর্য আবদ্ধ হয় শিবনাথ, ক্ষুদ্রতা দেহে নয়, মনে। তা ছাড়া ইউরোপের রাজনীতির খবর তুমি জান না। যুদ্ধ অনিবার্য, শুধু অনিবার্য নয়, সমগ্র ইউরোপ জুড়ে যুদ্ধ। এই আমাদের সুযোগ।

যে দীপ্তিতে সুশীল জ্বলিতেছিল, সেই দীপ্তির স্পর্শ বুঝি শিবনাথকেও লাগিয়া গেল। তাহার চোখের সম্মুখ হইতে সমস্ত প্রকৃতি অর্থহীন হইয়া উঠিতেছিল, কল্পনার মধ্যে তাহার গ্রাম মুছিয়া গিয়াছে, মা নাই, পিসীমা নাই, কেহ নাই, সব যেন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

সুশীল বলিল, নাইন্‌টিন ফোর্‌টিন—গ্রেটেস্ট ইয়ার অব অল। উঃ, এতক্ষণে বোধ হয় ওআর ডিক্লেয়ার হয়ে গেছে! অস্ট্রিয়ান আর্মি মার্চ করে চলেছে!

দুই-একজন করিয়া এতক্ষণে বিছানা ছাড়িয়া বাহিরে আসিতেছিল। নীচে রাজপথে ভিড় জমিয়া উঠিয়াছে, খবরের কাগজের হকারের হাঁকে সংবাদের চাঞ্চল্যে সমস্ত জনতার মধ্যে যেন একটা চাঞ্চল্য জাগিয়া উঠিয়াছে।

সুশীল এদিক ওদিক দেখিয়া বলিল, ঘরে এস। উঃ, বেটা দেখছি, এই ভোরেও আমার সঙ্গ ছাড়ে নি! মার্ক দ্যাট ম্যান, ওই যে ওদিকের ফুটপাথে হাঁ করে হাবার মত দাঁড়িয়ে, ও-লোকটা স্পাই।

স্পাই!

হ্যাঁ। ঘরে এস।

ঘরে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া সুশীল বলিল, এইবার কাজের সময় আসছে শিবনাথ। যে কোন মুহূর্তে প্রত্যেককে প্রয়োজন হতে পারে।

শিবনাথ উত্তর দিল না। নির্ভীক উজ্জ্বল দৃষ্টিতে সুশীলের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, সৈনিক যেমন ভাবে-ভঙ্গিতে সেনাপতির মুখের দিকে চাহিয়া থাকে।

সুশীল আবার বলিল, এইবার টাকার প্রয়োজন হবে, বাড়ি থেকে তুমি টাকা আনতে পারবে?

চিন্তা করিয়া শিবনাথ বলিল, আপনি তো জানেন, একুশ বছরের এদিকে আমার কোন হাত নেই।

হুঁ। তোমার আর যা ভ্যালুয়েব্‌ল্‌স আছে, আমাকে দাও।

শিবনাথ একে একে বোতাম, ঘড়ি, আংটি, হাতের তাগা খুলিয়া সুশীলের হাতে তুলিয়া দিল। সুশীল সেগুলি পকেটে পুরিয়া বলিল, খুব সাবধানে থাকবে। পুলিস এইবার খুব অ্যাকৃটিভ হয়ে উঠবে। ভাল, তুমি এই চিঠিখানা নিয়ে পূর্ণর কাছে যাও। চিঠিখানা বরং পড়ে নাও, পড়ে ছিঁড়ে ফেল। মুখে তাকে চিঠির খবর বলবে। তার ওখানে বড় বেশি উপদ্রব পুলিসের, আমি যাব না। আর চিঠি নিয়ে যাওয়াও ঠিক নয়।

চিঠিখানা পড়িয়া লইয়া শিবনাথ স্লিপার ছাড়িয়া জুতা পরিয়া সুশীলের সঙ্গেই বাহির হইবার জন্য বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল।

সুশীল নীচের দিকে চাহিয়া বলিল, একটা মোটর এসে দাঁড়াল দরজায়।

শিবনাথ ঝুঁকিয়া দেখিল, রামকিঙ্করবাবু ও কমলেশ মোটর হইতে নামিতেছেন। পূর্ণর কাছে যাইবার জন্য সে যেন অকস্মাৎ অতিমাত্রায় ব্যাকুল হইয়া উঠিল, সুশীলের জামা ধরিয়া আকর্ষণ করিয়া সে বলিল, আসুন আসুন, ওদের আমি চিনি।

সুশীল আর কোন প্রশ্ন করিল না, নীচে নামিয়া আসিয়া দরজার মুখেই শিবনাথকে রামকিঙ্করবাবু ও কমলেশের সম্মুখে রাখিয়া নিতান্ত অপরিচিতের মতই চলিয়া গেল।

রামকিঙ্করবাবু সহাস্য মুখে বলিলেন, এই যে তুমি! তোমার ঠিকানা জানি না যে, খোঁজ করি। তুমি তো যেতে পারতে আমাদের বাসায়।

শিবনাথ কোন উত্তর দিল না, হেঁট হইয়া পথের উপরেই রামকিঙ্করকে প্রণাম করিয়া নীরবেই দাঁড়াইয়া ছিল। কমলেশও নতমুখে অকারণে জুতাটা ফুটপাথের উপর ঘষিতেছিল।

রামকিঙ্করবাবু আবার বলিলেন, এস, গাড়িতে এস; আমাদের ওখান হয়ে আসবে।

শিবনাথ বলিল, না। আমি এখন একজন বন্ধুর ওখানে যাচ্ছি।

বেশ তো, চল, গাড়িতেই সেখান হয়ে আমাদের বাসায় যাবে। মা এসেছেন কাশী থেকে, ভারি ব্যস্ত তোমাকে দেখবার জন্যে।

মা! নান্তির দিদিমা! তবে—! শিবনাথের বুকের ভিতরে যেন একটা আলোড়ন উঠিল। নান্তি, নান্তি আসিয়াছে—গৌরী!

"ইহার পর কোন ভদ্রকন্যা ভদ্ররমণীর বাস অসম্ভব"—এই কথাটা তাহার মনে পড়িয়া গেল। আরও মনে পড়িয়া গেল, তাহার মা-পিসীমার সহিত রামকিঙ্করবাবুর রূঢ় আচরণের কথা। তাহার সমস্ত অন্তর বিদ্রোহের ঔদ্ধত্যে উদ্ধত হইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু সে ঔদ্ধত্যের প্রকাশ হইবার লগ্নক্ষণ আসিবার পূর্বেই তাহার নজরে পড়িল, দূরে একটা চায়ের দোকানে দাঁড়াইয়া সুশীল বার বার তাহাকে পূর্ণর নিকট যাইবার জন্য ইঙ্গিত করিতেছে। সে আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা করিল না, পথে পা বাড়াইয়া সে বলিল, না, গাড়িতে সেখানে যাবার নয়; আমি চললাম, সেখানে আমার জরুরী দরকার।

মুহূর্তে রামকিঙ্করবাবু উগ্র হইয়া উঠিলেন, কঠোর উগ্র দৃষ্টিতে তিনি শিবনাথের দিকে চাহিলেন, কিন্তু ততক্ষণে শিবনাথ তাঁহাদিগকে অনায়াসে অতিক্রম করিয়া আপন পথে দৃঢ় দ্রুত পদক্ষেপে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে।

কমলেশের ঠোঁট দুইটি অপমানে অভিমানে থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল।

কুড়ি

রামকিঙ্করবাবু সামাজিকতা বা আত্মীয়তার ধার কোন দিনই ধারিতেন না। প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি দ্বিপ্রহরে নিদ্রাভিভূত হইবার মুহূর্তটি পর্যন্ত তাঁহার একমাত্র চিন্তা—বিষয়ের চিন্তা, ব্যবসায়ের চিন্তা, অর্থের আরাধনা। ইহার মধ্যে আত্মীয়তা কুটুম্বিতা, এমন কি সামাজিক সৌজন্য-প্রকাশের পর্যন্ত অবকাশ তাঁহার হইত না। ধনী পিতার সন্তান, শৈশব হইতেই তাঁবেদারের কাঁধে কাঁধে মানুষ হইয়াছেন, যৌবনের প্রারম্ভ হইতেই তাহাদের মালিক ও প্রতিপালকের আসনে বসিয়া কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছেন, ফলে প্রভুত্বের দাবি, মানসিক উগ্রতা তাঁহার অভ্যাসগত স্বভাব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আর একটি বস্তু—সেটি বোধ হয় তাঁহার জন্মগত, কর্মী পিতার সন্তান তিনি, কর্মের নেশা তাঁহার রক্তের ধারায় বর্তমান। এই কর্মের উন্মত্ত নেশায় তিনি সব কিছু ভুলিয়া থাকেন; আত্মীয়তা কুটুম্বিতা সামাজিক সৌজন্য-প্রকাশের অভ্যাস পর্যন্ত এমনই করিয়া ভুলিয়া থাকার ফলে অনভ্যাসে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। কিন্তু আসল মানুষটি এমন নয়। এই কৃত্রিম অভ্যাস-করা জীবনের মধ্যে সে মানুষের দেখা মাঝে মাঝে পাওয়া যায়, যে মানুষের আপনার জনের জন্য অফুরন্ত মমতা; অদ্ভুত তাঁহার খেয়াল, যে খেয়ালের বশবর্তী হইয়া স্বর্ণমুষ্টিও ধূলায় ফেলিয়া দিতে পারেন। কাশীতে অকস্মাৎ প্লেগ দেখা দিতে কমলেশ তাহার দিদিমা ও গৌরীকে লইয়া কলিকাতায় আসিতেই রামকিঙ্করবাবু গৌরীকে দেখিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন, নাত্তি যে অনেক বড় হয়ে গেলি রে, অ্যাঁ!

গৌরী মামাকে প্রণাম করিয়া মুখ নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। এই দুই মাসের মধ্যেই গৌরীর সর্ব অবয়ব হইতে জীবনের গতির স্বাচ্ছন্দ্য পর্যন্ত ঈষৎ ক্ষুণ্ণ ম্লান হইয়া গিয়াছে। শিবনাথকে যে পত্র সে লিখিয়াছিল, সে পত্রের ভাষা তাহার স্বকীয় অভিব্যক্তি নয়, সে ভাষা অপরের, সে তিরস্কার অন্যের; শিবনাথের প্রতি তাহার নিজের অকথিত সকল কথা ধীরে ধীরে তাহার রূপের মধ্যে এমনই করিয়া ব্যক্ত হইয়া উঠিতেছে। গৌরীর রূপের সে অভিনব অভিব্যক্তি রামকিঙ্করবাবুর চোখে পড়িল, তিনি পরমুহূর্তেই বলিলেন, কিন্তু এমন শুকনো শুকনো কেন রে তুই?

নাত্তির দিদিমা—রামকিঙ্করবাবুর মা এতক্ষণ পর্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন আপনার পূজার ঝোলাটির সন্ধানে; ঝোলাটি লইয়া উপরে উঠিতে উঠিতে তিনি রামকিঙ্করের কথাগুলি শুনিয়া সিঁড়ি হইতেই বলিলেন, তুমিই তো তার কারণ বাবা। মেয়েটাকে হাতে পায়ে বেঁধে জলে দিলে তোমরা। আবার বলছ, এমন শুকনো কেন?

গৌরী দিদিমার কথার ধারা লক্ষ্য করিয়া সেখান হইতে সরিয়া বাড়ির

ভিতরের দিকে চলিয়া গেল। রামকিঙ্করবাবু চমকিয়া উঠিলেন, তাঁহার সব মনে পড়িয়া গেল—শিবনাথের মায়ের কথা, পিসীমার কথা, সঙ্গে সঙ্গে শিবনাথের সেবা-কার্যের পরম প্রশংসার কথাও মনে পড়িল। আরও মনে পড়িল, শিবনাথের সঙ্গে গৌরীর দেখা-সাক্ষাৎ পর্যন্ত নাই। তিনি বলিলেন, দাঁড়াও, আজই খোঁজ করছি, শিবনাথ কোন্ কলেজে পড়ে, কোথায় থাকে! আজই নিয়ে আসছি তাকে।

কমলেশ বলিয়া উঠিল, না মামা।

কেন?—রামকিঙ্করবাবু আশ্চর্যান্বিত হইয়া গেলেন।

রামকিঙ্করবাবুর মা ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন, না, নিয়ে আসতে হবে না তাকে, সে একটা ছোটলোক, ইতর; একটা ডোমেদের মেয়ের মোহে—

বাধা দিয়া রামকিঙ্কর বলিলেন, ছি ছি, কি বলছ মা তুমি? কে, কার কথা বলছ তুমি?

ক্রোধ হইলে নাত্নির দিদিমার আর দিগ্বিদিক-জ্ঞান থাকে না, তিনি দারুণ ক্রোধে আত্মহারা হইয়া ডোমবধূর সমুদয় ইতিবৃত্ত উচ্চকণ্ঠে বিবৃত করিয়া কহিলেন, তুই করেছিস এ সম্বন্ধ; তোকেই এর দায় পুরোতে হবে। কি বিধান তুই করছিস বল্ আমাকে, তবে আমি জল-গ্রহণ করব।

রামকিঙ্কর বলিলেন, কথাটা একেবারে বাজে কথা বলেই মনে হচ্ছে মা। আমি আজই আমাদের ম্যানেজারকে লিখছি, সঠিক খবর জেনে তিনি লিখবেন। আমার কিন্তু একেবারেই বিশ্বাস হয় না মা।

চিঠি সেইদিনই লেখা হইল; কয়দিন পরে উত্তরও আসিল। ম্যানেজার লিখিয়াছেন, "খবর আমি যথাসাধ্য ভাল রকম লইয়াছি; এমন কি এখানকার দারোগাবাবুর কাছেও জানিয়াছি, ওটা নিতান্ত গুজবই। দারোগা বলিলেন, ওসব ছেলের নাম পাপের খাতায় থাকে না। ওদের জন্য আলাদা খাতা আছে। কথাটা ভাঙিয়া বলিতে বলায় তিনি বলিলেন, সে ভাঙিয়া বলা যায় না, তবে এইটুকু জানাই যে, ও রটনাটা রটাইয়াছে ওই বউটার শাশুড়ী এবং ভাশুর; মেয়েটা আসলে পলাইয়াছে তাহার বাপের বাড়ির গ্রামের একজন স্বজাতীয়ের সঙ্গে। সে লোকটা কলিকাতায় থাকে, সেখানে মেথর বা ঝাড়ুদারের কাজ করে। এখানে সর্বসাধারণের মধ্যেও কোন ব্যক্তিই কথাটা বিশ্বাস করেন নাই। বরং শিবনাথবাবুর এই সেবাকার্যের জন্য এতদঞ্চল তাঁহার প্রশংসায় পঞ্চমুখ।"

চিঠিখানা পড়িয়া কমলেশকে ডাকিয়া রামকিঙ্করবাবু হাসিয়া বলিলেন, পড়্। ম্যানেজার সেখান থেকে পত্র দিয়েছেন।

চিঠিখানা পড়িতে পড়িতে কান্নার আবেগে কমলেশের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া

আসিতেছিল। শিবনাথ তাহার বাল্যবন্ধু, তাহার উপর গৌরীর বিবাহের ফলে সে তাহার পরম প্রিয়জন, তাহার প্রতি অবিচার করার অপরাধ-বোধ অন্তরের মধ্যে এমনই একটা পীড়াদায়ক আবেগের সৃষ্টি করিল। কমলেশ শিবনাথকে খুব ভাল করিয়া জানিত, উলঙ্গ শৈশব হইতে তাহারা দুইজনে খেলার সাথী, বাল্যকাল হইতে তাহাদের মধ্যে প্রগাঢ় অন্তরঙ্গতা সত্ত্বেও শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিযোগিতা জাগিয়াছে, কৈশোরের প্রারম্ভে তাহারা কর্মের সহযোগিতার মধ্যে পরস্পরের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে যৌবন-জীবনে প্রবেশ করিয়াছে; একের শক্তি-দুর্বলতা দোষ-গুণ অন্যে যত জানে, সে নিজেও আপনাকে তেমন ভাল করিয়া জানে না। তাই কমলেশের অপরাধ-বোধ এত তীক্ষ্ণ হইয়া আপনার মর্মকে বিদ্ধ করিল। সে যেন কত ছোট হইয়া গেল! শিবনাথের নিকট, গৌরীর নিকট সে মুখ দেখাইবে কি করিয়া!

রামকিঙ্কর বলিলেন, যাও, মাকে চিঠিখানা পড়ে শুনিয়ে এস। আর দেখ, নাস্তিকে চিঠিখানা পড়তে দিও।

চিঠিখানা শুনিয়া নাস্তির দিদিমা খুব খুশী হইয়া উঠিলেন, তিনি সঙ্গে সঙ্গে হাঁকডাক শুরু করিয়া বলিলেন, নাস্তি নাস্তি, অ নাস্তি!

নাস্তি তাহার সমবয়সী মামাতো মাসতুতো বোনদের সহিত গল্প করিতেছিল, দিদিমার হাঁকডাক শুনিয়া সে তাড়াতাড়ি আসিয়া দাঁড়াইতেই তিনি বলিলেন, এই নে হারামজাদী, এই পড়্। চিলে কান নিয়ে গেল বলে সেই কে চিলের পেছনে পেছনে ছুটেছিল, তোর হল সেই বিত্তান্ত। কে কোথা থেকে কি লিখলে, আর তাই তুই বিশ্বেস করে কেঁদে-কেটে—বাবা, একালের মেয়েদের চরণে দণ্ডবত মা!

গৌরী রুদ্ধশ্বাসে চিঠিখানা হাতে লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। দিদিমার মনের আবেগ তখনও শেষ হয় নাই, তিনি তাঁহার অপরাধটুকু গৌরীর স্কন্ধে আরোপিত করিয়া কহিলেন, তা. একাল অনেক ভাল মা, তাই পরিবার এখন স্বামীর ওপর রাগ করতে পারছে। সেকালে বাবুদের ওসব ছিল কুকুর-বেরাল পোষার সামিল। ওই কি বলে, শ্যামাদাসবাবুর ভালবাসার লোক ছিল—কাদম্বিনী, সে বলেছিল, বাবু, তোমার পরিবারের গোবরের ছাঁচ তুলে এনে আমাকে দেখাও, সে কেমন সুন্দরী! তোরা হলে তো তা হলে গলায় দড়ি দিতিস, না হয় বিষ খেতিস।

গৌরীর চোখ দুইটি জলে ভরিয়া উঠিয়াছিল। চোখের জলের লজ্জা গোপন করিতেই সে চিঠিখানা ফেলিয়া দ্রুত সেখান হইতে চলিয়া গিয়া আপনার বিছানায় মুখ লুকাইয়া শুইয়া পড়িল।

কমলেশ নতমুখেই বলিল, দিদিমা!

দিদিমা ঝঙ্কার দিয়া বলিলেন, তুই ছোঁড়াই হচ্ছিস ভারি হেপো। একেবারে

রেগে আগুন হয়ে লেক্‌চার-মেক্‌চার ঝেড়ে এই কাণ্ড করে বসে থাকলি। যা এখন, যা, খোঁজখবর করে নিয়ে আয় তাকে।

সে যদি না আসে?

আসবে না? কান ধরে নিয়ে আসবি। গৌরী কি আমার ফেলনা নাকি? সে বিয়ে করেছে কেন আমার গৌরীকে?

তারপর তাঁহার ক্রোধ পড়িল কলিকাতার বাসায় যাঁহারা থাকেন, তাঁহাদের উপর। কেন তাঁহারা এতদিন শিবনাথের সংবাদ লন নাই? তাঁহাদের নিজের জামাই হইলে কি তাঁহারা এমন করিয়া সংবাদ লইতে ভুলিয়া বসিয়া থাকিতেন? শেষ পর্যন্ত তিনি মৃতা কন্যা—গৌরীর মার জন্য কাঁদিয়া ফেলিলেন। এ কি দারুণ বোঝা সে তাঁহার বুকের উপর চাপাইয়া দিয়া গেল?

ইহারই ফলে কমলেশ ও রামকিঙ্করবাবু শিবনাথের নিকট আসিয়াছিলেন সমাদর করিয়া শিবনাথকে লইয়া যাইবার জন্য, কিন্তু শিবনাথ একটা তন্ময় শক্তির আবেগে তাঁহাদিগকে পিছনে ফেলিয়া মেঘ মাথায় করিয়া ভিজিতে ভিজিতে আপন পথে চলিয়া গেল, তাঁহারা যেন তাহার নাগাল পর্যন্ত ধরিতে পারিলেন না।

নাতির দিদিমার নির্বাপিত ক্রোধবহ্নি আবার জ্বলিয়া উঠিল। তাঁহার ক্রোধ পড়িল শিবনাথের পিসীমা ও মার উপর। শিবনাথ যে তাঁহাদিগকে এমন করিয়া লঙ্ঘন করিয়া গেল, এ শিক্ষা যে তাঁহাদেরই, তাহাতে আর তাঁহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না। তিনি অত্যন্ত দৃঢ় ভঙ্গিতে বার্ধক্যনত দেহখানিকে সোজা করিয়া তুলিয়া বলিলেন, আমি আমার নাতিকে রানী করে দিয়ে যাব। আসতে হয় কি না-হয় আমার নাতির কাছে, আমি মলেও যেখানে থাকি সেইখান থেকে দেখব।

রামকিঙ্করবাবুও মনে মনে অত্যন্ত আহত হইয়াছিলেন, তিনি মার কথার প্রতিবাদ করিলেন না, গম্ভীরভাবে নীচে নামিয়া গেলেন। কমলেশ চুপ করিয়া বারান্দায় ভর দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। গৌরী ঘরের মধ্যে জানালার ধারে বসিয়া উল বুনিতেছিল; জানালাটা দিয়া পথের উপরটা বেশ দেখা যায়, তাহার হাতের আঙুল রচনা করিতেছিল উল দিয়া ছাঁদের পর ছাঁদ, দেখিতেছিল সে পথের জনতা। সমস্ত শুনিয়া তাহার হাতের কাজটি থামিয়া গেল, পথের দিকে চাহিয়া সে শুধু বসিয়াই রহিল।

সেদিন সন্ধ্যায় সমগ্র পরিবারটিকেই রামকিঙ্করবাবু থিয়েটার দেখিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন।

ঠিক মাসখানেক পর।

বিদ্যুৎ-তরঙ্গে তরঙ্গে সংবাদ আসিয়া পৌঁছিল, চৌঠা আগস্ট ব্রিটেন, জার্মানি ও অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া, ফ্রান্স রাশিয়া বেল্‌জিয়াম সার্ভিয়ার সহিত মিলিত হইয়াছে। সমগ্র কলিকাতা যেন চঞ্চল সমুদ্রের মত বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। হাজার হাজার মাইল পশ্চিমের মানুষের অন্তরের বিক্ষোভ আকাশ-তরঙ্গে আসিয়া এখানকার মানুষকেও ছোঁয়াচ লাগাইয়া দিল। শেয়ার-মার্কেটে সেদিনের সে ভিড়, ব্যবসায়ীমহলে সেদিনের ছুটাছুটি দেখিয়া কমলেশের মন বিপুল উত্তেজনায় ভরিয়া উঠিল। প্রত্যেক মানুষটি যেন উত্তেজনার স্পর্শে দৃঢ় দ্রুত পদক্ষেপে সোজা হইয়া চলিয়াছে।

কয়লার বাজার নাকি হু-হু করিয়া চড়িয়া যাইবে, প্রচুর ধন, অতুল ঐশ্বর্যে বাড়িঘর ভরিয়া উঠিবে। সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীর আসনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিবার কল্পনা করিতে করিতে অকস্মাৎ তাহার শিবনাথকে মনে পড়িয়া গেল; তাহার মনে হইল, আর একবার খোঁজ করিতে দোষ কি? সেদিন সত্যই হয়তো তাহার কোন কাজ ছিল। আর তাহার সহিত একবার মুখামুখি সকল কথা পরিষ্কার করিয়া বলিয়া লওয়ারও তো প্রয়োজন আছে। মোট কথা, যুক্তি তাহার যাহাই হউক না কেন, যাওয়ার উত্তেজিত প্রবৃত্তিই হইল আসল কথা। তাহাদের ভাবী সৌভাগ্যের সম্ভাবনার কথাটাও শিবনাথকে জানানো হইবে।

শিবনাথ ঘরে বসিয়া আপন মনে কি লিখিতেছিল। কমলেশ ঘরে ঢুকিয়া বলিল, এই যে!

মুখ তুলিয়া শিবনাথ তাহাকে দেখিয়া লেখা কাগজখানা বাক্সের মধ্যে পুরিয়া অতি মৃদু হাসিয়া বলিল, এস।

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কমলেশ সবিস্ময়ে বলিল, এ কি, এমন উষ্কখুষ্ক চেহারা কেন তোমার? অসুখ করেছে নাকি?

সত্যই শিবনাথের রুক্ষ চুল, মার্জনাহীন শুষ্ক মুখশ্রী, দেহও যেন ঈষৎ শীর্ণ বলিয়া মনে হইতেছিল।

হাসিয়া শিবনাথ বলিল, না, অসুখ কিছু নয়। আজ নাওয়া-খাওয়াটা হয়ে ওঠে নি।

এই সামান্য বিস্ময়ের হেতুটুকু লইয়া কমলেশ বেশ স্বচ্ছন্দ হইয়া উঠিল, সে বলিল, কেন? নাওয়া-খাওয়া হল না কেন?

কাজ ছিল একটু, সকালে বেরিয়ে এই মিনিট পনরো ফিরেছি।

কলেজ যাও নি?

যাক্‌গে সে কথা। তারপর দেশে কবে যাবে বল ?

দেশে এখন যাব না, এইখানেই পড়ব ঠিক হয়েছে। কিন্তু তোমার খবর কি বল তো ? সেদিন মামা নিজে এলেন, আর তুমি অমন করে চলে গেলে যে ?

বলেছিলাম তো, কাজ ছিল।

কি এমন কাজ যে, দুটো কথা বলবার জন্যে তুমি দাঁড়াতে পারলে না ?

এবার শিবনাথ হাসিয়া বলিল, যদি বলি, কোন নতুন লাভ অ্যাফেয়ার, যার মোহে মানুষ আপনাকে একেবারে হারিয়ে ফেলে !

কমলেশ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, যাক, বুঝলাম, বলতে বাধা আছে।

শিবনাথ এ কথার কোনও জবাব না দিয়া একটা পেপার-ওয়েট লুফিতে লুফিতে বলিল, চা খাবে একটু ?—বলিতে বলিতেই সে বারান্দায় বাহির হইয়া হাঁকিল, গোবিন্দ, দু পেয়ালা চা।

কমলেশ খবরের কাগজটা টানিয়া লইয়া বলিল, আজকের নিউজ একটা গ্রেট নিউজ।

হাসিয়া শিবনাথ বলিল, নতুন ইতিহাসের সন তারিখ বন্ধু—নাইনটিন ফোর্‌টিন—ফোর্থ আগস্ট।

আজই বিজ্‌নেস-মার্কেটে অদ্ভুত ব্যাপার হয়ে গেল। কয়লার দর তো হু-হু করে বেড়ে যাবে। মামা বলছিলেন, পড়ে কি হবে, এবার বিজ্‌নেসে ঢুকে পড়। তোমার কথাও বলছিলেন। অবশ্য তোমার যদি পছন্দ হয়।

বিজ্‌নেস অবশ্য খুব ভাল জিনিস।

হাসিয়া কমলেশ বলিল, কিন্তু কবিতা লেখা ছাড়তে হবে তা হলে। আমাকে দেখে লুকোলে, ওটা কি লিখছিলে ? কবিতা নিশ্চয়।

না।

তবে ? কি, দেখিই না ওটা কি ?

এবার শিবনাথ হাসিয়া বলিল, ওটা নতুন লাভ অ্যাফেয়ার—প্রেম-পত্র একখানা ; সুতরাং ওটা দেখানো যায় না।

কমলেশ আবার নীরব হইয়া গেল। চাকরটা আসিয়া চা নামাইয়া দিল, কমলেশ নীরবে চায়ের কাপ তুলিয়া লইয়া তাহাতে চুমুক দিল। তাহার নীরবতার মধ্যে শিবনাথও অন্যমনস্ক হইয়া জানালার দিকে নীরবেই চাহিয়া রহিল।

এ অশোভন নীরবতা ভঙ্গ করিয়া সে-ই প্রথম বলিল, তোমরা কি কাশীর বাসা তুলে দিয়েছ ?

হ্যাঁ।

অ।

কমলেশ বলিল, দিদিমা নাস্তি এইখানেই চলে এসেছে আমার সঙ্গে।

শিবনাথ নীরব হইয়া গেল।

কমলেশ এবার বলিল, আমাদের বাসায় চল একদিন।

হাঁটুর উপর মুখ রাখিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া শিবনাথ যেন তন্ময় হইয়া গিয়াছে।

কমলেশ বলিল, গৌরী দিন দিন যেন কেমন হয়ে যাচ্ছে। তার মুখ দেখলে আমাদের কান্না আসে।

একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া শিবনাথ বলিল, আজও আমার কলঙ্কমোচন হয় নি কমলেশ, আমি যেতে পারি না।

কমলেশ যেন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, মিথ্যে কথা, মিথ্যে কথা। মিস্‌চিভাস লোকের রটনা ওসব—আমরা খবর নিয়ে জেনেছি।

শিবনাথের মুখ-চোখ অকস্মাৎ তীক্ষ্ণ দীপ্তিতে প্রখর হইয়া উঠিল। সে বলিল, কিন্তু আমায় তো বিশ্বাস করতে পার নি। যেদিন নিজেকে তেমনই বিশ্বাসের পাত্র বলে প্রমাণ করতে পারব, সেইদিন আমার সত্যকার কলঙ্কমোচন হবে।

কমলেশের মাথাটা আপনা হইতেই লজ্জায় নত হইয়া পড়িল। সে নীরবে ঘরের মেঝের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। শিবনাথ মৃদু হাসিয়া আবার বলিল, 'সময় যেদিন আসিবে, আপনি যাইব তোমার কুঞ্জে।'

একটি ছেলে দরজার সম্মুখেই বারান্দায় রেলিঙে ঠেস দিয়া নিতান্ত উদাসীনভাবেই দাঁড়াইয়া ছিল; তাহাকে দেখিয়াই শিবনাথ ঈষৎ চঞ্চল হইয়া বলিল, এখানেই যখন থাকবে, মাঝে মাঝে এস যেন। একদিনে সকল কথা ফুরিয়ে দিলে চলবে কেন?

উঠিতে বলার এমন সুস্পষ্ট ইঙ্গিত কমলেশ বুঝিতে ভুল করিল না, সে উঠিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া নীরবে বাহির হইয়া গেল। কমলেশ বাহির হইয়া যাইতেই ছেলেটি শিবনাথের ঘরে আসিয়া বলিল, হয়ে গেছে সেটা?

শিবনাথ বাক্স খুলিয়া সেই কাগজখানা তাহার হাতে দিয়া বলিল, সুশীলদাকে একটু দেখে দিতে বলবেন।

কাগজখানা একটা বৈপ্লবিক ইস্তাহারের খসড়া।

কাগজখানি সযত্নে মুড়িয়া পরনের কাপড়ের মধ্যে লুকাইয়া ছেলেটি বলিল, পূর্ণদার সঙ্গে একবার দেখা করবেন আপনি—জরুরি দরকার।

করব।

ছেলেটি আর কথা কহিল না, বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

পূর্ণ যেমন মৃদুভাষী, কথাবার্তাও তাহার তেমনই সংক্ষিপ্ত ; প্রয়োজনের অধিক একটি কথাও সে বলে না। শিবনাথের জন্যই সে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করিতেছিল। শিবনাথ আসিতেই ঘরের দরজাটা বন্ধ করিয়া দিয়া সে বলিল, আপনাকে এইবার একটা বিপদের সম্মুখীন হতে হবে শিবনাথবাবু।

শিবনাথ প্রশান্তভাবে বলিল, কি, বলুন ?

পূর্ণ বলিল, অরুণের ওপর পুলিসের বড় বেশি নজর পড়েছে। তার কাছে কিছু আর্ম্‌স আছে আমাদের। সেগুলো এখন সরাবার উপায় করতে পারছি না। আপনি মেস বদল করে অরুণের মেসে যান। আর্ম্‌সগুলো আপনার কাছে থেকে যাবে, অরুণ অন্য মেসে চলে যাক। তা হলে অরুণের জিনিসপত্র সার্চ করলে তার আর ধরা পড়বার ভয় থাকবে না। পরে আপনার কাছ থেকে ওগুলো আমরা সরিয়ে ফেলব।

শিবনাথের বুক যেন মুহূর্তের জন্য কাঁপিয়া উঠিল। ওই মুহূর্তটির মধ্যে তাহার মাকে, পিসীমাকে মনে পড়িয়া গেল। ম্লানমুখী গৌরীও একবার উঁকি মারিয়া চলিয়া গেল।

পূর্ণ বলিল, আপনি তা হলে দু-তিন দিনের মধ্যেই চলে যান। সম্ভব হলে কালই। এই হল অরুণের মেসের ঠিকানা। অরুণ চলে যাবে, ছোট একটা সুটকেস ঘরের কোণে কাগজ-ঢাকা থাকবে। সেই ঘরেই আপনার সীটের বন্দোবস্ত আমরা করে রাখব।

ততক্ষণে শিবনাথ নিজেকে সামলাইয়া লইয়াছে। সে এবার বলিল, বেশ।

পূর্ণ তাহার হাতখানি ধরিয়া বলিল, গুড লাক।

সমস্ত রাত্রিটা শিবনাথের জাগরণের মধ্যে কাটিয়া গেল।

নানা উত্তেজিত কল্পনার মধ্যেও বার বার তাহার প্রিয়জনদের মনে পড়িতেছিল। সহসা এক সময় তাহার মনে হইল, যদি ধরাই পড়িতে হয়, তবে পূর্বাহ্ণে মা-পিসীমার চরণে প্রণাম জানাইয়া বিদায় লইয়া রাখিবে না ? গৌরী—আজিকার দিনেও কি গৌরীকে সে বঞ্চনা করিয়া রাখিবে ? না, সে কর্তব্য তাহাকে সুশেষ করিতেই হইবে। মাকে ও পিসীমাকে খুলিয়া না লিখিয়াও ইঙ্গিতে সে বিদায় জানাইয়া মার্জনা ভিক্ষা করিয়া পত্র লিখিল। তারপর পত্র লিখিতে আরম্ভ করিল গৌরীকে। লিখিতে লিখিতে বুকের ভিতরটা একটা উন্মত্ত আবেগে যেন তোলপাড় করিয়া উঠিল। এত নিকটে গৌরী, দশ মিনিটের পথ, একবার তাহার সহিত দেখা করিয়া আসিলে কি হয়, হয়তো জীবনে আর ঘটিবে না! অর্ধসমাপ্ত পত্রখানা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া সে জামাটা টানিয়া লইয়া গায়ে দিতে দিতেই নীচে নামিয়া গেল।

গেট বন্ধ। রাত্রি এগারোটায় গেট বন্ধ হইয়া গিয়াছে। মেসটি নামে মেস হইলেও কলেজ-কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত, মেস-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কাছে চাবি থাকে। বন্ধ দুয়ারের সম্মুখে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া শিবনাথ উপরে আসিয়া আবার চিঠি লিখিতে বসিল। চিঠিখানি শেষ করিয়া বিছানায় সে গড়াইয়া পড়িল শ্রান্ত-ক্লান্তের মতো। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর তাহার মনে হইল, সে করিয়াছে কি ? ছি, এতো দুর্বল সে ! এ বিদায় লওয়ার কি কোনও প্রয়োজন আছে ? কিসের বিদায়, আর কেন এ বিদায় লওয়া ? আবার সে উঠিয়া বসিয়া দেশলাই জ্বালিয়া পত্রগুলি নিঃশেষে পুড়াইয়া ফেলিল।

কোথায় কোন্ দূরের টাওয়ার-ক্লকে ঢং ঢং করিয়া তিনটা বাজিয়া গেল। মনকে দৃঢ় করিয়া সে আবার শুইয়া পড়িল। অভ্যাসমত ভোরেই তাহার ঘুম ভাঙিয়া যাইতেই সে অনুভব করিল, সমস্ত শরীর যেন অবসাদে ভাঙিয়া পড়িতেছে। তবুও সে আর বিছানায় থাকিল না, মন এই অল্প বিশ্রামেই বেশ স্থির হইয়াছে, সম্মুখের গুরু দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়া উঠিয়া পড়িল। মনের মধ্যে আর কোনও চিন্তা নাই, আছে শুধু ওই কর্মের চিন্তা। কেমন করিয়া কোন্ অজুহাতে কলেজের মেস পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইবে ?

একে একে ছেলেরা উঠিতেছিল। সঞ্জয় উঠিয়া বাহিরে আসিল, সঞ্জয় তাহার অন্তরঙ্গ হইয়া উঠে নাই, কিন্তু দূরত্বের ব্যবধানও আর নাই। সঞ্জয় তাহাকে দেখিয়াই বলিল, হ্যালো শিবনাথ, তোমার ব্যাপার কি বল তো ? কলেজেও যাচ্ছ না, এখানেও প্রায় থাক না! এ কি, তোমার চেহারা এমন কেন হে ? অসুখ নাকি ? ঠাণ্ডা লাগিও না, ঘরে চল, ঘরে চল।

শিবনাথ সঞ্জয়ের সঙ্গে তাহারই ঘরে আসিয়া ঢুকিল। সম্মুখেই দেওয়ালে একখানা প্রকাণ্ড বড় আয়না। পূর্বদিন হইতে অস্নাত অভুক্ত রাত্রিজাগরণক্লিষ্ট শিবনাথ আপন প্রতিবিম্ব দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। সত্যই তো, এ কি চেহারা হইয়াছে তাহার ! কিন্তু সে তো কোন অসুস্থতা অনুভব করে নাই !

সঞ্জয় বলিল, অনিয়ম করে শরীরটা খারাপ করে ফেললে তুমি শিবনাথ। কি যে কর তুমি, তুমিই জান। সত্যি বলতে কি, তুমি রীতিমত একটা মিস্ট্রি হয়ে উঠেছ। প্রত্যেকের নোটিশ অ্যাট্রাক্টেড হয়েছে তোমার উপর।

শিবনাথ হাসিয়া বলিল, জান, জীবনে আমি এই প্রথম কলকাতায় এসেছি। কলকাতা যেন একটা নেশার মত পেয়ে বসেছে আমাকে। সোজা কথায়, পাড়াগাঁয়ের ছেলে কলকাত্তাই হয়ে উঠছি আর কি।

ঘাড় নাড়িয়া সঞ্জয় বলিল, নট অ্যাট অল, বিশ্বাস হল না আমার। হাউএভার

আমি তোমার সিক্রেট জানতে চাই না। কিন্তু আমার একটা কথা তুমি শোনো, তুমি বাড়ি চলে যাও, ইউ রিকোয়্যার রেস্ট, শরীরটা সুস্থ করা প্রয়োজন হয়েছে।

শিবনাথের মন মুহূর্তে উল্লসিত হইয়া উঠিল; শরীর-অসুস্থতার অজুহাতে বাড়ি চলিয়া যাওয়ার ছলেই তো মেস ত্যাগ করা যায়। সঙ্গে সঙ্গে সঙ্কল্প তাহার স্থির হইয়া গেল। সে হাতের আঙুল দিয়া মাথার রুক্ষ চুলগুলি পিছনের দিকে ঠেলিয়া দিতে দিতে বলিল, তাই ঠিক করেছি ভাই, শরীর যেন খুব দুর্বল হয়ে গেছে, আজই আমি বাড়ি চলে যাব। দেখি, আবার সুপার মশায় কি বলেন!

বলবে? কি বলবে? চল, আমি যাচ্ছি তোমার সঙ্গে। আমাদের দেশটাই এমনই, হেল্‌থের দাম এখানে কিছু নয়, ডিগ্রী ইজ এভ্‌রিথিং হিয়ার; ননসেন্স! জান, আমি এইজন্যে ঠিক করে ফেলেছি, অ্যাণ্ড ইট ইজ সার্টেন, এই আই. এ. এগ্‌জামিনেশনের পরই আমি বিলেত যাব। মামা ওআরের জন্যে আপত্তি করছিলেন, কিন্তু টাইম ইজ মানি, পড়ার বয়স চলে গেলে বিলেত গিয়ে কি হবে?

শিবনাথ সঞ্জয়কে শত ধন্যবাদ দিল তাহার সুপরামর্শের জন্য, তাহার সাহায্যের জন্য। সঞ্জয় নিজেই তাহার জিনিসপত্র গুছাইয়া দিল, বিদায়ের সময় বলিল, বেশিদিন বাড়িতে থেকো না যেন। পার্সেণ্টেজ কোন রকমে দু বছরে কুলিয়ে যাবে।

শিবনাথ হাসিয়া বলিল, যত শিগগির পারি, ফিরব।

হাসিয়া সঞ্জয় বলিল, তোমার বেটার-হাফকে আমার নমস্কার জানিও।

জানাব।

এদিকে অরুণের মেসে সকল বন্দোবস্ত হইয়াই ছিল। অরুণ তাহার কিছুক্ষণ পূর্বেই মেস পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। মারাত্মক অস্ত্রের ছোট সুটকেসটি ঘরের কোণে কাগজের মধ্যে চাপা ছিল। শিবনাথ সেটিকে তাহার নিজের ট্রাঙ্কের মধ্যে বন্ধ করিয়া ফেলিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া আপনার জিনিসপত্র গুছাইতে মনোনিবেশ করিল।

জিনিসপত্র গুছাইয়া সে চাকরকে ডাকিয়া বলিল, ঘরটা একবার পরিষ্কার করে দাও দেখি; বড্ড নোংরা হয়ে রয়েছে।

চাকর বলিল, অরুণবাবু—ওই যে বাবুটি এ ঘরে ছিলেন, তাঁর মশাই ওই এক ধরন ছিল। কিছুতেই ঘর ভাল করে পরিষ্কার করতে দিতেন না। তা দিচ্ছি পরিষ্কার করে।

কিছুক্ষণ পর সে মেসের ঝাড়ুদারনীকে সঙ্গে করিয়া ঘরে আসিয়া তাহাকে বলিল, এক টুকরো কাগজ যেন না পড়ে থাকে। ভাল করে পরিষ্কার করে দাও।

শিবনাথ স্তম্ভিত বিস্ময়ে মেয়েটির দিকে চাহিয়া ছিল। এ কে? এ যে সেই নিরুদ্দিষ্টা ডোমবউ। শরীর তাহার সুস্থ সবল, শহরের জল-হাওয়ায় বর্ণশ্রী উজ্জ্বল, কলিকাতার জমাদারনীদের মত তাহার গায়ে পরিষ্কার জামা, সৌষ্ঠবযুক্ত শাড়িখানি কোমর দিয়া আঁটসাট করিয়া পরা, তাহাকে আর সেই ডোমবধূ বলিয়া চেনা যায় না, তবুও শিবনাথের ভুল হইল না, প্রথম দৃষ্টিতেই তাহাকে চিনিয়া ফেলিল।

মেয়েটিও তাহার মুখের দিকে চাহিয়া প্রথমটা বিস্ময়ে যেন হতবাক হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু সে মুহূর্তেই তাহার মুখখানি যেন দীপালোকের মত উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, মুখখানি ভরিয়া হাসিয়া সে পরম ব্যগ্রতাভরে সম্ভাষণ করিল, বাবু! জামাইবাবু! সঙ্গে সঙ্গে হাতের ঝাঁটাটা সেইখানে ফেলিয়া দিয়া সে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল।

শিবনাথ বিস্ময় কাটাইয়া তাহাকে প্রশ্ন করিল, তুমি এখানে কোথায় ?

মাথার ঘোমটাটি অল্প বাড়াইয়া দিয়া মেয়েটি বলিল, কলকাতাতেই আমি থাকি বাবু, জমাদারনীর কাজ করি।

শিবনাথ একটু অধীরভাবেই প্রশ্ন করিল, কিন্তু কলকাতাতে তুমি এলে কেমন করে ?

সলজ্জ হাসি হাসিয়া মেঝের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া সে বলিল, আমার নতুন পুরুষের সঙ্গে বাবু।

নূতন পুরুষ, অর্থাৎ নূতন স্বামী।

আবার সাঙা করেছ বুঝি ?

আজ্ঞে হ্যাঁ বাবু। শাশুড়ী-ভাশুরের জ্বালায় আমি মাসীর বাড়ি পালিয়ে গিয়েছিলাম, সেইখানেই—

সেইখানেই এই নূতন স্বামীর সহিত বিবাহ হইয়াছে। ইঙ্গিতে অর্থ বুঝিতে শিবনাথের ভুল হইল না। তাহার চিত্ত মেয়েটির উপর বিরূপ হইয়াই ছিল, এ কৈফিয়তে তাহার সেই বিরূপতার এতটুকু লাঘব হইল না। সে রূঢ়স্বরে বলিল, সাঙাই যদি করলে, তবে ভাশুরকে সাঙা করতে কি দোষ ছিল ?

মেয়েটির মুখ মুহূর্তের জন্য উগ্র দীপ্তিতে ভরিয়া উঠিল, পর-মুহূর্তেই সে হেঁট হইয়া ঝাঁটাগাছটা কুড়াইয়া লইয়া ঝাঁট দিতে আরম্ভ করিয়া বলিল, সে কথা আপুনি শুনে কি করবেন বাবু? মানুষের মন তো মানুষের হুকুমে ওঠে না মাশায়!

শিবনাথ তাহার কথার আর জবাব দিল না বা আর কোন প্রশ্ন করিল না, ক্ষুব্ধচিত্তে নীরবে বসিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল। নূতন স্থান, জানালার বাহিরেও রাজপথের নূতন রূপ। সেখানে বাহিরের দিকে চাহিলেই নজরে পড়িত—পান-সিগারেটের দোকান, তাহার পাশে কাচের বাসনের দোকান, হার্মোনিয়ামের দোকান, ট্রাম মোটর ঘোড়ার গাড়ি, গতিশীল মানুষের ভিড়। এক এক সময় মনে হইত, দ্রুতবেগে বুঝি পথই চলিয়াছে সম্মুখের দিকে। আর এটি একটি ছোট চৌরাস্তা, এখানে ট্রাম নাই, চৌরাস্তার পাশে পাশে রিক্শর সারি, দোকানের মধ্যে ওদিকের কোণে একটা ফলের দোকান, এদিকের কোণে একটা চায়ের দোকান। বিকিকিনির জাঁকজমক এখানে নাই, জীবনের গতি এখানে অপেক্ষাকৃত মন্থর, এখানে পথের উপর দাঁড়াইয়া মানুষ গল্প করিতে পায়; শিবনাথের এটা ভালই লাগিল।

বাবু! জামাইবাবু!

মুখ ফিরাইয়া শিবনাথ তাহার দিকে চাহিল, মেয়েটি বলিল, দেখুন, পরিষ্কার হয়েছে? শিবনাথ ঘরখানির দিকে চাহিয়া দেখিল, নিপুণ সযত্ন পরিমার্জনায় ঘরখানি তকতক করিতেছে। সে মৌখিক সন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলিল, বেশ হয়েছে, চমৎকার হয়েছে।

মেয়েটি খুশি হইয়া উঠিল। হাসিমুখে এবার সে বলিল, মা পিসীমা ভাল আছেন বাবু?

সংক্ষেপে শিবনাথ উত্তর দিল, হ্যাঁ।

মেয়েটি আবার বলিল, আর গাঁয়ে ব্যামো-স্যামো হয় নাই তো বাবু?

না।

আর একটি কথা শুধাব, রাগ করবেন না তো জামাইবাবু?

কি?—শিবনাথের ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল।

গৌরীদিদিমণি কেমন আছেন?

ভালই আছেন।

কত বড় হয়েছেন এখন?

শিবনাথ বিরক্ত হইয়া বলিল, সে শুনে আর তুমি কি করবে, বল? তুমি বরং আপন কাজ করগে যাও।

মেসের চাকরটি এটা ওটা লইয়া যাওয়া-আসা করিতেছিল, এবার সে কুঁজায় জল ভরিয়া লইয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতে করিতে শিবনাথের শেষ কথা কয়টি শুনিয়া রূঢ়স্বরে সেই কথারই প্রতিধ্বনি করিল, যা যা, আপনার কাজ কর্‌গে যা। ভদ্দরলোকের ঘরে দাঁড়িয়ে ব্যাড়র ব্যাড়র করে বকতে আরম্ভ করেছে!

মেয়েটি মুহূর্তে সাপিনীর মত ফোঁস করিয়া উঠিয়া বলিল, কি রকম মানুষ তুমি গো! তোমার আবার এমন চ্যাটাং চ্যাটাং কথা কেনে? আমার দেশের নোক, আমাদের বাবু, বলব না কথা, দেশের খবর নোব না?—বলিতে বলিতে মেয়েটি ঘর হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেল। মেয়েটির উপর প্রবল বিরূপতা সত্ত্বেও চাকরটির এই অনধিকার মধ্যবর্তিতা শিবনাথের ভাল লাগিল না, বরং মেয়েটির ওই শেষের কথাগুলি বেশ ভালই লাগিল—আমাদের দেশের লোক, আমাদের বাবু।

মেসটি কতকটা হোটেলের মত, নানা শ্রেণীর লোক এখানে থাকে; ছাত্রের সংখ্যা নাই বলিলেই চলে, চাকুরের সংখ্যাই বেশি। বেলা প্রায় পাঁচটা হইয়া আসিয়াছে, দুই-একজন করিয়া আপিস-ফেরত বাবু আসিয়া মেসে ঢুকিতেছিলেন। সারাদিন মুখ বন্ধ করিয়া খাটুনির পর এতক্ষণে বোলচাল যেন তুবড়ি-বাজির মত ফুটিতে আরম্ভ করিয়াছে।

একজন মুক্ত দ্বারপথে শিবনাথের ঘরের দিকে চাহিয়া বলিল, বলিহারি বাবা, থ্যাঙ্ক ফিল্‌ড আপ! এক রাজা যায়, অন্য রাজা হয়, ভারতের সিংহাসন খালি নাহি রয়! নিমাইবাবুর কপাল বটে বাবা!

নিমাইবাবু বোর্ডিঙের মালিক। শিবনাথ ওই মেয়েটার কথাই ভাবিতেছিল। মেয়েটা কুগ্রহের মত তাহার অদৃষ্টাকাশে আসিয়া জুটিয়াছে। গ্রামের ঐ ঘটনার পর, আবার যদি কোনরূপে এই সংবাদটা গ্রামে যায়, তবে কি আর রক্ষা থাকিবে! মিথ্যা কলঙ্ক অক্ষয় সত্য হইয়া তাহার ললাটে চিরজীবনের মত অঙ্কিত হইয়া রহিবে।

অকস্মাৎ একটা তীব্র ক্রুদ্ধ চিৎকার-ধ্বনিতে মেসটা সচকিত হইয়া উঠিল। নারী-কণ্ঠের চিৎকার ও সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন পুরুষের কণ্ঠে সমস্বরে উচ্চারিত প্রশ্নধ্বনি। শিবনাথও কৌতূহলবশে আসিয়া দেখিল, বারান্দার কোণে কয়েকজন বাবু ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। ভিড়ের ওপাশে সেই ডোমবধূ প্রদীপ্ত মুখে অকুণ্ঠিত কণ্ঠে চিৎকার করিয়া বলিতেছে, আপনকাদের ওই চাকর মাশায়, আমাকে বলে কি, ওই নতুন বাবুর সঙ্গে তোর এত পিরীত কিসের? মাশায়, উনি আমাদের দেশের নোক, গাঁয়ের নোক। তা ছাড়া উনি আমার বাপ বল বাপ, মা বল মা, ভাই বল ভাই, সব। আমার মাশায়, সোয়ামী মল কলেরায়, তারপরে আমার হল কলেরা, কেউ কোথাও নাই, ঘরে শকুনি এসে বসে আছে আমার মরণ তাকিয়ে। আমার ময়লামাথা দেহ মায়ের মতন কোলে করে তুলে উনি যতন করে ওযুধ দিয়ে পথ্যি দিয়ে বাঁচিয়েছেন। একা কি আমাকে মাশায়? গাঁয়ে যেখানে যার রোগ হয়েছে, সেইখানে উনি গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। তাকে দেখে খবর শুধাব না মাশায়? বলেন, আপনারাই বলেন? তাকে পেনাম আমি করব না?

শিবনাথ আর সেখানে দাঁড়াইল না। প্রশংসার নম্রতায় যশোগৌরবের ভারে তাহার মাথা যেন নুইয়া পড়িতেছিল। মেয়েটি যেন তাহারই জয়ধ্বজা বহন করিয়া অকুণ্ঠিত উচ্চকণ্ঠে সমগ্র পৃথিবীকে তাহার জয়গান শুনাইতেছে। সে তাড়াতাড়ি আসিয়া ঘরে বসিল।

মেয়েটির প্রতি বিরূপতা সে আর অনুভব করিতে পারিল না, তাহার প্রতি পরম স্নেহে তাহার অন্তর তখন পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

কালের অংশ কল্প; কল্পনায় কল্পলোক রচনা করিয়া তাই মানুষ করিতে চায় কাল-জয়।

ভবিষ্যতের ইতিহাস রচনা করিবার কল্পনা করিয়া বাংলার যে তরুণের দল ভারতের স্বাধীনতা-লক্ষ্যের সংক্ষিপ্ত পথের সন্ধানে উন্মত্ত অধীর গতিতে নীরন্ধ্র অন্ধকার পথে ছুটিয়াছিল, এই সময়ে তাহাদের গতিবেগ তীব্র হইতে তীব্রতর হইয়া উঠিতেছিল।

ভাবীকালের কোন্ মণিকোঠায় স্বাধীনতার দীপশিখা জ্বলিতেছে, কত দীর্ঘ সে দূরত্ব, কালের কালো জটাজালের অন্ধকার কত জটিল ; সে বিবেচনা করিবার অবসর তাদের তখন নাই, পশ্চিমের রণাঙ্গনের রণবাদ্যের ধ্বনি, সৈন্যবাহিনীর পদক্ষেপের শব্দ, মারণাস্ত্রের গর্জনশব্দে উন্মত্ত হইয়া তাহারাও বর্তমানকালকে অতিক্রম করিয়া ভাবীকালকে জয় করিতে যাত্রা শুরু করিয়া দিল।

সুশীলকে দেখাই যায় না। সে নাকি সমগ্র উত্তরাপথ—লাহোর হইতে কলিকাতা পর্যন্ত একটা বিরাট ব্যবস্থার চেষ্টায় ফিরিতেছে। শিবনাথ কথাটার আভাস মাত্র পাইয়াছে, সুস্পষ্ট সংবাদ সে কিছু জানে না। সে জানিবার অধিকারও তাহার হয় নাই। সৈনিকের মত আদেশ পালন করাই তাহার কাজ।

অসুখের ছলনায় বাড়ি যাইবার ভান করিয়া আসিয়াছে, কলেজ যাওয়া চলে না; পড়িতেও ভাল লাগে না। শিবনাথ বসিয়া বসিয়া কল্পনার জাল বোনে শুধু। অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করে আদেশের, সংবাদের। আজ কুড়ি দিনের উপর বাড়িতে চিঠি দিতে পর্যন্ত সে ভুলিয়া গিয়াছে। এ কয়দিন তাহার বাড়ির কথা, তাহার মাকে পিসীমাকে মনে করিবার পর্যন্ত অবকাশ হয় নাই। সে কল্পনা করে, আকাশস্পর্শী প্রাসাদ প্রচণ্ড বিস্ফোরণে ধুলার মত গুঁড়া হইয়া আকাশ অন্ধকার করিয়া মিলাইয়া গেল। রেলপথের ব্রিজ ভাঙিয়াছে, টেলিগ্রাফের তার ছিঁড়িয়াছে। ওদিকে ফ্রান্সের রণাঙ্গনে জার্মানবাহিনী দৃঢ় পদক্ষেপে ক্যালের দিকে অগ্রসর হইতেছে।

পাশের ঘরগুলিতেও যুদ্ধের সংবাদের উত্তেজনাপূর্ণ আলোচনা চলে। কয়জনে মিলিয়া সন্ধ্যার পর ম্যাপ খুলিয়া লাইন টানিয়া যুদ্ধের সংবাদ পড়িয়া থাকেন। যুদ্ধনীতির পদ্ধতির সমালোচনা গভীর হইতে গভীরতর হইয়া উঠে, সঙ্গে সঙ্গে তামাক ও সিগারেটের ধোঁয়ায় ঘরখানা ভরিয়া যায়। কোণের ঘরে ফ্রেঞ্চকাট-দাড়িওয়ালা ভদ্রলোকটি একাই বাক্স হইতে হুইস্কির বেঁটে বোতল বাহির করিয়া বসেন ; একটি গ্লাস ভরিয়া লইয়া গভীর অভিনিবেশসহকারে শেয়ার-মার্কেটের দরের পাতাখানি খুলিয়া নোট করেন, মধ্যে মধ্যে গ্লাসে এক-একটি চুমুক দেন ; বাঁ হাতের আঙুলে জ্বলন্ত সিগারেটের ঘনশুভ্র ধোঁয়া আঁকিয়া-বাঁকিয়া উঠিতে থাকে।

ম্যানেজারের সঙ্গে চাকরটার এখন রোজ বচসা হয় যুদ্ধ লইয়া। ম্যানেজার বলেন, যুদ্ধ হচ্ছে বিলেতে, তা এখানে শাকের দরটা বাড়বার মানে কি ?

চাকরটা বলে, তা আপনি শুধান গিয়ে শাকওয়ালাকে। আমি কি করে সে জবাব দোব ? কাল থেকে যাবেন আপনি নিজে বাজার করতে, আমি পারব নি।

সেদিন সকালে তাহাদের দুইজনের এই উত্তেজিত আলোচনাটা শিবু বসিয়া বসিয়া শুনিয়া উপভোগের হাসি হাসিতেছিল। বাহিরের বারান্দায় ডোমবউ ঝাঁট

দিতেছিল, শিবনাথের ঘরের সম্মুখে আসিয়া সে আবর্জনার বালতিটা রাখিয়া ঘরে ঢুকিয়া পড়িল।

জামাইবাবু!

শিবনাথ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল, কি?

একটি কথা বলব আপনাকে?

কি?

ওই নীচে একটি নোক অহরহ দাঁড়িয়ে থাকে, আপনি দেখেছেন? ওই নোকটি আপনার খবর আমাকে শুধায়।

স্পাইটা! শিবনাথ চমকিয়া উঠিল। মেয়েটি বলিয়াই গেল, এই যে এখানকার চাকরটি, উ সুদ্ধু ওই নোকটির সঙ্গে ফিসফাস করে। আমাকে বলে কি যে, আপনার ঘরে কি আছে দেখিস, কাগজপত্র কুড়ায়ে এনে দিস। দিলে সরকার থেকে নাকি আমাকে বকশিশ দিবে। নোকটি নাকি গোয়েন্দা পুলিস—ওই চাকরটি আমাকে বলেছে।

এতক্ষণে শিবনাথ আপনাকে সংযত করিয়া লইয়াছিল, সে মৃদু হাসিয়া বলিল, রোজ তোমাকে আমি কাগজ বেছে দোব, তুমি নিয়ে গিয়ে ওকে দিও।

মেয়েটি বিচিত্র দৃষ্টিতে শিবনাথের দিকে চাহিয়া বলিল, আমরা ছোটনোক বলে কি আমাদের ধম্মভয়ও নাই বাবু? আপনার ক্ষেতি যাতে হয়, তাই কি আমি করতে পারি?

কথার শেষের দিকে আসিয়া তাহার কণ্ঠস্বর যেন ভাঙিয়া পড়িল, চোখ দুইটিও সজল হইয়া উঠিয়াছে।

শিবনাথ বলিল, না না, তাতে আমার ক্ষতি হবে না, বরং ভালই হবে।

মেয়েটা সহসা অত্যন্ত মনোযোগের সহিত ঘরের মেঝে ঝাঁট দিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িল; ঝাঁট দিতে দিতেই অতি মৃদুস্বরে বলিল, চাকরটা আসছে বাবু, পায়ের শব্দ উঠছে।

সত্য-সত্যই প্রায় পরক্ষণেই আসিয়া দরজায় দাঁড়াইল; হাসিয়া শিবনাথের দিকে চাহিয়া বলিল, জমাদারনী আমাদের আপনার ভারি নাম করে বাবু, আপনার ওপর ভারি ভক্তি।

শিবনাথ উত্তরে তাহাকে প্রশ্ন করিল, আমার কোন চিঠিপত্র আসে নি হে?

আজ্ঞে না, চিঠি এলে আমি তখনই দিয়ে যেতাম।

চিঠির প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াই শিবনাথ সত্য-সত্যই চিন্তিত হইয়া উঠিল, আজ কয়দিনই বাড়ির চিঠি আসে নাই; সে নিজেও চিঠি দেয় নাই প্রায় কুড়ি দিন।

সপ্তাহখানেক আগে পিসীমার চিঠি আসিয়াছে, পিসীমার নাম দিয়া লিখিয়াছেন মা। সে চিঠির উত্তর সে দিতে পারে নাই, শুধু তো কুশলবার্তা তাঁহারা চান নাই, চাহিয়াছেন অনেক কিছু জানিতে!

জামাইবাবু! চিঠি হয়তো ওই লোকটাই নিয়ে নিয়েছে। আপনি একটুকু সতর হয়ে থাকেন মাশায়।

শিবনাথ মুখ তুলিয়া দেখিল, চাকরটা কখন চলিয়া গিয়াছে, ডোমবউ তাহাকে ওই কথা বলিয়া সতর্ক করিয়া দিতেছে। তাহার চোখে মুখে অপরিসীম উদ্বেগের কাতরতা। সে বাহির হইয়া গেলে শিবনাথ সেই চিঠিখানা বাহির করিয়া বসিল।

তিনি লিখিয়াছেন, কলেজের মেস ছাড়িয়া তুমি অন্য মেসে কেন গেলে, তাহার কারণ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। তুমি যে কারণ লিখিয়াছ, তাহাতে আমাদের তৃপ্তি হইল না। তোমার সমস্ত চিঠিখানাই যেন কেমন আমাদের ভাল লাগিল না, মন শান্ত হইল না, তোমার জন্য চিন্তা আমাদের বাড়িয়া গেল। তোমার চিন্তায় আমার রাত্রে ঘুম হয় না। আকাশ-পাতাল ভাবনা হয়। তোমার মা কয়দিনই দুঃস্বপ্ন দেখিতেছেন, তোমার সর্বাঙ্গ যেন রক্তমাখা, ঘরের মেঝে রক্তে ভাসিয়া গিয়াছে।

শিবনাথ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। তাহার জীবনের ভাবী রূপ, তাহারই অন্তরের কল্পলোকে যাহা লুকাইয়া আছে, তাহারই প্রতিবিম্ব এই দীর্ঘ দূরত্ব অতিক্রম করিয়া মায়ের মনোদর্পণে প্রতিফলিত হইল কেমন করিয়া? চিন্তা করিতে করিতে তাহার মনে হইল, তাহার মায়ের অন্তরাত্মার দৃষ্টি ঊর্ধ্বতমলোকে অবস্থিত, পৃথিবীর সহিত সমগতিতে চলমান যুগল জ্যোতিষ্কের মত তাহারই মাথার উপর অহরহ যেন জাগিয়া আছে। সে জ্যোতিষ্কের রশ্মিদৃষ্টি জড়বস্তুর সকল আবরণ—ইট কাঠ পাহাড় বন সমস্ত কিছুর অন্তর ভেদ করিয়া তাহার প্রতিটি কর্মের উপর প্রসারিত হইয়া আছে। চোখ তাহার জলে ভরিয়া উঠিল। মনে মনে বার বার মাকে প্রণাম করিয়া বলিল, তোমার সন্তানগর্ব ক্ষুণ্ণ আমি করি নি মা। সে কাজ আমি কোন দিন করব না, করব না। চোখ বুজিয়া মনে মনে সে তাহার মাকে পিসীমাকে কল্পনা করিবার চেষ্টা করিল। পিসীমা যেন চিন্তায় বাক্যহীন স্পন্দনহীন মাটির পুতুলের মত উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া বসিয়া আছেন। আর তাহার মা আপন চিন্তা উদ্বেগ সমস্ত অন্তরে চাপিয়া রাখিয়া বহ্নিগর্ভা ধরিত্রীর শ্যামলস্নিগ্ধ বাহ্য রূপের মত একটি স্নিগ্ধ হাসি মুখে মাখিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিতেছেন। দুরন্ত কলিক-ব্যথায় শয্যাশায়িনী হইয়াও তাঁহার মুখে যন্ত্রণাকাতর একটি শব্দ কখনও বাহির হয় না, মুখের হাসি নিঃশেষে মিলাইয়া যায় না। বিছানায় রোগশায়িনী মায়ের নীরব স্থির রূপ তাহার চোখের উপর ভাসিয়া উঠিল।

সে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিত, বড় যন্ত্রণা হচ্ছে মা? ডাকব ডাক্তারকে?

অতি মৃদুস্বরে মা উত্তর দিতেন, না, এই তো মন্নফিয়া মিক্সচার খেলাম। তুই আমার কাছে আয় বরং—খুব কাছে।

অকস্মাৎ ভাবাবেগের আতিশয্যে সে আকুল হইয়া উঠিল, তাহার কল্পনার পটভূমির উপর পৃথিবীর কোন ছবি আর দেখা যায় না; শুধু রোগশায়িনী মায়ের স্তব্ধ স্থির দেহখানি অন্ধকারের বুকে নিশ্চল আলোকের একটি শীর্ণ রেখার মত মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া আছে।

সমস্ত সকালটা অস্থির হৃদয়ে বিছানায় পড়িয়া থাকিয়া অবশেষে সে স্থির করিল, আজ রাত্রেই অথবা কাল সকালেই সে একবার বাড়ি যাইবে। কিন্তু পরক্ষণেই মন তাহার হতাশায় ভাঙিয়া পড়িল। সে হইবার নয়, তাহার বাক্সের অভ্যন্তরস্থিত বস্তুগুলির কথা মনে পড়িয়া গেল, নীচে স্পাইটাকে মনে পড়িল, মেসের চাকরটাকে মনে পড়িল। ডোমেদের বধূটির কথা তাহার কানের কাছে এখনও যেন ধ্বনিত হইতেছে, "এখানকার ওই যে চাকরটি, উ সুদ্ধু ওই নোকটির সঙ্গে ফিসফাস করে।" তাহার অগোচরে যদি দ্বিপ্রহরে জনহীন বাড়িতে তালা খুলিয়া সন্ধান করিয়া দেখে! হতাশার অবসাদে সে যেন শ্রান্ত-ক্লান্তের মত বিছানায় শুইয়া পড়িল।

প্রায়-জনহীন বাড়ি, মেসের অধিবাসীরা যে যাহার কাজে বাহির হইয়া গিয়াছে; রান্না-বান্না খাওয়া-দাওয়ার পর চাকর বামুন সকলেই এ সময় ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। সম্মুখের পথটাও এখন জনবিরল; মাত্র দুই-চারিটা লোকের আনাগোনা; স্পাইটাও এ সময় গাছতলায় বসিয়া বসিয়া ঢুলিতে থাকে। মধ্যে মধ্যে দুই-চারিটা ফেরিওয়ালার ডাক আর দুই-একটা ভিক্ষুকের অভিনব ভঙ্গিতে ভিক্ষা-প্রার্থনার বিকট আর্তনাদ শোনা যাইতেছে।

বাহিরের দুয়ারে মৃদু কড়া নাড়িয়া কে ডাকিল, শিবনাথবাবু!

মুহূর্তে শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়া শিবনাথ দরজা খুলিয়া বলিল, পূর্ণবাবু!

নীরবে ঘরে প্রবেশ করিয়া পূর্ণ দরজা বন্ধ করিয়া বলিল, আমার সঙ্গে আপনাকে কলকাতার বাইরে যেতে হবে—আজ রাত্রেই।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে শিবনাথ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। পূর্ণ বলিল, আমাদের একজন নেতা এই দারুণ প্রয়োজনের সময়ে আমাদের পরিত্যাগ করতে চাচ্ছেন। অসামান্য ব্যক্তি, সমস্ত জীবনই এই সাধনায় সন্ন্যাসীর মত ব্রতপালন করে এসেছেন। কলকাতার বাইরে একটা আশ্রম করে কর্মী তৈরী করেছেন। অনেক অস্ত্র ও অর্থ তাঁর কাছে গচ্ছিত আছে। কিন্তু কি জানি কেন, তিনি হঠাৎ এখন সমস্ত দলের মতকে উপেক্ষা করে এ মতের বিরোধী হয়ে উঠেছেন। তাঁর কাছে যেতে হবে।

শিবনাথ বলিল, যাব।

পূর্ণের অকম্পিত কণ্ঠ, ধীর মৃদু স্বরের দৃঢ়তা, চোখের দীপ্তি তাহার অন্তরে-বাহিরে ছোঁয়াচ বুলাইয়া দিল। সারা সকালের হৃদয়ের অস্থিরতা মুহূর্তে যেন বিলুপ্ত হইয়া গেল।

পূর্ণ বলিল, আজ রাত্রেই সাড়ে দশটায় হাওড়ার দশ নম্বর প্ল্যাটফর্মে দেখা হবে। টিকিট অন্য লোকে করে রাখবে।

শিবনাথ বলিল, কিন্তু আর্ম্‌সগুলো যে এখানে থাকছে, তার কি হবে? এখানকার চাকরটা মনে হচ্ছে স্পাই।

সচকিতের মত পূর্ণ বলিল, তাই তো; ওগুলো যে সরিয়ে ফেলতে হবে। সে আপনি না গেলেও হবে। সমস্ত কলকাতাব্যাপী সার্চ হবে—যে কোন দিন, হয়তো কালই। পুলিস তৈরি হচ্ছে।

শিবনাথ বলিল, কিন্তু বের করে নিয়ে যাব কেমন করে? এখানকার চাকরটা স্পাই। বাইরেও স্পাই অহরহ বসে রয়েছে।

পূর্ণ কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল, আপনি ভেবে দেখুন, আমিও ভেবে দেখব; সন্ধ্যের সময় খবর পাবেন। আমি চলি এখন, বেলা পড়ে আসছে, রাস্তায় লোক বাড়বে।

সে সন্তর্পণে বাহির হইয়া চলিয়া গেল। শিবনাথ মনে মনে সমস্ত বাড়িটায় সন্ধান করিয়া ফিরিতেছিল একটি নিরাপদ গুপ্ত স্থান। নাঃ, কোন স্থান নাই। বাহির করিয়া লইয়া যাইবারও কোন উপায় নাই। স্পাইটা সতর্ক দৃষ্টি মেলিয়া বসিয়া আছে, কিছুদূরে চারিজন পুলিস, আর একজন সার্জেণ্ট; এক উপায়, সশস্ত্র হইয়া ওই ব্যূহ ভেদ করিয়া যাওয়া।

কে?

সন্তর্পণে কে দরজা খুলিতেছিল। শিবনাথ চকিত হইয়া প্রশ্ন করিল, কে?

ক্ষিপ্র ভঙ্গিতে ঘরে প্রবেশ করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল ডোমবধূ। পর-মুহূর্তেই সে শিবনাথের পা দুইটি জড়াইয়া ধরিয়া অতি কাতর মৃদুস্বরে বলিল, তোমার পায়ে পড়ি বাবু, জামাইবাবু, ওসব তুমি কোরো না।

শিবনাথের বুকখানা গুরগুর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। সে কম্পিত কণ্ঠেই প্রশ্ন করিল, কি?

আমি শুনেছি মাশায়। আমাকে বলেছে, ওই চাকরটা বলেছে, বাবুর তোর কি হয় দেখ্‌! তোমার কাছে নাকি বোমা-পিস্তল আছে। তোমাকে নাকি জেলে দিবে, ফাঁসি দিবে।

শিবনাথ নীরব নিথর হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার মনের মধ্যে রুদ্ধ রোষ গর্জিয়া গর্জিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল। হতভাগ্য গুপ্তচরটাকে শেষ করিয়া দিলে কি হয়?

তোমার পায়ে পড়ি বাবু। তোমার কাছে কি আছে আমাকে দাও, আমি ময়লা ঢেকে বালতিতে পুরে নিয়ে যাই। এই সময়ে চাকরটা ঘুমাইছে, দাও মাশায়, দাও।

আশায় আনন্দে, একটা অপূর্ব বিস্ময়ে শিবনাথ মুহূর্তের মধ্যে যেন কেমন হইয়া গেল। নিষ্পলক বিচিত্র দৃষ্টিতে সে ওই নীচজাতীয়া অস্পৃশ্য-বৃত্তিধারিণী মেয়েটির দিকে চাহিয়া রহিল। ডোমবউ কাঁদিতেছে, ঊর্ধ্বমুখে তাহারই মুখের দিকে কাতর মিনতিভরা দৃষ্টিতে চাহিয়া কাঁদিতেছে। শিবনাথের চোখও জলে ভরিয়া উঠিল।

মেয়েটি আবার কাতরস্বরে বলিয়া উঠিল, দেরি করেন না জামাইবাবু, উঠে পড়বে সেই মুখপোড়া।

শিবনাথ এবার চেতনা লাভ করিয়া অবহিত হইয়া উঠিল; কিন্তু তবুও তাহার হাত-পা এখনও কাঁপিতেছে। কম্পিত হস্তে সে বাক্স খুলিয়া একে একে সর্বনাশা বস্তুগুলি ডোমবউয়ের আবর্জনা-ফেলা বালতিতে ভরিয়া দিল। মেয়েটি এক রাশ আবর্জনা তাহার উপর সযত্নে চাপাইয়া দিয়া ত্রস্তপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

শিবনাথ মৃদুস্বরে ডাকিয়া বলিল, সাবধান, বেশি ধাক্কা-টাক্কা লাগে না যেন, ফেটে গেলে খুন হয়ে যাবে তুমি।

মেয়েটির যেন পুলকের সীমা নাই। সে বলিয়া উঠিল, আপুনি পরানটা রেখে-ছিলেন, না হয় আপনারই লেগে যাবে।

শিবনাথ আবার বলিল, আমার নাম করে লোক যাবে, তাকেই দিয়ে দিও, বুঝলে?

সে বলিল, না। গৌরীদিদির নাম করে পাঠায়ো; তোমার নাম করে তো এরা পাঠাতে পারে গো।—বলিতে বলিতে সে হেলিয়া দুলিয়া যেন রঙ্গ করিতে করিতে চলিয়া গেল। শিবনাথের চোখের সম্মুখে সমস্ত পৃথিবীতে যেন সোনার রঙ ধরিয়া গিয়াছে। এত সুন্দর পৃথিবী!

সে বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। সম্মুখেই ওদিকে ফুটপাথের উপর সেই স্পাইটার সহিত ততক্ষণে ডোমবউ রঙ্গ জুড়িয়া দিয়াছে। হাসিয়া ঢলিয়া পড়িতে পড়িতে মেয়েটা তাহার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটি লোকটার নাকের সম্মুখে বার বার নাড়িয়া দিয়া ত্বরিত গমনে অপূর্ব এক লীলার হিল্লোল তুলিয়া চলিয়া গেল।

লোকটা একটা আবেশের মোহে হাসির আকারে আকর্ণ দন্তবিস্তার করিয়া তাহারই গমনপথের দিকে চাহিয়া রহিল।

শিবনাথও হাসিতেছিল। অকস্মাৎ তাহার হাসি স্তব্ধ হইয়া গেল, অকারণেই মনে পড়িয়া গেল গৌরীকে।

বাইশ

গন্তব্য স্থানে তাহারা গিয়া পৌছিল পরদিন সন্ধ্যায়। সাঁওতাল পরগনার নিবিড় অভ্যন্তরে সন্ন্যাসীর আশ্রমরূপেই আশ্রমটি সাধারণের নিকট পরিচিত ছিল। রেলওয়ে স্টেশন হইতে পঁচিশ মাইল পাহাড় ও জঙ্গলের মধ্য দিয়া দুর্গম পথ। সমস্ত পথটা হাঁটিয়া আসিয়া শরীর তখন দুইজনেরই অবসাদে যেন ভাঙিয়া পড়িতেছিল। কিন্তু আশ্রমে প্রবেশ করিয়া শিবনাথ এই দারুণ অবসন্নতার মধ্যেও বিস্ময়ে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। সাঁওতাল পরগনার কঙ্করময় কর্কশ লাল মাটির বুকে একি অপূর্ব শস্যশ্রীর সমারোহ! বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ড—দুই শত বিঘারও অধিক জমির চারিদিকে মাটির পগারের উপর বেড়াগাছ দিয়া ঘেরা, তাহারই মধ্যে নানা শস্যের ক্ষেত, মধ্যে মধ্যে জলসেচনের জন্য কুয়া, কুয়ার মাথায় টঁ্যাড়ার বাঁশগুলি উর্ধ্বমুখে দাঁড়াইয়া আছে। আশ্রমের প্রবেশ-দ্বার হইতে একটি প্রশস্ত পথ চলিয়া গিয়াছে। পথের পাশে ছোট ছোট মাটির ঘর—দাতব্য ঔষধালয়, নৈশবিদ্যালয়, সাধারণ বিদ্যালয়, তাঁতশালা, শস্যের গোলা সেদিনের শারদ-জ্যোৎস্নার পরিস্ফুট স্নিগ্ধ প্রভায় অপরূপ শ্রীমণ্ডিত হইয়া শিবনাথের চোখ দুইটি জুড়াইয়া দিল।

এতবড় আশ্রম, চারিদিকে এত কর্মের চিহ্ন; কিন্তু জনমানবের অস্তিত্ব কোথাও অনুভূত হয় না, স্থানটা অস্বাভাবিকরূপে নীরব। আগন্তুক দুইজন নীরবে চলিয়াছিল, সে নীরবতা প্রথম ভঙ্গ করিল পূর্ণ; বলিল, সমস্ত কর্মী এই মতবিরোধের জন্যে আশ্রম ছেড়ে চলে গেছে। পঞ্চাশটি ছেলে অহরহ এখানে থাকত, তাদেরই প্রাণপণ পরিশ্রমে, অক্লান্ত কর্মে এই জিনিসটি গড়ে উঠেছে।

শিবনাথ বলিল, যাঁর কাছে আমরা এসেছি, তিনি কোথায় থাকেন?

অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া পূর্ণ বলিল, ওই গাছগুলির ভেতরে ছোট একখানি ঘর আছে, ওই যে গাছের ফাঁক দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে।

শিবনাথ দেখিল, দূরে শুভ্র জ্যোৎস্নার মধ্যে পুঞ্জীভূত স্থির অন্ধকারের মত কতকগুলি গাছের পাতার ফাঁকে প্রদীপ্ত রক্তাভ দীর্ঘ ক্ষীণ রেখার মত আলোকের চিহ্ন দেখা যাইতেছে। তাহার বুকের মধ্যে কেমন একটা অনুভূতি জাগিয়া উঠিল, এতবড় যাহার রচনা, বাংলার বিপ্লবীদের একটা বিশিষ্ট অংশ যাহাকে নেতার আসনে বসাইতে চায়, কেমন সে? মনে মনে সে কল্পনা করিল এক বিরাট পুরুষের।

ঘন বৃক্ষসমাবেশের মধ্যে প্রবেশ করিয়া পাওয়া গেল ছোট একখানি ঘর। ঘরের

ভিতরে আলো জ্বলিতেছে, খোলা জানালা দিয়া সে আলোর ধারা গাছগুলির উপর গিয়া পড়িয়াছে। ঘরের দুয়ার ভিতর হইতে বন্ধ। পূর্ণ দরজার উপর আঙুল দিয়া আঘাত করিয়া জানাইয়া দিল, বাহিরে আগন্তুক প্রতীক্ষায় রহিয়াছে।

ঘরের দরজা খুলিয়া দিয়া একটি অত্যন্ত সাধারণ আকৃতির মানুষ প্রসন্ন হৃষ্টকণ্ঠে সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন, এস। অনুমান করেছিলাম, তোমরা আসবে, মন যেন বলে দিলে। চায়ের জলও চড়িয়ে রেখেছি, তোমরা মুখ-হাত ধুয়ে ফেল দেখি। চা খেয়ে বরং আবার একবার জল গরম করে দোব, পঁচিশ মাইল হেঁটেছ, ফুটবাথে সত্যিই উপকার হবে।

পূর্ণ দৃঢ়স্বরে বলিল, সকলের আগে কাজটা সেরে নিতে চাই দাদা। কথা আগে শেষ হোক।

হাসিয়া তিনি বলিলেন, ভয় কি রে, চায়ের মধ্যে থাকবে দুধ আর মিষ্টি ; লবণাক্ত কিছু খেতে দোব না তোদের। আর তাই যদিই দিই, তাতেই বা তোদের আপত্তি কি ? লবণের এমন গুণের কথা তো তোদের রসায়নশাস্ত্রে নেই, যাতে মানুষকে আক্রোশ সত্ত্বেও কৃতজ্ঞ করে তোলে।—বলিয়া তিনি জ্বলন্ত স্টোভের উপর হইতে গরম জলের পাত্রটা নামাইয়া ফেলিলেন। পাত্রে চা দিতে দিতে পুনরায় বলিলেন, বাইরে দেখ্, জল গামছা সব রয়েছে। লক্ষ্মী ভাই, হাত-মুখ ধুয়ে ফেল্ তোরা। তোমার নামটি কি ভাই ?

শিবনাথ সশ্রদ্ধ অন্তরে সম্ভ্রমপূর্ণ কণ্ঠে উত্তর দিল, শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাঃ, চমৎকার নাম, মঙ্গলের দেবতা।

মুখ হাত ধুইয়া চায়ের কাপ হাতে লইয়া পূর্ণ বলিল, কিন্তু আপনার এ কি পরিবর্তন দাদা ?

দাদা একটু হাসিলেন ; বলিলেন, বলছি। আগে তোদের জন্যে দুটো ভাতে-ভাত চড়িয়ে দিই, দাঁড়া।

পূর্ণ প্রবল আপত্তি জানাইয়া বলিল, না দাদা, সে হয় না, আজই রাত্রে আমরা ফিরতে চাই। মুহূর্তের মূল্য এখন অনেক।

জানি রে জানি। কিন্তু এটাও তো জানিস, সুজাতার পায়সান্ন গ্রহণের বিলম্বে গৌতমের বুদ্ধত্ব অর্জনে বাধা হয় নি, সহায়ই হয়েছিল। ভারতের স্বাধীনতা যে জীবনের মূল্যে অর্জন করতে চাস, সে জীবনেরও তো একটা মূল্য আছে।

আহারান্তে আলোচনা হইতেছিল।

দাদা বলিলেন, অনেক চিন্তা করে আমি দেখেছি পূর্ণ, আমি বুঝেছি, এ পথ ভুল।

পূর্ণ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল, ভুল ? ইতিহাসকে আপনি অস্বীকার করতে চান ? রাজনীতির নির্দেশ আপনি মানতে চান না ?

ইতিহাসকে আমি অস্বীকার করি না ভাই, কিন্তু বৈদেশিক ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি এ দেশে হবে একই রূপে একই ভঙ্গিতে—এও স্বীকার করতে চাই না। আর রাজনীতি ? পাশ্চাত্ত্য রাজনীতি সত্যিই আমি মানতে চাই না ভাই।

কারণ ?

কারণ মন্দিরের মধ্যে মিল ফিট করা যায় না ভাই। আর মিলের ওপরেও মন্দিরের কলস বসানো যায় না।

পূর্ণ বিরক্ত হইয়া বলিল, ও ধারার হেঁয়ালির কথা বলবেন না দাদা, পরিষ্কার সাদা কথায় আমায় যা বলবেন বলুন।

হাসিয়া তিনি বলিলেন, ভাল, তাই বলছি। আমার প্রথম কথা শোন্। আমার ধারণা, ইংরেজ তাড়ানোর নামই স্বাধীনতা নয়। বৈদেশিক শাসন উচ্ছেদ করে সাম্প্রদায়িক শাসন প্রবর্তনের নাম—রাজ্য নিয়ে কাড়াকাড়ি। দেশের সত্যিকার স্বাধীনতা ও থেকে সম্পূর্ণ পৃথক বস্তু।

এ আমাদের মিশনের ওপর কটাক্ষপাত করছেন আপনি।

না, তোদের কি ভুল বুঝতে পারি রে ? এ মিশন যে কত বড় পবিত্র নিঃস্বার্থ, সে কি আমি জানি না ? ধর্ম নেই, অধর্ম নেই, প্রবৃত্তি নেই, নিবৃত্তি নেই, দেশমাতৃকা তোদের হৃষিকেশ—আদি জননী, তোদের আমি চিনি না ?

তবে আপনি এ কথা বলছেন কেন ?

ভাল। একটা কথার আমার উত্তর দে। দেশ স্বাধীন হলে শাসনতন্ত্র পরিচালনা করবে কে ? উত্তেজিত হোস নি ভাই, ভেবে দেখ্। পরিচালনা করবে এই ভদ্রসম্প্রদায়, এই শিক্ষিত সম্প্রদায়, দেশের উচ্চবর্ণ যারা তারাই, দেশের ধনী যারা তারাই। কিন্তু সে তো স্বাধীনতা নয়। স্বাধীনতা বলতে আমি কি বুঝি জানিস ?—এস্ট্যাব্লিশ্‌মেণ্ট অব এ গবর্মেণ্ট অব দি পিপ্‌ল বাই দি পিপ্‌ল, নট ফর দি সেক অফ দি পিপ্‌ল। অনুগ্রহ নয়, দান নয়, তেত্রিশ কোটির দাবির বস্তু গ্রহণ করতে ছেষট্টি কোটি হাত আপনা হতে এগিয়ে আসা চাই।

পূর্ণ নিষ্পলক স্থির দৃষ্টিতে মাটির দিকে চাহিয়া রহিল, শিবনাথ প্রদীপ্ত নেত্রে তৃষ্ণার্তের মত চাহিয়া ছিল বক্তার দিকে। তিনি আবার বলিলেন, ভারতবর্ষের আদিম জাতি সাঁওতাল এ অঞ্চলের চারিদিকে। ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত আমি ঘুরে এসেছি। দেখলাম, ব্রাহ্মণ্যধর্মের জন্মভূমি আর্যসভ্যতার গৌরবময়ী ভারতের বুকে শুধু শূদ্র—শূদ্র আর শূদ্র, অনার্য আর অনার্য। হাজার হাজার বছরের পরও এই

অবস্থা। এরই জন্যে বার বার—বার বার ভারতবর্ষ পরাজিত হয়েছে বিদেশীর হাতে। এই অবস্থা নিয়ে স্বাধীনতার অভিযানে অগ্রসর হওয়ার নাম উন্মত্ততা ছাড়া আর কিছু নয়।

পূর্ণ এবার বলিল, কিন্তু রাজনৈতিক জটিলতার এ সুযোগ ছাড়লে কি আর আসবে মনে করেন?

হয়তো আসবে না। কিন্তু তেত্রিশ কোটি লোকের দাবি ঠেকিয়ে রাখতে পারে, এমন শক্তিও কারও কোন কালে হবে না পূর্ণ। তা ছাড়া বৈদেশিক রাজনীতির ফল এই অ্যানার্কিজ্‌ম অনুসরণ করাও আমার মতবিরুদ্ধ ভাই। এ পথ ভুল।

তার অর্থ?

অর্থ? সে বলবার পূর্বে আমি একটি প্রশ্ন করব তোমাকে। স্বাধীনতার প্রয়োজন কেন বলতে পার? ভাবাবেগে বোলো না যেন, স্বাধীনতার জন্যেই স্বাধীনতার প্রয়োজন।

দেশের এই দুরবস্থা দেখেও আপনি সেই প্রশ্নের উত্তর চান?

অর্থাৎ দেশে অন্নবস্ত্রের প্রাচুর্য ও সম্পদ-বৈভবের জন্য স্বাধীনতার প্রয়োজন।

নিশ্চয়, কৃষিশিল্পে সম্পদে শিক্ষায় দেশের চরম উন্নতি—

কিন্তু আমি আর একটু বেশি চাই। চরম উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে চাই পরম উন্নতি। আমার সভ্যতা, আমার জাতীয় ভাবধারা অনুমোদিত পন্থায় পরমপ্রাপ্তির সাধনার অবকাশ, সুযোগ, অধিকার। আমার ওপর বিদেশী রাজশক্তির চাপিয়ে-দেওয়া বিদেশী জীবনদর্শনকে আমি অস্বীকার করতে চাই। আমার জীবনের সাধনায় অপরের নির্দেশ আমি মানতে চাই না। পূর্ণ, আজ বৈদেশিক শাসনের ফলে, তাদের জীবনদর্শনের চাপে চরম বস্তু পরমকে ভুলিয়ে দিলে। আমি স্বাধীনতা চাই সেই জন্যে; আর সেই জন্যেই বিদেশীর নির্দিষ্ট অ্যানার্কিজ্‌ম, কি টেররিজ্‌ম আমি গ্রহণ করতে পারি না।

পূর্ণ অদ্ভুত হাসি হাসিয়া বলিল, তার বদলে কোন্ পথ অবলম্বন করা উচিত? তপস্যা অথবা যজ্ঞ?

তা ঠিক জানি না। এখনও ভেবে ঠিক করতে পারি নি। তবে সেটা ওই গুপ্তহত্যা আর গুপ্তষড়যন্ত্রের পথ নয় পূর্ণ, এটা ঠিক। বাস্তবতার দিক দিয়েও ঠিক নয়, আমাদের দেশের বৈশিষ্ট্য, সভ্যতা এবং শাস্ত্রও এটা অনুমোদন করে না। হাসিস নি পূর্ণ, একদিন আমিও এমন কথা শুনে হাসতাম। কিন্তু এ হাসির কথা নয়। পরশুরামের মত বীর্যবান, মাতৃহত্যার পাপও তার স্খালন হয়েছিল, কিন্তু ব্রাহ্মণ হয়ে কুঠার স্পর্শের অপরাধ কোনও পুণ্যেই ক্ষয় হয় নি, তার জীবনের ঊর্ধ্বগতির পথ চিরদিনের মত রুদ্ধ হয়ে গেল।

পূর্ণ বলিল, তর্ক করে লাভ নেই দাদা; আপনাকে আমি জানি, তর্কে আপনাকে

আমি পারবও না। কিন্তু একটা কথা বলি, এই আগুন যাঁরা জ্বেলেছেন, তার মধ্যে আপনিও একজন প্রধান। আগুন যখন জ্বেলেছিলেন, তখন যদি সঙ্গে সঙ্গে মেঘের তপস্যাও করে রাখতেন, তা হলে আজ এ কথা বলায় লাভ ছিল।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া দাদা বলিলেন, জানি। সে ভুলের মাশুলও আমাকে দিতে হবে, সেও আমি জানি।

অকস্মাৎ পূর্ণ ব্যগ্রতাভরে মিনতি করিয়া বলিল, আপনি হতাশ হবেন না দাদা, একবার সেই উৎসাহ নিয়ে দাঁড়ান, দেখবেন, অসম্ভব সম্ভব হয়ে উঠবে। আমরা আমাদের কর্মধারা টেররিজ্‌ম-অ্যানার্কিজ্‌মের মধ্যে আবদ্ধ রাখি নি। আমরা করব সশস্ত্র বিপ্লব। লাহোর থেকে রেঙ্গুন পর্যন্ত ক্যাণ্টন্‌মেণ্টে ক্যাণ্টন্‌মেণ্টে আমাদের কর্মী ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওদিকে জার্মানিতে আমাদের কর্মী যাচ্ছে, সেখান থেকে আমরা অর্থ পাব, অস্ত্র পাব। একদিন এক মুহূর্তে ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিপ্লবের আগুন জ্বলে উঠবে।

অত্যন্ত ধীরভাবে বারকয়েক ঘাড় নাড়িয়া অস্বীকার করিয়া দাদা বলিলেন, না পূর্ণ, বাস্তবতার দিক দিয়েও এ অসম্ভব, আর আমার ধর্মমতের দিক থেকেও এ মত এবং পথ গ্রহণীয় নয়; সে হয় না।

গম্ভীরভাবে পূর্ণ এবার বলিল, ভাল কথা, আমাদের গচ্ছিত অর্থ আর আর্মস—এগুলো আমাদের দিয়ে দিন।

স্থিরদৃষ্টিতে পূর্ণের মুখের দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন, একটু অপেক্ষা কর্, তোর কথার উত্তর দিচ্ছি।—বলিয়া দুইখানা কাগজ টানিয়া লইয়া খসখস করিয়া কি লিখিয়া আপনার বিছানার বালিশের তলায় রাখিয়া দিয়া বলিলেন, ওটা থাকল, যাবার সময় দেখে যাস।

পূর্ণ বলিল, রাত্রি অনেক হয়ে গেল দাদা, আমার কথার উত্তর দিন।

উত্তর?

হ্যাঁ।

কি উত্তর দোব রে পূর্ণ? যে মত যে পথ যে কর্ম আমি সমর্থন করি না, যাতে দেখছি নিশ্চিত সর্বনাশ, সে পথে সে কর্মে তোদের যেতেও তো আমি সাহায্য করতে পারি না ভাই।

পূর্ণের চোখে যেন আগুন জ্বলিয়া উঠিল। সে বলিল, সে সাহায্য তো আপনি করছেন না; আপনি বরং গচ্ছিত আর্মস এবং অর্থ দিয়ে ফেলে এ পথের সঙ্গে সংস্রবহীন হচ্ছেন। আর গচ্ছিত ধন 'দোব না' বলবার আপনার অধিকার?

সেগুলো আমি নষ্ট করে দিয়েছি পূর্ণ।

কি ?

আর্ম্‌সগুলো—সেগুলো আমি ভেঙে ফেলে দিয়েছি।

মুহূর্তে একটা বিপর্যয় ঘটিয়া গেল। পকেটের ভিতর হইতে সাপের ফণার মত ক্ষিপ্র ভঙ্গিতে পূর্ণের হাত পিস্তলসহ উদ্যত হইয়া উঠিল। পরক্ষণেই একটা উচ্চ কঠিন শব্দ ধ্বনিত হইল। তারপর বারুদের গন্ধে ধোঁয়ায় স্থানটা ভরিয়া উঠিল। শিবনাথের বিস্ফারিত চোখের সম্মুখে প্রাচীন বিপ্লবপন্থীর রক্তাক্ত দেহ সশব্দে মাটির উপর পড়িয়া গেল। একেবারে হৃৎপিণ্ড ভেদ করিয়া গুলিটা বোধ হয় ওপারে পৌঁছিয়া গিয়াছে।

পূর্ণ এতক্ষণে কঠিন আক্রোশের সহিত বলিল, ট্রেটার !

শিবনাথ বলিল, না না, এ কি করলেন ?

ঠিক করেছি। এমনই ধারার কতকগুলো লোকেই বাংলার বিপ্লবী দলের সর্বনাশ করেছে। টাকাটা আত্মসাৎ করার প্রলোভন সম্বরণ করতে পারেন নি।—কথাটা শেষ করিয়াই সে বালিশ উলটাইয়া সেই কাগজ দুইখানা টানিয়া বাহির করিল। পড়িতে পড়িতে পূর্ণের উত্তেজিত রক্তোচ্ছ্বাসপরিপূর্ণ মুখ কাগজের মত সাদা হইয়া গেল। তাহার হাত দুইটির সঙ্গে পত্র দুইখানাও থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল। পড়া শেষ করিয়া সে বিহ্বল দৃষ্টিতে শিবুর দিকে চাহিয়া চিঠি দুইখানা আগাইয়া দিল।

শিবু দেখিল, একখানাতে লেখা—আমার কৃতকর্মের জন্যই জীবন দুর্বহ হইয়া উঠিয়াছে। তাই আমি আত্মহত্যা করিতেছি।

আর একখানাতে লেখা—তোর চোখে যে আগুন দেখলাম পূর্ণ, তাতে আজই বোধ হয় ভুলের মাশুল আমাকে দিতে হবে। যদি সত্যিই হয়, আমি জানি দলের হুকুমে তোকে এ কাজ করতে হবে; আর এ নিয়ম যারা করেছিল তার মধ্যে আমিও একজন। তোর কোনও অপরাধ হবে না। তবে যাবার সময় অন্য চিঠিখানা বালিশের তলায় রেখে যাস, আর তোর পিস্তলটা আমার হাতের কাছে। তাতে তোরা নিরাপদ হতে পারবি। কিন্তু আমার শেষ অনুরোধ রইল ভাই, এ পথে আর অগ্রসর হোস নি।

শিবনাথ স্তম্ভিত হইয়া পূর্ণের দিকে চাহিল। তাহার হাতে তখনও পিস্তল উদ্যত হইয়াই আছে। মুহূর্তে শিবনাথ তাহার হাত হইতে সেটাকে ছিনাইয়া মৃতদেহের পায়ের কাছে ফেলিয়া দিল।

•

শেষ ভাদ্রের কৃষ্ণা দ্বিতীয়ার রাত্রি। প্রায় পূর্ণচন্দ্রের পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নায় শরতের নির্মল নীল আকাশ মর্মরের মত ঝলমল করিতেছে। মধ্যে শুভ্র ছায়াপথ একখানি

সুদীর্ঘ উত্তরীয়ের মত এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। জ্যোৎস্নার পরিপূর্ণতায় আকাশ নক্ষত্রবিরল। উত্তর দিগন্তে ধ্রুবতারাকে প্রদক্ষিণ করিয়া সপ্তর্ষিমণ্ডল পশ্চিমাভিমুখে চলিয়া পড়িয়াছে। চড়াই-উতরাই পার হইয়া জনহীন পথ, দুই পাশে ঘন বন। বনের মাথায় জ্যোৎস্না ঘুমাইয়া আছে, তাহারই ছায়ায় পথের উপর আলোছায়ার বিচিত্র আলপনা ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সে সৌন্দর্য দেখিবার মত অবস্থা তখন তাহাদের নয়। শিবনাথের মনের মধ্যে অদ্ভুত একটা আবেগের তরঙ্গ বহিয়া চলিয়াছে। মন যেন পঙ্গু মূক হইয়া গিয়াছে। মধ্যে মধ্যে এক-একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস শুধু ঝরিয়া পড়িতেছিল। পূর্ণ চলিয়াছে মাটির দিকে চোখ রাখিয়া। পথ চলিবার সতর্কতার জন্য নয়, আকাশের দিকে চাহিতে অকারণেই যেন একটা অনিচ্ছা জন্মিয়া গিয়াছে।

চলিতে চলিতে পূর্ণ শিবনাথকে হঠাৎ আকর্ষণ করিয়া বাধা দিল, বলিল, সাপ।

সাপ! শিবনাথ দেখিল, হাত বিশেক দূরে প্রকাণ্ড এক বিষধর দীর্ঘ ফণা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে, গর্জনের নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে। পূর্ণ মৃদুস্বরে বলিল, আপনার পিস্তলটা বের করুন, জলদি, তাড়া করলে বিপদ হবে।

পকেট হইতে পিস্তল বাহির করিয়া শিবনাথ পূর্ণের হাতে সমর্পণ করিল। পূর্ণ একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল, কহিল, আমাকেই দিচ্ছেন?

শিবনাথও একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল, কহিল, কি জানি, আত্মরক্ষার জন্যে ওই সাপটাকে মারতেও মনে আমি দৃঢ়তা পাচ্ছি না পূর্ণবাবু।

উদ্যত পিস্তলটা নামাইয়া পূর্ণ বলিল, চলুন, গাছের আড়াল দিয়ে একটু পাশ কাটিয়ে চলে যাই। নেহাত আক্রমণ করে, তখন যা হয় করা যাবে।

গাছের আড়াল দিয়া একটু পাশ কাটাইয়া যাইতেই সাপটা ফণা নামাইয়া পথের উপরেই আরাম করিয়া শুইয়া পড়িল। শিবনাথ বলিল, শরতের শিশির আর জ্যোৎস্না ওদের ভারি প্রিয়। এমনই করেই ওরা পড়ে থাকে এ সময়।

পূর্ণ উত্তরে বলিয়া উঠিল নিতান্ত অবান্তর কথা, বোধ করি স্তব্ধ নীরবতার মধ্যে বহুক্ষণ ধরিয়া এই কথাটাই তাহার মনের মধ্যে ঘুরিতেছিল; সে বলিল, কি করব, আমার ওপর এইই অর্ডার ছিল।

শিবনাথ শুধু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল, তাহাকে সমর্থনও করিল না, প্রতিবাদও করিল না। পূর্ণ আবার বলিল, সে কথা দাদা বুঝেছিলেন। ভুলের মাশুল দেবার কথাটা মনে আছে আপনার? আর চিঠি দুখানাই তো তার প্রমাণ। আমায় অর্ডার দিলে কি জানেন, যদি টাকা আর আর্ম্‌স দেন, তা হলে কিছু করবার দরকার নেই, অন্যথায়—

আর সে বলিতে পারিল না, এতক্ষণ পরে সেই নির্জন বনপথের মধ্যে শিশুর মত ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। শিবনাথও কাঁদিতেছিল, কিন্তু সে কান্নায় উচ্ছ্বাস ছিল না, শুধু গাল বাহিয়া ধারায় ধারায় অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছিল।

বহুক্ষণ পর শান্ত হইয়া পূর্ণ বলিল, জানেন শিবনাথবাবু, বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছিলাম আমি এই আশ্রমে।

শিবনাথ কোন উত্তর দিল না, সে ভাবিতেছিল ওই মানুষটির কথা। দুই-তিন ঘণ্টার পরিচয়, তাহার সহিত মাত্র দুইটি কথা তিনি বলিয়াছিলেন, কিন্তু অক্ষয় আসন পাতিয়া রহিয়া গেলেন অন্তরের অন্তরে। কত বড় নির্ভীকতা! তাঁহার প্রতিটি কথা তাহার মনের মধ্যে অহরহ ধ্বনিত হইতেছে।

পূর্ণ আবার বলিল, এমন করে আমি আর কখনও কাঁদি নি শিবনাথবাবু। খ্যাতিই বলুন আর অখ্যাতিই বলুন, দলের মধ্যে আমারই নাকি সেন্টিমেণ্ট সকলের চেয়ে কম। তাই এই ভার পড়েছিল আমার ওপর। সুশীলের হুকুম—বেনারসে বসে বড় বড় নেতারা বিচার করে এই হুকুম পাঠিয়েছেন।

শিবনাথের কানে বোধ হয় কথাগুলি প্রবেশই করিল না, সে তন্ময় হইয়া ওই কথাগুলি ভাবিতে ভাবিতেই পথ চলিতেছিল। উত্তর না পাইয়া পূর্ণ তাহার হাত ধরিয়া বলিল, মনে খুবই আঘাত পেয়েছেন, না?

এবার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া শিবনাথ অতি করুণ হাসি হাসিয়া বলিল, আমার চেয়ে আপনি কি সে আঘাত বেশি পান নি পূর্ণবাবু?

পূর্ণ পিস্তলটা বাহির করিয়া শিবনাথের হাতে দিয়া বলিল, এটা আপনি রেখে দিন শিবনাথবাবু। আমার মন অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু আজ যেন ভূমিকম্পে পাথর ফেটে চৌচির হয়ে গেছে।

শিবনাথ চঞ্চল হইয়া ত্রস্তভাবে পিস্তলটা পূর্ণের হাত হইতে লইয়া আপনার পকেটে রাখিয়া দিল। বলিল, ভুল চিরকালই ভুল পূর্ণবাবু।

হাসিয়া পূর্ণ বলিল, কিন্তু দাদা কি বলেছিলেন, মনে আছে? ভুলের মাশুলও দিতে হয়। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া সে আবার বলিল, তখনই মাশুল দিয়ে ভুলের সংশোধন করতাম শিবনাথবাবু, কিন্তু আমার মিশন পাপ-পুণ্য সমস্ত কিছুর ঊর্ধ্বে, অ্যাবাভ এভ্‌রিথিং, আমাকে তারই জন্যে বেঁচে থাকতে হবে।

পিছনে পশ্চিম-দিগন্তে চাঁদ তখন অস্তাচলের সমীপবর্তী, বন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, শিবনাথের ঊর্ধ্বমুখী দৃষ্টিতে পড়িল, সম্মুখে পূর্বাকাশের ঈষৎ ঊর্ধ্বে শুকতারা দপদপ করিয়া জ্বলিতেছে। সে চঞ্চল হইয়া বলিল, রাত্রি যে শেষ হয়ে এল পূর্ণবাবু! পথ যে এখনও অনেক বাকি!

কটা বাজল, দেখুন তো ?

ঘড়ি তো নেই।

কি হল আপনার—? ও, জানি, সুশীল বলেছে আমাকে। কিন্তু চাঁদ তো এখনও অস্ত যায় নি।

হাসিয়া শিবনাথ বলিল, কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ অস্ত তো যাবে না, আকাশেই থাকবে, সূর্যের আলোয় ঢাকা পড়ে যাবে। ট্রেন তো নটায়। চলুন, একটু পা চালিয়ে চলুন।

কিন্তু চলিতে যেন পা চাহিতেছিল না। দীর্ঘ পথভ্রমণে পা দুইটা যেন ভাঙিয়া পড়িতেছে। কপালে দুই রগের শিরা দুইটা দপদপ করিয়া লাফাইতেছে। সহসা পথের পাশে গাছের পাশ হইতে কে বলিয়া উঠিল, কে রে ? কে বটিস তুরা ?

সচকিত হইয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহারা চাহিয়া দেখিল, ওই গাছের কাণ্ডের মত বিশাল কালো এক মূর্তি গাছের তলায় অন্ধকারে মিশিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

পূর্ণ প্রশ্ন করিল, তুমি কে ?

আমরা মাঝি গো—সাঁওতাল।

শিবনাথ বলিল, একটু জল দিতে পার মাঝি ?

কৃতার্থ হইয়া মাঝি বলিল, জল কেনে খাবি ? দুধ দুহে দিব, গরম দুধ খাবি।

পূর্ণ বলিল, আর একটু গরম জল। পা দুটো ধুয়ে ফেলব।

আয়, তাও দিব। কাছেই বাড়ি বেটে আমাদের। যাবি কুথা তুরা ?

রেল-স্টেশন। কত দূর বল তো ?

কতটো হবে! এই তুর এক কোশ দু কোশ কি তিন কোশ হবে। ইঃ বাবু, তুর মুখটি কি হয়ে গেইছে রে! কালো ভুঁসার পারা! আ-হা-হা-রে!

পূর্ব-দিগন্তে তখন আলোকের আমেজ ধরিয়াছে, ধূসর আলোক ক্রমশ রক্তাভ দীপ্তিতে মুহূর্তে মুহূর্তে উজ্জ্বলতর হইতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে। শিবনাথ পূর্ণের মুখের দিকে চাহিয়া শিহরিয়া উঠিল, এমন করিয়া কালি তাহার মুখে কে মাখাইয়া দিল!

পূর্ণ আপন মনেই বলিল, দাদার কথা মনে পড়ে গেল শিবনাথবাবু। ব্রাহ্মণ্যধর্মের জন্মভূমি আর্যসভ্যতার গৌরবময়ী ভারতবর্ষের বুকে শুধু শূদ্র—শূদ্র আর শূদ্র, অনার্য আর অনার্য। এরা সেই শূদ্র, অনার্য।

হাওড়ায় নামিবার পূর্বেই পূর্ণ বলিল, আপনি বরং সুশীলের বাড়ি চলে যান। সেখানে একবেলা বিশ্রাম করে সুস্থ হয়ে মেসে যাবেন। নইলে এমন চেহারা দেখে সকলেই সন্দেহ করে বসবে। আমি শ্রীরামপুরে নেমে পড়ব, কাল সকালে কলকাতায় যাব।

পকেটের মধ্যেই রুমালে মুড়িয়া পিস্তলটা সতর্কতার সহিত পূর্ণের পকেটে দিয়া শিবনাথ বলিল, এটা আপনি নিয়ে যান, আর একটা কথা—। বলিয়া সে নীরব হইল।

কিছুক্ষণ প্রতীক্ষা করিয়া পূর্ণ বলিল, বলুন।

সেই জিনিসগুলো আমার কাছে যা ছিল—

হ্যাঁ, বলুন।

সেগুলো আমাদের মেসের জমাদারনী—সেই ডোমবউ, তার কাছে গেলেই পাবেন। বলবেন, গৌরী পাঠিয়েছে। গৌরী নামটা ভুলবেন না।

দরকার কি এত মনে রাখবার! আপনি গিয়েই বরং নিয়ে আসবেন।

আমি বাড়ি চলে যাব পূর্ণবাবু।

আশ্চর্য হইয়া পূর্ণ বলিল, বাড়ি!

হ্যাঁ, আমার মন বড় অস্থির হয়ে পড়েছে।

পূর্ণ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, তা হলে তো আমার আত্মহত্যা ছাড়া উপায় থাকে না শিবনাথবাবু। এত সেন্টিমেণ্টাল হবেন না। সহসা সে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল, আপনি কি আমাদের সংস্রব কাটিয়ে ফেলতে চান শিবনাথবাবু?

শিবনাথ জানালার মধ্য দিয়া উদাস দৃষ্টিতে বাহিরের দিকে চাহিয়া বলিল, ঠিক বলতে পারি না। তবে বাড়ি যেতে চাই আমি অন্য কারণে, আমার মাকে বার বার মনে পড়ছে। তাঁরই জন্যে, কি জানি কেন, মন আমার বড় ব্যাকুল হয়ে উঠেছে, আপনি ট্রেনে ঘুমুচ্ছিলেন, কিন্তু আমি ঘুমোই নি, গাড়ির শব্দের মধ্যে যেন মায়ের ডাক শুনলাম, মনে হল, ট্রেনের সঙ্গে সমান গতিতে মা আমার ছুটে চলেছেন। আমি আজই বাড়ি চলে যাব।

গাড়ি আসিয়া একটা স্টেশনে থামিল। পূর্ণ সচকিত হইয়া বলিল, এ কি, শ্রীরামপুর যে এসে গেল! আমি চলছি, কিন্তু আজ যেন আপনি বাড়ি যাবেন না। এ বেলাটা সুশীলের বাড়িতে বিশ্রাম করে সন্ধ্যের পর বরং মেসে যাবেন।

হাওড়া ব্রিজ পার হইয়া খানিকটা আসিয়াই শিবনাথ একটা চায়ের দোকান পাইয়া দোকানটায় ঢুকিয়া পড়িল। ভিতরে প্রবেশ করিয়াই সে শিহরিয়া উঠিল। সামনের দেওয়ালে ঝুলানো আয়নাখানার মধ্যে এ কি তাহারই প্রতিবিম্ব! রুক্ষ ধূলিপিঙ্গল চুল, আরক্ত চোখ, চোখের কোলে কোলে কালো দাগ; সাঁওতাল পরগনার লাল ধূলায় আচ্ছন্ন পরিচ্ছদ; মুখাকৃতি শুষ্ক হইয়া যেন অস্বাভাবিকরূপে দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ণের কথাটা মনে পড়িয়া গেল। সত্যই এই বেশে এই মূর্তিতে মেসে যাওয়া তাহার উচিত নয়। সুশীলের বাড়ি যাওয়াই ভাল। তাহার আট বছরের প্রণয়িনী দীপা

মহা ব্যস্ত হইয়া উঠিবে, পরিচর্যার জন্য হাঁকডাক শুরু করিয়া দিবে। সঙ্গে সঙ্গে আর একজনকে মনে পড়িল—গৌরী, নান্তি। সে যদি সেখানেই যায়? নানা কল্পনা তাহার শুষ্ক মনকে অপূর্ব আনন্দে অভিষিক্ত করিয়া তুলিল। কিন্তু—না, সে উচিত নয়, উচিত নয়। সুশীলের বাড়িই সে যাইবে।

এমনই দ্বন্দ্বের মধ্যে দোকান হইতে নামিয়া পথ চলিতে চলিতে অকস্মাৎ সে দেখিল, সিমলা স্ট্রীটের একটা দরজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সে একটু সচকিত হইয়া উঠিল। এই তো রামকিঙ্করবাবুর বাসা! তাহার বুকখানা লজ্জায় দ্বিধায় আলোড়িত হইয়া উঠিল। সহসা সে একটা প্রচণ্ড চেষ্টা করিয়াই যেন বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়া ডাকিল, কমলেশ!

বাড়িখানার প্রতি ঘরেরই দ্বার রুদ্ধ, কাহাকেও দেখা যায় না। শিবনাথ বুঝিল, পুরুষেরা কর্মোপলক্ষ্যে বাহিরে গিয়াছেন, কমলেশও বোধ হয় কলেজে। তবুও সে আবার ডাকিল, কমলেশ!

এবার একটা ঘরের দরজা খুলিতে খুলিতে কে ব্যগ্রস্বরে বলিল, কে? শিবনাথ?

কণ্ঠস্বর শুনিয়া শিবনাথ চমকিয়া উঠিল, কে? কাহার কণ্ঠস্বর? পর-মুহূর্তেই বাহির হইয়া আসিলেন তাহার মাস্টার মহাশয় রামরতনবাবু। সে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া মাস্টার মহাশয়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

রামরতনবাবু কিন্তু তাহার এই মূর্তি এই রূপ দেখিয়া এতটুকু বিস্ময় প্রকাশ করিলেন না, সস্নেহে তাহার মাথার রুক্ষ চুলে হাত বুলাইয়া বলিলেন, বড্ড টায়ার্ড হয়েছিস রে। আমি খানিকটা খানিকটা শুনেছি, ডোমেদের মেয়েটি আমাকে সব বলেছে। কাল থেকে আমি এসে তোর জন্যে বসে আছি। মেসে খবর পেয়েই বুঝি ছুটে এসেছিস?

শিবু নির্বাক বিস্ময়ে পূর্বের মতই রামরতনবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। মাস্টার অভ্যাসমতই বলিলেন, ইডিয়ট সব। মানুষটা সুস্থ হলেই কথাটা বল্‌; আমি তো বিকেলে আসব, সে কথাও বলে এসেছিলাম।

সহসা উপরের জানালায় খুটখুট শব্দ শুনিয়া শিবনাথ দৃষ্টি তুলিয়া দেখিল, একটি মেয়ে। চিনিতেও পারিল, গৌরীরই মামাতো বোন।

রামরতন বলিলেন, তোকে আর বউমাকে নিয়ে যাবার জন্যে পিসীমা আমায় পাঠালেন। মায়ের বড় অসুখ রে।

মায়ের অসুখ! শিবনাথের বুকখানায় কে যেন হাতুড়ি দিয়া আঘাত করিল। মুহূর্তে তাহার মনে পড়িয়া গেল, সেদিনের কল্পনার ক্ষীণ আলোকশিখার মত রোগশয্যা-শায়িনী তাহার মায়ের ছবি, আজিকার ট্রেনের শব্দের মধ্যে মায়ের ডাক, ট্রেনের

জানালার কাচের ওপাশে ট্রেনের সঙ্গে সমগতিতে ধাবমান মায়ের মুখ। সে কম্পিতকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, কেমন আছেন মা ?

অসুখেই আছেন। এত বিচলিত হচ্ছিস কেন? বি স্ট্রং, মাই বয়, বি স্ট্রং, দুর্বলতা পুরুষের লক্ষণ নয়।

শিবনাথ এবার প্রশ্ন করিল, এঁরা কি বললেন ?

সঙ্গে সঙ্গেই তাহার চোখ আবার উপরের জানালার দিকে নিবদ্ধ হইল। এবার সে মেয়েটির পাশে আরও একজন ছিল, সে গৌরী।

মাস্টার বলিলেন, বউমার নাকি অসুখ, তিনি আর যেতে পারছেন কই !

শিবু সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া পা বাড়াইয়া বলিল, তা হলে এখানে অপেক্ষা করে লাভ কি সার? আসুন, সব গুছিয়ে-গাছিয়ে নিতে হবে, অনেক কাজ আছে।

তেইশ

জ্যোতির্ময়ী যেন শিবনাথের প্রতীক্ষাতেই জীবনটুকু দেহের মধ্যে ধরিয়া রাখিয়াছিলেন। বিলিয়ারি কলিকের দারুণ যন্ত্রণা উপশমের জন্য মরফিয়া ইন্‌জেকশন দেওয়া হইতেছিল। মর্‌ফিয়ার প্রভাবে আচ্ছন্নের মত তিনি পড়িয়া ছিলেন। মধ্যে মধ্যে শ্রান্ত চক্ষুপল্লব অতি কষ্টে ঈষৎ উন্মীলিত করিয়া চারিপাশ একবার দেখিয়া লইয়া বলিতেছিলেন, শিবু আসে নি?

তাঁহার শয্যাপার্শ্বে শৈলজা দেবী পাথরের মূর্তির মত বসিয়া ছিলেন। ভ্রাতৃজায়াকে যে তিনি এত ভালবাসিতেন, সে কথা তিনি এতদিনের মধ্যে আজ প্রথম উপলব্ধি করিলেন। তাঁহার মনে হইতেছিল, এই সংসারটিতে, শুধু এই সংসারটিতে কেন, সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে তাঁহার সকল দাবি-দাওয়ার মূল দলিলখানি যেন আজ নষ্ট হইতে বসিয়াছে। রোগে সেবা-শুশ্রূষা তিনি কোন কালেই করিতে পারেন না তবে বিপদ-আপদের দুর্যোগের মধ্যেও দৃঢ় মুষ্টিতে সংসার-তরণীর হালখানি ধরিয়া অটুট ধৈর্যের সহিত বসিয়া থাকিতে তিনি পারেন; কিন্তু আজ যেন সে শক্তিও তাঁহার নিঃশেষে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। জ্যোতির্ময়ীর সেবা করিতেছিল পাচিকা রতন আর নিত্য-ঝি। ডাক্তার দেখানোর ত্রুটি হয় নাই, শৈলজা দেবী সেখানে এতটুকু খেদ রাখেন নাই। শহর হইতে সাহেব ডাক্তার আসিয়া বলিয়া গিয়াছেন, এত মর্‌ফিয়া সহ্য করিবার মত শক্তি রোগিণীর নাই।

জ্যোতির্ময়ীর প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া শৈলজা দেবীর মন অসহনীয় উদ্বেগে পীড়িত হইয়া উঠিল। রামরতন আজ দুই দিন হইল শিবুকে আনিতে গিয়াছেন, তবু শিবু আজও আসিয়া পৌঁছিল না কেন? কোথায় এমন কোন্ জটিল জালের মধ্যে গিয়া জড়াইয়া পড়িল যে, মায়ের অসুখ শুনিয়াও সে আসিতে পারিল না? সঙ্গে সঙ্গে একটি লাবণ্যময়ী কিশোরীর মূর্তি মনের ছায়াপটে ভাসিয়া উঠিল, সে-ই যেন পথরোধ করিয়া শিবুর বক্ষোলীনা হইবার ভঙ্গিতে দাঁড়াইয়া আছে। এতক্ষণে নিস্পন্দ অসাড় মূর্তিতে স্পন্দন জাগিল, শ্বাসরোধী স্বপ্নের মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণায় বহুকষ্টে যেমন মানুষ জাগিয়া উঠে, তেমন ভাবেই শৈলজা দেবী এতক্ষণে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। আবার টেলিগ্রাম করিতে হইবে, অন্তত রামরতন ফিরিয়া আসুক। সুকঠিন প্রয়াসে ধৈর্য ও সংযম বজায় রাখিয়া তিনি স্বাভাবিক পদক্ষেপে নীচে নামিয়া আসিয়া ডাকিলেন, সতীশ!

নীচের তলাটা জনশূন্য, কেহ কোথাও নাই। এমন কি ২১৯ নম্বর তৌজির লগ্দী বেহারী বাগদী, যাহাকে অহরহ এ দুঃসময়ে ঘর-দুয়ার আগলাইবার ভার দেওয়া হইয়াছে, সে লোকটা পর্যন্ত নাই। তাঁহার ইচ্ছা হইল, চিৎকার করিয়া বাড়িখানার ইট-কাঠের নিরেট দেওয়ালগুলা পর্যন্ত চৌচির করিয়া ফাটাইয়া দেন। কিন্তু কিছু করিবার পূর্বেই সদর-দরজার রাস্তা-ঘরে একেবারে কয়েক জোড়া জুতার শব্দ বাজিয়া উঠিল। বিভিন্ন মানুষের পদশব্দের বিভিন্নতার মধ্যেও তাঁহার অন্তরের শব্দানুভূতি একাগ্র উন্মুখ হইয়া উঠিল। কে? কে? এ কাহার পদশব্দ? পরক্ষণেই তাঁহার সকল সন্দেহের নিরসন করিয়া অন্দরের উঠানে সর্বাগ্রে প্রবেশ করিল শিবু, তাহার পশ্চাতে রামরতনবাবু, সর্বশেষে রাখাল সিং।

দৈহিক কৃশতাহেতু শিবুকে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ বলিয়া মনে হইতেছিল, তৈলহীন রুক্ষ দীর্ঘ চুল, শুভ্র দীপ্ত চোখে ধারালো দৃষ্টি, সে যেন ভবিতব্যতার সকল কঠোরতার সম্মুখীন হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছে। বিচিত্র মানুষের প্রকৃতি, শৈলজা দেবীর মুহূর্ত-পূর্বের বজ্রগর্ভ অন্তর পর-মুহূর্তে বর্ষণোন্মুখ হইয়া উঠিল। তাঁহার ঠোঁট দুইটি কাঁপিয়া উঠিল, তিনি বহুকষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া বলিলেন, আসতে পারলি বাবা?

শিবু স্থির দৃষ্টিতে পিসীমার দিকে চাহিয়া শান্ত অথচ সকরুণ কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, পিসীমা, আমার মা?

ফোঁটা কয়েক অবাধ্য অশ্রু পিসীমার চোখ হইতে টপটপ করিয়া ঝরিয়া পড়িল, দীর্ঘনিশ্বাস ঝরিয়া পড়িল, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সিক্ত চক্ষু মুছিয়া শৈলজা দেবী বলিলেন, আয়, ওপরে আছে তোর মা।

লগ্দী বেহারী সেই মুহূর্তেই রঙিন শাড়ির ঘেরাটোপ-ঢাকা শিবনাথের বাক্সটা মাথায় করিয়া বাড়িতে আসিয়া প্রবেশ করিল। রামরতন বলিলেন, শিবু আজ দুদিন কিছু খায় নি, ওকে একটু শরবত খাওয়ান আগে।

পিসীমা সে কথার উত্তর দিলেন না, বাক্সটার উপরে রঙিন কাপড়ের ঘেরাটোপটার দিকে চাহিয়া তিনি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে মাস্টারকে বলিলেন, বউমা কই মাস্টার?

রামরতন বলিলেন, বউমার শরীর নাকি খুব খারাপ, তাই তিনি আসতে পারলেন না।

শিবু বলিল, ও-কথাটা তাঁদের অজুহাত পিসীমা; আসলে তাঁরা তাকে পাঠালেন না।

পাঠালেন না?

না।

দুর্জয় ক্রোধে শৈলজা দেবীর মুখখানি ভীষণ হইয়া উঠিল, কিন্তু সে ক্রোধ প্রকাশের

অবকাশ তাঁহার হইল না ; উপরের বারান্দা হইতে ঝুঁকিয়া নিত্য-ঝি বলিল, দাদাবাবুকে মা ডাকছেন, পিসীমা।

শিবু আর অপেক্ষা করিল না, সে দ্রুতপদে উপরে উঠিয়া গেল। শৈলজা দেবীও শিবুর অনুসরণ করিয়া উপরে আসিয়া ভ্রাতৃজায়ার মাথার শিয়রে বসিয়া বলিলেন, তোমার শিবু এসেছে ভাই বউ।

জ্যোতির্ময়ী অর্ধনিমীলিত চোখে অলস আচ্ছন্ন দৃষ্টিতে শিবুর মুখের দিকে চাহিয়াছিলেন, শিবু মায়ের কপালে অতি মৃদু স্পর্শে হাত বুলাইতেছিল। জ্যোতির্ময়ী শৈলজা দেবীর কথায় কোন উত্তর দিলেন না, ক্ষীণ ক্লান্ত স্বরে তিনি শিবুকে বলিলেন, কোন অন্যায় করিস নি তো শিবু?

শিবনাথ অবিচলিত দৃষ্টিতে মায়ের দিকে চাহিয়া বলিল, না মা।

জ্যোতির্ময়ী অতি কষ্টে হাতখানি ছেলের কোলের উপর রাখিয়া প্রশান্ত মুখে চোখ বুজিলেন।

শৈলজা দেবী ডাকিলেন, বউ!

জ্যোতির্ময়ী চোখ না খুলিয়া ভ্রূর ভঙ্গিতে উত্তর দিলেন, উঁ?

শৈলজা বলিলেন, বল, তোমার কি কষ্ট হচ্ছে শিবুকে বল।

ধীরে ধীরে মাথাটি নাড়িয়া জ্যোতির্ময়ী জানাইলেন, না।

শিবনাথ এবার বলিল, কি হচ্ছে তোমার বল মা?

একটা ম্লান হাসি জ্যোতির্ময়ীর অধরে ফুটিয়া উঠিল, তিনি ক্ষীণকণ্ঠে ধীরে ধীরে বলিলেন, চলে যাচ্ছি, মনে হচ্ছে, অনেক দূরে আমি চলে যাচ্ছি। তোরা যেন কতদূর থেকে কথা বলছিস, সব যেন ঝাপসা হয়ে আসছে।

এই কথা কয়টি বলিতেই তাঁহার ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটিয়া উঠিল। শিবু সযত্নে তাহা মুছাইয়া দিয়া বাতাস করিতে আরম্ভ করিল।

অপরাহ্ণের দিকে নিঃশেষিত-তৈল প্রদীপের মতই ধীরে ধীরে নিঃশেষে স্তিমিত হইয়া জ্যোতির্ময়ী মৃত্যুর মধ্যে যেন বিলীন হইয়া গেলেন।

মায়ের পারলৌকিক ক্রিয়া শেষ করিয়া শিবু এক অদ্ভুত মন লইয়া ফিরিল। চোখের সম্মুখে উপর্যুপরি দুই-দুইটি মানুষের আকস্মিক মৃত্যু দেখিয়া তাহার মন সমগ্র সৃষ্টির নশ্বরতার কথাই গভীরভাবে উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিতেছিল; কিন্তু সে উপলব্ধির মধ্যে এক বিন্দু খেদ ছিল না, আক্ষেপজনিত বৈরাগ্য ছিল না, মৃত্যুর প্রতি ভয় ছিল না। যে মানুষ দুইটিকে মৃত্যু আক্রমণ করিল, সে মানুষ দুইটি সহাস্যে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়া মৃত্যুর আক্রমণের তীব্রতাকে হতমান করিয়া দিয়াছে। বারান্দায় কম্বল বিছাইয়া তাহারই

উপর বসিয়া সে এই কথাটাই ভাবিতেছিল। তখন প্রায় শেষরাত্রি, শরতের অমলধবল জ্যোৎস্নার মধ্যে মানুষের রাজ্য সুষুপ্ত, কিন্তু মৃত্তিকার রন্ধ্রে রন্ধ্রে অসংখ্য কোটি কীট-পতঙ্গের বিচিত্র সম্মিলিত স্বরধ্বনি ধরণীর মর্মসঙ্গীতের মত অবিরাম ধ্বনিত হইতেছে। ইহারই মধ্যে শিবনাথ যেন সমগ্র সৃষ্টির জীবনস্পন্দন অনুভব করিল, তাহার চোখের সম্মুখের জ্যোৎস্নালোক-প্রতিফলিত অচঞ্চল খণ্ডপ্রকৃতি অসীম-বিস্তার হইয়া ধরা দিল, ইহারই মধ্যে সমগ্র ধরিত্রীকে সে যেন দেখিতে পাইল। জন্ম-মৃত্যুর সমুদ্রমন্থনে উঠিয়া রহস্যময়ী ধরিত্রী এমনই মনোরমা মূর্তিতে যুগযুগান্তর ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। কি অপূর্ব আজিকার ধরিত্রীর রূপ! তাহার মা ছিলেন এই জ্যোৎস্নাবর্ণময়ী নিশীথের মত প্রশান্ত স্থৈর্যময়ী, দিবসের কলরবের উন্মত্ততা তাঁহার জীবনে ছিল না, তিনি ছিলেন এমনই নৈশ-প্রকৃতির মত অশ্রান্ত মর্মসঙ্গীতময়ী। তাহার মনে পড়িয়া গেল—শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীম্, ফুল্লকুসুমিত-দ্রুমদলশোভিনীম্, সুহাসিনীম্ সুমধুরভাষিণীম্, সুখদাম্ বরদাম্ মাতরম্—বন্দেমাতরম্।

মনে মনে কয়টি লাইন আবৃত্তি করিতে করিতে সহসা তাহার মনে হইল, তাহার ওই মায়ের জীবনধারার মধ্যে শরদাকাশের ছায়াপথের মত একটি সাধনার স্রোতের আভাস যেন সে অনুভব করিতেছে। তাহার সেই কয়েক ঘণ্টার পরিচিত মানুষটিকে মনে পড়িয়া গেল, হাসিমুখে যিনি ভুলের মাশুল কড়ায়-গণ্ডায় শোধ করিয়া দিলেন।

শিবু!—শৈলজা ঠাকুরানী শ্মশান-বন্ধুদের বিদায় করিয়া এতক্ষণে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

শিবনাথ এতক্ষণে একটি গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মুখ তুলিয়া বলিল, পিসীমা?

হ্যাঁ। শুয়ে পড়্ বাবা। রাত্রি যে শেষ হয়ে এল।

এই শুই।—বলিয়া সে কম্বলের উপর ক্লান্ত দেহ প্রসারিত করিয়া দিয়া কহিল, এ রকম রাত্রি কিন্তু বড় দীর্ঘই হয়ে থাকে পিসীমা।

স্নেহভরে শিবনাথের মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে শৈলজা বলিলেন, দুঃখের রাত্রি শেষ হতে চায় না বাবা, ক্ষণকে মনে হয় যেন একটা যুগ। কিন্তু ধৈর্য যে ধরতেই হবে বাবা। বিপদের পরও যে মানুষের কর্তব্য না করলে যে উপায় নেই।

শিবনাথ আবার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চোখ বুজিল। শৈলজা ঠাকুরানী বসিয়া নিস্তব্ধ নৈশপ্রকৃতির দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে অবিরল ধারায় নীরবে কাঁদিয়া আকুল হইয়া উঠিলেন। বউ, তাঁহার সকল সুখদুঃখের অংশভাগিনী, সহোদরার মত মমতাময়ী, সখীর মত প্রিয়ভাষিণী—জ্যোতির্ময়ী নাই, কোথায় কোন্ অজানার মধ্যে হারাইয়া গেল!

পরদিন প্রভাতে কিন্তু সন্তোবিয়োগদুঃখে কাতর অবসন্ন শিথিলগতি এই সংসারটির মধ্যে শক্তি সঞ্চয় করিয়া স্বাভাবিক রূপ লইয়া সর্বাগ্রে জাগিয়া উঠিলেন শৈলজা ঠাকুরানীই। ঘরের দুয়ারে দুয়ারে জল দিয়া তিনি নিত্য ও মানদা ঝি এবং রতন-পাচিকাকে ডাকিয়া তুলিলেন, নিত্য, রতন, মানদা, ওঠ মা, আর শুয়ে থেক না। রাজ্যের কাজ পড়ে রয়েছে, ওঠ সব।

রতন একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, উঠব বইকি মাসীমা। খেতেও হবে, মাখতেও হবে, পরতেও হবে, করতে হবে যে সবই।

শৈলজা দেবী বলিলেন, মা, পৃথিবীর পানে চেয়ে দেখ, ওঁর তো শোক-দুঃখ কিছু মানলে চলে না, ভূমিকম্পই হোক আর ঝড়-বৃষ্টিতে বুক ভেঙে ভেসেই যাক, দিনরাত্রি সেই সমানে হবে, আর সৃষ্টিকেও সেই বুকে করেই ধরে রাখতে হবে। নিত্য, মুখে হাতে জল দে মা। আমার সঙ্গে কাছারি-বাড়ি যেতে হবে।

গোটা কাছারি-বাড়িটাও মুহ্যমানের মত অবসন্ন স্তব্ধ। বারান্দার তক্তাপোশটার উপর রাখাল সিং গালে হাত দিয়া উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া বসিয়া ছিলেন, নীচে দেওয়ালে ঠেস দিয়া বসিয়া কেষ্ট সিং আকাশের দিকে চাহিয়া ছিল, সতীশ চাকর উবু হইয়া দুই হাতে মাথা ধরিয়া বসিয়া আছে, মাস্টার রামরতনবাবু শুধু বারান্দায় পায়চারি করিতে করিতে মোহমুদ্গর আওড়াইতেছেন, শৈলজা ঠাকুরানী আসিয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু তবুও আজ কাহারও মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা গেল না।

শৈলজা দেবী বলিলেন, সিং মশায়, এমন করে বসে থাকলে তো চলবে না। যা হবার সে তো হয়েই গেল, এখন ক্রিয়াকর্মের ব্যবস্থা করতে হবে যে! দশটা দিন সময়, তার মধ্যে একটা দিন তো চলে গেল।

রাখাল সিং যেন একটু লজ্জিত হইয়া পড়িলেন, সত্য কথা, এ কর্তব্যকর্মে সজাগ হইয়া উঠা উচিত ছিল তাঁহারই সর্বাগ্রে। তিনি কেষ্ট সিংকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, কাঠটা কাটিয়ে ফেলতে হবে সকলের আগে। তেঁতুল কিংবা কয়েতবেলের গাছ দুটো কাটিয়ে ফেল, বুঝলে হে?

কেষ্ট সিং একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া নড়িয়া-চড়িয়া বসিয়া বলিল, কোথাকার গাছ কাটাব বলুন? কাছে-পিঠেই কাটাতে হবে, নইলে এই জল-কাদার দিনে গাছ নিয়ে আসাই হবে মুশকিল।

রামরতনবাবু পাদচারণায় ক্ষান্ত দিয়া তক্তাপোশটায় আসিয়া বসিলেন। সম্মুখের এই আসন্ন কর্তব্যকর্মটির দায়িত্বের অংশ যেন তিনি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়া বলিলেন, গাছ কোথায় কাটাতে হবে, মাছ কোথায় ধরাতে হবে, ওই আপনার চাল তৈরি করতে দিতে হবে, এ ভারগুলো হল কেষ্ট সিংয়ের। ওগুলো ওকেই ছেড়ে দিন। মহলের

গোমস্তাদের আনিয়ে তাদের সব কাজ ভাগ করে দিন। ইংরেজীতে একে বলে—ডিভিশন অব লেবার; বড় কাজ করতে হলেই ও না হলে হবে না। আপনি বরং সর্বাগ্রে একটা ফর্দ করে ফেলুন— দি ফার্স্ট অ্যাণ্ড দি মোস্ট ইম্পর্ট্যাণ্ট থিং।

রাখাল সিং বহুদর্শী ব্যক্তি, তিনি বলিলেন, তা হলে গ্রামের মুরুব্বিদের একবার আহ্বান করে তাঁদের পরামর্শমত ফর্দ করাই উচিত। অবশ্য তাঁরাও সব আপনা হতেই আসবেন।

রামরতনবাবু বলিলেন, ইয়েস। এটা তাঁদেরও একটা সামাজিক কর্তব্য।

রাখাল সিং মাথা চুলকাইয়া বলিলেন, বাবুর মামাশ্বশুরকেও একটা খবর দিতে হয়, তাঁদেরও একটা মতামত—না কি বলেন মাস্টার মশায়?

শৈলজা ঠাকুরানী বলিলেন, হ্যাঁ, খবর দিতে হবে বইকি। আর পরামর্শ চাইতেও হবে। কিন্তু সকলের আগে একখানা টেলিগ্রাম করতে হবে বউমাকে পাঠিয়ে দেবার জন্যে। মাস্টার, একখানা টেলিগ্রাম লেখ তো বাবা।

রাখাল সিং বলিলেন, ওঁদের ম্যানেজারকে ডেকে তাঁকে দিয়েও একখানা পত্র বরং—

শৈলজা দেবী বলিলেন, এতটা নামতে পারব না সিং মশাই; আমার বউ আনতে বউয়ের মামার কর্মচারীকে সুপারিশ করবার জন্যে ধরতে পারব না।

এই সময়েই কাছারি-বাড়ির ফটকে কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি প্রবেশ করিলেন; সামাজিক প্রথা অনুযায়ী তাঁহারা তত্ত্বতল্লাস করিতে আসিয়াছেন। শৈলজা দেবী মাথায় স্বল্প একটু অবগুণ্ঠন টানিয়া দিয়া বলিলেন, ভদ্রলোকেরা আসছেন, আমি তা হলে বাড়ির মধ্যে যাই, শিবুকে পাঠিয়ে দিই। মাস্টার, তুমি বাবা টেলিগ্রামখানা লিখে এখুনি পাঠিয়ে দাও।

তিনি একটু দ্রুত পদক্ষেপেই কাছারি-বাড়ি হইতে বাহির হইয়া গেলেন। রাখাল সিং সতীশকে বলিলেন, গড়গড়ায় জল ফিরিয়ে দে সতীশ, কাছারি-ঘরখানাও খুলে দে।

সতীশ কাছারি-ঘর খুলিয়া সমস্ত জানালা-দরজাগুলি খুলিতে আরম্ভ করিল; রাখাল সিং জোড়হাতে কাছারির দাওয়া হইতে নামিয়া বাগানের পথের উপর দাঁড়াইয়া আগন্তুকগণকে অভ্যর্থনা করিলেন।

শৈলজা ঠাকুরানী বাড়ির মধ্যে আসিয়া দেখিলেন, শিবুর কাছে বসিয়া আছেন এ সংসারের সেই বন্ধুটি—শিবুর গোঁসাই-বাবা—স্থানীয় দেবস্থানের গদিয়ান রামজী সাধু। সন্ন্যাসীকে দেখিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া শৈলজা বলিলেন, আসুন দাদা, থাকল না, ধরে রাখতে পারলাম না।

সন্ন্যাসী নিমেষহীন স্থির দৃষ্টিতে সম্মুখের দিকে চাহিয়া নীরবে বসিয়া রহিলেন। এ সংসারটির সহিত তাঁহার পরিচয় মৌখিক নয়, গভীর এবং আন্তরিক; আন্তরিকতার মধ্য দিয়া জীবনের সকল মমতা তিনি এইখানে উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিয়াছিলেন। চোখ ফাটিয়া জল বাহিরে আসিতে চাহিতেছিল, তাই তিনি নির্নিমেষ দৃষ্টিতে কঠোরতর উত্তাপে সে জল শুষ্ক করিয়া দিবার প্রয়াস করিলেন।

শিবনাথ সন্ন্যাসীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, মৃত্যু কি, বলতে পার গোঁসাই-বাবা?

সন্ন্যাসী ম্লান হাসি হাসিয়া অকপটে আপনার অজ্ঞতা স্বীকার করিলেন, হামি জানে না বাবা; উ যদি হামি জানবে বাবা, তবে সন্‌সার ছোড়কে ফিন কেনো মায়াজালমে গিরবো হামি?

শৈলজা দেবী শিবুর এই তীক্ষ্ণ অনুভূতিপ্রবণতা দেখিয়া কাল হইতেই শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিলেন; শিবুর মনকে যেন তিনি স্পর্শ করিতে পারিতেছেন না; তিনি প্রসঙ্গটা বন্ধ করিবার জন্যই তাড়াতাড়ি বলিলেন, ওসব উদ্ভট ভাবনা ভেবো না বাবা। জন্ম মৃত্যু হল বিধাতার কীর্তি, চিরকাল আছে, ওতেই সংসার চলছে। ওর কি আর জবাব আছে?

বিস্ময়বিমুগ্ধতার একটি মৃদু হাস্যরেখা শিবনাথের মুখে ফুটিয়া উঠিল, সে বলিল, বুদ্ধদেব বলে গেছেন, নির্বাণ; বিজ্ঞান বলে, দেহের যন্ত্রসমূহের ধ্বংসেই সব শেষ; সাধারণে বলে, জন্মান্তর।

সন্ন্যাসীও এবার যেন হাঁপাইয়া উঠিলেন, তিনি তাহাকে বাধা দিয়া বলিলেন, ছোড় দে বেটা; 'কর আপনা কাম ভাই, ভজ ভগবান, মরণকে কেয়া ডর, তুমহারা মতি মান'।

শৈলজা দেবী বলিলেন, ওসব কথা এখন থাক দাদা; আপনি বরং শিবুকে নিয়ে একবার বৈঠকখানায় যান। গ্রামের ভদ্রলোকজন সকলে আসছেন, তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে হবে, তাঁদের পাঁচজনের পরামর্শ নিতে হবে, নিয়ে কাজ করতে হবে। কথায় বলে, মাতৃপিতৃদায়।

সন্ন্যাসী বলিলেন, আসিয়াছেন সব? তব চল্ বেটা শিবু, বাহারমে চল্ বাবা হামার। উনিলোগ কি মনমে লিবেন?

শিবু উঠিল, আর বিলম্ব করিল না। উঠিতে উঠিতে তাহার মনে হইল, সমাজে বাস করার এ মাশুল; এ মাশুল না দিয়া উপায় নাই, দিতেই হইবে।

কাছারিতে তখন আরও কয়েকজন ভদ্রলোক আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, গড়গড়ায় তামাক দেওয়া হইয়াছে, হুঁকাতেও তামাক চলিতেছে। রাখাল সিং সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া আছেন, মাস্টার এক পাশে বসিয়া কথাবার্তা শুনিতেছেন।

কথা হইতেছিল নাবালক শিবনাথের অভিভাবকত্ব লইয়া। কৃষ্ণদাসবাবুর মৃত্যুর পর নাবালক শিবনাথের স্বাভাবিক অভিভাবক ছিলেন তাহার মা; এখনও শিবুর সাবালকত্ব অর্জন করিবার প্রায় তিন বৎসর বিলম্ব আছে।

শিবনাথের পিতৃবন্ধু মানিকবাবু এ গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তি, তিনিও জমিদার, তিনি বলিতেছিলেন, অবশ্য শিবনাথের পিসীমাই এখন সত্যকার অভিভাবক। কিন্তু আমার বিবেচনায় আইনে আদালতে দরখাস্ত করে তাঁর অভিভাবক না হওয়াই ভাল।

একজন বলিলেন, কেন, হলেই বা ক্ষতি কি? আমার বিবেচনায় তাঁরই তো হওয়া উচিত।

মানিকবাবু বলিলেন, 'অর্থম্ অনর্থম্ ভাবয় নিত্যম্'—বুঝলে, বিষয় হল বিষ, অমৃতকেও সে নষ্ট করে। ধর, ভবিষ্যৎ-বনিবনাও আছে, যদিই কোন কারণে তাঁর সঙ্গে বনিবনাও না হয়, তখন এই দায়িত্ব নিয়েই তাঁর নানা ফ্যাসাদ হতে পারে।

রামরতনবাবু বার বার এ কথাটা অস্বীকার করিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, না না না, শিবনাথের এমন মতিগতি কখনও হতে পারে না। শিবনাথ কখনও তাঁর কাজে 'না' করতে পারে না।

মানিকবাবু হাসিয়া বলিলেন, আপনি মাস্টার, শিক্ষক মানুষ, সাংসারিক জ্ঞান আপনাদের কিছু কম। অবশ্য অনেক শিক্ষক তেজারতি-মহাজনি করেন, মামলা-মকদ্দমাতেও ওস্তাদ শিক্ষকের নাম শুনতে পাই, কিন্তু আপনি তো সে দলের নন। তাই কথাটা ভেঙে বলতে হচ্ছে। ভাল কথা, শিবনাথ তাঁকে খুবই ভক্তি করে, মান্য করে, মেনে নিলাম। কিন্তু শিবনাথের স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর যদি না বনে? তখন শিবনাথ কাকে ফেলবে? পিসীমাকে, না, স্ত্রীকে?

কথাটা শুনিয়া সকলেই নিস্তব্ধ হইয়া গেল। এমন করিয়া অন্তর্ভেদী দৃষ্টি হানিয়া কেহ অবস্থাটা দেখিয়া ভবিষ্যতের কথা ভাবে নাই। তাহা ছাড়াও প্রকাশ্যভাবে কথাটার বহিরাবরণ এমন করিয়া উন্মুক্ত করিয়া দেওয়ার ফলে সকলেই অল্প লজ্জিত না হইয়া পারিল না। সত্য হইলেও কথাটার সহিত লজ্জার যেন একটু সংস্রব আছে, অন্তত পল্লীর প্রাচীন সমাজে আছে। শিবনাথ ঠিক এই নির্বাক অবসরটিতেই আসিয়া কাছারি-ঘরে প্রবেশ করিল।

মানিকবাবু সস্নেহে তাহাকে সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন, এস বাবা, এস। তোমার অপেক্ষাতেই রয়েছি আমরা।

শিবনাথ অল্প ইতস্তত করিয়া বলিল, প্রণাম তো করতে পাব না আমি এখন?

না। অশৌচকালে প্রণাম নিষেধ। বোসো, তুমি বোসো, এইখানেই কম্বলটা বিছিয়ে বোসো।

ওদিক হইতে একজন প্রসঙ্গটা পুনরুত্থাপিত করিয়া বলিলেন, তা হলে শিবনাথের শ্বশুরদের হাতে ভার দিতে হয়। গ্রামের শ্রেষ্ঠ লোক ওঁরা, বিষয়ও প্রকাণ্ড, তারই সঙ্গে এ এস্টেটও বেশ চলে যাবে।

মানিকবাবু বলিলেন, তা অবশ্য বলতে পারেন, চলেও অবশ্য যাবে, জাহাজের পেছনের জেলেবোটের মত। কিন্তু কৃষ্ণদাসদাদার ছেলে ঘরজামাই না হয়েও শ্বশুরের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকবে, এটা আমার কোনমতেই ভাল লাগছে না।

শিবনাথ কথাটা বুঝিতে পারিল না, কিন্তু মানিকবাবুর কথার বঙ্কিম তীক্ষ্ণাগ্র তাহাকে বিদ্ধ করিল, সে পূর্ণ দৃষ্টিতে মানিকবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, কথাটা আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না কাকা।

মানিকবাবু বলিলেন, তোমারই অভিভাবকত্বের কথা হচ্ছে বাবা। তোমার মা মারা গেলেন, এখন আদালতগ্রাহ্য অভিভাবক হবে কে? সেই নিয়ে কথা হচ্ছে। আমার মতে তোমার পিসীমার হওয়া উচিত নয়; এঁরা তোমার শ্বশুরদের কথা বলছেন, সেও আমি বেশ পছন্দ করতে পারছি না।

শিবনাথ বলিল, পরে সেটা ভেবে দেখলেই হবে কাকা, এখন আমার মায়ের কাজকর্ম কি করে সুশৃঙ্খলে হয়, সেই ব্যবস্থা করে দিন আপনারা।

একটা অপ্রিয় অবাঞ্ছনীয় আলোচনার জটিল জাল হইতে মুক্তি পাইয়া সকলে যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। একসঙ্গে কয়েকজনই শিবনাথের কথাতেই সায় দিয়া বলিয়া উঠিল, ঠিক কথা, ও তো হল পরের কথা; এখন মাথার ওপরে যে দায় চেপেছে, তারই ব্যবস্থা করা হোক।

মানিকবাবু গম্ভীরভাবে বলিলেন, বেশ তো, খরচপত্র কি রকম করা হবে, কর্তীর সামর্থ্য কতখানি, সে কথা আমাদের জানালেই আমরা সেইমত ব্যবস্থা করে দোব। কি রাখাল সিং, খরচপত্র কি রকম করা যেতে পারে, এস্টেটের সামর্থ্য কতখানি, সে কথা তুমিই বলতে পারবে ভাল, বল তুমি সে কথা।

কথাটার উত্তর দেওয়া সহজ নয়, উত্তর দিতে হইলে এস্টেটের গোপন কথাটি প্রকাশ করিতে হয়, রাখাল সিং বিব্রত হইয়া পড়িলেন। সতীশ চাকর সেই মুহূর্তে সসম্ভ্রমে ঘরে প্রবেশ করিয়া রাখাল সিংকে বলিল, পিসীমা আপনাকে একবার ডাকছেন, এই পাশের ঘরেই আছেন। রাখাল সিং দ্রুতপদেই ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

সতীশ গড়গড়ার কল্কে পাল্টাইয়া নূতন কল্কে বসাইয়া দিল, ওপাশ হইতে হুঁকা হাতে করিয়া এক ব্যক্তি বলিলেন, এটাও পালটে দাও হে, শুধু গড়গড়ার মাথাতেই নজর রেখো না, বুঝলে?

সতীশ তাড়াতাড়ি বলিল, আজ্ঞে না, হুঁকোর কল্কে সেজে এনেছি, এই যে।

বক্তা বলিলেন, কল্কে তো দু রকম তামাক দু রকম নয় তো?—বলিয়া আপন রসিকতায় তিনি হা-হা করিয়া হাসিয়া আকুল হইয়া উঠিলেন।

সহসা শিবনাথ বলিল, আচ্ছা কাকা, কোন উকিলকে গার্জেন নিযুক্ত করে আমি নিজে তো সম্পত্তি দেখতে পারি?

মানিকবাবু তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ছেলেটির মুখের দিকে চাহিয়া কয়েক মুহূর্ত নীরব হইয়া রহিলেন, এরূপ একটি সমস্যার এমন তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্মত সমাধান শিবনাথের মুখে শুনিবার প্রত্যাশা করেন নাই। তাহার পরই তিনি অল্প একটু হাসিয়া বলিলেন, হ্যাঁ, সে অবশ্য খুবই ভাল যুক্তি; কিন্তু ব্যয়সাপেক্ষ, মানে—উকিল একটা ফী নেবেন।

শিবনাথ বলিল, তা হলে তাই হবে। এই যুক্তিই আমি স্থির করলাম। এখন আপনারা এই শ্রাদ্ধের একটা ফর্দ করে দিন।

রাখাল সিং শিবনাথের কথার মধ্যস্থলেই আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। মানিকবাবু বলিলেন, খরচ কি পরিমাণ করা হবে, সেই কথাই তো জিজ্ঞাসা করলাম তোমার নায়েবকে বাবা। সেইটে জানলেই আমরা ব্যবস্থা করে দোব।

রাখাল সিং এবার জবাব দিলেন, পিসীমাই নিবেদন করলেন কথাটা। তিনি বললেন, মাতৃদায় পিতৃদায়, যেমন করেই হোক সমাধা করতে হবে। তাতে তো মজুত দেখতে গেলে চলবে না। টাকার সংস্থান একরকম করে হয়ে যাবে, আপনি আপনার মাতৃশ্রাদ্ধের ফর্দ অনুযায়ী ফর্দ করে দিন দয়া করে।

মানিকবাবু অত্যন্ত গম্ভীরভাবে বলিলেন, তা হলে কাগজ-কলম নিয়ে এস।

শৈলজা ঠাকুরানী এইবার পাশের ঘর হইতে বাহির হইয়া অন্দরে চলিয়া গেলেন। তাঁহার মুখ বেদনায় যেন বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। নিত্য তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, পিসীমা, শরীরটা কি খারাপ মনে হচ্ছে।

পিসীমা সংক্ষেপে উত্তর দিলেন, না।

দারুণ দুঃখের উপরে তিনি মর্মান্তিক আঘাত পাইয়াছিলেন। অভিভাবকত্ব ও বিষয়-পরিচালনার ব্যবস্থা লইয়া শিবনাথের প্রস্তাবটি তিনি কাছারি-ঘরের পাশের ঘরে থাকিয়া স্বকর্ণেই শুনিয়াছিলেন। আশ্চর্য মানুষের মন! কয়েক মাস পূর্বে তিনিই শিবনাথকে কাছারিঘরে বসাইয়া সম্পত্তি-পরিচালনার ভার তাহার হাতে তুলিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন, অথচ আজ শিবনাথের মুখেই সেই সংকল্পের কথা শুনিয়া মর্মান্তিক আঘাত অনুভব করিলেন। তাঁহার বার বার মনে হইল, তাঁহার জীবনের সকল প্রয়োজন ফুরাইয়া গিয়াছে। তিনি বাড়িতে আসিয়া অবসন্নের মত মেঝের উপর

শুইয়া পড়িলেন, ভ্রাতৃজায়ার অভাব এই মুহূর্তে যেন সহস্রগুণে অধিক হইয়া উঠিল। বহুক্ষণ কাঁদিয়া তিনি উঠিয়া বসিলেন, বার বার আপন ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিয়া আপনার মনকে লক্ষ সান্ত্বনা দিয়া দৃঢ় করিয়া তুলিলেন। রতন ও নিত্য-ঝি দুয়ারের পাশে দাঁড়াইয়া নীরবে অশ্রুবিসর্জন করিতেছিল, তাহারা ভাবিয়াছিল, শৈলজা দেবী এইবার অবসর পাইয়া জ্যোতির্ময়ীর জন্য কাঁদিতে বসিয়াছেন। মনকে বাঁধিয়া চোখ মুছিয়া শৈলজা দেবী বলিলেন, রান্নাবান্না চড়াও মা রতন। নিত্য, চাকর-বাকরদের জলখাবার বের করে দাও। আমি দেখি, ঠাকুরদের পুজো-ভোগের ব্যবস্থা করে দিই।

ভাষায় সুরে এ যেন সে শৈলজা ঠাকুরানী নন।

দুই দিনেই শ্রাদ্ধকার্যের বন্দোবস্তের মধ্যে একটি শৃঙ্খলা আসিয়া গেল। মহলের গোমস্তারা সকলে আসিয়া গিয়াছে, তাহাদের সঙ্গে পাইক-লগদীও আসিয়া কাজে লাগিয়াছে। সমগ্র কাজটি কয়েক ভাগে ভাগ করিয়া এক-একজনকে ভার দেওয়া হইয়াছে, সকল বন্দোবস্তের কর্তৃত্বভার লইয়াছেন মানিকবাবু, রাখাল সিং ও রামরতন হইয়াছেন তাঁহার সহকারী।

কলিকাতার বাজারের ফর্দ তৈয়ারি হইতেছিল। রামরতন যাইবেন কলিকাতায় বাজার করিতে। শিবনাথ নীরবে কম্বলের উপর বসিয়া ছিল। সহসা সে রামরতনকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, একটা কথা আপনাকে বলে দিই মাস্টার মশায়।

কি, বল?

একবার আপনি সুশীলদার ওখানে যাবেন। তাঁকে আমার এই বিপর্যয়ের কথাটা জানিয়ে আসবেন। তিনি মাকে বড় ভক্তি করতেন। —বলিতে বলিতেই তাহার ঠোঁট দুইটি কাঁপিয়া উঠিল। আশ্চর্যের কথা, সদ্য মাতৃবিয়োগে সে কাঁদে নাই, সেদিন যেন বুকে সে অসীম ধৈর্য অনুভব করিয়াছিল। কিন্তু যত দিন যাইতেছে, সে যেন ততই দুর্বল হইয়া পড়িতেছে। এ সময়ে পূর্ণ তাহার পাশে থাকিলে বড় ভাল হইত। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে আবার বলিল, পূর্ণ কেমন আছে, এইটে জিজ্ঞেস করতে যেন ভুলবেন না।

রাখাল সিং ফর্দ করিতে করিতেও বোধ হয় কথাটা শুনিয়াছিলেন, তাঁহার আর একটা কথা মনে পড়িয়া গেল। তিনি একটু ইতস্তত করিয়া বলিলেন, আর একবার— মানে, বউমা তো আজও এলেন না, কোন খবরও পাওয়া গেল না—ওঁদের ওখানে একবার গেলে হত না?

শিবনাথ ঘাড় নাড়িয়া অস্বীকার করিয়া বলিল, না।

রামরতন সহসা প্রশ্ন করিলেন, কদিন থেকেই তোকে কথাটা জিজ্ঞেস করব ভাবছিলাম শিবু, তুই কি আর পড়বি না ?

কলেজের পড়া আর পড়ব না।

তাই তো রে ! একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া রামরতন বলিলেন, ক্ষুদ্র এই বিষয়টুকুর গণ্ডির মধ্যেই বদ্ধ করে রাখবি নিজেকে ?

শিবনাথ চুপ করিয়া সম্মুখের পানে চিন্তাকুল দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। কয়টা কুলি প্রচুর মোটঘাট লইয়া কাছারিতে প্রবেশ করিয়া বলিল, আজ্ঞেন, কোথা রাখব জিনিসগুলি ?

কার জিনিস ? কে এল রে বাপু ?—রাখাল সিং সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিলেন।

শিবুও সবিস্ময়ে মাথার মোটগুলির দিকে চাহিয়া দেখিয়া চমকিয়া উঠিল, এ বাক্সটা—

কুলিরা উত্তর দিল, আজ্ঞেন, এ বাড়ির বউঠাকরুন এলেন, উ বাড়ির দাদাবাবু এলেন।

শিবনাথ, রাখাল সিং সকলেই দেখিল, অন্দরের দরজায় কমলেশের পিছনে পিছনে অবগুণ্ঠনাবৃতা কিশোরী গৌরী বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিতেছে।

শিবনাথ একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া চোখ বুজিল, আবার তাহার চোখে জল আসিতেছিল।

চব্বিশ

গৌরী প্রণাম করিতে উদ্যত হইতেই শৈলজা দেবী পা দুইটি সরাইয়া লইয়া বলিলেন, থাক্ মা, অশৌচ হলে প্রণাম করতে নেই। আমি এমনিই তোমাকে আশীর্বাদ করছি।

গৌরী সঙ্কুচিত হইয়া উদ্যত হস্ত সম্বরণ করিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। শৈলজা দেবী বধূর আপাদমস্তক একবার দেখিয়া লইয়া বলিলেন, কি অসুখ করেছিল তোমার, মাস্টার বলছিলেন ?

গৌরী এ কথারও কোন জবাব দিতে পারিল না, বরং মাথাটি হেঁট করিয়া আরও যেন একটু সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। কমলেশ গৌরীর হইয়া কৈফিয়ত দিল, বলিল, কাশী থেকে কলকাতায় এসে একবার জ্বর হয়েছিল, তা ছাড়া হজমের গোলমাল, এতেই ওর শরীরটা অনেকটা খারাপ হয়ে গেছে।

শৈলজা দেবী বলিলেন, অ, আমি ভেবেছিলাম, বোধ হয় শক্ত কিছু। যাকগে, এখন মুখে হাতে জল দাও মা। এই তোমার আপনার ঘর, তোমাকেই সব বুঝে-সুঝে নিতে হবে। আমাকে এইবার খালাস দাও।

এ কথার জবাব কিই বা আছে, আর কেই বা দিবে! কমলেশ ও গৌরী উভয়েই নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। শৈলজা দেবীই আবার বলিলেন, তবে যখন আনতে পাঠানো হয়েছিল, তখনই আসাটা উচিত ছিল, তোমাদেরও পাঠানোই ছিল কর্তব্যকাজ। আমাকে নিয়ে যাই কর আর যাই বল, শাশুড়ীর শেষ সময়টায় না আসা ভাল কাজ হয় নি।

কমলেশ ও গৌরীর এবার মুখ শুকাইয়া গেল, মানুষের অপরাধই অনুশোচনায় রূপান্তরিত হইয়া শাস্তি হইয়া দাঁড়ায়, তাহার উপর তাহা লইয়া অভিযোগ করিলে সে শাস্তি হইয়া উঠে পর্বতের মত গুরুভার। শৈলজা দেবী গৌরীর মনের মধ্যে একটা আতঙ্কের মত হইয়া আছেন, আজ সেই মানুষ অভিযোগের সুযোগ পাইয়া দণ্ডদাতার মত সম্মুখে দাঁড়াইতেই ভয়ে তাহার সর্বশরীর যেন ঝিমঝিম করিয়া উঠিল। কিন্তু শৈলজা ঠাকুরানী আর কোন কঠোর কথা বলিলেন না; নিত্য-ঝিকে ডাকিয়া বলিলেন, নিত্য, শিবুর নতুন রঙ-করা ঘর বউমাকে খুলে দে; বউমার জিনিসপত্র সব ঘরের মধ্যে তুলে দে। শেষে বধূকে আবার বলিলেন, ঘরে চাবি দিয়ে রেখো বাছা, কাজকর্মের বাড়ি, সাবধান থাকা ভাল।

নিত্য সঙ্গে করিয়া লইয়া উপরের—শিবনাথের জন্য শৈলজা দেবীর সাধ করিয়া সাজানো—ঘরখানি খুলিয়া দিয়া বলিল, ঝাঁটপাট দিয়ে পরিষ্কার করাই আছে বউদিদি। এই ছোট বেঞ্চিখানার ওপর বাক্সগুলো রেখে দিক। হাত-মুখ ধোবার জল বারান্দাতেই আছে। আর যদি কোন দরকার পড়ে, ডাকবেন আমাকে।

গৌরী ও কমলেশ মুগ্ধ দৃষ্টিতে ঘরখানি দেখিতেছিল; ঘরের বিচিত্রতর শোভা, ইহা হইতেও মূল্যবান আসবাব ও গৃহসজ্জা কলিকাতার ধনীসমাজে তাহারা অনেক দেখিয়াছে, কিন্তু এ ঘরখানির বর্ণবিন্যাস হইতে পারিপাট্যের সূক্ষ্মতম ব্যবস্থাটির মধ্যেও একটি পরম যত্নের আভাস সুপরিস্ফুট। কমলেশ বলিল, বাঃ, শিবনাথের টেস্ট তো ভারি চমৎকার! সুন্দর সাজানো হয়েছে ঘরখানি!

গৌরী এতক্ষণে প্রথম কথা বলিল, সে নিত্যকে প্রশ্ন করিল, নতুন সাজানো হয়েছে, না নিত্য?

হ্যাঁ বউদিদি, পিসীমা নিজে দাঁড়িয়ে থেকে রঙ করিয়েছেন, মা সমস্ত বলে দিয়েছিলেন, পিসীমা মাকে দিয়ে ঘর সাজিয়েছিলেন।—বলিতে বলিতেই বোধ করি জ্যোতির্ময়ীকে তাহার মনে পড়িয়া গেল, একটা সুগভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে বলিল, এমন শাশুড়ী নিয়ে আপনি ঘর করতে পেলেন না বউদিদি। আ! যদি দাদাবাবুর সঙ্গেও আসতেন, তা হলে দেখাটা হত।

গৌরীর মুখ মুহূর্তে গম্ভীর হইয়া উঠিল। অন্তরের মধ্যে ভয়ের অন্তরালে বিদ্রোহের ক্ষোভ এতক্ষণ গুমরিয়া মরিতেছিল, ব্যক্তিত্বের মধ্যে হীনতার সুযোগ পাইয়া সে বিদ্রোহ তাহার মাথা চাড়া দিয়া উঠিল; সে বলিল, সে দোষ-ঘাটের কৈফিয়ত কি তোমার কাছেও দিতে হবে নিত্য? যাও বাপু, তোমার কাজকর্ম থাকে তো করগে যাও। আমাকে একটু হাঁপ ছাড়তে দাও।

নিত্য এ বাড়ির পুরোনো ঝি, বাড়ির পাঁচজনের একজনের অধিকার লইয়াই সে কাজ করিয়া থাকে। নিত্য এ কথায় ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল, এবং উত্তরও সে দিত, কিন্তু কমলেশের উপস্থিতির জন্য বাড়ির মর্যাদা রাখিয়া নীরবেই ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

কমলেশ যেন বিস্মিত হইয়া বলিল, ঝিটা তো ভারি অসভ্য।

গৌরীর চোখ ছলছল করিয়া উঠিল, সে বলিল, দেখ, তোমরাই দেখ। আমি এখানে থাকতে পারব না।

কমলেশ বলিল, শিবনাথকে আমি খোলাখুলি বলব নান্তি। শাশুড়ীতে বউকে ধরে মারবার যুগ আর নেই, সে যুগে আর এ যুগে অনেক প্রভেদ।

সে আমি জানি কমলেশ।

কথার শব্দে গৌরী ও কমলেশ উভয়েই চমকিয়া উঠিয়া পিছনে ফিরিয়া দেখিল, দরজার মুখেই দাঁড়াইয়া শিবনাথ। তৈলহীন রুক্ষ চুল, অঙ্গে অশৌচের বেশ, খালি পায়ে কখন সে উপরে আসিয়াছে, কেহ জানিতে পারে নাই। শিবনাথ আবার বলিল, তোমার চেয়ে বরং বেশিই একটু জানি, সেটা হল ভবিষ্যতের কথা, বৃদ্ধবয়সে শ্বশুর-শাশুড়ীদের পিঁজরেপোলের জানোয়ারের মত হাসপাতালে মরতে যাবার দিনও আগতপ্রায়।

কমলেশের মুখ-চোখ লাল হইয়া উঠিল, অবগুণ্ঠনের মধ্যে গৌরীর মুখ বিবর্ণ পাংশু হইয়া গেল। আত্মসম্বরণ করিয়া কমলেশ বলিল, অপরাধটা আমাদের—গৌরীর অভিভাবকদের, গৌরীর নয়। এ কথাটা অতি সাধারণ লোকও বুঝতে পারবে। তেরো-চোদ্দ বছরের মেয়ে নিজে থেকে শ্বশুরবাড়ি যাবার কথা কোনমতেই প্রকাশ করে বলতে পারে না।

শিবনাথ তিক্ততার সহিত হাসিয়া বলিল, আরও কম বয়সের মেয়েতে কিন্তু জনরবের ওপর নির্ভর করে স্বামীর সঙ্গে সম্বন্ধ চুকিয়ে দেবার কথা লিখতে পারে, এইটে আরও আশ্চর্যের কথা।

রুদ্ধ ঘরে জানোয়ারকে পুরিয়া মারিলে সে যেমন মরিয়া হইয়া ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে, কমলেশের অবস্থা হইয়া উঠিতেছিল সেইরূপ, সে বলিয়া উঠিল, সে কথা সত্যি হলে সেই ব্যবস্থাই হত। অন্নবস্ত্রের কাঙাল হয়ে আমরা মেয়ের বিয়ে দিই নি। অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা করে দেবার মত অবস্থা আমাদের আছে।

শিবনাথের মাথার মধ্যে দপ করিয়া যেন আগুন জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু ক্রোধ ভয় আনন্দ সুখ দুঃখ প্রভৃতি সকল কিছুর বিহ্বলতার উর্ধ্বে জাগ্রত থাকিবার মত শিক্ষার চেতনা তাহার আয়ত্ত হইয়া গিয়াছে, বিশেষ করিয়া এ কয় মাসের শিক্ষায়, সাহচর্যে, কয়দিন আগে একটি মানুষের হাসিমুখে মৃত্যুবরণের প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তে। সেই চেতনার নির্দেশে সে আপনাকে সম্বরণ করিয়া সঙ্গে সঙ্গেই কোন উত্তর দিয়া বসিল না, কমলেশের মুখ হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইবার জন্যই সে গৌরীর দিকে চাহিল; চোখের জলে তাহার ভয়বিবর্ণ মুখখানি ভাসিয়া গিয়াছে, এই বাদানুবাদের উগ্রতার মধ্যে তাহার মাথার অবগুণ্ঠন প্রায় খসিয়া পড়িয়াছে। শিবনাথের সংযমে আবদ্ধ বিক্ষুব্ধ মনের উপরের উত্তপ্ত বায়ুপ্রবাহ যেন গৌরীর অশ্রুবর্ষণের ধারায় খানিকটা শীতল হইয়া শান্তও হইয়া গেল। সে অল্প একটু হাসিয়া বলিল, তোমরা ধনী, তোমরা হয়তো তা পার। কিন্তু গরিবের স্ত্রী তা পারে কি না, সেটা বরং তার কাছ থেকেই আমি শুনব। তুমি আমার কুটুম্ব, আমার বাড়ির ক্রিয়া-কর্ম উপলক্ষে এসেছ, কটু কথা বললেও সেটা আমার চুপ করে সহ্য করাই উচিত।

কমলেশ এ কথার কোন উত্তর দিল না, অবরুদ্ধ ক্রোধে সে চুপ করিয়া নানা অদ্ভুত কল্পনা করিতে আরম্ভ করিল। শিবনাথকে তাহাদের ব্যবসায়ের মধ্যে একটা চাকুরি দিয়া তাহার টেবিলের সম্মুখে দাঁড় করাইয়া কৈফিয়ত লইলে কেমন হয়? অথবা টাকা ধার দিয়া ঋণজালে আবদ্ধ করিয়া নির্মম আকর্ষণে টানিলে কেমন হয়?

শিবনাথ বলিল, আচ্ছা, তোমরা এখন বিশ্রাম করো। আমি বাইরে যাই, অনেক কাজ রয়েছে।—বলিয়া সে চলিয়া গেল।

কমলেশ বলিল, তুই স্পষ্ট বলবি নাস্তি, এখানে তুই থাকতে পারবি না। শিবনাথ চলুক কলকাতায়, কয়লার ব্যবসায় এখন লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন; ও ব্যবসা করুক, টাকা না থাকে আমরা ধার দিচ্ছি। ব্যবসা না পারে, চাকরি করুক, তুইও সেখানে থাকবি। এ সামান্য জমিদারি, ফুঁ দিলে উড়ে যায়, এ নিয়ে পড়ে থাকলে কি হবে? পিসীমা এখানে থাকুন, খান-দান, আর চোখ রাঙান ওই ঝি-চাকরদের ওপর।

গৌরী এতক্ষণে আপনাকে সামলাইয়া লইয়াছিল, আঁচলে চোখ মুছিয়া কি বলিতে গিয়া চুপ করিয়া গেল, শঙ্কিতভাবে মৃদুস্বরে বলিল, সিঁড়িতে পায়ের শব্দ উঠছে।

কমলেশ ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া দেখিল, সিঁড়ির বাঁকের মুখে একটা মানুষের ছায়া সিঁড়ি হইতে দেওয়ালের গায়ে উঠিয়া আবার ওদিকে অদৃশ্য হইয়া গেল। কিছুক্ষণ পর রতন আসিয়া গৌরীকে ডাকিয়া বলিল, নেমে এসো, ঘাটে যেতে হবে, শিবনাথের হবিষ্যিও তোমাকে চড়িয়ে দিতে হবে।

গৌরী শঙ্কিত অন্তরে নীচে নামিয়া গেল। শৈলজা ঠাকুরানী অতি মিষ্টস্বরে বলিলেন, স্নান করে ফেলো মা, স্নান করে হবিষ্যি চড়াতে হবে। এ ঘরদোর সবই তোমার, শিবুর মাতৃদায়, তোমার কি ওপরে বসে থাকলে চলে?

মিষ্ট কথায় আশ্বস্ত হইয়া গৌরী হৃষ্ট হইয়া উঠিল, সে আনুগত্য স্বীকার করিয়া বলিল, শ্রীপুকুরের ঘাটে নাইতে হবে তো পিসীমা?

হ্যাঁ, রতন যাচ্ছে তোমার সঙ্গে।

শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠানটি বৃষোৎসর্গ হইলেও সাধারণ স্তরের ক্রিয়া হয় নাই। মানিকবাবু তাঁহার মাতৃশ্রাদ্ধের অনুরূপ ফর্দ করিয়াছিলেন—বোধ করি অতি কঠোর নিষ্ঠার সহিতই অনুরূপ ফর্দ করিয়াছিলেন। ব্যয়ে সমারোহে সমগ্র ক্রিয়াকাণ্ডটি আকারে প্রকারে বিপুলকায় হইয়া উঠিল। কিন্তু শৈলজা ঠাকুরানী একাই যেন দশভুজা হইয়া উঠিলেন। তাঁহার ব্যক্তিত্বের আভিজাত্য কাহারও অজ্ঞাত নয়, বৈষয়িক কর্মে তাঁহার জন্মগত তীক্ষ্ণ

বুদ্ধির পরিচয় সকলের সুবিদিত, কিন্তু এমন কঠোর পরিশ্রম-পারগতার পরিচয় সম্পূর্ণ অভিনব, সর্বোপরি ওই দৃপ্ত তেজস্বিনী মেয়েটির এমন নমনীয় শান্ত স্নিগ্ধ ব্যবহার দেখিয়া সকলেই বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গেল। শুধু তাহাই নয়, অকস্মাৎ তিনি যেন মমতায় পরম স্নেহময়ী হইয়া উঠিয়াছেন। সেদিন নিত্য-ঝি প্রকাণ্ড বড় গুড়ের জালা হইতে গামলায় গুড় বাহির করিতেছিল, একটা গামলা পরিপূর্ণ হইয়া গেলে সে আসিয়া পিসীমাকে বলিল, এক গামলা গুড় বের করেছি, আর কি বের করব পিসীমা?

শৈলজা দেবী বলিলেন, না, আর এখন থাক্।—বলিয়াই তিনি বলিলেন, এমন করেই কি বেহুঁশ হয়ে কাজ করে মা? মুখময় যে গুড় লেগেছে রে, মুছে ফেল্।

নিত্য বাঁ হাতের কব্জি ও কনুইয়ের মধ্যবর্তী অংশটা দিয়া মুখটা মুছিয়া লইল। পিসীমা বলিলেন, হল না রে। সরে আয় আমার কাছে; আয় না, তাতে কি দোষ আছে?—বলিয়া নিজেই একখানা গামছা দিয়া কন্যার মতই নিত্যর মুখখানা মুছাইয়া দিলেন।

রতন একান্তে নিত্যকে বলিল, ঠাকরুন আর বেশি দিন নয় নিত্য, এ যে অসম্ভব মতিগতি, সে মানুষই আর নয়। মামীমাই ননদের আশেপাশে ঘুরছে নিত্য, দেখিস তুই, ছ মাসের বেশি ঠাকরুন আর নয়।

নিত্য একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, ও-কথা বোলো না রতনদি, সংসারটা তা হলে ভেসে যাবে।

শ্রাদ্ধের দিন খাওয়া-দাওয়া যখন শেষ হইল, রাত্রি তখন বারোটা। শৈলজা দেবী তখনও পর্যন্ত অভুক্ত, সে সংবাদ জানিত শুধু নিত্য ও রতন। রতন ব্যস্ত হইয়া বলিল, মাসীমা, এবার আপনি কিছু মুখে দিন, এখনও পর্যন্ত তো কিছু খান নি।

শৈলজা বলিলেন, দে তো মা, এক গেলাস ঠাণ্ডা জল আমায় দে তো। ভেতরটা শুকিয়ে যেন কাঠ হয়ে গিয়েছে।

রতন এক গ্লাস জল আনিয়া তাঁহার হাতে দিয়া বলিল, দুটো ভাতে-ভাত চড়িয়ে দিই মাসীমা, সমস্ত দিন কিছু খান নি।

আলগোছে গ্লাস তুলিয়া ঢকঢক করিয়া জলটা নিঃশেষে পান করিয়া তিনি বলিলেন, না রতন, অনেক খেয়েছি মা, আর মুখে কিছু রুচবে না।

সবিস্ময়ে রতন বলিল, সে কি? কখন কি খেলেন আপনি?

শৈলজা বিচিত্র হাসি হাসিয়া বলিলেন, স্বামী, পুত্র, ভাই, ভাজ, অনেক খেলাম মা বসে বসে। আর ক্ষিধে থাকে, না, থাকতে আছে? বউয়ের শ্রাদ্ধের অন্ন আমাকে খেতে হয় রতন?—বলিয়া তিনি ধীরে ধীরে আপন শয়নকক্ষের অভিমুখে সিঁড়ি দিয়া অগ্রসর হইলেন।

এ কথার উত্তর রতন খুঁজিয়া পাইল না। নিত্য বলিল, আজ তো পায়ে তেল নেন নি, পায়ে তেল দিয়ে দিই।

শৈলজা দেবীর এ অভ্যাসটুকু চিরদিনের অভ্যাস। এটুকু না হইলে রাত্রে তাঁহার ঘুম পর্যন্ত হয় না। শৈলজা দেবী আজ বলিলেন, না, থাক্।

নিত্য ব্যস্ত হইয়া বলিল, না পিসীমা, রাত্রে আপনার ঘুম হবে না।

তিনি শান্তভাবে প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, না নিত্য, ভোগের মধ্যে থেকে থেকে ভগবানকে আমি দূরে ফেলেছি মা, নিজে হয়ে উঠেছি দেবতা, ওসব আর নয়, সেবা আর আমি কারও নোব না। আপন শয়ন-ঘরের দরজায় আসিয়া আবার তিনি ফিরিলেন, বারান্দার রেলিঙে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, শিবনাথ শুয়েছে নিত্য? কোথায় শুয়েছে?

তিনি আর বউদির ভাই মায়ের ঘরে শুয়েছেন পিসীমা।

বউমার কাছে তুই শুবি তো?

হ্যাঁ।

কাল থেকে শিবুর বিছানা শিবুর ঘরে করে দিবি, বুঝলি?

নিত্য একটু ইতস্তত করিয়া বলিল, বউদিদি যে বলছিলেন, কলকাতায় যাবেন কাল-পরশু।

হাসিয়া শৈলজা বলিলেন, যাব বললেই কি যাওয়া হয় বাছা? তার ঘরদোর কে নেবে, কে চালাবে?

তারপর আবার বলিলেন, কেষ্ট সিং আর বেহারী বাগদী বাড়িতে শুয়েছে তো? ওদের দরজা বন্ধ করে দিতে বল্। একটু সজাগ হয়ে থাকতে বলে দে। রাজ্যের জিনিস বাইরে পড়ে আছে।

সকল কাজ সুশেষ করিয়া তিনি দরজা খুলিয়া শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে উঠিয়াই তিনি রাখাল সিংকে ডাকিয়া বলিলেন, শ্রাদ্ধ-শান্তি তো চুকে গেল সিং মশায়, এখন একটি জিনিস আমাকে বুঝিয়ে দিন দেখি, মোট কত টাকা খরচ হল? আমি একবার সিন্দুক খুলে মজুত টাকা আর খরচের হিসেবটা মিলিয়ে দেখি।

রাখাল সিং বলিলেন, তা কি করে হবে? এখনও যে অনেক খরচ বাকি রয়েছে, তা ছাড়া এতবড় হিসেব একদিনে কি খাড়া করা যায়?

সস্নেহে অনুরোধ করিয়া শৈলজা বলিলেন, যায় বইকি সিং মশায়, ধর্মরাজের দরবারে এতবড় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের হিসেব-নিকেশ যখনই দেখবে, তখনই দেখবে কড়া-

ক্রান্তিতে মিল। আপনারা কায়স্থেরা হলেন চিত্রগুপ্তের বংশধর, আপনারা মনে করলে না পারেন কি? আমার পাপপুণ্যের খতিয়ান করে আমাকে শুনিয়ে ছুটি করে দিন আপনি।

রাখাল সিং বিষম সমস্যায় পড়িলেন, তীক্ষ্ণবুদ্ধি জমিদারের মেয়েটির বিষয়জ্ঞান টনটনে হইলেও হিসাব-নিকাশ যে কি বস্তু, কত জটিল, তাহা তো তিনি বুঝিবেন না! আর মুখের কথায় সে কথা তাঁহাকে বুঝানোই বা যায় কিরূপে! অবশেষে তিনি বলিলেন, আপনি বরং মাস্টারকে ডেকে জিজ্ঞাসা করুন, তাই কি হয়?

হাসিয়া শৈলজা বলিলেন, মাস্টারকে ডেকে আর কি করব? আমি বলছি কি, আমি বাড়ি থেকে দফায় দফায় যত টাকা দিয়েছি, সেগুলো তো গোলমেলে নয়, সেইগুলো যোগ দিয়ে আমাকে বলে দিন আপনি, নিজ হাতে কত টাকা খরচ করেছি। তার বেশি দায়িত্ব তো আমার নয়, সেই খরচে আর মজুতে মিলে গেলেই তো আমি খালাস। তারপর আপনারা আবার সে টাকা নিয়ে যে যেমন খরচ করেছেন, সে হিসেব আপনাদের আলাদা হবে।

শিবনাথ অভ্যাসমত প্রত্যূষে উঠিয়াই বাহিরে গিয়াছিল, সে ফিরিয়া বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিল। পিসীমা তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, শিবু, রাখাল সিংয়ের সঙ্গে বসে একবার হিসেব মিলিয়ে দেখতে হবে। কত টাকা বাড়ি থেকে আমি বের করে দিয়েছি, আর সিন্দুক খুলে দেখ্, মজুতই বা কত আছে, তা হলেই মোটামুটি হিসেবটা ঠিক হবে। এই চাবিটা নে, সিন্দুকটা খুলেই আগে দেখ্, মজুত কত!

সিন্দুকের চাবিটা তিনি শিবুর হাতে তুলিয়া দিলেন। তারপর টাকাকড়ি গুনিয়া দেখিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, একটা বোঝা নামল বাবা। এইবার বাসন-পত্রগুলো। ওরে নিত্য, বউমাকে একবার ডাক্ তো।

গৌরী আসিয়া দাঁড়াইতেই পিসীমা বলিলেন, বাসনগুলো দেখে তুমি মিলিয়ে নাও দেখি। এই নাও, চাবি নাও, বাসনের ঘরের দরজা খোলো।—বলিয়া তাহার হাতে এক গোছা চাবি তুলিয়া দিলেন।

হিসাব-নিকাশ করিতে করিতে বার বার শিবনাথের ভুল হইতেছিল। এসব কিছুই তাহার ভাল লাগিতেছিল না। শ্রাদ্ধের কয়দিন কর্মব্যস্ত মুহূর্তগুলি ঝটিকার বেগে বহিয়া চলিয়া গিয়াছে, তাহার নিজের সকল শক্তিও এই কর্মসমারোহের মধ্যে পরিব্যাপ্ত ছিল; চিন্তার অবসর ছিল না, প্রবৃত্তি অপ্রবৃত্তি সমস্ত যেন কোথায় আত্মগোপন করিয়া ছিল। আজ অবসর পাইয়া মন তাহার জাগিয়া উঠিয়াছে। মনে মনে সে একটা গভীর উদাসীনতা অনুভব করিল। কিছুই যেন তাহার ভাল লাগিতেছিল না।

রামরতনবাবু বলিলেন, এখন থাক্ শিবনাথ, শরীর মন দুই তোর দুর্বল হয়ে পড়েছে। ইউ রিকোয়্যার রেস্ট—অ্যাবসলিউট রেস্ট!

আপনার মুণ্ডিত মস্তকে হাত বুলাইয়া শিবনাথ বলিল, আসলে যেন কোন কিছুতে প্রবৃত্তি হচ্ছে না মাস্টার মশায়, ভাল লাগছে না কিছু।

রাখাল সিং বলিলেন, থাক্ তা হলে এখন। আমিই বরং যোগ দিয়ে ঠিক করে রাখি, আপনি এর পরে একবার চোখ বুলিয়ে নেবেন।

শিবনাথ উঠিয়া গিয়া একটা ডেক-চেয়ারের উপর আপনাকে এলাইয়া দিয়া বলিল, তাই হবে।

রামরতনবাবু মৃদুস্বরে বলিলেন, শিবু, একটা কথা তোকে না বলে আমি পারছি না। আমার মনে হচ্ছে, এজন্যে আমিই হয়তো রেস্‌পন্সিব্‌ল।

নিতান্ত অন্যমনস্কভাবে শিবু বলিল, বলুন।

আমার মনে হচ্ছে, আমার শিক্ষার দোষেই জীবনে তুই এমন ডেঞ্জারাস পথ বেছে নিয়েছিস। আমি বিশেষ কিছুই জানি না, তবু সেই মেয়েটির কাছে শুনে, সুশীলবাবুর বাড়ির আবহাওয়া দেখে আমি অনুমান করেছি। ইউ মাস্ট লীভ ইট, মাই বয়।

শিবনাথের চোখ মুহূর্তে প্রদীপ্ত স্থির দৃষ্টিতে সম্মুখের আকাশের নীলিমায় নিবদ্ধ হইল, সে চোখের দৃষ্টি অতলস্পর্শী গভীর। তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের স্পন্দনের অস্থিরতাটুকু পর্যন্ত গভীরতার গাম্ভীর্যে স্তব্ধ প্রশান্ত।

রামরতন ডাকিলেন, শিবু!

সার্?

ইউ মাস্ট গিভ মি ইওর ওয়ার্ড অব অনার, আমায় কথা দে তুই।

পারি না সার্। আজও ভেবে আমি ঠিক করতে পারি নি, তবে আমি পথ খুঁজছি।

আমার কথাতেও তুই নিবৃত্ত হতে পারিস না শিবু?

অতি ক্ষীণ হাস্যরেখা শিবুর অধরে ফুটিয়া উঠিল, সে বলিল, একজন মহামানব—অতিমানব আমায় বলেছেন, এ পথ ভ্রান্ত। কিন্তু অন্য পথের সন্ধান তিনি দিতে পারেন নি। আমি সেই পথ খুঁজছি।

রামরতন একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া নীরব হইয়া গেলেন, তাঁহার অন্তরটা যেন অসহ দুঃখে ভরিয়া উঠিল। অতিমানব, মহামানব! কে সে? কেমন ব্যক্তি সে? বার বার সেই প্রশ্ন তাঁহার অন্তরে ঘুরিয়া মরিতেছিল, কিন্তু তবু তিনি মুখ ফুটিয়া সে কথা জানিতে চাহিলেন না। তিনি বেশ জানেন, শিবু বলিবে না। পৃথিবীর কোন শক্তি ওই ছেলেটির কাছে তাহা আদায় করিয়া লইতে পারিবে না।

কিছুক্ষণের মধ্যেই শিবনাথ সে প্রশান্ত গম্ভীর চিন্তা হইতে জাগিয়া উঠিল। মনের মধ্যে সেই কিছু-ভাল-না-লাগার অস্থিরতা। ডেক-চেয়ারটা ছাড়িয়া সে উঠিয়া পড়িল; দীর্ঘদিন পর আস্তাবলে আসিয়া ঘোড়াটার সম্মুখে দাঁড়াইল। গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ মসৃণ শরীরে সূর্যের আলো যেন ঠিকরাইয়া পড়িতেছে। দুরন্ত অস্থিরতায় চঞ্চল পায়ের ক্ষুরের আস্ফালনে আস্তাবলটা ধুলায় ভরিয়া উঠিয়াছে। এমন সুন্দর বাহনটিও তাহাকে আজ আকর্ষণ করিতে পারিল না। সে অন্যমনস্কভাবেই ঘুরিয়া ঘুরিয়া বাড়িটার সর্বস্থান যেন সন্ধান করিয়া ফিরিতে আরম্ভ করিল, কোথায় কোন্‌খানে এ অস্থিরতার সান্ত্বনা লুকাইয়া আছে!

মালতীলতাটা সাদা ফুলে ভরিয়া উঠিয়াছে। খামার-বাড়িটা ঘাসে ঘাসে পুরু সবুজ গালিচার মত নরম। ঘাস মাড়াইয়া মাড়াইয়া সে শ্রীপুকুরের ঘাটে আসিয়া উঠিল। আশ্বিনের প্রারম্ভে পুকুর-ভরা কালো জল টলমল করিতেছে।

সে আসিয়া বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিল। পিসীমা আহ্নিকে বসিয়াছেন। বাসনের ঘরের দরজায় গৌরী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সে উপরে উঠিয়া গেল। সাজানো ঘরখানার দরজাটা খোলা, ঘরের মধ্যে নিত্য-ঝি রাজ্যের বিছানা স্তূপীকৃত করিয়া ঝাড়ামোছা করিতেছিল। শিবনাথ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। ঘরখানার চারিদিক একবার দেখিয়া মেঝের উপর জড়ো-করা বিছানাগুলির দিকে চাহিয়া সে বলিল, এগুলো নামালি কেন?

নিত্য পুলকিত হাসি হাসিয়া বলিল, নতুন করে বিছানা হবে, আপনি শোবেন এ ঘরে।

শিবনাথ তীক্ষ্ণ স্থির দৃষ্টিতে নিত্যর দিকে চাহিয়া রহিল, নিত্যর হাসিতে কথায় একটা ইঙ্গিত রহিয়াছে। অকস্মাৎ এক মুহূর্তে তাহার মনের সকল অস্থিরতা দেহের প্রতি শোণিতবিন্দুতে সঞ্চারিত হইয়া গেল, শোণিতকণিকাগুলি যেন উত্তাপে উত্তেজনায় কুঙ্কুমের মত ফাটিয়া পড়িতেছে।

নিত্য আবার হাসিয়া বলিল, আমার কিন্তু শয্যে-তুলুনি দিতে হবে দাদাবাবু।

শিবনাথ অস্থিরতর পদক্ষেপে দ্রুত ঘর হইতে বাহির হইয়া নামিয়া চলিয়া আসিল। কাছারিতে আসিয়া আবার সে ঘোড়াটার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। ঘোড়াটার কপালে মৃদু চাপড় মারিয়া তাহাকে আদর জানাইয়া বারান্দায় আসিয়া ডেক-চেয়ারটায় বসিল।

রাখাল সিং বলিলেন, আমার যোগ দেওয়া হয়ে গেল। মজুতে খরচে তহবিল ঠিক মিলই আছে। দেখুন একবার আপনি।

গভীর অনিচ্ছা জানাইয়া ঘাড় নাড়িয়া সে বলিল, না না, ও থাক্‌। মিলে যখন গেছে, তখন আর দেখব কি?

মাস্টার গম্ভীরভাবে পদচারণা করিতেছিলেন। শিবনাথ হিসাবের প্রসঙ্গ ত্যাগ করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পর অকস্মাৎ সে ডাকিল, নিতাই!

সহিস নিতাই আসিয়া দাঁড়াইতেই সে বলিল, ঘোড়ার সাজ পরিষ্কার করে রাখ্। চারটের সময় ঘোড়ার পিঠে সাজ দিবি।

সতীশ আসিয়া বলিল, চান করুন, অনেক বেলা হয়েছে।

শিবনাথ বলিল, তেল গামছা নিয়ে আয়, আজ শ্রীপুকুরে নাইব, সাঁতার কাটব খানিকটা।

সাঁতার কাটিয়া একেবারে ক্লান্ত হইয়া তবে সে উঠিল; চোখে তখন যেন ঘুম ধরিয়া আসিয়াছে।

দুরন্ত গতিতে সে ঘোড়াটাকে ছাড়িয়াছিল; বলিষ্ঠ দৃঢ় দীর্ঘদেহ বাহনটির দুরন্ত গতিবেগের সঙ্গে সঙ্গে তাহার মন উচ্ছ্বসিত আনন্দে ভরিয়া উঠিতেছিল। দেহের পেশীগুলি সবল আন্দোলনের দোলায় দোলায় কঠিন পরিপুষ্টিতে জাগিয়া উঠিল। বাড়ি যখন ফিরিল, তখন তাহার সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজিয়া গিয়াছে। সহিসের হাতে ঘোড়াটাকে ছাড়িয়া দিয়া কাছারির বারান্দায় আসিয়া ডেক-চেয়ারটায় বসিয়া বলিল, ঘোড়াটার চাল হয়েছে চমৎকার!

রাখাল সিং চিন্তাকুল হইয়া বসিয়া ছিলেন, ওদিকে একখানা চেয়ারে মাস্টার বসিয়া ছিলেন, তাঁহার মুখেও অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য। শিবনাথের কথায় কেহ কোন উত্তর দিল না। শিবনাথ এদিক ওদিক চাহিয়া ডাকিল, সতীশ!

সতীশের এ সময়টি মৌতাতের সময়। সে একটি নির্জন আড়ালে বসিয়া গাঁজা টিপিতেছিল। শিবনাথের ডাক শুনিবামাত্র তাহার গঞ্জিকা-মর্দনচঞ্চল হাত দুইখানি স্তব্ধ হইয়া গেল। কিন্তু সে মুহূর্তের জন্য, মুহূর্ত পরেই আবার তাহার হাত চলিতে লাগিল, কোন উত্তর সে দিল না।

শিবনাথ কোন উত্তর না পাইয়া নিজেই উঠিল। রাখাল সিং বলিলেন, একবার বাড়ির দিকে যান আপনি। পিসীমা—

শিবনাথ তাঁহার কথার মধ্যপথেই বাধা দিয়া বলিল, বাড়িতেই যাচ্ছি আমি।

বাড়ির দরদালানে পিসীমা বসিয়া গৌরীকে কিছু বলিতেছিলেন, শিবনাথ বাড়িতে প্রবেশ করিতেই তিনি বলিলেন, শিবু, তোর জন্যেই আমি পথ চেয়ে রয়েছি বাবা, তোর সঙ্গে আমার কথা আছে।

শিবনাথের মনের উত্তেজনা তখনও শান্ত হয় নাই, সে অল্প উচ্ছ্বাসের সহিত বলিল, আসছি পিসীমা, কাপড়-জামাগুলো পালটে আসি, ঘামে একেবারে ভিজে

গিয়েছে। আজ ঘোড়ায় চড়েছিলাম পিসীমা, ওঃ, ঘোড়াটা যা চমৎকার হয়েছে!—বলিতে বলিতেই সে দ্রুতপদে উপরে উঠিয়া গেল। পা-হাত ধুইয়া সাবান দিয়া সে মুখ ধুইয়া ফেলিল, ঘর্মাক্ত কাপড়-জামা ছাড়িয়া পরিল জরিপাড় একখানি মিহি ধুতি ও একটি চুড়িদার পাঞ্জাবি। নীচে নামিয়া সে পিসীমার কোল ঘেঁষিয়া ছোট ছেলের মতই বসিয়া পড়িল, বলিল, বলো।

পিসীমা তাহাকে ভাল করিয়া দেখিয়া একটু হাসিলেন, সস্নেহে তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া বলিলেন, তোর কাছে আমি একটি জিনিস চাইব শিবু। বল্, দিবি।

শিবনাথ হাসিয়া ফেলিল। পিসীমার পাশেই বসিয়া গৌরী; মুহূর্তে শিবনাথ বুঝিয়া লইল, পিসীমা কি চাহেন,—গৌরীর দোষের জন্য ক্ষমা। গৌরীর ঘোমটার ফাঁক দিয়া একটি পুলকিত চকিত কটাক্ষ হানিয়া সে বলিল, প্রতিজ্ঞা করতে হবে? বেশ, তাই করলাম, বলো, কি দিতে হবে?

নিত্য সহসা বলিয়া উঠিল, না দাদাবাবু।

শৈলজা ডাকিয়া বলিলেন, নিত্য!

নিত্য স্তব্ধ হইয়া গেল। শিবু একটু বিস্মিত হইল; সে ভাল করিয়া কিছু বুঝিবার পূর্বেই পিসীমা বলিলেন, আমায় ছুটি দে বাবা।

শিবনাথের মুখ বিবর্ণ হইয়া উঠিতেছিল, সে সবিস্ময়ে শুধু দুইটি অক্ষরে একটি প্রশ্ন করিল, ছুটি?

হ্যাঁ, ছুটি। আমার ডাক এসেছে বাবা, আমার যেতে হবে; আমায় এইবার মুক্তি দাও তোমরা।

এক ঝলক হিমতীক্ষ্ণ বাতাস আসিয়া যেন শিবুকে মুহূর্তে অসাড় করিয়া দিল। পিসীমা বলিলেন, আমি কাশী যাব বাবা। আজ কদিন থেকেই আমার গুরু যেন স্বপ্নে আমাকে বলছেন, আর কতদিন আমায় ভুলে থাকবি? আয়, তুই কাশী আয়।

ধীরে ধীরে আত্মসম্বরণ করিয়া আত্মস্থ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিবুর মনে সমস্ত দিনের উষ্ণ আবেগ বিদ্রোহের শিখা তুলিয়া জ্বলিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল, গুরুর আহ্বান নয়, গৌরীর আগমনই তাঁহার এই বৈরাগ্যের হেতু। চোখ-মুখ তাহার রক্তোচ্ছ্বাসে থমথমে হইয়া উঠিল। কিন্তু উত্তেজনার মুখে আত্মসমর্পণ করা তাহার স্বভাব নয়, সে কঠোর সংযমের সহিত আপনাকে শান্ত করিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। তারপর বলিল, আমাদের বন্ধন কি তোমাকে পীড়া দিচ্ছে পিসীমা? না, ওপরের আকর্ষণে এ বন্ধন আর সত্যিই রাখা যায় না?

পিসীমা চমকিয়া উঠিলেন, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে শিবুর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,

এতকাল পরে আমার কথা তোর মিথ্যে বলে মনে হল শিবু? সঙ্গে সঙ্গে তিনি একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন।

শিবু ধীর স্বরেই বলিল, স্বপ্ন মনের বিকার পিসীমা, সত্যি হয় না কখনও, তাই বলছি।

মনের জটিল রহস্যময় গহনে যে কামনা গুরু-মূর্তিতে শৈলজা দেবীকে আহ্বান জানাইয়াছে, তাহাই তাঁহার মনকে করিয়া তুলিয়াছে শান্ত দৃঢ়তায় অনমনীয় কঠিন, কোনরূপেই তাহার পরিবর্তন সম্ভবপর নয়। তিনি অবিচলিত দৃঢ়তার সহিত বলিলেন, ও কথা বোলো না বাবা শিবু। তুমি বিশ্বাস না কর, আমি বিশ্বাস করি। তাঁকে আমি প্রত্যক্ষ দেখেছি, তাঁর আদেশ আমি অবহেলা করতে পারি না। আমি যাব, তুমি বাধা দিও না।

শিবু বহুক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিল, মনের আকাশের কোন্ অদৃশ্য কোণে মেঘ জমিয়া আছে, সেখান হইতে বিদ্যুৎ-চমকের আভা মুহুর্মুহু বিচ্ছুরিত হইতেছিল, শিক্ষা-দীক্ষা সমস্ত কিছুর চোখ যেন সে আভায় ধাঁধিয়া যাইতেছে। তবুও সে ধীরভাবে বিচার করিতে চেষ্টা করিল। সে যেন ভাল করিয়াই অনুভব করিল, গৌরী ও পিসীমার একত্রে বাস অসম্ভব। কেহ কাহাকেও সহ্য করিতে পারিবে না।

পিসীমা আবার বলিলেন, শিবু!

পিসীমা!

তুমি আমায় মুক্তি দিতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছ।

শিবুর অন্তর একটা প্রদীপ্ততর বিদ্যুৎ-চমকে ঝলকিয়া উঠিল, এবার সুদূরশ্রুত মেঘ গর্জনের ধ্বনিও যেন শোনা গেল; গভীর স্বরে শিবু বলিল, বেশ, তাই হবে। যাবে তুমি।

গলাটা এবার পরিষ্কার করিয়া লইয়া শৈলজা বলিলেন, আজ ভোরেই আমি যাব বাবা। আমি মাস্টারকে বলে রেখেছি, সে-ই রেখে আসবে।

উত্তরে শিবু কেবল বলিল, আজই!

হ্যাঁ, আজই। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া শৈলজা দেবী আবার বলিলেন, ওপরের আকর্ষণ যদি না হয় শিবু, বিশ্বনাথ আমাকে স্থান দেবেন কেন? মরতেও আবার আমাকে ফিরে আসতে হবে।

শিবু বলিল, বেশ, তাই হবে, আজই যাবে। সঙ্গে সঙ্গেই সে নিত্যকে ডাকিয়া বলিল, নিত্য, মাস্টার মশায়কে ডাক্ তো। রতনদি, তুমি একবার আলোটা ধরো তো ভাই, আয়রন-চেস্টটা খুলতে হবে।

টেবিলের উপর রেশমী নীলাভ শেড দেওয়া একটি টেবিল-ল্যাম্প জ্বলিতেছিল। শিবনাথ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া পিসীমার কথাই ভাবিতেছিল। কিন্তু চিন্তার মধ্যে একটি ধারাবাহিকতা ছিল না। থাকিয়া থাকিয়া চঞ্চল হইয়া ব্যগ্র চকিত দৃষ্টিতে সম্মুখের দুয়ারের দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল।—গৌরী আসিবে। কথাটা মনে করিবামাত্র দেহের শিরায় শিরায় এক শিহরণ ছুটিয়া চলিতেছে।

ঝুনঝুন, খসখস—একটা শব্দ সিঁড়ির উপর বাজিয়া উঠিতেই অস্থির উত্তেজনায় শিবনাথ উঠিয়া দাঁড়াইল। সকল স্মৃতি যেন বিস্মৃতির অন্ধকারের মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে। সমস্ত দৃষ্টির মধ্যে গৌরী এবং সে ছাড়া আর কাহারও যেন অস্তিত্ব পর্যন্ত নাই। পায়ের তলায় ধরিত্রী যেন দুলিতেছে, গৌরী এবং তাহাকে দোলা দিবার জন্যই যেন দুলিতেছে। অস্ফুট কণ্ঠে সে আবৃত্তি করিল, "দে দোল—দোল, প্রিয়ারে আমার পেয়েছি আজিকে, ভরেছে কোল! দে দোল—দোল!"

সেই মুহূর্তটিতেই শঙ্কিত সন্তর্পিত পদক্ষেপে গৌরী ঘরে প্রবেশ করিল; তাহার কাপড়ের মৃদু সেন্টের গন্ধে শিবনাথের বুক ভরিয়া গেল, চুড়ির মৃদু শব্দে তাহার মনে সুর জাগিয়া উঠিল। টেবিল-ল্যাম্পের শিখাটা আরও বাড়াইয়া দিয়া সে গৌরীর দিকে চাহিল। সেই নীলাভ আলো মুখে মাখিয়া কিশোরী গৌরী শিবনাথের সম্মুখে দাঁড়াইল। তাহার পরনে নীলাম্বরী শাড়ি, গৌরবর্ণ মসৃণ ললাটে একটি গাঢ় সবুজ মণিখণ্ডের মত কাচপোকার টিপ, চোখের কালো তারায় বিচিত্র দৃষ্টি। গৌরীর সর্ব-অবয়বের মধ্যে এইটুকু শিবুর চোখে পড়িল।

গৌরীর ক্ষুদ্র বৃহৎ ত্রুটি-বিচ্যুতির গুরুতর অপরাধের কৈফিয়ত লইবার জন্য যে জাগ্রত কর্তব্যজ্ঞান কঠোর তপস্বীর মত বিনিদ্র তপস্যায় মগ্ন ছিল, তাহার ধ্যান ভাঙিয়া গেল, মোহগ্রস্তের মত আত্মহারা হইয়া ঢলিয়া পড়িল। শিবনাথ অভিযোগ করিল না, সম্ভাষণ করিল না, নীরবে উঠিয়া দাঁড়াইয়া গৌরীকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইল।

কতক্ষণ কাটিয়া গেল। পরস্পরের বাহুপাশে আবদ্ধ হইয়াই দুইজনে সোফাটার উপর ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। এক সময় হাতে একটা যন্ত্রণা অনুভব করিয়া শিবনাথ জাগিয়া উঠিল, গৌরীর খোঁপার একটা কাঁটা তাহার হাতের উপর বিঁধিবার উপক্রম করিয়াছে। ধীরে ধীরে গৌরীর মাথাটি সরাইয়া দিয়া সে হাতটা টানিয়া লইয়া আপন মনেই মৃদু হাসিল। সহসা তাহার মনে হইল, বারান্দায় কে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে!

আপন অভ্যাসমত ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সে প্রশ্ন করিল, কে?

বারান্দা হইতে শৈলজা ঠাকুরানীর কণ্ঠস্বর শুনিয়া শিবু চমকিত হইয়া উঠিল; তিনি প্রশ্ন করিলেন, দেখ্ তো বাবা, কটা বাজল? রাত তিনটে কি বাজে নি এখনও?

শিবু ঘড়িতে দেখিল, সবে বারোটা বাজিতেছে। সে বলিল, এই সবে বারোটা, এখনও অনেক দেরি, শোও গিয়ে এখন।

শৈলজা দেবী গিয়া বিছানায় শুইলেন। কিন্তু আবার কি মনে করিয়া উঠিয়া বসিয়া জপ করিতে আরম্ভ করিলেন।

রাত্রি তিনটার গাড়িতে শৈলজা ঠাকুরানী কাশী রওনা হইয়া গেলেন। শিবনাথ সঙ্গে সঙ্গে স্টেশন পর্যন্ত গিয়া তাঁহাকে ট্রেনে তুলিয়া দিল।

শেষরাত্রির অন্ধকারে কাহারও মুখ স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল না, তবু প্রণাম করিয়াও শিবু নত মাথা তুলিল না, বলিল, পিসীমা!

পিসীমা তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া বলিলেন, অন্যায়-অধর্মকে কখনও আশ্রয় কোরো না বাবা।

গাড়ির বাঁশি বাজিল।

পঁচিশ

কয়দিন পর। বেলা তখন প্রায় আটটা। শিবনাথ কাছারির বারান্দায় চিন্তান্বিত মুখে বসিয়া ছিল। সে ভাবিতেছিল পিসীমার কথা। কাজটা কি ভাল হইল? পরদিন প্রভাত হইতেই সে কথাটা ভাবিতেছে। এ চিন্তার হাত হইতে কোনক্রমেই যেন নিস্তার নাই। পিসীমার অভাব যে আজ চারিদিকে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। সমস্ত বাড়িখানার গতিধারাই যেন পালটাইয়া গিয়াছে। আর তাহার মনে এ কি কঠিন আত্মগ্লানি! তাহার মাথা হেঁট হইয়া পড়ে। গৌরী ও পিসীমার মধ্যে এমন নির্লজ্জ অকৃতজ্ঞতার সহিত গৌরীকে বড় করিয়া তুলিল কি করিয়া? কিন্তু পিসীমাও যে গৌরীকে কোনমতেই সহ্য করিতে পারিলেন না। গৌরীকেই বা বিসর্জন দিবে সে কোন্ ধর্ম, কোন্ নীতি অনুসারে?

রাখাল সিং আসিয়া তাহার এই চিন্তায় বাধা দিয়া বলিলেন, একটা যে মুশকিল হয়েছে বাবু।

মুশকিল!—বিস্মিত হইয়া শিবনাথ রাখাল সিংয়ের মুখের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, কি মুশকিল?

মাথা চুলকাইয়া রাখাল সিং বলিলেন, মানে, এই একটা অস্থাবর—বাকি সেসের সাট্টিপিট এসে গিয়েছে।

সেসের সার্টিফিকেট? সেস কি আমাদের দাখিল করা হয় নি?

আমাদের, আজ্ঞে, সেস সমস্ত পাই-পয়সা মিটিয়ে দেওয়া আছে।

তবে?

মানে, এ আপনার শরিকান মহলের সেস, অন্য কোন শরিক বাকি ফেলেছে আর কি। আর সাট্টিপিট আপিসের ব্যাপার তো, দিয়েছে উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপিয়ে।

হুঁ। কত টাকা লাগবে? দিয়ে দিন তা হলে।

আবার রাখাল সিং মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিলেন, মানে, সেই তো হয়েছে মুশকিল। লাগবে আপনার একশো বারো টাকা পাঁচ আনা তিন পাই। তা, মজুত তো এত হবে না।

শিবনাথ চমকিয়া উঠিল, সে কি, সামান্য এক শত বারো টাকা পাঁচ আনা তিন পাইও তাহার ঘরে জমা নাই? এমন কথা তো স্বপ্নেও সে ভাবিতে পারে নাই।

রাখাল সিং বলিলেন, মানে এস্টেটে টাকা দাঁড়াতে সময় পেলে কই? এই ধরুন, আপনার বিয়েতে মোটা টাকা খরচ গেল, তারপর আপনার মায়ের শ্রাদ্ধে তিন হাজারের ওপর খরচ। আর যুদ্ধের বাজার, এক টাকার জিনিসের দাম তিন টাকা হয়েছে। খরচ বেড়েছে তিন গুণ, আয় আপনার সেই একই। আবার সেদিন পিসীমা গেলেন, তাঁর জন্যে দেওয়া হয়েছে একশো টাকা।

হুঁ, তা হলে উপায়?

গোটা পাঁচেক টাকা ঘুষ দিয়ে ফিরিয়ে দিই আজকে।

চকিতের মধ্যে শিবনাথের একটা পরিবর্তন ঘটিয়া গেল, মুহূর্তে তাহার চিন্তান্বিত বিমর্ষতা কোথায় চলিয়া গেল, আত্মচেতনার গাম্ভীর্যে তাহার সর্বাঙ্গ যেন জাগ্রত হইয়া উঠিল, মাথা তুলিয়া রাখাল সিংয়ের মুখের দিকে উষ্ণ দৃপ্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, না।

সে দৃষ্টিতে রাখাল সিং সঙ্কুচিত হইয়া চুপ করিয়া গেলেন। শিবনাথ আবার চিন্তান্বিতভাবে সম্মুখের দিকে দৃষ্টি ফিরাইল। সহসা খামার-বাড়ির ধানের মরাইগুলি তাহার চোখে আজ এক বিশিষ্ট রূপ লইয়া যেন ধরা দিল। ওই তো! ওই তো স্তূপীকৃত সম্পদ খড়ের আবরণের তলে সঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে। সে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, ধান বেচে ফেলুন দেড়শো—দেড়শো কেন, দুশো টাকার।

মাথা চুলকাইয়া রাখাল সিং বলিলেন, ধান!

হ্যাঁ।

কিন্তু এ বছরের গতিক তো বেশ ভাল নয়, ওদিকেও দু বছর ধান তেমন সুবিধে হয় নি। মানে, এখন কার্তিক মাসে জল না হলে আবার—। সঙ্কোচে তিনি কথা শেষ করিতে পারিলেন না।

শিবনাথ এবার বিরক্ত হইয়া উঠিল, সকাল অবধি পর পর বিমর্ষ বিষণ্ণ চিন্তার ভারে তাহার মন ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে, এ ভারের লাঘব হইলে সে বাঁচে। তাই ভবিষ্যতের ভাবনায় সদ্য-উদ্ভাবিত উপায়টিকে নাকচ করার প্রস্তাবে সে বিরক্ত না হইয়া পারিল না, তবুও যথাসাধ্য সে ভাব গোপন করিয়া বলিল, যদিগুলো এখন বাদ দিন সিং মশায়; ভবিষ্যতে কি হবে, না হবে, সে ভাবনা এখন থাক। এখন যা বলছি, তাই করুন।

রাখাল সিং আর প্রতিবাদ না করিয়া চলিয়া গেলেন। সদ্য এই উদ্বেগকর চিন্তাটা হইতে নিস্তার পাইয়া শিবনাথ আবার পিসীমার কথা ভাবিতে বসিল। পিসীমার অভিমান-ত্রুটি বৈশাখের অপরাহ্ণের মেঘের মত পরিধিতে ধীরে ধীরে তাহার মানস-লোকে বাড়িয়া উঠিতেছিল। কিন্তু তবুও কেমন একটি বিমর্ষ উদাস ভাবের আচ্ছন্নতা হইতে সে কোনরূপেই আপনাকে মুক্ত করিতে পারিল না। সংক্রামক রোগের ছোঁয়াচ লাগিলে গঙ্গাস্নানে শুচি হইয়াও যেমন তাহার প্রভাব অতিক্রম করা যায় না, তেমনই

ভাবেই ওই চিন্তার বীজ তাহার অন্তরে সংক্রামিত হইয়া বসিয়াছিল, উদাসীন বিমর্ষতা তাহার প্রভাব; কোনরূপেই সে প্রভাবকে কাটানো যায় না।

কিছুক্ষণ পরেই রাখাল সিং আবার আসিয়া দাঁড়াইলেন, তাঁহার পিছনে গ্রামেরই একজন ধান-চালের কারবারী। লোকটি হেঁট হইয়া শিবনাথকে একটি নমস্কার বা প্রণাম জানাইল। রাখাল সিং বলিলেন, তা হলে—

শিবনাথ তাঁহার অসমাপ্ত কথা বুঝিয়া লইয়া বলিল, হ্যাঁ, দিয়ে দিন ধান।

মাথা চুলকাইয়া রাখাল সিং বলিলেন, মানে, দর ঠিক হল তিন টাকা।

বেশ।

ব্যবসায়ী বলিল, সে আপনি বাজার যাচাই করে দেখুন কেনে। এক পয়সা কম বলে থাকি দু পয়সা বেশি দোব আমি। সে জুয়োচ্চুরি কেষ্টগতির কুষ্টিতে লেখে নাই। কেউ যদি সে কথা প্রমাণ করতে পারে তো পঞ্চাশ জুতো খাব আমি।

ঈষৎ হাসিয়া শিবনাথ বলিল, তুমি খেতে চাইলেও আমি সে মারতে পারব না দত্ত। আর যাচাই করবারও দরকার নেই। কাজ সেরে নাও।

দত্ত তৎক্ষণাৎ বসিয়া পড়িয়া কাপড়ের খুঁট খুলিতে খুলিতে বলিল, টাকাটা গুনে নিন, টাকা আমি নিয়েই এসেছি। এদিকের কাজ আপনার মিটে যাক, তারপর ধান নোব আমি। গাড়ি বস্তা নিয়ে আমি আসছি।

রাখাল সিং টাকাগুলি গুনিয়া বাজাইয়া লইতে আরম্ভ করিলেন। দত্ত বলিল, আমার বাবু, ঝাড়া-ঝাপটা কাজ; টাকা আমার আগাম, জিনিস বরং দু দিন পরে হয়, তাও আচ্ছা। কেউ যে বলবে, ওই ব্যাটা কেষ্টগতির কাছে একটা পয়সা পাব, সে কাজ করা আমার কুষ্টিতে লেখে নাই। তা হলে পেনাম। আমি আসছি লোকজন বস্তা গাড়ি নিয়ে। আবার তেমনই একটি প্রণাম করিয়া দত্ত চলিয়া গেল।

অস্থাবরের টাকা মিটাইয়া দেওয়া হইল, রসিদ লওয়া হইল। মিটিয়া গেলে সার্টি-ফিকেটবাহী পিওনটা লম্বা সেলাম করিয়া বলিল, হুজুর, আমার পাওনাটা হুকুম করে দ্যান।

সবিস্ময়ে শিবনাথ বলিল, তোমার পাওনা?

আবার একটা সেলাম করিয়া সে বলিল, হুজুরের দরবারে আমরা বকশিশ থোড়াথুড়ি পেয়ে থাকি।

শিবনাথ সবিস্ময়ে লোকটাকে দেখিতেছিল, লোকটার এক চোখ কানা, লোকটা যেমন বিনীত, তেমনই যেন ক্রূর। অদ্ভুত লোক! তবুও সে তাহার নিবেদন অগ্রাহ্য করিল না, বলিল, ওকে একটা টাকা দেবেন সিং মশায়।

ধান বিক্রয় শেষ হইতে বেলা প্রায় একটা বাজিয়া গেল। শিবনাথ বাড়ির মধ্যে

আসিয়া জামা খুলিবার জন্য উপরের ঘরে প্রবেশ করিল। জামা খুলিয়া উদাসভাবেই সে দোতলার খোলা জানালা দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার জীবনের গতিবেগ ওই বিমর্ষ উদাসীনতার মধ্যে সমাহিত হইয়া পড়িয়াছে! শেষ শরতের আকাশ গাঢ় নীল, কোথাও এক ফোঁটা মেঘের চিহ্ন নাই। সাধারণ শরৎ-রৌদ্রের চেয়ে রৌদ্র যেন প্রখরতর হইয়া উঠিয়াছে। কচি কচি গাছগুলির পাতা ম্লান শিথিল হইয়া ভাঙিয়া পড়িয়াছে। গৌরী এক গ্লাস শরবত লইয়া ঘরে প্রবেশ করিল। শরবতের গ্লাসটি শিবনাথের দিকে অগ্রসর করিয়া দিয়া বলিল, হ্যাঁগা, ধান বিক্রি করলে কেন বল তো? ছিঃ ধান বিক্রি করে তো চাষাতে!

কথাটা তীরের মত শিবনাথের অন্তরে গিয়া বিদ্ধ হইল। সচকিত হইয়া সে গৌরীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, অবজ্ঞার সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি রেখায় রেখায় তাহার মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তবুও সে আত্মসম্বরণ করিয়া বলিল, হঠাৎ টাকার কিছু দরকার হয়ে পড়ল; একটা সেসের সার্টিফিকেট এসে পড়েছিল।

সবিস্ময়ে গৌরী প্রশ্ন করিল, সে আবার কি?

গবর্মেণ্টকে জমিদারির খাজনার সঙ্গে সেস দিতে হয়। সেই সেস বাকি পড়লে গবর্মেণ্ট অস্থাবর করে টাকা আদায় করে।

অস্থাবর? যাতে ঘটি-বাটি বিক্রি করে নিয়ে যায়?

হ্যাঁ। কিন্তু টাকা দিলে আর নিয়ে যায় না।

তোমার নামে অস্থাবর এসেছিল? ঘটি-বাটি নিলেম করতে এসেছিল?—গৌরীর কণ্ঠস্বরের ভঙ্গিমায় হতাশা, অবজ্ঞা, ক্রোধের সে এক বিচিত্র সংমিশ্রণ! পর-মুহূর্তেই গৌরী কাঁদিয়া ফেলিল। শিবনাথ লজ্জায় মাথা হেঁট না করিয়া পারিল না। শুধু লজ্জাই নয়, গৌরীর মুখের দিকে চাহিয়া সে শিহরিয়া উঠিল।

মানব-জীবনের মজ্জাগত জীবধর্মের প্রেরণায়, শিরায় শিরায় ফাটিয়াপড়া শোণিত-কণার উষ্ণ আবেগে, যৌবন-স্বপ্নের মোহময় দৃষ্টিতে, নীলাভ আলোর প্রভায় গৌরীকে মনে হইয়াছিল ফুলের মত কোমল সুন্দর, কিন্তু আজ দিনের পরিপূর্ণ আলোকে শিবনাথ গৌরীকে দেখিয়া শঙ্কিত বিস্ময়ে চকিত হইয়া উঠিল। গৌরীর মুখে চোখে, শিবনাথের মনে হইল, তাহার সর্বাঙ্গে দম্ভের উগ্রতা ক্ষুরের ধারের নিষ্ঠুর হাসির মত বিচ্ছুরিত হইতেছে। রাত্রিতে তাহার যে মসৃণ ললাটে আলোর প্রতিবিম্ব ঝলমল করিতেছিল, দিবালোকে শিবনাথ দেখিল, বিরক্তির কুঞ্চনরেখা সেখানে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। রাত্রিতে তাহার যে অধরকোণে আবেগময় হাসি দেখিয়া পৃথিবী ভুলিয়াছিল, প্রভাতে শিবনাথ সেই অধরপ্রান্তে তীক্ষ্ণ শ্লেষের বাঁকানো হাসির মধ্যে ছুরির ধারের শানিত দীপ্তি দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল।

খাওয়া-দাওয়ার পর গৌরী বলিল, দেখ, এক কাজ কর। দাদা আমাকে বলে গেছে, মামাদের আপিসে তুমি চাকরি কর, তুমি লিখলেই দেবে। আপিসে চাকরি করে ব্যবসা শিখে পরে তুমি নিজে ব্যবসা করবে। কিংবা এখনই যদি ব্যবসা কর, মামারা টাকা দেবে, তারপর তুমি শোধ দিও।

শিবনাথ চুপ করিয়া রহিল; সে নীরবে ভাবিতেছিল কমলেশ ও রামকিঙ্করবাবুর কথা। তাহার মনে পড়িয়া গেল, তাহারই বাড়িতে দাঁড়াইয়া রামকিঙ্করবাবুর ক্রোধে রক্তবর্ণ মুখচ্ছবি, কলিকাতার ফুটপাথে দাঁড়াইয়া তাঁহাদের সে ক্রুদ্ধ ভঙ্গিমা, কমলেশের সেদিনের গল্প—কয়লার ব্যবসায়ে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন হইবে। প্রত্যেকটির স্মৃতি তাহার মনে কাঁটার মত বিঁধিতেছিল।

গৌরী আবার বলিল, কথা কইছ না যে?

ম্লান হাসি হাসিয়া শিবনাথ বলিল, ভেবে দেখি।

এর আবার ভাববে কি? চাকরি করবে, রোজগার হবে, এতে ভাববার কি আছে?

শিবনাথ রক্তিমমুখে এবার বলিল, দাসখত লেখবার আগে ভেবে দেখতে হবে বইকি। অন্তত যার পায়ে লিখতে হবে, তার সম্বন্ধেও তো বিবেচনা করতে হবে।

গৌরীর মুখ-চোখও লাল হইয়া উঠিল। সে বলিল, কেন তুমি আমার আত্মীয়-স্বজনদের হেয় কর বল দেখি?

শিবু দৃঢ়স্বরে বলিল, না, হেয় আমি করি নি। তা ছাড়া আরও একটা কথা তুমি জেনে রাখ, আমার জীবনে অর্থ উপার্জনটাই সবচেয়ে বড় জিনিস নয়। তার চেয়েও বড় কাজ আমি করতে চাই।

গৌরী আশ্চর্য হইয়া গেল, কথাটা সম্পূর্ণ সে বুঝিতেও পারিল না, কিন্তু উত্তপ্ত অন্তর লইয়া নিরুত্তর হইয়াও সে থাকিতে পারিল না, বলিল, তাই বলে তোমার হাতে পড়ে আমাকে সুদ্ধু পথে পথে ভিক্ষে করতে হবে নাকি?

শিবনাথ গম্ভীরভাবে বলিল, ভিক্ষে করতে হলে আমিই করে নিয়ে এসে তোমাকে খাওয়াব। ভয় নেই, তোমাকে ভিক্ষে করতে হবে না।

ক্রুদ্ধা গৌরী মুখ বাঁকাইয়া বলিয়া উঠিল, থাক্, আমার জন্য তোমায় ভাবতে হবে না। আমার ব্যবস্থা আমার মা-বাপেই করে গেছেন। তোমার নিজের কথা তুমি ভাব।

শিবনাথ নির্বাক হইয়া ক্রুদ্ধ বিস্ময়ে গৌরীর দিকে পলকহীন দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

দুর্জয় ক্রোধে সে অধীর হইয়া উঠিতেছিল; কিন্তু আপনাকে হারাইয়া ফেলিবার পূর্বেই সে-স্থান ত্যাগ করিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

কাছারি-বাড়িতে আসিয়া সে অসুস্থের মত বসিয়া পড়িল। অবরুদ্ধ ক্রোধ তাহার মাথার মধ্যে যেন আগুনের মত জ্বলিতেছে। সতীশ চাকর আসিয়া সেই মুহূর্তে ঘরে প্রবেশ করিল ; শিবনাথ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল, অত্যন্ত রূঢ় কঠোর স্বরে সে বলিল, কি ? কে তোকে ঘরে আসতে বললে ?

সতীশ সভয়ে থান দুই চিঠি ও খবরের কাগজ প্রভুর সম্মুখে রাখিয়া দিয়া বলিল, আজ্ঞে, ডাক এসেছে।

ডাক ! আত্মসম্বরণ করিয়া শিবনাথ চিঠি ও কাগজখানা তুলিয়া লইল। সতীশ পালাইয়া বাঁচিল। চিঠি দুইখান সদর হইতে উকিল দিয়াছেন। সেগুলা একপাশে সরাইয়া রাখিয়া সে কাগজখানা খুলিয়া বসিল।

উঃ, পশ্চিম-সীমান্তে নিউপোর্ট ইপ্রেস মার্নে বেলফোর্ট ভার্দুন হইয়া ছয় শত মাইলব্যাপী যুদ্ধ চলিয়াছে। প্যারিসের অনতিদূরে জার্মান সৈন্য খুঁটি গাড়িয়া বসিয়াছে। ওদিকে পূর্ব-সীমান্তে প্রায় নয় শত মাইল-বিস্তৃত যুদ্ধক্ষেত্র। লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণ, প্রত্যেক জাতির সমগ্র ধনভাণ্ডার জাতীয় গৌরব-রক্ষার্থে নিয়োজিত হইয়াছে। ভারতবর্ষ হইতে ভারতীয় সৈন্য প্রেরণের পরিপূর্ণ আয়োজন চলিতেছে।

শিবনাথ কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া আকাশের দিকে চাহিল। জাতীয় গৌরব ! জাতি—দেশ, জন্মভূমি ! অকস্মাৎ জীবনে যেন একটা পটপরিবর্তন হইয়া গেল। জীবনের আকাশে কামনার কালবৈশাখীর কালো মেঘে সমস্ত আবৃত হইয়া গিয়াছিল, সে মেঘ কাটিয়া যাইতেই আবার দেখা দিল সেই আকাশ, তাহার সকল জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলী। মনের মধ্যে সুপ্ত বিস্মৃতপ্রায় কামনা আবার তাহার জাগিয়া উঠিল—দেশের স্বাধীনতা।

কিন্তু পথ ? পথ কই ? রক্তাক্ত পথের কথা মনে জাগিয়া উঠিতেই সে শিহরিয়া উঠিল। তাহার মনে পড়িয়া গেল, সেদিনের সেই ঘটনার কথা, অতি সাধারণ আকৃতির এক মহাপুরুষের কথা ; সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে পড়িয়া গেল মাকে। গভীর চিন্তায় আচ্ছন্নের মত বসিয়া থাকিতে থাকিতে সে বাহির হইয়া পড়িল। গ্রাম ছাড়াইয়া মাঠের মধ্য দিয়া সে সেই কালীমাতার আশ্রমের দিকে চলিয়াছিল। সরু আল-পথের দুই দিকে ধানের জমি ; প্রায় কোমর পর্যন্ত উঁচু ধানগাছে মাঠ ভরিয়া উঠিয়াছে। সহসা একটানা একটা সোঁ-সোঁ শব্দে আকৃষ্ট হইয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইল। কোথায় এ শব্দ উঠিতেছে ? কিসের শব্দ ? তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে গভীর মনঃসংযোগ করিয়া সে আবিষ্কার করিল, শব্দ উঠিতেছে জমিতে, অনাবৃষ্টিতে রৌদ্রের প্রখর উত্তাপে জমির জল শুকাইয়া যাইতেছে, মাটি ফাটিতেছে।

উঃ, তৃষ্ণার্ত মাটি হাহাকার করিতেছে ! মাটি কথা কহিতেছে ! মাটি—মা—

দেশ—জন্মভূমি কথা কহিতেছে! চোখ তাহার জলে ভরিয়া উঠিল। হ্যাঁ, কথাই তো কহিতেছে। সে যেন সত্যই প্রত্যক্ষ করিল মৃত্তিকার আবরণের তলে জাগ্রত ধরিত্রী-দেবতাকে চোখের সম্মুখে স্থতার মত ফাটলের দাগগুলি ক্রমশ মোটা হইয়া সুদীর্ঘ রেখায় অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। শস্যগর্ভা ধানের গাছের দীর্ঘ পাতাগুলি ম্লান হইয়া মধ্যস্থলে যেন ভাঙিয়া পড়িয়াছে। লক্ষ্মী দেহত্যাগ করিয়াছেন।

এ ধ্যানও তাহার ভাঙিয়া গেল একটা আকস্মিক কোলাহলে। দৃষ্টি তুলিয়া সে দেখিল, সম্মুখেই কিছু দূরে দুইটা লোকের মধ্যে ক্রুদ্ধ বাক্যবিনিময় হইতেছে। সহসা একজন অপরের গালে সজোরে একটা চড় মারিয়া বসিল। সঙ্গে সঙ্গে প্রহৃত লোকটা কি একটা উদ্যত করিল। শিবনাথ দূর হইতেও বেশ বুঝিল, সেটা কোদালি। সে চিৎকার করিয়া উঠিল, এই এই এই! সঙ্গে সঙ্গে নিজেও ছুটিয়া সেই দিকে অগ্রসর হইল। তাহার চিৎকারে ফল হইল, বিবদমান লোক দুইটি তাহাকে চিনিয়া পরস্পরের দিকে আক্রোশভরা দৃষ্টিতে চাহিয়া নিরস্ত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

শিবনাথ আসিয়াই বলিল, সর্বনাশ! করছ কি? খুন হয়ে যেত যে এখুনি।

লোক দুইটি উভয়েই চাষী; শিবনাথকে দেখিয়া তাহারা দুইজনেই ঈষৎ সরিয়া দাঁড়াইল; প্রহৃত ব্যক্তিটি বলিয়া উঠিল, আপনি তো দেখলেন বাবু, ওই তো আমাকে আগুতে চড়িয়ে দিলে! ব্যাটার বাড় দেখেন দেখি!

অপরজন বলিয়া উঠিল, মারব না? আমার জল চুরি করে ঘুরিয়ে নিলি কেনে?

জল তোর বাবার? আমার ধান মরে যাবে, আর লালার জল ও একলা নেবে!

পাশেই একটি নালায় ঝরনার জল অতি ক্ষীণ ধারায় বহিয়া চলিয়াছে, সেই জল লইয়া ঝগড়া। লোকটা তখনও বলিতেছিল, আমার গদ্‌গদে পোড়ওয়ালা ধান শুকিয়ে মরে যাবে, আর ওর ধান একা শিষ দুলিয়ে পেকে ঢলে পড়বে! লোকটি অকস্মাৎ কাঁদিয়া ফেলিল।

শিবনাথ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, আচ্ছা, মাঠে জল দেবার কি কোনও উপায় নেই?

চোখ মুছিতে মুছিতে লোকটি বলিল, আজ্ঞে, দেবতার জল না হলে কি পৃথিবীর শোষ মেটে? তবে আপনকারা দয়া করলে কিছু কিছু বাঁচে। পুকুরের জল যদি ছেড়ে দ্যান আপনকারা।

আমাদের পুকুর?

আজ্ঞে না। এ মাঠে আপনকাদের পুকুরের জল আসবে না; তবে সব বাবুরাই আপন আপন পুকুরের জল ছেড়ে দ্যান তো সব মাঠই কিছু কিছু বাঁচবে।

শিবনাথ তাহাদের আশ্বাস দিয়া কলহ করিতে নিরস্ত করিয়া বাড়ির দিকে

ফিরিল। পথের দুই ধারের জমি হইতে একটানা সোঁ-সোঁ শব্দ নির্জন প্রান্তরের বায়ুস্তরের মধ্যে মিলাইয়া যাইতেছে। মাঠ শেষ হইল, শুষ্ক শস্যহীন পতিত ডাঙাটায় ধুলা উড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। প্রান্তরের পর গ্রাম আরম্ভ হইল, মানুষের বসতির কলরব ছাড়া আর কিছু শোনা যায় না। কিন্তু শিবনাথের কানে তখনও যেন ধ্বনিত হইতেছিল ওই সোঁ-সোঁ শব্দ; জল চাহিতেছেন, মৃত্তিকাময়ী মা—সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা তৃষ্ণায় চৌচির হইয়া ফাটিয়া যাইতেছেন!

কাছারি-বাড়িতে আসিয়া সে ডাকিল, সিং মশায়!

সেরেস্তা-ঘরে বসিয়া রাখাল সিং কাগজ লিখিতেছিলেন, শিবনাথের ডাক শুনিয়া চশমাটা নাকের ডগায় টানিয়া দিয়া ভ্রূ ও চশমার ফাঁকের মধ্য দিয়া দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া আসিয়া দাঁড়াইলেন, আমাকে বলছেন?

হ্যাঁ। কেষ্ট সিংকে ডাকুন, এখানকার মহলে ঢোল দিয়ে দিন, আমাদের যত পুকুর আছে, সমস্ত পুকুরের জল আমরা ছেড়ে দোব। কিন্তু তারা মারামারি করতে পারবে না, একটা করে পঞ্চায়েত করে দিন, তারাই জল ভাগ করে দেবে।

রাখাল সিং বিস্ময়ে চোখ দুইটা বিস্ফারিত করিয়া বলিলেম, সে কি!

হ্যাঁ, মাটি ফাটছে, চৌচির হয়ে গেল। ধান বাঁচবে না।

কিন্তু বহু টাকার মাছ নষ্ট হবে যে!

উপায় নেই। মাছ মরে, আবার হবে। মাটি ফেটে যাচ্ছে। ধান মরে গেলে মানুষ বাঁচবে না।

কত টাকার মাছ নষ্ট হবে, জানেন?

জানি না। কিন্তু জল দিতেই হবে। অন্যান্য মহলেও লোক পাঠিয়ে দিন; যেখানে যত পুকুর আছে আমার, মহল বে-মহল যেখানে হোক, জল ছেড়ে দেওয়া হবে।

শিবনাথ বাড়ির মধ্যে চলিয়া গেল। দ্বিপ্রহরের মনের গ্লানি নিঃশেষে মুছিয়া গিয়াছে। রাখাল সিং আপন মনেই ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, উঁহু, বে-মহলে ছেড়ে দোব কেন? কিসের গরজ আমাদের? মহলে বরং—তাও প্রজারা সব কড়ার করুক যে, খাজনাটি ঠিক দেবে, তবে দোব। দেওয়া উচিতও বটে, রাজধর্মও বটে। কি বল হে কেষ্ট?

কেষ্ট বলিল, কি বলব, মশায়? হুকুম তো শুনলেন? সহসা সে দারুণ আক্ষেপভরে বলিয়া উঠিল, সায়েরের এক-একটা মাছ বারো সের চৌদ্দ সের—আধ মণ পর্যন্ত কাতল দু-চারটে আছে।

রাখাল সিং বলিলেন, ক্ষেপেছ তুমি, সায়েরের মাছের জল না রেখে আমি জল দোব! সে করতে গেলে চাকরি আমি ছেড়ে দোব।

গৌরী বিছানায় চুপ করিয়া শুইয়া ছিল। শিবনাথ ঘরে ঢুকিয়া হাসিয়া বলিল, কি রকম, এখনও শুয়ে রয়েছ যে?

নির্লিপ্তভাবে গৌরী উত্তর দিল, আছি।

একটু চা করে দেবে?

বল না বামুন-ঠাকুরুনকে, কি নিত্যকে।

তুমিই বলে দাও। আমি আর পারি না, যেন স্নান করে উঠেছি।

বিছানা ছাড়িয়া গৌরী বলিল, যাওয়া হয়েছিল কোথায় এই রোদের মধ্যে?

মাঠে—বলিতে বলিতেই আবেগে শিবনাথের বুক ভরিয়া উঠিল, সে বলিল, জানো গৌরী, মাঠে গিয়ে আশ্চর্য হয়ে গেলাম, মনে হল, মাটি যেন কথা কইছে, জল শুকিয়ে মাঠের জমি ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে। মানুষ যেমন তেষ্টায় হা-হা করে, মাঠের মাটির মধ্যে তেমনই শব্দ অবিরাম উঠছে!

গৌরী বলিল, আমরা তো আমরা, আমাদের চোদ্দপুরুষে এমন কথা কখনও শোনে নি।—বলিয়া সে বাহিরে যাইবার উপক্রম করিল। শিবনাথ ক্ষুণ্ণ হইলেও বুঝিল, এটুকু গৌরীর অভিমান। সে খপ করিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিল, রাগ হয়েছে? শোনো শোনো।

না। আমরা সব ছোটলোক, ওসব বড় কথা আমরা বুঝি না। ছাড়ো ছাড়ো, চা করে আনি।—বলিয়া হাতটা সজোরে টানিয়া লইয়া চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পর চায়ের কাপ লইয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল, আবার এ কি হুকুম হয়েছে?

সবিস্ময়ে শিবনাথ বলিল, কি?

সমস্ত পুকুরের জল ছেড়ে দেবে নাকি?

হ্যাঁ, বলেছি। তুমি মাঠের অবস্থা দেখ নি গৌরী—

মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া অসহিষ্ণু গৌরী বলিল, দরকার নেই আমার দেখে। কিন্তু পুকুরের মাছ কি হবে শুনি?

আবেগময় কণ্ঠে শিবনাথ বলিল, মানুষ মরে যাবে গৌরী, ধান না হলে মানুষ মরে যাবে।

কিন্তু মাছের যে টাকাটা লোকসান হবে, সে কে দেবে?

লোকসান স্বীকার করতে হবে, না করে উপায় নেই। ধান না হলে দুর্ভিক্ষ হবে, আমরাও হয়তো খেতে পাব না।

বাবাঃ, তোমার ধানের চরণেও প্রণাম, তোমার জমিদারির চরণেও প্রণাম।

শিবনাথ চুপ করিয়া রহিল, এ কথার কোনও উত্তর দিল না। কিন্তু আবার তাহার মন ধীরে ধীরে অস্থির হইয়া উঠিতেছিল ; এইটুকু কিশোর বয়সে স্বার্থের এমন লোলুপতা দেখিয়া তাহার সমস্ত অন্তর দুঃসহ ক্ষুব্ধতার গ্লানিতে ভরিয়া উঠিল।

গৌরী আবার বলিল, এইজন্যে বলেছিলাম, চাকরি কর। চাকরি করলে কলকাতায় সুখে স্বচ্ছন্দে আরামে থাকবে। আজ না জল নেই, কাল না ধান নেই, পরশু না অমুক নেই—এ ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হবে না। এখানকার টাকা জমবে, অবস্থার উন্নতি হবে।

শিবনাথ দৃঢ়স্বরে বলিল, সে হবে না গৌরী, সে আশা তুমি ত্যাগ করো। এ মাটি ছেড়ে আমি কোথাও যেতে পারব না।

শিবনাথ নিজে দাঁড়াইয়া তাহার নিজের সমস্ত পুকুরের মুখ কাটাইয়া দিল। প্রত্যহ প্রভাতে ঘোড়ায় চড়িয়া গ্রামে গ্রামান্তরে ঘুরিয়া নিজের প্রত্যেকটি পুকুরের জল নিঃশেষে মাটির তৃষ্ণা নিবারণের জন্য ছাড়িয়া দিল। মাছ কিছু বিক্রয় হইল, অধিকাংশই নষ্ট হইয়া গেল। রাখাল সিং, কেষ্ট সিং চোখের জল না ফেলিয়া পারিল না। রাখাল সিং অনেক বিবেচনা করিয়া পিসীমাকে চিঠি লিখিলেন ; কিন্তু সে পত্রের জবাব আসিল না। শেষে তিনি চণ্ডীদেবীর গদিয়ান গোসাই-বাবাকে গিয়া ধরিলেন। গোসাই-বাবা বলিলেন, উ তো হামি পারবে না ভাই রাখাল সিং, দান-ধরমমে হামি বাধা কেমন করিয়ে দিবে দাদা ?

মাস্টার রতনবাবু আসিয়া মহা উৎসাহে শিষ্যের সহিত কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া গেলেন। বলিলেন, গ্রেট, গ্রেট, দিস ইজ রিয়েলি গ্রেট! আই অ্যাম প্রাউড অব হিম, আই অ্যাম হিজ টীচার।

রাখাল সিং বলিলেন, বাংলা করে বলুন মশায়, ইংরিজী-ফিংরিজী আমি বুঝি না।

রতনবাবু বলিলেন, এই হল বড় মানুষ, সত্যিকারের বড় মানুষ। আমি শিবুর শিক্ষক, আমার অহঙ্কার হচ্ছে।

রাখাল সিং কিছুক্ষণ তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, তবে তো আপনি খুব বললেন মশায়! কাপড় ফাটল আর ফুটল, ধোপার কি ? সেই বিত্তান্ত! —বলিয়া তিনি রাগ করিয়া স্থানত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

শিবনাথের দৃষ্টান্তে আরও অনেকেই জল ছাড়িয়া দিলেন। কিন্তু ক্রোশ-ক্রোশব্যাপী শস্যক্ষেত্রের অনুপাতে সে জল কতটুকু! ঐরাবতের বুক-ফাটা তৃষ্ণার সম্মুখে গোষ্পদের জল কতটুকু!

সেদিন গ্রামান্তরে পুকুর কাটাইয়া দিয়া সে ফিরিতেছিল, বেলা তখন প্রায় আড়াইটা বাজিয়া গিয়াছে। শরীরের অপেক্ষা মন তাহার অধিক ক্লান্ত; হতাশার ভারে মন যেন মাটিতে লুটাইয়া পড়িতে চায়। ঘোড়াটাও মন্থর গমনে চলিয়াছিল, ক্ষুধার তৃষ্ণায় শক্তিমান বাহনটিও ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। শিবনাথ শুনিল, দুই পাশের জমি হইতেই আবার সেই সোঁ-সোঁ শব্দ উঠিতেছে। সে আশ্চর্য হইয়া গেল, কাল এই সব জমিতে জল দেওয়া হইয়াছে! ইহার মধ্যে আবার তৃষ্ণা জাগিয়া উঠিয়াছে! সে দ্রুতবেগে ঘোড়াটা চালাইয়া দিল। বাড়িতে আসিয়া ঘোড়াটা ছাড়িয়া দিল ও কাছারির ভিতর দিয়া অন্দরের দিকে অগ্রসর হইল। সতীশ চাকর খানকয়েক চিঠি তাহার হাতে দিল, ডাকে আসিয়াছে।

একখানা তাহার মামার বাড়ির চিঠি। দ্বিতীয়খানা খুলিয়া দেখিল, সেখানা লিখিয়াছেন গৌরীর দিদিমা। লিখিয়াছেন, গৌরী অনেকদিন গিয়াছে, তাহাকে একবার লইয়া আসিতে চাই। গৌরী লিখিয়াছে—তাহার শরীর নাকি খারাপ। অতএব ভায়াজীবন, গৌরীকে লইয়া অতি সত্বর তুমি এখানে আসিবে।

তাহার ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল, গৌরী লিখিয়াছে, তাহার শরীর খারাপ! মনশ্চক্ষে সে গৌরীকে আপাদমস্তক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখিয়া লইল, গৌরীর রঙ অবশ্য একটু ময়লা হইয়াছে, কিন্তু স্বাস্থ্য যে পরিপূর্ণ নদীর মত ভরিয়া উঠিয়াছে! সে বাড়ির ভিতরে আসিয়া চিঠিখানা গৌরীর হাতে দিয়া বলিল, তোমার নাকি শরীর খারাপ?

উত্তপ্ত পরিশ্রান্ত শিবনাথের কথার সুরের মধ্যে জ্বালা যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। গৌরী এক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া মাথা তুলিয়া বলিল, শরীর খারাপ লিখব না তো কি লিখব যে, এ রকম মহাপুরুষের কাছে আমি থাকতে পারছি না, তোমরা আমায় নিয়ে যাও?

কেন?—দুরন্ত ক্রোধে শিবনাথের মাথাটা যেন ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম হইল।

কেন আবার কি? মহাপুরুষেরা আবার কোন্ কালে স্ত্রী নিয়ে ঘর-সংসার করে? তার চেয়ে আমার সরে যাওয়াই ভাল; তুমি কেন সংসার ছাড়বে?

বেশ। তা হলে কালই যাবে, মাস্টার মশায় তোমাকে রেখে আসবেন।—বলিয়া সে মাথায় তেল না দিয়াই স্নানের ঘরে ঢুকিল, রুক্ষ মাথার উপরে হুড়হুড় করিয়া ঠাণ্ডা জল ঢালিয়া সে আপন মনেই বলিল, আঃ!

পরদিন প্রাতঃকালের ট্রেনেই গৌরী রামরতনবাবুর সঙ্গে রওনা হইয়া গেল। শিবনাথ ট্রেনে তুলিয়া দিয়া আসিল, কিন্তু একটি কথাও বলিল না। গৌরীও ট্রেনের

বিপরীত দিকে জানালা দিয়া চাহিয়া রহিল, অবগুণ্ঠনের অন্তরাল হইতেও একবার শিবনাথের দিকে ফিরিয়া চাহিল না।

বাড়ি ফিরিয়াই শিবনাথ ঘোড়ায় চড়িয়া রওনা হইল।

কার্তিকের প্রারম্ভ, শেষরাত্রে শীতের আমেজ দেখা দিয়াছে, প্রভাতে শিশিরকণায় সমস্ত যেন ভিজা হইয়া থাকে। সূর্য দক্ষিণায়নে ক্রমশ দূর হইতে দূরান্তরে চলিয়াছেন, তবুও এবার রৌদ্রের প্রখরতা এখনও কমে নাই। প্রাতঃকাল অতিক্রান্ত হইতে না হইতেই রৌদ্রের মধ্যে যেন একটা জ্বালা ফুটিয়া উঠে, সে জ্বালার শোষণে মাটির বুকের রস নিঃশেষিত হইয়া শুষ্ক হইতে চলিয়াছে। দিগন্তপ্রসারী শস্যক্ষেত্রে শস্যশীর্ষগর্ভা ধান্যলক্ষ্মী নীরস ধরণীর বুকের উপর তৃষ্ণায় মৃতপ্রায় কিশোরী কন্যার মত এলাইয়া পড়িয়াছে। ধীরে ধীরে মৃত্যুর বিবর্ণতা কিশোরীর সর্বাঙ্গে সঞ্চারিত হইতেছে। মাঠ-জোড়া ধানগাছগুলির পাতার প্রান্তভাগ হলুদ হইয়া গিয়াছে। তবুও উদ্গমোন্মুখ ধান্য-শীর্ষের একটি ক্ষীণ মৃদু গন্ধে প্রান্তরটা ভরিয়া উঠিয়াছে—ধান্যলক্ষ্মীর অঙ্গসৌরভ। আর কানে বাজিতেছে, মাঠ-জোড়া সোঁ-সোঁ শব্দ। তৃষ্ণায় মরণোন্মুখ কিশোরী কন্যার জন্য, আপন তৃষ্ণার জন্য ধরিত্রী জল চাহিয়া কাঁদিতেছেন।

গৌরীর এ শুনিবার কান নাই, এ দেখিবার চোখ নাই, এ বুঝিবার মন নাই। শিবনাথ সজল চক্ষে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া অগ্রসর হইল।

ছাব্বিশ

ফাল্গুনের প্রথম।

মাঘ মাস না যাইতেই দেশ জুড়িয়া হাহাকার উঠিল। লক্ষ্মীর অপমৃত্যু ঘটিয়াছে, ধরিত্রীর বুক শুকাইয়া ফাটিয়া চৌচির হইয়া গিয়াছে। গত ভাদ্রের মাঝামাঝি বৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার পর আজও পর্যন্ত একফোঁটা বৃষ্টি নাই ; পুকুরের জল কার্তিক মাসে ধান সেচিতে নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। পানীয় জলের পুষ্করিণী হিসাবে যে পুকুরগুলির জল ছাড়া হয় নাই, মানুষের সকল প্রয়োজনে তাহাই খরচ করিয়া করিয়া সে ভাণ্ডারও প্রায় ফুরাইয়া আসিল। মাঠে ইহার মধ্যে ধু-ধু করিতেছে, কোথাও সবুজের চিহ্ন নাই। জলের অভাবে রবি-ফসল বোনা হয় নাই, ঘাস শুকাইয়া গিয়াছে, মাটির শুষ্কতায় গাছের পাতাও এবার মাঘ মাসেই ঝরিয়া গেল।

শিবনাথ ঘরের মধ্যে বসিয়া পড়িতেছিল। চারিদিকে রাশীকৃত বই, খাটের উপর রাত্রির বিছানা এখনও অপরিচ্ছন্ন অবস্থায় পড়িয়া আছে। ঘরখানার কোণে ঝুল, খাটের তলায় ধূলার একটা জমাট স্তর।

সে নিবিষ্টমনে পড়িতেছিল, The French people were divided into three classes, or 'Estates', of which two the clergy and the nobility, comprised fewer than 300,000 souls and were "privileged", while one, the 'Third Estate', comprised more than 20,000,000 and was, "unprivileged".

মাঠে মাঠে ঘুরিয়া সে দেশের অবস্থা দেখিয়াছে, অসংখ্য পঙ্গপালের মত দীনদরিদ্র মানুষকে সে দেখিয়াছে, সর্বোপরি মাটির অন্তরাল হইতে ধরিত্রী-দেবতার শুষ্ক কণ্ঠের তৃষিত হাহাকার সে শুনিয়াছে। এই দুঃখের প্রতিকার খুঁজিয়া সে সারা হইয়া গেল, দেশদেশান্তরের ইতিহাসের মধ্য হইতে প্রতিকারের উপায় খুঁজিতেছিল। বার বার সে এই ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস পড়িয়া থাকে। নিরুপায় হতাশার মধ্যে মনে যেন সান্ত্বনা পায়। আরও একটু অগ্রসর হইয়া সে পড়িল, It has been estimated that in the eighteenth century a French peasant could count on less than one fifth of his income for the use of himself and family ; four fifth went in taxes to the king, in tithes to the clergy, and in rents and dues to the nobility.

পাড়ায় কোথায় একটা সোরগোল উঠিতেছে, খুব ব্যস্ত কর্ম-তৎপরতার সাড়ার মত। অভ্যাসবশে বাহিরের কোলাহলে আর শিবনাথের মনোযোগ ভ্রষ্ট হয় না। একটা ধ্যানযোগ তাহার যেন অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। তবুও ওই সোরগোলটা আজ তাহার মনোযোগ আকৃষ্ট করিল, চকিতের মত একখানা নিমন্ত্রণ-পত্রের কথা গতকল্যকার স্মৃতি হইতে জাগিয়া উঠিল। সম্মুখেই দোল-পূর্ণিমা; দোল-পূর্ণিমায় রামকিঙ্করবাবুদের বাৎসরিক উৎসব—তাঁহাদের রাধাগোবিন্দ বিগ্রহের দোলপর্ব মহাসমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। সেই উপলক্ষ্যে জামাতা হিসাবে নিমন্ত্রণ-পত্র সে পাইয়াছে। এই সময় সপরিবারে তাঁহারা কলিকাতা হইতে দেশে আসেন। আজই তাঁহাদের আসিবার কথা। বোধ হয় বাড়ি ঝাড়া-মোছা সারা হইতেছে। গৌরীও আসিবে! আজ এই কয়েক মাস ধরিয়া গৌরী সেখানে; পত্র নিয়মিত সে দিয়াছে, গৌরীও উত্তর দিয়াছে; কিন্তু সে পত্রে আনন্দ নাই, আগ্রহ নাই। শিবনাথ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ডাকিল, নিত্য! নিত্য! নিত্য!

উত্তর দিল পাচিকা রতন—শিবনাথের রতনদিদি, নিত্য বউকে দেখতে গেল ভাই। বড়বাবুদের বাড়ির সব এল কিনা, তাই নিত্য গেল; বলে, একবার বউদিদিকে দেখে আসি। কেন, কিছু বলছ?

শিবনাথ নীরব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। গৌরী আসিয়াছে! সংবাদ শুনিবামাত্র তাহার মন কি এক গভীর আবিষ্টতার মধ্যে নিমগ্ন হইয়া গেল। গৌরী আসিয়াছে! বুকের মধ্যে হৃদ্‌যন্ত্র দ্রুততর গতিতে চলিতে আরম্ভ করিল।

রতনদিদি আবার জিজ্ঞাসা করিল, শিবু, নিত্যকে কিছু বলছিলে ভাই? নিত্য তো নাই, আমি করে দিই। কি বলছ, বল?

শিবু এবার আত্মস্থ হইয়া বলিল, একবার চা খেতাম রতনদি।

রতন বলিল, কবার চা খেলে, আবার চা খাবে? নাক দিয়ে যে রক্ত পড়বে। বরং একটু দুধ গরম করে দিই।

শিবনাথ বলিল, দুর, দুধ বাছুরে খায়।

রতন হাসিয়া ফেলিল, হাসিতে হাসিতে বলিল, তবে একটু শরবত করে দিই নেবু দিয়ে?

শিবনাথ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, উঁহু, শরবত খায় ভটচাজ্জি মশায়রা।

রতন এবার উনান হইতে কড়া নামাইয়া ফেলিয়া বলিল, আচ্ছা বড়সায়েব, চায়ের জলই আমি চড়িয়ে দিলাম।

শিবনাথ আবার গিয়া চেয়ারের উপর বসিল। ইতিহাসখানা খুলিয়া চোখের সম্মুখে ধরিল বটে, কিন্তু একবর্ণ আর পড়া হইল না। বই হইতে মুখ তুলিয়া সে

আপনার ঘরের জানালা দিয়া রামকিঙ্করবাবুদের জানালার দিকে চাহিয়া রহিল। দীর্ঘকাল পরে আবার তাহার দেহ-মন এক পুলকিত অস্থিরতায় অধীর হইয়া উঠিতেছে।

একমুখ হাসি লইয়া চায়ের কাপ হাতে নিত্য ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিল, বউদিদি এসেছেন, দাদাবাবু। দেখা করে এলাম আমি।

হুঁ। শত প্রশ্ন মনের মধ্যে গুঞ্জরিত হইতেছিল। কিন্তু নিত্যর কাছে শিবনাথ কেমন লজ্জাবোধ করিল; নিত্য এ বাড়ির পুরানো ঝি, তাহার সম্মুখে সে সঙ্কোচ কাটাইতে পারিল না, নিস্পৃহতার ভান করিয়া শুধু বলিল, হুঁ।

নিত্য বলিল, বউদিদি এবার বেশ সেরেছেন, রঙ ফরসা হয়েছে, যাকে বলে টকটকে রঙ; মাথায়ও খানিকটা বেড়েছেন। তা, তিন-চার আঙুল লম্বা হয়েছেন মাথায়।

হাসিয়া শিবনাথ বলিল, ভাল। কিন্তু মনের অস্থিরতা তাহার মুহূর্তে মুহূর্তে বাড়িতেছিল।

নিত্য আপন উৎসাহেই বলিতেছিল, আমি বলে এলাম বউদিদিকে পাঠিয়ে দেবার কথা। বললাম, আমরা আর পারব না বাপু বউদিদির ঘর-সংসার চালাতে, পাঠিয়ে দ্যান আমাদের বউদিদিকে। তা, বউদিদির দিদিমায়ের যে রাগ! বললেন, তা বলে আপনা থেকে আমার নাতিন যাবে নাকি লো হারামজাদী? পাঠিয়ে দিগে তোদের দাদাবাবুকে, এসে পায়ে ধরে নিয়ে যাবে।

শিবনাথের বুকে দ্রুত-ধাবমান রক্তস্রোতের বেগ স্তিমিত হইয়া গেল, সে গম্ভীর-ভাবে চায়ের কাপে চুমুক দিয়া কহিল, তারপর?

নিত্য বলিল, বউদিদির গায়ে এবার অনেক নতুন গয়না দেখলাম দাদাবাবু। এক গা গয়না, গয়নায় সর্বাঙ্গ ঢাকা যাকে বলে।

হুঁ। শিবনাথ আবার কাপে চুমুক দিল।

আপনি বাপু একবার যান, গিয়ে বউদিদিকে নিয়ে আসুন। নইলে ভাল লাগছে না বাপু।

শিবনাথ কোন উত্তর দিল না, তার মন বিদ্বেষে ক্ষোভে ভরিয়া উঠিল; সে আবার বইখানায় মনঃসংযোগ করিল—Louis XV wasted millions on idle personal pleasure and at the same time encouraged the upper classes to imitate his shameful and prodigal manner of living, with the result that the "privileged" orders vied with their worthless master in exacting more and more money from the 'unprivileged" ।

নিত্য কিন্তু নাছোড়বান্দা ; সে বলিল, বউদিদিকে নিয়ে আসুন, পিসীমাকে নিয়ে আসুন, নিয়ে সাজিয়ে ঘরকন্না করুন বাপু। পিসীমারই আর সেখানে থাকলে চলবে কেন ? দুদিন পরে নাতি হবে।

শিবনাথ অসহিষ্ণু হইয়া বলিয়া উঠিল, বকিস না নিত্য, কানের কাছে এমন করে। যা এখান থেকে তুই।

নিত্য এ কথায় মনে মনে আহত না হইয়া পারিল না, সে বলিল, আমরা চাকর-বাকর লোক, এমন করে দায়িত্ব হয়ে সংসার চালাতে পারব না বাপু; আমাদের বলা সেইজন্যে।—বলিয়া সে হনহন করিয়া নীচে নামিয়া গেল।

শিবনাথ চায়ের কাপ ও বই—দুই-ই ফেলিয়া উঠিয়া পড়িল। পিসীমার কথা উঠিলেই সে এমনই অস্থির হইয়া পড়ে, দারুণ একটা অস্বস্তির গ্লানিতে তাহার অন্তর পীড়িত হইয়া উঠে, সংসারের সকল কিছুর উপরেই বিতৃষ্ণা জন্মিয়া যায়, বিতৃষ্ণা হয় গৌরীর উপর বেশি। গৌরীকেই এ অপরাধের একমাত্র হেতু না ভাবিয়া সে পারে না। মনের উত্তাপে সে রুক্ষ হইয়া উঠে; তারপর ধীরে ধীরে সে এক রহস্যময় গভীরতার মধ্যে ডুব দেয়। তখন অতিমাত্রায় সংযত, মিতভাষী, চিন্তাশীল; তারপরই আসে একটা কর্মমুখর অধ্যায়। কর্মক্লান্ত হইয়া তবে আবার সে একদিন ঘরে ফেরে; শান্ত হইয়া আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়া আসে। কিন্তু এমনই করিতে করিতে তাহার স্বাভাবিক রূপেরও একটা পরিবর্তন ঘটিতে চলিয়াছে। পৃথিবীর সর্বত্রব্যাপী একটা দুঃখময় অবস্থার আভাস সে অনুভব করিতেছে। কল্পনার সহিত বাস্তবের সাদৃশ্য খুঁজিতে সে পল্লীতে পল্লীতে ঘুরিয়া তাহাদের দুঃখ-দারিদ্র্যের কথা প্রত্যক্ষ করিয়া আসে। সম্মুখে অন্নহীনতার একটা ভীষণ অবস্থা কল্পনা করিয়া এক-একটি গ্রামের কাহার কতদিনের খাদ্য আছে সন্ধান করিতে গিয়া এমনই একটা ভাবময় অনুভূতি তাহার মনে জাগিয়া উঠিয়াছে। এই অনুভূতির সহিত তাহার অন্তরেরও যেন একটা সহজ সহানুভূতি আছে।

আজও সে ঘর হইতে বাহির হইয়া ওয়াটার-বট্‌লটা জলে পূর্ণ করিয়া লইল, রতনকে বলিল, আমার জলখাবার তৈরী করেছ রতনদি ?

রতন তাহার দিকে চাহিয়া চলিল, ওকি পিঠে আবার চামড়ার দড়ি ঝোলালে যে ?

একবার বেরুব।

কোথায় ?

রামপুরের খবর অর্ধেক নেওয়া হয়েছে, তারপর বাকি-পড়ে আছে। ওটা আজ শেষ করে আসব। দাও, খাবারগুলো এই ব্যাগের মধ্যে পুরে দাও।—বলিয়া সে বাইসিক্লটা ঠেলিয়া বাহির করিয়া আনিল। ঘোড়ায় এখন আর সে যায় না, ঘোড়ায়

গেলে ঘোড়াটার খাওয়া-দাওয়ার একটু অসুবিধা হয়, বাড়ি ফিরিবার জন্ম তাগিদ থাকে। রতন জানে, প্রতিবাদে ফল হইবে না; প্রতিবাদ করিতে গেলে মধ্যে মধ্যে রুক্ষ দৃষ্টি, কখনও বা রূঢ় কথা সহিতে হয়, তাই সে বিনা প্রতিবাদে ব্যাগে খাবার পুরিয়া দিল। শিবনাথ মাথায় একটা হ্যাট চড়াইয়া বাইসিক্ল লইয়া বাহির হইয়া গেল।

রতন আজ ছানা কিনিয়া ডালনা রাঁধিতেছিল, শিবু ছানার ডালনা ভালবাসে। শিবু চলিয়া যাইতেই সে অর্ধসমাপ্ত ডালনাটি ছুঁড়িয়া উঠানে ফেলিয়া দিল, এবং উচ্ছিষ্টপ্রত্যাশী কয়টা কুকুরকে কহিল, নে খা, তোরাই খা।

তারপর সে শূন্ত কড়াটা লইয়া সশব্দে রান্নাঘরে নামাইয়া রাখিল।

অপরাহ্নে রামকিঙ্করবাবুর বাড়ি হইতে নিমন্ত্রণ আসিল। তাঁহাদের বাড়ির এক পোষ্য আত্মীয়া আসিয়া রতনকে দেখিয়া বলিল, কই গো, তোমাদের দাদাবাবু কই?

রতন সম্ভাষণ জানাইয়া বলিল, এস ভাই, এস। আজই এলে বুঝি সব? বস।

হ্যাঁ। বসবার কি জো আছে ভাই, এখুনি ডাক পড়বে। তোমাদের দাদাবাবুকে নেমন্তন্ন করতে এসেছি, রাত্রে খাবে, ওখানেই থাকবে, বুঝলে?—বলিয়া একটু হাসিল।

রতন বলিল, তিনি তো বাড়িতে নাই।

ওই নাও! কোথায় গেলেন আবার?

কোথা কোন্ পাড়াগাঁয়ে গিয়েছেন, সে ভাই তিনিই জানেন। বেরিয়েছেন সেই সকালে—স্নানও নাই, খাওয়াও নাই, আবার কখন যে ফিরবেন, তারও কিছু ঠিক-ঠিকেনা নাই।

বেশ। আমি তাই বলিগা তবে।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে আবার লোক আসিল, রতন জবাব দিল, এখনও তিনি ফেরেন নাই। কিছুক্ষণ পরে গৌরীর দিদিমা আসিয়া হাজির হইলেন; রতন শশব্যস্ত হইয়া আসন পাতিয়া দিয়া সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া রহিল।

গৌরীর দিদিমা বলিলেন, আমরা নেমন্তন্ন করব, যেতে হবে, এই ভয়েই সে বুঝি পালিয়েছে?

সবিনয়ে রতন বলিল, আজ্ঞে না গিন্নীমা, আজকাল তাঁর কাজই হয়েছে ওই। কোন দিন খান না, অদ্ধেক রাত তো ঘুমোনই না; ফিরতে কোন দিন বারোটা-একটা হয়, আবার ঘরে থাকলে বই নিয়েই বসে থাকেন অদ্ধেক রাত।

গৌরীর দিদিমা কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, হ্যাঁলো রতন, বলি, স্বভাবচরিত্তির খারাপ-টারাপ হয় নি তো?

শিহরিয়া উঠিয়া রতন বলিল, আমরা সে কথা বলতে পারব না গিন্নীমা ; মুখ দিয়ে তা হলে পোকা পড়বে আমাদের।

নিত্য বলিল, ই কিন্তু স্বভাবচরিত্তির খারাপের চেয়েও খারাপ গিন্নীমা, মানুষ এই করেই বিবেগী হয়।

গৌরীর দিদিমা চিন্তিত মুখে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। নিত্য আবার বলিল, সেদিন আবার মাস্টারকে বলছিলেন, যুদ্ধে গেলে বেশ হয়। ওই মাস্টারটি কিন্তু একটি নষ্টগুড়ের খাজা। ওই তো বাহবা দিয়ে পুকুর মেরে দেশের লোককে জল দিয়ে রাজ্যের মাছগুলোকে লণ্ডভণ্ড করে দিলে।

গৌরীর দিদিমা অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া বলিলেন, এ আমি কি করলাম মা ; শুয়োরের কাছে ফুলবাগান করে সাধ করে ফাঁস গলায় পরলাম! চোখের সামনে কুটুম করে এ কি বিপদ করলাম আমি! তা যখনই আসুক, পাঠিয়ে দিও, বুঝলে? দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

শিবনাথ ফিরিল রাত্রি বারোটায়। পথে বাইসিক্লটার টিউব ফাটিয়া যাওয়ায় বাইসিক্ল ঠেলিতে ঠেলিতে সে বারো মাইল রাস্তা হাঁটিয়া আসিয়াছে। ধূলায় সর্বাঙ্গ ভরা, শ্রান্ত অবসন্নদেহ শিবুকে দেখিয়া সকলে ত্রস্ত হইয়া উঠিল। শিবনাথ বলিল, এক হাঁড়ি জল গরম করতে দে তো সতীশ, স্নান করতে হবে।

রতন সবিস্ময়ে বলিল, এই রাত্রে স্নান করবে কি ?

হ্যাঁ, ধুলোয় সমস্ত শরীর কিচকিচ করছে। সমস্ত পথটা হেঁটে আসছি।

হেঁটে!

হ্যাঁ, গাড়িটা অচল হয়ে গেল যে। জলদি কর্‌ সতীশ, আর বসে থাকতে পারছি না আমি।

রতন বলিল, তোমায় আবার নেমন্তন্ন করে গেছেন তোমার দিদিশাশুড়ী।

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া শিবনাথ বলিল, কি বিপদ! নেমন্তন্ন নিলে কেন তোমরা? এই এত রাত্রে কি নেমন্তন্ন খেতে যায় কোথাও ?

এত রাত্রি হবে, তা কি করে আমরা জানব, বল ? আর বলে গেছেন তিনি, যত রাত্রিই হোক, এলে পাঠিয়ে দিও। আমরা কি বলব, বল ?

হুঁ।—বলিয়া সে ঈজি-চেয়ারের উপর শ্রান্তভাবে এলাইয়া পড়িল। তাহার মনের সে এক বিচিত্র অবস্থা। গৌরীর আকর্ষণ নাই, পিসীমার স্মৃতি সমাহিত হইয়া পড়িয়াছে, চোখের পাতায় ঘুম নামিয়া আসিতেছে মায়ের স্পর্শের মত ; নিস্তব্ধ রাত্রের অসংখ্য কোটি কীটপতঙ্গের সঙ্গীত ঘুমপাড়ানি গানের মত অবোধ্য অথচ মধুর ঝঙ্কারে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া মিলাইয়া আসিতেছে।

সতীশ জল গরম করিয়া আসিয়া ডাকিল, কিন্তু সাড়া মিলিল না। রতন আসিয়া দেখিয়া নিত্যর সহিত পরামর্শ করিয়া কিছু খাবার টেবিলের উপর ঢাকা দিয়া রাখিয়া দিল। নিত্য বিছানাটা ঝাড়িতে ঝাড়িতে বলিল, ডাক না রতনদিদি, কিছু খেয়ে বিছানার ওপর শুয়ে পড়ুন।

রতন দক্ষিণের খোলা জানালাটার দিকে আঙুল দেখাইয়া বলিল, ওদের বাড়ির জানলায় দাঁড়িয়ে আমাদের বউ নয়, নিত্য ?

নিত্য চাহিয়া দেখিয়া বলিল, হ্যাঁ।

দিদিমার বাড়ির খোলা জানালায় দাঁড়াইয়া গৌরী এই ঘরের দিকেই চাহিয়াছিল, পরমুহূর্তেই সে সরিয়া গেল, রতন ও নিত্যর ইঙ্গিতে ভঙ্গীতে দেখিতে পাওয়াটা সে বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছিল।

রতন বলিল, আর গতিক ভাল নয় নিত্য, এ বাড়ির আর ভাল বুঝছি না ভাই ; এখন মানে মানে আমরা সরতে পারলে বাঁচি।

নিত্য বলিল, আমার সব্বনাশ যে আমি নিজে করেছি ভাই। আমার মাইনে-পত্তর সবই যে এখানেই জমা আছে, যাব বললেই বা যাই কি করে, বল ?

তাহারা বাহির হইয়া গেল। সতীশ ঘরের বাতিটা কমাইয়া দিয়া এদিক ওদিক চাহিয়া খাবারের থালা হইতে একটি রসগোল্লা তুলিয়া লইয়া চলিয়া গেল।

প্রাতঃকালে জন তিনেক লোক ঝুড়িতে করিয়া ফল মিষ্টি ও দুইটা বাক্স মাথায় করিয়া উপস্থিত হইল। নিত্য পুলকিত হইয়া বলিল, বউদিদির বাক্স।

সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় গৌরীর দিদিমা গৌরীকে সঙ্গে লইয়া বাড়িতে প্রবেশ করিয়া ডাকিলেন, কই, নাতজামাই কই ?

রতন সসম্ভ্রমে বলিল, এখনও ওঠেন নাই গিন্নীমা। কাল ফিরেছেন সেই শেষরাত্রে, গাড়ি খারাপ হয়ে গিয়ে ছ কোশ রাস্তা হেঁটে এসে বললেন, চান করব ; আমি নেমন্তন্নের কথা বললাম। তা, জল গরম হতে হতে চেয়ারে পড়ে সেই যে ঘুমোলেন, উঠলেনও না, চানও না, খাওয়াও না ; সেই চেয়ারে পড়ে এখনও ঘুমোচ্ছেন।

গৌরীর দিদিমা নাতনীকে বলিলেন, যা কেন লো হারামজাদী, দেখ্, উঠল কি না ! না উঠেছে তো ডাক্।

গৌরী বলিল, এই দেখ, তোমাকে ফাজলামি করতে হবে না, আমি ডাকতে পারব না।

পারবি না ? পারবি না তো তোর সোয়ামীকে আমি ডাকতে যাব নাকি ? যা বলছি, যা।

গৌরী মুখে না বলিলেও কাজে অগ্রসর হইয়াছিল। দিদিমার কথা শেষ না হইতেই সে সিঁড়িতে উঠিয়াছে। গৌরীর দিদিমা বলিলেন, পারবি না বলে চললি যে হারামজাদী ? লজ্জাবতী লতা আমার !

গৌরী আসিয়া ঘরের দরজায় দাঁড়াইয়া দেখিল, শিবনাথ তখনও নিদ্রামগ্ন ; তাহার সর্বাঙ্গে ধূলা, মাথার চুলে ধূলায় ও ঘামে যেন জট পড়িয়া গিয়াছে। তাহার শরীর যেন অনেক শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, দেহবর্ণ রৌদ্রে রৌদ্রে যেন পুড়িয়া গিয়াছে। টেবিলের উপর স্তূপীকৃত বই, টেবিল-ল্যাম্পটা এখনও নিবানো হয় নাই। পাশে খাবার তেমনই চাপা দেওয়া আছে। সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ডাকিল, শুনছ !

কিন্তু সে মৃদুস্বরে নিদ্রিতের চেতনা পর্যন্ত পৌঁছিল না। সে আবার ডাকিল, শুনছ ! তারপর অগ্রসর হইয়া সলজ্জভাবে শিবনাথকে স্পর্শ করিয়া ডাকিল, শুনছ !

এবার নিদ্রারক্ত চোখ মেলিয়া শিবনাথ বলিল, অ্যাঁ ! চোখের সম্মুখে গৌরীকে তখনও তাহার মূর্তিমতী স্বপ্নের মত বোধ হইতেছিল। কিন্তু গৌরী সাড়া দিয়া বাস্তবকে প্রকট করিয়া বলিল, ওঠো। মুখ-হাত ধোও। কাল সমস্ত দিনরাত্রি কিছু খাও নি, কিছু খাও।

শিবনাথ চোখ মুছিয়া প্রত্যক্ষ বাস্তবকে যেন অনুভব করিয়া বলিল, কখন এলে তুমি ?

গৌরী অভিমানভরে বলিল, তুমি তো গেলে না, আমি নিজেই যেচে এলাম।

সেই মুহূর্তে উচ্চহাস্যরোলে সিঁড়িটা যেন ভাঙিয়া পড়িল। শিবনাথ সচকিত হইয়া উঠিল, গৌরী মাথায় অবগুণ্ঠন টানিয়া দিয়া বলিল, মরণ তোমার !

শিবনাথ সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল, কে ?

আমি হে আমি, বড়াই বুড়ী ; তোমাদের দূতীগিরি করতে এসেছি।—বলিয়া দিদিমা ঘরে প্রবেশ করিলেন।

শিবনাথ ত্রস্ত হইয়া উঠিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল।

দিদিমা নাতনীকে বলিলেন, বেশ তো এখুনি ছেন্দা হচ্ছিল, সোহাগ হচ্ছিল, আমাকে দেখে যে আবার সাধুবুড়ী হয়ে গেলি ? যা না তাই, মুখ-হাত ধোবার জল দিতে বল্, চা করে নিয়ে আয়। দাঁড়িয়ে রইলি যে ?

শিবনাথ ব্যস্ত হইয়া বলিল, না না, আমাকে আগে স্নান করে ফেলতে হবে।

দিদিমা বললেন, বেশ তো, তা হলে তেল আসুক, গামছা আসুক, পিঠে তেল দিয়ে দিক। আমাকে দেখে আবাব লজ্জা ! আমি বুড়ী, চোখে ভাল দেখতে পাই না, তার ওপর দিদিমা, আমাকে দেখে আবার লজ্জা !

শিবনাথ স্নান করিয়া আসিয়া দেখিল, দিদিমা চলিয়া গিয়াছেন, গৌরী চা ও খাবার টেবিলের উপর রাখিয়া অপেক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, নিত্য ঘর পরিষ্কার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। শিবনাথকে দেখিয়া গৌরী বলিল, মাগো, ঘরের যেমন ছিরি, তেমনই মানুষের ছিরি! তোমার রঙ কি কালো হয়েছে বল তো!

শিবনাথ একটু হাসিল শুধু, কোন উত্তর দিল না। ঘর অপরিষ্কারের কথায় নিত্যর একটা কথা মনে পড়িয়া গেল, ঝুল ঝাড়িতে গিয়া গৌরী একদিন ছবি ভাঙিয়াছিল; চুরি-করা পানের পিচকে রক্ত ভাবিয়া সকলে 'হায় হায়' করিয়া উঠিয়াছিল: সে হাসিয়া বলিল, আপনি একদিন ঘর পরিষ্কার করতে গিয়ে ছবি ভেঙেছিলেন বউদিদি, মনে আছে আপনার?

গৌরীও হাসিয়া উত্তর দিল, মনে নেই আবার! বাবাঃ, পিসীমার যে বকুনি!

শিবনাথ চায়ের কাপ হাতে লইয়া হঠাৎ যেন অন্যমনস্ক হইয়া গেল। নীরবে বাহিরের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। গৌরী শিবনাথের এই আকস্মিক উদাসীনতায় বিস্মিত না হইয়া পারিল না, তাহার ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। এদিকে নিত্য আপন মনে প্রশ্নের পর প্রশ্ন, প্রসঙ্গের পর প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া চলিয়াছে। সে বলিল, এবার আপনার কি কি গয়না হল বউদিদি?

শিবনাথের উদাসীনতায় ক্ষুণ্ণ গৌরী উত্তর দিল, নাম আর কত করব নিত্য, এর পর বরং দেখাব তোমাদের।

দাদাবাবুকে দেখিয়েছেন?

তোমাদের দাদাবাবুর চোখে ওসব ঠেকে না, সাধু মানুষকে ওসব দেখতে নেই।

শিবনাথ ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, না না, দেখব বইকি, কিন্তু না দেখালে কি করে দেখব, বল?

না দেখালে? খুব মানুষ তুমি যা হোক! এই তো পাঁচ-সাতখানা নতুন গয়না আমি পরে রয়েছি।

কই, দেখি দেখি! বাঃ গলার ওই কণ্ঠিটা কিন্তু ভারি ভাল হয়েছে!

নিত্য প্রশ্ন করিল, এসব আপনার দিদিমা দিলেন, নয় বউদিদি?

গৌরী বলিল, হ্যাঁ, ভারি গরজ দিদিমার, আমাকে গয়না গড়িয়ে দেবে! এ আমার মায়ের উইলের দরুন টাকা। আমার মামা বের করে ব্যাঙ্কে দিয়ে দিয়েছেন। তা থেকে এই কতক গয়না গড়ালাম।

ব্যগ্র কৌতূহলভরে নিত্য বলিল, কত টাকা দিয়েছেন আপনার মা?

চোদ্দ হাজার হয়েছে সুদে আসলে।

সব অঙ্গে তা হলে তোমার দুখানা করে হল, না কি বউদিদি?

দুখানা, তিনখানা, নামো-হাতে চারখানা হয়েছে—রুলি, দু রকম চুড়ি, ব্রেস্‌লেট। কেবল কোমরে আছে একখানা,—বিছে হয়েছে, চন্দ্রহার গড়াব এইবার।

বিষণ্ণতার মধ্যেও শিবনাথ কৌতুক অনুভব না করিয়া পারিল না, অদ্ভুত স্বর্ণতৃষা! সে ভাবিতেছিল, এ তৃষা কি নারীর জীবনের সহজাত! সঙ্গে সঙ্গে তাহার মায়ের কথা মনে পড়িয়া গেল, তাঁহার সধবা-জীবনের চিত্র দেখিলেও তাহার মনে নাই, কিন্তু শুনিয়াছে। তাঁহার বৈধব্য-জীবন সে স্বচক্ষে দেখিয়াছে, কোন দিন তিনি তাঁহার আভরণ স্পর্শ করিয়া দেখেন নাই, এমন কি এই বিষয়ের একটা টাকাও তিনি, প্রয়োজন আছে বলিয়া, গ্রহণ করেন নাই।

গৌরী সহসা শিবনাথকে বলিল, আমি কিন্তু এবার মায়ের গয়না ভেঙে চন্দ্রহার গড়াব।

ম্লান হাসি হাসিয়া শিবনাথ বলিল, বেশ।

বেশ নয়, আজই দিতে হবে বের করে, আজই গড়াতে দোব আমি।

আজ হবে না, দিনকতক পরে দোব। এত ব্যস্ত কেন?

না, সে হবে না। আজ হতে বাধাটা কি, শুনি?

কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া শিবনাথ বলিল, সেগুলো অন্য জায়গায় আছে, নিয়ে আসতে হবে।

তার মানে? অন্য জায়গায় গেল কেন? শাশুড়ীর গয়না তো বউ পায়। সে তো আমার জিনিস।

শিবনাথ ধীরে ধীরে বলিল, পৌষ মাসের লাটের টাকা হয় নি এবার; সেইজন্যে সেগুলো বাঁধা দিয়ে টাকা নেওয়া হয়েছে।

মুহূর্তে গৌরীর মুখে এক বিচিত্র অভিব্যক্তি ব্যক্ত হইয়া উঠিল—বিস্ময়, ঘৃণা, ক্রোধ, হতাশার সে এক সম্মিলিত অভিব্যক্তি! শিবনাথ সে মুখ দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল। থাকিতে থাকিতে গৌরীর চোখে জল দেখা দিল। শিবনাথ আত্মসম্বরণ করিয়া হাসিমুখে সান্ত্বনা দিয়া বলিল, কাঁদছ কেন এর জন্যে?

গৌরী বলিল, কেন বাপু, মিছে আমাকে ভোলাচ্ছ? কাঁদতে হবেই আমাকে দুদিন পরে।

বাধা দিয়া শিবনাথ বলিল, ছি গৌরী!

উত্তেজিত হইয়া গৌরী উত্তর দিল, কেন, 'ছি' কেন? ভাগ্য মন্দ হলে লোকে কাঁদে না? আমি আমার ভাগ্যের জন্যে কাঁদছি।—বলিতে বলিতে তাহার আবেগ আরও বাড়িয়া উঠিল, বলিল, দিদিমা আমাকে জলে ভাসিয়ে দিয়েছে। ছি! ছি! —অস্থির হইয়া সে দ্রুত সেখান হইতে চলিয়া গেল। শিবনাথ একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস

ফেলিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। গৌরী যেন অশান্তির উত্তাপ ছড়াইতে ছড়াইতে এখানে আসে, সে উত্তাপে বায়ুস্তর উত্তপ্ত হইয়া তাহার পক্ষে যেন শ্বাসরোধী হইয়া উঠিয়াছে। কয় মাস পূর্বে গৌরী ঠিক এমনই ভয়ঙ্করী রূপের আভাস দিয়া চলিয়া গিয়াছিল, ঠিক সেই মূর্তি লইয়াই আবার সে ফিরিয়া আসিয়াছে।

দূরে হোলি-পর্বের উৎসবে রামকিঙ্করবাবুদের ঠাকুরবাড়িতে নহবত বাজিতেছিল। কিন্তু সে তাহার ভাল লাগিল না। অশান্তির মধ্যে সান্ত্বনা পাইবার জন্য সে বই খুলিয়া বসিল, সেও ভাল লাগিল না। বই হইতে মুখ তুলিয়া বাহিরের দিকে চাহিল, ইহারই মধ্যে একটা শুষ্ক উতলা বাতাস উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে, নীরস মৃত্তিকাস্তর গুঁড়া হইয়া ধূলা হইয়া সে বাতাসের বেগে উড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। এই ধূলায় ধূসর প্রকৃতির রুক্ষ মূর্তি কল্পনা করিতে গিয়া তাহার মনশ্চক্ষে ভাসিয়া উঠিল—গৌরীর ক্ষণপূর্বের মুখচ্ছবি।

নিত্য এতক্ষণে স্তব্ধ হইয়া ঝাঁটা হাতে বসিয়া ছিল, সে আবার ঘর পরিষ্কার করিতে আরম্ভ করিল।

সাতাশ

মাস চারেক পরের কথা। আষাঢ়ের প্রথম। দ্বিপ্রহরের প্রারম্ভেই সমস্ত সৃষ্টিটা যেন ভয়ে নিস্তব্ধ হইয়া ঘরে লুকাইয়া বসিয়া আছে। আকাশে দ্বাদশ সূর্যের যেন একসঙ্গে উদয় হইয়াছে; নির্মেঘ রুক্ষ আকাশ পৃথিবীর বুক হইতে বহুদূর পর্যন্ত উর্ধ্বলোক ধূলিকণায় সমাচ্ছন্ন, চোখের সম্মুখে ক্ষীণ কুয়াশার আস্তরণের মত সে ধূলিস্তরটা ভাসিয়া রহিয়াছে, দিক্‌চক্রবাল দৃষ্টিপথ হইতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়, সেখানে দেখা যায় গাঢ় ধূমপুঞ্জের মত জমাট ধুলার রাশি। পৃথিবীর বুকের মাটি স্তরের পর স্তর গুঁড়া হইয়া উড়িয়া গেল। বৈশাখে দুই-এক পশলা বৃষ্টি হইয়া আবার মেঘ মুখ লুকাইয়াছে; আষাঢ়ের প্রথম সপ্তাহ হইয়া গেল, এখনও বৃষ্টি নাই; এখনও মাঠে বীজধান বোনা হয় নাই, ঘাস একবার দেখা দিয়া আবার শুকাইয়া গিয়াছে, পৃথিবীর সুশ্যাম লাবণ্যময়ী রূপের কথা ভাবিয়া আজ মাঠের দিকে চাহিলে মনে হয়, কেহ যেন তাহার চর্মোৎপাটিত করিয়া লইয়াছে। দেশ জুড়িয়া হাহাকার, ভিক্ষুকে ভিক্ষুকে গ্রামখানা ছাইয়া গিয়াছে; দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে।

এই উত্তপ্ত নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহরেও সেদিন শিবনাথ একা কাছারিতে বসিয়া ছিল। মুখে গভীর উদ্বেগ ও চিন্তার ছায়া, মাথার চুলগুলি বিপর্যস্ত, চিন্তিতভাবে ক্রমাগত চুলের মধ্যে আঙুল চালাইয়া চালাইয়া নিজেই সে এমনই করিয়া তুলিয়াছে। এতবড় কাছারি-বাড়িতে সে একা, সে ছাড়া জনমানব নাই। সময় নির্ণয়ের জন্য পিছনের দেওয়ালের দিকে সে অভ্যাসমত চাহিয়া দেখিল, কিন্তু ব্র্যাকেটের উপর ঘড়িটা নিস্তব্ধ, কখন থামিয়া গিয়াছে। অয়েল করানোর অভাবে ঘড়িটা মাঝে মাঝে বন্ধ হইয়া যাইতেছে। ঈজি-চেয়ারের বেতের ছাউনিটা ছিঁড়িয়াছে, সদর হইতে বেত ও কারিগর আনাইয়া ওটাকে মেরামত করা প্রয়োজন, কিন্তু সেও হয় নাই। ওসব পরের কথা, এখন সম্পত্তি থাকিলে হয়। আগামী সরকারী নিলামে বাকি রাজস্বের দায়ে সম্পত্তি নিলামে উঠিয়াছে। পাঁচ শত টাকা লাগিবে; না দিতে পারিলে সমস্ত নিলাম হইয়া যাইবে; নায়েব গোমস্তা, চাপরাসী, এমন কি চাকর ও মাহিন্দার পর্যন্ত বাহিরে গিয়াছে, মহলে মহলে টাকার জন্য তাহারা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। শিবনাথ নীরব উৎকণ্ঠা বহন করিয়া এখানে একা বসিয়া তিলে তিলে সে উৎকণ্ঠার যন্ত্রণা সহ্য করিতেছে। চেষ্টার ফল যাহা হইবে, সে জানে; তবুও চেষ্টা না করিয়া উপায় কি? রাখাল সিং কেষ্ট সিং পাগলের মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আজ কয়েকজন প্রজা আসিয়া কাঁদিয়া পড়িয়াছিল। কোনরূপে যেন সম্পত্তি রক্ষা করা হয়, পুরুষানুক্রমে

তাহারা এই বাড়ির ছত্রচ্ছায়াতলে বাস করিয়া আসিতেছে, আজ যেন তাহাদের ভাসাইয়া দেওয়া না হয়—এই ছিল তাহাদের বক্তব্য। জমিদার তাহারা চায়, অথচ নূতন জমিদার তাহারা চায় না কেন—এই কথা খতাইয়া দেখিতে গিয়া দেখিতে পাইল, প্রজাদের অফুরন্ত মমতা আর তাহার পিতৃপুরুষের উদার মহত্ব।

অথচ কয়েকদিন আগেই সে পড়িয়াছে Joseph Prudhoneর বাণী; পড়িয়াছে—Property is theft, because it enables him, who has not produced, to consume the fruits of other people's toil। জমিদারি-ব্যবস্থা অক্ষরে অক্ষরে তাই। গভীর বিস্ময় এবং ঐকান্তিক শ্রদ্ধার সহিত এ সত্যকে স্বীকার করিয়া লইয়াও আজ কিন্তু প্রজাগুলির এই অনুরাগ-আসক্তি এবং নূতন জমিদারের অধীনে তাহাদের ভবিষ্যতের শঙ্কার কথা বিবেচনা করিয়া সে বিচলিত হইয়া উঠিয়াছে; বাঁচাইতেই হইবে, যেমন করিয়া হউক, সম্পত্তি রাখিতেই হইবে। এই উৎকণ্ঠার সময় মাস্টার মহাশয় থাকিলে বড় ভাল হইত; সকল দুঃখ, সকল সংঘাতের মধ্যে ওই মানুষটি তাহাকে সুস্থ করিয়া তোলেন। রামরতনবাবুও আজ সকালে টাকার সন্ধানে গিয়াছেন। সকালেই তিনি বলিলেন, তাই তো শিবু, উপায় কি করবি, বল্ দেখি?

শিবু অভ্যাসমত ম্লান হাসি হাসিয়া উত্তর দিল, কি আর করব!

অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া তিনি বলিলেন, বউমা তো তাঁর মায়ের উইলের দরুন টাকা পেয়েছেন; তাঁকে বললেই তো হয়। তুই একটা ডকি।

শিবনাথ বিচলিতভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না সার্, সে হয় না। ও-কথা আমাকে বলবেন না।

অত্যন্ত আশ্চর্য হইয়া রামরতনবাবু বলিলেন, কেন, বল্ দেখি?

শিবনাথ কোন উত্তর দিল না।

রামরতনবাবু আপন মনে ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, দিস ইজ ভেরি ব্যাড। ইট মিন্‌স—

শিবনাথ বাধা দিয়া বলিল, টাকা তো তার হাতে নেই মাস্টার মশায়, টাকা আছে কলকাতায়, ওর মামার ব্যবসায় খাটছে। সেখানে আমার অভাব বলে টাকা চাইতে যাওয়া কি যায়?

হুঁ, তা বটে। সেটা তুই ঠিক বলেছিস। আমি ভাবলাম অন্য রকম; ভাবলাম, নট ইন গুড টার্ম্‌স উইথ বউমা।

শিবনাথ সহসা ব্যগ্র হইয়া উঠিল, বলিল, বোলপুরে তো অনেক মহাজন আছে, আপনার সঙ্গে আলাপও আছে অনেকের; আপনি পাঁচশো টাকা আমাকে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারেন না?

কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া রামরতন উঠিয়া পড়িলেন, আপনার ছাতা ও বাঁশের লাঠি লইয়া বলিলেন, অল রাইট, চললাম আমি; দেখি কি হয়! সেই তিনি রওনা হইয়া গিয়াছেন।

রাখাল সিং কিন্তু শুনিয়া বলিলেন, ধারের উপায় থাকলে কি সে উপায় আমি আমি না করতাম বাবু? সে উপায় নেই। মানে, সাবালক হন নি যে এখনও আপনি। একুশ বছর না হলে তো আর সাবালক হয় না জমিদারের ছেলে।

রামরতনবাবু রওনা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিবনাথের অন্তরে একটি ক্ষীণ আশার সঞ্চার হইয়াছিল, রাখাল সিংয়ের কথায় সে আশা নির্মূল হইয়া গেল। ইহার চেয়ে তিনি এখানে থাকিলে ভাল হইত, সান্ত্বনা দিবার একজন থাকিত। আরও একজনকে মনে পড়িল—পিসীমাকে, তিনি এখানে থাকিলে এ দুশ্চিন্তাই বোধ হয় তাহাকে ভোগ করিতে হইত না।

রাখাল সিং, কেষ্ট সিং, গোমস্তা কুড়ারাম মিশ্র প্রজাদের সকলকে এখানে হাজির করিবার জন্য মহলে গিয়াছে। তাহাদের অনুরোধের বিনিময়ে সেও অনুরোধ জানাইবে, চার আনা, আট আনা, এক টাকা, যে যেমন পার, যাহা পার তাহাই দাও। হাজার প্রজায় চারি আনা করিয়া দিলেও আড়াই শত টাকা হইবে, আর আট আনা করিয়া দিলে পাঁচ শত টাকা। সতীশ, শম্ভু, মতিলাল—ইহারাও গিয়াছে অন্য একখানা গ্রামে।

একা বসিয়া চিন্তা করিতে করিতে উদ্বেগে শিবনাথের যেন হাঁপ ধরিয়া উঠিল। প্রপার্টি ইজ থেফ্‌ট—জানিয়াও ক্রমশ সে বিচলিত হইয়া পড়িতেছে, সম্পত্তির মমতায় সে ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছে। প্রজাদের অনুরোধ, পিতৃপুরুষের সম্পত্তি, এই দুইটা কথা মনে পড়িলে চোখে জল আসে। গৌরীর কথা মনে করিয়া সে শিহরিয়া উঠে। সম্পত্তি গেলে গৌরী যে রূপ গ্রহণ করিবে, সে বিক্ষুব্ধ ক্রুদ্ধ রূপ কল্পনা করিয়া সে আত্মহত্যা করা ছাড়া আর অন্য উপায় খুঁজিয়া পায় না।

শিবনাথ কাছারি-বাড়ি হইতে বাহির হইয়া আসিয়া পথের উপর দাঁড়াইল। রৌদ্রের উত্তাপে পৃথিবী যেন দগ্ধ হইয়া যাইতেছে; জনহীন পথ, একটা পাখির ডাক পর্যন্ত শোনা যায় না। পথের উপর ব্যগ্র প্রত্যাশায় চাহিয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল। ওই দিক হইতে রাখাল সিং, কেষ্ট সিংয়ের প্রজাদের লইয়া ফিরিবার কথা। কিন্তু কেহ কোথাও নাই। সে পিছনের দিকে ফিরিল, এ দিক হইতে গোমস্তা কুড়ারাম মিশ্র, সতীশ চাকর ও মাহিন্দারদের ফিরিবার কথা। যতদূর দৃষ্টি চলে কোথাও কোন মানুষের দেখা নাই। সে আবার ফিরিল। এবার সে দেখিল, এদিক হইতে টলিতে টলিতে একটা কঙ্কাল যেন চলিয়া আসিতেছে।

একটা জীর্ণ কঙ্কালসার মেয়ে। সে আসিয়া অনুনাসিক সুরে কহিল, বাঁবু মাশাঁয় !

তাহার দিকে চাহিয়া শিবনাথের সর্বশরীর যেন কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। আঠারো-উনিশ বছরের মেয়ে, কিন্তু সর্ব অবয়বের মধ্যে কোথাও একবিন্দু তারুণ্যের লেশ নাই; যেন একটা চর্মাবৃত কঙ্কাল; করকরে জিভ দিয়া কোন শ্বাপদ যেন মেয়েটার সর্বাঙ্গ লেহন করিয়া লইয়াছে।

বাঁবু মাশাঁয়, চাঁরটি ভাত।

মেয়েটির গায়ের দুর্গন্ধে শিবনাথের কষ্ট হইতেছিল; সে মুখ ফিরাইয়া লইয়া বলিল, বাড়ির মধ্যে যাও বাপু, দেখ, যদি থাকে তো পাবে। কিন্তু আর কি আছে?—বলিতে বলিতেই তাহার মনে পড়িয়া গেল, এই মেয়েটাই কাল অপরাহ্নে মেথরের কাজ করিয়া চারিটা পয়সা লইয়া গিয়াছে, সন্ধ্যায় খাইয়া কিছু উচ্ছিষ্টও লইয়া গিয়াছে। ইহারই মধ্যে সে আবার অন্ন অন্ন করিয়া ফিরিতেছে! তবে এ উহার স্বভাব, না, সত্যই অভাব?

মেয়েটা চলিয়া গেল; তাহার পদক্ষেপের মধ্যেও সমতা নাই, পায়ে পায়ে টোক্কর খাইতে খাইতে সে চলিয়াছে। শিবনাথ সহসা ক্ষণপূর্বের মনোভাবের জন্য লজ্জিত হইয়া পড়িল, নিজের কাছেই নিজে অপরাধ বোধ করিল। তাহার মনে হইল, লক্ষ লক্ষ যুগের ক্ষুধা ওই মেয়েটির উদরে জ্বলিতেছে। সে ক্ষুধার অন্ন তাহারাই পুরুষানুক্রমে কাড়িয়া খাইয়া আসিয়াছে, সে নিজেও খাইতেছে। নতমস্তকে সে সম্মুখের পথেই অগ্রসর হইয়া চলিল, সম্মুখের ওই বাঁকটায় দাঁড়াইলেই আরও অনেকটা দেখা যাইবে। খানিকটা অগ্রসর হইতেই একটা কলরবের আভাস পাওয়া গেল;—রামকিঙ্করবাবুদের ঠাকুরবাড়ির দরজায় ভিক্ষুকদলের কলরব উঠিতেছে। উচ্ছিষ্ট অন্নের জন্য পঙ্গপালের মত আসিয়া বসিয়া সব চিৎকার করিতেছে।

ঠাকুরবাড়ির সম্মুখে যেখানে যেটুকু ছায়া পড়িয়াছে, উচ্ছিষ্টপ্রত্যাশী ভিক্ষুকের দল সেই সেই স্থানটুকুর মধ্যে জটলা বাঁধিয়া বসিয়া আছে। কেহ কাহারও উকুন বাছিতেছে, কোথাও গল্প চলিতেছে, ঝগড়াও চলিয়াছে। একটা খেজুরগাছের সঙ্কীর্ণ একটুখানি ছায়াকে আশ্রয় করিয়া বসিয়া প্রায়-অন্ধ এক বুড়ী আপন মনেই বকিতেছিল, ভদ্দর-নোকের ছেলের ওই করণ! ওইগুলো আবার কথা নাকি? আমি দেখতে পাই চোখে? মিছে করে আবার কানা সেজে কেউ থাকে থাকি? না, তাই থাকতে পারে? দেখতে পেলে কেউ দিনে একশো বার করে পড়ে মরে নাকি?

এত উৎকণ্ঠার মধ্যেও শিবনাথ না হাসিয়া পারিল না। সে বুঝিতে পারিল, কেহ বুড়ীকে অন্ধত্বের ভান করার অভিযোগে অভিযুক্ত করিয়াছে, তাই বুড়ী এমন ক্ষিপ্ত

হইয়া উঠিয়াছে। এ সংসারে এখন উহার বাঁচিয়া থাকার মূলধন ওই অন্ধত্ব। ঈষৎ হাসিয়া শিবনাথ বলিল, হ্যাঁ রে বুড়ী, কে কি বললে তোকে? বকছিস কেন?

বুড়ী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া অঙ্গভঙ্গীসহকারে বলিয়া উঠিল, অ্যাঃ, বকছি কেনে! আবার লক্ষ্য করা দেখ ছেলের! তুমি বললে না, বুড়ী বেশ দেখতে পায় চোখে, কানা সেজে থাকে—

একজন চক্ষুষ্মান ভিক্ষুক তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিল, এই বুড়ী, এই, কাকে কি বলছিস? উনি যে আমাদের উ বাড়ির বাবু। সে নোক তোর চলে গিয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে বুড়ী সেইখানে একটি প্রণাম করিয়া কাতরস্বরে বলিল, বাবু মাশায়, আপনাকে আমি বলি নাই মাশায়। আমি কানা মানুষ, মানুষ চিনতে লারি বাবা। ওই সাদা কাপড় শুধু চোখের ছামুতে ফটফট করে। তাতেই আমি বলি, বুঝি—

শিবনাথ বলিল, না রে বুড়ী, আমি কিছু মনে করি নি।

বুড়ী সঙ্গে সঙ্গে হাতজোড় করিয়া বলিল, তবে একখানি তেনা দিও মাশায় এই কানাকে; ধর্ম হবে আপনার।

শিবনাথ হাসিয়া বলিল, আচ্ছা।

মুহূর্তে চারিদিক হইতে রব উঠিল, আমাকে মাশায়, আমাকে মাশায়, বাবু মাশায়। যাহারা বসিয়া ছিল, তাহারা উঠিয়া দাঁড়াইল। সেদিকে চাহিয়া শিবনাথ শিহরিয়া উঠিল, মুহূর্তে তাহার মনে পড়িয়া গেল—'মা যাহা হইয়াছেন'।

মেয়েরা প্রায় বিবস্ত্রা, মাত্র কটিতটটুকু জীর্ণ শতচ্ছিন্ন বস্ত্রে কোনরূপে ঢাকা, বস্ত্রহীন নগ্ন বক্ষে সন্তানের অক্ষয় অমৃতভাণ্ড পয়োধর শুষ্ক। চর্মাবৃত পঞ্জরশ্রেণী একটি একটি করিয়া গোনা যায়, সে চর্মাবৃত পঞ্জরের নীচে হৃৎপিণ্ডস্পন্দন পর্যন্ত বাহির হইতেও যেন দেখা যাইতেছে। তৈলহীন রুক্ষ বিশৃঙ্খল চুল মৃতের চুলের মত বিবর্ণ; দ্বিপ্রহরের উত্তপ্ত বাতাসে সেগুলা বিভীষিকাময়ীর ধ্বজা-পতাকার মত উড়িতেছে। চোখে ক্ষুধার্ত লোলুপ দৃষ্টি। সারি সারি নারীর দল কলরব করিয়া উঠিল, আমাকে মাশায়, আমাকে মাশায়। ওদিকে কতকগুলি কঙ্কালসার পুরুষ, দীর্ঘ দেহ জীর্ণ হইয়া কুব্জ হইয়া পড়িয়াছে। শিবনাথ বিভ্রান্ত হইয়া গেল। পরনে কেবলমাত্র কৌপীন। তাহারাও সকলে শীর্ণ বাহু বাড়াইয়া চিৎকার করিয়া উঠিল, আমাকে মাশায়, আমাকে মাশায়। মাথার উপরে দগ্ধ বিবর্ণ আকাশ, মধ্যে ধূলিমাখা অগ্ন্যুত্তপ্ত বায়ুস্তর, নিম্নে মরুভূমির মত তৃষিত ধূসর ধরিত্রী, তাহার মধ্যে মানুষের এই রূপ—মুহূর্তে তাঁহার চোখের উপর যেন মূর্ত হইয়া উঠিল 'আনন্দমঠে'র সেই মূর্তি—'মা যাহা হইয়াছেন'।

শিবনাথ নতমস্তকে ভাবিতে ভাবিতে সেখান হইতে ফিরিল, কেমন করিয়া, কোন্

সাধনায় মাকে আত্মস্থ করিয়া, 'মা যাহা হইবেন'—সেই মূর্তিতে প্রকটিত করা যায়! কোন্ সে মন্ত্র!

তাহার ইতিহাস মনে পড়িল, A long line of the poorest women of Paris, riotous with hunger and rage, screaming "Bread! bread! bread!" proceeded on—। কিন্তু ইহারা চিৎকার করিতেও পারে না। চিন্তা করিতে করিতে সে বোধ করি আপনার অজ্ঞাতসারেই বাড়ির ভিতর আসিয়া উপস্থিত হইল। দুরন্ত উত্তপ্ত দ্বিপ্রহরে গৌরী ঘুমাইতেছে, রতন নিত্য—তাহারও ঘরের ভিতর আশ্রয় লইয়াছে। শুধু কয়টা কাক উচ্ছিষ্ট পাত্রগুলা লইয়া কলকল করিতেছে। শিবনাথ বারান্দায় বসিয়া রৌদ্রদগ্ধ আকাশের দিকে চাহিয়া ওই কথাই ভাবিতেছিল। গভর্মেণ্টের কাছে আবেদন করা বৃথা। যুদ্ধের জন্য সরকার হইতেই 'ওয়ার লোন' ঘোষিত হইয়াছে। "তোমা সবাকার ঘরে ঘরে, আমার ভাণ্ডার আছে ভরে"—এই একমাত্র পথ।

আচ্ছা, দেশের লোক এই রোদের গরমে ঘরের মধ্যে দরজা-জানলা বন্ধ করে বসে রয়েছে, আর তোমার এ কি ধারা বল তো? ভাল মানুষ কিন্তু তুমি! সারাটা দুপুর এই রোদে এ বাড়ি আর ও বাড়ি! আর দরজা নিয়ে ছুট আর হাট!

শিবনাথ মুখ ফিরাইয়া চাহিয়া দেখিল, দোতলায় সিঁড়ির মুখে দাঁড়াইয়া গৌরী। তাহার আবেশ ভাঙিয়া গেল, আত্মস্থ হইয়া গৌরীর মুখের দিকে চাহিয়া সে একটু হাসিল মাত্র, কোনও উত্তর দিল না। গৌরী এ নীরবতায় আহত না হইয়া পারিল না। শিবনাথ না বলিলেও সম্মুখেই সঙ্কটের কথা সে জানে, শুনিয়াছে। প্রতিদিন সে প্রত্যাশা করে, শিবনাথ তাহাকে টাকার জন্য বলিবে। তাহার টাকা তো রহিয়াছে। শিবনাথের অবস্থায় অনটনের আভাস পাইয়া তাহার কান্না আসে; আপনার পিতৃকুলের অবস্থার সঙ্গে, অন্যান্য বোনেদের শ্বশুর-বাড়ির অবস্থার সঙ্গে তাহার স্বামীর অবস্থার তুলনা করিয়া তাহার লজ্জা হয়। উপায় থাকিতেও শিবনাথ সে উপায় প্রত্যাখ্যান করে, সেজন্য তাহার ক্রোধ হয়। এও তো সে কোন দিন বলে নাই যে, আমার টাকায় তোমার কোনও অধিকার নাই। আর তাহাকে এমন করিয়া গোপন করারই বা প্রয়োজন কি? শিবনাথের নীরবতায় তাই সে আহত না হইয়া পারিল না, বলিল, কথার একটা জবাবই দেন দেবতা। তাতে মান্যি ক্ষয় হয় না।

কি বলব, বল? শিবনাথ আবার একটু হাসিল।

কি বলবে? কেন, কি হল তোমার, তাই বলবে।

হয় নি তো কিছু। কাজেই জিজ্ঞেস করছি, কি বলব?

উঃ, খুব কথা ঢাকতে শিখেছ যা হোক! কিন্তু মুখের চেহারাটা এমন হল কেন, শুনি?

ওটা রোদে ঘুরে ঘুরে হয়েছে।

গৌরী একটু নীরব থাকিয়া বলিল, শাক দিয়ে কখনও মাছ ঢাকা যায় না, চেহারা চাপা দিলেও গন্ধে টের পাওয়া যায়, বুঝলে? শেষ পর্যন্ত সেই আমাকেই বলতে হবে সে আমি বেশ বুঝতে পারছি। তবে সময়ে বললে দোষ কি?

শিবনাথ অপলক দৃষ্টিতে গৌরীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার দৃষ্টিতে, কথায়, মুখের রেখায় কোথাও কি এতটুকু স্নেহ লুকাইয়া নাই? গৌরী সে-দৃষ্টির সম্মুখে অশ্বস্তি বোধ করিল, বলিল, অমন করে তুমি চেয়ে থেকো না বাপু। ওই এক কি ধারার চাউনি তোমার। আমি জানি, চৈত্র মাসে লাটের টাকা দেওয়া হয় নি বলে মহাল সব নিলেমে উঠেছে। আমার কাছে কিন্তু সেই শেষ সময়ে গয়না কি টাকা চেয়ো না যেন; আমি দোব না, বলে রাখছি।

শিবনাথ উত্তপ্ত হইয়া উঠিতেছিল, সে গম্ভীরভাবে বলিল, আমি তো তোমার কাছে চাই নি গৌরী।

চাও নি, কিন্তু টাকা না হলেই চাইতে হবে তো?

না।

আহা, সে তো খুব সুখের কথা।—বলিয়া সে নিজের মনেই বোধ করি বলিল, মাগো, একেই বুঝি জমিদার বলে! এ জমিদারি করার চেয়ে মুটে-মজুর খেটে খাওয়া ভাল; জমিদারি, না, জমাদারি!

শিবনাথের আর সহ্য হইল না, সে কঠোর স্বরে বলিল, গৌরী!

সমান তেজে গৌরী উত্তর দিল, কেন, ধরে মারবে নাকি?

শিবনাথ কঠোর সংযমে আত্মসম্বরণ করিয়া কাঠের মত দাঁড়াইয়া রহিল। গৌরী সহসা ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

ঠাকরুন!

শিবনাথ দেখিল, দুয়ারের সম্মুখে দুর্ভিক্ষের প্রকটমূর্তি সেই খোনা মেয়েটা দাঁড়াইয়া ডাকিতেছে, ঠাকরুন!

নিত্য, রতন বোধ করি জাগিয়াও ঘরের মধ্যে বসিয়া ছিল, স্বামী-স্ত্রীর এই দ্বন্দ্বের মধ্যে বাহিরে আসিতে পারে নাই; এবার ওই মেয়েটার ডাকটাকেই উপলক্ষ্য করিয়া নিত্য দরজা খুলিয়া ঝঙ্কার দিয়া বলিল, কি, কি বটে কি তোর? দুপুরবেলাতেও রেহাই নাই বাবা? যত মড়া কি উদ্ধারণপুরের ঘাটে জড়ো, যত ভিখিরী কি এখানেই এসে জুটেছে!

মেয়েটা ইহাতেও লজ্জা পাইল না, ভয় পাইল না, অনুনয় করিয়া বলিল, টুঁকচে আঁচার দাঁও ঠাঁকরুন, পাঁয়ে পঁড়ি।

রতন বলিয়া উঠিল, ছেঁকা নিগে জিভে, ছেঁকা নিগে। পায় না দড়িমুড়ি, চায় মেঠাই মণ্ডা ছড়াছড়ি।

সকলের আবির্ভাবে গৌরী চোখ মুছিয়া আত্মসম্বরণ করিয়াছিল, সে বলিল, আহা, একটু দাও রতন-ঠাকুরঝি; আহা জিভ তো ওদেরও আছে।

শিবনাথ বাহির হইয়া গেল।

অন্দর হইতে বাহির হইয়া একটা বড় রান্না-ঘর অতিক্রম করিতে হয়, শিবনাথকে সেখানে থমকিয়া দাঁড়াইতে হইল। দরজার মুখেই কতকগুলি বোরকা-পরা মেয়ে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। মর্যাদাশালী মুসলমান-ঘরের স্ত্রীলোক, তাহাতে সন্দেহ নাই। এখানকার সাধারণ চাষী-মুসলমানদের মেয়েরা তো বোরকা পরিয়া বাহির হয় না! কিন্তু এই ভয়ঙ্কর দ্বিপ্রহরে ইঁহারা কোথায় আসিয়াছেন, এখানেই বা দাঁড়াইয়া আছেন কেন? শিবনাথ ফিরিয়া বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিবে অথবা নিত্যকে ডাকিবে ভাবিতেছিল, এমন সময় একটি মহিলা বোরকার একাংশ মোচন করিয়া বলিল, বাপ!

শিবনাথ সসম্ভ্রমে বলিল, বলুন, মা, আমাকে বলছেন? এই দুপুরে আপনারা কোথায় এসেছেন?

বৃদ্ধা ঈষৎ হাসিয়া বলিল, এ ধুপের চেয়েও জ্বালায় জ্বলছি যে বেটা; আর এ সময় ভিন্ন পথঘাট দিয়ে চলবারও যে জো নাই।—বলিয়া একটা পোঁটলা খুলিয়া কতকগুলি রূপার অলঙ্কার ও খানকয়েক সেকেলে জীর্ণ শাল বাহির করিয়া বলিল, জান বাঁচাও বেটা, খোদা তোমার মঙ্গল করবেন। কচি বাচ্চারা না খেয়ে মরে যাবে বেটা, আর আমাদের দুশমনও বাগ মানছে না, পেট জ্বলে খাক হয়ে গেল বাপ। এ রেখে কিছু টাকা—দশটা টাকা আমাদের দাও বেটা।

শিবনাথ স্তম্ভিত হইয়া গেল, চোখে তাহার জল আসিতেছিল। এই সময়ে খোনা মেয়েটা একটা পাতায় মুড়িয়া আচার লইয়া বাহির হইয়া গেল। চোখে তাহার লালসাব্যগ্র জ্বলজ্বলে দৃষ্টি। দৃষ্টি দিয়া লেহন করিতে করিতে সে চলিয়াছে, খাইলে যে ফুরাইয়া যাইবে!

বৃদ্ধা মুসলমানী বলিল, বাপ!

শিবনাথ বলিল, মা!

জান বাঁচাতে পারবি বেটা? ভুখের ভাত দিতে পারবি মানিক?

শিবনাথ বলিল, এগুলো আপনারা নিয়ে যান মা, আমি দশটা টাকা আপনাদের দিচ্ছি।

মাত্র বারোটি টাকা আজ তাহার মজুত আছে, কিন্তু সে 'না' বলিতে পারিল না।

বৃদ্ধা বলিল, বাপ, খোদা তোমার উপর খোশ থাকবেন; কিন্তু ওই শাল আমরা একদিন গায়ে দিতাম; ভিখ তো মাগতে পারব না মানিক।

বেশ তো, আপনাদের হলে আমাকে দিয়ে যাবেন ফের।

না বেটা; এমন বছরে কে বাঁচবে কে থাকবে, ঠিক তো কিছু নাই বাপ। দেনাদার হয়ে গিয়ে খোদার দরবারে কি জবাব দিব বেটা? এগুলো তুমি রেখে দাও।

শিবনাথ তাহাদের আহ্বান করিয়া অন্দরে লইয়া গিয়া সসম্ভ্রমে বসাইল।

নিত্য বলিল, দাদাবাবু, বউদিদি বলছেন, উনি টাকা দিচ্ছেন এগুলো রেখে।

শিবনাথ কোনও উত্তর দিল না, কিন্তু মুখে তাহার বিচিত্র হাসি খেলিয়া গেল; গৌরী শুধু টাকাই বোঝে না, সুদও বোঝে, লাভলোকসানে তাহার জ্ঞান টনটনে! সে টাকা দশটি বৃদ্ধার হাতে দিয়া বলিল, সুদ আমি নেব না মা, সুদ আপনাদের শাস্ত্রে নিষেধ, আমাদেরও পূর্বপুরুষের নিষেধ আছে।

বৃদ্ধার মুখে এতক্ষণে হাসি দেখা দিল, সে হাসিয়া বলিল, আচ্ছা বেটা, আচ্ছা। মঙ্গল হবে তোমার বাপ। আচ্ছা বাপ, তুমি বাহিরে চল থোড়া, আমরা বহুমার সঙ্গে একটু আলাপ করে নিই।

শিবনাথ বাহিরে চলিয়া গেল। পথের উপর আবার আসিয়া দেখিল, ঠাকুর-বাড়ির সম্মুখে ক্ষুধার্তের দল এখনও তেমনই গোলমাল করিতেছে। রাখাল সিং, কেষ্ট সিং, কুড়ারাম, সতীশ কেহ এখনও ফিরে নাই, পথেও যতদূর দৃষ্টি যায় কাহাকেও দেখা যায় না।

আটাশ

রাখাল সিং, কেষ্ট সিং ফিরিল প্রায় অপরাহ্ণে। তাহারা দুইজনেই শুধু ফিরিয়া আসিল, সঙ্গে প্রজাদের কেহ ছিল না। শিবনাথ বুঝিল, প্রজারা আসে নাই। সম্পত্তি রক্ষার জন্য কাঁদিয়া অনুরোধ জানাইতে যাহারা আসিয়াছিল, টাকা দিবার সময় তাহারা পর্যন্ত আসে নাই। কি করিবে তাহারা, পাইবে কোথায়? কি হইল, এ সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে শিবনাথের সাহস হইল না; সংবাদ জানাই আছে, তবু প্রত্যক্ষভাবে সে সংবাদ শুনিতে যেন তাহার ভয় হইতেছিল। সে অন্য দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া নীরবে বসিয়া রহিল।

রাখাল সিং একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, প্রজাদের কাছে কোন আশাই নেই বাবু, মানে—দেখাই করলে না কেউ।

কেষ্ট সিং বলিল, দেখা যে এক বেটারও পেলাম না নায়েববাবু, নইলে দেখতাম, সব কেমন হাজির না হয়!

রাখাল সিং বলিলেন, তাদেরও তো ইজ্জতের ভয় আছে কেষ্ট। মানে—ভয়ে তারা দেখা করলে না।

শিবনাথ এতক্ষণে বলিল, প্রজাদের তা হলে দেখাই পান নি?

না, খবর পেতেই সব লুকিয়ে পড়ল। সামান্যক্ষণ নীরব থাকিয়া রাখাল সিং আবার বলিলেন, অবিশ্যি লুকিয়ে পড়া ভুল, মানে—এর পরে তো আছে। তবে আজ এক হিসেবে তারা ভালই করেছে, মানে—দেখা হলেই ধরুন, দুটো কড়া কথা শুনত; কেউ জবাব যদি করত, তা হলে আবার আমাদের জেদও চাপত।

শিবনাথ বলিল, তা হলে তো দেখছি নিরুপায়। একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে নীরব হইল। তাহার দীর্ঘনিশ্বাসটা প্রচণ্ডভাবে আঘাত করিল রাখাল সিংকে। তিনি মাথা হেঁট করিয়া মাটির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন, চোখ হইতে ফোঁটা ফোঁটা জল টপটপ করিয়া মাটিতে ঝরিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। কেষ্ট একলা থামের গায়ে মুখ লুকাইয়া দাঁড়াইয়া ছিল, তাহার দীর্ঘ দেহখানা লইয়া সে যেন ওই থামের সঙ্গে মিশিয়া যাইতে চায়। এই সময়ে অন্য একটি গ্রাম হইতে গোমস্তা কুড়ারাম, চাকর সতীশ ও মাহিন্দার দুইজন ফিরিয়া আসিল। কুড়ারাম বলিল, নাঃ, একটি পয়সার ভরসা নেই বাবু।

এ কথায় কেহ কোনও জবাব দিল না, ওই একটি কথার পর পূর্বের মতই সকলে নিরুত্তর হইয়া বসিয়া রহিল। সে স্তব্ধতা ভঙ্গ করিল নিত্য-ঝি; সে আসিয়া বলিল, এই

যে নায়েববাবু, মিশ্রি মাশায়, সতীশ, সবাই এসে বসে আছেন! বেশ মানুষ মাশায় আপনারা, বলি, আর খাবেন কখন গো?

অন্য কেহ এ কথার জবাব দিল না, জবাব দিল সতীশ; সে বলিল, হুঁ, তা খেতে হবে বইকি, তা নায়েববাবু, গোমস্তা মাশায় এঁরা না গেলে আমরা যাই কি করে?

রাখাল সিং বলিলেন, এ অবেলায় আমি আর খাব না নিত্য, একেবারে—

বাধা দিয়া নিত্য বলিল, অবেলা তো বটে, কিন্তু বউদিদি যে এখনও খান নি গো!

কেন?

কেনে আবার কি গো! ছেলেমানুষ হলেও তিনিই তো বাড়ির গিন্নী; বললেন, এতগুনো নোক খায় নি, আমি কি করে খাব? রতন-দিদিও খায় নি, আমিও না। কেবল দাদাবাবু, তাও সে নামমাত্র খেতে বসা।

কেষ্ট সিং তাড়াতাড়ি আপনার জামা পাগড়ি খুলিয়া ফেলিয়া বলিল, দেখ দেখি বউদিদির কাণ্ড! এ কষ্ট করবার তাঁর কি দরকার? হুঁ!

নিত্য বলিল, আর বোলো না বাপু, কচি বউ, তার সাধ্যি এই সংসার চালানো? সারা হয়ে গেল বেচারী; কাল একবার বমি করেছেন, আজ একবার করেছেন।

শিবনাথ বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল, কই, আমি তো কিছু শুনি নি?

নিত্য বলিল, আপনি পাগলের মত ঘুরছেন, এর মধ্যে আর আপনাকে সে কথা বলে কি করব? নিত্যি এ বাড়িতে উপোস, আজ এ পালন, কাল ও পর্ব; পিত্তি পড়ছে, অম্বল হচ্ছে, তার আর বলব কি, বলুন?

নিত্যর কথা শেষ হইতেই সতীশ বলিল, তা হলে উঠুন নায়েববাবু, তেল-টেল দেন গায়ে। বউদিদি বসে আছেন, খান নি এখনও।

নায়েব বলিলেন, চল নিত্য, আমরা এই গেলাম বলে।

নিত্য চলিয়া গেল। রাখাল সিং অত্যন্ত সঙ্কোচভরে বলিলেন, একটা কথা বলব বাবু, মনে কিছু করবেন না। মানে—সম্পত্তি আপনার মানেই বউমায়ের, আবার বউমায়ের টাকা বলতে সেও আপনারই—

বাধা দিয়া শিবনাথ বলিল, মানে সংসারে অনেক রকমই হয় সিং মশায়, কিন্তু সব মানে সব ক্ষেত্রে খাটে না। সে হয় না, সে হবে না। আর সে যে একটা দারুণ লজ্জার কথা, ছিঃ, ও কথা ছেড়ে দিন।

রাখাল সিং একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া তেল মাখিতে-বসিলেন। কুড়ারাম মিশ্র এবার সঙ্কোচভরে বলিল, কিন্তু একটা উপায়ও তো করতে হবে! সম্পত্তি তো এ ভাবে ছেড়ে দেওয়া যায় না!

শিবনাথ অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল, আপনারা স্নান করে খেয়ে নিন, সন্ধ্যার পর আমি নিজে একবার প্রজাদের কাছে যাব। দেখি, কিছু হয় কি না!

রাখাল সিং বলিলেন, কিছু টাকা হলেও আপনাকে নিয়ে কালেক্টর সাহেবের কাছে দাঁড়িয়ে নাবালক বলে সময় করে নেব আমি।

শিবনাথ বলিল, চলুন, একবার নিজে গিয়ে আমি দেখব, প্রজারা কি বলে!

কেষ্ট সিং দুই হাতে আপনার মাথা সজোরে চাপিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল, না না না। সে হবে না দাদাবাবু।

শিবনাথ তাহার দিকে চাহিয়া দেখিল, সে কাঁদিতেছে। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ম্লান হাসি হাসিয়া শিবনাথ বলিল, কাঁদছ কেন কেষ্ট সিং? সময়ে মানুষকে সবই করতে হয়।

কেষ্ট সিং এবার হাউহাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, আপনি যাবেন বাবু, প্রজাদের কাছে ভিক্ষে চাইতে?

শিবনাথ বলিল, জোর-জুলুম করে টাকা আদায় করার চেয়ে মিষ্টি কথায় নিজে হাত পেতে টাকা আদায় অনেক ভাল কেষ্ট সিং। ওকে ভিক্ষে করা বলে না।

সন্ধ্যা হইতে আর বিশেষ বিলম্ব ছিল না।

শিবনাথ একটা অপেক্ষাকৃত নির্জন রাস্তা ধরিয়া গ্রাম হইতে বাহির হইয়া মাঠে আসিয়া পড়িল। সদর-রাস্তা দিয়া কিছুতেই তাহাকে আসিতে দেওয়া হয় নাই, রাখাল সিং ও কেষ্ট সিং ঘোর আপত্তি তুলিয়াছিল।

তৃণচিহ্নহীন ধূলিধূসর মাঠ, যতদূর দৃষ্টি যায় ধুধু করিতেছে। শিবনাথের পিছনে রাখাল সিং ও কেষ্ট সিং মাথা হেঁট করিয়া চলিতেছিল; শিবনাথের এই যাওয়াটাকে কিছুতেই তাহারা সহজভাবে গ্রহণ করিতে পারে নাই। লজ্জায় যেন তাহাদের মাথা কাটা যাইতেছে। রাখাল সিং সবই বোঝেন, কিন্তু সমস্ত বুঝিয়াও তিনি স্বচ্ছন্দে মাথা তুলিতে পারিতেছেন না। প্রজারা চারি আনা করিয়া দিলেও তো দুই শত আড়াই শত টাকা হইবে! কিছুদূর আসিয়া শিবনাথ দেখিল, মাঠের মধ্যে এক পুকুরের পাশে একটা জনতা জমিয়া আছে। কেষ্ট সিং থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, একটু ঘুরে চলুন বাবু।

শিবনাথ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া প্রশ্ন করিল, কেন?

অনেক লোক রয়েছে, ওই দেখুন।

কেন, কি হয়েছে ওখানে?

বাবুরা পুকুর কাটাচ্ছেন।

বাঃ, একটা ভাল কাজ হচ্ছে।

আজ্ঞে হাঁ্যা ; একটু ঘুরে চলুন।

কেন, ঘুরে যাবার দরকার কি ?

আজ্ঞে, ওরা দেখবে, কথাটা জানাজানি হবে বাবু।

হাসিয়া শিবনাথ বলিল, হোক। এগুলো মিথ্যে লজ্জা কেষ্ট সিং।

রাখাল সিং মৃদুস্বরে বলিলেন, মানে—একটু ঘুরে গেলেই বা ক্ষেতি কি বাবু?

শিবনাথ দৃঢ়স্বরে বলিল, প্রয়োজন নেই সিং মশায় ; আসুন, এতে কোনও লজ্জা আমি দেখছি না। গ্রামে গ্রামে তো আমি অনেক ঘুরে বেড়িয়েছি।

আজ্ঞে বাবু, সে এক আর এ এক। সে যেতেন আপনি তাদের বাঁচাতে, আর—। রাখাল সিং কথাটা শেষ করিতে পারিলেন না, তাঁহার মুখে যেন বাধিয়া গেল। কয়জন মজুর এই দিকেই আসিতেছিল, তাহারা শিবনাথকে দেখিয়া লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া দ্রুতপদে স্থানটা অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল। শিবনাথ তবুও তাহাদের চিনিতে পারিল, তাহারা এই গ্রামেরই চাষী-গৃহস্থ। মধ্যে মধ্যে নিজেদের শক্তিতে না কুলাইলে ইহারা মজুর খাটাইয়া আসিয়াছে, নিজেরা কখনও জনমজুর খাটে নাই। শিবনাথ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। আর এক দল মজুর তাহাদের পিছনে আসিয়া পড়িয়াছিল ; তাহাদের কয়টা কথা কানে আসিয়া পৌছিল। একজন বলিতেছিল, সারা দিন খেটে মোটে ছটা পয়সা, একসের চাল হবে না, কি যে করব !

আর একজন বলিল, মজাতে আছে বাবুরা, খেছে-দেছে, জামা ফটফটিয়ে বেড়াইছে। গাঁ ডুবলে একহাঁটু জল—আমরা বানে ডুবে মলাম, ওরা ডাঙায় দাঁড়িয়ে বান দেখছে।

কেষ্ট সিং ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল, সে ফিরিয়া দাঁড়াইল। শিবনাথ কঠিন দৃষ্টিতে তাহাকে তিরস্কার করিয়া নিরস্ত করিল, বলিল, চুপ করে থাক। ওসব শোনে না, শুনতে নেই।

কিছুদূর আসিয়া দেখিল, একটা বটগাছের তলায় সাঁওতালদের কয়েকটি উলঙ্গ ছেলে কি কুড়াইয়া কুড়াইয়া খাইতেছে। শিবনাথ লক্ষ্য করিল, খাইতেছে তাহারা বটের ফল। উপরের দিকে চাহিয়া দেখিল, গুটি-দুয়েক সাঁওতালের মেয়ে গাছে চড়িয়া বটফল সংগ্রহ করিতেছে।

কেষ্ট বলিল, আজকাল সাঁওতালেরা বট-বিচি খেতে আরম্ভ করেছে। পাকুড়-বিচি মায় পাকুড়-পাতা খেয়ে সব শেষ হয়ে গেল। ওই দেখুন কেনে! অদূরেই একটা প্রচণ্ড গাছ পত্রহীন শাখা-প্রশাখা মেলিয়া কঙ্কালের মত দাঁড়াইয়া ছিল, কেষ্ট আঙুল দেখাইয়া সেই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিল।

শিবনাথ থমকিয়া দাঁড়াইল। সত্যই প্রায় নিঃশেষ করিয়া অশ্বত্থ-গাছটার পাতা-

গুলা খাইয়া ফেলিয়াছে, একেবারে মাথার উপরে কয়েকটি হালকা সরু ডালের মাথায় দুই-চারিটা পাতা গরম বাতাসে থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। মানুষের ওখানে ওঠা চলে না।

রাখাল সিং বলিলেন, একটু বসবেন? অনেকটা পথ—

শিবনাথ বলিল, না, চলুন। চলিতে চলিতেই সে দেখিতেছিল, মাঠের মধ্যে গত বৎসরের ধানের গোড়ার চিহ্ন পর্যন্ত নাই, ঘাস নাই, জল নাই, যতদূর দৃষ্টি চলে মাঠ যেন ধুধু করিতেছে, মাটির বুক ফাটলে ভরিয়া উঠিয়াছে, অসংখ্য ফাটল। ফাটলে ফাটলে পৃথিবীর বুকের চেহারা হইয়াছে ঠিক সবুজ-সারাংশ-নিঃশেষিত জীর্ণ তন্তুসার পাতার মত। সম্মুখেই একটা প্রশস্ত দীর্ঘ ফাটল, সেটা পার হইতে হইতে শিবনাথ অনুভব করিল, ফাটলের ভিতরটা গরম বাষ্পের মত উত্তপ্ত বাতাসে ভরিয়া উঠিয়াছে; ধীরে ধীরে সে উত্তপ্ত বাতাস বিকিরিত হইতেছে জ্বরোত্তপ্তের উষ্ণ নিশ্বাসের মত।

গন্তব্য গ্রামখানি বেশী দূর নয়; দূরত্ব দুই মাইলের কমই, বেশী হইবে না। সন্ধ্যার মুখেই তাহারা গ্রামের প্রান্তে আসিয়া পৌছিল। অদূরেই গ্রাম, তবুও কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না, অস্বাভাবিক একটা স্তব্ধতায় সমস্ত যেন মুহ্যমান হইয়া রহিয়াছে। কিছুদূর আসিয়া একটা অন্ধকার নিস্তব্ধ পল্লীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া শিবনাথ বলিল লোকজনের তো কোনও সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না!

কেষ্ট সিং বলিল, আজ্ঞে এটা বাউরীপাড়া।

সে জানি। কিন্তু বাউরীরা সব গেল কোথায়?

পেটের জ্বালায় সব পালিয়েছে বাবু। কোথাকার কলে সব খাটতে গিয়েছে।

শিবনাথ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া অগ্রসর হইল। বাউরীপাড়ার পর খানিকটা পতিত জায়গার ব্যবধান পার হইয়া সদ্‌গোপপল্লীতে আসিয়া তাহারা প্রবেশ করিল।

আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে, কিন্তু গাছের ছায়ায় পল্লীপথের উপর জ্যোৎস্না ফুটিতে পারে নাই; অন্ধকার পল্লীপথ জনহীন, নিস্তব্ধ। পথের দুই পাশে চাষী-গৃহস্থের বাড়ি, কিন্তু বাড়িগুলিও প্রায় অন্ধকার, কোথাও এক-আধটা কেরোসিনের ডিবার আলোর ক্ষীণ শিখার আভাস পাওয়া যায় মাত্র; দুই-একটা বাড়িতে দুই-চারিটা কথা বা ছেলের কান্না জল-বুদ্বুদের মত অকস্মাৎ পর পর কতকগুলি উঠিয়া আবার স্তব্ধ হইয়া যাইতেছে। মধ্যে মধ্যে দুই-একটা কুকুর এক-আধ বার চীৎকার করিয়া ভয়ে আশপাশের গলির মধ্যে ছুটিয়া পলাইতেছিল। একখানি বাড়ির সম্মুখে আসিয়া কেষ্ট সিং হাঁক দিল, মোড়ল, বড় মোড়ল!

উত্তর আসিল, কে?

করে এই—, সামান্ত পাঁচ টাকাও ভরাতে পারলাম না হুজুর, সমস্ত গাঁ ঝেঁটিয়ে দু পয়সা চার পয়সা করে আপনার নজর—

অসম্বদ্ধ অসমাপ্ত কথা, কিন্তু শিবনাথ বুঝিল অনেক। সে আর দ্বিধা করিল না, পঞ্চাননের হাত হইতে পয়সা, আনি, দুয়ানির মুঠি আপন হাতে তুলিয়া লইল।

এই যাওয়ার কথাটা শিবনাথ বাড়িতে বলিয়া না গেলেও কথাটা গোপন ছিল না। শুনিয়া গৌরীর সর্বাঙ্গ যেন শানিত দীপ্তিতে ঝলকিয়া উঠিল। অগণ্য চাষী-প্রজার কাছে স্বয়ং গিয়া খাজনা দিতে বলাটা তাহার কাছে ভিক্ষা করা ছাড়া আর কিছু মনে হইল না। সে মনে মনে 'ছি ছি' করিয়া সারা হইল, শিবনাথের এই উঞ্ছ-প্রবৃত্তিতে তাহার প্রতি ঘৃণায় তাহার অন্তরটা ভরিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে রাগেও সে হইয়া উঠিল প্রখর। ওই নগণ্য তুচ্ছ চাষী-প্রজার চেয়েও সে হেয়, তাহাদের চেয়েও সে শিবনাথের পর? কই, একবারও তো মিষ্ট কথায় অনুনয় করিয়া সে তাহাকে বলিল না, গৌরী, এ বিপদে তুমি মুখ তুলিয়া না চাহিলে যে আর উপায় নাই! ঘৃণায় ক্রোধে জর্জর হইয়া গৌরী নীরবে শিবনাথের প্রতীক্ষায় বসিয়া ছিল। শিবনাথ ফিরিতেই সে বলিল, হ্যাঁগা, তুমি নাকি প্রজাদের কাছে ভিক্ষা চাইতে গিয়েছিলে?

মুহূর্তে শিবনাথের মস্তিষ্ক উত্তপ্ত হইয়া উঠিল, সে কঠিনভাবেই জবাব দিল, হ্যাঁ।

বাঁকানো ছুরির মত ঠোঁট দুইটি বাঁকাইয়া হাসিয়া গৌরী বলিল, কত টাকা নিয়ে এলে, দাও, আমি আঁচল পেতে বসে আছি।

শিবনাথ রূঢ় দৃষ্টিতে গৌরীর দিকে চাহিয়া রহিল, এ কথার কোনও জবাব দিল না।

উত্তর না পাইয়া গৌরী আবার বলিল, কি ভাবছ? হাজার দরুনে টাকা এ শাড়ির আঁচলে মানাবে না, না কি? বল তো বেনারসী শাড়িখানাই না হয় পরি।

শিবনাথ এবার বলিল, শাড়ির কথা ভাবছি না গৌরী, ভাবছি তোমার পুণ্যের কথা। যে ধন আমি এনেছি, সে ধন গ্রহণ করবার মত পুণ্যবল তোমার এখনও হয় নি। হলে দিতাম।

গৌরী বলিল, কেন, তোমার পুণ্যের অদ্ধেক তো আমার পাবার কথা গো; তবে কুলুবে না কেন শুনি?

পাবার কথাও বটে, আমি দিতেও চেয়েছি, কিন্তু তুমি নিতে পারলে কই গৌরী? সে হলে তোমায় বলতে হত না, আমি এসেই তোমাকে সব ঢেলে দিতাম।

গৌরী এবার জ্বলিয়া উঠিল, অন্তরের জ্বালায় উপরের ভদ্রতার আবরণটুকুও

খসাইয়া দিয়া সে নির্মমভাবে বলিয়া উঠিল, ছি ছি, তুমি এত হীন হয়েছ, ছি! আমি যে 'ছি ছি' করে মরে গেলাম!

শিবনাথও আর সহ্য করিতে পারিতেছিল না, সেও এ কথার উত্তরে নির্মমভাবেই গৌরীকে আঘাত করিত, কিন্তু নায়েব রাখাল সিংয়ের আকস্মিক আবির্ভাবে সেটুকু আর ঘটিতে পারিল না। রাখাল সিং ব্যস্ত হইয়া আসিয়া বলিলেন, সদর থেকে সায়েব-সুবো, উকিল, মোক্তার সব দুর্ভিক্ষের জন্যে ভিক্ষে করতে এসেছেন। আমাদের কাছারির দোরে এসে দাঁড়িয়েছেন, শিগগির আসুন।

অন্দর হইতে কাছারি-বাড়ি যাইবার অর্ধপথে আসিয়াই শিবনাথ অনুভব করিল, মূল্যবান সিগারেটের ধোঁয়ার গন্ধে বায়ুস্তর যেন মোহময় হইয়া উঠিয়াছে। কাছারিতে আসিয়া দেখিল, গোটা বাড়িটাই উজ্জ্বল আলোয় আলোময় হইয়া গিয়াছে। একটা লোকের মাথায় একটা পেট্রোম্যাক্স-আলো জ্বলিতেছে, তাহার পিছনে ভিক্ষার্থী বিশিষ্ট ব্যক্তির দল। ভিক্ষার কাপড়টার এক প্রান্ত ধরিয়াছে জেলার অতি উচ্চপদস্থ এক রাজকর্মচারী, অন্য প্রান্ত ধরিয়াছেন জেলার এক লক্ষপতি ধনী; তাঁহাদের পশ্চাতে উকিল মোক্তার ও অন্যান্য সরকারী দল। হাতে হাতে প্রায় দশ-বারোটা সিগারেট হইতে ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাক খাইয়া বাতাসে মিশিয়া যাইতেছে।

পঞ্চাননকে মনে মনে শত শত ধন্যবাদ দিয়া শিবনাথ সেই পয়সা, আনি, দুয়ানির মুষ্টি ভিক্ষাপাত্রে ঢালিয়া দিয়া বাড়ি ফিরিল। গভীর চিন্তায় আচ্ছন্নের মত সে বাড়িতে প্রবেশ করিল। কিন্তু গৌরীর তীক্ষ্ণ কঠোর কণ্ঠস্বরে তাহার সে চিন্তার একাগ্রতা ভাঙিয়া গেল। গৌরী নিত্যকে বলিতেছিল, খবরদার, ওকে আর বাড়ি ঢুকতে দিবি না। বলছি, বসে খা; তা না, আঁচলে বেঁধে নিয়ে যাবে, যুগিয়ে রাখবে! নিতি দুবেলা ওকে আচার দিতে হবে!

শিবনাথ দেখিল, ওদিকের দুয়ারে দাঁড়াইয়া সেই খোনা মেয়েটা। মেয়েটা আবার মুড়ি ও আচার চাহিতে আসিয়াছে। ধমক খাইয়াও মেয়েটা কিন্তু নড়িল না, তেমনই ভাবেই দাঁড়াইয়া রহিল, না লইয়া সে এক পা নড়িবে না। মধ্যে মধ্যে আপনার দাবিটা সে মনে পড়াইয়া দিতেছিল, এঁই এঁতটুঁকুন আঁঙুলের ডঁগায় কঁরে দাঁও ঠাঁকরুন! এঁকটুঁকুন।

শিবনাথ উপরে উঠিয়া গেল। কোনও উপায় আর নাই। পৈতৃক সম্পত্তি চলিয়াই যাইবে।

উনত্রিশ

গভীর রাত্রিতেও শিবনাথ বিনিদ্র হইয়া বসিয়া ওই কথাই ভাবিতেছিল। ওদিকে খাটের উপর গৌরী ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। প্রথম কিছুক্ষণ সেও জাগিয়া ছিল, তাহারই মধ্যে কয়েকটা বাঁকা কথাও হইয়া গিয়াছে। শিবনাথ বরাবর নিরুত্তর থাকিবারই চেষ্টা করিয়াছে, ফলে অল্পেই পালাটা শেষ হইয়াছে। তারপর কখন গৌরী ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। গৌরীর ঘুমটা একটু বেশী, সেজন্য শিবনাথ ভাগ্য-দেবতার নিকট কৃতজ্ঞ। ঘুম কম হইলে—শিবনাথ রাত্রির কথা ভাবিয়া শিহরিয়া উঠে।

অনেক চিন্তা করিয়া করিয়া সে যেন ক্রমে নিশ্চিন্ত হইয়া আসিতেছে। উপায় যেখানে নাই, সেখানে চিন্তা করিয়া কি করিবে? উপায় ছিল—গৌরী যদি তাহার জীবনে নিজের জীবন দুইটি নদীর জলধারার মত মিশাইয়া দিতে পারিত, তবে উপায় ছিল। গৌরীর টাকার কথা মনে করিয়াই শুধু একথা ভাবে নাই। সে যদি শিবনাথের আদর্শকে গ্রহণ করিতে পারিত, তবে যে সে প্রপার্টি ইজ থেফ্‌ট—এ কথা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়া গৌরীর হাত ধরিয়া এ সমস্ত বর্জন করিতে পারিত। জীবিকা? এতবড় বিস্তীর্ণ দেশ—মা-ধরিত্রীর প্রসারিত বক্ষ, তাহারই মধ্যে তাহারা স্বামী-স্ত্রীতে স্তন্যপায়ী শিশুর মত মায়ের বুক হইতে রস সংগ্রহ করিত। গৌরীর দিকে চাহিয়া সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। এ কি! গৌরীর গায়ের গহনা কি হইল? এ যে হাতে কয়গাছা চুড়ি ও গলায় সরু একগাছি বিছাহার ভিন্ন আর কিছুই না! গহনাগুলি গৌরী খুলিয়া রাখিয়াছে। বোধ করি তাহার দৃষ্টিপথ হইতে সরাইবার জন্যই খুলিয়া রাখিয়াছে, হয়তো বা নিরাপদ করিবার জন্য মামাদের বাড়িতে ম্যানেজারের জিম্মায় রাখিয়া আসিয়াছে।

সহসা সে চমকিয়া উঠিল। নীচে কোথায় যেন একটা শব্দ উঠিতেছে—পাখির পাখা ঝটপট করার মত শব্দ। একটা দুইটা নয়, অনেকগুলা পাখি যেন একসঙ্গে অন্ধকারের মধ্যে অসহায়ভাবে উড়িবার চেষ্টা করিতেছে বলিয়া বোধ হইল। বাড়ির সংলগ্ন ঠাকুরবাড়ির আটচালায় অনেকগুলি পায়রা থাকে, বোধ হয় কোন কিছুর তাড়া খাইয়া এমন ভাবে আত্মরক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছে। ঘর হইতে বাহিরের বারান্দায় আসিয়া সে ঠাকুরবাড়ির দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। আটচালার ভিতর গাঢ়তর অন্ধকারের মধ্যে যেন একটা সচল ছায়ামূর্তি সে দেখিতে পাইল। মানুষের মত দীর্ঘ সচল ছায়ামূর্তি। অন্ধকারে যেন একটা প্রেত নাচিয়া নাচিয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছে। শিবনাথ ঘরে প্রবেশ করিয়া টেবিলের উপর হইতে টর্চ ও দেওয়ালের গায়ে ঝুলানো

তলোয়ারখানা খুলিয়া লইয়া নিঃশব্দে নীচে নামিয়া গেল। ঠাকুরবাড়ি ও অন্দরের মধ্যে একটি মাত্র দরজা। দরজাটি সন্তর্পণে খুলিয়া সতর্ক পদক্ষেপে আটচালার একটা থামের আড়ালে আসিয়া দাঁড়াইল। মূর্তিটার কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নাই, কোন দিকে লক্ষ্য করিবার যেন তাহার অবসর নাই। একটা লম্বা লাঠি হাতে সে উন্মত্তের মত ওই পায়রাগুলাকে তাড়া দিয়া দিয়া ফিরিতেছে, বার বার আঘাত করিবার চেষ্টা করিতেছে। ক্রমশই যেন শিবনাথের বিস্ময় বাড়িতেছিল। মূর্তিটা স্ত্রীলোকের। অপটু হাতে লাঠি-চালনা, নতুবা এতক্ষণে দুই-চারিটা পায়রা আঘাত পাইত। মূর্তিটা এবার এদিক হইতে পিছন ফিরিতেই শিবনাথ টর্চটা জ্বালিয়া তলোয়ারখানা উদ্যত করিয়া তাহাকে আহ্বান করিল, কে?

আলোকের দীপ্তি এবং মানুষের কণ্ঠস্বরের রূঢ় প্রশ্নে মূর্তিটা মুখ ফিরাইল এবং সভয়ে একটা অনুনাসিক আর্তনাদ করিয়া উঠিল, আঁ—!

শিবনাথ এবার বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গেল। এ কি, এ যে সেই জীর্ণ খোনা মেয়েটা! পর-মুহূর্তেই মেয়েটা সশব্দে মাটিতে পড়িয়া গেল; শিবনাথের মনে হইল, মেয়েটা বোধ হয় মূর্ছিত হইয়া পড়িয়াছে। টর্চ জ্বালিয়া তাহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিল, তাই বটে, সে নিথর হইয়া পড়িয়া আছে। সে ছুটিয়া বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিয়া একটা ঘটি হাতে আবার ফিরিয়া গেল, এ কি! মূর্ছিত মেয়েটার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া একটা কঙ্কালসার পুরুষ চাপা গলায় তাহাকে বার বার ডাকিয়া সচেতন করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছে। ও কে? শিবনাথ বুঝিল, এই মেয়েটার সঙ্গী এই লোকটা, বোধ হয় কোথাও লুকাইয়া ছিল। তাহাকে গ্রাহ্য না করিয়াই শিবনাথ মেয়েটার মুখে জলের ছিটা দিতে আরম্ভ করিল। দুই-একবার ছিটা দিতেই সে চোখ মেলিয়া সভয়ে কাঁদিয়া উঠিল, মেরেন না বাঁবু মাশায়।

পুরুষটাও কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, মেরেন না মাশায় ওকে।

শিবনাথ প্রশ্ন করিল, কি করছিলি তুই এখানে?

মেয়েটা জোড়হাত করিয়া বলিল, এঁকটি পায়রা—

পায়রা! মানুষের লোভ দেখিয়া শিবনাথ স্তম্ভিত হইয়া গেল, এই অবস্থাতেও এমন ভাবে মাংস খাইবার প্রবৃত্তি!

মেয়েটা আবার বলিল, ডাঁক্তার উয়োকে মাংসের ঝোঁল দিঁতে বঁলেছে মাশায়, লঁইলে উ বাঁচবে না।

ও তোর কে?

মেয়েটা চুপ করিয়া রহিল, পুরুষটা এতক্ষণ বসিয়া কামারের হাপরের মত হাঁপাইতেছিল, সে এবার বলিল, আজ্ঞেন, আমার পরিবার মাশায়।

আজ্ঞে হ্যাঁ। মরতে বঁসেছে মাশাঁয়, ডাঁক্তার বঁললে, মাঁংসের ঝোঁল—মুরগীর, নয় তোঁ পাঁয়রার ঝোঁল এঁকটুকুন কঁরে না দিলে উ বাঁচবে না।

পুরুষটা বলিল, পঞ্চাশ বার বারণ করলাম, মাশায়, তা শুনলে না। আমাকে বাইরে রেখে ওই জলের নালা দিয়ে ঢুকে—। সে আবার হাঁপাইতে লাগিল। হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, মাগী আমাকে নিশ্চিন্দি হয়ে মরতেও দেবে না বাবু।

মেয়েটা মুহূর্তে যেন স্থান কাল সব ভুলিয়া গেল, সে তিরস্কার করিয়া স্বামীকে বলিল, এঁই দেঁখ, দিনরাত তুঁ মরণ মরণ কঁরিস না বঁলছি, ভাঁল হঁবে না। সে স্বামীর বুকে হাত বুলাইতে আরম্ভ করিল।

পুরুষটা দম লইয়া আবার বলিল, বাবুদের পায়খানা সাফ করে পয়সা নিয়ে ওষুধ এনে আমার আর লাঞ্ছনার বাকি রাখছে না বাবু। ওষুধ না খেলে আমাকে ধরে মারে। ভিখ করে যা আনবে—ভাত, আচার, মুড়ি সব আমাকে খাওয়াবে। না খেয়ে খেয়ে মাগীর দশা দেখেন কেনে!

শিবনাথ নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। তাহার সমস্ত অন্তর বিপুল তৃপ্তিতে ভরিয়া উঠিয়াছে; কুৎসিত জীর্ণ দেহের মধ্যে জীবনের এমন সুমধুর প্রকাশ দেখিয়া তাহার সকল ক্ষোভ যেন মিটিয়া গিয়াছে। সে বলিল, তোমরা এই মন্দিরের বারান্দায় শুয়ে থাক। কাল থেকে আমার বাড়িতেই থাকবে। ওষুধ-পথ্যির সব ব্যবস্থা আমি করে দোব, বুঝলে?

মনে মনে যুগল বিগ্রহের মতই সমাদর করিয়া তাহাদের শোয়াইয়া শিবনাথ বাড়িতে আসিয়া আবার চেয়ারের উপর বসিল। চোখের ঘুম যেন আজ ফুরাইয়া গিয়াছে। সহসা তাহার মনে হইল, দুঃখ, দারিদ্র্য, স্বার্থপরতা, লোভ, মোহের ভার হিমালয়ের ভারের মত মনুষ্যত্বের বুকের উপর চাপিয়া বসিয়া আছে, সেই ভার ঠেলিয়াই মনুষ্যত্বের আত্মবিকাশ অহরহ চলিয়াছে। কঠিন মাটির তলদেশ হইতে মাটি ফাটাইয়া যেমন বীজ অঙ্কুরিত হয়, তেমনই ভাবেই সে যুগে যুগে উর্ধ্বলোকে চলিয়াছে, এই ভার ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়াই চলিয়াছে। জানালা দিয়া আকাশের দিকে সে চাহিয়া দেখিল, গাঢ় নীল আকাশ, পুঞ্জ পুঞ্জ জ্যোতির্লোকের সমারোহে রহস্যময়। সে সেই রহস্য-লোকের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। পশ্চিম-দক্ষিণ কোণটা কেবল গাঢ় অন্ধকার; সহসা দীপ্তির একটা চকিত আভাসও যেন সেখানে খেলিয়া গেল। মেঘ! মেঘ দেখা দিয়াছে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে! শিবনাথ পুলকিত হইয়া জানালায় আসিয়া দাঁড়াইল। দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের মেঘ! মেঘ যেন পরিধিতে বাড়িতেছে, বিদ্যুতের প্রকাশ ঘন ঘন হইতে আরম্ভ করিয়াছে। আঃ, দেশ বাঁচিবে; চৌচির মাটি আবার শান্ত স্নিগ্ধ

অখণ্ড হইয়া উঠিবে। সেই কোমল স্নিগ্ধ মাটির বুকে মানুষ আবার বুক দিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িবে স্তন্যপায়ী শিশুর মত। আবার মা হইবেন সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা শস্যশ্যামলা কমলা কমলদলবিহারণী। এ রূপ মায়ের অক্ষয় রূপ, এ রূপের ক্ষয় নাই; শত শোষণে, পরাধীনতার অসহ বেদনাতেও এ রূপের জীর্ণতা আসিল না।

সহসা তাহার মনে হইল, কাছাড়ি-বাড়ির দরজা হইতে কে যেন ডাকিতেছে! সে বাড়ির ভিতরের দিকের বারান্দায় আসিয়া সাড়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কে?

আজ্ঞে, আমি কেষ্ট সিং।

কি বলছ?

আমি এসেছি শিবু, তাই তোকে খবরটা দিচ্ছি। তুই নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমো, আমি উপায় করেছি।

মাস্টার মহাশয়ের কণ্ঠস্বর। শিবনাথ দ্রুতপদে নীচে নামিয়া গেল।

রামরতনবাবু বলিলেন, দীজ মহাজনস্, শুধু মহাজন কেন, বিষয়ী ক্লাসই একটা অদ্ভুত ক্লাস। বিশ্বাস এরা কাউকে করবে না। এত করে বললাম, তাও না; বলে, নাবালককে টাকা কেমন করে দোব? তখন বললাম, অল রাইট, আমাকে জান তোমরা, আমার সম্পত্তিও তোমরা জান, আমাকে দাও টাকা আমার সম্পত্তি মর্‌গেজ নিয়ে। তাই নিয়ে এলাম।

শিবনাথ বাক্যহীন হইয়া বসিয়া রহিল। আজিকার দিনটা তাহার জীবনের একটি অমূল্য সম্পদ। এমন দিন আর বোধ হয় কখনও আসিবে না। তাহাকে কেন্দ্র করিয়া আজ যেন মানুষের জাগরণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে; আকাশে মেঘ দেখা দিয়াছে।

মাস্টার বলিলেন, আমি সব নোটই এনেছি। সিং মশায় সব গুনে নিচ্ছেন। কিন্তু তুই এমন চুপ করে রয়েছিস কেন? আবার 'নোব না' বলবি না তো? তোকে আমার এক-এক সময় ভয় করে; এমন সেন্টিমেণ্টাল ফুলের মত কথা বলিস! কি বলছিস?

শিবনাথ এবারও কোন উত্তর দিতে পারিল না, নির্বাক হইয়াই সে বসিয়া রহিল। মাস্টার বলিলেন, তোর ঘুম পাচ্ছে, যা তুই, শুগে যা। আমরা সব চালান-টালান লিখে ঠিক করে রাখছি, কাল সকালেই সিং মশায় সদরে চলে যাবেন।

এতক্ষণে শিবু ধীরে ধীরে বলিল, আপনি আমার শিক্ষক—গুরু, আপনার কাছে অনেক পেয়েছি, আজ এই টাকাও আমি নিলাম মাস্টার মশায়।—বলিয়া সে বাড়ির

দিকে চলিয়া গেল। বাড়িতে তখন নিত্য, রতন উঠিয়াছে; উঠানে কেষ্ট সিং মাস্টার মহাশয়ের সঙ্গী লোকটিকে লইয়া দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাকে জলখাবার দিতে হইবে। শিবনাথ উপরে উঠিয়া গেল। এত সাড়া-শব্দের মধ্যেও গৌরী অগাধ ঘুমে আচ্ছন্ন। বিছানার উপর শুইতে গিয়া গৌরীর ঘুমে ব্যাঘাত দিতে তাহার ইচ্ছা হইল না, তাহার উপর এই গরমে এক বিছানায় দুইজনে শোয়াটাও তাহার বড় অস্বস্তিকর বোধ হইল; ঈজি-চেয়ারটার উপরেই শুইয়া সে শ্রান্তভাবে চোখ বুজিল।

ত্রিশ

পরদিন প্রভাতে সে উঠিল পরম নিশ্চিন্ত প্রশান্ত মন লইয়া। বিগত রাত্রির স্মৃতিটা তাহার কাছে স্বপ্নের মত বোধ হইতেছিল। সে চায়ের জন্য তখনও শুইবার ঘরেই বসিয়া ছিল; গৌরী চা লইয়া আসিবে। চায়ের অপেক্ষা গৌরীর প্রতীক্ষাই সে যেন অধিক ব্যগ্রতার সহিত করিতেছিল। গৌরীর উপর বিরূপতাও আজ শান্ত হইয়া আসিয়াছে। কেবলই মনে পড়িতেছে সেই দুইটি জীর্ণ কদাকার নরনারীর কথা। সকাল হইতেই আকাশ মেঘে ছাইয়া গিয়াছে, এলোমেলো বাতাসও বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। বৃষ্টি নামিবে এইবার। চারিদিক হইতেই এ দিনটিকে তাহার মধুর মনে হইতেছিল।

গৌরী চা লইয়া আসিতেই শিবনাথ স্মিত হাসিমুখে তাহাকে যেন সম্বর্ধনা করিয়াই বলিল, বোসো, অনেক কথা আছে।

ক্রোধে অভিমানে গৌরীর অন্তর ভরিয়া উঠিল। কেন, অনেক কথা তাহাকে কেন? অনেক কথা কি, সে তাহা জানে, নিজে সে তাহা যাচিয়া শুনিতেও চাহিয়াছে; দিবার জন্য সে তাহার গহনাগুলিও খুলিয়া গুছাইয়া রাখিয়াছে। মুখ-চোখ লাল করিয়া তাহাকে প্রত্যাখ্যানের কথাও তাহার মনে আছে। আজ কোন্ লজ্জায় এমন স্মিত হাসিমুখে শিবনাথ অনেক কথা বলিতে চাহিতেছে, সে ভাবিয়া পাইল না। তবুও সে যথাসম্ভব আত্মদমন করিয়া বলিল, অনেক কথা শুনে আমি আর কি করব? আর তোমারও উচিত নয়, ঘরের মানসম্মানের কথা পাঁচজনের কাছে বলা।

শিবনাথ ইহাতে রাগ করিল না, বরং আরও খানিকটা হাসিয়াই সে বলিল, তুমি ভয়ানক রাগ করে আছ দেখছি, বোসো বোসো।

গৌরী স্বামীর দিকে কঠিন দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, স্ত্রীর কাছে টাকা চাইতে তোমার লজ্জা করছে না? আর, কি করে তুমি এমন হাসিমুখে তোষামোদ করছ, তাও যে আমি ভেবে পাচ্ছি না!

শিবনাথ চমকিয়া উঠিল, গৌরীর মনের গতিপথের দিক্‌নির্ণয় সে এতক্ষণ করিতে পারে নাই, তাহার নিশ্চিন্ত প্রশান্ত মনশ্চক্ষুর দৃষ্টি সোজা সরল পথেই প্রসারিত ছিল; অকস্মাৎ আশপাশের বাঁকা গলিপথ হইতে গৌরীর বাক্যবাণে আহত হইয়া সে চমকিয়া উঠিল। কিন্তু আঘাতের বেদনা সম্বরণ করিয়াই বলিল, তুমি জান না, টাকা আমার হয়ে গেছে গৌরী, তোমার টাকা আমি চাই নি।

কথাটা শুনিবামাত্র গৌরীর মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, অকারণে তাহার চোখে জল আসিবার উপক্রম করিল। গৌরীর মুখের এ পরিবর্তনে শিবনাথ যেন উৎসাহিত হইয়া উঠিল, সে হাসিতে হাসিতেই বলিল, তোমার টাকা সুদে আসলে দিন দিন গোকুলের

কৃষ্ণচন্দ্রের মত বেড়ে উঠুক। আমি সেখানে পুতনা বা দন্তবক্রের মত হানা দিতে চাই না; তোমার শঙ্কিত হবার কোন কারণ নেই।

গৌরীর চিবুক থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, পর-মুহূর্তে সে মুখ ফিরাইয়া লইয়া দ্রুতপদে ঘর হইতে যেন ছুটিয়াই পলাইয়া গেল। শিবনাথ নীরবে কিছুক্ষণ তাহার গমনপথের দিকে চাহিয়া থাকিয়া একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কাছারি-বাড়ি যাইবার জন্য উঠিল। গতরাত্রির সুখস্মৃতির আনন্দ প্রভাতেই গৌরীর উষ্ণ নিশ্বাসে ঝলসিয়া ম্লান হইয়া গেল।

কাছারিতে লোকজন বড় কেহ ছিল না, রাখাল সিং টাকা দাখিলের জন্য সদরে গিয়াছেন, কেষ্ট সিং কাজে বাহির হইয়াছে; থাকিবার মধ্যে আছে সতীশ, কিন্তু সেও এখন অনুপস্থিত, প্রভাতী গঞ্জিকাসেবনের জন্য কোথাও সরিয়া পড়িয়াছে। মাস্টার আপন মনে ইংরেজী কবিতা আবৃত্তি করিতেছিলেন—

> Of Man's First Disobedience, and the Fruit
> Of that Forbidden Tree, whose mortal taste
> Brought Death into the World, and all our woe,
> With loss of *Eden*, till one greater Man
> Restore us,—

শিবু আসিয়া দাঁড়াইল, ঈষৎ হাসিয়া আবৃত্তি বন্ধ করিয়া মাস্টার বলিলেন, বল্ তো শিবু, এ কিসের থেকে আমি আবৃত্তি করছি! আবার তিনি আরম্ভ করিলেন—

> Sing Heav'nly Muse, that on the secret top
> Of *Oreb* or of *Sinai*,—"

আবৃত্তির ফাঁকে মুহূর্তের অবসর পাইয়া শিবু বলিল, মিল্টন্'স 'প্যারাডাইস লস্ট্'।

মাস্টার খুব খুশি হইলেন, বলিলেন, ইয়েস। মিল্টন ইজ এ গ্রে—ট পোয়েট। পড়েছিস তুই 'প্যারাডাইস লস্ট্'? আবৃত্তি করতে পারিস? তোর যেখানটা ভাল লাগে আবৃত্তি কর্, আমি শুনি।

শিবনাথ মৃদু হাসিয়া খানিকটা ভাবিয়া লইয়া আবৃত্তি করিল—

> So saying, she embrac'd him, and for joy
> Tenderly wept, much won that he his love
> Had so ennobl'd, as of choice to incurr
> Divine displeasure for her sake, or Death.
> ... ... from the bough
> She gave him of that fair enticing Fruit
> With liberal hand.

শিবনাথ চুপ করিল, মাস্টার তাহার মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া ছিলেন, একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া তিনি বলিলেন, ইউ ডোণ্ট লাভ আওয়ার বউমা, আই অ্যাম সিয়োর।

শিবনাথ এই আকস্মিক প্রসঙ্গে লজ্জিত এবং বিস্মিত দুইই হইল। মাস্টার বলিলেন, রাখাল সিং আমাকে বলেছিলেন, আমি বিশ্বাস করি নি। কিন্তু দিস ইজ ব্যাড, ভে—রি ব্যাড, মাই বয়। না না, লজ্জা করিস নি আমাকে। তুই বড় হয়েছিস, লজ্জা কিসের তোর!

শিবনাথের মুখ রাঙা হইয়া উঠিল, তবুও সে বলিল, নো। আই লাভ হার; অ্যাডাম যেমন ঈভকে ভালবাসত, তেমনই ভালবাসি। জানেন, তারই জন্তে আমি পিসীমাকে হারিয়েছি?

মাস্টার বহুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, যাক। কিন্তু তোকে এমন শুকনো-শুকনো ঠেকছে কেন, বল্ দেখি?

ম্লান হাসি হাসিয়া শিবনাথ বলিল, কয়েকদিন তো অনেকই দুশ্চিন্তা গেল, কাল রাত্রেও ভাল ঘুম হয় নি, বোধ হয় সেইজন্তেই।

মাস্টার বলিলেন, সকাল সকাল স্নান কর্, খেয়ে নে, তারপর এ ল—ং স্লীপ, ল—ম্বা একটা ঘুম দিয়ে দে। অল রাইট হয়ে যাবে।

উদাসীনের মতই শিবনাথ বলিল, তাই করব।

হ্যাঁ। তারপর যা বলছিলাম বলি, শোন্। ইউ মাস্ট ডু সাম্‌থিং, মাই বয়। একটা কিছু তোকে করতে হবে, এই জমিদারির মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখা চলবে না। নিজেকে কিছু উপার্জন করতে হবে। যা আছে, সেটাকে বাড়াতে হবে, সেটাকে ক্ষয় করলে চলবে না।

শিবনাথ একটু চিন্তা করিয়া বলিল, করব মাস্টার মশায়, কিন্তু দেশ ছেড়ে আমি যেতে চাই না। শহরে আমি যেন হাঁপিয়ে উঠি।—বলিতে বলিতেই সাঁওতাল পরগনার একটি আশ্রমের কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল। চন্দ্রালোকিত প্রান্তরের মধ্যে সব্জি ও ফসলের ক্ষেত, ক্ষেতের মাথায় মাথায় কুয়া হইতে জল তুলিবার ট্যাড়ার উধ্বর্বাহু বাঁশ-গুলি, পথের পাশে পাশে ছোট ছোট ঘর, আর সে সমস্তের মধ্যে হাস্যময় নির্ভীক একটি মানুষ,—সব মনে পড়িয়া গেল। তাহার চোখ-মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; সেখানে গৌরী থাকিবে না, জমিদারির চিন্তা থাকিবে না, মিথ্যা মর্যাদা-রক্ষার বালাই থাকিবে না; সেখানে থাকিবে শুধু সে আর মাটি—যে মাটি কথা কয়, জলের জন্ম তৃষ্ণায় হা-হা করে, জ্বরজর্জরের মত উত্তপ্ত নিশ্বাস ফেলে। সে উৎফুল্ল হইয়া বলিল, আমি প্রকাণ্ড একটা প্লট জমি নিয়ে চাষ করব মাস্টার মশায়।

চাষ? গুড আইডিয়া! তাই কর্, তুই তাই কর্, শিবু। তবে নদীর ধারে জমি নিতে হবে। তোদের বিল্বগ্রাম মহালে কিন্তু ময়ূরাক্ষীর ধারে অনেক জমি আছে। ওইখানেই তুই চাষ আরম্ভ করে দে। প্লেন লিভিং অ্যাণ্ড হাই থিঙ্কিং! গুড আইডিয়া, ভেরি গুড আইডিয়া! মাস্টার কাগজ-কলম টানিয়া লইয়া বলিলেন, লাভ-লোকসান খতিয়ে একটা দেখি, দাঁড়া। কিন্তু লাভ বা লোকসান দুইটার কোনটাতেই উপনীত হইতে দিল না নিত্য-ঝি। উৎকণ্ঠিত মুখে সে আসিয়া তিরস্কারের সুরেই বলিল, এ আপনার কি রকম কাজ দাদাবাবু?

সবিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া শিবনাথ বলিল, কেন, হল কি?

হল কি! বউদিদি আজ আবার সকাল থেকে দুবার বমি করলেন। কাল বলেছি আপনাকে, কাল পরশু দু দিনই বমি করেছেন। তা ডাক্তার-টাক্তারকে তো একবার ডাকতে হয়।

আবার আজ বমি করছে? শিবনাথের ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। চিন্তায় অসন্তোষে তাহার মন ভরিয়া উঠিল। সে আবার বলিল, ডাক্তার আমি ডাকাচ্ছি এখুনি, কিন্তু এমন করে কোন দিন তিনটে, কোন দিন চারটের সময় খেতে কে বলেছিল, শুনি?

নিত্য বলিল, সে আর আমরা কি বলব, বলুন? অল্প বয়সে গিন্নী সাজতে গেলেই এমনই হয়। তা ছাড়া বাড়িতেই যে আপনার বারো মাসে তেরো পার্ব্বন, সে উপোসগুলো কে করবে?

শিবনাথ ডাকিল, সতীশ! সতীশ!

সদ্য গাঁজা টানিয়া সতীশ আসিয়া সম্মুখে স্বপ্নাচ্ছন্নের মত স্থির হইয়া দাঁড়াইল। শিবনাথ বলিল, একবার ডাক্তারের ওখানে যা, তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে আসবি, বুঝলি?

বুঝিল কি বুঝিল না, সে উত্তর সতীশ দিল না, বিনা বাক্যব্যয়ে সে কাছারি হইতে বাহির হইয়া গেল। গঞ্জিকাসেবনের পর প্রথম কিছুক্ষণ সতীশ এমনই মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া থাকে।

ডাক্তার প্রবীণ লোক, গৌরীকে দেখিয়া শুনিয়া তিনি বলিলেন, তাই তো হে শিবনাথবাবু, সায়েরের মাছগুলো কত বড় বড় হল, বল দেখি?

শিবনাথ হাসিয়া বলিল, ধরবেন একদিন ছিপে?

ডাক্তার ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, ছিপে ধরতে পারব না, তবে খেতে হবে একদিন। বেশ তো!

অসহিষ্ণু হইয়া মাস্টার জিজ্ঞাসা করিলেন, বউমাকে কেমন দেখলেন ?

ভালই দেখলাম। চলুন, বাইরে চলুন। কাছারিতে আসিয়া তিনি বলিলেন, নিত্যকে একবার ডাক তো সতীশ, কয়েকটা কথা আবার জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেলাম।

মাস্টার আবার প্রশ্ন করিলেন, বউমার অসুখ সিরিয়াস কিছু নয় তো ? মানে—ডিস্‌পেপ্‌সিয়াও একটা সিরিয়াস ডিজিজ বলে আমি মনে করি।

ডাক্তার বলিলেন, না না। তবে শিবনাথবাবুর একটা ভোজ লাগবে মনে হচ্ছে। তাই তো জিজ্ঞেস করলাম, সায়েরের মাছগুলো কত বড় বড় হল ?

নিত্য-ঝি আসিয়া দাঁড়াইল, বলিল, আমাকে ডাকছিলেন ?

ডাক্তার বলিলেন, হ্যাঁ, তুমি একবার—। বলিতে বলিতেই উঠিয়া গিয়া কয়েকটা কথা নিম্নস্বরে বলিলেন, চট করে জেনে এস দেখি।

মাস্টার বলিলেন, এ যে একটা হেঁয়ালি আরম্ভ করে দিলেন আপনি!

ডাক্তার হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন, বাড়িতে প্রবীণ মেয়ে থাকলে এজন্যে আমাদের ডাকতে হয় না।

মাস্টার বলিলেন, পিসীমা যে চলে গেলেন। কিছুতে যে ধরে রাখা গেল না।

শিবনাথ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল; মনে মনে বার বার বলিল, না, তিনি গিয়াছেন ভালই হইয়াছে; তিনি পারিলেও গৌরী তাঁহাকে সহ্য করিত না। তাঁহার মত সে এবার নিজেকেও নির্বাসিত করিবে, শান্তির জন্য তাহার মন ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে।

নিত্য ফিরিয়া আসিয়া হাসিমুখে বলিল, আজ্ঞে হ্যাঁ, তাই বটে।—বলিয়াই সে চলিয়া গেল।

ডাক্তার হাসিতে হাসিতে বলিলেন, ভোজ তা হলে একটা লাগল শিবনাথবাবু। বউমা আমাদের অন্তঃসত্ত্বা।

মাস্টার বিপুল বিস্ময়ে প্রশ্ন করিলেন, হোয়াট ?

শিবনাথবাবুর রাঙা খোকা হবে গো।

মাস্টার কাগজ-কলম ফেলিয়া দিয়া উঠিয়া পাশের ঘরে চলিয়া গেলেন; সেই সেদিনের ছোট ছেলেটি শিবনাথ, সে সন্তানের পিতা হইবে। তিনি আপন মনেই নির্জন ঘরে হাসিয়া সারা হইয়া গেলেন।

ডাক্তার শিবনাথকে যেন একটা অদ্ভুত বার্তা দিলেন। একটা উত্তেজনাই তাহার মনে শুধু সঞ্চারিত হইল না, তাহার কল্পনার ভাবী জীবনচিত্রের উপর দিয়াও যেন একটা বিপ্লব বহিয়া গেল। লজ্জিত আনন্দে তাহার মনখানি পরিপূর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে

অনুভব করিল, গৌরী যেন বিপুল শক্তিশালিনী হইয়া উঠিয়াছে, যে শক্তির বলে গৌরীর ইচ্ছা-অনিচ্ছার কাছে তাহার মাথা নত না করিয়া উপায় নাই ; ভাবী সন্তান মাতৃগর্ভ হইতেই যেন তাহার মায়ের শক্তির সঙ্গে আপন শক্তি মিলিত করিয়া তাহাকে খর্ব করিবার চেষ্টা করিতেছে।

ডাক্তার বলিলেন, শিবনাথবাবু, পিসীমাকে চিঠি লেখ। আর তিনি না এলে চলবে না বাপু। নাতিকে আদর করবে কে ? মানুষ করবে কে ?

ডাক্তার চলিয়া গেলেন।

মাস্টার হাসি সম্বরণ করিয়া বাহিরে আসিয়া বলিলেন, ইমিডিয়েট্‌লি, এখুনি পত্র লিখতে হবে। শি মাস্ট কাম।

শিবনাথ আবার ভাবিল, তাহার এই সন্তান হয়তো দেশের মধ্যে এক মহাশক্তি-শালী পুরুষ হইবে, রূপে গুণে বিদ্যায় প্রতিভায় সমগ্র দেশ উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। তাহাকে শিক্ষা দিবে সে নিজে, আপন আদর্শে তাহাকে দীক্ষিত করিবে। তাহার অসম্পূর্ণ কর্ম সম্পূর্ণ করিবে তাহার ওই সন্তান।

মাস্টার আবার বলিলেন, চিঠির চেয়েও আমি বলি, তুই কাশী চলে যা শিবু, পিসীমাকে ধরে নিয়ে আয়।

হাঁ, তাই সে যাইবে। এই প্রসঙ্গে পিসীমার স্মৃতি মনে পড়িয়া গেল, পিসীমা বলিতেন, শিবুর ছেলে হইবে, সে ট্যাঁ-ট্যাঁ করিয়া কাঁদিবে ; শিবু বিরক্ত হইয়া বউকে বলিবে, যাও, পিসীমার কোলে ফেলিয়া দিয়া এস ; তাহাকে আমি সোনায় মুড়িয়া রাখিব, আকাশের চাঁদ পাড়িয়া দিব। রূপকথার রাজপুত্রের মতই তাহাকে তিনি কল্পনা করিতেন। তিনি নিশ্চয়ই আসিবেন। কিন্তু গৌরী—গৌরী কি তাহা সহ্য করিবে ?

নিত্য-ঝি আবার আসিয়া দাঁড়াইল।

মাস্টার বলিলেন, কি, আবার কি ?

নিত্য বলিল, দাদাবাবু, একবার বাড়িতে আসুন।

কেন ?

বউদিদি কি বলছেন।

শিবনাথ বাড়ির দিকে অগ্রসর হইল। মাস্টার নিত্যকে ডাকিয়া বলিলেন, এই দেখ নিত্য, আজ সব ঠাকুরবাড়িতে পুজো দিতে হয়, রতনকে গিয়ে বল, যা যা করতে হয়, সব যেন নিখুঁতভাবে করা হয়।

শিবু ও নিত্য চলিয়া গেলে মাস্টার আবার মৃদু মৃদু হাসিতে আরম্ভ করিলেন ; শিবুকে তিনি বলিতেন, নটি বয়—দুষ্টু ছেলে। সেই দুষ্ট ছেলে সন্তানের পিতা হইতে চলিয়াছে ! কিমাশ্চর্যম্ অতঃপরম্ !

গৌরী আপন বক্তব্য যেন জিহ্বাগ্রে লইয়া বসিয়া ছিল, শিবনাথ ঘরে ঢুকিবামাত্র বলিল, দেখ, পিসীমার সঙ্গে একসঙ্গে ঘর আমি করতে পারব না।

কথাগুলি প্রচণ্ড বেগে গিয়া শিবনাথকে আঘাত করিল। কিছুক্ষণ পূর্বেই তাহার মনে নানা চিন্তা, নানা কল্পনা, নানা সঙ্কল্পের ফলে যে একটি আনন্দময় অনুভূতির সৃষ্টি হইয়াছিল, এই আঘাতে মুহূর্তে সব যেন বিপর্যস্ত হইয়া গেল। একটি মাত্র প্রশ্ন তাহার মুখ হইতে বাহির হইল, মানে?

গৌরী বলিল, মানে, আমি বসে বসেই শুনছি, সকলেই বলছে, এইবার পিসীমাকে আনতে হবে। বাইরেও নাকি সেই কথা হচ্ছে, নিত্য আমাকে বললে। সেইজন্যে আমি বলছি, সময় থেকে বলে রাখছি, সে আমি পারব না।

ভাল। কিন্তু তিনি আসবেন, এমন ধারণা করাটা তোমার ঠিক হয় নি। আর আমি আনতে যাব, এ ধারণাটাও তোমার ভুল। তুমি আসার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর গৃহত্যাগের প্রয়োজন তিনিও বুঝেছিলেন, আমিও বুঝেছিলাম; সেইজন্যেই আমি বাধা দিই নি, বুঝলে? ভয় নেই তোমার, তিনি আসবেন না।

ভাল, কথাটা জেনে রাখলাম। কিন্তু ধারণা করা আমার ভুল হয় নি। সংসারে আগে কথা হয়, পরে কাজ হয়; কথা শুনলাম, পাঁচজনে বলছে, কাজেই সময় থাকতে আমি বলে রাখাটাই ভাল মনে করলাম। এতে আমার এমন কিছু অপরাধ হয় নি। অপরাধ হয়ে থাকলে, যারা কথা তুলেছে, তাদেরই হয়েছে।

না, তাদেরও হয় নি। তারা আমাদের হিতকামনা করেই কথাটা তুলেছে। তোমার এ অবস্থায় সংসারে প্রবীণা অভিভাবকের দরকার, যিনি যত্ন করবেন।

এবার অসহিষ্ণু হইয়া গৌরী শিবনাথের মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলিল, সেজন্যে আমার দিদিমা আছেন, আরও পাঁচজন আছেন, তাঁরা সংবাদ পেলেই আমাকে নিয়ে যাবেন, তোমাকে বা অন্য কাউকে তার জন্যে দুশ্চিন্তা করতে হবে না।

শিবনাথ বলিল, বেশ, সে সংবাদ আজ আমি তাঁদের জানিয়ে দিচ্ছি।

গৌরী সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, আমার মহা উপকার করা হবে তা হলে, আমি নিশ্চিন্ত হয়ে হেসে খেলে বাঁচব। এমন কি, যদি আর আমাকে না টানাটানি কর, তবে চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকব তোমার কাছে। এত দুশ্চিন্তা আমি সইতে পারছি না।

শিবনাথ এ কথার জবাব দিতে পারিল না, তাহার মনে হইল, বুকের মধ্যে একটা দুঃসহ দুঃখের আবেগে তাহার শ্বাস রুদ্ধ হইয়া গেল। সে উত্তর না দিয়াই কাছারিতে আসিয়া উঠিল। সেরেস্তা-ঘরে গিয়া চিঠির কাগজ টানিয়া লইয়া সে কমলেশকে চিঠি লিখিয়া ফেলিল। এই সংবাদটা জানাইয়া সে লিখিল, আমার বাড়ির

কথা তুমি জান, প্রবীণা অভিভাবিকা কেহ নাই। এ অবস্থায় তাহাকে কে দেখিবে শুনিবে? সুতরাং একটি দিন স্থির করিয়া গৌরীকে ওখানে লইয়া যাওয়াটাই আমি নিরাপদ মনে করি।

দিনকয়েক পরেই কমলেশ আসিয়া গৌরীকে লইয়া গেল।

গৌরী প্রণাম করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল, কেউ তোমাকে আর অশান্তিতে পুড়িয়ে মারবে না। আমি চললাম।

শিবনাথ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, তুমিও নিশ্চয় নিশ্চিন্ত হয়ে হেসে খেলে বাঁচবে।

গৌরী বিস্মিত হইয়া গেল, শিবনাথ তাহার সে কথাটা এমন অক্ষরে অক্ষরে মনে রাখিয়াছে! বাকিটুকু সে নিজেই বলিয়া পরিপূর্ণ করিয়া দিল, হ্যাঁ, এমন কি, আর যদি আমাকে টানাটানি না কর, তবে চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকব তোমার কাছে।

শিবনাথ উঠিয়া পড়িল, সে যেন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, চেষ্টা করিয়া আত্মসম্বরণ করিয়া সে বলিল, বেশ, তাই হবে।

ইহার কয়দিন পর শিবনাথ আপনার জীবনের অতি প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি গুছাইয়া লইয়া বিল্বগ্রামের চরের উপর বাসা বাঁধিবার জন্য রওনা হইল। জিনিসের মধ্যে বইয়ের সংখ্যাই বেশি।

ময়ূরাক্ষী-গর্ভের ধুধু-করা বালুরাশির মধ্যস্থলে স্বল্প জলস্রোত বহিয়া চলিয়াছে; বর্ষায় কয়েক পসলা বৃষ্টি হইয়াছে মাত্র, ইহারই মধ্যে জলে লাল রঙের ঘোর ধরিয়াছে। বালুচরের কোলে গাঢ় সবুজ ঘাসে ঢাকা নদীর চর, এখানে ওখানে চারিদিকে শরবন বাতাসের প্রবাহে সরসর শব্দ তুলিয়াছে। চরের অদূরে ছোট্ট গ্রামখানি। শিবনাথ ঘাসের উপর শুইয়া ধরিত্রীর কোলে দেহ এলাইয়া দিল। তাহার মন শান্তিতে ভরিয়া উঠিয়াছে, আনন্দে সে পরিতৃপ্ত হইয়া গিয়াছে।

একত্রিশ

আড়াই বৎসর পর।

সাত-আনির বাঁড়ুজ্জেদের বাড়িখানার অবস্থা হইয়াছে নির্বাপিত-শিখা প্রদীপের মত। প্রদীপের ধাতুময় অঙ্গের মত তাহার অঙ্গরাগের দীপ্তি এক বিন্দু কমে নাই, তাহাতে আলো জ্বলে না। বাড়িখানা প্রায় নিস্তব্ধ নিঝুম শূন্যপুরীর মত হইয়া গিয়াছে। প্রাণের কোলাহল আর শোনা যায় না। পিসীমা সেই কাশী গিয়াছেন, ফিরিয়া আসা দূরে থাক্, চিঠি দিলেও তাহার উত্তর পর্যন্ত আসে না। গৌরীও কলিকাতায় গিয়া আর আসিবার নাম করে নাই। তাহার কোল জুড়িয়া এখন একটি শিশুপুত্র, তাহাকে লইয়াই গৌরী এ বাড়ির স্মৃতি ভুলিয়াছে। শিবনাথ ময়ূরাক্ষীর তীরে চরভূমির উপর একটি কৃষিক্ষেত্র লইয়া মাতিয়া আছে। মাটির বুকে ধূলিধূসরিত মানুষের সহিত সে কারবার খুলিয়াছে। রাত্রিশেষে বাউল টহলদারের মত সে তাহাদের ডাক দিয়া দিয়া ফেরে। চরের ওই কৃষিক্ষেত্রটিকে কেন্দ্র করিয়া একে একে পাঁচ-সাতখানি গ্রামে তাহার কর্ম-ধারাকে প্রবাহিত করিয়া দিয়াছে। নাইট-স্কুল, জন তিনেক হাতুড়ে ডাক্তার লইয়া তিনটি ডাক্তারখানা, দুইখানা গ্রামে বহু চেষ্টায় দুইটি ধর্মগোলাও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। চারিদিকে শূদ্র—শূদ্র আর শূদ্র। বশিষ্ঠের মত আত্মাহুতি দিয়াও বিশ্বামিত্রের গলায় উপবীত দিবার তাহার সঙ্কল্প। সম্প্রতি সে চরকা ও তাঁত প্রবর্তন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। সমগ্র ভারতের বুকে কালের রথের চূড়ায় ১৯২১-এর ধ্বজা দেখা দিয়াছে।

সন্ধ্যার মুখে শিবনাথ ময়ূরাক্ষীর বালুকাগর্ভের উপর দাঁড়াইয়া ছিল।

তাহার কৃষিক্ষেত্রের কোলেই ময়ূরাক্ষী নদী। এখানে ময়ূরাক্ষী প্রায় মাইল খানেক ধরিয়া একেবারে সরলরেখার মত সোজা বহিয়া গিয়াছে। নদীর বুকে বালির উপর দাঁড়াইয়া ময়ূরাক্ষীর গতিপথের দিকে চাহিয়া দেখিলে মনে হয়, ময়ূরাক্ষী চক্রবাল-সীমায় অবনমিত আকাশের বুক হইতে নামিয়া আসিতেছে—আকাশগঙ্গার মত।

সন্ধ্যার অন্ধকারও আকাশ হইতে কালিমার বন্যার মত নামিয়া ময়ূরাক্ষীর ধূসর বালুগর্ভ বিলুপ্ত করিয়া দিয়া শিবনাথের দিকে আগাইয়া আসিতেছিল। শিবনাথ প্রতি সন্ধ্যায় ময়ূরাক্ষী-গর্ভের উপর এমনই করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে।

দিগন্তের কোলে ঘনায়িত অন্ধকার, কিন্তু নিকটে আশেপাশে চারিদিকে অন্ধকারের মধ্যেও এখনও অস্পষ্ট আলোর রেশ একটা আবছায়ার মত জাগিয়া আছে। অস্পষ্টতার মধ্যে একটা রহস্য আছে, সন্ধ্যার ছায়ান্ধকারে সব যেন রহস্যময় হইয়া

উঠিতেছে। এখানকার প্রতিটি চেনা জানা বস্তুও এই রহস্যের আবরণের মধ্যে অজানা অচেনা হইয়া উঠিতেছে। চিনিতে ভুল হয় না কেবল আকাশস্পর্শী শিমুলগাছটিকে, সকলের ঊর্ধ্বে তাহার মাথা জাগিয়া থাকে, তাহার উন্নত মহিমা যেন রহস্যেরও উপরে প্রতিষ্ঠা পাইয়াছে। এক-একটা মানুষ এমনই করিয়া অতীতকালের বিস্মৃতির অন্ধকারের মধ্যেও মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, বিগত কাল যত দীর্ঘ হউক, বিস্মৃতি যত প্রগাঢ় হউক, সে মিলাইয়া যায় না। তাহার মনের মধ্যেও এমনই কয়েকটি মানুষ সকল বিস্মৃতিকে ছাপাইয়া মহিমান্বিত মূর্তিতে দাঁড়াইয়া আছে। সহসা তাহার এ চিন্তাধারা বাধা পাইয়া ছিন্ন হইয়া গেল। তাহার চাষ-বাড়ি হইতে কে একজন তাহারই দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। আলো-অন্ধকারের সংযোগ-রহস্যের মধ্যে মানুষটির গতিশীলতাই শুধু তাহাকে মানুষ বলিয়া চিনাইয়া দিতেছিল, নহিলে চারিপাশের গাছপালা হইতে মানুষের অবয়বের পার্থক্য ওই আবছায়ার মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। শিবনাথ বুঝিল, কোন সংবাদ আছে, নতুবা এ সময়ে তাহার লোকজনেরা কেহ সাধারণতঃ তাহার কাছে আসিয়া বিরক্ত করে না। হয়তো কোন গোরু-মহিষের অসুখ করিয়াছে, নয়তো চাষের কোন যন্ত্রপাতি ভাঙিয়াছে, অথবা গ্রামের কোন লোকের গোরু-ছাগলে আসিয়া ফসল খাইয়াছে, কিংবা বাড়ি হইতে লোক আসিয়াছে। কোন জরুরি কাজের জন্য রাখাল সিং নিজেও আসিয়া থাকিতে পারেন। মধ্যে মধ্যে তিনি আসেন। আজ আড়াই বৎসর এমনই চলিয়াছে, আড়াই বৎসর সে বাড়ি যায় নাই। পিসীমা কাশীতে, গৌরী সন্তান লইয়া কলিকাতায়, সে এখানে নির্জনে নদীতীরে একমাত্র মাটিকে অবলম্বন করিয়া দিন কাটাইয়া চলিয়াছে।

মাটির ভিতর সে মাকে প্রত্যক্ষভাবে দেখিতে চাহিয়াছিল। দেখিতেও পাইয়াছে, কিন্তু যে মূর্তিতে সে মাকে দেখিতে চাহিয়াছিল, এ মূর্তি সে মূর্তি নয়। মায়ের এ মূর্তি যেন গৃহস্থবধূর মূর্তি, ক্ষুদ্র গণ্ডি-ঘেরা একখানি বাড়ির ভিতর এ মা সন্তান পালন করেন, স্নেহে বিগলিত শান্ত সলজ্জভাবে পরম মমতায় সন্তানকে বুকে আঁকড়াইয়া শুধু ধরিয়া রাখেন। তাহার মনে পড়িয়া যায়—'সাত কোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননি, রেখেছ বাঙালী করে মানুষ কর নি'। এ মা, সেই মা। বিরাট মহিমায় যে মা সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে আপন মহিমার দীপ্তিতে আকাশ-বাতাস জল-স্থল ঝলমল করিয়া দাঁড়াইবেন, সে মূর্তিতে মা কবে দেখা দিবেন? সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

দ্রুততম গতিতে পৃথিবীর সকল দেশে বিপ্লব ঘটিয়া চলিয়াছে, রাশিয়ার স্বৈরাচার-তন্ত্র নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল গণবিপ্লবের কালবৈশাখীর ঝঞ্ঝাতাড়নায়, তুর্কীতে বিপ্লবের কালো মেঘ দেখা দিয়াছে; সারা ইউরোপে সামাজিক জীবনে একটা বিপ্লব বহিয়া চলিয়াছে। ভারতবর্ষে জালিয়ানওয়ালাবাগের মাটি রক্তাক্ত হইয়া গেল। কলিকাতায়

কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন, তারপর নাগপুর কংগ্রেসের ফলে চৈত্র মাসের উত্তপ্ত দ্বিপ্রহরের ক্ষীণ ঘূর্ণির মত জাগিয়া উঠিয়াছে অসহযোগ-আন্দোলন। অহিংসা ও সত্য তাহার মূলমন্ত্র। শিবনাথ গ্রামের মধ্যে চরকা তাঁত লইয়া কাজ আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। কিন্তু চারিদিকে শুধু শূদ্র—শূদ্র আর শূদ্র। সমগ্র জাতিটাই যেন শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। মাতৃদেবতার পূজাবেদীর সম্মুখেও তাহাদের পূজার অধিকার আছে, এ কথা মনে মনে স্বীকার করিতে পারে না, ভয়ে আসিতে চায় না। সে আপন মনেই আবেগকম্পিত কণ্ঠে সেই রহস্যময় অন্ধকারের মধ্যে আবৃত্তি করিল—

"বীরের এ রক্তস্রোত মাতার এ অশ্রুধারা
এর যত মূল্য সে কি ধরার ধূলায় হবে হারা ?
স্বর্গ কি হবে না কেনা ?
বিশ্বের ভাণ্ডারী শুধিবে না
এত ঋণ ?
রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবে না দিন ?"

যে লোকটি তাহার দিকে আসিতেছিল, সে নিকটে আসিয়া পড়িল, তবু শিবনাথ তাহাকে চিনিতে পারিল না, সে আবৃত্তি বন্ধ করিল। চারিদিকে ঘনায়মান অন্ধকারের আবরণের উপরেও আগন্তুকের সর্বাঙ্গে আচ্ছাদনের বাধা তাহাকে চিনিতে দিল না। লোকটির আপাদমস্তক একখানা জীর্ণ চাদরে ঢাকা। মাথার উপর হইতে কপালের আধখানা পর্যন্ত অবগুণ্ঠনের ভঙ্গীতে আবৃত। শিবনাথ তাহার মুখের দিকে ঈষৎ ঝুঁকিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখিতে দেখিতে প্রশ্ন করিল, কে ?

মাথার আবরণ টানিয়া খুলিয়া ফেলিয়া আগন্তুক বলিল, আমি সুশীল।

সুশীলদা ! শিবনাথ চমকিয়া উঠিল, আরও খানিকটা তাহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাহাকে ভাল করিয়া দেখিয়া বলিল, উঃ ! এ কি চেহারা হয়েছে আপনার সুশীলদা ?

সত্যই সুশীলের শীর্ণ শরীর, দাড়ি-গোঁফে মুখ ভরিয়া উঠিয়াছে, দীর্ঘ রুক্ষ চুলে মাথা বেমানান রকমের বড় মনে হইতেছে।

অন্ধকারের মধ্যে অস্পষ্ট হইলেও শিবনাথ দেখিল, সুশীলের মুখে হাসির রেখা। হাসিয়া সুশীল বলিল, আজ ছ মাস পুলিসের চোখে ধুলো দিয়ে ফিরছি। আমি এখন অ্যাব্‌সকন্‌ডার, উপস্থিত দেড় শো মাইল হেঁটে আসছি। চেহারার আর দোষ কি, বল ?

দেড় শো মাইল ! শিবনাথ শিহরিয়া উঠিল।

মৃদুস্বরে নিতান্ত নিরুচ্ছ্বসিতভাবেই সুশীল বলিল, হবে বইকি। বেশি হবে, তবু কম

হবে না। কলকাতা থেকে এখানকার নিয়ারেস্ট স্টেশন হল বোধ হয় এক শো পঁয়ত্রিশ মাইল। তাও রেল-লাইন এসেছে সোজা। আমি নিবিড় পল্লীগ্রাম দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে আসছি। দেড় শো মাইলের অনেক বেশি হবে। চল, এখন তোমার আস্তানায় চল তো। ভয়ঙ্কর ক্ষিদে পেয়েছে, আর চায়ের তৃষ্ণায় প্রায় মরে যাচ্ছি।

শিবনাথ ব্যস্ত হইয়া উঠিল, বলিল, আসুন। পথে চলিতে চলিতে শিবনাথ ব্যগ্র-ভাবে প্রশ্ন করিল, পূর্ণবাবু কোথায় ?

পূর্ণ নেই।

নেই! আর্তস্বরে শিবনাথ বলিয়া উঠিল, নেই, পূর্ণ নেই ?

সুশীল সংযত মৃদুস্বরে বলিল, এমন চীৎকার করে নয় শিবনাথ, আর বিচলিত হলেও চলবে না। পূর্ণ ডায়েড এ গ্লোরিয়াস ডেথ—গৌরবের মৃত্যু, সে যুদ্ধ করে মরেছে। পুলিসের সঙ্গে ওপন ফাইট।

শিবনাথ একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। তাহার মনে শত প্রশ্ন উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিতেছিল, কিন্তু সে প্রশ্ন উত্থাপন করিতে তাহার সঙ্কোচ হইল। এ কাহিনী জানিবার তাহার অধিকার নাই। সে স্বেচ্ছায় এ অধিকার ত্যাগ করিয়াছে।

সুশীল বলিল, গুলি খেয়েও পূর্ণ তিন দিন বেঁচে ছিল। হাসপাতালে যখন তার জ্ঞান হল, পুলিস এসে তাকে জিজ্ঞেস করলে, তোমার নাম কি ? উত্তর সে দিলে না; বার বার প্রশ্ন করাতে সে বললে, আমাকে বিরক্ত কোরো না, শান্তিতে মরতে দাও, ডোণ্ট ডিস্টার্ব মি প্লীজ, লেট মি ডাই ইন পীস। বলে নি নাম। পুলিস তাকে এও বলেছিল, দেখ, আমরাও ভারতবাসী, আমরাও কামনা করি যে, ভারত একদিন স্বাধীন হবে। সেদিন যখন স্বাধীন ভারতের ইতিহাস লেখা হবে, তখন উজ্জ্বল অক্ষরে তোমার নাম লেখা থাকবে। বল, তোমার নাম বল। কিন্তু তার সেই এক উত্তর, ডোণ্ট ডিস্টার্ব মি প্লীজ, লেট মি ডাই ইন পীস। আন্‌সাং, আন্‌ল্যামেণ্টেড, আন্‌রেকগ্‌নাইজ্‌ড সে চলে গেল।

ছোট একখানি মেটে খোড়ো বাংলায় শিবনাথের থাকিবার স্থান। মাত্র দুইখানি কুঠরি; কুঠরি দুইটির সম্মুখে টানা একটি প্রশস্ত বারান্দা। সুশীল একেবারে শিবনাথের বিছানার উপর গড়াইয়া পড়িয়া বলিল, নরম বিছানায় শুয়ে ভারি আরাম লাগছে শিবনাথ।

শিবনাথ বলিল, এখন যেন তা বলে ঘুমিয়ে পড়বেন না। আগে স্নান করে ফেলুন, তারপর গরম জলে পা ডুবিয়ে বসুন কিছুক্ষণ। তারপর খেয়ে-দেয়ে শোবেন।

খানিকটা চা খাওয়াও দেখি আগে।

দাঁড়ান, আমি নিজেই চা করে নিয়ে আসি। এখানকার লোক-জনের চা খাওয়া তো জানেন না। খায় না'তো খায়ই না, সর্দি-টর্দি হলে চা যেদিন খাবে, সেদিন জলের বদলে দুধ ফুটিয়ে তাতে চা দেবে, এতখানি গুড় বা চিনি দেবে, তারপর দেড়-সের দু-সেরী একটা বাটিতে চা নিয়ে বসবে।

শিবনাথ বাহির হইয়া গেল, সুশীল একে একে গায়ের আবরণগুলি খুলিয়া ফেলিতে আরম্ভ করিল। চাদর ও জামা খুলিয়া ফেলিয়া কোমর হইতে একটা বেল্ট খুলিয়া সযত্নে বিছানার উপর রাখিল। বেল্টটার দুই পাশে দুইটা রিভলভার।

কিছুক্ষণ পর চায়ের কাপ লইয়া শিবনাথ ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিল, স্নানের জল রেডি। ফুটবাথের জল চড়িয়ে দিয়েছি। চা খেয়ে আপনি সর্বাগ্রে কামিয়ে ফেলুন সুশীলদা, বলেন তো গ্রাম থেকে নাপিতটাকে ডেকে পাঠাই, চুলগুলোও কেটে ফেলুন।

চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে সুশীল বলিল, উঁহু।

বেশ, তবে কাল সকালেই হবে।

উঁহু।

কেন?

বাউল বৈরাগী, কি মুসলমান ফকির, কি শিখ—এদের কি চুল-দাড়ি-গোঁফ না থাকলে চলে?

শিবনাথ এবার হাসিয়া বলিল, ও।

খাওয়া-দাওয়া শেষ করিয়াই সুশীল বিছানায় গড়াইয়া পড়িল এবং কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই অগাধ ঘুমে ডুবিয়া গেল। শিবনাথ তাহাকে ডাকিল না, একখানা মাদুর টানিয়া লইয়া মেঝের উপর বিছাইয়া শুইয়া পড়িল। পরদিন প্রভাতে উঠিয়া দেখিল, সুশীল তখনও ঘুমাইতেছে। চা তৈয়ারি করিয়া লইয়া আসিয়া দেখিল, সুশীলের ঘুম তখনও ভাঙে নাই। এবার বাধ্য হইয়া সে ডাকিল, সুশীলদা, উঠুন। চা হয়ে গেছে।

বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া সুশীল বলিল, ঘুম যেন এখনও শেষ হয় নি ভাই শিবনাথ। এখনও ঘুমুতে ইচ্ছে করছে।

বেশ তো, চা খেয়ে আবার শুয়ে পড়ুন।

চা খাইয়া সুশীল সত্য-সত্যই আবার শুইয়া পড়িল। শিবনাথ কাজকর্মের অজুহাতে বাহির হইয়া গেল। সমস্ত কাজ আজ তাহার বিস্বাদ তিক্ত বোধ হইতেছিল। সুশীলের এই দুর্দান্ত অভিযানের তুলনায় এ তাহার কি, কতটুকু? পৈতৃক সম্পত্তি হইতে এক পয়সা সে গ্রহণ করে না, সে অর্থে প্রয়োজনমত প্রজার সাহায্য হয়, বাকি জমিতেছে। জমিয়া প্রচুর হইলে তাহা হইতে একটা বড় কাজ হয়তো হইবে, প্রজাদের গ্রামে গ্রামে

সমবায়-ব্যাঙ্ক স্থাপন করিতে পারিবে। সেই বা কতটুকু? আর এই চাষীদের মধ্যে কর্মপ্রচেষ্টার ফলে তাহার কল্পনার গণ-আন্দোলন গণ-বিপ্লব, সে কি কোন দিন সত্য হইবে? চিন্তা করিতে করিতে তাহার মনে পড়িল, রাওলাট রিপোর্ট, রাওলাট আইন, জালিয়ানওয়ালাবাগ, কলিকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন, নাগপুর কংগ্রেস অসহযোগ-আন্দোলনে পরিণত হইতে চলিয়াছে। ধীরে ধীরে মন আবার আশায় ভরিয়া উঠিল। সে কল্পনা করিল, এই গ্রাম হইতে একদিন ভাবী পুরুষের দল সারি বাঁধিয়া অভিযান করিয়া চলিয়াছে গণ-আন্দোলনকে পুষ্ট করিতে; অহিংসা তাহার মূল মন্ত্র। শিবনাথ উৎসাহিত হইয়া একজন তদ্বিরকারক চাষীকে ডাকিয়া বলিল, তুমি একবার যাও দেখি, যে সব লোক চরকা নিয়েছে, তাদের বলে এস যে, সুতো বড্ড কম হচ্ছে। আরও বেশি সুতো হওয়া দরকার।

লোকটি চলিয়া গেল, সে নিজে বাহির হইল তাঁতীদের বাড়ির দিকে, কাপড়ের কাজ বড় কম হইতেছে। রাশি রাশি কাপড় চাই—রাশি রাশি কাপড় চাই।

তাঁতীদের বাড়ি বাড়ি ঘুরিয়া যখন সে ফিরিল, তখন বেলা প্রায় দুইটা। সুশীল তখনও ঘুমাইতেছে। ঠাকুর বলিল, বাবু উঠেছিলেন একবার, স্নান করে খেয়ে আবার শুয়েছেন।

স্নান-আহার শেষ করিয়া শিবনাথ ডেক-চেয়ারখানা বারান্দায় বাহির করিয়া তাহারই উপর শুইয়া পড়িল। তাহারও চোখে ঘুম ধরিয়া আসিয়াছিল, কিন্তু কাহার ভারী পদশব্দে চোখ মেলিয়া সে দেখিল, সুশীল আসিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়াছে। শিবনাথ ঈষৎ হাসিয়া বলিল, ঘুম ভাঙল সুশীলদা?

সুশীলও হাসিয়া বলিল, ভাঙল।

শরীর সুস্থ হয়েছে?

তাজা রেস-হর্সের মত। আরও এক শো মাইল আবার কভার করতে পারব। কিন্তু চা বানাও ভাই। তারপর চল, একটু বেড়িয়ে আসি নদীর ধারে ধারে।

সেই রহস্যময় প্রদোষালোকের মধ্যে নদীর বালুকাগর্ভের উপর বসিয়া সুশীল এই কয় বৎসরের উন্মাদনাময় বিপ্লবপ্রচেষ্টার কথা বলিয়া কহিল, আরব্য উপন্যাসের একাধিক সহস্র রজনীর গল্পের মত রাত্রির পর রাত্রি বলে গেলেও এ ইতিহাস নিখুঁত করে বলে শেষ হবে না শিবনাথ। দেশের লোক জানলে না, কিন্তু বিদেশী গভর্মেণ্ট জেনেছে, তারা লিখে রেখেছে। রাওলাট রিপোর্টে এর ইতিহাস রয়ে গেল। যথাসাধ্য বিকৃত করেছে, কিন্তু ভাবীকালের ঐতিহাসিকের সায়েণ্টিফিক মনের কাছে তার সত্য স্বরূপ লুকোনো থাকবে না।

শিবনাথ নীরবে অন্ধকারের দিকে চাহিয়া বসিয়া ছিল। সে শুধু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। সুশীলের আবেগ তখনও শেষ হয় নাই, সে আবার বলিল, একটা বিরাট উদ্যম, পাঞ্জাব থেকে বাংলা পর্যন্ত বিপ্লবের একটা ধারা ব্যর্থ হয়ে গেল!

শিবনাথের মনে পড়িয়া গেল অতি সাধারণ আকৃতির অসাধারণ মানুষটির কথা, 'না পূর্ণ, বাস্তবতার দিক দিয়েও এ অসম্ভব, এ হয় না।' সে এবার বলিল, এ কথা একজন জানতে পেরেছিলেন, বুঝতে পেরেছিলেন সুশীলদা।

বাধা দিয়া সুশীল বলিল, হত শিবনাথ, হত। সামান্য ভুলের জন্যে সব পণ্ড হয়ে গেল। দেশের লোক একটু সাহায্য করলে না।

শিবনাথ সুশীলের কথার প্রতিবাদ করিল না। সে তাহাকে জানে, তাহার মত, তাহার পথ তাহার কাছে অভ্রান্ত। তাহাতে এতটুকু আঘাত সে সহ্য করিতে পারে না। সে মনে মনে সেই দিনের আরও কয়েকটা কথা স্মরণ করিল, 'ব্রাহ্মণ্যধর্মের জন্মভূমি ভারতবর্ষের বুকে চারিদিকে শূদ্র আর শূদ্র—অনার্য আর অনার্য।' সে নিজেও এ কথা প্রত্যক্ষ করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে আসিয়া তাহাদের অন্তরলোক পর্যন্ত তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়াছে, স্বাধীনতা তাহাদের কাছে একটা দুর্বোধ্য শব্দ ছাড়া কিছু নয়। সাহায্য তাহারা করিবে কোন্ প্রেরণায়?

সুশীল আবার বলিল, কিন্তু তুমি এ কি করছ শিবনাথ? এতে কি হবে?

শিবনাথ বলিল, তেত্রিশ কোটি লোকের স্বাধীনতার জন্যে ছেষট্টি কোটি হাত উদ্যত করবার সাধনা আমার সুশীলদা, গণ-বিপ্লব।

সুশীল একটু চিন্তা করিয়া বলিল, সে কি কোন কালে হবে?

গভীর বিশ্বাসের সহিত শিবনাথ বলিল, হবে—দি ডে ইজ ডনিং, এই নন্-কো-অপারেশনের মত আন্দোলন পাঁচ বছর আগেও কি কেউ কল্পনা করতে পেরেছিল সুশীলদা? এই শুকনো বালির মরুভূমির ওপর আমরা বসে আছি, ওই কোথায় একধারে খানিকটা জল ঝিরঝির করে বয়ে চলেছে। একদিন এরই বন্যায় দিকদিগন্তর একেবারে ভেসে যায়, ডুবে যায়। কিন্তু সে বন্যা একেবারে আসে না, প্রথমে এই বালি ঢাকে, তারপর কূল পর্যন্ত ভরে, তারপর কূল ভাসায়।

সুশীল বলিল, তোমার কল্পনা বাস্তবে পরিণত হোক শিবনাথ, কিন্তু আমি ওতে বিশ্বাস করতে পারলাম না।

শিবনাথ মুহূর্তে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, বলিল, তুমি বিশ্বাস কর না সুশীলদা, আমি বিশ্বাস করি। আমি জানি, আমার সাধনা আমার জীবনেই হয়তো সিদ্ধ হবে না; কিন্তু সাধনার সঞ্চয় হারাবে না, সে হারায় না, সে থাকে; আবার একজন এসে তাকে পরিপুষ্ট করে। অহিংসায় আমি বিশ্বাস করি, গণ-আন্দোলন আমি প্রত্যাশা করি;

বিশ্বাস করি আমি মানুষকে। ক্ষুদ্র হোক, হীন হোক, দীন হোক, তাদের ক্ষুদ্রতা হীনতা দীনতা সমস্ত কিছুর মধ্য দিয়েই, তুমিও যেখানে যেতে চাও, তারাও চায় সেইখানে যেতে—এক পরম লক্ষ্যে। সৃষ্টির আদিকাল থেকে জীবনের এই বিশৃঙ্খল উন্মত্ত যাত্রায় মানুষ দিগ্‌ভ্রান্তের মত ছুটছে, অপমৃত্যুর সংখ্যা নেই। তাদের ঘোষণা দেবার কণ্ঠস্বর চাই সুশীলদা, জীবনকে যাত্রাপথে আহ্বান জানাবার ভাষা চাই, মানুষের চিরন্তন সাধনাই তো এই। স্বাধীনতা লাভ করলেই কি সব পেয়ে যাবে তুমি, সুশীলদা? জীবনের সকল দ্বন্দ্বেরই কি অবসান হবে?

সুশীল স্থির দৃষ্টিতে শিবনাথের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, কোনও উত্তর দিল না। শিবনাথ কিছুক্ষণ পর আবার বলিল, উত্তর দিলে না তুমি। কিন্তু আমি বলছি, সব পাবে না। দ্বন্দ্বের অবসান হবে না। ওতে তুমি চরম প্রাপ্তি পাবে, পরম প্রাপ্তি নয়। চরমের মধ্যে প্রাচুর্য আছে, কিন্তু সে অফুরন্ত নয়, তার ক্ষয় আছে, ওটা সাময়িক; পরম হল অফুরন্ত, অক্ষয়, চিরন্তন।

সুশীল এবার হাসিয়া বলিল, তা হলে তো সন্ন্যাসী হলেই পারতে, গুহার মধ্যেই তো পরম তত্ত্বের সন্ধান মেলে বলে শুনেছি।

হাসিয়া শিবনাথ উত্তর দিল, রাগাতে আমায় পারবে না সুশীলদা। তুমি যা বললে, সেও আমি বিশ্বাস করি, কিন্তু ওই গুহাটির সন্ধান করতেও যে আলোর সাহায্য চাই। স্বাধীনতা চাই আগে, তবে তো মুক্তি।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সুশীল বলিল, যাক, তোমার কাজ তুমি কর, আমার পথে আমি চলে যাব। আজ রাত্রেই আমি রওনা হব শিবনাথ।

আজ রাত্রেই? কোথায়?

সুশীল আসিয়া বলিল, প্রথম প্রশ্নের উত্তর, হ্যাঁ, আজ রাত্রেই। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর আমিও নির্দিষ্টরূপে জানি না। তবে চলেছি পেশোয়ারের পথে, চেষ্টা করব ভারতবর্ষের বাইরে চলে যেতে। এখন আর দেশে থেকে কাজ করা সম্ভব নয়, দেশের বাইরে থেকে কাজ করতে হবে।

শিবনাথ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, আপনার মা, দীপা— এঁরা?

বেশ তো 'তুমি তুমি' হচ্ছিল, আবার 'আপনি' কেন?

শিবনাথ হাসিয়া বলিল, সহজ অবস্থায় কেমন বাধছে। যাক, এখন কথার উত্তর দিন।

বাড়িতে রইলেন।

কিন্তু তাঁদের দেখবেন কে?

নিজেরাই দেখবেন। ভগবান থাকলে ভগবান দেখবেন।

কিন্তু—

বাধা দিয়া এবার সুশীল বলিল, থাক ও কথা শিবনাথ। এখন তোমার কাছে কেন এসেছি শোন। কিছু অর্থসাহায্য করতে পার?

বেশি টাকা তো আমার কাছে নেই, এক শো টাকা মাত্র হতে পারে।

যথেষ্ট, যথেষ্ট। তাই দাও তুমি।

রাত্রি তখন প্রায় দ্বিপ্রহর। চারিদিক স্তব্ধতায় যেন নিথর হইয়া পড়িয়াছে। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি, আকাশে আকাশ-ভরা তারা, পৃথিবীর বুকের উপর জমাট অন্ধকার।

সুশীল ও শিবনাথ ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। সুশীলের গায়ে একটা আলখাল্লা, গলায় একবোঝা ফকির-কাঠি অর্থাৎ রঙিন পাথরের মালা, কাঁধে একটা ঝোলা, মাথায় মুসলমানী টুপি। সে হাসিয়া বলিল, ছালাম বাবুছাহেব, হজ্ব করতি চললাম।

শিবনাথ কিন্তু কথার উত্তর দিতে পারিল না, টপটপ করিয়া কয় ফোঁটা জল তাহার চোখ হইতে ঝরিয়া পড়িল। সুশীল আবার বলিল, আমার কাপড়-চোপড় যা পড়ে রইল, সেগুলো পুড়িয়ে নষ্ট করে দিও। তারপর আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিয়া বলিল, ঠিক আছে।

শিবনাথ এতক্ষণে প্রশ্ন করিল, কি?

বৃশ্চিক রাশিটাকে দেখে নিলাম, ওই দেখ। ওই আমার দিকনির্ণয়যন্ত্র।

শিবনাথ আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিল, আকাশের প্রায় একাংশ জুড়িয়া বৃশ্চিকের দীর্ঘ বঙ্কিম পুচ্ছরেখা জলজল করিতেছে।

সুশীল বলিল, চলি তা হলে। 'একলা চল রে'।

শিবনাথ কথা বলিল না, হেঁট হইয়া সুশীলের পা ছুঁইয়া প্রণাম করিল। মাথা তুলিয়া উঠিয়া সে দেখিল, সুশীল দ্রুতপদে আগাইয়া চলিয়াছে। কয়েক মুহূর্ত পরেই আর তাহাকে দেখা গেল না, গভীর অন্ধকারের মধ্যে বৃশ্চিকের বঙ্কিমপুচ্ছনির্দিষ্ট পথে দূর-দূরান্তরে যেন মিলাইয়া গিয়াছে।

সমস্ত রাত্রি শিবনাথের ঘুম হইল না। রক্তের ধারায় ধারায় উত্তেজনার প্রবাহ বহিয়া চলিয়াছে। মনের মধ্যে একটা গ্লানি যেন তীক্ষ্মমুখ সূচের মত তাহাকে বিদ্ধ করিতেছিল। আন্দোলনের নির্যাতনময় ঘনীভূত যুদ্ধক্ষেত্রের আহ্বান যেন তাহার কানে আসিয়া পৌঁছিতেছে। সংবাদপত্রের সংবাদগুলি তাহার চোখের উপর প্রত্যক্ষ হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে। দলের পর দলে স্বেচ্ছাসেবকেরা চলিয়াছে, পুলিস গ্রেপ্তার করিতেছে।

কারাপ্রাচীরের অন্তরাল হইতে তাহাদের কণ্ঠধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছে। পুলিসের বেটনের আঘাতে অহিংস-যুদ্ধের সৈনিকের মুখ রক্তে ভাসিয়া গেল। দেশের মাটির বুকে সেই রক্ত ঝরঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে, মাটি শুষিয়া লইতেছে।

সে বিছানা হইতে উঠিয়া পড়িল।

আবার বারান্দায় বাহির হইয়া আসিয়া সে দাঁড়াইল। পৃথিবীর বুকজোড়া নীরন্ধ্র অন্ধকারের মধ্যে বহু বহু উর্ধ্বলোকে নক্ষত্রখচিত আকাশ। মাটির বুকে অসংখ্য কোটি কীটপতঙ্গের সম্মিলিত সঙ্গীতধ্বনি। সহসা তাহার যেন মনে হইল, ওই সঙ্গীতের ভাষা স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছে। নক্ষত্রের আলোক-সঙ্কেতের মধ্যেও যেন ওই একই ভাষা রূপায়িত হইতেছে।—

"যাত্রা কর, যাত্রা কর, যাত্রীদল
এসেছে আদেশ—
বন্দরের কাল হল শেষ!"

সত্যই তো, এই যাত্রার আদেশই তো মহাকালের চিরন্তন আদেশ! যে যাত্রা করিয়াছে, সে-ই পরমকে পাইয়াছে; যে মধ্যপথে থামিয়াছে, সে পায় নাই; কিন্তু চলা যাহার থামে নাই, সে কবে বঞ্চিত হইয়াছে! যাত্রার সঙ্কল্প সে স্থির করিয়া ফেলিল। আর নয়, বন্দরের কাল শেষ হইয়াছে।

পাশের ঘরে প্রবেশ করিয়া হ্যারিকেনের শিখাটা সে বাড়াইয়া দিল। এক দিকে তাহার বই, অন্য দিকে সুতা ও খদ্দর কাঠের শেল্‌ফের মধ্যে থাকে থাকে সাজানো রহিয়াছে। সম্মুখের দেওয়ালের গায়ে একখানি ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকা, অতি সযত্নে চারিদিকে আলপিন দিয়া আবদ্ধ করিয়া টাঙানো। সে সসম্ভ্রমে পতাকাটিকে অভিবাদন করিয়া দেওয়াল হইতে খুলিয়া লইয়া মাথার উপর তুলিয়া ধরিল।

কালই সে কলিকাতায় রওনা হইবে, স্বেচ্ছাসেবকের দলে সেবক-রূপে সে প্রত্যক্ষ যুদ্ধে ঝাঁপ দিয়া পড়িবে। সহসা তাহার মনে পড়িল আপন গ্রামের কথা। দেশের সর্বত্র যখন জীবনের ধ্বনিতে মুখর হইয়া উঠিতেছে, তখন কি তাহার জন্মভূমিই নীরবে মাথা হেঁট করিয়া থাকিবেন? সে সঙ্কল্প দৃঢ় করিয়া ফেলিল, কলিকাতা নয়, তাহার আপন গ্রামে—যেখানে সে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সেইখানে তাহার সকল শক্তি নিঃশেষ করিয়া যুদ্ধ করিবে। উত্তেজনার আবেগে সর্বাঙ্গ তাহার থরথর করিয়া কাঁপিতে আরম্ভ করিল।

বত্রিশ

পরদিন সকালেই গোরুর গাড়িতে অতি প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি বোঝাই করিয়া লইয়া দীর্ঘ আড়াই বৎসর পর আবার আপনার গ্রামের দিকে রওনা হইল। বাকি জিনিসপত্র পড়িয়া রহিল, কৃষিক্ষেত্র পড়িয়া থাকিল। ক্ষেত্রের নানা স্থানে ফসল ফলিয়াছিল, ঘনসন্নিবিষ্ট গাঢ় সবুজ ফসলের সমারোহ সকালের বাতাসে দুলিয়া দুলিয়া নাচিতেছিল, সেদিকে সে ফিরিয়াও চাহিল না। এখানে আসিবার সময় সে আসিয়াছিল ঘোড়ায়, ফিরিবার সময় চলিল গোরুর গাড়িতে। সে ঘোড়া আর নাই, এখানে আসিয়া প্রথমেই ঘোড়াটাকে বেচিয়া দিয়াছে। ধনগত আভিজাত্যের সমস্ত কিছু সে বর্জন করিয়াছে।

মাঠের মাঝখান দিয়া কাঁচা সড়ক, তাহারই উপর মন্থর গমনে গাড়িখানা চলিয়াছিল। শিবনাথ নিবিষ্টচিত্তে ভাবিতেছিল ভবিষ্যৎ-কর্মপদ্ধতির কথা। গাড়িখানার ঝাঁকানিতে, দোলায় তাহার সমস্ত দেহ নড়িতেছে দুলিতেছে, তবু তাহার চিন্তাধারা খরস্রোতা নদীর মত বহিয়া চলিয়াছে।

গ্রামের কেহ কি সাড়া দিবে? ডাক শুনিয়া কেহ কি আসিবে? সঙ্গে সঙ্গে তাহার ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটিয়া উঠিল। গত রাত্রের সুশীলের কথা মনে পড়িল, সে যাইবার সময় মহাকবির গানের তিনটি শব্দ উচ্চারণ করিয়াছিল, সেই শব্দ তিনটি মনে পড়িল, 'একলা চল রে'। চলিতে হইবে, সে একলাই চলিবে, লোকে তাহার ডাক শুনিয়া ঘরের দুয়ার বন্ধ করুক, অন্ধকার দুর্যোগে কেহ আলো না ধরুক, তাহার আপন বুকের পঞ্জরাস্থি জ্বালাইয়া লইতে কণ্টকাকীর্ণ পথ ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত পদে দলিয়া দলিয়া চলিতে হইবে।

বাধা দিবে রাখাল সিং, কেষ্ট সিং। তাহারা প্রবল আপত্তি তুলিবে। মাস্টার মহাশয়? না, মাস্টার মহাশয় বোধ হয় বাধা দিবেন না, তিনি বাধা দিতে পারেন না। গোঁসাই-বাবা কোনও কথা বলিবেন না, নির্বাক হইয়া দেখিবেন। সহসা নদীর বন্যার উপর যেমন কখনও কখনও নূতন উচ্ছ্বসিত জলরাশি ছুটিয়া আসিয়া নীচের জলকে ঢাকিয়া দিয়া চলিয়া যায়, তেমনই ভাবে আর একজনের স্মৃতি সকলের কথা আবৃত করিয়া শিবনাথের মনে পড়িয়া গেল, পিসীমা—তাহার পিসীমার কথা। আজ দীর্ঘ চার বৎসর পর পিসীমার কথায় তাহার অন্তর উদ্বেল আকুল হইয়া উঠিল। পিসীমার মূর্তির পাশেই আর একজনের মূর্তি ভাসিয়া উঠিল—গৌরীর মূর্তি, গৌরীর কোলে একটি শিশু। শিবনাথের চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। আজও সে তাহার সন্তানকে দেখে নাই। জীবনের অশান্তি, দুর্ভাগ্যের স্মৃতি তাহাকে বিচলিত করিয়া তুলিল। এ দুর্ভাগ্য

হইতে তাহাকে রক্ষা করিতে পারিতেন একজন, সে তাহার মহিমময়ী মা। পিসীমা ও গৌরীর মাঝখানে তাহার মা যেন এবার হাসিমুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। অগ্নিশিখার মত দীপ্তিময়ী, ধরিত্রীর মত প্রশান্ত ধৈর্যময়ী তাহার মা—জীবনের অশান্তির দুর্বার স্রোতকে ঘুরাইয়া দিতে পারিতেন। আজ তিনি থাকিলে তাহাকে আশীর্বাদ করিয়া পাঠাইয়া দিতেন জাতির জীবন-যুদ্ধে। তিনি থাকিলে পিসীমাও যদি আজ তাহার সম্মুখে বাধার সৃষ্টি করিয়া দাঁড়াইতেন, তবে সে বাধাও শিবনাথ জয় করিতে পারিত। মায়ের মধ্য দিয়া পিসীমার বুকে সে আজ প্রেরণার সৃষ্টি করিত, বলিত, এ তো তোমারই শিক্ষা, এ শক্তি যে তোমারই দান! তুমিই যে শিখাইয়াছিলে, 'না খাব উচ্ছিষ্ট ভাত, না দিব চরণে হাত'! আজ চাহিয়া দেখ, সমগ্র জাতিটাই উচ্ছিষ্টভোজী, সে কি উদরের ক্ষুধায়, না, মনের ক্ষুধায়! আর পায়ে হাত! মাথাই যে সমগ্র জাতির পদানত। তোমার দুঃখমোচনের মতই যে সমান গুরুভার দায়িত্ব আমার দেশের দুঃখ-মোচনের! মায়ের গর্ভ হইতে যখন আসিলাম, তখন প্রথম ধরিয়াছিল এই দেশ—মা-ধরিত্রী আর তুমি। পিসীমার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিত। মায়ের মুখে বরাভয়ের মত প্রদীপ্ত হাসি। সে বরাভয়ের স্পর্শে গৌরীও আজ গৌরবদীপ্ত মুখে নির্ভীক দৃঢ়তার সহিত বলিত, তোমার পাশেই যে আমার স্থান, আমাকে ফেলিয়া কোথায় যাইবে? তাহার মা তাহাদের সন্তানকে দেখাইয়া বলিতেন, না, শিবনাথের ভবিষ্যৎ তোমার হাতে, তুমি গেলে তাহাকে বাঁচাইবে কে?

তাহার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল, আপাদমস্তক শিরায় শিরায় রক্তস্রোত দ্রুততর গতিতে বহিয়া গেল।

গাড়োয়ানটা বলিল, গাঁ এসে গেইছি বাবু।

এতক্ষণে শিবনাথের চিন্তাধারা ব্যাহত হইল। ওই যে গ্রামের প্রথমেই পুরানো হাটতলায় বড় আমগাছটা; তাহার পরই সরকার-দীঘি, দীঘির পাড়ের উপর পচুইয়ের দোকান।

ইহারই মধ্যে পচুইয়ের দোকানে লোক আসিতে শুরু করিয়াছে। জন কয়েক সাঁওতাল দুইটা মরা গোসাপ লাঠির ডগায় ঝুলাইয়া লইয়া চলিয়াছে; চামড়াটা বেচিবে, মাংসটা পুড়াইয়া খাইবে। ওদিক হইতে আসিতেছে জন চারেক জেলে, শিবনাথ তাহাদের চিনিল,—বিপিন, নবীন, কুঞ্জ আর হরি। শিবনাথ জাতীয় পতাকা হাতে করিয়া গাড়ি হইতে নামিয়া পড়িল। বন্দরের কাল শেষ হইয়াছে। যাত্রা করিবার আদেশ আসিয়াছে, সে শুনিয়াছে, প্রত্যক্ষ শুনিয়াছে। মুহূর্ত সময় অপব্যয় করিবার অবসর নাই।

সে গাড়োয়ানটাকে বলিল, গাড়ি নিয়ে তুই বাড়িতে চলে যা। আমি যাচ্ছি, কিছুক্ষণ হয়তো দেরি হবে।

গাড়োয়ান গাড়ি হাঁকাইয়া চলিয়া গেল, শিবনাথ হাতজোড় করিয়া আসিয়া ওই জেলে ও সাঁওতাল কয়টির সম্মুখে পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল। সাঁওতালেরা অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া গেল, জেলে কয়টি সসম্ভ্রমে ও সভয়ে শিহরিয়া উঠিয়া প্রণাম করিয়া বলিল, হেই মা রে! বাবু মাশায়, আপুনি ই কি করছেন হুজুর? আমাদের মাথায় যে বজ্রাঘাত হবে, নরকেও ঠাঁই হবে না দেবতা।

পচুইয়ের দোকানের ভেণ্ডার ত্রিলোচন সাহা অল্প নীচু হইয়া প্রণাম করিয়া বলিল, এ আপুনি কি করছেন বাবু?

শিবনাথ মিষ্ট হাসি হাসিয়া বলিল, এদের মদ খেতে বারণ করছি ত্রিলোচন।

ত্রিলোচন জোড়হাত করিয়া বলিল, আজ্ঞে, আঁমরা কি অপরাধ করলাম বাবু?

অপরাধ নয় ত্রিলোচন। এই হল কংগ্রেসের হুকুম, আমি সেই হুকুমমত কাজ করতে এসেছি।

ত্রিলোচন শিহরিয়া উঠিল, বলিল, আপুনি পিকেটিং করতে এসেছেন বাবু?.

হ্যাঁ।

আজ্ঞে, আপুনি বাড়ি যান বাবু, আপুনি বাড়ি যান। পুলিসে খবর পেলে এখুনি ধরে নিয়ে যাবে।

হাসিয়া শিবনাথ বলিল, জানি।

চারিদিকে জনতা জমিতে শুরু করিয়াছিল, সকলেই গ্রামের লোক। প্রত্যেকেই শিবনাথকে চেনে, তাহারা ত্রিলোচনের কথা ও শিবনাথের কথা শুনিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিল। নিশি চৌধুরী আগাইয়া আসিয়া বলিল, বাবু, বাড়ি চলুন।

শিবনাথ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, তোমরা ভয় করছ কেন? তোমরা জান না, আজ দেশের—সমস্ত ভারতবর্ষের দিকে দিকে—চারিদিকে হাজার হাজার জোয়ান ছেলে জেলে চলেছে, সমাজের দেশের যাঁরা মাথার মণি, তাঁরা হাসিমুখে যাচ্ছেন জেলে। কেন? দেশের মুক্তির জন্যে, জাতির মুক্তির জন্যে, তোমাদের মুক্তির জন্যে। সোনার দেশ শ্মশান হয়ে গেল, আজও কি মদ খেয়ে বিভোর হয়ে পড়ে থাকবার সময় আছে, না, ভয় করে স্ত্রীলোকের মত ঘরের কোণে বসে থাকবার সময় আছে! আমাকে তোমরা ডাকছ, বলছ, পালিয়ে এস, ফিরে এস। কিন্তু আমি তোমাদের ডাকছি, তোমরা আর ঘরের মধ্যে লুকিয়ে বসে থেকো না; বেরিয়ে এস, দেশের কাজে স্বরাজের যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়। বিলিতী কাপড়, বিলিতী জিনিস পোরো না, মদ খেও না, সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা কোরো না।

এবার জনতা স্তব্ধ হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; শিবনাথ আবেগভরে আবার বলিল, বল—বন্দে মাতরম্।

তবুও জনতা স্তব্ধ। বরং পিছন হইতে দুই-চারিজন সরিয়া পড়িল। শিবনাথ আবার বলিয়া উঠিল, বল—বন্দে মাতরম্।

এবার জনতার পিছন হইতে সতেজ কিশোর কণ্ঠে কে বলিয়া উঠিল, বন্দে মাতরম্। সমগ্র জনতা সবিস্ময়ে পিছনের দিকে দৃষ্টি ফিরাইল,—একটি শ্যামবর্ণের কিশোর জনতার মধ্য দিয়া পথ করিয়া লইয়া চলিয়া আসিতেছে। শিবনাথ তাহাকে দেখিয়া পুলকিত হইয়া বলিয়া উঠিল, শ্যাম, তুই ?

আমি এসেছি শিবনাথদা।

শ্যাম, কলেরায় সেবাকার্যের সেই সর্বকনিষ্ঠ ছেলেটি—সে আজ কিশোর হইয়া উঠিয়াছে, সে আসিয়া শিবনাথের পাশে দাঁড়াইল।

তুই কি করে খবর পেলি যে, আমি এখানে এসেছি ?

শ্যাম বিপুল উৎসাহের সহিত বলিল, সমস্ত গ্রামে খবর ছড়িয়ে পড়েছে শিবনাথদা। আমি ছুটে বেরিয়ে এলাম।

অকস্মাৎ পিছন হইতে জনতা অতি দ্রুতবেগে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। কয়েক মুহূর্ত পরেই সমগ্র জনতা অপসারিত হইয়া গেলে শিবনাথ দেখিল, থানার অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সাব্‌ইন্সপেক্টর ও একজন কন্‌স্টেব্‌ল তাহার দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। এ. এস্. আই. মুখ বাঁকাইয়া হাসিয়া বলিল, এই যে এসেছেন আপনি! আমরা ভাবছিলাম, বলি, এ হুজুকে শিবনাথবাবুটি রইলেন কোথায় ?

শিবনাথ হাসিয়া তাহারই মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। এ. এস. আই. বলিল, আসুন, আমার সঙ্গে আসুন।

শিবনাথ তাহার অনুসরণ করিয়া বলিল, চলুন। শ্যামু, তুই বাড়ি যা, রাখাল সিংকে খবরটা দিস।

এ. এস. আই. বলিল, হুঁ, এটিও এসে জুটেছে দেখছি। তারপর রূঢ়স্বরে বলিল, এই ছোঁড়া, ডেঁপোমি করতে হবে না, যা, বাড়ি যা।

শ্যাম ঘুরিয়া দাঁড়াইল। শিবনাথ দেখিল, উত্তেজনায় তাহার মুখ আরক্ত, প্রদীপ্ত দৃষ্টি, দাঁড়াইবার ভঙ্গীর মধ্যে সুকঠিন দৃঢ়তা—প্রতি অঙ্গের ভঙ্গীগুলি মিলিয়া একটা অবিচল সঙ্কল্প যেন তাহার সর্বাঙ্গ হইতে শানিত দীপ্তির মত ঠিকরিয়া পড়িতেছে। আনন্দে গৌরবে প্রেরণায় শিবনাথের অন্তর ভরিয়া উঠিল, তবু সে শ্যামকে বাধা দিল, বলিল, আমি বলছি, তুই আজ বাড়ি যা শ্যামু। আজ যদি আমি যাই, তবে তোর

যাবার দিন হবে কাল। তোর জায়গায় আর একজনকে দাঁড় করিয়ে তুই তবে যেতে পাবি। বাড়ি যা।

শ্যামুর মুখ ছলছল করিয়া উঠিল, কিন্তু সে আর প্রতিবাদ করিল না, ফিরিল। শিবনাথ একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া এ. এস. আই.-কে বলিল, চলুন।

এ. এস. আই. বলিল, থানায় নয়, আপনার বাড়িতে চলুন।

শিবনাথ বুঝিল, বাড়ি সার্চ হইবে। এক মুহূর্তে সে মনে মনে বাড়ির প্রতিটি কোণ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সন্ধান করিয়া দেখিয়া লইল, তারপর হাসিমুখে বলিল, চলুন।

বাড়িতে আসিয়া কিন্তু এ. এস. আই. বলিল, কেন মিথ্যে মিথ্যে হাঙ্গামা করছেন শিবনাথবাবু? আপনি বুদ্ধিমান পরোপকারী, যাকে বলে—মহাশয় লোক, তার ওপর আপনি জমিদারের ছেলে। আপনার দেশের সত্যিকার কাজ করুন, গভর্মেণ্ট আপনাকে অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট করে দেবে, খেতাব দেবে। ওসব আপনি করবেন না।

শিবনাথ সবিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, এই বলবার জন্যেই আপনি আমাকে এখানে নিয়ে এলেন বুঝি?

এ. এস. আই. হাসিয়া বলিল, আপনি স্নান করুন, খাওয়া-দাওয়া করুন, তারপর ভেবে-চিন্তে যা হয় করবেন। আচ্ছা, আসি তা হলে। নমস্কার।

শিবনাথ বুঝিল, পুলিস সুকৌশলে তাহাকে উপস্থিত প্রতিনিবৃত্ত করিয়া গেল, খানিকটা কৌতুকও অনুভব করিল, কৌতুকে খানিকটা না হাসিয়া সে পারিল না। দাবাখেলার মত এ যেন কিস্তি সামলাইয়া কিস্তি দিয়া গেল। মুহূর্তে সে আপনার সঙ্কল্প ঠিক করিয়া লইল; পুনরায় সে পতাকা হাতে করিয়া পথে নামিবার জন্য অগ্রসর হইল। কিন্তু পথে নামিবার পূর্বেই পিছন হইতে রাখাল সিং তাহাকে ডাকিলেন, বাবু!

বাধা পাইয়া শিবনাথের ললাট কুঞ্চিত হইয়া উঠিল, সে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিল, কিছু বলছেন?

হাতজোড় করিয়া রাখাল সিং বলিলেন, আজ্ঞে বাবু, আমাকে আপনি রেহাই দিয়ে যান। শিবনাথ দেখিল, একা রাখাল সিং নয়, রাখাল সিংয়ের পিছনে কেষ্ট সিংও মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। রাখাল সিংয়ের কথা শেষ হইবামাত্র সেও বলিয়া উঠিল, আমিও ছুটি চাইছি দাদাবাবু, এ আমরা চোখে দেখতে পারব না।

শিবনাথ একটা দীর্ঘনিশ্বাস না ফেলিয়া পারিল না। ওই পরমহিতৈষী ভৃত্য দুই-জনের আকুল মমতার আবেদন অকস্মাৎ তাহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। রাখাল সিং অত্যন্ত কাতরভাবে তাহার পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া পা দুইটি ধরিয়া বলিলেন, আপনার পায়ে ধরছি বাবু, এমন করে সর্বনাশ আপনি করবেন না। পিসীমার কথা একবার ভাবুন, বউমার কথা একবার ভাবুন, খোকাবাবুর কথা একবার মনে করুন।

শিবনাথ ধীরে ধীরে আপনাকে সংযত করিয়া তুলিতেছিল, পিসীমা ও গৌরীর উল্লেখে অকস্মাৎ মুহূর্তের মধ্যে অবিচল দৃঢ়তায় তাহার মন ভরিয়া উঠিল, তাহার অন্তরের শক্তি ও সঙ্কল্প একটা প্রেরণার আবেগে যেন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। শিবনাথ বলিল, রেহাই আপনাদের আমি দিলাম সিং মশায়, আপনি পা ছাড়ুন, আমাকে বাধা দেবেন না।

রাখাল সিং একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া বলিলেন, তা হলে হিসেব-নিকেশ—

সমস্তই আমি মঞ্জুর করে দিলাম সিং মশায়।

একবার দেখে-শুনে—

দরকার নেই। সে বিশ্বাস আপনার ওপর আমার আছে।

তা হলেও একটা ফারখত—

চলুন, আমি লিখে দিচ্ছি। শিবনাথ ফিরিয়া আসিয়া কাছারিতে বসিয়া বলিল, কাগজ-কলম নিয়ে আসুন।

কাগজ-কলম দিবার পূর্বেই রাখাল সিং কোমর হইতে চাবির থোলো খুলিয়া সম্মুখে নামাইয়া দিয়া বলিল, চাবি।

চাবির গোছাটা অতর্কিত একটা শৃঙ্খলবন্ধনের মত তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। শিবনাথ বিব্রতভাবে মাথা নীচু করিয়া ভাবিতে বসিল। রাখাল সিং একটা থামের গায়ে ঠেস দিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া নিস্পন্দের মত দাঁড়াইয়া ছিলেন, শুধু অতি মৃদু স্পন্দনে তাঁহার ঠোঁট দুইটি কাঁপিতেছিল ঘাসের পাতার মত। আড়ালে বসিয়া কেষ্ট সিং ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছিল। সতীশ গাঁজা টানিয়া বিভোর উদাসীনের মত বসিয়া ছিল।

এই বিচিত্র স্তব্ধতা ভঙ্গ হইল কাহার প্রচণ্ড সবল পদক্ষেপের শব্দে। শুধু শব্দই নয়, আগন্তুকের বিপুল শক্তি ও গতিবেগের মিলিত আবেগে কাছারি-বাড়ির শান-বাঁধানো মেঝের প্রান্তদেশ পর্যন্ত একটা স্পন্দন সঞ্চারিত করিয়া তুলিয়াছিল। শিবনাথের চিনিতে ভুল হইল না, সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া আহ্বান করিল, গোঁসাই-বাবা!

অস্বাভাবিক দ্রুত গতিতে উত্তেজিত আরক্ত মুখে রামজী গোস্বামী আসিয়া দাঁড়াইলেন। চকিতের মধ্যে শিবনাথের এই আকস্মিক বন্ধন যেন শিথিল হইয়া আসিল, তাহার সঙ্কল্প স্থির হইয়া গেল, সে চাবির গোছাটি সন্ন্যাসীর দিকে বাড়াইয়া দিয়া বলিল, এই চাবিগুলো তুমি রাখ গোঁসাই-বাবা।

সন্ন্যাসী যে প্রচণ্ড গতিতে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সে তাঁহার মনের প্রচণ্ড আক্ষেপের প্রতিধ্বনি ছাড়া আর কিছু নয়। সমস্ত গ্রামেই ইহারই মধ্যে সংবাদটা রটিয়া

গিয়াছে। কিশোর যুবক সন্তানের মা-বাপেরা শিহরিয়া উঠিয়া শিবনাথকে অভিসম্পাত দিতে শুরু করিয়াছে, ব্যবসায়ীরা বিরক্তিতে ভয়ে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, শিক্ষিত একদল প্রশংসার গুঞ্জনে গৃহকোণ ভরিয়া তুলিয়াছে। শুধু জন কয়েক কিশোর ছেলে আকাশ-অভিসারী উদ্গতপক্ষ পতঙ্গের মত খুঁজিতেছে—ঘর হইতে বাহির হইবার পথ ও সাহস।

সন্ন্যাসী আসিয়াছিলেন শিবনাথকে তিরস্কার করিতে, তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে। কিন্তু শিবনাথের সহিত মুখামুখি দাঁড়াইয়া আজ অকস্মাৎ তিনি অনুভব করিলেন, এ তো সেই শিশুটি নয়, যে তাঁহার বুকের উপর ঝাঁপ দিয়া পড়িত, যাহাকে তিনি, 'বাবা হামার, হামার বাবা' বলিয়া বুকে জড়াইয়া আনন্দের আবেগে অধীর হইয়া উঠিতেন, এ তো সে নয়! সঙ্গে সঙ্গে এক মুহূর্তে তাঁহার অন্তরলোকে সর্বধ্বংসী ভূমিকম্পের কম্পনের মত একটা কম্পনে সব যেন ভাঙিয়া-চুরিয়া একাকার হইয়া গেল। তাঁহার মনে পড়িয়া গেল একদিনের কথা। তিনিই বলিয়াছিলেন দিদিকে—শৈলজা-ঠাকুরানীকে, মৃগশিশু তো ভাগবে, উ হামি জানি। মৃগশিশু পলাইয়াছে।

শিবনাথ সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিয়া বলিল, আমি যুদ্ধে যাচ্ছি গোঁসাই-বাবা, তুমি আশীর্বাদ কর।

সন্ন্যাসী শিবনাথের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন ; তিরস্কার করিবার অধিকার নাই ; ইচ্ছা হইল, শিবুর হাত দুইটি ধরিয়া অনুরোধ করেন, মৎ যাও বেটা, মৎ যাও তুমি জানে না বেটা, হামি জানে, ধরৃতি জয় করতে পারে আংরেজ। তাঁহার মনে পড়িয়া গেল যুদ্ধের কথা, কামানের কথা, বন্দুকের কথা, কাতারে কাতারে সুসজ্জিত সৈন্যদলের কথা। কিন্তু সেও তিনি পারিলেন না।

শিবনাথের চোখ-মুখ দীপশিখার মত উজ্জ্বল, সে মুখের সম্মুখে এমন কথা তিনি বলিবেন কি করিয়া ?

শিবনাথ হাসিয়া বলিল, এমন যুদ্ধ তোমরা কখনও কর নি গোঁসাই-বাবা। এতে শুধু মরতে হয়, মারতে হয় না। অহিংস যুদ্ধ। নিরস্ত্র হয়ে বীরের মত বন্দুকের সামনে দাঁড়াতে হবে।

সন্ন্যাসী শিবনাথের মাথায় হাত দিয়া বলিলেন, দীরঘ জীবন তুমার হোক বেটা, শওবরিষ তুমার প্রমায়ু হোক। আর তিনি দাঁড়াইলেন না, চলিয়া যাইবার জন্য ফিরিলেন।

শিবু বলিল, চাবিটা তুমি রাখ গোঁসাই-বাবা, আমার মাস্টার মশায়কে বরং দিয়ে দিও তুমি। দু-এক দিনেই তিনি এখানে নিশ্চয়ই আসবেন।

এ অনুরোধে সন্ন্যাসী আর 'না' বলিতে পারিলেন না, মিনিটখানেক চিন্তা করিয়া নীরবে দীর্ঘ হাতখানি প্রসারিত করিয়া দিলেন।

শিবনাথ পতাকা লইয়া আবার অগ্রসর হইল আপনার পথে।

তেত্রিশ

কলিকাতার অবস্থা তখন বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের মত। সভা-সমিতি, শোভাযাত্রায় জাতির জীবনোচ্ছ্বাস বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের উচ্ছ্বসিত তরঙ্গের মত ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল। স্বেচ্ছা-সেবকের দল—দলের পর দল, শাসনতন্ত্রের দুর্গপ্রাচীরমূলে আঘাত করিতে দুর্বার স্রোতের মত ছুটিয়া চলিয়াছে। মহানগরীর ঘরে ঘরে প্রতিটি নরনারীর সর্বাঙ্গে, প্রতিটি রোমকূপে তীব্র শিহরণ বহিয়া চলিয়াছে। তবুও আনুপাতিক সংখ্যায় অধিকাংশ গৃহদ্বার রুদ্ধ, সমুদ্রগর্জনের মত আহ্বান সত্ত্বেও অধিকাংশ মানুষই সভয়ে মূক হইয়া আছে।

ইহারই মধ্যে আবার একদল আছেন, যাঁহারা এই জীবনোচ্ছ্বাসকে অভিসম্পাত দেন, ঘরের মধ্যে সমধর্মী কয়েকজনে মিলিয়া তীব্র সমালোচনা করিয়া এই আন্দোলনকে আত্মঘাতী প্রতিপন্ন করিয়া তোলেন। ইঁহাদের সকলেই ধনী, অনেকে জমিদার, প্রত্যেকেই সমাজে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত। বিপ্লবের কলরোলে ইঁহাদের স্নায়ুমণ্ডলী সূক্ষ্ম ধাতব তারের মত ঝনঝন করিয়া উঠে। বিপ্লবের ভাবী রূপ কল্পনা করিয়া ইঁহারা শিহরিয়া উঠেন, মনশ্চক্ষে প্রত্যক্ষ যেন দেখিতে পান, বিপ্লবের প্রলয়তাণ্ডবে এই বর্তমান অতীতের মধ্যে বুদ্বুদের মত মিলাইয়া যাইতেছে; সেই বর্তমানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের জীবনের সব কিছুও যেন হারাইয়া যায়।

রামকিঙ্করবাবুরা এই দলের লোক। একাধারে তাঁহারা ধনী এবং জমিদার, তাহার উপর জেলার উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী-মহলে সুপরিচিত এবং সমাদৃত ব্যক্তি। ভাবীকালে প্রচুর মান-সম্মানের প্রত্যাশা তাঁহাদের অলীক নয়, ইহা সর্ববাদি-সম্মত; সুতরাং তাঁহাদের মতবাদ এমনই হওয়াই স্বাভাবিক। পথের শোভাযাত্রার কলরবে ধ্বনিতে রামকিঙ্করবাবুর ললাটে কুঞ্চনরেখা দেখা দেয়। সেই বিরক্তির সংস্পর্শ ক্রমে ক্রমে সমগ্র বাড়িতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, বাড়ির মেয়েরা পর্যন্ত বিরক্তিভরে বলে, মরণ হতভাগাদের, যত সব 'মায়ে-খেদানো বাপে-তাড়ানো'র দল! কাজ নেই, কম্ম নেই, চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গেলেন!

একজন হাসিয়া বলে, না চেঁচালে ধরবে না যে পুলিসে! বাইরে খেতে পায় না, জেলে গেলে তবু কিছুদিন খেয়ে-দেয়ে বাঁচবে।

অন্য একজন বলে, দেবে যেদিন গুলি করে মেরে, সেই দিন হবে।

এ সমস্ত তাহাদের শোনা কথা, শেখা বুলি।

কিন্তু তবু পথে ধ্বনি উঠিলেই বারান্দায় তাহাদের ছুটিয়া যাওয়া চাই। বাড়ির সম্মুখেই বড় একটা পার্ক, সেখানে সভা হইলেই ছাদে উঠিয়া আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত না

দেখিয়া তাহারা নীচে কিছুতেই নামে না। বক্তৃতার কতক তাহারা শুনিতে পায়, কতক পায় না, কিন্তু বাতাসের স্তরে স্তরে বক্তার এবং আবেগস্পন্দিত জনতার ক্ষুব্ধ জীবনের সংস্পর্শ তাহারা অনুভব করে। সভয়ে নির্বাক হইয়া তাহারা তখন মাটির পুতুলের মত দাঁড়াইয়া থাকে। ছোট ছোট ছেলেরা ছাদের আলিসার ফাঁকে মুখ রাখিয়া উঁকি মারিয়া দেখে, জনতার সঙ্গে সঙ্গে তাহারাও চিৎকার করে, বন্দে মাতরম্।

গৌরীর আড়াই বছরের শিশুটি অপটু জিহ্বায় বলে, বণ্ডে মাটরম্। মাঝে মাঝে শব্দটা সে ভুলিয়া যায়, তখন সে ছুটিয়া মায়ের কাছে আসিয়া বলে, বণ্ডে—, বল।

গৌরী বলে, ও বলতে নেই, ছি!

ছেলে কাঁদে, বলে, না, বল।

অগত্যা গৌরী বলে, বন্দে মাতরম্।

খুশি হইয়া শিশু আপন মনেই মুখস্থ করে, বণ্ডে মাটরম্, বণ্ডে মাটরম্।

সেদিন কমলেশ হঠাৎ শিশুর চিৎকার শুনিয়া ঠোঁট বাঁকাইয়া হাসিয়া বলিল, বাঃ! এই যে, 'বাপকা বেটা সিপাইকা ঘোড়া', বেশ বুলি বলছে!

গৌরী ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল, কমলেশের কথাটা তাহাকে অত্যন্ত তীক্ষ্ণভাবে আঘাত করিল, সে বলিল, ছোট ছেলেতে যা শোনে, তাই শেখে, তাই বলে। তাতে আবার দোষ আছে নাকি? এই তো বাড়ির সকল ছেলেতে বলছে, দোষ হল আমার ছেলের?

কমলেশ হাসিতে হাসিতেই বলিল, অন্য ছেলের বলা আর তোর ছেলের বলায় তফাত আছে গৌরী। কেমন বাপের বেটা! ওর বাপ হল স্বদেশপ্রাণ, মহাপ্রাণ, ব্যক্তি। তোর ছেলেও দেখবি, ঠিক তাই হবে। এও একটা গ্রেটম্যান-ট্রেটম্যান কিছু হবে আর কি। দেখিস নি, ছেলের গোঁ কেমন?

গৌরীর আঁচল ধরিয়া নাচিতে নাচিতে ছেলেটা তখনও চিৎকার করিতেছিল, বণ্ডে মাটরম্। গৌরী সজোরে তাহার পিঠে একটা চড় কষাইয়া দিয়া বলিল, কাপড় ধরে টানছিস, কাপড় ছিঁড়ে যাবে যে! হতভাগা ছেলে মলে যে খালাস পাই।

কমলেশ অপ্রস্তুত হইয়া এক রকম পলাইয়া গেল। ছেলের কান্নার শব্দ পাইয়া ও-ঘর থেকে গৌরীর দিদিমা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া গৌরীকে তিরস্কার করিয়া উঠিলেন, এই হারামজাদী নাতি, ছেলে মারছিস কেন, শুনি? কেন তুই ছেলেটাকে এমন যখন-তখন মারিস? হারামজাদী পাজি মেয়ে কোথাকার! মা-গিরি ফলানো হচ্ছে, না কি?

প্রথম প্রথম গৌরী শঙ্কিত হইয়া ক্ষান্ত হইত। তাহাকে তিরস্কারের অন্তরালে তাহার সন্তানের প্রতি দিদিমার স্নেহ অনুভব করিয়া সান্ত্বনা পাইত, শান্ত হইত। কিন্তু

আজকাল আর সে শঙ্কিতও হয় না, সান্ত্বনা পায় না, বরং সে আরও উগ্র হইয়া সমানে ঝগড়া শুরু করিয়া দেয়। আজও সে উগ্রভাবে বলিয়া উঠিল, বেশ করব মারব, আমাকে জ্বালাচ্ছে, আমি মারছি, শাসন করছি। আদর দিয়ে ছেলের মাথা খাওয়ার মত অবস্থা তো আমার নয়। ছেলেকে আমাকে মানুষ করতে হবে।

ঝগড়া এমন ক্ষেত্রে প্রায়ই প্রচণ্ড হইয়া উঠে, শেষ পর্যন্ত গৌরীর দুরন্ত অভিমান ভাঙাইতে আসিতে হয় রামকিঙ্করবাবুকে। তাঁহার কথায় গৌরী আজও সান্ত্বনা পায়, শান্ত হয়। রামকিঙ্করবাবু ঘটা করিয়া সেদিন মেয়েদের থিয়েটারে পাঠাইয়া দেন, কিংবা আপিসের ফেরত কতকগুলো ভাল কাপড়-চোপড়, কোনদিন বা একখানা গহনা আনিয়া গৌরীকে দেন। সেদিন সমস্ত রাত্রি গৌরীর বিনিদ্র শয়নে কাটিয়া যায়, নানা ভাবে ঘুরিয়া ফিরিয়া একটি কল্পনাই তাহার মনোলোকে ভাসিয়া উঠে, সে কল্পনা করে—আপনার মৃত্যুশয্যার, সে যেন মৃত্যুশয্যার শায়িতা, আর তাহার শয্যায় বসিয়া আছে সে। তাহার বুক ভাঁসাইয়া চোখের জল ঝরিয়া পড়িতেছে, বলিতেছে, আমাকে ক্ষমা কর। কখনও সে ভাবে, সে তাহাকে হাসিমুখে ক্ষমা করিল; কখনও ভাবে, সে বিরক্তিভরে পাশ ফিরিয়া শুইল, তাহার আগমন-সংবাদ শুনিবামাত্র সে বলিল, না না না, তাহাকে আমি দেখিব না, দেখিতে চাই না। কল্পনার সঙ্গে সঙ্গে দারুণ উত্তেজনায় সে বিছানার মধ্যে রোগগ্রস্তার মত চঞ্চল অস্থির হইয়া উঠে, তাহার নড়া-চড়ায় ছেলেটি জাগিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করে। গৌরী দুর্দান্ত ক্রোধে আবার ছেলেকে পিটিয়া চিৎকার করিয়া হাট বাধাইয়া বসে, কোন দিন বা ব্যাকুল স্নেহে ছেলেকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া, অঝোরে কাঁদিতে আরম্ভ করে।

আজিকার কলহও ঠিক সেই খাতের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া সেই অবশ্যম্ভাবী পরিণতির দিকেই চলিয়াছিল, কিন্তু আকস্মিক একটা বিপরীতমুখী জলোচ্ছ্বাস আসিয়া সে স্রোতোবেগের গতি রুদ্ধ করিয়া দিল। গৌরীর দিদিমা গৌরীর কথার একটা উত্তর দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, সে মুহূর্তটিতেই গৌরীর এগারো-বারো বৎসরের মামাতো ভাই ছুটিয়া আসিয়া বলিল, ঠাকুমা, গৌরীদিদির বরকে পুলিসে ধরে নিয়ে গেছে।

তড়িতাহতের মত মুহূর্তে গৌরী যেন পঙ্গু মূক হইয়া গেল। কয়েক মিনিটের জন্য গৌরীর দিদিমার মুখেও কথা ফুটিল না। কয়েক মিনিট পরে তিনি সরবে কাঁদিয়া উঠিলেন, এ কি হল আমার, মাগো! এ আমি কি করেছি গো!

ছেলেটি বলিল, তার আর কাঁদলে কি হবে? যেমন কর্ম তেমনই ফল, গভর্মেণ্টের সঙ্গে চালাকি!

রাখাল সিংহ সংবাদটা লইয়া ছুটিয়া আসিয়াছিলেন। শিবনাথের উপর

অভিমান করিয়া তিনি সেই দিনই বাড়ি চলিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু একটা দিনও বাড়িতে থাকিতে পারেন নাই। তৃতীয় দিনের দিন স্থির করিলেন, বউমাকে লইয়া আসিবেন। সেই দিনই রওনা হইয়া কলিকাতায় আসিয়া রামকিঙ্করবাবুর নিকট—যাহাকে বলে 'গড়াইয়া পড়া'—সেই গড়াইয়াই পড়িলেন। রামকিঙ্করবাবুর পা দুইটি জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, রক্ষে করুন বাবু, বউমাকে পাঠিয়ে দেন, নইলে সর্বনাশ হল।

রামকিঙ্করবাবু চমকিয়া উঠিলেন, তিনি ভাবিলেন, শিবনাথের বোধ হয় অসুখ-বিসুখ কিছু করিয়াছে, তিনি সভয়ে প্রশ্ন করিলেন, কি হয়েছে রাখাল সিং? শিবনাথ—

সর্বনাশ হয়েছে বাবু, শিবনাথবাবুকে পুলিসে ধরেছে।

পুলিসে?

হ্যাঁ বাবু। ধরেছিল, একবার ছেড়ে দিয়েছে, কিন্তু আর ছাড়বে না। আর বাবুও কিছুতে কারও মানা শুনবেন না। সে যেন একবারে ধনুক্‌ভাঙা পণ।

রামকিঙ্কর বুঝিয়াও বুঝিতে চাহিতেছিলেন না। বিশ্বাস করিতে মন পীড়িত হইতেছিল। তাই তিনি প্রশ্ন করিলেন, ফৌজদারি কার সঙ্গে?

আজ্ঞে না, ফৌজদারি নয়, স্বদেশী হাঙ্গামা।

হুঁ। দীর্ঘ সুরে 'হুঁ' বলিবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন।

বউমাকে পাঠিয়ে দেন বাবু, তিনি গিয়ে পড়লে হয়তো ক্ষান্ত হবেন। তিনি বললে, তিনি কাঁদলে, বাবু কখনই স্থির থাকতে পারবেন না।

আপনার কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনায়, এই তরলমস্তিষ্ক অবাধ্য জামাতাটির প্রতি ক্রোধে রামকিঙ্করবাবুর সমস্ত অন্তর তিক্ততায় ভরিয়া উঠিল। ইচ্ছা হইল, একবার তাহার সহিত মুখামুখি দাঁড়াইতে, অগ্নিবর্ষী আরক্ত চোখের দৃষ্টি হানিয়া তাহাকে মাটির সঙ্গে মিশাইয়া দিতে। অকস্মাৎ তাঁহার মনে পড়িয়া গেল আর একদিনের কথা। হ্যারিসন রোডের ফুটপাথের উপর তিনি এমনই দৃষ্টিই হানিয়াছিলেন শিবনাথের উপর, কিন্তু তরুণ কিশোর ছেলেটি অনায়াসে সে দৃষ্টিকে তুচ্ছ বস্তুর মত উপেক্ষা করিয়া তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া গিয়াছিল। ক্রোধ তাঁহার বাড়িয়া উঠিল, রাখাল সিংকেও তিনি যেন আর সহ্য করিতে পারিতেছিলেন না। ঠিক এই সময়টিতেই উপরে তাঁহার মা—গৌরীর দিদিমা কাঁদিয়া উঠিলেন। কান্না শুনিয়া তিনি দ্রুতপদে উপরে উঠিয়া গেলেন, তাঁহাকে দেখিবামাত্র গৌরীর দিদিমা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়া উঠিলেন, নাতিকে আমার জলে ভাসিয়ে দিলি বাবা! তার কপালে কি শেষে এই ছিল বাবা!

রামকিঙ্করবাবু একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, কই, নাতি কই?

রামকিঙ্করবাবুর ভাইপো, সেই সংবাদদাতা ছেলেটি বলিল, ছাদে উঠে গেল এখুনি।

গৌরীর জীবনে এমন একটা অবস্থা কখনও আসে নাই। এক দিক দিয়া তাহার প্রচণ্ড অভিমান আহত হইল এই ভাবিয়া যে, শিবনাথ তাহাকে উপেক্ষা করিয়া, তাহার সহিত সম্বন্ধ একেবারে শেষ করিয়া দিবার জন্যই, এমন করিয়া অন্ধকূপের মধ্যে পচিয়া, বোধ করি, নিজেকে নিঃশেষে শেষ করিতে চলিয়া গেল। আর এক দিক দিয়া হইল তাহার প্রচণ্ড লজ্জা। এই পরিবারের সংস্কৃতি ও রুচির সংস্পর্শে গঠিত মনের বিচারবুদ্ধিতে জেলে যাওয়ার মত লজ্জা যে আর হয় না! একেই তো জীবনে তাহার লজ্জার অবধি নাই। যখন তাহার ভাই এবং ভগ্নীপতির দল হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জনের পথে সগৌরবে সদম্ভে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে, তখন তাহার স্বামী কোন্ অখ্যাত নিবিড় পল্লীর মধ্যে চাষীর মত চাষ করিতেছে! এই সুসজ্জিতা মহানগরীর রাজপথে মহার্ঘ পরিচ্ছদ পরিয়া যে মানুষের দল শোভাযাত্রা করিয়া চলিয়াছে, তাহাদের তুলনায় হতশ্রী পল্লীর মধ্যে রৌদ্রদগ্ধমুখ তাহার স্বামীকে কল্পনা করিয়া লজ্জায় তাহার মাথা হেঁট হইয়া পড়ে। সে লজ্জার উপরে এই লজ্জার বোঝা সে সহিবে কেমন করিয়া?

সম্মুখেই রাজপথের উপর জনস্রোত চলিয়াছে। সহসা তাহার কাছে সেসব যেন অর্থহীন বলিয়া মনে হইল, পার্কের গাছপালা, চারিপাশের বাড়িঘর সব যেন আজ নিরর্থক হইয়া গেল। এমন কি, আকাশ হইতে মাটি পর্যন্ত দৃশ্যমান প্রকৃতিরও কোন আবেদন তাহার মনের দুয়ারে আসিতেছে না। কিছুক্ষণ পর সহসা একটা গানের সুর তাহার কানে আসিয়া পৌঁছিল, কোন্ দূর-দূরান্তরের ডাকের মত। ধীরে ধীরে দৃষ্টি শব্দধ্বনি অনুসরণ করিয়া ফিরিল; গৌরী দেখিল, একদল স্বেচ্ছাসেবক শোভাযাত্রা করিয়া আসিতেছে, তাহারাই গান গাহিতেছে। ধীর পদক্ষেপে সারি সারি তাহারা অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। এদিকে রাস্তার মোড়ের উপর একদল পুলিস আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

আবার অদ্ভুত একটা অনুভূতি গৌরী এই মুহূর্তে অনুভব করিল। কেমন করিয়া জানি না, তাহার দৃষ্টি এতদিন যাহা দেখিয়াছে, সহসা তাহার বিপরীত দেখিল। আজ আর সে এই স্বেচ্ছাসেবকগুলির মুখে উচ্ছৃঙ্খলতার ছাপ দেখিতে পাইল না, দস্যুর মত কঠোর নিষ্ঠুরতা দেখিতে পাইল না; সে যেন স্পষ্ট দেখিল, বীর্যে সাহসে মহিমায় দেবতাদলের মতই ইহারা মহিমান্বিত। কোটি কোটি নরনারীর বিস্ময়বিমুগ্ধ শ্রদ্ধান্বিত দৃষ্টি তাহাদের আরতি করিয়া ফিরিতেছে।

তাহার মামাতো ভাই আসিয়া তাহার এই অভিনব বিচিত্র অনুভূতির ধ্যান ভাঙিয়া দিল, বলিল, জ্যাঠামশায় ডাকছে তোমাকে গৌরীদি।

গৌরী সচেতন হইয়া অনুভব করিল, তাহার অন্তর যেন কত লঘু হইয়া গিয়াছে, এক বিন্দু লজ্জার প্রভাবও আর নাই। সে মাথা উঁচু করিয়াই হাসিমুখে নীচে নামিয়া আসিল। রামকিঙ্করবাবু চিন্তাকুল মুখেই মায়ের সঙ্গে পরামর্শ করিতেছিলেন, গৌরী আসিয়া কাছে দাঁড়াইয়া অকুণ্ঠিত অথচ কন্যাসুলভ লজ্জার সহিতই বলিল, বড়মামা, আমি বন্দর শ্যামপুর যাব।

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া সবিস্ময়ে রামকিঙ্করবাবু বলিলেন, শ্যামপুর!

হ্যাঁ।

রামকিঙ্করবাবু বলিলেন, তাই যাও। কমলেশ সঙ্গে যাক তোমার, তুমি শিবনাথকে রাজী করিও, কমলেশ ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে ধরে সব ঠিক করে দেবে। কিছু ভেবো না তুমি।

ট্রেনে উঠিয়া গৌরী যেন বাঁচিয়া গেল। ইণ্টার-ক্লাস ফিমেল কম্পার্টমেণ্টে সে খোকাকে লইয়া একা। কমলেশ আপত্তি করিল, কিন্তু গৌরী বলিল, না, এতেই আমি ভাল যাব। বেটাছেলেদের সঙ্গে সমস্ত রাস্তা ঘোমটা দিয়ে প্রাণ আমার হাঁপিয়ে উঠবে।

নির্জন কামরাটার ভিতর সে যেন পরম সান্ত্বনা অনুভব করিল। এমনই একটি নির্জনতার মধ্যে আপনাকে অধিষ্ঠিত করার যেন তাহার প্রয়োজন ছিল। অকস্মাৎ সমস্ত সংসারের রঙ বদলাইয়া গিয়াছে। দৃশ্যমান প্রকৃতির খণ্ডাংশ হইতে আপনার অদৃশ্য মর্মলোক পর্যন্ত সমস্ত কিছু আজ যেন নূতন কথা কহিতেছে। হু-হু করিয়া ট্রেন ছুটিয়া চলিয়াছে, জানালার বাহিরে দিগন্তপ্রসারী সবুজ শস্যসমৃদ্ধ মাঠ পিছনের দিকে ছুটিয়াছে। এই মাঠ তাহার বরাবরই বড় ভাল লাগে, কিন্তু আজিকার ভাল লাগার আস্বাদনের অর্থ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। সবুজ শস্যের গাছগুলির মধ্যে সে আজ জীবনকে যেন স্পষ্ট অনুভব করিল। উহাদেরও জীবন আছে, হেলিয়া দুলিয়া উহারাও যেন কথা কয়। আবার এই শস্যসম্ভারের অন্তরালে আছে মাটি। মাটিও আজ তাহার কাছে নূতন রূপে ধরা দিল। সে মাটি ধুলা নয়, কাদা নয়, যাহাকে মানুষ ঝাড়িয়া ফেলে, ধুইয়া দেয়। যে মাটির বুকে ফসল ফলিয়া উঠে, যে মাটির বুকে প্রাণফাটা দুঃখে পড়িয়া পড়িয়া কাঁদিতে ভাল লাগে, এ মাটি সেই মাটি। যে মাটির বুকে মানুষ ঘর গড়িয়া তুলিয়াছে, এ মাটি সেই মাটি। সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে পড়িয়া গেল আপনার ঘর। কমলেশের ঘর নয়, শিবনাথের ঘর। সে ঘরের প্রতি প্রগাঢ় মমতা সে আজ অনুভব করিল। কেমন করিয়া এমন হইল, সে ভাবিবার তাহার অবসর ছিল না, ব্যগ্রতা ছিল না, এই হওয়াটাই সে যেন কতদিন হইতে চাহিয়াছে, এই সংঘটন না ঘটাতেই, এই পাওয়া না

পাওয়াতেই সে অস্থিরতায় অশান্তিতে জ্বলিয়াছে। ঘর ছাড়িয়া বাহিরে ঘুরিয়া মরিয়াছে, আপন ছাড়িয়া পরের আশ্রয়ে আপনাকে অপমানিত করিয়াছে। গাড়ির গতির চেয়েও বহুগুণ দ্রুততর গতিতে মন তাহার ছুটিয়া চলিয়াছিল, শিবনাথকে সে সর্বাগ্রে প্রণাম করিবে। ক্ষমা চাহিবার প্রয়োজনও তাহার মনে হইল না। প্রণামের পরই সে তাহার কণ্ঠলীনা হইয়া বুকে মুখ লুকাইবে। খোকাকে তাহার কোলে তুলিয়া দিবে। ঘুমন্ত খোকাকে তুলিয়া লইয়া সে বুকে জড়াইয়া মরিল। খোকা জাগিয়া উঠিল।

গভীর ধ্যানমগ্নার মতই সে গাড়ি হইতে নামিয়া গাড়ি বদল করিল।

প্রায় সন্ধ্যার মুখে গাড়ি আসিয়া দাঁড়াইল বন্দর শ্যামপুরে। কমলেশ তাড়াতাড়ি গৌরীকে নামাইয়া জিনিসপত্র প্ল্যাটফর্মের উপর নামাইয়া ফেলিল। জিনিসপত্র নামানো শেষ করিয়া সে চরিদিকে চাহিয়া বিস্মিত না হইয়া পারিল না, একদল কিশোর ইহারই মধ্যে গৌরীকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে, তাহারা প্রত্যেকে গৌরীর পায়ের ধুলা লইয়া প্রণাম করিতেছে। স্টেশনের বাহির হইতেও কয়েকজন ছুটিয়া আসিতেছে। একজনকে কমলেশ চিনিল, সে শ্যামু। সে ভিড় ঠেলিয়া গৌরীর দিকে অগ্রসর হইল।

কমলেশ বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, এ কি, ব্যাপার কি ?

শ্যামু অহঙ্কৃত কণ্ঠেই উত্তর দিল, কাল শিবনাথদা গ্রেপ্তার হয়েছেন। আমরা এবার পাঁচজন তৈরি হয়েছি গ্রেপ্তার হবার জন্যে।

কমলেশ শঙ্কিত হইয়া ব্যস্তভাবে গৌরীর হাত ধরিয়া বলিল, গৌরী, আয় আয়, বাইরে আয়। ভিড় ছাড় তোমরা, ভিড় ছাড়।

মৃদুস্বরে গৌরী উত্তর দিল, হাত ছাড়, আমি যাচ্ছি।

কমলেশ বলিল, সিং মশায়, জিনিসপত্র আমাদের বাড়িতেই পাঠিয়ে দিন তা হলে।

গৌরী বলিল, না। এ বাড়িতেই যাব আমি।

চৌত্রিশ

একটি শোকাতুর মৌনতার মধ্যে আপন ঘরে গৌরীর আবাহন হইল। নিত্য ও রতন গৌরীকে দেখিয়া কাঁদিল, কিন্তু নীরবে কাঁদিল। পাছে গৌরী দুঃখ পায়, লজ্জা পায়, তাই তাহারা চোখের জল আসিতে আসিতে আঁচল দিয়া মুছিয়া ফেলিতে চাহিল। কেষ্ট সিং তাড়াতাড়ি খোকাকে বুকে তুলিয়া লইয়া চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে বাহিরে চলিয়া গেল। রাখাল সিং গম্ভীরভাবে বলিলেন, এই দেখ নিত্য, আপনাকেও বলছি রতন-ঠাকরুন, ওসব চোখের জল-টল ফেলো না বাপু। অকল্যেণ কোরো না কেউ। কালই বাবুকে নিয়ে আসছি ফিরিয়ে।—বলিয়া ব্যস্তভাবে বাহিরে চলিয়া গেলেন। কমলেশের সহিত পরামর্শ করিয়া একটা উপায় স্থির করিতে হইবে। মরিবার মত অবসরও তাঁহার নাই।

নিত্য বলিল, বউদিদি, আপনি ওপরে গিয়ে বসুন। এখুনি পাড়ার যত মেয়েতে দল বেঁধে মজা দেখতে আসবে।

রতন বলিল, হ্যাঁ, সেই কথাই ভাল। কারও ঘরে কিছু একটা ভাল-মন্দ হলে হয়, সব আসবে, যেন ঠাকুর উঠেছে ঘরে। তুমি ওপরে যাও, আমরা বলব বরং, বউয়ের মাথা ধরেছে, সে শুয়েছে।

গৌরী কথাটা মানিয়া লইল। উপরে গিয়াই সে বসিল। নিত্য বলিল, আপনার ঘরই খুলে দিই বউদিদি। ঝাড়া-মোছাই সব আছে, একবার বরং ঝাঁট দিয়ে দিই, বিছানাটার চাদরও পালটে দিই। শুতেও তো হবে আপনাকে!

এতক্ষণে গৌরী কথা বলিল। কহিল, না নিত্য, এই দরদালানেই বিছানা কর। তুমি, রতন-ঠাকুরঝি, আমি—সব একসঙ্গেই শোব।

নিত্যর চোখে জল আসিল, তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া বলিল, সেই আপনি যেদিন গেলেন বউদিদি, সেই দিন শুধু দাদাবাবু এ ঘরে শুয়ে ছিলেন, তারপর আজ এই আড়াই বছর তিন বছর এ ঘরে কেউ শোয় নাই। তার পরের দিনই তো দাদাবাবু চলে গেলেন বেলগাঁয়ে।

গৌরী এ কথার কোনও উত্তর দিল না, নীরবে সে খোলা জানালা দিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল। এখানে যাত্রা করিবার অব্যবহিত পূর্বে আকস্মিক যে আলোক আসিয়া তাহার জীবনকে গ্লানিহীন শুভ্রতায় উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিল, তাহার উপর একখানি মেঘের বিষণ্ণ ছায়া যেন আসিয়া পড়িতেছে। শিবনাথের উপর অভিমান

পূর্বেকার অভিমান হইতে স্বতন্ত্র। ইহার মধ্যে ক্রোধ নাই, আক্রোশ নাই, বরং একটা আত্ম-অপরাধবোধ আছে। কিন্তু শত অপরাধ সে করিলেও যাইবার পূর্বে একবার দেখা করাও কি তাহার উচিত ছিল না, অন্তত একখানি পত্র লিখিলেও কি ক্ষতি ছিল!

নিত্য গৌরীর মনের কথা অনুমান করিয়া অনুশোচনা না করিয়া পারিল না, কথাটা বলা তাহার উচিত হয় নাই। কথাটা চাপা দিবার জন্য সে অকস্মাৎ ব্যস্ত হইয়া বলিল, আ আমার মনের মাথা খাই, আপনার জন্যে চা করে নিয়ে আসি। ভুলেই গিয়েছি সে কথা।

গৌরী বলিল, এ আড়াই বছরের মধ্যে তিনি কি একেবারেই আসেন নি নিত্য?

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া নিত্য বলিল, এক দিনের জন্যে না বউদিদি। ঘর-সংসার, বিষয়-সম্পত্তি একদিন চেয়েও দেখেন নাই। যা করেছেন সিং মশায়। বলব কি বউদিদি, একটা পয়সাও নাকি তিনি এস্টেট থেকে নেন নাই।

সেখানে রান্নাবান্না কে করত?

এই একজন ঠাকুর ছিল,—সেই বামুন, সেই চাকর, সেই সব। কাপড় কাচতেন নিজে, ঘর ঝাঁট দিতেন নিজে, জুতো তো পরতেনই না, তা কালি বুরুশ। তার ওপর—। বলিতে বলিতে আবার তাহার মনে হইল, এ কি করিতেছে সে! নিজেকে গঞ্জনা দিয়াই সে নীরব হইল। তারপর আবার বলিল, সে-সব রাত্রে শুয়ে শুয়ে বলব বউদিদি, এখন আপনার জন্যে চা আনি।

সমস্ত রাত্রিটাই প্রায় জাগিয়া কাটিয়া গেল। নিত্য ও রতন এই দীর্ঘ আড়াই বৎসরের কথা বলিয়া গেল, গৌরী শুনিল। নিত্য যে কথা বলিতে ভুলিল, সেটি রতন বলিয়া দিল; আবার রতন বলিতে বলিতে যে কথা বিস্মৃত হইল, সে কথা স্মরণ করাইয়া দিল নিত্য। বলিতে বলিতে রতন আপনাকে সম্বরণ করিতে পারিল না, আবেগভরে সে বলিয়া উঠিল, রাগ কোরো না ভাই বউ, তোমাতে আর মাসীমাতেই শিবনাথকে এত দুঃখ দিলে। তোমরা রাগ করে যদি দুজনে দুদিকে চলে না যেতে, তবে শিবু এমন হত না।

নিত্যও আর থাকিতে পারিল না, সেও এবার বলিল, পিসীমা গিয়েছিলেন অনেকদিন, তুমি যদি থাকতে বউদিদি, তবে দাদাবাবুর সাধ্যি কি যে, এমন সন্ন্যেসী হয়ে বেড়ায়, যা খুশি তাই করে!

গৌরী রাগ করিল না, ক্ষুণ্ণ হইল না, ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, দোষ আমার স্বীকার করছি রতন-ঠাকুরঝি। কিন্তু কই, বেশ ভেবে বল দেখি, আমি থাকলেই কি তোমাদের ভাই এসব করত না?

রতন কথাটা একেবারে অস্বীকার করিতে পারিল না, কিন্তু তবু বলিল, করত, কিন্তু এতটা করতে পারত না।

গৌরী হাসিয়া বলিল, যারা করে ঠাকুরঝি, তারা মাপ করে বিচার করে করে না। কলকাতায় যদি দেখতে, তবে বুঝতে; অহরহ এই কাণ্ড চলছে। সি. আর. দাশ—চিত্তরঞ্জন দাশ, বছরে লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার করতেন, তিনি সব ছেড়ে-ছুড়ে জেলে গেলেন। তাঁর স্ত্রী বাসন্তী দেবী—তিনিও গেলেন জেলে—তাঁর ছেলে—তিনিও গেলেন জেলে। গান্ধী—তিনি জেলে গিয়েছেন। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া গৌরী আবার বলিল, জান ঠাকুরঝি, দেশে আবার এমন লোকও আছে, যারা এই সব লোকের নিন্দে করে! বলে, দেশের সর্বনাশ করছে! ভলেন্টিয়ারদের বলে, খেতে পায় না, তাই জেলে যাচ্ছে পেট ভরে খেতে। তোমার ভাই কি খাবারের অভাবে জেলে গেল ভাই?

রতন সবিস্ময়ে বলিল, তাই বলে লোকে?

নিত্য অহঙ্কার করিয়া বলিল, এখানে কিন্তু তা কেউ বলে না বউদিদি। দাদাবাবুর নাম আজ ঘরে ঘরে, লোকের মুখে মুখে।

অকস্মাৎ যেন নদীর বাঁধ ভাঙিয়া গেল, গৌরীর দুই চোখ বাহিয়া জল ঝরিতে আরম্ভ করিল, সে আর আপনাকে সম্বরণ করিতে পারিল না। খোকাকে কাছে টানিয়া লইয়া নীরবে সে কাঁদিতে লাগিল।

অন্ধকারের মধ্যে নিত্য ও রতন আপন মনেই বকিয়া চলিয়াছিল, এক সময় তাদের খেয়াল হইল, গৌরীর সাড়াশব্দ আর পাওয়া যায় না। রতন মৃদুস্বরে ডাকিল, বউ!

কোন উত্তর আসিল না।

নিত্য বলিল, ঘুম এসেছে, আর চুপ কর রতনদিদি।

তাহারাও পাশ ফিরিয়া শুইল।

ভোরের দিকে গৌরী ঘুমাইয়াছিল। সকাল হইয়া গেলেও সে ঘুম তাহার ভাঙে নাই। কলিকাতাতেও তাহার সকালে উঠা অভ্যাস ছিল না, তাহার উপর প্রায় সারারাত্রি জাগরণের পর ঘুম। নিত্য তাহাকে ডাকিয়া বলিল, আপনার দাদা ডাকছেন বউদিদি।

গৌরী নীচে আসিয়া দেখিল, একা কমলেশ নয়, কমলেশের সঙ্গে এ বাড়ির সকল হিতৈষী আপনার জনই আসিয়াছেন। রাখাল সিং, কেষ্ট সিং, এ বাড়ির ভাগিনেয়-গোষ্ঠীর কয়েকজন, এমন কি রামরতনবাবু মাস্টারও আসিয়াছেন। গৌরী মাথার ঘোমটা খানিকটা বাড়াইয়া দিয়া একপাশে দাঁড়াইল।

কমলেশ বলিল, দশটার সময় আমাদের বেরুতে হবে গৌরী, তাড়াতাড়ি স্নান করে খেয়ে নাও।

গৌরী ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। কমলেশ বলিল, খালাস শিবনাথ এখুনি হয়ে যাবে। কিন্তু খালাস নেওয়াটা হল তার হাত। তোমাকে যেমন করে হোক সেইটি করতে হবে, তাকে রাজী করাতে হবে।

রামরতনবাবু বলিলেন, ইম্‌পসিব্‌ল, শিবনাথ কাণ্ট ডু ইট, তার মন অন্য ধাতুতে গড়া।

রাখাল সিং অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, দেখুন মাস্টার মশায়, আপনি হলেন এই সবের মূল। কিন্তু আর আপনি বাধা-বিঘ্ন দেবেন না বলছি, আপনার সঙ্গে আমার ভাল হবে না।

এ বাড়ির ভাগিনেয়-গোষ্ঠীর একজন, সম্পর্কে তিনি শিবনাথের দাদা, বলিলেন, না, না, সে করতে গেলে চলবে কেন শিবনাথের? এ আপনি অন্যায় বলছেন মাস্টার মশায়। ওই বালিকা বউ, শিশু ছেলে, বিষয়-সম্পত্তি—এ ভাসিয়ে দিয়ে 'যাব' বললেই যাওয়া হয়? আপনিও বরং যান, আপনার কথা যখন সে শোনে, আপনিও তাকে বুঝিয়ে বলুন।

মাস্টার দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, সে আমি পারি না, পারব না। তাতে শিবনাথ খালাস পাবে বটে, কিন্তু সে কত ছোট হয়ে যাবে, জানেন?

কমলেশ এবার তিক্তস্বরে বলিল, বেশ মশায়, আপনাকে যেতেও হবে না, বলতেও হবে না। আপনি দয়া করে আর বাধা দেবেন না, পাক মারবেন না। হুঃ, জেল খাটলেই বড় হয়, আর না খাটলেই মানসম্মান ধুলোয় লুটোয়! অদ্ভুত যুক্তি! লুডিক্রাস! আপনি বাইরে যান দেখি।

গৌরীর মন—তাহার নূতন মন কমলেশের কথায় সায় দিল না! কিন্তু সে তাহার প্রতিবাদও করিতে পারিল না। এতগুলি লোকের সম্মুখে শিবনাথ-সম্পর্কিত কথায় অভিমত প্রকাশ করিতে বধূ-জীবনের লজ্জা তাহাকে আড়ষ্ট করিয়া দিল। কিন্তু তাহার মন বার বার বলিতেছিল, তাঁহাকে হেয় হইতে, ছোট হইতে বলিতে সে পারিবে না—পারিবে না। আর তাঁহাকে ছোট হইতে অনুরোধ করিতে গিয়া তাঁহার কাছে সে নিজেও হেয় হইতে পারিবে না।

রামরতনবাবু কমলেশের কথায় বলিলেন, অল রাইট, চললাম আমি। —বলিয়া বাড়ি হইতে বাহির হইবার জন্য অগ্রসর হইলেন। কিন্তু দরজার সম্মুখে গিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইয়া বিস্ময়ে আনন্দে অভিভূতের মত উচ্ছ্বসিত স্বরে বলিয়া উঠিলেন, পিসীমা!

মুহূর্তে সমস্ত লোকগুলির দৃষ্টি দরজার দিকে নিবদ্ধ হইল, পর-মুহূর্তেই বাড়িতে প্রবেশ করিলেন শৈলজা-ঠাকুরানী। কিন্তু কত পরিবর্তন হইয়াছে তাঁহার! তপস্বিনীর মতই শীর্ণ দেহ, তপস্যার দীপ্তির মতই তাঁহার দেহবর্ণ ঈষৎ উজ্জ্বল, মুখে তাহারই উপযুক্ত কঠোর দৃঢ়তা, মাথার চুলগুলি ছোট করিয়া ছাঁটা, তাঁহাকে দেখিয়া বিস্ময়ে সম্ভ্রমে সকলে যেন নির্বাক হইয়া গেল।

তিনিই প্রথম প্রশ্ন করিলেন, শিবুকে আমার ধরে নিয়ে গেছে?

এবার হাউহাউ করিয়া রাখাল সিং কাঁদিয়া উঠিলেন। কেষ্ট সিংও কাঁদিতে আরম্ভ করিল। মাস্টার আপন মনেই বলিলেন, ইডিয়ট্‌স!

শৈলজা দেবী বলিলেন, কেঁদো না বাবা রাখাল সিং, কাঁদছ কেন?

রাখাল সিং বলিলেন, আমাকে রেহাই দেন মা, এ ভার আমি বইতে পারছি না।

অদ্ভুত হাসি হাসিয়া শৈলজা দেবী বলিলেন, যে ভার যার বইবার, সে যে তাকেই বইতে হবে বাবা। রেহাই নোব বললেই কি মানুষ রেহাই পায়, না, রেহাই দেবার মানুষই মালিক! নাও, তোমার চাবি নাও। রামজীদাদাকে দিয়েছিল শিবু, তিনি দিয়ে গেলেন আমাকে।

ভাগিনেয়-বাড়ির একজন বলিলেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, তিনি যে আজ চার দিন হল এখন থেকে চলে গেছেন। পুরোহিতকে সব বুঝিয়ে-সুঝিয়ে দিয়ে তীর্থে যাচ্ছি বলে গেছেন বটে।

নিত্য এবার আসন পাতিয়া দিয়া বলিল, বসুন পিসীমা।

বসিয়া পিসীমা বলিলেন, তিনিই আমাকে খবর দিয়ে বললেন, তুমি যাও ভাই-দিদি, আমার কথা তো শিবু শুনলে না। শুনে আর থাকতে পারলাম না, ছুটে আসতে হল।

রামরতনবাবু বলিলেন, তাঁরই সঙ্গে এলেন বুঝি?

না। তিনি আমায় চাবি দিয়ে কেদারমঠে চলে গেলেন। বললেন, মৃগশিশু পালন করে মমতায় কেঁদে মরছি, চোখ যাবার আগে আমি গুরুর কাছে চললাম। আর আমার অদৃষ্ট দেখ বাবা, ভগবানের কাছে গিয়েও আমি থাকতে পারলাম না শিবুকে দেখবার জন্যে বুক যেন তোলপাড় করে উঠল, আমি ছুটে চলে এলাম। শিবুকে আমার কবে ধরে নিয়ে গেল?

রাখাল সিং বলিলেন, সোমবার সন্ধ্যেবেলায়। কিন্তু কোনও ভাবনা নাই, চলুন, আজই যাব সদরে, খালাস করে নিয়ে আসব।

সবিস্ময়ে শৈলজা-ঠাকুরানী বলিলেন, খালাস!

হ্যাঁ। কমলেশবাবু ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে বলে রাজী করাবেন। আপনি চলুন, বউমা চলুন, আপনারা বাবুকে ধরে রাজী করান, একটা এগ্রিমেণ্টো লিখে দিলেই খালাস হয়ে যাবে।

বউমা এসেছেন?

নিত্য বলিল, কাল এসেছেন। লোকজনের ভিড়ে তিনি আসতে পারছেন না।

শৈলজা দেবী নিত্যর কথার উত্তর না দিয়া রাখাল সিংকে বলিলেন, তোমরা বউমাকে নিয়েই যাও বাবা, এগ্রিমেণ্ট লিখে দিয়ে আমি তাকে খালাস হতে বলতে পারব না।

রামরতনবাবু উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, ছাট'স লাইক পিসীমা।

শৈলজা দেবী বলিয়াই গেলেন, আমার বাবা বলতেন, আমার দাদা বলতেন, 'না খাব উচ্ছিষ্ট ভাত, না দিব চরণে হাত'। আমি তো ঘাট মানতে বলতে পারব না বাবা। যদি সে অন্যায় করত, কথা ছিল। কিন্তু এ তো অন্যায় নয়। আজ চার বছর কাশীতে থেকে আমি দেখলাম, কাঁচা বয়েসের ছেলে—কচি কচি মুখ—হাসিমুখে জেলে গেল, দ্বীপান্তরে গেল, ফাঁসি গেল। আজ ছ মাস ধরে দলে দলে ছেলে যুবা বুড়ো জেলে চলেছে দেশের জন্যে। আগে শিবু 'দেশ দেশ' করত, বুঝতাম না; কিন্তু কাশীতে থেকে বুঝে এলাম, এ কত বড় মহৎ কাজ। এর জন্য ঘাট মানতে তো আমি বলতে পারব না বাবা।

গৌরী আর থাকিতে পারিল না, সে আসিয়া শৈলজা দেবীর পায়ে প্রণাম করিয়া উঠিয়া মৃদুস্বরে বলিল, আমিও পারব না পিসীমা, আপনি ওঁদের বারণ করুন।

নিত্য বলিল, আপনারা সব বাইরে যান কেনে গো! শাশুড়ী-বউকে একটু দুঃখের কথা কইতে অবসর দেবেন না আপনারা?

সর্বাগ্রে উঠিল কমলেশ, সে গম্ভীর মুখে বাড়ি হইতে বাহির হইয়া গেল।

বধূর দিকে চাহিয়া শৈলজা দেবী কঠিন স্বরেই বলিলেন, আসতে পারলে মা?

গৌরী চুপ করিয়া অপরাধিনীর মত দাঁড়াইয়া রহিল, চোখ তাহার জলে ভরিয়া উঠিয়াছে। রতন শঙ্কিত হইয়া উঠিল, নিত্য একরূপ ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

শৈলজা দেবী আবার বলিলেন, নাও, চাবিটা তুমিই নাও। রাখাল সিংকে দিতে ভুলে গেলাম, ভালই হয়েছে। এবার গৌরীর চোখ হইতে টপটপ করিয়া জল মাটিতে ঝরিয়া পড়িল।

নিত্য খোকাকে কোলে করিয়া ছুটিয়া আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল, কে বলুন দেখি পিসীমা?

শিশুর দিকে চাহিয়াই শৈলজা দেবী ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন, এ যে তাঁহার শিবু ছোট হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। সেই শৈশবের শিবু, এতটুকু তফাত নাই। নিত্য তাঁহার কোলে খোকাকে ফেলিয়া দিয়া বলিল, নেন, কোলে নেন।

শৈলজা দেবী তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিলেন, তারপর আবার তাহাকে ভাল করিয়া দেখিয়া বলিলেন, ঠিক ছোটবেলার শিবু।

শিশুও অবাক হইয়া তাঁহাকে দেখিতেছিল, নিত্য তাহাকে বলিল, খোকন, তোমার দাদু। বল, দাদু।

শৈলজা দেবী তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া এবার বধূকে বলিলেন, কাঁদছ কেন বউমা? ছি, এতে কি কাঁদে? বোসো, আমার কাছে বোসো। কাঁদছ কেন? শিবু তো আমার ছোট কাজ করে জেলে যায় নি। বরং ভগবানের কাছে তার মঙ্গল কামনা কর। দু বছর, দশ বছর—এই জীবনেই যেন জয় নিয়ে সে ফিরে আসে।

খোকা তাঁহার হাতের কবচ-রুদ্রাক্ষ লইয়া নাড়িতেছিল, তিনি হাসিয়া বলিলেন, কি দাদু, দাদুর ধন-সম্পত্তি নিয়ে টানাটানি করছ? দেখ বউমা, তোমার ছেলের কাণ্ড দেখ, ছেলে কেমন চালাক দেখ!

বধূ এবার হাসিল।

নিত্য বলিল, দাদাবাবুকে কিন্তু খালাস করে আনুন বাপু।

কঠোর চক্ষে চাহিয়া শৈলজা দেবী বলিলেন, না, তাতে আমার শিবুর মাথা হেঁট হবে। ও কথা কেউ বোলো না আমাকে।

রতন বলিল, তা না আন, তার সঙ্গে দেখা করে এস।

শৈলজা দেবীর কণ্ঠস্বর আর্দ্র হইয়া উঠিল, বলিলেন, যাব বইকি মা, আজই যাব। নিত্য, তুই ডাক রাখাল সিংকে।

পঁয়ত্রিশ

এই জেলখানাটির ঘর-দুয়ারের বন্দোবস্ত তেমন ভাল নয়। কয়েদীদের সহিত দেখা-সাক্ষাতের জন্য ঘরের কোনও ব্যবস্থা নাই। দেখা-সাক্ষাৎ হয় আপিস-ঘরে, কিন্তু সেও এত সঙ্কীর্ণ যে দুইজনের বেশি তিনজন হইলে আর স্থান-সঙ্কুলান হয় না। শৈলজা দেবী বলিলেন, আমরা বাইরে থেকেই দেখা করব। সঙ্গে রাখাল সিং ও রামরতনবাবু গিয়াছিলেন; খোকাকে কোলে লইয়া গৌরীর সঙ্গে ছিল নিত্য।

জেলখানার ভিতর দিকের ফটক খুলিয়া শিবনাথকে আনিয়া আপিস-ঘরের জানালায় দাঁড় করাইয়া দিল। শিবনাথ বাহিরের দিকে চাহিয়াই বিস্ময়ে আনন্দে হতবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পিসীমা, গৌরী! কে দেখা করিতে আসিয়াছে জানিতে চাওয়ায় তাহাকে বলিয়াছিল, বহুৎ আদমি আছে মশা, জেনানা-লোকভি আছে। সে ভাবিয়াছিল, রাখাল সিংয়ের সঙ্গে নিত্য ও রতনদিদি আসিয়াছে। তাহারা তো আপনার জনের চেয়ে কম আপনার নয়।

পিসীমা রুদ্ধকণ্ঠে ডাকিলেন, শিবু!

স্বপ্নাচ্ছন্নের মতই শিবু উত্তর দিল, পিসীমা!

পিসীমারও কথা যেন হারাইয়া যাইতেছে। অনেক ভাবিয়াই যেন তিনি বলিলেন, বউমা এসেছেন, আমি এসেছি, খোকা এসেছে, এরা সব এসেছে তোকে দেখতে।

শিবনাথের বুক মুহূর্তের জন্য কাঁপিয়া উঠিল, তাহাকে কি 'বণ্ড' দিয়া ফিরিয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিতে আসিয়াছে? সে আত্মসম্বরণ করিয়া দৃঢ় হইয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

পিসীমাও ধীরে ধীরে আত্মসম্বরণ করিতেছিলেন, তিনি বলিলেন, আমি তোকে আশীর্বাদ করতে এসেছি, বউমা প্রণাম করতে এসেছেন, খোকা বাপকে দেখতে এসেছে, চিনতে এসেছে। তুই ওকে আশীর্বাদ কর, যেন তোর মত বড় হতে পারে ও।

শিবনাথের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, বুক ভরিয়া উঠিল, তাহার মনে হইল, এতবড় পাওয়া সে আর জীবনে পায় নাই, তাহার সকল অভাব মিটিয়া গিয়াছে, সকল দুঃখ দূর হইয়াছে, তাহার শক্তি শত সহস্র গুণে বাড়িয়া গিয়াছে। সে এতক্ষণে গৌরীর দিকে ফিরিয়া চাহিল। অর্ধ-অবগুণ্ঠনের মধ্যে গৌরীর মুখখানি স্পষ্ট দেখা যাইতেছে,—তাহার মুখে হাসি, চোখে জল; ইঙ্গিতে-ভঙ্গীতে সারাটি মুখ ভরিয়া কত ভাষা, কত

কথা সোনার আখরে লেখা কোন্ মহাকবির কাব্যের মত ঝলমল করিতেছে! শিবনাথের মুখেও বোধ করি অনুরূপ লেখা ফুটিয়া উঠিয়াছিল। দুইজনেই মুগ্ধ হইল, কত কথার বিনিময় হইয়া গেল, তাহাদের তৃপ্তির আর সীমা রহিল না। যে কথা, যে বোঝাপড়া এই ক্ষণিকের দৃষ্টিবিনিময়ের মধ্যে হইল, সে কথা, সে বোঝাপড়া দিনের পর দিন একত্র কাটাইয়াও হইত না।

পিসীমা খোকাকে জানালার ধারে দাঁড় করাইয়া দিয়া বলিলেন, দাদুভাই, বাবা।

শিবনাথ তাহার চিবুকে হাত দিয়া আদর করিয়া বলিল, তুমি ওকে যেন আমার মত করেই মানুষ কোরো পিসীমা, ওদের ভার তোমার ওপরই আমি দিয়ে যাচ্ছি।

পিসীমা আর্তস্বরে বলিলেন, ও কথা আর বলিস নি শিবু। ওরে, এ ভার নিতে আর পারব না।

শিবনাথের অধররেখায় একটি মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল; সেই হাসি হাসিয়া সে শুধু দুইটি কথা বলিল প্রশ্নের ভঙ্গীতে, বলিল, পারবে না? তারপর আর সে অনুরোধ করিল না, সকলের দিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া মুহূর্তের জন্য আকাশের দিকে চাহিল। পর-মুহূর্তেই দৃষ্টি নামাইয়া জানালা দিয়া সম্মুখের মুক্ত ধরিত্রীর দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করিল। জেলখানার ফটক হইতে দুই পাশের বড় বড় গাছের মধ্য দিয়া সোজা একটা রাস্তা জেলখানার সীমানার পর অবাধ প্রান্তরে গিয়া পড়িয়াছে। সেই প্রান্তরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া সে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। সে আপনার মনকে দৃঢ় করিয়া তুলিতেছিল, সম্মুখের ওই দিগন্তে মিশিয়া-যাওয়া পথটার মত সুদীর্ঘ পথে যে যাত্রা করিয়া চলিয়াছে, পিছন ফিরিয়া চাহিবার তাহার অবসর কোথায়? অনাদিকালের ধরিত্রী-জননীর বুকে শিশু-সৃষ্টি ধীরে ধীরে লালিত হইয়া বাড়িয়া চলিয়াছে, তাহারই হাতে সব কিছু সঁপিয়া নিশ্চিন্ত নির্ভরতায় মানুষ অনন্তকাল অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে, মানুষের হাতে ভার দিয়া রাখিয়া যাওয়ার সকল মিথ্যার মধ্যে ওই রাখিয়া যাওয়াই তো আসল সত্য।

তাহার মনের চিন্তা চোখের দৃষ্টির মধ্যে রূপ লইয়া ফুটিয়া উঠিতেছিল। পিসীমা তাহার মুখের দিকেই চাহিয়া ছিলেন। শিবনাথের দৃষ্টি দেখিয়া তিনি শিহরিয়া উঠিলেন, মমতায় হৃদয় আচ্ছন্ন হইয়া গেল, তিনি বোধ হয় পরকাল ভুলিয়া গেলেন, ইষ্ট ভুলিয়া গেলেন, সব ভুলিয়া গেলেন; শিবুই হইয়া উঠিল সব, তাঁহার ইষ্টদেবতা—গোপাল আর শিবু মিশিয়া যেন একাকার হইয়া গেল।

পিসীমা বলিলেন, আমি ভার নিলাম শিবু, তুই ভাবিস নি। ওরা আমার বুকেই রইল। ঝরঝর করিয়া চোখের জল ঝরিয়া তাঁহার বুক ভাসিয়া গেল।

পিছন হইতে রাখাল সিং ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, পড়ে গেল, খোকা পড়ে গেল।

মুহূর্তে আত্মসম্বরণ করিয়া খোকাকে ধরিয়া পিসীমা বলিলেন, না, আমি ধরে আছি।

পিছন হইতে জেলার বলিল, সময় হয়ে গেছে শিবনাথবাবু।

জানালার চৌকাঠে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিয়া শিবু বলিল, এখান থেকেই প্রণাম করছি পিসীমা। মনে মনে সে বলিল, সমস্ত জীবের ধাত্রী যিনি ধরিত্রী, জাতির মধ্যে তিনিই তো দেশ, মানুষের কাছে তিনিই বাস্তু; সেই বাস্তুর মূর্তিমতী তুমি, তোমাকে যে সে বাস্তুর বংশের কল্যাণ করতেই হবে। এই তো তোমার ধর্ম। তুমিই তো আমায় বাস্তুকে চিনিয়েছ, তাতেই চিনেছি দেশকে। আশীর্বাদ কর, ধরিত্রীকে চিনে যেন তোমায় চেনা শেষ করতে পারি।

প্রদীপ্ত হাসিমুখে পরিপূর্ণ অন্তরে শিবনাথ ফিরিল। গৌরীর অবগুণ্ঠন তখন খসিয়া গিয়াছে, অনাবৃত মুখে, পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে সে ওই দিকে চাহিয়া ছিল। পিসীমা তাহার মাথার অবগুণ্ঠন টানিয়া দিয়া ডাকিলেন, বউমা, খোকা ডাকছে তোমাকে।

ওদিকে লোহার দরজাটা সশব্দে বন্ধ হইয়া গেল।

নাটক

পথের ডাক

উৎসর্গ

সুকবি

শ্রীযুক্ত জগদীশ ভট্টাচার্য

প্রীতিভাজনেষু

চরিত্র

পুরুষ

রায়বাহাদুর	...	স্বীয় চেষ্টায় সুপ্রতিষ্ঠিত শিল্পপতি
ডাক্তার চ্যাটার্জী	...	প্রফেসর
অতুল	...	বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র
যতীন	...	ছাত্র
নিখিলেশ	...	ঐ
রমেন	...	ঐ
কুড়োরাম	...	কোলিয়ারির ওভারম্যান
কানাই	...	ঐ কর্মচারী
খাজাঞ্চী	...	ঐ ঐ
ভক্তারাম	...	ঐ সর্দার
বিছে	...	ভিক্ষা-ব্যবসায়ী ছেলে

অন্ধ, ভিক্ষুক, ডাক্তার, ছাত্রগণ, কুলিগণ, বেয়ারা ইত্যাদি

স্ত্রী

জ্যোতির্ময়ী	...	নিখিলেশের মা
সুনন্দা	...	রায়বাহাদুরের কন্যা
রমা	...	ডাক্তার চ্যাটার্জীর কন্যা
ইলা	...	কলেজের ছাত্রী
দামিনী	...	ঝি

সখীর মা, ছাত্রীগণ, কুলীরমণীগণ

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কলেজের করিডোর

(নেপথ্যে ক্লাস বসিবার ঘণ্টা বাজিল)

একদল ছাত্রী প্রবেশ করিল।

১ম ছাত্রী। আমি নিজে চোখে দেখেছি। ফার্স্ট ফিফটি নেম্‌স্ আজ কাগজে বেরিয়েছে। অতুল মুখার্জি টোয়েন্টি-সেভেন্‌থ্ প্লেস ; পুয়োর রমা চ্যাটার্জি!

২য় ছাত্রী। সে তো কই আজ আসেই নি দেখছি।

১ম ছাত্রী। তেজস্বিনী বোধ হয় কঠিন শব্দ চয়ন করে লিপিকা রচনায় নিমগ্ন আছে। ধর—"তোমার অক্ষমতার লজ্জায় আমার উঁচু মাথা পথের ধুলোয় মিশে গেছে"—।

২য় ছাত্রী। বেচারা রমা! আই. সি. এস-গৃহিণী হবার এত বড় কল্পনা—

১ম। চুপ! ডক্টর চাটার্জি আসছেন। রমা বোধ হয় পিছনে? দেখ তো।

২য় ছাত্রী। (পিছনের দিকে ভাল করিয়া দেখিয়া) নাঃ, সে সঙ্গে নেই, আসে নি। বেচারী!

১ম। চল, চল।

উভয়ের প্রস্থান

প্রফেসার ডাঃ চ্যাটার্জির প্রবেশ ; তাঁহার সর্বাঙ্গে উত্তেজনা পরিস্ফুট। বগলে একগাদা বই। তিনি আপনার মনেই শেক্সপীয়র আবৃত্তি করিতে করিতে করিডোর অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেলেন।

To be or not to be,—that is the question—;
Whether 'tis nobler in the mind to suffer,
The slings and arrows of outrageous fortune
Or to take arms against a sea of troubles,
And by opposing end them—;

আবৃত্তি শেষ হইবার পূর্বেই তিনি রঙ্গমঞ্চ অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেলেন। তিনজন ছাত্রের প্রবেশ।

১ম। অতুল টোয়েনটি-সেভেন্থ্ হয়েছে! দি মোস্ট ব্রিলিয়ান্ট বয় অব আওয়ার ইউনিভার্সিটি—আই. সি. এস. কমপিটিশনে বাঙালীর আর চান্স নাই। মাদ্রাসীদের একচেটে হয়ে গেল।

২য়। অঙ্কেই ওরা মেরে দেয়। নাইনটি পারসেন্ট মার্ক তো বাঁধা।

৩য়। বাবা—জিঞ্জার মার্চেন্টের ভেস্‌ল্-এর খবরে দরকার কি? বাদ দাও না ওসব কথা। আমাদের তো সেই কেরানীগিরি ছাড়া 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়'। চল—চল—রোল কলটা সেরে দিয়ে সটকে পড়ি।

সকলের প্রস্থান

নিখিলেশ ও যতীনের প্রবেশ। নিখিলেশের পরনে খদ্দর, আধময়লা কাপড়চোপড়, মুখে চোখে সদ্য-বিগত বিপুল পরিশ্রমের চিহ্ন। যতীনের পরনেও খদ্দর।

যতীন। কি কাণ্ড বল দেখি তোর? আমি তো ভেবেই আকুল। ফ্লাড রিলিফ-এ গিয়ে মানুষ একেবারে নিখোঁজ?

নিখিল। অনাবশ্যক ভাবনা তোর। বান কমে যাবার পর গেছি। সুতরাং ভেসে যাবার চিন্তা উঠতেই পারে না।

যতীন। তুই ভেসে যাবি—এ কথা আমি একবারও ভাবি নি। ভাবছিলাম বিবাগী হলি নাকি?

নিখিল। বিবাগী?

যতীন। নইলে আর ভাবি কি বল?

নিখিল। এই টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরিতে শুদ্ধোদনের ভাইপো সেজে যারা আজও বসে আছে—তারাই ওরকম ভাববে। যুগোপযোগী বুদ্ধি নিয়ে একটু মাথা ঘামালেই বুঝতে পারতিস আমি কোথায়!

যতীন। একটা কাণ্ড করে এসে আর মেলা বাজে বকিস নে নিখিল।

নিখিল। বাজে? ওরে গর্দভ—এই সভ্যতার যুগে—মানুষ হারালে খুঁজবার জায়গা মাত্র দুটি। দু জায়গার এক জায়গায় ,না এক জায়গায় পাত্তা মিলবেই। হাসপাতাল—অথবা পুলিস-হাজত। হয় মিউজিয়ম, নয় চিড়িয়াখানা। তা—চিড়িয়াখানা জায়গাটা মন্দ নয় রে যতীন।

যতীন। তুই কিন্তু এ কি কাণ্ড করে এলি বল তো? ভলেন্টিয়ারি করতে গিয়ে খামকা খামকা জেল খেটে চলে এলি? তোর মা শুনলে কি বলবেন বল তো?

নিখিল। আমার মা? (হাসিল)। মায়ের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে যতীন। জেল থেকে বেরিয়ে বাড়ি গিয়েছিলাম। মাকে প্রণাম করে সব বললাম।

যতীন। মা কী বললেন?

নিখিল। মা শুধু জিজ্ঞাসা করলেন—ফুড রিলিফে যাওয়া তো আইনবিরুদ্ধ নয়। তবে জেল হল কেন? আমি সব কথা বললাম—গেলাম ফুড রিলিফে; লোকের দুর্দশা দেখে কান্না আসে, অথচ সেখানকার জমিদার-গোমস্তা এতে মহাখুশী, বলে কি জান, বলে এখানকার প্রজারা ভয়ানক বদমাশ পাজী; ভগবান সেই জন্মেই ওদের সাজা দিয়েছেন। কেউ ওদের সাহায্য করতে পাবে না। সেই নিয়ে হাঙ্গামা—আমাদের ওপর জুলুম। শেষে সইতে না পেরে জমিদারের একটা চাপরাশীকে একদিন বসিয়ে দিলুম এক চড়—ব্যাস। মামলা করলে। পুলিসও রিপোর্ট দিলে—আমরা সব ভয়ঙ্কর লোক। হয়ে গেল একমাস জেল। একেবারে কমপ্লীট রেস্ট হয়ে গেল। ওজন বেড়ে গেছে।

যতীন। তারপর?

নিখিল। মাথায় হাত দিয়ে মা আশীর্বাদ করলেন।

যতীন। কিন্তু ওদিকের সংবাদ? তোর হবু-শ্বশুর রায়বাহাদুরের খবর কী? তিনি জেনেছেন ব্যাপারটা?

নিখিল। জননীটি তো আমার সাক্ষাৎ সত্যযুগের ব্যাঘ্রী, হুঙ্কার করে সে কথা জানিয়ে দিয়েছেন। চিঠি লেখা আমি দেখে এসেছি।

যতীন। তারপর? ভদ্রলোক বোধ হয় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবেন।

নিখিল। বোধ হয় মানে? ক্ষিপ্ত হয়ে নাচতে আরম্ভ করবেন—মানে রণ-নৃত্য।

যতীন। (হাসিয়া) জানি। কিন্তু সে তো খুব ভয়ের কথা নয়—ভয়ের কথা রায়বাহাদুরের কন্যা। ভাবীকালে জেলফেরত স্বামী দেখে তাঁর যদি হিস্টিরিয়া হয় তবেই তো মুশকিল!

নিখিল। মুশকিল আসান—ইজ র অ্যামোনিয়া উইদাউট এ সিঙ্গল ড্রপ অব্ ল্যাভেণ্ডার।

যতীন। কাজটা কিন্তু সত্যই অন্যায় করেছিস নিখিল। চার বছর বয়স থেকে যখন তোর বিয়ের সম্বন্ধ হয়ে আছে—এর থেকে যখন নিষ্কৃতি পাবার উপায় নেই, তখন এ পথ তোর নয়। রায়বাহাদুরের অগাধ সম্পত্তি, তাঁর একমাত্র কন্যা—তাঁদের মত জীবনে পথ চললেই ভাল করতিস। এই নিয়ে সমস্ত জীবনে স্ত্রীর সঙ্গে একটা—

নিখিল। তুই একটা ইডিয়ট!

যতীন। তুই ইডিয়ট—

নিখিল। আমি ইডিয়ট? জানিস—বাঙালীর ছেলে আজকাল মেম বিয়ে করে শাঁখা-শাড়ি পরাচ্ছে? ডার্লিং-এর বদলে প্রিয়তমো বলাচ্ছে? আর আমি একটা বাঙালীর মেয়েকে জর্জেট ছাড়িয়ে খদ্দরাইজ করতে পারব না?

একটি সুবেশা উগ্র-প্রসাধন-সমন্বিতা ছাত্রী চলিয়া গেল।

যতীন। দেখছিস? মেমেরা বাঙালিনী হতে চাচ্ছে, কিন্তু বাঙালিনীরা যে মেমসাহেব হতে চাচ্ছে তা দেখেছিস? তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়।

নিখিল খাতা লইয়া একটা কাগজ ছিঁড়িয়া বাহির করিল।

যতীন। কী ওটা?

নিখিল। কবিতা। 'তরুণ' কাগজটা কমাস থেকেই জ্বালাচ্ছিল লেখার জন্যে। একটা কবিতা লিখেছি। নে, নোটিশ বোর্ডটার উপর এঁটে দে কবিতাটা। ঠিক এই নিয়ে কবিতা।

যতীন। (কবিতাটি বোর্ডে পেরেকে আঁটিয়া আবৃত্তি করিয়া পড়িল)

গার্গীদেবী মাখত কি না লোধ্ররেণু কে জানে
ধূপের ধোঁয়ায় সুবাস করত চুল?
ব্রহ্মবিদ্যা শোনার পরে পরত কিনা সেই কানে
কানপাশা আর ঝুমকো কিংবা দুল?
ভগবানের বার্নিশে হায়, হাল ফ্যাশানের গার্গীদের
লোকসমাজে মুখ দেখানো ভার।
শিক্ষা শাড়ি সব যে তাদের এক জিনিসের রকম ফের
এর পরে আর সন্দ রইবে কার?

নিখিল। হ্—শ্—শ! এ টাইগ্রেস ইজ কামিং—প্রফেসার চ্যাটার্জি-নন্দিনী—রমা চ্যাটার্জি! চলে আয়!

উভয়ের প্রস্থান

কয়েক মুহূর্ত পরে রমা চ্যাটার্জির প্রবেশ। অত্যন্ত সাধাসিধা বেশভূষা, একবিন্দু প্রসাধনবাহুল্যের চিহ্ন নাই। তেজস্বিনী মেয়ে। সঙ্গে আর একটি মেয়ে ইলা।

রমা। বাহুল্য হলেও তোমার সহানুভূতির জন্যে ধন্যবাদ ইলা। অতুলবাবু আই. সি. এস কমপিটিশানে টোয়েন্টি সেভেন্‌থ হয়েছেন—নমিনেশান পান নি, তার জন্যে আমি একবিন্দুও দুঃখিত নই। অতুলবাবু বাবার প্রিয়ছাত্র ছিলেন—সেই হিসেবেই তাঁর সঙ্গে আমার বিয়ের সম্বন্ধ করেছিলেন। এর মধ্যে পূর্বরাগের ভূমিকা ছিল না—অথবা অতুলবাবুর কেরিয়ার দেখে আমি তাঁকে পাকড়াও করতে চেষ্টা করি নি।

ইলা। মাফ করো ভাই রমা। অতুলবাবুর ফেলিয়োর উপলক্ষ্য করে আমি তোমাকে আঘাত দিতে চাই নি—

রমা। (বোর্ডের দিকে চাহিয়া কবিতা পড়িয়া) দেখছ ইলা, বোর্ডের লেখাটা দেখেছ ?

ইলা। ছি—ছি—ছি—! লজ্জার কথা !

রমা। লজ্জা ? তুমি কি মনে কর ইলা—এদের লজ্জা আছে ? এরা গ্রেটা গার্বোকে গবেষণা করে, এলিসা ল্যাণ্ডিকে চিঠি লেখে—বাংলা দেশের সিনেমা স্টারদের নিয়ে কবিতা লেখে—।

বোর্ডের লেখা ছিঁড়িয়া দিল

কাপুরুষের দল সব—একবিন্দু সাহস নেই,—জানতাম যদি চোরের মত না লিখে সামনে দাঁড়িয়ে লিখতে পারত।

খাতায় লিখিতে লিখিতে নিখিলের প্রবেশ এবং খাতা হইতে কাগজ ছিঁড়িয়া বোর্ডে আবার সে আঁটিয়া দিল। মুখে আবৃত্তি করিয়া লিখিল

বোর্ডের লেখাটা মিথ্যাই ছিল যদি
সেটা মুছে ফেলা মিথ্যা নয় কি আরও ?
সত্যি কথাই যদি হয়েছিল লেখা
দুঃসাহসিকা ! সেটা মুছে দিতে পারো ?

কোন দিকে না চাহিয়া সে চলিয়া যাইতেছিল।

রমা। (ক্রুদ্ধ স্বরে) দাঁড়ান আপনি।

নিখিল গ্রাহ্য না করিয়া যাইতেছিল, রমা দ্রুত অগ্রসর হইয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিল।

দাঁড়ান।

নিখিলেশ দাঁড়াইল। এবং একটু হাসিল।

আসুন আপনি আমার সঙ্গে।

নিখিল। কোথায় ? এবং কেন ?

রমা। অথরিটিজদের কাছে, আপনাকে এর জবাবদিহি করতে হবে।

নিখিল। আমি যাব না।

রমা। কাওয়ার্ড কোথাকার ! আপনারা—

নিখিল। কাওয়ার্ড নই বলেই যাব না। আপনি আমাকে ধরে নিয়ে যাবেন—আমি যাব, সে আমি পারব না। আমার নাম নিখিলেশ বন্দ্যোপাধ্যায়—রোল একশো

পনের, কোর্থ ইয়ার, আপনি স্বচ্ছন্দে নালিশ করতে পারেন। সাক্ষীর দরকার হবে না, আমি নিজেই সব কথা স্বীকার করব। আচ্ছা—নমস্কার।

রমা। প্রতিনমস্কার আমি করব না। নমস্কার পাবার মত যোগ্যতা আপনার নেই।

ডাঃ চ্যাটার্জির প্রবেশ

ইলা চলিয়া গেল

চ্যাটার্জি। রমা, আই হ্যাভ রিজাইন্‌ড—

রমা। রিজাইন্‌ড? তুমি কাজ ছেড়ে দিয়েছ বাবা?

চ্যাটার্জি। হ্যাভ ইউ রেড দিস্ বুক?

রমা। 'ইণ্ডিয়া আনভেলড'

চ্যাটার্জি। হ্যাঁ। বিদেশী পর্যটকের অতি ঘৃণিত কুৎসা রটনা। ভারতবাসী অসভ্য, ভারতীয়েরা বর্বর, তাদের সমাজ কলঙ্কিত, তাদের আধ্যাত্মিকতা অতি ঘৃণিত, মদ্য মাংস নারী নিয়ে ব্যভিচারের মহোৎসব—হাস্যকর জাদুবিদ্যার নামান্তর। আমি লিখব। আজ কয়েক দিন অহরহ চিন্তা করেছি রমা। আজ আমি মনস্থির করেছি। প্রতিবাদ লেখবার সংকল্প নিয়ে তাই কাজ থেকে অবসর নিলাম; প্রতিবাদে আমি অন্য দেশকে গাল দিতে চাই নে; তাদের কুৎসিত দিকের তথ্য প্রকাশ করব না। বিগত যুগের সংস্কৃতির ইতিহাসকে ভিত্তি করে বর্তমানকে প্রকাশ করব আমি। নিষ্ঠুর শোষণে কল্পনাতীত দারিদ্র্যের পটভূমিতে রবীন্দ্রনাথের জাতি—তিলকের জাতি—বিবেকানন্দের জাতি—গান্ধীর জাতির কাহিনী লিখব আমি। দিস্ ইজ মাই মিশন অব লাইফ। আই হ্যাভ রিজাইন্‌ড—

রমা তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। নিখিলেশ আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল।

চ্যাটার্জি। কল্যাণ হোক তোমার। রমা—আমি চললাম।

চ্যাটার্জির প্রস্থান

নিখিলেশ চলিয়া যাইতেছিল

রমা। কবিতাটা আপনি নিজে হাতে মুছে দিয়ে যান।

নিখিল। না।

রমা। ইউ শ্যাল রিপেণ্ট ফর দিস। আমাকে তা হলে দোষ দেবেন না।

প্রস্থানোদ্যত

নিখিল। নমস্কার।

উভয়ের উভয় দিকে প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

নিখিলেশদের গ্রামের বাড়ি

মধ্যবিত্ত স্বচ্ছল গৃহস্থের বাড়ি। পূজার ঘর। একটি কাঠের সিংহাসনে (বার্নিশ করা নয়) লক্ষ্মীঝাঁপি, দুই পাশে দুইটি কাঠের পেঁচা। পাশেই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ছবি, রামকৃষ্ণের পাশে বিবেকানন্দের ছবি, উভয় ছবির নীচে আরও একখানি দর্শকের অপরিচিত এক সাধারণ বাঙালী-ভদ্রলোকের ছবি। নিখিলেশের বিধবা মা জ্যোতির্ময়ী দেবী (বয়স ৪৫।৪৬) বসিয়া মালা দিয়া ছবিগুলি সাজাইতেছেন। তিনি সাজানো শেষ করিয়া প্রণাম করিলেন। ঠিক সেই সময়ে আসিয়া প্রবেশ করিল ঝি। সে ঘরে প্রবেশ করিয়া দরজার পাশেই দাঁড়াইল। জ্যোতির্ময়ীর প্রণাম-শেষের অপেক্ষা করিয়া রহিল।

জ্যোতির্ময়ী। (প্রণাম শেষ করিয়া উঠিয়া ঝিকে দেখিয়া) কি-লো দামিনী ?

ঝি। দাদাবাবুর শ্বশুর এয়েচেন মা।

জ্যোতি। (হাসিয়া) আগে বিয়ে হোক, তারপর শ্বশুর বোলো মা। কখন এলেন ?

ঝি। মটর থেকে এই নামছেন। গোটা একটা মটর ভাড়া করে এয়েচেন। মস্ত মস্ত দুটো ঝুড়ি, আমের পাতা বেরিয়ে আছে, বোধ হয় আম আছে।

জ্যোতি। ঝুড়িসুদ্ধ নামিয়ে রেখে দিক, যেন খোলা না হয়। আর সরকার মশাইকে—

নেপথ্যে রায়বাহাদুর শিবপ্রসাদ। কই, বউঠাকরুন কই ? কোথায় ?

বলিতে বলিতেই তিনি জুতা পায়েই ঘরে আসিয়া ঢুকিলেন। রায়বাহাদুরকে জুতা পায়ে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া ঝি জিভ কাটিল। কিন্তু তাহার পূর্বেই জ্যোতির্ময়ী বলিলেন—

জ্যোতি। আসুন, ঠাকুরপো, আসুন। (তিনি নিজেই আসন পাতিয়া দিলেন) বসুন ঠাকুরপো। জুতো খুলে ভাল হয়ে বসুন।

রায়বাহাদুর। হ্যাঁ, ভাল হয়ে বসতে হবে বৈ কি। সমস্ত ব্যাপারের একটা সুব্যবস্থা না করে আমি নড়ব না, প্রতিজ্ঞা করে এসেছি। দাঁড়ান আগে প্রণাম করি।

জ্যোতি। (পিছাইয়া গেলেন) থাক ঠাকুরপো, মেয়েদের শুচিবাইয়ের কথা তো জানেন। আমি পুজোয় রয়েছি। আর (হাসিয়া) আপনি ট্রেন থেকে আসছেন, পথে কেলনারের খানা নিশ্চয় খেয়েছেন। সায়েব মানুষ।

শিবপ্রসাদ। (উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন) তা খেয়েছি। তবে অখাদ্য কিছু খাই নি বউদি।

শিবপ্রসাদ নমস্কার করিয়া জুতা খুলিয়া আসনে বসিলেন।

জ্যোতি। দামিনী, ঠাকুরপোর জুতোজোড়াটা বাহিরে রেখে দে তো মা।

শিব। ও হো হো—এটা বুঝি পুজোর ঘর!

জ্যোতি। হ্যাঁ, লক্ষ্মীর ঘর।

শিব। বাইরে বাইরে আপিসে আমাদের কারবার—ভুল হয়ে যায়। আর আমাদের লক্ষ্মীর ঘর তো উঠেই গেছে। লক্ষ্মী আমাদের ব্যাঙ্কে। (হাসিলেন) এ-গুলি বেশ লাগে আমার।

জ্যোতি। দামিনী, বাইরের বারান্দায় ঠাকুরপোর মুখ-হাত-পা ধোবার জল দে। আর বামুন ঠাকরুনকে বল জলখাবারের ময়দা মাখতে। আমি আসছি।

দামিনী চলিয়া গেল

শিব। আপনি ব্যস্ত হবেন না বউদি। আগে আমি আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই। আপনার পত্র পেয়ে আমি ছুটে আসছি। আমাকে কঠিন সমস্যায় ফেলেছেন আপনারা।

জ্যোতি। সমস্যা আসে বই কি জীবনে। সেই সমস্যার সমাধান যারা করতে পারে তারাই তো সংসারে বড় মানুষ। আপনি কর্মী-কৃতী পুরুষ, সেই জন্যেই তো সর্বাগ্রে আপনাকেই জানালাম সমস্যার কথা। নিখিলেশ যখন এসে বললে—মা আমি জেল খেটে এলাম—তখন সর্বাগ্রে আপনাকেই পত্র লিখলাম।

শিব। পত্র পেয়ে আমিও ছুটে আসছি। কিছু মনে করবেন না বউদি, অবিনাশদা যখন হঠাৎ মারা গেলেন তখন এই আশঙ্কা করেই আমি আপনাকে বলেছিলাম—নিখিলেশকে আমার হাতে দিন, আমি ওকে মানুষের মত মানুষ গড়ে তুলব। কিন্তু আপনি বলেছিলেন—নিখিলেশের জন্যে আপনি ভাববেন না ঠাকুরপো। আপনার দাদার সন্তান অমানুষ হবে না। তা ছাড়া—ছেলেকে মানুষ করে গড়ে তোলবার ভার ভগবান মাকেই দিয়েছেন। আমি কখনও সে ভারের অমর্যাদা করব না। আপনি শিক্ষিতা মেয়ে—আপনার কথায় আমি নির্ভর করেছিলাম।

জ্যোতি। ভগবানের দায়িত্বের কি আমি অমর্যাদা করেছি ঠাকুরপো?

শিব। (একটু স্তব্ধ থাকিয়া) আপনার কাছে যতদিন নিখিল ছিল—ততদিন আপনার পক্ষে সে দায়িত্ব পালন করা সম্ভবপর হয়েছিল। কিন্তু তারপর কলকাতায় গিয়ে তার মতিগতি অন্য রকম হয়েছে। ম্যাট্রিকুলেশনে সে স্কলারশিপ পেয়েছিল—কিন্তু আই-এ-তে সেই ছেলে সেকেণ্ড ডিভিশনে পাস করলে। অবশ্য চাকরি তাকে কোনদিন করতে হবে না। সুনন্দা আমার একমাত্র সন্তান। কিন্তু বিদ্যার গৌরবকে আমি শ্রদ্ধা করি।

জ্যোতি। বিদ্যার গৌরবকে শ্রদ্ধা আপনার চেয়ে আমি কম করি না ঠাকুর-পো। কিন্তু আপনি তো জানেন—আপনার দাদা ছিলেন ঠাকুরের মঠের শিষ্য। আমার

দীক্ষাও সেই দীক্ষা। বিদ্যার গৌরবের চেয়েও মনুষ্যত্বের গৌরব আমার কাছে আরও বড়। তাই কলেজে গিয়ে সে যখন সেবাধর্মে কাজ করতে আরম্ভ করলে তখন আমি আপত্তি করি নি। কখনও করব না।

শিব। আপনি কি প্রকারান্তে আমাকে জবাব দিচ্ছেন বউদি ?

জ্যোতি। (জিভ কাটিয়া) না না ঠাকুরপো, সে অধিকারই যে আমার নেই। সুনন্দার অন্নপ্রাশনে গিয়ে তিনি নিখিলেশকে আপনাকে দান করে এসেছিলেন। ফিরে এসে আমায় বলেছিলেন—নিখিলেশের বিয়ের সম্বন্ধ করে এলাম অমুকের মেয়ের সঙ্গে। নিখিলেশের বয়স তখন চার। তাই আমি হেসেছিলাম। তিনি বলেছিলেন—হাসি নয়, শুনে রাখ, নিখিলেশের বিয়ে পর্যন্ত যদি আমি না থাকি—তবে তাঁরা অমত না করলে আমাদের অমত করবার অধিকার রইল না। আমি কি জবাব দিতে পারি ঠাকুরপো ?

শিব। (কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া) কথা যখন তুললেন বউদি তখন আমার দিকের কথাও আমি বলব। সত্য যদি কঠোর হয় কিছু মনে করবেন না। দেখুন, অবিনাশদা আমি বাল্যবন্ধু। অবশ্য মতের পার্থক্য আমাদের চিরকাল ছিল। যখন এই বিয়ের কথা হয় তখন আমার জীবনের সবে আরম্ভ। ছোট কণ্ট্রাক্ট বিজনেস আরম্ভ করেছি। তারপর ভাগ্যই বলুন—আর ভগবানের দয়াই বলুন—কি আমার কর্মশক্তিই বলুন—যাতেই হোক—ধীরে ধীরে আজও পর্যন্ত আমার কর্মক্ষেত্র বেড়েই চলেছে। মনুষ্যত্বের কথা বললেন—আমিও অমানুষ নই। গ্রামে স্কুল করেছি, হাস-পাতাল দিয়েছি, যে-কোন বড় প্রতিষ্ঠান আমার কাছে আসে আমি কখনও তাদের ফিরিয়ে দিই না। অবস্থার পরিবর্তন সত্ত্বেও আমি অবিনাশদার কাছে যে কথা দিয়েছিলাম তা ভুলি নি। সুনন্দা আমার একমাত্র সন্তান—আমি ইচ্ছে করলে বাংলাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ ছেলে—

জ্যোতি। (হাসিয়া) তা নিশ্চয়ই পারতেন। রাগ করবেন না ঠাকুরপো—আমি নিখিলেশের মা। আমার চোখে নিখিলেশই আমার বাংলাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ ছেলে। জানেন তো, "তনয় যদ্যপি হয় অসিতবরন, প্রসূতির কাছে সেই কষিত কাঞ্চন।"

শিব। নিখিলেশ সম্বন্ধে আপনার ধারণা মিথ্যে হত না বউদি, যদি এই ডেঁপোমি তার মধ্যে না ঢুকত। এই ডেঁপোমির ভয়েই আমি তখন আপনাকে লিখেছিলাম—নিখিলকে আমার হাতে দিন।

জ্যোতি। (আঘাত পাইলেন) আপনি একে ডেঁপোমি বল্লেন ঠাকুরপো ?

শিব। (ক্রমশ উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছিলেন) ডেঁপোমি ছাড়া কী বলব? দেশে ফ্লাড হয়েছে, রিলিফের দরকার—সত্যিই দরকার। কিন্তু ভলেন্টিয়ার হয়ে লেখাপড়া ছেড়ে সেখানে গিয়ে হৈ-চৈ করলে কতটুকু রিলিফ হয় বলুন আপনি? রিলিফের জন্যে আসল দরকার টাকার। যার যতটুকু সাধ্য সেই পরিমাণ টাকা দিলেই তো সবচেয়ে বড় সাহায্য হয়। নিখিলেশ আমাকে লিখলে আমি তৎক্ষণাৎ—যা সে বলত পাঠিয়ে দিতাম।

জ্যোতি। নিখিলেশ যে তা করে নি ঠাকুরপো—তার জন্যে আমি তাকে লক্ষবার আশীর্বাদ করছি। তা হলে—

শিব। বউদি, আপনি কী বলছেন বউদি?

জ্যোতি। আমার কথা শেষ হয় নি ঠাকুরপো। তা হলে আজ না হলেও কাল আপনি তাকে মনে মনে ঘেন্না করতেন। যে চোখে বাংলাদেশের লোক আজ ঘরজামাইকে দেখে থাকে, সেই চোখেই তাকে দেখতেন।

শিব। (স্তব্ধতার পর) শুনুন বউদি। ঢাকা দিয়ে কথা বলে মীমাংসা হবে না। তাতে অনেক সময়ের দরকার। সে সময় আমার নেই। শুনুন—আমি খোলাখুলি কথা বলছি—আপনি তার খোলাখুলি উত্তর দিন।

জ্যোতি। বলুন।

শিব। আমি চাই যে নিখিলেশ এখন থেকে এই সব নিয়ে আর মাতামাতি করবে না। আমার কলকাতার বাসায় থাকবে। আর—

জ্যোতি। আর?

শিব। এই যে জেল সে খেটে এল—এর প্রতিকারের জন্য আমি তাকে মিনিস্টারের কাছে নিয়ে যাব। প্রয়োজন হলে তাকে একটা বণ্ড লিখে দিতে হবে।

জ্যোতি। দামিনী? মুখ-হাত ধোবার জল দিয়েছিস? জলখাবার হল?

শিব। থাক বউদি, আগে আমার কথার উত্তর দিন।

জ্যোতি। আপনি মুখ-হাত ধুয়ে ফেলুন, জল খান; আমায় একটু ভাবতে দিন।

শিব। (জ্যোতির্ময়ীর সম্মুখের দিকে চাহিয়া উঠিয়া পড়িলেন), আমার উত্তর আমি পেয়েছি বউদি, আমি উঠলাম। নমস্কার (দ্রুত বাহিরে গিয়া জুতা পরিতে আরম্ভ করিলেন)।

জ্যোতি। দামিনী, সরকার মশায়কে বল, আমের ঝুড়ি দুটো, যা ঠাকুরপো এনেছিলেন, সে দুটো ওঁর গাড়িতে তুলে দিক।

শিবপ্রসাদের পুনঃপ্রবেশ

শিব। বউদি, অবিনাশদার সঙ্গে দাদা সম্পর্কটাও কি আপনি মুছে ফেলতে চান?

জ্যোতি। সে তো আপনিই ফেলছেন ঠাকুরপো। আপনি হাতে মুখে জল না দিয়ে চলে যাচ্ছেন।

শিব। জানেন বউদি, আপনার চিঠি যখন গেল—নিখিলেশের জেলের খবর পেয়ে সুনন্দা কেঁদেছে।

জ্যোতি। তাকে আমার আশীর্বাদ দেবেন ঠাকুরপো। ইন্দ্রের মত স্বামী হবে তার। ইন্দ্রাণীর মত সে যেন সুখী হয়।

শিব। আপনি তা হলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বউদি?

জ্যোতি। জেনে শুনে নতুন করে দক্ষযজ্ঞের আয়োজন করা কি উচিত হবে ঠাকুরপো? সেই জন্যেই তো আপনার মেয়েকে শিবের মত স্বামী লাভের আশীর্বাদ করলাম না। শিবের মত জামাই ধনাধিকারী কোন কালে সহ্য করতে পারেন না।

শিব। (একটু দাঁড়াইয়া থাকিয়া) বলে দিন বউদি, আপনাদের সরকারকে—আমের ঝুড়ি দুটো মোটরে তুলে দিক।

প্রস্থান

জ্যোতির্ময়ী। (ছবির সম্মুখে প্রণাম করিয়া বলিলেন) তোমার কথা যদি মানতে না পেরে থাকি—তুমি আমায় মার্জনা কোরো; কিন্তু মা হয়ে নিখিলেশের এতবড় সর্বনাশ আমি করতে পারব না; পারব না।

তৃতীয় দৃশ্য

ডাঃ চ্যাটার্জির বাড়ি

বসিবার ঘর। অত্যন্ত সাধারণভাবে সাজানো—চারিদিকে কেবল বইয়ের আধিক্য।

ডাঃ চ্যাটার্জি বিবেকানন্দের বই পড়িতেছিলেন।

বাহির হইতে দরজার কড়া নাড়ার শব্দ হইল

চ্যাটার্জি। ভেতরে আসুন।

অতুলের প্রবেশ—দাম্ভিক উগ্র চেহারা

অতুল! এস! এস! তোমার কথাই আমি অহরহ মনে করছি। আমি চাকরি ছেড়ে দিয়েছি তুমি শুনেছ! বস—তুমি বস।

অতুল বসিল

আই হ্যাভ রিজাইনড।

অতুল। শুনেছি।

চ্যাটার্জি। এইবার তুমি এসেছ—এখন আমি নিশ্চিন্ত।

অতুল। আই.সি.এস. কমপিটিশানে আমি নমিনেশান পাই নি। দিস্ ওয়াজ মাই লাস্ট চান্স। বয়সের বাধায় আর আমার পরীক্ষা দেওয়া চলবে না।

চ্যাটার্জি। আই অ্যাম গ্ল্যাড—অতুল, নমিনেশান যে তুমি পাও নি এতে আমি সুখী হয়েছি। তোমাদের মত শক্তিমান ছেলে দাসত্বের নাগপাশেই যদি নিজেকে আবদ্ধ করে শক্তিকে পঙ্গু করে রাখবে তবে দেশের সেবা করবে কারা? আই অ্যাম গ্ল্যাড—অতুল, এতে আমি একবিন্দুও দুঃখিত হই নি।

অতুল। দুঃখ আমি পেয়েছি। কিন্তু সে দুঃখকে জয় করব আমি। আমি স্থির করেছি আমি ইংল্যাণ্ড যাব। ইঞ্জিনীয়ারিং পড়ব আমি।

চ্যাটার্জি তাহার মুখের দিকে চাহিলেন

চ্যাটার্জি। ইংল্যাণ্ড যাবে? ইঞ্জিনীয়ারিং পড়বে? কিন্তু—এ কি অতুল! (খুব কাছে এসে মুখের দিকে চেয়ে) তোমার মুখে চোখে এত ক্লান্তি? নিশ্চয় তোমার কিছু খাওয়া হয় নি।

রমা। অতুলবাবু? কখন এলেন?

চ্যাটার্জি। অতুলের খাওয়া হয় নি রমা, শিগগির কিছু খাবার ব্যবস্থা কর মা!

রমা। আপনার কি অসুখ করেছে?

চ্যাটার্জি। শুনছ রমা, অতুল এখনও খায় নি—আর তুমি—হোয়াট ইজ ব্যাড—খাবার নিয়ে এস শিগগির। দাঁড়াও, সকলবেলায় আমি কিছু খেয়েছি না কি বল তো?

রমা। (হাসিয়া) গরম মুড়ি যে খেলে বাবা!

চ্যাটার্জি। ও ইয়েস! মুড়িগুলোর মধ্যে কিন্তু সার পদার্থ কিছু নেই। এই খেয়ে আধ ঘণ্টার মধ্যে ফের খিদে পায়। গরম শিঙাড়ার ব্যবস্থা কর দেখি এবার। বুঝলে?

[রমার প্রস্থান

চ্যাটার্জি। শোন অতুল, আমি কি ঠিক করেছি শোন। আনুভেলড্ ইণ্ডিয়ার প্রতিবাদ লিখব আমি। পড়েছ তুমি বইখানা? পড় নি? সদ্য বেরিয়েছে—তুমি পড় নি। পড়লে তোমার মাথায় আগুন জ্বলে যাবে। অনন্যকর্মা হয়ে আমি এর প্রতিবাদ লিখবার জন্যে কলেজের কাজে রেজিগ্নেশান দিয়েছি। এবার রমাকে তোমার হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে আমার কাজ আরম্ভ করতে চাই।

অতুল। আপনাকে আমি বলেছি আমি ইংল্যাণ্ড যেতে চাই।

চ্যাটার্জি। গুড আইডিয়া; আমার কোন আপত্তি নাই। যতদিন তুমি না ফিরবে, রমা আমার কাছেই থাকবে।

অতুল। আপনি আমাকে কী সাহায্য করতে পারেন ?

চ্যাটার্জি। কী সাহায্য বল ?

অতুল। অর্থ সাহায্য। ইংল্যাণ্ড যেতে হলে অর্থের প্রয়োজন। আমার অবস্থা আপনি জানেন।

চ্যাটার্জি। (কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া) তুমি আমায় লজ্জা দিলে অতুল। (ড্রয়ার খুলিয়া ব্যাঙ্কের পাশ বই খুলিয়া) এই দেখ আমার সঞ্চয়, সম্বল মাত্র পাঁচ শো টাকা।

অতুল চুপ করিয়া বসিয়া রহিল

এতে যদি তোমার কোন সাহায্য হয় আমি দিতে পারি। হ্যাঁ, আরও আছে, রমার গায়ে সামান্য কয়েকখানা গয়না, তাও তুমি নিতে পার।

অতুল চুপ করিয়া রহিল

অতুল।

অতুল। বলুন।

চ্যাটার্জি। হোয়াট এল্স্ ক্যান আই ডু ফর ইউ মাই বয় ? আর কী করতে পারি আমি, বল ?

অতুল। পারেন। রমার দায়িত্ব থেকে আপনি আমায় নিষ্কৃতি দিতে পারেন।

চ্যাটার্জি। (সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন) অতুল !

অতুল। হ্যাঁ, রমার দায়িত্ব থেকে আপনি আমায় নিষ্কৃতি দিতে পারেন।

অতুল অসঙ্কোচে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল

চ্যাটার্জি। কী বলছ তুমি অতুল !

অতুল। আমার অবস্থা আপনি জানেন। আমার আশা ছিল আই. সি. এস. কমপিটিশানে আমি খুব উচ্চস্থান অধিকার করব। সেই ভরসাতেই আপনাকে কথা দিয়েছিলাম। কিন্তু আজ আমি নিজেই পড়েছি অথৈ সমুদ্রে। এর ওপর রমার দায়িত্ব আমি কী করে গ্রহণ করব ? আপনি আমায় মুক্তি দিন।

চ্যাটার্জি। বস অতুল, বস। এতক্ষণে তোমার আজকের মন আমি বুঝতে পারছি। আই. সি. এস. কমপিটিশানের ব্যর্থতায় তুমি আঘাত পেয়েছ। কিন্তু ভেঙে পড়লে তো চলবে না, মাই বয়। ফেলিয়োরস্ আর পিলারস্ অব সাক্সেস্। আমি বলছি আই. সি. এস-এর চেয়েও তুমি বড় হবে, ইউ উইল বি এ নেশন-বিল্ডার। বিপুল

পাণ্ডিত্য অর্জন করেছ তুমি, সুন্দর স্বাস্থ্য তোমার, ভবিষ্যতের জন্য তোমার চিন্তিত হওয়া উচিত নয় অতুল।

অতুল তিক্ত হাসি হাসিল

তা ছাড়া অতুল, রমাকে আমি লেখাপড়া শিখিয়েছি; সেই সঙ্গে আরও একটা বড় শিক্ষা দিয়েছি—দারিদ্র্যকে সে ভয় করে না, দুঃখকে সে হাসিমুখে উপেক্ষা করতে পারে, তোমার সকল দুঃখ-কষ্টের ভাগ সে হাসিমুখে বরণ করে নেবে।

অতুল। কিন্তু আমি? আমি তাকে কোন মুখে দুঃখ-কষ্টের বোঝা তুলে দেব? কোন মুখে বলব এই পৃথিবীর এই অগাধ অপরিমেয় ঐশ্বর্য-বিলাস-সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে তোমার অধিকার নাই, ওদিকে তুমি চেয়ে দেখো না। আমাকে মাফ করবেন, আমি তা পারব না। আমার স্ত্রীকে আমি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য-সম্পদের মধ্যে অধিষ্ঠিত দেখতে চাই। আমার জীবন সহস্রের মধ্যে মাথা উঁচু করে বড় হয়ে উঠবে এই আমার আশা। বর্তমান অবস্থার মধ্যে আমার পক্ষে বিবাহ করা অসম্ভব—আমাকে মার্জনা করবেন।

চ্যাটার্জি। ভগবান তোমাকে মার্জনা করুন অতুল। আমার মার্জনা-অমার্জনায় তোমার কিছু যাবে আসবে না।

অতুল চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল

কালই পড়ছিলাম—ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একখানা কুৎসাপূর্ণ বইয়ে একজন বিদেশী লিখেছে—এই বাংলাদেশ সম্বন্ধেই লিখেছে—In Bengal, of late years, several cases have become public of girls committing suicide at the approach of marriageable age to save their fathers the crashing burden of their marriage dowry. It is pity—a great pity. অতুল, তুমিই সেটা প্রমাণ করে দিলে।

অতুল। না—পণ আমি চাই নি, পণ আমি চাইব না। কিন্তু দারিদ্র্যকে আমি ঘৃণা করি। রমাকে আমি স্নেহ করি। তাই তাকে নিয়ে নিষ্ঠুর দারিদ্র্যের মধ্যে সংসার পাততে আমি পারব না। আর নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে আমি হত্যা করতে চাই না। তাই আমি আপনার কাছে মুক্তি চাই।

রমা জলখাবার লইয়া প্রবেশ করিল

রমা। (থালাখানি টেবিলের উপর নামাইয়া দিল) খান অতুলবাবু। বাবা, তোমার খাবার এখন আনলাম না। তুমি তো এখন খেতে পারবে না। খান অতুলবাবু।

অতুল। (কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া) আবার আপনাকে বলছি, আপনি আমাকে মার্জনা করবেন, আমি চললাম।

দ্রুতপদে রঙ্গমঞ্চের প্রান্ত পর্যন্ত চলিয়া গেল

রমা। দাঁড়ান অতুলবাবু! দাঁড়ান।

অতুল দাঁড়াইল

বাবা মুখ ফুটে আপনাকে মুক্তি দিতে পারেন নি। কিন্তু আমি আপনাকে মুক্তি দিচ্ছি।

অতুল। আমাকে তুমি মার্জনা কর রমা।

রমা। তাও করেছি। মুখ ফুটে চাইবার আগেই করেছি। দুর্বল করুণার পাত্র যারা—তাদের ওপর রাগই যে করা যায় না, তাই চাইবার আগেই তারা মার্জনা পেয়ে থাকে। আপনি কিন্তু খেয়ে যান।

অতুল। না, করুণার পাত্র বলে এ থেকেও তুমি আমায় মার্জনা কর।

[প্রস্থান

রমা জলখাবারের থালাটা উঠাইয়া লইয়া চলিয়া যাইতেছিল

চ্যাটার্জি। রমা!

রমা। আসছি বাবা, খাবারগুলো কুকুরটাকে দিয়ে আসি আগে।

ভিতরে গিয়া রমা পুনরায় ফিরিয়া আসিল

বল বাবা!

চ্যাটার্জি। মা!

রমা। (চ্যাটার্জির বক্তব্যের প্রতীক্ষা করিয়া) বাবা!

চ্যাটার্জি। তোকে কী বলব—আমি যে খুঁজে পাচ্ছি না, মা।

রমা। দুঃখ আমি পাই নি বাবা। তোমার আশীর্বাদ আমাকে অমানুষের হাত থেকে রক্ষা করেছে—সেইটে আমার সবচেয়ে বড় সান্ত্বনা।

চ্যাটার্জি। এত বড় ফাঁকি? অতুলের মত শিক্ষিত ছেলের মধ্যে এত বড় ফাঁকি—এ যে আমি কল্পনা করতে পারি না মা! চৈতন্যের দেশ, বিবেকানন্দের দেশ, রবীন্দ্রনাথের দেশ কি অমানুষে ভরে গেল!

রমা। না বাবা। তা হয় না। মানুষ আছে বই কি। তবে মানুষেরা মানুষ বলে নিজেদের জাহির করে বেড়ায় না, তাই অমানুষগুলোই বেশী করে চোখে পড়ে।

চ্যাটার্জি। তোর কথা সত্য হোক। কিন্তু তোকে নিয়ে যে আমি সমস্যায় পড়লাম মা!

রমা। কোন সমস্যা নেই বাবা। রানী-ভবানীর দেশের মেয়ে, রায়-বাঘিনীর দেশের মেয়ে আমি। এ যুগের লেখাপড়া শিখে বাইরের চেহারাই শুধু পালটেছে, কিন্তু তাঁদের যোগ্যতা আমাদেরও আছে। সে যুগে খাঁড়া নিয়ে লোকে যুদ্ধ করত বাবা, তারপর হয়েছিল বাঁকা তলোয়ার, এখন তলোয়ারের চেহারা হয়েছে সোজা। (প্রণাম করিয়া) তুমি আমায় আশীর্বাদ কর বাবা।

চ্যাটার্জি নীরবে তাহার মাথায় হাত দিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

চতুর্থ দৃশ্য

সেবাশ্রমের কক্ষ

পুরানো একখানি ঘর। ঘরের আসবাসের মধ্যে একটা ভাঙা টেবিল, খান দুয়েক পুরানো বেঞ্চ, খান দুই পুরানো চেয়ার। একদিকে একখানা ছোট চৌকি—বেড হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ফার্স্ট এডের বাক্স—কিছু ঔষধপত্র একটি শেল্‌ফে সাজানো। দেওয়ালে প্রকাণ্ড বড় বোর্ড, তাহাতে মোটা হরফে লেখা বিবেকানন্দের বাণী—

"তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলি প্রদত্ত। ভুলিও না তোমার সমাজ, সে বিরাট মহামায়ার ছায়া মাত্র। ভুলিও না—নীচ জাতি, মুর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত—তোমার ভাই।

হে বীর, সাহস অবলম্বন কর। সদর্পে বল, আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই, বল, মুর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই। ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ—ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ। মা, আমার দুর্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।"

এ ছাড়াও দেওয়ালে দুইপাশে দুইখানি চার্ট—মৃত্যুর হিসাব ও দেশের আমদানি-রপ্তানির হিসাব। ঘরখানির মধ্যে দারিদ্র্য সুপরিস্ফুট ; কিন্তু একটি পবিত্র পরিচ্ছন্নতা চারিদিকে উজ্জ্বল মহিমায় বিরাজিত। বেডের বিছানার চাদর পরিষ্কার—আসবাব-পত্র সুশৃঙ্খলার সঙ্গে সাজানো। যতীন ছেলেটি আপন মনে লিখিতেছিল।

(নিখিলেশ একটা পথচারী ছোঁড়ার হাত ধরিয়া প্রবেশ করিল
এবং তাহাকে একটা বেঞ্চের উপর বসাইয়া দিল)

নিখিল। বোস ওইখানে, চুপ করে—ভ-য়ে আকার ল-য়ে ওকার ছ-য়ে একার ল-য়ে একারের মত—মানে ভাল ছেলের মত বোস। হ্যাঁ!

যতীন। ওটা আবার কে?

নিখিল। খুদে শয়তান। একেবারে বিচ্ছু! দেখ না—হাতটা কামড়ে কী করে দিয়েছে। বলব কি হে, ডালকুত্তার বাচ্চার মত হাতে কামড়ে ধরে ঝুলতে আরম্ভ করলে।

যতীন। জোটালে কোত্থেকে?

নিখিল। বল কেন? সেই যে সেই অন্ধ ভিখিরীটা—'আয় বাপ' 'আয় বাপ' বলে পিলে-চমকানো চীৎকার করে ভিক্ষে করে হে—আমি আসছি, দুপুরবেলা পথটায় জনমানব নেই—দেখি সেই ভিখারীটা আর এই ছোঁড়াটা হনুমান আর অহিরাবণের বেটা মহীরাবণের মত যুদ্ধ লাগিয়ে দিয়েছে। অন্ধটার কোমরে গেঁজেতে তার ভিক্ষের টাকা ছিল, ছোঁড়াটা সেইটা ছিঁড়ে নিয়ে পালাচ্ছিল—কিন্তু অন্ধ হলেও শব্দ-ভেদী হাতে ধরে ফেলেছে। ছুটে গেলাম। ছোঁড়াটার কাছে ছিল একটা হাতা কি খন্তার ভাঙা ডাঁট—খপ করে বসিয়ে দিল অন্ধটার মাথায়। মেরেই দে ছুট। বহু কষ্টে ধরলাম। কচকচ করে ডালকুত্তার মত কামড়ায় হে। রমেনকে দিয়ে ভিখারীটাকে পাঠিয়েছি হাঁসপাতালে। (ছোঁড়ার প্রতি) অ্যাই। (ছোঁড়াটা একটু একটু করিয়া বেঞ্চের প্রান্তদেশের দিকে সরিতেছিল) সরে পড়বার মতলবে আছিস বুঝি? (ছোঁড়াটার হাত ধরিয়া একটা জানালার ধারে লইয়া গিয়া) শোন। নীচে রাস্তা দেখতে পাচ্ছিস।

ছোঁড়াটা তাহার মুখের দিকে চাহিল। নিখিল ছেলেটাকে দুই
হাতে তুলিয়া জানালা পার করিয়া বাহিরে ধরিয়া

দিই আলগোছে—এই দোতলা থেকে রাস্তার ওপর নামিয়ে? দিই?

ছোঁড়া। না।

নিখিল। আর পালাবি না?

ছোঁড়া। না।

নিখিল। দেখিস?

ছোঁড়া। হ্যাঁ।

নিখিল। আচ্ছা। (জানালা হইতে লইয়া আসিয়া বেঞ্চে বসাইয়া দিল) বোস তবে চুপ করে। কিছু খাবি?

ছোঁড়া। একটা বিড়ি দাও।

নিখিল। কী!

ছোঁড়া। বিড়ি।

নিখিল। হুঁ! সোনামণি আমার বাপের ঠাকুর! আর কী খাবি? গাঁজা—চরস—মদ।

ছোঁড়া। উঁহু—শুধু বিড়ি খাই।

নিখিল। তবু রক্ষে।

যতীন। ভাগিয়ে দাও, ওকে ভাগিয়ে দাও।

নিখিল। উঁ-হু। যে কামড় ও আমাকে দিয়েছে, ওকে আমি সহজে ছাড়ব না। এস্পার কি ওস্পার একটা করবই। হয় ওকে ভাল করে তুলে সেবাশ্রমের কাজে লাগাব, নয় আমিই শেষ পর্যন্ত ওর সঙ্গে গাঁট কেটে বেড়াব।

যতীন। পাগলামো কোরো না নিখিল, পাগলামো কোরো না।

নিখিল। পেছনের দিকে চাও যতীন, স্বামীজীর মন্ত্রের দিকে চেয়ে দেখ। আমাকে বাধা দিও না, আমি একবার চেষ্টা করে দেখব।

যতীন। (কিছুক্ষণ পরে) কলেজে কী হল?

নিখিল। ফাইন করেছে—না দিলে সাসপেণ্ড করবে। বললে—লজ্জা হয় না তোমার? বললাম—হয়। কিন্তু কবিতা লিখেছি বলে নয়, মেয়েরা অতিরিক্ত পাউডার মাখে বলে লজ্জা হয়। চটে গেল বেজায়।

কথাবার্তার অবসরে ছেলেটা স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে থাকিতে বেঞ্চে শুইল ও ঘুমাইয়া পড়িল

যতীন। যাক, শোন। শক্তিগড়ের বিমল খবর দিয়েছে, আশেপাশে ভীষণ কলেরা হয়েছে। এক সপ্তাহে পঁচিশজন মারা গেছে।

পত্রখানি নিখিলেশের দিকে অগ্রসর করিয়া দিল।

নিখিল। (তাহার মুখের দিকে চাহিয়া পত্রখানি লইল, তারপর পড়িল, পড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল) আরে, ছোঁড়াটা ঘুমিয়ে পড়ল দেখছি! (হাসিয়া) চঞ্চল ছেলে—একটু শান্ত হয়েছে আর ঘুমিয়ে পড়েছে।

কোলে তুলিয়া লইয়া ভিতরের দরজা দিয়া চলিয়া গেল যতীন পত্র পড়িতে লাগিল। রমেন মাথায় ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা অন্ধ ভিক্ষুককে লইয়া প্রবেশ করিল। ভিক্ষুককে বিছানায় শোয়াইয়া দিল

ভিক্ষুক। আমাকে ছেড়ে দেন বাবু, ও আমার কিছু হবে নি। পথে থাকলে আমার দু পয়সা রোজগার হবে।

যতীন। কী হল? হাসপাতাল থেকে নিয়ে এলে কেন ওকে?

রমেন। সামান্য আঘাত। ব্যাণ্ডেজ করেই ছেড়ে দিলে। রাখলে না। রাখা নিয়মও নয়।

ভিক্ষুক। কিছু লাগে নি বাবু, ও আমার কিছু লাগে নি। সেবার বাঁ পা-টার ওপর দিয়ে গাড়ি চলে গেল—আপনি ভাল হল। যা ছিল ছমাস, রোজগার ডবল হয়ে গিয়েছিল। ছেড়ে দেন বাবু আমাকে।

যতীন। বেশ তো, ওবেলায় যাবে। এ বেলাটা এইখানে বিশ্রাম করেই যাও। রমেন, ওকে ওঘরে নিয়ে যাও।

ভিক্ষুক। বাবুমশায়, তবে আমাকে দুখানা রুটি খেতে দেবেন। ভাত খেলে আমার ঘা বাড়বে।

রমেন। আচ্ছা, আচ্ছা—তাই দেব। চল।

[রমেন ও ভিক্ষুকের প্রস্থান]

(রমার প্রবেশ)

(যতীন উঠিয়া দাঁড়াইল)

রমা। নমস্কার।

যতীন। নমস্কার।

রমা। আপনাকে কোথায় দেখেছি বলুন তো ?

যতীন। আমি আপনাকে চিনি। আমরা একসঙ্গে একই কলেজে পড়ি মিস চ্যাটার্জি !

রমা। তা হলে ভালই হয়েছে। ভেবেছিলাম অপরিচিত লোকের কাছে গিয়ে পড়ব। শুনুন—আমি কি জন্যে এসেছি।

যতীন। বলুন।

রমা। আমার বাবা গিয়েছেন বর্ধমান জেলায় এক বন্ধুর বাড়ি। সঙ্গে আমিও গিয়েছিলাম। দেখলাম বন্যায় অঞ্চলটা ভেসে গেছে। বাবার সঙ্গে গ্রামের পর গ্রাম ঘুরে দেখলাম। সেখানে সর্বত্র আপনাদের সেবাশ্রমের নাম শুনলাম। আপনারা সেখানে ফ্লাড রিলিফ-এ গিয়েছিলেন। আপনি গিয়েছিলেন কি ?

যতীন। না। আমি যেতে পারি নি। আমাদের সম্পাদক গিয়েছিলেন, অন্য সভ্যরাও গিয়েছিলেন ?

রমা। আপনাদের সম্পাদক কোথায় ?

যতীন। (হাসিয়া) তিনি ভেতরে আছেন—আসবেন এখুনি।

রমা। আপনারা কি মেয়েদের মেম্বর করেন ?

যতীন। আছেন দু-চার জন।

রমা। তাঁরা কেউ যান নি সেখানে ? মেয়েরা কেউ এসেছিলেন বলে তো সেখানে শুনলাম না।

যতীন। আমাদের মহিলা সভ্যেরা আমাদের অর্থ-সাহায্য করেন—কখনও কখনও সমিতির মিটিংয়ে আসেন—হাতে-কলমে বাইরের কাজ করায় তাঁদের অসুবিধে

আছে, আমরাও কখনও অনুরোধ করি নে। আমরা থাকতে আপনারা কাজ করবেন —সে যে আমাদেরই লজ্জার কথা।

রমা। আমি কিন্তু নিজে কাজ করতে চাই।

(যতীন চুপ করিয়া রহিল)

আপনাদের কি কোন আপত্তি আছে ?

যতীন। মিস চ্যাটার্জি—আপনি কেন এর মধ্যে আসছেন ? আপনারা গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী—আপনাদের স্থান ঘরের মধ্যে—বাইরের কাজের ভার পুরুষের—

রমা। না, ও যুক্তি আমি স্বীকার করি না। এই যুক্তিতেই দীর্ঘকাল আমরা পঙ্গু হয়ে রয়েছি—ঘর, গৃহ, গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ! এ সব ছলনা। আমি মুক্তি চাই, পুরুষের সঙ্গে সকল কর্মে সমান অধিকার চাই। আপনাদের আপত্তি থাকে, আমি চলে যাচ্ছি। আমি নিজে এমনি সংঘ গড়ে তুলব। প্রয়োজন হয় শুধু মেয়েদের নিয়েই গড়ে তুলব।

(নিখিলেশের প্রবেশ—পিঠে হাভারস্যাক ও ওয়াটার বটল্)

নিখিলেশ। সেদিন আমি সেই কবিতাটা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে আগুনে ফেলে দেব রমা দেবী।

রমা। আপনি ?

(দুই পা পিছাইয়া গেল)

নিখিল। আমিই সেবা-সংঘের সম্পাদক। সেদিন আমি নূতন করে কবিতা লিখব আপনাদের বন্দনা করে। বলব কি—আজই ইচ্ছে করছে খাতা-কলম নিয়ে বসে যাই।

রমা। খাতা-কলম নিয়ে যিনি বসেন—তাঁর প্রতি বা তাঁর বন্দনার প্রতি আমার কিছুমাত্র শ্রদ্ধা নেই নিখিলেশবাবু ; তবে আমার সম্মুখে যে মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা আছে। সেদিন আপনাকে নমস্কার করি নি, আজ আপনাকে নমস্কার করছি।

নিখিল ! যাক গে ও কথা। আপনি কি আমাদের সংঘের সভ্য হতে চান ?

রমা। চাই। সমস্ত জীবন—নিখিলবাবু, আমার সমস্ত জীবন আমি এই কাজে উৎসর্গ করতে চাই।

নিখিল। যতীন, রমা দেবীকে আমাদের সভ্য করে নাও। আমি চললাম।

রমা। কোথায় ?

নিখিল। শক্তিগড়। কলেরা হয়েছে সেখানে।

রমা। দাঁড়ান, আমিও আপনার সঙ্গে যেতে চাই। যতীনবাবু, আমাকে কি কিছুতে সই করতে হবে? কত চাঁদা দিতে হবে?

যতীন। চাঁদা? চাঁদা আপনার কম। সইও কিছু করতে হবে না। শুধু অন্তরে অন্তরে শপথ গ্রহণ করতে হবে। কেবল ওই দেওয়ালের দিকে স্বামীজীর স্বদেশ-মন্ত্রের দিকে দেখুন। সমস্ত অন্তর দিয়ে ওই মন্ত্র গ্রহণ করুন।

(রমা মনে মনে পড়িতে পড়িতে সহসা স্ফুটকণ্ঠে বলিতে আরম্ভ করিল, সঙ্গে সঙ্গে যতীন নিখিলেশও যোগ দিল)

"আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই, মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই! ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ—ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ।"

(প্রণাম করিল)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রঙ্গমঞ্চের একপ্রান্ত হইতে অর্ধাংশ পর্যন্ত একটি বাংলো বিস্তৃত। বাংলোটির অর্ধাংশ রঙ্গমঞ্চের পার্শ্বদেশের নেপথ্যে চলিয়া গিয়াছে। সম্মুখে একটি বারান্দা। বাংলোর গায়ে রঙ্গমঞ্চের মধ্যস্থলে একটি ফটক। ফটকের পাশ হইতে রঙ্গমঞ্চের অপর পার্শ্বদেশ পর্যন্ত একটি দেওয়াল। ফটকের পাশেই ছোট একটি টেবিল। টেবিলটি লেবার রেজিস্ট্রারের। বারান্দায় ঘরের দুয়ারের সম্মুখে টুলের উপর বসিয়া একজন তকমা-আঁটা পিওন। ঘরের দরজার মাথায় লেখা 'অফিস'। নেপথ্যে শব্দ উঠিতেছে—ঘং—ঘং—ঘং। তিনবার ঘণ্টার আওয়াজ। একজন হাঁকিল—হোই—টালোয়ান!

পর মুহূর্তেই ইঞ্জিনের শব্দ আরম্ভ হইল।

মুন্সী এখনও আসে নাই। মুন্সীর আসনের পাশেই দাঁড়াইয়া আছে ওভারম্যান—খাকী হাফপ্যান্ট, খাকী হাফ-হাতা কামিজ, বগলে একটা শোলার টুপি। সবই কয়লার কালিতে ময়লা। হাতে একটা মোটা লাঠি এবং খাদের তলায় ব্যবহার্য বাতি। এক পাশ হইতে প্রবেশ করিল একদল 'কামিন', মেয়ে কুলি—সকলেরই হাতে শিকে লাগানো বড় কেরোসিনের ডিবে, মাথায় বিঁড়ার উপর ঝুড়ি। তাহারা গান গাহিতে গাহিতে প্রবেশ করিল। তাহাদের মধ্যে প্রবীণা একজন আগাইয়া গেল লেবার-রেজিস্ট্রারের কাছে। অন্য মেয়েরা গান গাহিয়াই চলিল।

বাঁকা চাঁদ পাহাড়ে, রঙে আঁকা আহা রে,
কাজ নাই থাক্ রে।
এই মাটি কালো সে, তবু হয় ভাল সে,
গায়ে তাই মাখ্ রে।
মহুয়ার ফুল রে, শুধু মিছে ভুল রে
মেটে না তো ক্ষুধাও।
কালো মাটি কয়লা, ওরা বলে ময়লা,
জানি গড়ে সুধাও।
দূরে বাঁশি বাজলো, তাহে কিবা কাজ লো
দূরে তারে রাখ রে।
মণিভরা খনিতে, চল্ মণি গণিতে,
আছে কত লাখ রে॥

ওভারম্যান কুড়ারাম ; কি গো সখির মা, নামবি নাকি খাদে ? অ্যাঁ ?

প্রৌঢ়া। হ্যাঁ গো। মরদরা সব নেমেছ সেই কখন ; কয়লা কেটে ডাং করেছে এতক্ষণে। বোঝ দিব কখন ? মুন্সীবাবু কই গো ? গেল কোথা ?

কুড়ারাম। আসছে আসছে। হোই—কানাই ! কানাই হে।

প্রৌঢ়া। হাঁ গো বাবু, কাল তুমি ভক্তার দলকে মদ দিলে, খাসী দিলে। আমাদিগে দিলে না কেনে ?

কুড়া। দিব দিব। আজ দিব। কাল উদিগে দিয়েছি—আজ তোদের পালা। খাদ থেকে উঠেই কিন্তু আবার গাড়ি-বোঝাইয়ের কাজে লাগতে হবে। কোম্পানির আজকাল মেলা অর্ডার। অন্নদাতা প্রভু। বুঝলি সখির মা—না করলে হবে কেনে ? অ্যাঁ।

প্রৌঢ়া। হ্যাঁ—তা বটে, ঠিক বটে বাবু।

কুড়া। হ্যাঁ—ঠিক বটে বাবু। হুঁ—হুঁ ! এইবার কি হয় দেখ না সখির মা ! জামাইবাবু বিলাত থেকে মাইনিং শিখে এল। এইবার কি হয় দেখ না ! এ ফিল্ড-এ ফার্স্ট নম্বর কলিয়ারি। খাদের নীচে বিজলী বাতি হবে। তোদের ধাওড়ায় হবে। হুঁ—হুঁ ! হুঁ—হুঁ ! দেখ না কি হয়। তবে চুপি চুপি একটি কথা তোকে বলে দি সখির মা। আর চুরি করে কয়লা কাটিস না যেন ! খবরদার ! হুঁ—হুঁ—আর সে দিন নাই বাবা। বিলাতফেরত জামাইবাবু মালিক এখন। একেবারে শেলেদা বাঘ।

প্রৌঢ়া। হুঁ। তুর মিছে কথা। ওই সোনার পারা চেহারা—ওই আবার বাঘ হয় ! মিছে কথা বলছিস তু।

(আফিস হইতে বাহির হইয়া আসিল অতুল। খাকী হাফপ্যান্ট, শার্ট ইত্যাদি পরনে)

অতুল। ওভ্যারম্যান বাবু।

(কুড়ারাম আঁতকাইয়া উঠিয়া প্রায় ছুটিয়া আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইয়া দুলিতে লাগিল। এ দোলা তাহার অভ্যাস)

কুড়ারাম। আজ্ঞা, জামাইবাবু।

অতুল। মুন্সীবাবু কোথায় গেলেন ? কামিনরা এখনও দাঁড়িয়ে কেন ?

কুড়ারাম। আসছে আজ্ঞা, এখনি আসছে। কানাই হে ! ও কানাই !

(আবার দুলিতে লাগিল)

(কানাইয়ের প্রবেশ)

কানাই। বাপরে বাপরে বাপরে, আচ্ছা বিশকুণী হাঁক—(অতুলকে দেখিয়া লোকটা যেন পাথর হইয়া গেল। পর মুহূর্তে সেলাম করিয়া বলিল) ভারি জল তেষ্টা পেয়েছিল স্যার !

অতুল। এইখানে কুঁজো-গেলাস রাখবেন আজ থেকে। কামিনদের নাম রেজিস্টারে এণ্টার করে নিয়ে যেতে দিন ওদের।

(মুন্সী তাড়াতাড়ি গিয়া চেয়ারে বসিল। মেয়েরা আগাইয়া গেল।
নেপথ্যে ঘণ্টার শব্দ হইল)

মুন্সী। ঠাণ্ডারামের দল তো? নাম আমি লিখে রেখেছি। সবাই এসেছিস তো?

প্রৌঢ়া। হঁ্যা গো। ঘরে বসে থাকলে পয়সা দিবি তুরা? (মেয়েদের প্রতি) আয় গো! সব আয় গো!

(গানের এক লাইন গাহিতে গাহিতে মেয়েরা
ফটক দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল)

অতুল। (মেয়েদের চলিয়া যাইবার পর) ওভারম্যানবাবু!

কুড়ারাম। আজ্ঞা জামাইবাবু?

অতুল। কাল আপনি খাদের কুলিদের মদ আর খাসীর দাম দিয়ে ওভার-টাইম খাটিয়ে লোডিং করিয়েছেন?

কুড়া। আজ্ঞা জামাইবাবু! বেশী অর্ডার আছে—পঁচিশখানা গাড়ি লেগেছে—

অতুল। থামুন আপনি। শুনুন—ভবিষ্যতে আর এমন করবেন না, যেটুকু আপনার ডিউটি তার বেশী কোম্পানি আপনার কাছে প্রত্যাশা করে না। ঘড়ির ছোট কাঁটাটা যদি বড় কাঁটার কাজ করতে চায় তবে সেটা চলতে গিয়ে অচল হয়ে যায়। সমস্ত দিন কুলিগুলো খেটেছে—রাত্রে আবার তাদের মদ-মাংস খাইয়ে কাজ করিয়েছেন আপনি! তাদেরও মানুষের শরীর। আমার কথা বুঝেছেন আপনি?

কুড়া। আজ্ঞা হঁ্যা জামাইবাবু!

অতুল। হঁ্যা, কথাটা মনে রাখবেন।

[প্রস্থান

কুড়া। কানাই, কুঁজো-গেলাস এনেছিস ভাই? উঃ, বুকটা শুখায়ে গেল রে।

কানাই। কুঁজা কুমার-বাড়িতে, গেলাস বাজারে, জল নদীতে। কুঁজা-গেলাস! বিষ নাই, তার কুলার পারা চক্করটি আছে। ঘর-জামাই—

কুড়ারাম। চুপ চুপ!

কানাই। চুপ? চুপ করতে বলছিস? (কাঁদিয়া ফেলিয়া খাতাখানা খুলিয়া দেখাইল, তাহাতে কালি পড়িয়া গেছে) এই দেখ কী হল!

কুড়ারাম। এই মরেছিস রে, কালি ফেলাইলি কি করে?

কানাই। তুমাকে দিলে ধমক, আমি উঠলাম চমকায়ে আর দোয়াতটি গেল উলটায়ে। এখন এ আমি কী করি বল দেখি ভাই? বাঘের মত এসে ধরবেক মাইরি।

তখন যদি বলি তোমার ধমকে ইটি হয়েছে স্থায়—মানবেক শালা? এগুলেও নিব্বংশের বেটা, পিছালেও তাই। ই আমি কি করি বল দেখি ভাই?

কুড়ারাম। দাঁড়া ভাই, জল খেয়ে আসি। গলা আমার শুকায়ে গেল।

কানাই। আমার লেগেও এক গেলাস আনিস ভাই।

(কানাই থুথু দিয়া আঙুল ঘষিয়া কালি তুলিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। নেপথ্যে হর্নের শব্দ)

কুড়ারাম। ওরে বাবারে! রায়বাহাদুর এলেন লাগছে। অন্নদাতা প্রভু, আয় আয় কানাই—সেলাম দিয়ে আসি, দেখে আসি।

[উভয়ের প্রস্থান

(রায়বাহাদুর ও অতুলের প্রবেশ)

রায়। এই আমার স্বপ্ন অতুল। এ আমার সম্পত্তি নয়, সম্পদ আহরণের ক্ষেত্র নয়, এ আমার স্বপ্নের ভারতবর্ষের প্রতীক। বিংশ-শতাব্দীর নূতন ভারতবর্ষ। যন্ত্রশিল্পে সমৃদ্ধ—বিজ্ঞানবুদ্ধিতে প্রদীপ্ত। আমি নিজে হাতে গড়েছি এই ক্ষুদ্র অংশটুকু। এখন তোমার হাতে ভার তুলে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত। একে তুমি প্রসারিত কর, বাড়িয়ে তোল।

অতুল। প্রাণ দিয়ে আপনার স্বপ্নকে সফল করবার চেষ্টা করব আমি। আপনি আমাকে সন্তানের আসন দিয়েছেন, মর্যাদা দিয়েছেন, স্নেহ দিয়েছেন, আমি তার অমর্যাদা করব না।

রায়। জানি অতুল, সে কথা আমি জানি। জান অতুল, নিঃস্ব রিক্ত হাতে সংসারে পথে বেরিয়েছিলাম। খালি মাথায় রোদে পুড়ে, জলে ভিজে ডিস্ট্রিক্টবোর্ডের ঠিকেদারি নিয়ে কাজ করিয়েছি। ছাতা কিনি নি পয়সা খরচ হবে বলে। সেখান থেকে এলাম কলকাতা। খিদিরপুর ডকে মালখালাসের কাজ নিলাম। সেখানে থেকে এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট, তারপর শুরু করেছি কলকারখানা—কলিয়ারি নিয়ে কাজ। পৃথিবীতে মানুষ অনেক দেখেছি। মানুষ চিনতে আমার ভুল হয় না। তুমি যেদিন ক্লান্ত দেহে, মলিন পোশাকে আমার সামনে এসে দাঁড়ালে, সেইদিন তোমাকে চিনতে আমার ভুল হয় নি। আমি তোমায় চিনেছিলাম, তাই নিঃসংশয়ে তোমার হাতে আমার সুনন্দাকে তুলে দিয়েছি। আমি ভুল করি নি।

(সুনন্দার প্রবেশ)

সুনন্দা। বাবা!

রায়। মামি, মাই মাদার—সুনি—সুনন্দা! মা জননি!

সুনন্দা। আমি তোমার জন্যে বসে আছি বাবা, তুমি কলকাতা থেকে আসছ—কিন্তু তুমি এসে আপিসে বসে আছ। কতদিন পর এলে বল তো!

রায়। কতদিন পর? একমাস!

সুনন্দা। একমাসই কি কম বাবা?

রায়। শোন অতুল, পাগলী কি বলে শোন! ওরে মা, জীবন-যুদ্ধে পুরুষ ছুটবে দেশে-দেশান্তরে—যুদ্ধ জয় করে সে ফিরবে সেই প্রতীক্ষাতেই তো আনন্দ তোদের! এত উতলা হলে চলবে কেন?

সুনন্দা। উতলা? না বাবা, উতলা আমি হই না। মা যখন মৃত্যুশয্যায় তুমি তখন বম্বেতে। মা উতলা হন নি। মাকে বলেছিলাম—বাবা যে এখনও এলেন না মা। মা বলেছিলেন—উতলা হোস নে সুনন্দা—কখনও যেন উতলা হোস নে। আমি উতলা হই নে বাবা!

অতুল। সুনন্দা, কী সব বলছ তুমি?

সুনন্দা। তুমি ওঁকে জিজ্ঞেস কর বাবা। আনি কখনও উতলা হই নে। সকালে বেরিয়ে আসেন—খাদের নীচে নামেন, বাড়ি ফিরে খাবার সময় হয় না, খাদের নীচে খাবার পাঠিয়ে দি; জিজ্ঞেস কর ওঁকে—কোনদিন উতলা হই নে আমি।

রায়। আচ্ছা—আচ্ছা—ঝগড়াতে কাজ নেই। চল, তোর দরবারে যাই চল।

সুনন্দা। না বাবা, তোমার কাজ থাকলে তুমি শেষ করে এস।

[প্রস্থান

রায়। অতুল! সুনন্দাকে ঠিক আমি বুঝতে পারলাম না।

অতুল। না না, সুনন্দা সম্বন্ধে আপনি চিন্তা করবেন না। ওর প্রকৃতি বড় স্নিগ্ধ, বড় শান্ত।

রায়। ওই—ওই আমার ভয় অতুল। বড় স্নিগ্ধ, বড় শান্ত! ওর মা ছিল ওই রকম। জীবনে কোনদিন কোন অসন্তোষ প্রকাশ করে নি, কিন্তু তার মৃত্যুর পর যতবার তার মুখ আমি স্মরণ করি ততবার আমি শিউরে উঠি—মনে হয় পুঞ্জীভূত অতৃপ্তি অসন্তোষ তার চোখের দৃষ্টিতে ফুটে রয়েছে, মনে হয় দীর্ঘদিন শ্যামল তৃণক্ষেত্র ভ্রম করে একটা আগ্নেয়গিরিকে বুকে আঁকড়ে ধরেছিলাম।

অতুল। আপনি ভাববেন না, সুনন্দাকে এবার আমি কাজ দেব। কুলিদের ছেলেদের জন্যে চাইল্ড ওয়েলফেয়ার করব, মেয়েদের জন্যে মেটারনিটি হোম করব—তার কাজের ভার দেব সুনন্দার উপর।

রায়। গুড—খুব ভাল আইডিয়া। এস, আর দেরি কোরো না। সুনন্দা অভিমান করে গেল বোধ হয়।

অতুল। না—না। গিয়ে দেখবেন সে বইয়ের মধ্যে মগ্ন হয়ে বসে আছে।

রায়। হ্যাঁ, পড়তে ও বরাবরই ভালবাসে। কিন্তু—

অতুল। কিন্তু কী ?

রায়। ওটাও বোধ হয় ওর পক্ষে ভাল নয়। তোমার কাছে আমি গোপন করি নি। ছেলেবেলায় ওর সম্বন্ধ করেছিলাম নিখিলেশ বলে একটি ছেলের সঙ্গে। সে কবিতা লিখত—গল্প লিখত কাগজে। সুনন্দার মা সেই সব কাগজ কিনতেন। তা থেকেই—। (আক্ষেপের স্বরে) সেই—সেই আমার সর্বনাশ করে গেছে।

অতুল। চলুন—আপনি বাংলোয় চলুন।

[উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

যতীন সেবাসংঘ আপিসের কাজ করিতেছে। রমা প্রবেশ করিল। তাহার এক কাঁধে একটা ঝোলা, অন্য কাঁধে একটা ওয়াটার বটল। তাহার সঙ্গে প্রবেশ করিল বিছে। তাহার বেশভূষা পরিচ্ছন্ন। রমা আসিয়া ঝোলা ও ওয়াটার বটল রাখিয়া আসিয়া একটা চেয়ারে বসিল। বিছে ভিতরের দিকে চলিয়া গেল।

রমা। আমার অভিযোগ আছে যতীনবাবু।

যতীন। অভিযোগ ? কী হয়েছে মিস চ্যাটার্জি ?

রমা। আপনি নিজে কী কিছু বুঝতে পারেন না যতীনবাবু ? এ পৃথিবীতে গতিই জীবন। যার মধ্যে গতি নেই সে মৃত—সে জড়। আমাদের সংঘ কি চলছে ? সে কি এক জায়গায় স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে নেই ?

যতীন। আপনার কথাটা আংশিকভাবে সত্য রমা দেবী।

রমা। আংশিকভাবে ? (হাসিল) সংসারে আপনি সত্যকারের বন্ধু যতীনবাবু। বন্ধুর ত্রুটি ঢাকবার জন্য সত্যকেও আপনি পূর্ণভাবে স্বীকার করতে পারছেন না। নিখিলেশবাবুর ত্রুটি সম্বন্ধে আপনি আমার মতই সচেতন। নিখিলেশবাবুর জন্যই আজ সংঘের এই অবস্থা।

যতীন। নিখিলেশ নিজেও এ সম্বন্ধে সচেতন মিস চ্যাটার্জি।

(নিখিলেশ পিছনে দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল)

সে আমাকে বার বার বলেছে—যতীন তুই বরং সংঘের ভার নে। আমি পথ খুঁজে পাচ্ছি না।

রমা। পথ খুঁজে পাচ্ছেন না ?

(নিখিলেশ সামনে আসিয়া ধীরে ধীরে বসিল)

নিখিল। সত্যই পথ আমি খুঁজে পাচ্ছি না রমা দেবী।

রমা। কিন্তু—।

নিখিল। কিন্তু কি রমা দেবী? বলুন।

রমা। থাক নিখিলেশবাবু—শুনলে আপনি আঘাত পাবেন।

নিখিল। আঘাত আমি গায়ে মাখি নে রমা দেবী। ও সম্পর্কে আমার মনের চামড়ায় গণ্ডারের চামড়ার অপবাদ আছে। আপনি স্বচ্ছন্দে বলুন।

রমা। কথাটা সত্য। চামড়াটা পাতলা হলে আজ আপনাকে রাশি রাশি ব্যর্থ প্রেমের কবিতা লিখে হা-হুতাশ করতে হত না। অনেক আগেই বাল্যপ্রেম অনুভব করতে পারতেন। তাতে দেশও উপকৃত হত। জীবন সার্থক হলে মানুষ অনেক কথা শুনতে পেত সাহিত্যিক নিখিলেশবাবুর কাছে।

যতীন। আপনার কথায় আমি প্রতিবাদ করব রমা দেবী। নিখিলেশের কবিতা তো প্রেমের কবিতা নয়। বেদনার কবিতা।

রমা। সে বেদনা ব্যর্থ প্রেমের বেদনা যতীনবাবু। আমি পূর্বেই বলেছি তো সংসারে আপনি সত্যকারের বন্ধু।

নিখিল। শুনুন রমা দেবী! আজ আপনাকে কতকগুলি ঘটনার কথা বলব। আপনার কথার উত্তরে নয়; বলবার সময় হয়েছে, আপনি শুনবার যোগ্যতা অর্জন করেছেন বলে বলব।

রমা। তার অর্থ?

যতীন। আমাদের সংঘের একটি নিয়ম আছে রমা দেবী। সে নিয়মটি হল—সংঘের বাইরের বিভাগে তিন বৎসর কাজ করার পর বিশ্বাসভাজন সভ্যকে আমরা ভিতরের বিভাগের কথা বলি, সম্মতি থাকলে গ্রহণ করি। সেবার বিভাগটি আমাদের বাইরের বিভাগ।

রমা। কী বলছেন যতীনবাবু?

(সে উত্তেজনায় উঠিয়া দাঁড়াইল)

যতীন। বসুন রমা দেবী।

রমা। (বসিল) ভিতরের বিভাগে কি—আপনারা বিপ্লবী।

নিখিল। ঠিক অনুমান করেছেন—আর অনুমান করা কিছু কঠিনও নয়। আমাদের দেশে স্বামীজীর সেবাধর্ম থেকেই বিপ্লবীদলের জন্ম হয়েছে। আমরা অনেক দূর এগিয়েছিলাম—অনেক কল্পনা করেছিলাম। আয়োজনও করেছিলাম। কিন্তু—

রমা। কিন্তু? কী কিন্তু নিখিলবাবু? আমায় বিশ্বাস করতে পারছেন না?

নিখিলেশ। না, আপনাকে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন নয়! প্রশ্ন আমাদের নিজেদের বিশ্বাসের প্রশ্ন। ১৯০৫ সাল থেকে ১৯৩০ সালের চট্টগ্রাম পর্যন্ত আয়োজন আমাদের

ব্যর্থ হয়েছে। পথ খুঁজছিলাম—অত্যন্ত সংগোপনে পথ খুঁজছিলাম। কিছুদিন আগে প্রাচীনকালের এক বিপ্লবী নেতার সঙ্গে দেখা হল, তিনি বললেন—ও পথ নয়। জিজ্ঞাসা করলাম তবে পথ কি? তিনি বললেন—পাই নি বলেই সন্ন্যাস নিয়েছি।

রমা। কিন্তু পথ তো পড়ে রয়েছে সামনে—হাতছানি দিয়ে ডাকছে—আপনারা চোখ বন্ধ করে বসে থাকলে পথের ইঙ্গিত দেখতে পাবেন কি করে নিখিলেশবাবু?

নিখিলেশ। জানি আপনি কোন পথের কথা বলছেন—

রমা। হ্যাঁ, গণবিপ্লবের কথা বলছি। এত বড় ইতিহাস—এত বড় সার্থকতা—এর দিকে পিছন ফিরে বসে থাকলে কোন কালে পথ পাবেন না।

নিখিলেশ। সেই পথেই যাত্রা করতে উদ্যত হয়ে পা বাড়িয়েও আমি থমকে দাঁড়িয়েছি রমা দেবী।

রমা। তার কারণ সম্ভবতঃ আপনার দুর্বলতা নিখিলেশবাবু। আপনার জীবনের ব্যর্থতা। যার জন্য আপনি রাশি রাশি প্রেমের কবিতা—যাকে যতীনবাবু বললেন—বেদনার কবিতা, তাই লিখেছেন এবং একটি আধ্যাত্মিক বেদনা-ব্যাধিতে পঙ্গু হয়ে পড়েছেন।

নিখিলেশ। না। তারও কারণ বলি শুনুন। আপনার বাবা সেদিন তাঁর বইয়ের একটি অধ্যায় আমাকে শোনালেন। আমাকে নূতন করে চেনালেন ভারতবর্ষকে। তিনি নিজেও এ ভারতবর্ষের রূপকে প্রকাশ করবার ভাষা খুঁজে পান নি। মহাকবির ভাষা উদ্ধৃত করে দিয়েছেন—

"নদীতীরে রুদ্র রৌদ্র বিকীর্ণ বিস্তীর্ণ ধূসর প্রান্তরের মধ্যে কৌপীনবস্ত্র পরে তৃণাসনে একাকী মৌন বসে আছে। বলিষ্ঠ ভীষণ, দারুণ সহিষ্ণু, উপবাসব্রতধারী, তার কৃশ পঞ্জরের অভ্যন্তরে প্রাচীন তপোবনের অশোক অভয় হোমাগ্নি এখনও জ্বলছে।" রমা দেবী, এই ভারতবর্ষকে যেদিন থেকে আপনার বাবা আমায় নূতন করে দেখালেন—সেদিন থেকে আমি থমকে দাঁড়িয়েছি।

রমা। তা হলে পিছনের দিকে মুখ ফিরিয়ে অতীতের অন্ধকারের মধ্যে যাত্রা শুরু করুন। সামনে চলার আপনাদের অধিকার নাই।

নিখিলেশ। সেই দ্বিধার মধ্যে আমরা স্তব্ধ হয়ে পড়েছি—এ অভিযোগ আপনার সত্য।

রমা। তা হলে আপনাদের সঙ্গে পথ চলা আমার সম্ভবপর হবে না নিখিলেশবাবু। আপনাদের দলের সংস্রব আমি ত্যাগ করছি। আমায় আপনারা মুক্তি দিন।

নিখিলেশ। শুনুন রমা দেবী, শুনুন।

(অগ্রসর হইয়া গেল)

একটা কথা।

রমা। বলুন।

নিখিলেশ। আপনি উল্কার মত ছুটতে চাচ্ছেন—

রমা। তার কারণ উল্কার বেগ আমার মধ্যে সঞ্চিত রয়েছে। আপনাদের মত আমি ফুরিয়ে যাই নি। আমি থামতে পারি না। আপনারা মৃত—আপনারা ফুরিয়েছেন—আপনারা পাথরের টুকরো হয়ে পড়ে আছেন।

নিখিলেশ। আপনি দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করুন।

রমা। আমায় মানতে পারবেন আপনি?

নিখিলেশ। শুধু আমার কথা নিয়েই আপনার মনে প্রশ্ন উঠল রমা দেবী? ভাল, আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। আনুগত্যের শপথ নিতে প্রস্তুত আছি।

রমা। দলের নেতৃত্ব নিয়েই কলহ বাধে নিখিলেশবাবু। নেতাও যা রাজাও প্রায় তাই। কোশল নৃপতির মত রাজাই বলুন আর নেতাই বলুন, সংসারে বিরল। পরাজিত হয়ে পুনরায় রাজ্যলাভের ষড়যন্ত্র না করে শত্রুর কাছে ধরা দিয়ে নিজের মাথার মূল্য দরিদ্রকে দিতে চান—এমন মানুষ কাব্যেই থাকে। প্রশ্নটা আপনাকে অর্থাৎ পরাজিত দলপতিকেই বিশেষ করে সেই জন্য।

নিখিলেশ। আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছি মিস চ্যাটার্জি, আপনি দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করুন। আমি আপনার আদেশ অবনতমস্তকে স্বীকার করছি।

রমা। বেশ। তাহলে তাই গ্রহণ করলাম আমি। বাইরে সেবা সংঘের কাজ যেমন চলছে তেমনি চলবে। ভিতর থেকে আরম্ভ হোক শ্রমিক-সংগঠন। শ্রমিকপ্রধান অঞ্চলগুলি আমাদের ঘোরার প্রয়োজন আছে। তারই ব্যবস্থা করুন আগে। কালই আমি একটা প্রোগ্রাম আপনাদের দেব। আচ্ছা—আজ চলি। নমস্কার—

[প্রস্থান

যতীন। কাজটা কি ঠিক করলি নিখিলেশ? রমাকে কি তুই ভালবেসেছিস।

নিখিলেশ। (তাহার মুখের দিকে চাহিয়া) তার অর্থ?

যতীন। নারীর কাছে পরাজয় স্বীকার আর আত্মসমর্পণ একই কথা যে!

নিখিলেশ। আমার মনে হচ্ছে—তুই ঈর্ষায় অন্ধ হয়ে পড়েছিস যতীন। রজ্জুকে সর্প ভ্রম করছিস!

(রমেনের প্রবেশ)

রমেন। Hey! বন্দেমাতরম্!

যতীন। রমেন! বন্দেমাতরম্! কোথা থেকে?

রমেন। অনেক দূর থেকে। চল, অনেক কথা আছে।

তৃতীয় দৃশ্য

সুসজ্জিত বাংলোর কক্ষ

সুনন্দা ও রায়বাহাদুর শিবপ্রসাদ।

দেওয়ালে হেনরি ফোর্ড, এডিসন, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের ছবি।

একটি ফ্রেমে বাঁধানো বোর্ডে লেখা—

"নমো যন্ত্র নমো যন্ত্র নমো যন্ত্র।
তব লৌহ-গলন শৈল-দলন অচল চলন-মন্ত্র।
কভু কাষ্ঠ-লোষ্ট্র-ইষ্টক-দৃঢ় ঘন-পিনদ্ধ কায়া,
কভু ভূতল-জল-অন্তরীক্ষ-লঙ্ঘন লঘু মায়া।
তব খনি-খনিত্র-নখ-বিদীর্ণ ক্ষিতি-বিকীর্ণ অন্ত্র,
তব পঞ্চভূত-বন্ধন-কর ইন্দ্রজাল তন্ত্র।"

(রায়বাহাদুর চায়ের টেবিলে বসিয়াছেন। সুনন্দা নীরবে পাশে দাঁড়াইয়া চা তৈয়ারী করিতেছে। সুনন্দা সুন্দরী শান্ত মেয়ে। ঈষৎ দীর্ঘাঙ্গী)।

রায়বাহাদুর। ওয়েস্টার্ন এডুকেশান-এর গুণই এটা। ওদের আমি সহস্রবার প্রণাম করি। সময় ওদের কাছে অমূল্য। কর্মই জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনা।

(সুনন্দা নীরবে চামচ দিয়া চা নাড়িতে লাগিল)

অতুলের শিক্ষা যদি এ দেশেই শেষ হত, তবে ও এতক্ষণ ভক্তিগদগদ হয়ে শ্বশুরের তদ্বিরে ছুটোছুটি করে বেড়াত।

(সুনন্দা একটু মৃদু হাসিল। চায়ের কাপটি সম্মুখে রাখিয়া)-

সুনন্দা। চা, খাও বাবা।

রায়বাহাদুর। অতুলের নার্ভ আমাদের দেশের পক্ষে একস্ট্রা অর্ডিনারি—আই অ্যাম গ্ল্যাড, আমি ভাগ্যবান যে, অতুলের মত জামাই পেয়েছি। নিখিলেশের সঙ্গে তোর বিয়ে হয় নি—সে তোর ভাগ্য, আমার ভাগ্য! কই সুনন্দা, তুই তো চা খাচ্ছিস নে মা?

সুনন্দা। সকালে চা আমি খেয়েছি বাবা!

রায়। আরে এ চা হল আমার নতুন চা-বাগানের চা। খেয়ে দেখ। তুই আবার তার ডিরেক্টর! তুই না খেলে অন্যলোকে খাবে কেন? আর চা কখনও একা খেতে ভাল লাগে? আচ্ছা, আমি তৈরি করে দিচ্ছি তোকে।

সুনন্দা। (হাসিয়া) না—না, আমি তৈরি করে নিচ্ছি বাবা।

রায়। জানিস সুনন্দা, টী কোম্পানী থেকে এবারই আমরা বেশ হ্যাণ্ডসাম্ ডিভিডেণ্ট দিয়েছি। তোর ডিভিডেণ্ডের টাকা পাস নি তুই? অতুল বলে নি তোকে?

সুনন্দা। বলেছেন। আমার নামের শেয়ারের ডিভিডেণ্ট-এর টাকা কড়া-ক্রান্তি হিসেব করে বুঝিয়ে দিয়েছেন ?

রায়। এ পারফেক্ট বিজিনেসম্যান। হি ইজ ওয়াণ্ডারফুল। জানিস মা, কলিয়ারি থেকে একটা বাই-প্রোডাক্ট-এর স্কীম অতুল করেছে, আমি সেটা একজন বড় এক্‌সপার্ট সাহেব ইঞ্জিনীয়ারকে দেখিয়েছিলাম, লোকটা অবাক হয়ে গেল।

(সুনন্দা চুপ করিয়া রহিল)

তাই তো সুনন্দা, তুই তো কিছু বলছিস না মা ? আমি যে একাই বকে যাচ্ছি !

সুনন্দা। কী বলব বাবা ?

শিব। (তাহার মুখের দিকে চাহিয়া) কেন সুনন্দা ?

সুনন্দা। আমি এ সবের কী বুঝি বাবা ?

শিব। কিন্তু তোমায় তো এসব বুঝতে হবে। নইলে তো অতুলকে তুমি বুঝতে পারবে না ! তার প্রতিটি কাজকে তোকে শ্রদ্ধা করতে হবে। তার গৌরবে তোর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠবে—তুই মুগ্ধ হবি। তবে তো তার উৎসাহ বাড়বে, বর্ষার নদীর মত বিস্তীর্ণ হবে, প্রবলবেগে ছুটে চলবে। তুই হাসছিস সুনন্দা ?

সুনন্দা। হাসছি তোমার কথা শুনে।

শিব। কেন ? আমি কি ভুল বললাম ?

সুনন্দা। না বাবা। উপমাটা তুমি ঠিকই দিয়েছ, কিন্তু তাঁর উৎসাহ এমনিতেই বর্ষার নদীর মত। বর্ষার নদী আপনার বেগেই ছোটে ; সে কারও উজ্জ্বল মুখের মুগ্ধদৃষ্টির অপেক্ষা করে না। আবার কুলের ভাঙা ঘরের মানুষের কান্নাতেও তার গতির বেগ কমে না।

শিব। সুনন্দা।

সুনন্দা। (হাসিয়া উঠিল) কেমন ঠকেছ তো তুমি ? পারলে না তো আমার সঙ্গে সাহিত্যের তর্কে ?

শিব। সাহিত্যের তর্ক ?

সুনন্দা। হ্যাঁ।

শিব। তুই সাহিত্যিক খুব ভালবাসিস, না ? খুব বই পড়িস।

(আসিয়া দাঁড়াইলেন বইয়ের সেল্‌ফের ধারে)

বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, কাজী নজরুল, নিখিলেশ—নিখিলেশ—নিখিলেশ—

(বই টানিয়া বাহির করিলেন)

দেবতার নবজন্ম—নিখিলেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। কে নিখিলেশ ? কোন নিখিলেশ ?

সুনন্দা। লেখক নিখিলেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্য পরিচয় তো জানি না।

(শিবপ্রসাদ সরিয়া আসিলেন)

শিব। তুই আর এই সব বইগুলো পড়িস নে সুনন্দা।

সুনন্দা। কেন বাবা ?

শিব। না। আমি পছন্দ করি নে। শুধু হৃদয়—শুধু ভাবাবেগ—শুধু স্বপ্ন—শুধু কল্পনা করা দুঃখ ! দেশের সর্বনাশ করে দিলে ওই বইগুলো।

সুনন্দা। বাবা !

শিব। এইগুলো—এইগুলো। (নিখিলেশের বইগুলি টানিয়া লইয়া) এইগুলো—(ফেলিয়া দিলেন মেঝের উপর এবং বাহির হইয়া চলিয়া গেলেন)।

(সুনন্দা বইগুলি কুড়াইয়া লইয়া সেল্‌ফের উপরে রাখিল)

সুনন্দা। বেয়ারা !

(বেয়ারা আসিয়া দাঁড়াইল)

সুনন্দা। ধর, বইগুলি ধর। (কতকগুলি বই তাহার হাতে তুলিয়া দিল)।

(অতুল ও শিবপ্রসাদের প্রবেশ)

শিব। আজই তুমি এক হাজার টাকার বইয়ের অর্ডার দাও। ভাল ইংরাজী বাংলা বই।

(সুনন্দা তখনও বই বেয়ারার হাতে তুলিয়া দিতেছিল)

অতুল। এ কি ? বইগুলো কী হবে ?

সুনন্দা। (বেয়ারাকে) কেরানীবাবুদের ক্লাবের লাইব্রেরিতে দিয়ে এস, বলবে আমি দান করলাম। বুঝেছ ?

অতুল। সে কি ?

সুনন্দা। ফিরে এসে বাকীগুলো নিয়ে যাবে। সমস্ত বই, সমস্ত ! বুঝেছ। একখানা বইও যেন না থাকে।

শিব। সুনন্দা !

সুনন্দা। যাও তুমি যাও।

(বেয়ারা চলিয়া গেল)

অতুল। কী হল সুনন্দা ?

সুনন্দা। (হাসিয়া) আজ থেকে বই আর পড়ব না ! বাবা বারণ করেছেন।

[প্রস্থান

শিব। ঠিক তার মত। (স্থির দৃষ্টিতে তাহার গমন-পথের দিকে চাহিয়া রহিলেন)।

শিব। ঠিক ওর মায়ের মত। তুমি বোসো অতুল। তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে। সুনন্দার সম্বন্ধে আমি শঙ্কিত হয়ে উঠেছি।

অতুল। সুনন্দার সম্পর্কে ?

শিব। হ্যাঁ। সুনন্দার সম্পর্কে। সুনন্দাকে কি তুমি—?

অতুল। আপনি যা প্রশ্ন করছেন আমি বুঝেছি। সুনন্দাকে আমি অন্তরের সঙ্গে ভালবাসি।

শিব। প্রশ্নটা হয়তো ঠিক হয় নি আমার। সুনন্দার সঙ্গে তোমার—অর্থাৎ সুনন্দার ব্যবহার তোমাকে পীড়া দেয় না অতুল ?

অতুল। আপনি সুনন্দার উপর অবিচার করছেন। হয়তো ভুল বুঝছেন।

শিব। ভুল বুঝেছি ?

অতুল। আমি সকালে উঠি, দেখি সুনন্দা স্নান করে নিজের হাতে আমার জন্যে চা তৈরি করে দাঁড়িয়ে আছে। আমি কাজে বেরিয়ে যাই, দুপুরে ফিরি—সুনন্দা আমার স্নানের ব্যবস্থা করে রাখে নিজের হাতে। পরিবেশন করে নিজের হাতে। আবার বেরিয়ে যাই, ফিরি রাত্রে, সুনন্দা প্রতীক্ষা করে দাঁড়িয়ে থাকে। আমি ক্লান্ত দেহে বিছানায় এলিয়ে পড়ি, সে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়।

শিব। ঠিক তার মত, ওর মায়ের মত। (কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া) কিন্তু এত উদাসীন কেন বলতে পার ? জীবনে কোন দাবি নাই, কোন আকাঙ্ক্ষা নাই—

অতুল। কী নাই সুনন্দার ? কিসের আকাঙ্ক্ষা তার থাকবে ?

শিব। কখনও রাগ করে না—জীবনে কোন উত্তাপ নাই—

অতুল। সুনন্দার প্রকৃতি শান্ত, স্নিগ্ধতাই তার ধর্ম। আপনি তাকে ভুল বুঝছেন !

শিব। ভুল ? (সুনন্দার মায়ের ছবির কাছে গিয়া) দিস্ উওম্যান—এই ভদ্রমহিলাটি অবিকল সুনন্দার মত ছিলেন।

অতুল। এখন আমার কিছু কথা আছে। আপনাকে এতদিন জানাই নি। সন্দেহ হয়েছিল—কিন্তু স্থির সিদ্ধান্ত করতে পারি নি বলে জানাই নি। আজ আমি স্থির সিদ্ধান্ত করেছি। খাদের ভিতর ফায়ার হবার সম্ভাবনা হয়েছে।

শিব। (ছবির নিকট হইতে ঘুরিয়া অতুলের কাছে আসিলেন) কী হবার সম্ভাবনা রয়েছে ? ফায়ার ? আগুন ?

অতুল। হ্যাঁ, আগুন। খাদের ভিতর গরম কিছুদিন থেকেই বেড়েছে। কুলিরা বলেছিল, আমারও মনে হয়েছিল। কিন্তু ম্যানেজারবাবু বলেছিলেন—ওটা কুলিদের মজুরী বাড়াবার একটা ফিকির। মধ্যে মধ্যে এক-আধজন কুলি অজ্ঞান হয়ে পড়েছে।

শিব। এক-আধজন কুলির অজ্ঞান হওয়াটা নিশ্চিত প্রমাণ নয়। অমিতাচারী হতভাগার দল মদ-টদ খায়—তারপর খারাপ শরীরে খাদে নামে—অজ্ঞান হয়। আমার প্রশ্ন ডু ইউ ফীল্ ইট্? তুমি বুঝতে পারছ?

অতুল। আমি তো বললাম—আমি প্রায় স্থির সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছি।

(সুনন্দার প্রবেশ)

সুনন্দা। বাবা।

শিব। (তাহার দিকে তাকাইলেন না, শুধু সেইদিকে হাত তুলিয়া বলিলেন) এখন নয় মা, অত্যন্ত গুরুতর সমস্যার কথা বলছি আমরা।

(সুনন্দা চলিয়া গেল)

প্রতিকারে তুমি কী করতে বল?

অতুল। যেখানে গরম বেশী—আই মীন্ সোর্স লোকেট করে সেই কয়েকটা সুড়ঙ্গ সীল্ করে বন্ধ করে দেওয়া হোক,—আর আরও একটা শ্যাপ্ট কেটে উত্তাপ বের করে দেবার ব্যবস্থা করা হোক।

শিব। (প্ল্যান পাড়িয়া খুলিয়া ধরিলেন) দেখাও তো কোন কোন গ্যালারি তুমি সীল্ করতে চাও?

অতুল। দিস্ ওয়ান—দিস্ ওয়ান—

শিব। তুমি যা বলছ তাতে পশ্চিম দিকের একটা বিরাট অংশ চিরদিনের মত বন্ধ করতে হবে।

অতুল। কিছু মনে করবেন না। না করলে—হয়তো আরও অনেক বেশী অংশ শেষে ছেড়ে দিতে হবে।

শিব। আমার বিবেচনায় শ্যাপ্ট কাটিয়ে কয়েকদিন দেখা হোক। চেষ্টা করে দেখা যাক! তাতে একটার জায়গায় দুটো শ্যাপ্ট কেটে উত্তাপ বেরুবার পথ করে দাও। দেখতে দোষ কি!

(উঠিয়া দাঁড়াইলেন)

আমি নিজে একবার দেখতে চাই।

(কুড়ারাম ওভারম্যানের প্রবেশ)

(আসিয়াই সেলাম করিয়া দুলিতে লাগিল)

কুড়ারাম। আজ্ঞা হজুর, সাত নম্বর ধাওড়াতে একজন কুলি মরেছে, ডাক্তার বলেছে—কলেরা। আর একজনকেও ধরেছে বলছে।

রায়। যে লোকটা মরেছে—তার লাশটা জালিয়ে দাও। যার হয়েছে—তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করো। ডাক্তারকে খবর দাও।

(প্ল্যান দেখিতে লাগিলেন)

অতুল। ওভারম্যান বাবু!

কুড়া। আজ্ঞা জামাই—(বলিয়াই সে স্তব্ধ হইয়া গেল, ঢুলুনি থামিয়া গেল)।

অতুল। আমার মনে হয় যারা কাল রাত্রে মদ-মাংস খেয়ে ওভারটাইম খেটেছে—তাদেরই কেউ কলেরা হয়ে মরেছে। সত্যি কি?

কুড়া। আজ্ঞা হাঁ

অতুল। ঘড়ির ছোট কাঁটা বড় কাঁটার কাজ করতে ছুটলে—কী হয় দেখেছেন?

কুড়া। আজ্ঞা হাঁ।

অতুল। দেখেও আবার আপনি তাই করেছেন? আপনি ওভারম্যান, আপনার কাজ খাদের নীচে। কার কোথায় অসুখ হল—সে দেখবার ভার ডাক্তারের।

কুড়া। আজ্ঞা হাঁ।

অতুল। তবে?

কুড়া। আজ্ঞা জামাইবাবু—ই কুঠির প্রথম থেকে আমি আছি আজ্ঞা, নিজের হাতেই কুঠি গড়েছি। তখন ই সব ডাঙা ছিল, জঙ্গল ছিল—ভালুকসুঙার ডাঙায় ভলুক আসত রাতে। একা এসে আমি—

অতুল। থামুন আপনি। যান এখন। (তবু ওভারম্যান গেল না)

যান—যান।

রায়। (প্ল্যান হইতে মুখ তুলিয়া) যাও—যাও! (কুড়ারাম দুঃখিতভাবে চলিয়া গেল)। (আঙুল দেখাইয়া দিলেন)।

(ওদিকে ঠিক এই সময়েই প্রবেশ করিল সুনন্দা,
হাতে খাবারের থালা)

সুনন্দা। এমনি করেই মানুষকে তাড়িয়ে দিতে হয়?

শিব। তুই এই সময় খাবার নিয়ে এলি সুনন্দা?

সুনন্দা। বেলা যে অনেক হয়েছে বাবা।

শিব। কটা বাজল?

সুনন্দা। একটা বেজে গেছে বাবা।

শিব। ফিরতে অন্তত তিন ঘণ্টা। চারটে বেজে যাবে। এ বেলা আর খাওয়া হবে না মা। এসো অতুল।

সুনন্দা। না বাবা—সে হবে না। খেয়ে যাও। আমি নিজের হাতে রেঁধেছি!

শিব। ছেলেমানুষি কোরো না মা। ডোণ্ট বীহেভ্ লাইক্ এ বেবি।

(স্নেহভরেই হাতে ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়া অগ্রসর হইলেন)

অতুল, জীবনে কখনও ভাগ্যকে স্বীকার করি নি। পুরুষকারকে অবলম্বন করেই চলেছি। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে—সময়টা খারাপ। যা তুমি বলছ, তাতে লক্ষ লক্ষ টাকা—বহু লক্ষ টাকা—হু ক্যান সে—গোটা মাইনটাই নষ্ট হয়ে যাবে না।

[উভয়ের প্রস্থান

সুনন্দা। লক্ষ লক্ষ টাকা বহু লক্ষ টাকা—!

(খাবারের থালাটা জানালা খুলিয়া ফেলিয়া দিল)

হায়রে টাকা! হায়রে মানুষ!

চতুর্থ দৃশ্য

কলিকাতায় ডাঃ চ্যাটার্জির বাড়ি

(চ্যাটার্জি ও রমা)

চ্যাটার্জি। বলুক মা, যে যা বলছে বলুক। তোকে আমি জানি। সেদিন তুই আমাকে বলেছিলি—পুরাকালে অস্ত্র ছিল খাঁড়া, তারপর হয়েছিল বাঁকা তলোয়ার, আজ তলোয়ারের চেহারা হয়েছে সোজা। লোকে আমায় বলে—আমার সংসারজ্ঞান নেই, আমি অন্ধ। অন্ধও যদি হই আমি—তবু আমার স্পর্শ-বোধ তো আছে মা। আমি যে স্পর্শ করে বুঝতে পারছি—আমার সোজা তলোয়ারে একবিন্দু মরচের কর্কশতা কোথাও পড়ে নি। মালিন্যহীন তলোয়ারের ওপর রোদের ঝকমকানি অন্ধ চোখেও যে অনুভব করতে পারি, উত্তাপের স্পর্শ এসে যে চোখে লাগে!

রমা। মনে আমি কিছু করি নি বাবা। কিন্তু আমার এই দুঃখ যে মানুষের এত বিষ?

চ্যাটার্জি। বিষই তো মানুষের স্বভাবের আদিম সম্পত্তি মা। সেই বিষকে অমৃতে পরিণত করাই তো তোমার মনুষ্যত্বের সাধনা। দেবতাদের মধ্যেও কেবল একটি দেবতাই নীলকণ্ঠ। তিনি মঙ্গলের দেবতা। কুৎসাপূর্ণ চিঠিগুলো আমি তখনই পুড়িয়ে ফেলতাম। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল তোকে দেখানো উচিত। আমাকে উপলক্ষ্য করে এ আঘাত তোর উপরেই আঘাত। তাই তোকে না দেখিয়ে পারলাম না। এখন এগুলো—(চিঠি কয়েকখানা তিনি ছিঁড়িয়া পোড়াইয়া দিলেন)।

রমা। (চ্যাটার্জির কাছে আসিয়া দাঁড়াইল) বাবা! তুমি আমায় আশীর্বাদ করো।

(প্রণাম করিল)

চ্যাটা। আশীর্বাদ? (মাথায় হাত দিয়া) আমার সকল আশীর্বাদ তোকে যে অহরহ ঘিরে আছে রমা—নতুন করে কী আশীর্বাদ তোকে করব? বোস মা বোস। নিখিলেশ আজ কদিন আসে নি, না-রে?

রমা। না, আমার সঙ্গে দেখাও হয় নি। আমার মনে হয় বাবা, তিনিও বোধ হয় এমনি ধরনের বেনামী চিঠি পেয়েছেন।

চ্যাটা। হবে। বিশ্বাস তো নেই। কিন্তু সে না এলে যে আমার লেখা এগুচ্ছে না মা। নতুন চ্যাপটার আরম্ভ করেছি—তাকে শোনাতে না পারলে আমার তৃপ্তি হচ্ছে না। চমৎকার বোধশক্তি নিখিলেশের। ওর নতুন বইখানা পড়েছিস রমা? 'দেবতার নবজন্ম'! সুন্দর বই। আমি অবাক হয়ে গেছি মা—ওর দৃষ্টির ভঙ্গি দেখে!

রমা। পড়েছি বাবা।

চ্যাটা। আমার বই কিন্তু পড়িস নে। একদিনও শুনতে চাইলি না—আমি কী লিখেছি!

রমা। তোমার বই অমি আগাগোড়া মুখস্থ বলতে পারি বাবা! তুমি যখন থাক না বাড়িতে, তখন আমি লুকিয়ে লুকিয়ে তোমার বই পড়ি।

চ্যাটা। (উৎসাহে সঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইয়া) তুই পড়িস?

রমা। মুখস্থ বলব বাবা?

চ্যাটা। শুনবি,—আমার নূতন চ্যাপটারের আরম্ভটা একটু শুনবি? শোন—(খাতা খুলিয়া) "শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা"—পৃথিবীর লোককে আমি অমৃতের পুত্র করেছি—হিন্দু মুসলমান—বৌদ্ধ খ্রীষ্টান সে যে ধর্মাবলম্বী হোক, ইণ্ডিয়ান, ইয়োরোপীয়ান, আমেরিকান, কাফ্রি-নিগ্রো, এমনকি অনাবিষ্কৃত অরণ্যের আদিমতম নামহীন জাতি, সে যেই হোক, সব – সব—আমার ভারতের চক্ষে অমৃতের পুত্র, যেহেতু তার সাধনা অমৃতের সাধনা। তোমরা শোন—যারা তোমাদের মধ্যে অমৃতের সন্ধান সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেছে সেই তাদের কথা তোমাদের কথা বলব, শোন।··জানিস রমা, নিখিলেশের পরামর্শেই আমি ইংরেজী বাংলা দুটো ভাষাতেই বইখানা লিখছি! আমার দেশ-বাসীকে বঞ্চিত করে পৃথিবীর লোককে শোনবার জন্যে শুধু ইংরেজীতে লেখার কোন অর্থ হয় না। নিখিলেশের যুক্তি আমি মেনে নিয়েছি।—এরপর ইংরেজীটা একটু শোন—

(নেপথ্যে ডাকপিওন—চিঠি হ্যায় বাবুসাব)

চ্যাটা। কী আশ্চর্য! এদের একটুও সময়-জ্ঞান নেই! দেখ, তো মা চিঠিগুলো!

(রমা বাহিরে গিয়া চিঠি লইয়া আসিল, অনেকগুলি চিঠি)

রমা। এ যে অনেক চিঠি বাবা!

চ্যাটা। আমি আমার পুরানো বন্ধুবান্ধবদের চিঠি লিখেছিলাম রমা। আমার বইয়ের কথা জানিয়ে তাদের কাছে আপীল করেছিলাম। বইখানা ছাপাতে হবে তো! তাঁরাই সব উত্তর দিয়েছেন। (চিঠিগুলি লইয়া খুলিতে খুলিতে) জানিস মা, আমি আরও একটা সঙ্কল্প করে রেখেছি। বল তো দেখি কী সে সঙ্কল্প? দেখি তুই আমার মনের কথা অনুমান করতে পারিস কি না?

রমা। তুমি ইয়োরোপ আমেরিকা ঘুরতে যাবে বাবা, সেখানকার ইউনিভারসিটিতে তুমি বইয়ে যা লিখেছ তাই বক্তৃতা দেবে।

চ্যাটা। নো নো, ইউ গেট এ জিরো। পারলে না তুমি। তুমি একটি প্রকাণ্ড রসগোল্লা পেলে।

(রমা খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল)

চ্যাটা। আমি আমার বইয়ের কপিরাইট তোদের সেবাশ্রমকে দান করব।

রমা। সত্যি বাবা? সত্যি?

(নেপথ্যে জ্যোতির্ময়ী)—কে আছেন বাড়িতে?

চ্যাটা। কে দেখ তো মা, মনে হচ্ছে কোন মহিলা ডাকছেন যেন।

(রমা অগ্রসর হইয়া গেল)

রমা। কে আপনি? ভেতরে আসুন।

(জ্যোতির্ময়ী প্রবেশ করিলেন)

জ্যোতি। এইটে কি বিনোদবাবুর বাড়ি? প্রফেসার বিনোদবিহারী চাটুজ্জে মশায়?

রমা। হ্যাঁ আপনি কে? কোত্থেকে আসছেন?

(জ্যোতির্ময়ী ডাঃ চ্যাটার্জিকে দেখিয়া ঈষৎ ঘোমটা টানিয়া দিলেন)

জ্যোতি। তুমিই বোধ হয় রমা? আমি নিখিলেশের মা। (ডাঃ চ্যাটার্জিকে লক্ষ্য করিয়া) আমি আপনার কাছেই এসেছি।

(নমস্কার করিলেন)

(রমা প্রণাম করিল—জ্যোতির্ময়ী নীরবে মাথার হাত দিয়া আশীর্বাদ করিলেন)

চ্যাটা। নমস্কার! নমস্কার! আসুন আসুন। বসতে দাও রমা, বসতে দাও মা!

জ্যোতি। ব্যস্ত হবেন না আপনি। (রমা চেয়ার আগাইয়া দিল) থাক মা! আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কথা বলব।

চ্যাটা। রমা, তুমি বরং একটা আসন নিয়ে এসো। আপনি নিখিলেশের মা। আপনি আমার বাড়িতে এসেছেন। আমার বহু ভাগ্য।

[রমার দ্রুত প্রস্থান

জ্যোতি। একটা অনুরোধ নিয়ে আমি আপনার কাছে এসেছি।

চ্যাটা। বলুন।

জ্যোতি। আমি আপনার কাছে রমাকে ভিক্ষে চাইতে এসেছি।

চ্যাটা। রমাকে ভিক্ষে চাইতে এসেছেন?

জ্যোতি। নিখিলেশকে কি আপনি অযোগ্য পাত্র মনে করেন?

চ্যাটা। ও, আপনি রমার সঙ্গে নিখিলেশের বিবাহের কথা বলছেন?

জ্যোতি। হ্যাঁ।

চ্যাটা। এর চেয়ে বড় সৌভাগ্য আমি কল্পনা করতে পারি না। কিন্তু--

জ্যোতি। এতে আর কিন্তু করবেন না আপনি। আমি শুনেছি রমা আর নিখিলেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ মেলামেশা রয়েছে। ওরা দুজনে একসঙ্গে কাজ করে বেড়ায়। লোকে এ নিয়ে কথাও বলছে। প্রশংসা নিন্দা দুয়েরই সমান ভাগে ভাগী ওরা। আমার ইচ্ছে ওরা দুজনে জীবনে এক হয়েই কাজ করুক।

চ্যাটা। এর উত্তর তো আপনাকে দিতে পারব না। রমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি তার বিবাহ দিতে তারি না।

জ্যোতি। রমা কি—? রমার কি ইচ্ছে নেই?

চ্যাটা। আগে একটি ছেলের সঙ্গে আমি ওর বিয়ের সম্বন্ধ করেছিলাম। সে ছেলেটি—

জ্যোতি। জানি। নিখিলেশ সে কথা আমায় বলেছে।

চ্যাটা। নিখিলেশ কি রমাকে বিয়ে করতে চায়?

জ্যোতি। তার কথা বলবেন না, সে সন্ন্যাসীর মত ঘুরেই বেড়ায়। অসুখ করলে শুধু বাড়ি আসে মায়ের দুঃখ বাড়াতে। কিন্তু আমি তাকে বিয়ে করতে বাধ্য করব। এতখানি মেলামেশার পর সে যদি রমাকে বিয়ে না করে, তবে তার চেয়ে বড় অন্যায় আর হতে পারে না।

(রমার আসন লইয়া প্রবেশ)

থাক মা থাক। (রমার হাত হইতে আসন লইয়া চেয়ারের উপর রাখিয়া দিলেন)

চ্যাটা। রমা, নিখিলেশের মা এসেছেন; তিনি তোমায় পুত্রবধূ করতে চান।

রমা। আমি ওঘর থেকে সব শুনেছি বাবা। কিন্তু না বাবা, আমার পথ আমি পেয়েছি। (জ্যোতির্ময়ীর মুখের দিকে চাহিয়া) আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন।

[প্রস্থান

চ্যাটা। আপনি বলতে পারেন এ আমার কোন পাপের প্রায়শ্চিত্ত?

জ্যোতি। শুনুন, আমি এসেছিলাম একটা বেনামী চিঠি পেয়ে। ভাবলাম নিখিলেশ যদি এত হীনই হয়ে থাকে—

চ্যাটা। না, না, না। নিখিলেশ হীন নয়—নিখিলেশ কখনও হীন হতে পারে না—। মিথ্যা সে চিঠি। তেমন চিঠি শুধু আপনিই পান নি। আমিও পেয়েছি। আমি কন্যার পিতা—আমাকে বিশ্বাস করুন—সে মিথ্যা—সম্পূর্ণ মিথ্যা।

জ্যোতি। সে রমা-মাকে দেখে বুঝেছি, আপনাকে দেখে বুঝেছি, সে চিঠি মিথ্যা। আমি নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরে যাচ্ছি। নিখিলেশকে আপনি বলবেন—

চ্যাটা। নিখিলেশের সঙ্গে আপনার দেখা হয় নি?

জ্যোতিঃ। না। (হাসিয়া) আমার চেয়ে সে ভাল মা পেয়েছে—দেশ-জননী। আমার কথা তার আর মনে হয় না।

(ভিক্ষুক ছেলেটি ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া
চারিদিকে চাহিতে লাগিল)

চ্যাটা। এই যে নিখিলেশের বাহন। কি রে? নিখিলেশ কোথায়?

ছেলে। রমাদি কোথায়?

চ্যাটা। শয়তান কোথাকার? জিজ্ঞাসা করলে জবাব না দিয়ে পালটা জিজ্ঞাসা করে! আগে নিখিলেশ কোথায় বল!

ছেলে। (চীৎকার করিয়া) রমাদি! আসানসোল থেকে টেলিগ্রাম এসেছে। সেখানে যেতে হবে। কলেরা হয়েছে। নিখিলদা তোমায় যেতে বললে। বললে, ট্রেনের মাত্র আধ ঘণ্টা সময় আছে।

[ছুটিয়া প্রস্থান

চ্যাটা। এই—ওরে!

(রমার প্রবেশ)

রমা। আপনি একটু অপেক্ষা করুন; আমি নিখিলেশবাবুকে নিয়ে আসছি!

জ্যোতি। তুমিই তাকে আমার আশীর্বাদ জানিয়ো মা। ট্রেনের আধ ঘণ্টা সময়। আমার সঙ্গে দেখা করতে হলে ট্রেন ফেল হয়ে যাবে। তাকে বোলো, দুষ্ট ছেলের মা বলে কি একটুও মন কেমন করে না।

(রমা তাঁহাকে প্রণাম করিল)

তোমাদের জয় হোক মা।

পঞ্চম দৃশ্য

কলিয়ারির কুলি-বস্তী

[দেশী খাপরার ছাওয়া কুলি-ধাওড়ার এক অংশ। সরু শালের রোলার-খুঁটি-দেওয়া নীচু বারান্দা সামনে। অপরিষ্কার বারান্দা। বারান্দার গায়ে ঘরের একটিমাত্র দরজা—একপাল্লা দরজা। দরজা যেমন হালকা তেমনি অসংস্কৃত গঠন। দরজার পাশে দেওয়ালের গায়ে ২॥´×১॥´ মত একটি আইন-বাঁচানো জানালা। জানালাটিও দরজার অনুরূপ। বারান্দার সম্মুখে খোলা জায়গাটা কদর্য নোংরা। কতকগুলা কালো হাঁড়ি-সরা। এক জায়গায় কতকগুলা পাখির পালক, দুই-এক আঁটি খড় পড়িয়া আছে। কতকগুলা আগাছাও জন্মিয়াছে। কেবল ঠিক মধ্যস্থলে একটি পুষ্পভারে সমৃদ্ধ পলাশের গাছ। লাল ফুলে গাছটি ভরিয়া উঠিয়াছে। বারান্দার উপর দুইটি ঝুড়ি, একটা গাঁইতি; বারান্দারই একপাশে একটা জলের হাঁড়ি কাত হইয়া গড়াইয়া পড়িয়া আছে, দেওয়ালে দড়ির আলনায় একখানা কালো রঙের কাপড় ঝুলিতেছে। দেওয়ালের গায়ে ঝুলানো আছে একটা কেরোসিনের ডিবে।

ঘরের খোলা দরজার ভিতর দিয়া দেখা যাইতেছে আপাদ-মস্তক কাপড়ে ঢাকা একটা শব। বারান্দায় পড়িয়া ছটফট করিতেছে একজন কয়লাকাটা শ্রমিক। তাহার হাতে একটা শূন্য অ্যালুমিনিয়ামের গ্লাস। দুই হাতে সেটা ধরিয়া সে সম্মুখে বাড়াইয়া বলিতেছে—"জল—জল! জল—জল!"

বারান্দার বাহিরে খোলা জায়গাটায় একদিকে কতকগুলি শ্রমিক মেয়ে ও একটি দীর্ঘাকৃতি শ্রমিক পুরুষ। নাম ভক্তা। অপরদিকে কুড়ারাম ওভারম্যান ও কলিয়ারির ডাক্তার। ওভারম্যান কুড়ারাম দাঁড়াইয়া দুলিতেছে। ভক্তা সর্দার স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া আছে রুগ্ন শ্রমিকটির দিকে। ডাক্তার একটা শিশিতে ওষুধ চোখের সামনে ধরিয়া মধ্যে মধ্যে ঝাঁকি দিতেছে। রঙ্গমঞ্চ অন্ধকার। কাল সন্ধ্যার পর। শুধু একটা ডিবে জ্বলিতেছে—

কুড়া। তুই এর উপরে মদ খেয়েছিস ভক্তা!

ভক্তা। মদ খাব না তো বাঁচব কী করে বাবু? বুকটা যে আমার কী করছে! উয়াদিগে যি আমি নিয়ে এলাম ইখানে। আমি উয়াদের সর্দার। উয়ারা চাষ করছিল—বাস করছিল—থাকছিল। তোমরা বললে বাবু—লোক নিয়ে আয়, সর্দার হবি, সর্দারি দিব, আমি লিয়ে এলাম,—বললাম—মেয়ে-মরদে খাটবি—পয়সা পাবি। মেয়েটা মরে গেল, মরদটা মরছে।

ডাক্তার। এই নে। ওষুদটা খাইয়ে দে। তিন খোরাক, বুঝলি! একবারে সবটা খাওয়াস না যেন।

ভক্তা। আমার ডাক ছেড়ে চেঁচাইতে মন হছে বাবু। তু আমাকে কিছু বলিস না।

(প্রবেশ করিল রমা, নিখিল ও বিছে, সঙ্গে কানাই)

কানাই। এই দেখুন, ওই কুলিসর্দার ভক্তারাম। ওই ডাক্তারবাবু, আর ওই হল কুড়ারাম ওভারম্যান। ডাক্তারবাবু, ওঁরা এসেছেন কলকাতা থেকে। আচ্ছা আমি যাই মশায়! কাজ ছেড়ে এসেছি। জানলে পরে জামাইবাবু মাথাটি নিবে।

[প্রস্থান

কুড়ারাম। কানাই হে, কানাই!

(অনুসরণ)

(রমা, নিখিল ও বিছে এতক্ষণ চারিদিকে দেখিতেছিল ;
বিছে ঘরের দরজার কাছে গিয়া পিছাইয়া আসিল)

বিছে। মড়া! ঘরের মধ্যে একটা লোক মরে পড়ে রয়েছে।

রমা। মরে পড়ে আছে!

নিখিল। (বারান্দার লোকটিকে শোয়াইয়া) ঘরে মরেছে—বাইরে মরছে! (হাসিল) গাছটার দিকে চেয়ে দেখুন রমা দেবী, গাছটা ফুলে ভরে গেছে। প্রকৃতি কাউকে বঞ্চনা করে না। তার বসন্ত সর্বত্র আসে। কিন্তু মানুষের জীবনে কোথাও চিরবসন্ত, কোথাও চিরদিন মেরু-তুষারে ঢাকা অনন্ত শীত-রাত্রি!

ভক্তা। (প্রণাম করিয়া) আপনকারা কে বাবু? হাঁগো মা-ঠাকরুন?

রমা। তোমাদের অসুখ হয়েছে শুনে আমরা এসেছি তোমাদের দেখতে, সেবা করতে। তুমি এদের সর্দার?

ভক্তা। হাঁ, উয়ারা আমার আপন জাত, আমার গাঁয়ের মানুষ। আমি সর্দার। উদিগে আমি ইথানে লিয়ে এলাম। বারো জনা মরে গেল ঠাকরুন! আমার মনে হছে আমি ডাক ছেড়ে চেঁচাই!

নিখিল। পাউডারটা বের করুন রমা দেবী।

রমা। (অগ্রসর হইয়া) এই যে।

নিখিল। (পাউডার লইয়া) বিছে, মুখে জল দে দেখি।

(বিছে রোগীর মুখে জল দিল, নিখিল পাউডার ঢালিয়া দিল)

ভক্তা। ওই দেখেন ঠাকরুন, ঘরে একটা মেয়ে মরে পড়ে আছে। বাবুরা বলছে, পায়ে দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে যা। বলেন ঠাকরুন, তাই পারি? আপনার মানুষ—আপন জাত!

(নিখিল উঠিয়া ঘরের মড়াটা দেখিয়া)

নিখিল। কত দূর নিয়ে যেতে হবে বল তো ? শ্মশান কতদূর ?

ভক্তা। এই খুব নগিছে বাবু। পো-টাক রাস্তা !

নিখিল। (ভক্তার প্রতি) তোমাতে আমাতে নিয়ে যাব চল। কেমন ? পারব না ?

ভক্তা। আপনি আমাদের মড়া ছোঁবেন বাবু ?

ডাঃ। আপনি খ্রীষ্টান বুঝি ?

নিখিল। না। (পৈতা খুঁজিয়া) যাঃ, গেল কোথায় রে বাবা !

রমা। কি ?

নিখিল। পৈতে !

রমা। (হাসিয়া) ধোপার বাড়ি দেন নি তো ?

নিখিল। উঁহু। ডুপ্লিকেট নেই। তা ছাড়া কালই যে পাক দিতে দিতে গলায় প্রায় ফাঁস লাগিয়ে ফেলেছিলাম। (পৈতা পাইয়া) এই যে ! এই দেখুন। জাতি ব্রাহ্মণ, উপাধি বন্দ্যোপাধ্যায়, নৈকষ্য না হলেও ভঙ্গ কুলীন।

ডাঃ। তা হলে আজ্ঞে—এ আপনাদের কি রকম আচরণ ? নীচ জাতের মড়া ছোঁবেন ?

রমা। ভাববেন না, ফিরে গিয়ে আমরা প্রায়শ্চিত্ত করব। আমাদের একটু সাহায্য করুন দেখি।

ডাঃ। মাপ করবেন, মড়া আমি ছোঁব না।

[প্রস্থান

নিখিল। মড়া আপনাকে ছুঁতে হবে না। শুনুন, শুনুন।

(কুড়ারামের প্রবেশ)

কুড়া। বলেন, আমাকে বলেন কী করতে হবে।

নিখিল। আমরা এখানে কলেরার রোগীদের সেবা করতে এসেছি। আমাদের থাকতে হবে তো। একটু থাকবার জায়গার বন্দোবস্ত চাই—এই আর কি !

কুড়া। শুনেছি আজ্ঞা সব শুনেছি, কানাই বলেছে আমাকে। ইয়ার লেগে ভাবনা কী আজ্ঞা। সে আমি ঠিক করে দিছি। এখুনি ঠিক করে দিছি। আমি এখানকার ওভারম্যান—নাম কুড়ারাম চক্রবর্তী। মালিক রায়বাহাদুর আমাকে পুত্রাধিক স্নেহ করেন। জামাইবাবুও লোক খুব ভাল। বিলাতফেরত। এখুনি বলে আমি সব ঠিক করে দিছি। আমাকে বললেন—ভালই করলেন। সব ঠিক করে দিছি আমি।

[প্রস্থান

রমা। ইডিয়ট কোথাকার।

নিখিল। বাদ দিন রমা দেবী, বাদ দিন। এই নিখিলচন্দ্রই যদি কোনদিন মার্চেণ্ট অফিসে চাকরি করে—তবে সেও বড়সাহেবের সম্বন্ধে এমনই পঞ্চমুখই হয়ে উঠবে! হয়তো একটু চাতুর্যপূর্ণ ভাষায়, একটু চালাকিপূর্ণ চালে; তবে ব্যাপারটা ঠিক একই। দেশী মুড়ি আর টিনবন্দী পার্চড রাইস।

"ওরে ভাই কার নিন্দা কর তুমি? মাথা কর নত।

এ আমার, এ তোমার পাপ!"

যাক গে—এক কাজ করুন। খানিকটা গ্লুকোজ দেওয়ার দরকার। আপনি ব্যবস্থা করুন বিছেকে নিয়ে। আমি বরং মালিকদের কাছ ঘুরেই আসি একবার। কাজ কি অনাবশ্যক ঝগড়া করে! তুমি আমাকে একটু পথ দেখাও তো ভাই—কোথায় তোমাদের মালিক থাকেন দেখি। এসে মড়াটি বের করবার ব্যবস্থা করব।

[ভণ্ডা ও নিখিলেশের প্রস্থান

(রমা বসিয়া ব্যাগ হইতে গ্লুকোজের বোতল বাহির করিল)

বিছে। রমাদি, ওই চোঙাটা থেকে কেমন আগুন বেরুচ্ছে দেখ!

রমা। ওসব পরে দেখবি। তুই এগিয়ে দেখ—ডাক্তার ছেলেদের গাড়ি কতদূর! একেবারে এখানে নিয়ে আসবি।

[বিছের প্রস্থান

রমা আবৃত্তি করিতে লাগিল:

ভীরুর ভীরুতা পুঞ্জ, প্রবলের উদ্ধত অন্যায়—

লোভীর নিষ্ঠুর লোভ

বঞ্চিতের নিত্য চিত্তক্ষোভ

জাতি অভিমান—

মানবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বহু অসম্মান,

(কুড়ারাম ও অতুলের প্রবেশ)

কুড়া। এই দেখুন—ইঁয়ারা এসেছেন আজ্ঞা, দেবতুল্য লোক, সেবা করতে এসেছেন। তাই বললাম আমি—আমাদের জামাইবাবু ভারি জবর লোক, বিলাত-ফেরত—শুনবামাত্র ছুটে এসেছেন। আমি তাহলে রায়বাহাদুরকে খবর দি আজ্ঞা।

[প্রস্থান

(অন্ধকারের জন্য অতুল ও রমা পরস্পরকে চিনিতে পারে নাই।

রমা উঠিয়া দাঁড়াইল। অতুল কাছে আসিল।)

অতুল। নমস্কার! আপনারাই এসেছেন এখানে কলেরায় কাজ করতে?

(পরস্পরের কাছে আসিল, অতুলের হাত হইতে টুপি পড়িয়া গেল।
রমার হাত হইতে কাপটা পড়িয়া গেল)

রমা। কে? আপনি?

অতুল। তুমি? রমা? তুমি?

রমা। (আত্মসম্বরণ করিয়া কাপটা কুড়াইয়া লইয়া) নমস্কার! হ্যাঁ, আমরাই এসেছি এখানে—কলেরায় সেবা করতে। ভাল আছেন আপনি?

অতুল। হ্যাঁ।

রমা। আর কিছু বলবেন অতুলবাবু?

অতুল। এই ব্রত গ্রহণ করেছ জীবনে?

রমা। ভাবপ্রবণ বাংলাদেশের মেয়ে আর কী করতে পারে বলুন।

অতুল। জানি না। সে সব কথা আলোচনার অধিকার আমার নাই। তবে যদি বলি মুগ্ধ হয়েছি, শ্রদ্ধাপূর্ণ অন্তর নিয়ে তোমাদের স্বাগত সম্ভাষণ জানাতে এসেছি তবে অবিশ্বাস কোরো না। শুধু স্বাগত সম্ভাষণ নয়—সাদর নিমন্ত্রণ—

রমা। নিমন্ত্রণ!

অতুল। হ্যাঁ। আমি তোমাদের নিমন্ত্রণ জানাতে এসেছি। তোমরা এখানে কলেরায় সেবা করতে এসেছ; কিন্তু তোমাদের সেবারও তো প্রয়োজন আছে। তুমি শুনেছ নিশ্চয়—ওভারস্যান আমাকে জামাইবাবু বলে ডাকছেন। আমি বিবাহ করেছি। আমাদের ওখানে চল তোমরা, আমরা স্বামী-স্ত্রীতে তোমাদের সেবা করব।

রমা। সে সব কথা তো আমাকে বললে হবে না। আমাদের সম্পাদককে বলতে হবে।

অতুল। কে তোমাদের সম্পাদক? কোথায় তিনি?

রমা। নিখিলেশবাবু বোধ হয় আপনাদের বাড়ির দিকেই গেছেন।

অতুল। নিখিলেশবাবু? নিখিলেশ বন্দ্যোপাধ্যায়? লেখক?

রমা। হ্যাঁ। চেনেন তাকে আপনি?

অতুল। নামটা চিনি। নিখিলেশবাবু—

[বলিতে বলিতে প্রস্থান

ষষ্ঠ দৃশ্য

রায়বাহাদুরের বাংলো

সুনন্দার গৃহ হইতে স্বতন্ত্র

সুনন্দা অন্ধকারের মধ্যেই বসিয়া ছিল। বাহিরে রায়বাহাদুরের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। সুনন্দা সঙ্গে সঙ্গে সুইচ টিপিয়া আলো জ্বালিল, এবং নিজে একটি জানালার ধারে—বাহিরের অন্ধকারের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

রায়। কলকাতায় টেলিগ্রাম করুন। ডাক্তার কম্পাউণ্ডার ওষুধ যত শীঘ্র হয় পাঠিয়ে দিক। পাবলিক হেল্‌থ ডিপার্টমেণ্ট, বেঙ্গল—কলিয়ারির বাইরে ওই ডাঙাটায় খড়ের ছাউনি করে এমার্জেন্সি হসপিট্যাল-এর জায়গা করুন।

ম্যানে। শুনেছি, আসানসোলে সেণ্টার করে একদল সেবাসংঘের লোক কাজ করছে—তারাও বোধ হয় খবর পেয়েছে। কলকাতা থেকে কিছুদিন হল আসানসোল এসেছে।

রায়। সেবাসংঘ? ভলেণ্টিয়ার? না-না, ওদের ওপর আমার বিশ্বাস নেই, আস্থাও নেই। আপনি পাবলিক হেল্‌থ ডিপার্টমেণ্টএ তার করুন। নিজের সেবায় যারা অক্ষম তারাই পরের সেবা করে ঘুরে বেড়ায়।

ম্যানে। যারা মারা যাবে—তাদের ছেলেমেয়েদের কিছু টাকা দেওয়া দরকার। নইলে কুলি সব পালাবে। টাকা পেলে ওইটের জন্যেই থাকবে। আমি বলি—মেল মেম্বার মারা গেলে তিরিশ আর ফিমেল মেম্বারএর জন্যে কুড়ি—

রায়। তিরিশ আর কুড়ি? ওটা পঞ্চাশ আর তিরিশ করে দিন। আজ পর্যন্ত মারা গেছে—বাইশ জন না?

ম্যানে। হ্যাঁ। হয়ে রয়েছে পনেরো জনের।

রায়। দে আর মাই মেন—আজই টেলিগ্রাম করুন আপনি। আজই।

ম্যানে। যে আজ্ঞে।

রায়। আমাদের বাংলো-কম্পাউণ্ডের কুয়োগুলোকে ডিসইনফেক্ট করা দরকার। পাহারা রাখাও দরকার।

ম্যানে। আজই করিয়ে দিচ্ছি।

[প্রস্থান

রায়। একটা কথা, ম্যানেজারবাবু!

(ম্যানেজার পুনরায় ফিরিল)

রায়। প্রফেসর বিনোদবিহারী চট্টোপাধ্যায়কে দেড় হাজার টাকার চেক পাঠাবার কথা—সেটা পাঠানো হয়েছে কি না জানেন?

ম্যানে। ও—হ্যাঁ। বই ছাপাবার জন্যে তো? পাঠানো হয়েছে তো! দশ টাকা হিসেবে দেড়শো বই পাঠাবার জন্যে চিঠির ড্রাফটও করে দিয়েছি। সেটা বোধ হয় আজই যাবে।

রায়। না-না-না। তিনি আমার বাল্যবন্ধু। ও চিঠি পাঠাতে হবে না। আমার নামে পাঁচশো টাকা চ্যারিটি অ্যাকাউণ্টে খরচ লিখবেন।

ম্যানে। বাকি হাজার টাকা?

রায়। ওটা অতুলবাবুর টাকা। উনি নিজের নামে পাঠাতে চান না বলেই আমার নামে পাঠাতে বলেছি। অতুলবাবু আমায় চেক দিয়েছেন। ও টাকার জমাখরচ রাখতে হবে না।

ম্যানে। যে আজ্ঞে।

[প্রস্থান

(রায়বাহাদুর এতক্ষণে সুনন্দাকে লক্ষ্য করিলেন। জামা খুলিতে খুলিতে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন)

রায়। সুনন্দা? (সুনন্দা মুখ ফিরাইল) ওখানে দাঁড়িয়ে তুই? ওখানে এমন করে কেন রে?

সুনন্দা। এমনি বাবা। বাইরেটা দেখছিলাম। অন্ধকার দেখছিলাম। শরৎচন্দ্রের বইয়ের কথা মনে হচ্ছিল। অন্ধকারেরও একটা রূপ আছে—

রায়। তুই বই পড়তে বড় ভালবাসিস। সেদিন আমার উপর রাগ করে বইগুলো কেরানীদের দিয়ে দিয়েছিস।

সুনন্দা। না বাবা।

রায়। না বললে আমি শুনব কেন? ভাল, আবার বইয়ের অর্ডার দে তুই। পাঁচ হাজার টাকা দেব তোকে আমি বই কিনতে।

সুনন্দা। না বাবা। বই আর পড়ব না। কী হবে?

রায়। আমার উপর তোর একটা নিদারুণ অভিযোগ আছে যেন, আমি সেটা যেন মধ্যে মধ্যে অনুভব করি। এদিকে আয়। সুনন্দা!

(সুনন্দা কাছে আসিল)

রায়। (উঠিয়া তাহার মুখ তুলিয়া) সুনন্দা!

সু। বাবা।

রায়। আমি তোর বাপ। তুই কি একথা বলতে পারিস—কখনও তোকে আমি দুঃখ দিয়েছি, তোর কোন সাধ অপূর্ণ রেখেছি, তুই যা চেয়েছিস আমি দিই নি!

সু। আমি কি কখনও সে কথা বলেছি বাবা?

রায়। মুখে বলিস নি। কিন্তু তোর মা সমস্ত জীবন আমাকে এমনি যন্ত্রণা দিয়ে গেছে। আবার তুই-ও তাই আরম্ভ করেছিস। কিন্তু কেন?

(সুনন্দা পিতার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল)

রায়। বল সুনন্দা। আমি আজ তোর উত্তর শুনতে চাই। কেন?

সু। সংসারে সাধের জিনিস পাওয়াই কি সব বাবা?

রায়। তবে মানুষ মানুষের জন্যে আর কী করতে পারে সুনন্দা?

সু। কিছু পারে না বাবা—কিছু পারে না। তুমি আমায় ক্ষমা কর বাবা। আমায় ক্ষমা কর তুমি।

[দ্রুত প্রস্থান

(রায়বাহাদুর চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। সুনন্দা পুনরায় প্রবেশ করিল)

সু। আমার মায়ের মৃত্যুর সময় তুমি কি তাঁর কাছে থাকতে পারতে না বাবা?

রায়। আমার দুরদৃষ্ট—বিরাট কাজের মধ্যে কোনমতেই আমি ছুটি পেলাম না। বম্বেতে আটকে গেলাম। কাজ ফেলে আসতে পারলাম না!

সু। কাজ! কাজ! কাজ! সে তোমার কাজ। তাতে অন্য কার কী? তাতে তোমার লক্ষ লক্ষ টাকা লাভ হয়েছে। কিন্তু আমার মা? তাঁর ক্ষতির দুঃখ তুমি বুঝতে পার বাবা? তাঁর সেই দুঃখই আমি বয়ে বেড়াচ্ছি।

(সুনন্দা আবার চলিয়া যাইতেছিল)

রায়। (আর্তস্বরে) সুনন্দা! অতুলও কি তবে তোকে—(সুনন্দা ফিরিয়া একটু হাসিল)

সুনন্দা। না, তিনি আমার কোন সাধ অপূর্ণ রাখেন না বাবা। তাঁর দেওয়া জিনিসের বোঝার ভারে আমার নিশ্বাস ফেলতে কষ্ট হয়। এত যত্ন তুমিও করতে না বাবা।

[প্রস্থান

(রায়বাহাদুর সুনন্দার মায়ের ছবির কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন)

রায়। তুমি! তুমি! তুমি আমায় অভিসম্পাত দিয়ে গেছ!

(নেপথ্যে ভক্তার কণ্ঠস্বর)

রায়। সুনন্দা! জানিস কত বড় বিরাট কাজ তখন আমার মাথায়?

ভক্তা। মালিকবাবু। হুজুর!

নিখিল। কে আছেন ভেতরে?

রায়। কে?

নিখিল। (নেপথ্যে) আমি একজন বিদেশী।

রায়। ম্যানেজারবাবুর কাছে অফিসে যান। এখানে নয়।

নিখিল। আমি আপনার সঙ্গেই দেখা করতে চাই।

রায়। ভেতরে আসুন।

নিখিল। (বলিতে বলিতেই প্রবেশ করিল) আমরা এসেছি কলকাতার এক সেবাশ্রম থেকে—এখানে কলেরায় সেবা করবার জন্যে। নমস্কার! তাই আপনার অনুমতি—

রায়। কে—কে—কে তুমি?

নিখিল। আমার নাম—এ কি? আপনি, কাকাবাবু?

রায়। নিখিলেশ, তুমি নিখিলেশ?

নিখিল। হ্যাঁ কাকাবাবু, আমরা এখানে কলেরায় সেবা করতে এসেছি!

রায়। কলেরায় সেবা করতে এসেছ? ট্রুথ ইজ স্ট্রেঞ্জার দেন ফিক্‌শন্‌। জানো নিখিলেশ, এই কলিয়ারি, আমার সব তোমায় দিতে চেয়েছিলাম!

(প্রণাম করিতে অগ্রসর হইল)

নিখিল। কাকাবাবু, সুনন্দা আমার বোন, তাকে আমি আশীর্বাদ করি।

রায়। থাক নিখিলেশ, সুনন্দার আলোচনা থাক। আমার বিশ্বাস ও আলোচনার অধিকার তোমার নাই।

নিখিল। বোনের সম্পর্কে আলোচনার অধিকার কি ভাইয়ের নেই কাকাবাবু?

রায়। ট্রুথ ইজ ট্রুথ—সূর্যের আলোয় রং ধরানো যায় নিখিলেশ। চোখে রঙীন চশমা পরতে হয়, ওকে বলে আত্মপ্রতারণা।

নিখিল। বেশ—ও আলোচনা করব না—থাক—

(সুনন্দা বাহির হইয়া আসিল)

সুনন্দা। আমি সুনন্দা! আপনি নিখিলেশবাবু—লেখক! (অগ্রসর হইয়া প্রণাম করিল) আমাকে আশীর্বাদ করুন। আমি আপনার ভক্ত পাঠিকা।

নিখিল। আশীর্বাদ করি স্বর্গের লতার মত তুমি ফুলে ফলে ভরে ওঠ।

সুনন্দা। আপনি এখানে কলেরায় সেবা করবার জন্য এসেছেন?

নিখিল। হ্যাঁ। তাই এসেছি—কাকাবাবুর অনুমতির জন্য।

রায়। সে অনুমতি আমি দিতে পারব না নিখিলেশ।

সু। কেন বাবা?

রায়। কারণ এ অনুমতি না দেবার অধিকার আমার আছে।

নিখিল। কিন্তু আমি তো আমার কাজ থেকে নিরস্ত হতে পারব না কাকাবাবু।

রায়। সে আর নাই যেন নিখিলেশ, আমার আশ্রিত—আমার পোষ্য তারা, তাদের ব্যবস্থা আমি করেছি।

নিখিল। তারা এখানে খেটে খায় কাকাবাবু। আপনার আশ্রিতও নয়—পোষ্যও নয়।

রায়। কলিয়ারি আমার, কুলি আমার। তাদের ভার আমার।

সু। বাবা!

রায়। না—সুনন্দা, না।

সু। আমিও একজন কলিয়ারির ডিরেক্টর—আমি বলছি ওঁদের সে অধিকার আছে।

(অতুলের প্রবেশ)

তুমি এসেছ? ইনি লেখক নিখিলেশবাবু। এখানে এসেছেন কলেরায় সেবা করতে।

অতুল। আপনি নিখিলেশবাবু? আমি অতুল, সুনন্দার স্বামী। আপনাকেই আমি খুঁজছি।

নিখিল। আপনি অতুলবাবু!

অতুল। আপনাকে আমি নিমন্ত্রণ জানাতে এসেছি নিখিলেশবাবু।

নিখিল। অতুলবাবু, নিমন্ত্রণ জানাতে হবে রমা দেবীকে—তিনি—

অতুল। তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে নিখিলেশবাবু। রমা বললে—আপনি সঙ্ঘের সম্পাদক—আপনাকে নিমন্ত্রণ জানাতে হবে।

নিখিল। রমা বলেছে—আমি সম্পাদক—নিমন্ত্রণ আমাকে জানাতে হবে?

অতুল। আমি তার কাছ থেকেই আসছি নিখিলেশবাবু। আমরা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই নিমন্ত্রণ জানাচ্ছি—

নিখিল। ধন্যবাদ, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। কিন্তু মাপ করবেন অতুলবাবু, আপনাদের নিমন্ত্রণ আমরা গ্রহণ করতে পারলাম না।

অতুল। কেন নিখিলেশবাবু?

নিখিল। অসহনীয় দারিদ্র্য, দুর্গন্ধময় আবর্জনায় অন্ধকূপের মত ওই কুলি-বস্তিতে নিপীড়িত মানুষের সেবা করতে এসেছি আমরা, আপনাদের রাজপ্রাসাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-বিলাস-প্রাচুর্যের আরামের নিমন্ত্রণে আমাদের আকাঙ্ক্ষাও নেই, অধিকারও নেই। ওই কুলি-বস্তিতে সামান্য একটু আশ্রয় পেলেই আমরা কৃতার্থ হব।

(প্রস্থানোদ্যত রায়বাহাদুর পথরোধ করিলেন)

রায়। আমি সে আশ্রয়টুকুও দিতে অক্ষম নিখিলেশ। আমার কলিয়ারি তোমাদের এই মুহূর্তে ছেড়ে যেতে হবে।

সুনন্দা। বাবা!

রায়। থাম সুনন্দা। আমি এখানে ইমারজেন্সি হাসপাতালের ব্যবস্থা করেছি। কলকাতা থেকে ডাক্তার আসছে—কম্পাউণ্ডার আসছে—তোমাদের কোন প্রয়োজন হবে না এখানে।

নিখিল। আপনার হাসপাতালে আমাদের কাজ করতে দিন। আমরা নার্সের কাজ করব।

রায়। ভালো। অতুল!

অতুল। বলুন!

রায়। আমার এই বাংলোর সমস্ত ফার্নিচার বের করে দাও। এই বাংলোয় হবে ইমারজেন্সি হাসপাতাল।

[প্রস্থান

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কুলিবস্তির সেই ধাওড়া

চারিদিকে এখন আর কোন অপরিচ্ছন্নতা নাই। চারিদিকে একটি সুষ্ঠু শৃঙ্খলাই তকতক করিতেছে। পুষ্পিত পলাশ গাছটার নীচে নিখিলেশ ও অতুল পরস্পরের হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

অতুল। কলিয়ারির মালিকের জামাই হিসেবে নয়, কলিয়ারির সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হিসেবেও নয়, নিতান্ত ব্যক্তিগতভাবেই আপনাদের আমি—কী বলব? ধন্যবাদ নয়—কৃতজ্ঞতাও নয়, শ্রদ্ধা, নিখিলেশবাবু, অন্তরের শ্রদ্ধা জানাতে এসেছি।

নিখিলবাবু। ফ্যাসাদে ফেললেন অতুলবাবু; ওই শ্রদ্ধা জিনিসটা আমার খুব বরদাস্ত হয় না। মানে ওটা খুব গুরুগম্ভীর ব্যাপার। তার চেয়ে প্রীতি, স্নেহ, এগুলো অনেক ভাল লাগে আমার। 'আবার খাবো'-গোছের জিনিস—খেয়ে অরুচি ধরে না, ছেলে-বুড়োর সবারই সমান মুখরোচক (হাসিল, তারপর গম্ভীর হইয়াও মাধুর্যের সঙ্গে বলিল) আমাকে আপনার প্রীতিভাজন বন্ধু মনে করলে আমি সুখী হব, সত্যিই তৃপ্তি পাব অতুলবাবু!

অতুল। আমি দিতে চাইলাম শ্রদ্ধা—কিন্তু আপনি নিতে চাইলেন প্রীতি; সে যে আমারই বড় সৌভাগ্য—অযাচিত সৌভাগ্য।

নিখিল। আপনি কিন্তু বড্ড ফর্মাল অতুলবাবু! বড্ড গম্ভীর! কী এত ভাবেন মশাই?

অতুল। (একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) আমার জীবনের সাধনা বড় কঠোর সাধনা নিখিলবাবু। এ আমার অতি কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনা। আপনার মতের সঙ্গে, পথের সঙ্গে—আমার মতের পার্থক্য অনেক। সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী আমরা। আপনি বুঝতে পারবেন কিনা জানি না, কিন্তু আমার সাধনার মধ্যে মুহূর্তের অবকাশ নাই, আমি যেন অনুভব করি—অবকাশের আমার অধিকার পর্যন্ত নাই।

নিখিল। অতুলবাবু!

অতুল। আমি বৈজ্ঞানিক। অতি বাস্তব বৈজ্ঞানিক আমি। আমার সাধনা—আমি প্রকৃতিকে আয়ত্ত করব—স্ববশে আনব। অপরিমেয় ঐশ্বর্য—দুর্লভ বিলাস—শ্রেষ্ঠ আহার সে ক্রীতদাসীর মত জোগাবে আমাকে, আমার স্বদেশবাসীকে, পৃথিবীর মানুষকে। আপনি কবি, আপনি শিল্পী—আপনি সেবাধর্মী, আপনি বন্দনা করে—সেবা

করে—তাকে তুষ্ট করতে চান। আপনি তার ভক্ত। আমি কিন্তু হতে চাই তার প্রভু। আপনারা বন্দনা করে তার স্বভাবের এতটুকু পরিবর্তন করতে পেরেছেন? সে অতি নির্মম নিষ্ঠুর, ক্রন্দনে গলে না, বন্দনায় হাসে, প্রার্থনায় নিষ্ঠুরার মত ব্যঙ্গ করে চলে যায়। নিখিলেশবাবু, তাই তাকে আয়ত্ত করার মত সাধনা আমার, জোর করে তাকে স্ববশে আনব আমি। নারীর মত—পৃথিবীর মত!

(রমা কথার মধ্যস্থলেই অতুলের পিছন দিকে প্রবেশ করিল)

রমা। তাই আপনার সাধনার হাতেখড়ি বুঝি প্রকৃতির প্রতীক—মেয়েদের ওপর নির্যাতন করে অতুলবাবু?

অতুল। (ফিরিয়া) রমা?

রমা। হ্যাঁ, আমি। আপনি—

নিখিল। রমা দেবী। মিস চ্যাটার্জি!

অতুল। তোমার কাছে আমার অপরাধ অনেক রমা।

রমা। না, সেজন্যে বলি নি আমি! আপনার হয়তো মনে নেই—আপনাকে আমি বলেছিলাম—না চাইতেই আমি মার্জনা করেছি। আপনি তো জানেন, মিথ্যে কথা আমি বলি নে। আমি বলছি আপনার স্ত্রীর কথা। পৃথিবীকে হয়তো জোর করে আয়ত্ত করা চলে অতুলবাবু, কিন্তু নারীকে জোর করে আয়ত্ত করবার কল্পনা করবেন না। সে যদি শক্তিতে আপনার চেয়ে খাটোও হয়, হার মানাটাই যদি তার অনিবার্য হয়ে ওঠে, তবে নিজেকে নিজে ধ্বংস করে আপনাকে উপহাস করে সে চলে যাবে। আপনার স্ত্রীর মুখ দেখে আপনি কিছু বুঝতে পারেন না অতুলবাবু?

অতুল। তোমাকে ধন্যবাদ রমা। সুনন্দার মুখখানি একবার ভাল করে দেখব—তাকে বুঝবার চেষ্টা করব! কিন্তু ও সব কথা থাক। আমি এসেছিলাম তোমাদের নিমন্ত্রণ জানাতে। আমাদের—মানে সুনন্দার এবং আমার বাড়িতে আজ নিমন্ত্রণ তোমাদের।

নিখিল। বেশ, বেশ, আমরা যাব, ঠিক সময়ে যাব অতুলবাবু। তবে একটা কথা—চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় সব রকমই চাই কিন্তু। একমাস স্রেফ ভিটামিন চলছে, মানে ভাত আর শাকপাতা। আপনাদের মেনু থেকে পালং শাকটা বাদ দেবেন, উদর-জগতে পালং শাকের অরণ্য জন্মে গেছে।

অতুল। আচ্ছা তা হলে আমি আসি। নমস্কার।

[প্রস্থান

রমা। আমি কিন্তু যাব না নিখিলেশবাবু!

নিখিল। কেন? যাবেন না কেন?

রমা। এতদিন কুলি-ধাওড়ায় বাস করে, দিনের পর দিন ওদের ওই নুন-ভাত খাওয়ার পর চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় আমার মুখে রুচবে না।

নিখিল। এই তো পাগলামি আরম্ভ করলেন। না না, ছেলেমানুষি করবেন না রমা দেবী; মানুষকে আঘাত দেওয়া উচিত নয়।

রমা। আঘাত কেউ পাবে না নিখিলবাবু; কারণ নিমন্ত্রণের ব্যাপারে আমি নিতান্তই গৌণ। সুনন্দা দেবী আপনার ভক্ত, আপনিই এক্ষেত্রে মুখ্য।

নিখিল। হুঁ? দেখুন (কঠিন স্বরে কিছু বলিতে গিয়া থামিয়া গেল, তারপর হাসিল) আপনি খুব রাগ করে আছেন কিনা বলুন তো?

রমা। রাগ? না, কিসের জন্য—কার ওপর করব?

নিখিল। কার ওপর, কেন, সে সব হল রিসার্চের কথা। সে থাক। রাগ করেন নি, সেইটেই হল বড় কথা। মানে, রাগ হলে রসবোধটাই সর্বাগ্রে নষ্ট হয় কি না!

রমা। (হাসিয়া) না, রসবোধ আমার নষ্ট হয় নি।

নিখিল। তবে? নিজের দিকের কথাটা ভুলে যাচ্ছেন কি করে? মানে বড়রসের সমারোহের আয়োজনে—আপনি 'না' বলছেন কি করে? তা ছাড়া ফুলস গিভ ফীস্ট—ওয়াইজ মেন ইট দেম, রসিকতার এমন উপভোগ্য বাক্যটাকেই আপনি অস্বীকার করছেন?

(ভক্তার প্রবেশ)

ভক্তা। বাবুমশায়! ঠাকুরুন!

রমা। নিখিলেশবাবু!

নিখিল। থামুন। আদিম মানুষ এসেছে তার অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা জানাতে। চুপ করুন এখন, ভুলে যান সব।

(ভক্তা প্রণাম করিল)

ভক্তা। আপনারা এইবার চলে যাবেন বাবু?

নিখিল। হ্যাঁ ভক্তারাম! কলেরা থেমে গেছে, এইবার আমরা যাব।

(ভক্তারাম বসিয়া নিখিলের পায়ে ধরিয়া পা টিপিতে আরম্ভ করিল।)

আরে, আরে কর কি?

ভক্তা। চরণটা একটু টিপে দি বাবু।

নিখিল। উঁহু! উঁহু! আমার ভারি সুড়সুড়ি লাগে। আরে ছাড়—ছাড়!

ভক্তা। আপনারা চলে যাবে বাবু, আবার আমাদের মরণ হবে।

নিখিল। না—না। মরণ হবে কেন? খাবে দাবে, কয়লা কাটবে, গান

করবে, মরণ হবে কেন? তোমাদের জামাইবাবু খুব ভাল লোক। উনি এবার তোমাদের থাকবার খুব ভাল বন্দোবস্ত করবেন। আমাকে বলেছেন তিনি।

ভক্তা। খাদের ভিতর ধুমা হচ্ছে বাবু; আবার আমাদের মরণ হবে।

নিখিল। কী? কী হচ্ছে খাদের ভেতর?

ভক্তা। ধুমা হচ্ছে বাবু। মরব, আমরাই মরব!

নিখিল। ধুমা হলে তোমরা নেম না।

ভক্তা। লামতে যে হবে বাবু। খাদটো নইলে বাঁচবে কী করে? বাবুরা জোর করে লামাবে। বেশী টাকা দিবে, আমরা লামব।

রমা। না, তোমরা নেম না। বলবে, আমরা নামব না।

ভক্তা। হাঁ ঠাকরুন, বেশী টাকা দিবে যে গো। আমরা লামব না তো ঠাণ্ডা-রামের দল সব টাকা রোজগার করে লিবে।

নিখিল। হুঁ। (উঠিয়া দাঁড়াইল)

রমা। কী হল? হঠাৎ যুদ্ধের ঘোড়ার মত অধীর হয়ে উঠলেন যে?

নিখিল। আসছি আমি।

রমা। ষড়রসের তালিকা থেকে লবণ রসটা বাদ দিতে বলতে চললেন নাকি?

নিখিল। রসিকতা আপনারও আসে দেখছি রমা দেবী! ভারি খুশি হলাম কিন্তু। জানেন, একবার একজন কবি-বন্ধুকে কষে গালাগাল দিয়ে কবিতা লিখে-ছিলাম, কবিতাটা খুব ভাল হয়েছিল। ভদ্রলোক সত্যিকার রসিক লোক, কবিতা পড়ে ভারি খুশি। একজোড়া দামী গ্লেজকিডের জুতো আমাকে উপহার পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

রমা। আমাকেও কি আপনি সেই রকম—

নিখিল। না। (গাছের ডাল নোয়াইয়া ফুল ভাঙিয়া) আপনাকে আমি উপহার দিলাম ফুল। আমি একবার অতুলবাবুর কাছ থেকে ঘুরে আসি।

(নিখিল চলিয়া গেল। রমা ফুলের স্তবকটি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতে লাগিল)

ভক্তা। চুলে পর ঠাকরুন, ভাল লাগবে। আমাদের মেয়েগুলান পরে—কেমন ভাল লাগে!

(রমা তাহার মুখের দিকে চাহিল)

রমা। একবার বিছেকে দেখতে পার ভক্তারাম?

ভক্তা। খাদের মুখে সি বৈসে আছে গো ঠাকরুন! ডাকব?

রমা। হ্যাঁ।

ভক্তা। (যাইতে যাইতে ফিরিয়া) ফুলটো চুলে পরেন ঠাকরুন।

[প্রস্থান

(রমা প্রথমে গুনগুন করিয়া পরে ক্রমশ স্ফুটকণ্ঠে গাহিল)

গান

কাঁটার মাঝে লুকিয়ে বুঝি ফুল ছিল গো, ফুল ছিল।
এবার সে কোন দখিন হাওয়া—
এবার সে কোন দখিন হাওয়া দোল দিল গো—দোল দিল ॥
ছিল আঁধার বিভাবরী,
কূল-হারা মোর ছিল তরী,
আজ প্রভাতে, তোমার তীরে, কূল নিল গো কূল নিল।
কে জানিত ব্যথায় সুখের মূল ছিল ॥

দ্বিতীয় দৃশ্য

সুনন্দার বাংলোর কক্ষ

(সুনন্দা একা গান গাইতেছিল)

ফুলের মাঝে কাঁটার বেদন কে দিল রে
আমার মনের দখিন হাওয়া কে নিল রে ?

(অতুল আসিয়া সুনন্দার চেয়ারের পিছনে দাঁড়াইল। গানশেষে তাহার পিঠে হাত রাখিল। সুনন্দা পিছন ফিরিয়া দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল)

অতুল। যে গানটা তুমি গাইলে সুনন্দা, ওটার ভাষার সঙ্গে সত্যিই কি তোমার অন্তরের যোগ আছে ?

(সুনন্দা অতুলের মুখের দিকে চাহিল—তারপর মুখ নত করিল)

অতুল। সুনন্দা !

সুনন্দা। (হাসিয়া) গান—গান। এ গান তো আমি রচনা করে গাই নি।

অতুল। কবিরা তো হাজারে হাজারে, লাখে লাখে গান রচনা করে এসেছেন। আনন্দের গান, সুখের গান, বেদনার গান, দুঃখের গান। তুমি এই গানটিই পছন্দ করলে কেন ?

(সুনন্দা আবার অতুলের মুখের দিকে চাহিল)

অতুল। আমি তোমার কাছে সত্যিসত্যি জানতে এসেছি সুনন্দা—তুমি কি সুখী হও নি ? তোমাকে কি আমি দুঃখ দিয়েছি ?

সুনন্দা। (হাসিয়া) কেন ? হঠাৎ একথা তোমার মনে হল ?

অতুল। তোমার বাবা একদিন আমাকে বলেছিলেন। আমি সেটাকে তাঁর অতিরিক্ত স্নেহের দৃষ্টিবিভ্রম মনে করেছিলাম। আজ রমা আমায় ঠিক সেই কথাই বললে। বাংলোর বারান্দায় উঠে শুনলাম যেন তুমি কাঁদছ। চমকে উঠলাম। তারপর বুঝলাম—কান্না নয়, গান। কিন্তু সে গান কান্নার চেয়েও মর্মান্তিক বলে মনে হল আমার।

সুনন্দা। বেশ আবার গান গাই শোন। আনন্দের গান, সুখের গান।

(সে পিয়ানোয় সুর তুলিল)

অতুল। (পিয়ানোয় আঘাত করিয়া একটা প্রচণ্ড বেসুরের সৃষ্টি করিয়া বাধা দিল) না।

(সুনন্দা কাতর বিস্ময়ে অতুলের দিকে চাহিল)

অতুল। আমার কথার উত্তর দাও সুনন্দা।

সুনন্দা। আমি কি কখনও তোমার কথায় না করেছি, বলতে পার ?

অতুল। না, তা কর নি। কিন্তু একথা আমার কথার উত্তর নয়।

সুনন্দা। আমি যা বলব—তা কি তুমি—

অতুল। সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করব সুনন্দা। আমি জানি—তুমি কখনো মিথ্যে বলবে না—বলতে পার না।

সুনন্দা। না, সে কথা আমি বলি নি। আমি বলেছি, আমি যা বলব—তা তুমি সহ্য করতে পারবে ?

(অতুল উঠিয়া দাঁড়াইল)

অতুল। তুমি আমাকে ক্ষমা কর সুনন্দা। তোমার জীবন আমি বিষময় করে দিয়েছি। তবু আমি যতটা পারি, সংশোধন করবার চেষ্টা করব। আজই আমি এখান থেকে চলে যাব। কেউ জানবে না।

সুনন্দা। তুমি এত বড় কাপুরুষ ?

অতুল। কাপুরুষ নই বলেই আমি চলে যাব। কর্তব্য সে যত কঠিন হোক—

সুনন্দা। কর্তব্য ? স্ত্রীকে অবহেলা করা—ভাল না-বাসাই বুঝি পুরুষের কর্তব্য ?

অতুল। কী বলছ সুনন্দা ? আমি তোমাকে অবহেলা করি ? আমি তোমাকে ভালবাসি না ?

সুনন্দা। না। তুমি দু হাত ভরে আমার ঐশ্বর্য এনে দাও—তাকে আমি ভালবাসা বলে মানতে পারি নে। তুমি আমাকে পুতুলের মত সাজাতে চাও, শিশুর মত যত্ন করতে চাও—সে আমার সহ্য হয় না। তুমি আমায় ক্ষমা করো। এ থেকে আমায় অব্যাহতি দাও।

অতুল। সুনন্দা! সুনন্দা!

সুনন্দা। (কাঁদিয়া ফেলিয়া) কোন দিন, বল তুমি—জীবনে একটা দিনের জন্যেও—একটা দিনের সামান্য অংশ, একটা প্রহর—একটা ঘণ্টার জন্যেও তুমি তোমার কাজকে অবহেলা করেছ আমার জন্যে? আমার কাছে বসে একটা কাজও তুমি ভুলে গেছ কখনও? বল—তুমি বল!

অতুল। সুনন্দা, আমায় তুমি ক্ষমা কর।

সুনন্দা। আমার মা সমস্ত জীবন এই দুর্ভোগ ভোগ করে গেছেন। মা যখন মৃত্যুশয্যায়—বাবা কাজের জন্য চলে গেছলেন বম্বে। মরবার সময় মা হেসেছিলেন। সে হাসি আমি ভুলতে পারি নে। আমার জীবনেও দেখি সেই অভিশাপ। তাই হাসতে গেলে মায়ের সেই শেষ হাসিই আমার মনে পড়ে।

অতুল। (সুনন্দার দুই হাত ধরিয়া) সুনন্দা!

সুনন্দা। বলতে পার তোমাকে যে আমি পেলাম না, তুমি নিজেই যে আমাকে পেতে দিলে না, বঞ্চিত করলে—এ দুঃখ কেমন করে ভুলব?

অতুল। আজ থেকে আমি কাজকে ভুলব সুনন্দা। আজ আমার নতুন জীবনের এই আমার সংকল্প!

সুনন্দা। সংকল্প? (হাসিল)

অতুল। তুমি হাসছ? বিশ্বাস করতে পারছ না সুনন্দা?

সুনন্দা। সংকল্প করে কাজ করা চলে, জীবনের ধারা পালটানো যায়, কিন্তু হৃদয়? সে কি সংকল্পকে মানে?

অতুল। আমায় বিশ্বাস কর সুনন্দা, তুমি বিশ্বাস কর।

সুনন্দা। বিশ্বাস নয়, সেই আশ্বাসেই আজ আবার নতুন করে আমি বুক বাঁধলাম। তুমি আমায় আশীর্বাদ কর।

(অতুলকে সে প্রণাম করিল)

অতুল। আজ আমাদের উৎসব। সমস্ত দিন আজ তোমার সঙ্গে কাটাব। ভালই হয়েছে! রমা নিখিলেশ এই উৎসবে আমাদের অতিথি। তাদের স্পর্শে আমাদের এই নতুন জীবন উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

(নেপথ্যে রায়বাহাদুরের কণ্ঠস্বর)

রায়। তুমি? আরে! তুমি? উঃ—কতদিন পর বল তো!

অতুল। চল সুনন্দা—আমরা পালাই। তোমার বাবা আসছেন। আজ আমরা ইস্কুলপালানো ছেলে। চল—

[উভয়ের প্রস্থান

(রায়বাহাদুর ও ডাঃ চ্যাটার্জির প্রবেশ)

রায়। বস—ভাই—বস। ওঃ, দোজ সুইট কলেজ ডেজ্‌, মধ্যে মধ্যে মনে পড়ে ভারি কষ্ট হয়। সেসব দিন আর ফিরে আসবে না! তুমি এসেছ—ওঃ কী আনন্দ যে হচ্ছে আমার বিনোদ—

চ্যাটা। শিবপ্রসাদ! তুমি আমাকে আমার বই ছাপাবার জন্যে দেড় হাজার টাকার চেক পাঠিয়েছ, তার জন্যেই—আমায় আসতে হল—

রায়। এক্‌স্‌কিউজ মী ফর ইনটেরাপশান; এক মিনিট। দেড় হাজার টাকার মধ্যে আমি পাঠিয়েছি পাঁচশো টাকা। আর হাজার টাকা পাঠিয়েছেন আমার জামাই। তোমার প্রতি তাঁর অগাধ শ্রদ্ধা; সে তোমার ছাত্র। সে তার নাম তোমাকে—

চ্যাটা। না জানালেও আমি জেনেছি। অতুল মুখার্জি। রমা আমাকে জানিয়েছে।

রায়। রমা?

চ্যাটা। রমা আমার মেয়ে। এখানে সে কলেরায় সেবা করতে এসেছে। সেই আমাকে লিখেছে।

রায়। রমা তোমার মেয়ে? কী আশ্চর্য দেখ দেখি? এতদিন সে এখানে এসেছে, আমায় পরিচয় দেয় নি! অতুলও আমায় জানায় নি! অন্যায়—এ অত্যন্ত অন্যায়।

চ্যাটা। শোনো শিবপ্রসাদ, অতুল তোমার জামাই, এ কথা আমি জানতাম না।

রায়। মাই গড! অতুল গেল কোথায়? কিন্তু তোমার মেয়ে ওয়াণ্ডারফুল মেয়ে, বিনোদ। যে সেবাটা তারা এখানে করলে, আমি আশ্চর্য হয়ে গেছি। জীবনের একটা দিক সম্বন্ধে পূর্বে আমার ভুল ধারণা ছিল, সে ধারণা আমার পালটে গেল।

চ্যাটা। শিবপ্রসাদ! তোমার চেক আমি তোমাকে ফেরত দিতে এসেছি।

রায়। ফেরত দিতে এসেছ? কেন বিনোদ?

চ্যাটা। তুমি দুঃখিত হয়ো না। এই নাও তোমার চেক।

(চেক বাড়াইয়া ধরিলেন)

রায়। বিনোদ!

চ্যাটা। আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি শিবপ্রসাদ।

(ভিতরের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল অতুল,
বিবর্ণ পাংশু তাহার মূর্তি)

রায়। ইচ্ছে হয় তুমি ওটা ছিঁড়ে ফেলে দিয়ো। নয় কাউকে দিয়ে দিয়ো। আমি যা দান করি, সে আমি কখনও ফিরিয়ে নিই না।

চ্যাটা। (অতুলের কাছে গিয়া) তুমি এটা ফিরিয়ে নাও। ধর অতুল, ধর।

(অতুল কলের পুতুলের মত হাত বাড়াইয়া
চেক গ্রহণ করিল)

রমা কোথায় তুমি জান অতুল? সে কি এখানে—এই বাংলোতে?

অতুল। না। এখানকার কুলিদের—

চ্যাটা। থাক, সে আমি খুঁজে নেব। তুমি দুঃখিত হয়ো না শিবপ্রসাদ, আমাকে তুমি ক্ষমা কর। তোমাকে ধন্যবাদ ভগবান, আমার তলোয়ারে মরচে পড়ে নি। সোজা তলোয়ার!

[প্রস্থান

(রায়বাহাদুর অতুলের কাছে গিয়া চেকটা লইয়া ছিঁড়িয়া
ফেলিয়া দিলেন)

রায়। বেয়ারা, খাজাঞ্চীবাবু! কী ব্যাপার অতুল?

অতুল। আপনাকে আমি বলেছিলাম আমাদের এক প্রফেসারের মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছিল—

রায়। ইয়েস আই রিমেম্বার—তা হলে এই বিনোদের মেয়ের সঙ্গেই তোমার বিয়ের কথা ছিল? রমা সেই মেয়ে? সুনন্দা জানে এ কথা?

অতুল। জানে। তাকে আমি প্রথম দিনই বলেছি।

রায়। তা হলে তোমার কোন অপরাধ নাই অতুল। আমি বলছি। একখানা দেড় হাজার টাকার চেক আজই কোন দাতব্য প্রতিষ্ঠান বা কোন সাহিত্য-পরিষদে পাঠিয়ে দাও। আর কিছু আমাদের করবার নেই।

(সুনন্দার প্রবেশ)

সুনন্দা। বাঃ বেশ লোক তুমি। পালিয়ে এসেছ তো? এ কী! কী হল, এমন মুখ কেন তোমার?

রায়। কিছু না মা! অতর্কিতে একটা হুঁচোট খেয়েছে অতুল। কিন্তু তোকে দেখে বড় ভাল লাগছে মা। আয় তো—আমার কাছে আয় তো!

সুনন্দা। দাঁড়াও বাবা—তোমায় আগে প্রণাম করি। আমায় আশীর্বাদ কর বাবা! আর ওঁর মঙ্গল। আমার সব অমিলের মীমাংসা হয়ে গেছে।

(রায়বাহাদুরের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল)

রায়। সত্যি মা—সত্যি?

সু। হ্যাঁ বাবা। (প্রণাম করিল)

রায়। অভিমানের বদলে আজ মালা পেয়েছিস—সেই মালা তোর—

(ঝড়ের মত প্রবেশ করিল কুড়ারাম। পায়ে লাগাইয়া উলটাইয়া ফেলিল একটা ফুলদানি সমেত টেবিল)—হুজুর সর্বনাশ হয়ে গেল—হুজুর—সর্বনাশ হয়ে গেল।

(সকলে স্তব্ধ হতভম্ব হইয়া গেল)

কুড়ারাম। (সে আজ ভয়ানক উত্তেজিত, সে দমিল না) খাদের ভিতর গান পাউডার জ্বলে গেল হুজুর—বারুদ জ্বলে গেল।

রায়। (পুতুলের মত বলিলেন) বারুদ জ্বলে গেল?

(অতুল দ্রুতপদে এতক্ষণে দরজার নিকট হইতে কুড়ারামের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল)

অতুল। (মৃদুস্বরে বলিল) গান পাউডার জ্বলে গেল?

কুড়া। আজ্ঞে হ্যাঁ। দখিন দিকের মেন গ্যালারির পাশে ৫৮নং সুঁদের ভিতর দেওয়ালে—(হাত তুলিয়া দেখাইয়া) হোই অমন জায়গায় (হাত ঘুরাইয়া দেখাইয়া) এই এতখানি এক চাঙড় কয়লা জমে আছে। ভক্তা বেটা বললে—বাবু ওই কয়লাটো দেগে দি। এই হপ্তায় আজ্ঞে বিস্তর গাড়ি লাগবে—তা ভাবলাম যুক্তি মন্দ লয়। টোটা তোয়ের করে ভক্তাকে নিয়ে গেলাম দেখতে। বলি নিজের চোখে একবার দেখে দি।

অতুল। তারপর?

ওভারম্যান কুড়ারাম। তারপর আজ্ঞা? ভক্তা বেটা বারুদের জায়গা নামিয়ে রেখেছে কি একেবারে দিন—দিপ্য—মা—ন। চেয়ে দেখি ফ্যাঁস করে জ্বলে উঠেছে বারুদ!

(এতক্ষণে সে শুব্ধ হইল। এবং বিজয়ী বীরের ভঙ্গিতে দাঁড়াইয়া দুলিতে লাগিল)

রায়। অতুল!

(অতুল সেল্‌ফ হইতে খানকয়েক বই লইয়া তাড়াতাড়ি উলটাইতে লাগিল)

যা উপায় হয় স্থির কর অতুল! তুমি আমায় বলেছিলে। কিন্তু এতখানি জায়গা ছেড়ে দিতে হবে বলে শুনি নি। তোমার কথা অবিশ্বাস করে আমি ভুল করেছি।

(পদচারণা আরম্ভ করিলেন)

কুড়া। হুজুর।

রায়। চীৎকার কোরো না। বাইরে গিয়ে দাঁড়াও তুমি।

কুড়া। আজ্ঞা!

রায়। (আঙুল দেখাইয়া) বাইরে গিয়ে দাঁড়াও। বাইরে।

[কুড়ারাম বাহিরে গেল

(পদচারণা করিয়া) আমি জানি—আমি জানি! এমনি একটা কিছু ঘটবে, সে আমি জানি! আমি যেন অনুভব করছিলাম; অ্যাণ্ড ইট ইজ কাম।

অতুল। ওভারম্যানবাবু!

(ওভারম্যানের প্রবেশ)

কুড়া। আজ্ঞা! (ঢুলিতে লাগিল)

অতুল। ফায়ার-ব্রিক্‌স আর ফায়ার-ক্লে চাই। যত শীগ্‌গির হয়। আজই। দুপুরের মধ্যে।

কুড়া। যে আজ্ঞা।

অতুল। কলিয়ারির চারিদিকে গুর্খা গার্ড বসিয়ে দিন। কোন কুলি যেন না পালায়।

কুড়া। এখনি আজ্ঞা বসায়ে দিব।

অতুল। যে-সমস্ত কুলি খাদের নীচে গ্যাস বন্ধের কাজে ওয়ার্ক করবে—তাদের মজুরি দেওয়া হবে দু টাকা।

রায়। দু টাকায় রাজী না হয় তিন টাকা, চার টাকা। বুঝলে?

কুড়া। আজ্ঞা হাঁ।

অতুল। যদি কেউ মারা যায়—

সুনন্দা। (সে এতক্ষণ পাথরের মূর্তির মত দাঁড়াইয়া ছিল) মারা যায়? তারা কি মারা যাবে?

অতুল। সুনন্দা! এ কি? তুমি যে অসুস্থ হয়ে পড়েছ সুনন্দা!

সুনন্দা। কাজ করতে গেলে লোক মারা যাবে?

(অতুল হাসিল)

অতুল। অসম্ভব নয়।

রায়। কেউ মারা গেলে পাঁচশো টাকা কম্পেনসেশন দেব আমি—পাঁচশো টাকা।

(নিখিলের স্বর বাহিরের দরজায় শোনা গেল)

নিখিল। (নেপথ্যে) আমি তাতে আপত্তি জানাতে এসেছি কাকাবাবু।

রায়। (ক্রুদ্ধভাবে) কে? কে?

(নিখিলেশের প্রবেশ, সে দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল)

রায়। (স্তম্ভিত হইয়া) নিখিলেশ!

নিখিল। হ্যাঁ কাকাবাবু, আমি। আপনাদের এই ব্যবস্থায় আমি আপত্তি জানাচ্ছি, কাকাবাবু। পশুকে বলি দেবার আগে তাকে চাল-বেলপাতা খেতে দিই

আমরা। কিন্তু দোহাই আপনার—মানুষকে বলি দেবার জন্তে চাল-বেলপাতার মত টাকা দিয়ে তাদের ভোলাবেন না!

রায়। নিখিলেশ, তুমি আমার জীবনের কুগ্রহ। তুমি কি আমার সর্বনাশ না করে ছাড়বে না?

নিখিল। এ কথা কেন বলছেন আপনি? আপনার অনিষ্টচিন্তা আমি জীবনে এক মুহূর্তের জন্তে করি নি। আপনাকে আমি—

রায়। তুমি আমাকে শ্রদ্ধা কর, আমি তোমাকে স্নেহ করি। কিন্তু তবু, তবু তুমি আমার জীবনের কুগ্রহ। অশুভ শনির বিবর্ণ ছায়ার ছাপ আমি যেন স্পষ্ট—

নিখিল। ছি ছি, একি বলছেন আপনি কাকাবাবু?

সুনন্দা। বাবা! বাবা! কী বলছ তুমি বাবা?

রায়। (অত্যন্ত রূঢ় স্বরে) সুনন্দা! (সুনন্দা সোফায় বসিয়া সোফাতেই মুখ লুকাইল)

অতুল। (শিবপ্রসাদকে) আপনি উত্তেজিত হয়েছেন। শান্ত হোন আপনি।

রায়। নিখিলেশ, তোমাকে আমি মিনতি করছি—এখান থেকে তুমি—

নিখিল। (রায়বাহাদুরকে প্রণাম করিয়া) ক্ষমা করবেন আমাকে। আমি তা পারি না। গরিব অশিক্ষিত মানুষের লোভের সুযোগ নিয়ে আপনারা তাদের মৃত্যুর মুখে টেনে নিয়ে যাবেন—তা জেনেও তাদের ফেলে আমি যেতে পারব না।

অতুল। (সুনন্দার নিকট হইতে অগ্রসর হইয়া আসিয়া) কী করবেন আপনি?

নিখিল। বিপদের গুরুত্ব তাদের আমি বুঝিয়ে দেব। লোভকে সম্বরণ করতে অনুরোধ করব। আমার দ্বারা যতটুকু সম্ভব তাদের প্রেরণা যোগাব আমি। তাদের আমি বারণ করব।

রায়। তুমি বারণ করবে নিখিলেশ? (হাসিলেন) ভাল! আমি তাদের ডাকব। তোমাকে আমি এক্ষুনি পুলিসের হাতে দিতে পারি, কিন্তু তা আমি দেব না। তোমাকে স্নেহ করি—তার অপমান আমি করব না। তুমি তাদের বারণ কর, আমি তাদের ডাকব।

[দ্রুত প্রস্থান

অতুল। নিখিলেশবাবু! আপনাকে আমি শ্রদ্ধা দিয়েছিলাম, কিন্তু আপনিই আমাকে প্রীতি দিয়ে বন্ধুত্বের সৌভাগ্য দিয়েছেন। আপনাকে আমি সেই বন্ধুত্বের দোহাই দিয়ে অনুরোধ করছি—মিনতি করছি।

নিখিল। (হাসিয়া) আজ যদি আমি আমার ধর্মকে লঙ্ঘন করি অতুলবাবু, তবে

যে বন্ধুত্বকে আপনি সৌভাগ্য বলে মনে করেছেন—মুহূর্তে সে দুর্ভাগ্যে পরিণত হবে। তা আমি পারি না অতুলবাবু!

অতুল। ভাবপ্রবণতায় হিসেবজ্ঞান হারাবেন না নিখিলেশবাবু! ডোণ্ট বী টু মাচ সেণ্টিমেণ্টাল, জানেন এ খনি কত বড় সম্পদ! এ সম্পদ একজনের বলে মনে করবেন না। এতে কত মানুষের জীবিকার সংস্থাপন হয় আপনি কল্পনা করতে পারেন না। এই কলিয়ারির কুলি-কর্মচারীই তার সব নয়! আরও হয়—হাজার হাজার মানুষ এর উপর নির্ভর করে আছে। এ সম্পদ জাতির, এ সম্পদ দেশের।

নিখিল। কিন্তু মানুষের জন্যই সম্পদ অতুলবাবু, সম্পদের জন্যে মানুষ নয়।

অতুল। না—না—না। নিখিলেশবাবু, মানুষের কোন মূল্য নাই যদি তার শক্তি না থাকে। আর ধন-সম্পদই তার শ্রেষ্ঠ শক্তি।

নিখিল। না। মাপ করবেন আমাকে, আমি স্বীকার করতে পারলাম না। সম্পদের শক্তি কৃত্রিম—সে মিথ্যা। মানুষের শ্রেষ্ঠ শক্তি তার জীবনীশক্তি—সেই তার শ্রেষ্ঠ সত্য।

অতুল। (স্থিরদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া) নিখিলেশবাবু!

নিখিল। (হাসিয়া) অতুলবাবু।

অতুল। তা হলে—

নিখিল। বলুন।

অতুল। আপনার সঙ্গে আমার বিরোধ অনিবার্য।

(পিছন ফিরিয়া সে সুনন্দাকে দেখিল না পর্যন্ত ;
হ্যাট র‍্যাক হইতে টুপি ও শক্ত বাঁশের
ছড়িটা লইয়া চলিয়া গেল)

(রমার প্রবেশ)

রমা। সর্বনাশ হয়ে গেল নিখিলবাবু!

নিখিল। আমি যাচ্ছি রমা দেবী, দেখি যদি কিছু করতে পারি।

রমা। চলুন, আমিও যাব।

নিখিল। আপনি যাবেন? সুনন্দা দেবী, আমাদের মার্জনা করবেন—আমরা বিদায় নিচ্ছি।

সুনন্দা। দাঁড়ান। আমিও আপনাদের সঙ্গে যাব।

রমা। সে কি?

সুনন্দা। হ্যাঁ। খাদের নীচে আমি আপনাদের নিয়ে যাব। কারও শক্তি হবে না বাধা দিতে। হৃদয়হীনতার আঘাত আর আমি সহ্য করতে পারছি না নিখিলেশবাবু! চলুন আমি যাব।

নিখিল। জয় হোক সুনন্দা দেবী, আপনাদের জয় হোক।

সুনন্দা। জয়! (হাসিল) চলুন—চলুন।

তৃতীয় দৃশ্য

কয়লা-খাদের খনির অভ্যন্তর

দুইপাশে কয়লার স্তরের ঘন কালো অসমান দেওয়াল—মাথার উপরে কয়লার ছাদ। দুই দিকে টানেলের মত কয়লার গ্যালারি চলিয়া গিয়াছে। ঠিক মাঝখানেও একটি সাইড গ্যালারি ভিতরের দিকে চলিয়া গিয়াছে—সে গ্যালারির ভিতরটা যেন জমাট অন্ধকার বলিয়া মনে হয়। সম্মুখের দৃশ্যমান গ্যালারিতে দুই পাশে হ্যারিকেন,—শালের বোলায় তৈয়ারী অসংস্কৃত দুইটি স্ট্যাণ্ডের উপর জ্বলিতেছে। তাহাতেই অতি অল্প খানিকটা রক্তাভ আলো হইয়াছে। অতুল দাঁড়াইয়া আছে। তাহার হাতে একটা বড় টর্চ। এক হাতে একটা বাঁশের শক্ত ছড়ি। পিছনে কর্মির খং খং শব্দ শব্দ উঠিতেছে। ইঞ্জিনের শব্দ হইতেছে। মধ্যে মধ্যে ঘং—ঘং ঘণ্টার শব্দ।

কুড়া। (নেপথ্যে) ইঁটা—ইঁটা! মাটি। হো—ই।

(দুইটি লোক একটা টব-গাড়ি ঠেলিয়া প্রবেশ করিল)

অতুল। জলদি! জলদি! জলদি নিয়ে যাও।

(টর্চটা জ্বালিয়া অপর দিকে ট্যানেলের দিকে দিক-নির্দেশ করিয়া দিল। টব-গাড়ি ঠেলিয়া তাহারা চলিয়া গেল। নেপথ্যে ঘং—ঘং ঘণ্টা বাজিল)

কুড়া। (নেপথ্যে) আদমি গির গিয়া। আদমি গির গিয়া—

(ব্যস্ত হইয়া কুড়ারামের প্রবেশ)

কুড়া। আদমি—

অতুল। (তাহার হাত ধরিয়া) চীৎকার করবেন না। কী হয়েছে?

কুড়া। আজ্ঞা?

অতুল। কী হয়েছে?

কুড়া। অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে। আবার একজন অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে।

(দুলিতে লাগিল)

অতুল। যান, কাজে যান আপনি। আমি ব্যবস্থা করছি, যান।

[অতুল দ্রুত চলিয়া গেল

কুড়া। (কপালের ঘাম মুছিয়া) পনেরোটা হয়ে গেল। বারো, দুই, এক। উঃ, দম বন্ধ হয়ে আসছে!

(অতুল ও আরও একজনের স্টেচার লইয়া প্রবেশ)

অতুল। আপনি এখনও দাঁড়িয়ে এখানে?

কুড়া। আর পারছি না জামাইবাবু, আর পারছি না। হু-হু করে ধুয়া বেরিয়ে আসছে।

অতুল। স্টপ ওয়ার্ক দেয়ার, কাজ বন্ধ করুন ওখানে। ওখানে কাজ করা অসম্ভব। পিছিয়ে আসুন। আরও পিছিয়ে আসুন।

কুড়া। আজ্ঞা জামাইবাবু, আর পিছায়ে এলে খাদের থাকবে কী বলুন? এতেই তো সিকি বাদ চলে গেল।

অতুল। কিন্তু যা অসম্ভব, তার জন্যে চেষ্টা করে করবেন কী?

(ম্যাপ দেখিতে লাগিল)

কুড়া। জামাইবাবু, ই খাদ আমি নিজের হাতে করেছি। ধু-ধু-করা ডাঙা, ভালুকের দৌরাত্ম্যি! ভালুকসুঙার ডাঙায় সন্ধ্যের পর মানুষ হাঁটত না। সেই ডাঙায় একলা থেকেছি জামাইবাবু! মাটির তলায় খাদ কেটেছি, উপরে ঘর গড়েছি!—জামাইবাবু, সেই খাদ—(কাঁদিয়া ফেলিল)।

অতুল। কাঁদছেন আপনি?

কুড়া। বুঝবেন না জামাইবাবু, খাদ আমার লয়, তবু আমার বুক ফেটে গেছে—

অতুল। বুঝি ওভারম্যানবাবু, আমি বুঝি! কিন্তু দুঃখ করে তো লাভ নেই। শুনুন—(ম্যাপ দেখাইয়া) এই সাতাশ নম্বরের মুখ; এইখানে পিছিয়ে আসুন।

কুড়া। ষাট থেকে সাতাশে পিছায়ে আসব জামাইবাবু?

অতুল। ওভারম্যানবাবু, এ আপনার কীর্তি। সে কীর্তির সমস্তটা যদি নষ্ট হতে না দিতে চান—তবে আমার কথার প্রতিবাদ করবেন না। সাতাশ নম্বরে পিছিয়ে আসুন।

[প্রস্থান

কুড়া। যে আজ্ঞা।

(অতুল তাহার দিকে চাহিয়া শ্রদ্ধার সঙ্গে একটু সকরুণ হাসি হাসিল)

কুড়া। (নেপথ্যে) সাতাশ নম্বর। হোই সব সাতাশ নম্বরে পিছিয়ে আয়। হোই।

(তাহার কণ্ঠস্বর ক্রমশ দূরে চলিয়া গেল)

(অতুল আবার ম্যাপের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল)

ভক্তা। (নেপথ্যে) মাথলা! মাথলা! মাথলা।

সুনন্দা। হ্যাঁ। খাদের নীচে আমি আপনাদের নিয়ে যাব। কারও শক্তি হবে না বাধা দিতে। হৃদয়হীনতার আঘাত আর আমি সহ্য করতে পারছি না নিখিলেশবাবু! চলুন আমি যাব।

নিখিল। জয় হোক সুনন্দা দেবী, আপনাদের জয় হোক।

সুনন্দা। জয়! (হাসিল) চলুন—চলুন।

তৃতীয় দৃশ্য

কয়লা-খাদের খনির অভ্যন্তর

দুইপাশে কয়লার স্তরের ঘন কালো অসমান দেওয়াল—মাথার উপরে কয়লার ছাদ। দুই দিকে টানেলের মত কয়লার গ্যালারি চলিয়া গিয়াছে। ঠিক মাঝখানেও একটি সাইড গ্যালারি ভিতরের দিকে চলিয়া গিয়াছে—সে গ্যালারির ভিতরটা যেন জমাট অন্ধকার বলিয়া মনে হয়। সম্মুখের দৃশ্যমান গ্যালারিতে দুই পাশে হ্যারিকেন,—শালের রোলায় তৈয়ারী অসংস্কৃত দুইটি স্ট্যাণ্ডের উপর জ্বলিতেছে। তাহাতেই অতি অল্প খানিকটা রক্তাভ আলো হইয়াছে। অতুল দাঁড়াইয়া আছে। তাহার হাতে একটা বড় টর্চ। এক হাতে একটা বাঁশের শক্ত ছড়ি। পিছনে কর্নির খং খং শব্দ শব্দ উঠিতেছে। ইঞ্জিনের শব্দ হইতেছে। মধ্যে মধ্যে ঘং—ঘং ঘণ্টার শব্দ।

কুড়া। (নেপথ্যে) ইঁটা—ইঁটা! মাটি। হো—ই।

(দুইটি লোক একটা টব-গাড়ি ঠেলিয়া প্রবেশ করিল)

অতুল। জলদি! জলদি! জলদি নিয়ে যাও।

(টর্চটা জ্বালিয়া অপর দিকে ট্যানেলের দিকে দিক-নির্দেশ করিয়া দিল। টব-গাড়ি ঠেলিয়া তাহারা চলিয়া গেল। নেপথ্যে ঘং—ঘং ঘণ্টা বাজিল)

কুড়া। (নেপথ্যে) আদমি গির গিয়া। আদমি গির গিয়া—

(ব্যস্ত হইয়া কুড়ারামের প্রবেশ)

কুড়া। আদমি—

অতুল। (তাহার হাত ধরিয়া) চীৎকার করবেন না। কী হয়েছে?

কুড়া। আজ্ঞা?

অতুল। কী হয়েছে?

কুড়া। অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে। আবার একজন অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে।

(দুলিতে লাগিল)

অতুল। যান, কাজে যান আপনি। আমি ব্যবস্থা করছি, যান।

[অতুল দ্রুত চলিয়া গেল

কুড়া। (কপালের ঘাম মুছিয়া) পনেরোটা হয়ে গেল। বারো, দুই, এক। উঃ, দম বন্ধ হয়ে আসছে!

(অতুল ও আরও একজনের স্ট্রেচার লইয়া প্রবেশ)

অতুল। আপনি এখনও দাঁড়িয়ে এখানে?

কুড়া। আর পারছি না জামাইবাবু, আর পারছি না। হু-হু করে ধুয়া বেরিয়ে আসছে।

অতুল। স্টপ ওয়ার্ক দেয়ার, কাজ বন্ধ করুন ওখানে। ওখানে কাজ করা অসম্ভব। পিছিয়ে আসুন। আরও পিছিয়ে আসুন।

কুড়া। আজ্ঞা জামাইবাবু, আর পিছায়ে এলে খাদের থাকবে কী বলুন? এতেই তো সিকি বাদ চলে গেল।

অতুল। কিন্তু যা অসম্ভব, তার জন্যে চেষ্টা করে করবেন কী?

(ম্যাপ দেখিতে লাগিল)

কুড়া। জামাইবাবু, ই খাদ আমি নিজের হাতে করেছি। ধু-ধু-করা ডাঙা, ভালুকের দৌরাত্মি! ভালুকসুণ্ডার ডাঙায় সন্ধ্যের পর মানুষ হাঁটত না। সেই ডাঙায় একলা থেকেছি জামাইবাবু! মাটির তলায় খাদ কেটেছি, উপরে ঘর গড়েছি!—জামাইবাবু, সেই খাদ—(কাঁদিয়া ফেলিল)।

অতুল। কাঁদছেন আপনি?

কুড়া। বুঝবেন না জামাইবাবু, খাদ আমার লয়, তবু আমার বুক ফেটে গেছে—

অতুল। বুঝি ওভারম্যানবাবু, আমি বুঝি! কিন্তু দুঃখ করে তো লাভ নেই। শুনুন—(ম্যাপ দেখাইয়া) এই সাতাশ নম্বরের মুখ; এইখানে পিছিয়ে আসুন।

কুড়া। ষাট থেকে সাতাশে পিছায়ে আসব জামাইবাবু?

অতুল। ওভারম্যানবাবু, এ আপনার কীর্তি। সে কীর্তির সমস্তটা যদি নষ্ট হতে না দিতে চান—তবে আমার কথার প্রতিবাদ করবেন না। সাতাশ নম্বরে পিছিয়ে আসুন।

[প্রস্থান

কুড়া। যে আজ্ঞা।

(অতুল তাহার দিকে চাহিয়া শ্রদ্ধার সঙ্গে একটু সকরুণ হাসি হাসিল)

কুড়া। (নেপথ্যে) সাতাশ নম্বর। হোই সব সাতাশ নম্বরে পিছিয়ে আয়! হোই।

(তাহার কণ্ঠস্বর ক্রমশ দূরে চলিয়া গেল)

(অতুল আবার ম্যাপের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল)

ভক্তা। (নেপথ্যে) মাথলা! মাথলা! মাথলা।

(উদ্‌ভ্রান্তের মত প্রবেশ, অতুল মুখ তুলিয়া তাহাকে দেখিল এবং আগাইয়া আসিল)

অতুল। ভক্তারাম !

ভক্তা। বাবু! মাথলা, আমার বেটা, আমার মাথলা!

অতুল। (হাসিয়া) আছে—সে ভালই আছে ভক্তারাম।

ভক্তা। আছে ? লোকগুলা মারা গেল—মাথলা মরে নাই ?

অতুল। না। ভাল আছে। কিন্তু কুলি কই ?

ভক্তা। বাবু! (অপরাধীর মত চাহিয়া রহিল)

অতুল। কুলি কই ?

ভক্তা। ডাকতে গিয়ে ডাকতে লারলাম বাবু, পারলাম না ডাকতে।

অতুল। ডাকতে পারলে না ?

ভক্তা। না। সেই বাবু, সেই ঠাকরুন বারণ করলে বাবু, বললে পাপ। টাকার লোভে—

অতুল। ফুল, এ ফুল—এ সেন্টিমেণ্টাল ফুল! তুমি যাও, তোমাদের মালিক কোথায় ? রায়বাহাদুর ?

ভক্তা। মালিকবাবু খ্যাপার মত হয়ে গিয়েছে বাবু। ধাওড়ায় ধাওড়ায় ঘুরে বেড়াইছে ; মদ দিছে সবাইকে—টাকা দিছে—ডাকছে। আমি আর পারছি না বাবু। আমি আর পারছি না।

(বসিয়া পড়িল)

কুড়া। (নেপথ্যে) হঁ্যা—এইখানে—এই সাতাশ নম্বরে। সাতাশ নম্বরে। ইঁটা—মাটি—ইঁটা !

অতুল। জলদি, জলদি, ভক্তারাম—তুমি যাও যাও। কুলি নিয়ে এস, কুলি নিয়ে এস। মজুরি আরও দু টাকা বাড়িয়ে দিচ্ছি। এখুনি যাও।

(নিখিলের প্রবেশ)

নিখিল। না। ভক্তারাম যাবে না। টাকার লোভ দেখিয়ে আর ওকে বিচলিত করবেন না অতুলবাবু!

অতুল। নিখিলেশবাবু ?

নিখিল। হঁ্যা, আমি।

নেপথ্যে। বাতি ধর, বাতি দেখাও। বাতি দেখাও।

অতুল। খাদের তলায় কে আপনাকে নামতে দিলে ? কার হুকুমে—

নিখিল। হুকুম যে মানে হুকুম তারই জন্যে, অতুলবাবু। ও কথা বাদ দিন। এখন আমার একান্ত অনুরোধ—অতুলবাবু—

(বাতি ধরিয়া একটি লোক ও তাহার পিছনে সুনন্দার প্রবেশ)

অতুল। এ কি? সুনন্দা?

সুনন্দা। হ্যাঁ—আমি! আমিই এঁদের নিয়ে এসেছি; মুনশীর কোন দোষ নেই।

অতুল। ছি—ছি—ছি! এ কি করেছ সুনন্দা? এ কি করলে তুমি?

সুনন্দা। তোমাদের কীর্তি দেখতে এসেছি। স্বার্থের জন্যে কতগুলো নরবলি দিচ্ছ—তাই দেখতে এসেছি।

অতুল। না-না-না। স্বার্থের জন্য নয়!

সুনন্দা। স্বার্থের জন্য নয়?

অতুল। না। তুমি জান—(কয়লার স্তর দেখাইয়া) এইগুলোর মধ্যে কত লক্ষ মানুষের অন্ন রয়েছে, বস্ত্র রয়েছে, ওষুধ রয়েছে, পথ্য রয়েছে, সুখ রয়েছে, স্বাচ্ছন্দ্য রয়েছে? জান তুমি? কত অফুরন্ত গতির উৎস—কত নতুন শিল্পসম্পদের মূলধন?

সুনন্দা। কিন্তু তোমাদের ব্যাঙ্ক ব্যালান্স-এর কথাটা এর থেকে বাদ দিলে যে?

নিখিল। না-না, আপনি অতুলবাবুর ওপর অবিচার করেছেন মিসেস মুখার্জি,—অতুলবাবু সে ভেবে এ কাজে নামেন নি। সে ভাবার ওঁর অবকাশ নেই। আপনাকে আমি অবিশ্বাস করি না, অতুলবাবু। কিন্তু লোভ দেখিয়ে পশুর মত মানুষগুলোকে হত্যা করবার অধিকার আপনার নাই। ওরা যদি আপনার কথার মূল্য বুঝে আত্মহত্যার বদলে ত্যাগ-স্বীকার করে আত্মদান করত, তাহলে আমি প্রতিবাদ করতাম না, আপনাকে সম্মান করতাম। ওদের সঙ্গে আমিও কাজে লাগতাম।

স্ত্রী। (নেপথ্যে) আমার ছেলে—আমার বাচ্চা—আমার বাচ্চা!

কুড়া। (নেপথ্যে) না-না। যেতে পাবি না। যেতে পাবি না। এই, মৎ যানে দো। খবরদার!

সুনন্দা। কী হল?

(একটি মেয়ের কাঁদিতে কাঁদিতে প্রবেশ)

স্ত্রী। আমার ছেলে! আমার বাচ্চা! আমার খোকা!

নিখিল। কোথায় তোমার ছেলে? কী হল?

স্ত্রী। ওই পিছেকার সুঁদে বাবু, ঘুমাইছিল—শুয়ায়ে দিলাম—

অতুল। ছেলে নিয়ে কেন নামলে তুমি? কে নামতে দিলে?

স্ত্রী। ঝুড়িতে কাপড় ঢেকে লুকিয়ে আনলাম বাবু। ওরা যে পিছায়ে এসে গাঁথছে গো! আমার ছেলে?

নিখিল। কোথায় তোমার ছেলে?

স্ত্রী। ওই দিকে গো। ওই দিকে।

নিখিল। এস।

অতুল। না।

নিখিল। না নয় অতুলবাবু, আমি যাব।

[দ্রুত পাশ কাটাইয়া প্রস্থান

অতুল। নিখিলেশবাবু—নিখিলেশবাবু!

(ডাক্তার চ্যাটার্জি প্রবেশ করিলেন)

চ্যাটা। এ অন্যায়—এ অধর্ম—এ পাপ! আন্‌হোলি, আন্‌গডলি—অতুল—এ তোমার পাপ!

(অতুল ফিরিল)

অতুল। এ কি, আপনি কেন এলেন এখানে? কে আসতে দিলে?

রমা। (নেপথ্যে) বাবা! নিখিলেশবাবু!

অতুল। এ কি রমা? না—না—আপনাদের ফিরে যেতে হবে। আমি আসতে দেব না! মুনশীবাবু—মুনশীবাবু!

[প্রস্থান

কুড়ারাম। (নেপথ্যে) সরে যাও—সরে যাও। ধুয়া আগুন—

সুনন্দা। আগুন! নিখিলেশবাবু—নিখিলেশবাবু! নিখিলেশবাবু!

(ছুটিয়া ভিতরে চলিয়া গেল)

চ্যাটা। এ কি? যেয়ো না—তুমি যেয়ো না—সুনন্দা মা—

(অনুসরণ করিলেন)

ভক্তা। বাবু—জামাইবাবু! (উঠিবার চেষ্টা করিল)

(রমা ও অতুলের প্রবেশ)

অতুল। ফিরে যেতে হবে—তোমাদের ফিরে যেতে হবে। শাস্তি আমার প্রাপ্য হয়—এ কি? সুনন্দা? ডাঃ চ্যাটার্জি?

রমা। পাবেন বৈকি! শাস্তি পাবেন ভাগ্যের চিরাচরিত ধারায়। ঐশ্বর্য সম্পদে—

অতুল। ভক্তারাম, সুনন্দা কই? বুড়াবাবু কই?

ভক্তা। ঠাকরুন গেল ওই বাবুটাকে ডাকতে ডাকতে। বুড়াবাবু ঠাকরুনকে ফিরাতে গেল বাবু! আমি উঠতে লারলাম—

অতুল। সুনন্দা! ডাঃ চ্যাটার্জি! সুনন্দা!

রমা। বাবা! বাবা!

(নিখিলেশ প্রবেশ করিল, বস্ত্রাবৃত শিশুটিকে লইয়া। সঙ্গে
শিশুর মা। ছেলেটিকে তাহার কোলে দিল।)

নিখিল। নাও তোমার ছেলে।

অতুল। নিখিলেশবাবু! সুনন্দা—ডাঃ চ্যাটার্জি এরা কই ?

নিখিল। সে কি !

অতুল। সুনন্দা আপনাকে ডাকতে ডাকতে ছুটেছে। ডাঃ চ্যাটার্জি গেছেন তাকে ফেরাতে।

নিখিল। সুনন্দা—ডাঃ চ্যাটার্জি—

অতুল। সুনন্দা—ডাঃ চ্যাটার্জি—

(উভয়েই অগ্রসর হইতে উদ্যত হইল। ভিতর হইতে পিছন ফিরিয়া
ভিতরের দিকটা দেখিতে দেখিতে ছুটিয়া আসিল কুড়ারাম)

কুড়া। প্রপে আগুন লেগেছে—ধ্বসে পড়ছে ছাদ—ধ্বসে পড়ছে—সরে যান—সরে যান !

(ভিতরে সশব্দে কয়লার ধ্বস। সুড়ঙ্গ-মুখ বন্ধ হইয়া গেল)

(ছুটিয়া প্রবেশ করিলেন রায়বাহাদুর)

রায়। সুনন্দা—সুনন্দা ! অতুল, সুনন্দা কই ? সুনন্দা ?

রমা। (মৃদু আর্তস্বরে) বাবা ! বাবা !

রায়। (অতুলকে ধরিয়া) অতুল, আমার সুনন্দা ? অতুল ?

অতুল। ওইখানে।

রায়। অতুল !

অতুল। কয়লার ধ্বস ছেড়েছে। সুনন্দা—ডাঃ চ্যাটার্জি ওরই ভিতরে সমাধিস্থ হয়েছেন !

রায়। সুনন্দা ! সুনন্দা !

রমা। (মৃদুস্বরে) বাবা ! বাবা !

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বাংলোর সেই সুসজ্জিত কক্ষ

মাসখানেক পর। রাত্রিকাল।

ঘরের মধ্যে দাঁড়াইয়া আছেন রায়বাহাদুর আপনার স্ত্রীর ছবির সম্মুখে। দূরে কোথাও করুণ সুরে বাঁশি বাজিতেছে। অতুল দাঁড়াইয়া আছে একপ্রান্তে জানালার ধারে। তাহার দৃষ্টি বাহিরের দিকে।

রায়। (স্ত্রীর ছবি লক্ষ্য করিয়া) তুমি, তুমি, তুমিই এর জন্যে দায়ী। অতুল, ইনি—এই মহিলাটি, দিস্ জেলাস উওম্যান, সুনন্দার মৃত্যুর জন্যে দায়ী এই মহিলাটি। এরই অভিসম্পাতে আমার সর্বনাশ হয়ে গেল।

(অতুল তাঁহার দিকে শুধু ফিরিয়া চাহিল)

তোমায় আমি একদিন বলেছিলাম অতুল, সুনন্দার একটা পরিবর্তন হয়েছে। তুমি বলেছিলে—'না'। তুমি অন্ধ অতুল, তুমি অন্ধ, আমি কিন্তু দেখেই বুঝেছিলাম। ওই ওকে আমি সমস্ত জীবন দেখেছিলাম কি না! ব্যাধি, ওটা একটা ব্যাধি, সুনন্দার মায়ের হয়েছিল; সেই ব্যাধি আবার সুনন্দার মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল।

(অতুল একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মৃদু হাসিল)

ইয়েস, ইট ইজ এ ডিজিজ, হেরিডিটারি ডিজিজ। অতিক্ষুধা বলে একটা ব্যাধি আছে জান? দৈহিক অতিক্ষুধার মত মনের অতিক্ষুধা। স্বামী, সন্তান, বাপ, ভাই—যাকে এরা স্নেহ করবে তাকেই এরা গ্রাস করতে চায়। তাদের ব্যক্তিত্ব, এমনকি অস্তিত্ব পর্যন্ত বিলুপ্ত না করতে পারলে এদের তৃপ্তি হয় না। সুনন্দার মায়েরও এই ব্যাধি ছিল, সুনন্দার মধ্যেও তা সঞ্চারিত হয়েছিল।

অতুল। আপনি স্থির হোন। এই দীর্ঘ একমাস ধরে আপনি এমন শোকে অভিভূত হয়ে থাকলে তো চলবে না।

রায়। শোকে আমি অভিভূত হই নি অতুল। অদৃষ্টের আঘাতকে আমি ব্যঙ্গ করছি। আমাকে আমি ব্যঙ্গ করছি।

[ভিতরের ঘরে চলিয়া গেলেন

(অতুল সুনন্দার ছবির কাছে গিয়া দুই হাতে ছবিখানি ধরিয়া দাঁড়াইল)

(রায়বাহাদুরের পুনঃপ্রবেশ)

রায়। একটা কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করব, অতুল।

অতুল। (ছবির নিকট হইতে সরিয়া আসিয়া) বলুন।

রায়। বিবাহিত জীবনে তুমি কি সুখী হয়েছিলে অতুল? সুনন্দা কি তোমাকে সুখী করতে পেরেছিল?

অতুল। আমিই সুনন্দাকে সুখী করতে পারি নি।

রায়। তোমার কি মনে হয় অতুল, নিখিলেশের জন্যে—মানে, মনে-মনে সে—

অতুল। না-না। ও প্রশ্ন আপনি করবেন না। অসম্ভব, সে অসম্ভব। সুনন্দার দুঃখের কারণ আমি জানি।

রায়। তোমাকে আর-একটা প্রশ্ন করব আমি।

(অতুল তাঁহার মুখের দিকে চাহিল)

রায়। তুমি কি রমাকে ভালবাস?

অতুল। আমি কাউকে ভালবাসি নি। আমি ভালবেসেছিলাম শুধু আমাকে। জীবনে আমি বড় হতে চেয়েছিলাম, আবার স্ত্রীপুত্রের আকাঙ্ক্ষা সেই বড়ত্বের শোভার জন্যে। ব্যাধি আমার, ব্যাধি আপনার, ব্যাধির বিকারে আমরাই সুনন্দাকে হত্যা করেছি।

রায়। সে সত্য আমি স্বীকার করে নিয়েছি, কলিয়ারির কাজ আমি বন্ধ করে দিয়েছি। এই আত্মসর্বস্ব কর্মের পথ থেকে আমি অবসর নেব। আমি শান্তি চাই। হেল্প্ মী মাই বয়। তুমি আমাকে সাহায্য কর।

অতুল। এই বিপর্যয়ের জন্যে আমিই সকলের চেয়ে বেশী দায়ী। সুনন্দা গেল, ডাঃ চ্যাটার্জি গেলেন; তাদের জন্যে দুঃখ আমার অনেক। কিন্তু কতকগুলি শিক্ষায় বঞ্চিত, অতি-দরিদ্রকে আমি শুধু শুধু হত্যা করেছি।

রায়। না। সে দায়িত্বও আমার। আজ অন্তর দিয়ে অনুভব করছি কী জান? সে এক অদ্ভুত রহস্য। অতুল, মানুষ প্রকৃতির রোদ-বৃষ্টি-ঝড় থেকে বাঁচবার জন্যে ঘর তৈরি করে। সেই ঘরের রুদ্ধ-বায়ু অন্ধকার কোণে রুষ্ট প্রকৃতি বিকৃতরূপে দেখা দেয় নানা ব্যাধির মূর্তিতে। অন্ধকার ঘরের কোণে যক্ষ্মা এসে বাসা বাঁধে। মাটির তলায় জলভরা খনির ভেতর গ্যাস জন্মায়। প্রকৃতি ছলনাময়ী; মানুষ যেখানে তাকে অতিক্রম করতে যায়, সেইখানেই তাকে আঘাত হানে। যুগে যুগে মানুষ হারে। আমরাও হেরেছি। তাতে লজ্জা নাই। অতুল, আমি আবার নতুনভাবে জীবন আরম্ভ করতে চাই। অর্থ নয়, সম্মান নয়, বৈভব নয়, বিলাস নয়, স্নেহমমতা, পুত্রকন্যা নিয়ে গৃহস্থের

মত জীবন যাপন করতে চাই। তুমি, রমা, নিখিলেশ, তোমাদের সকলকে নিয়ে আবার আমি ঘর বাঁধব। আমি রমা নিখিলেশকে ছেড়ে দিই নি।

(অতুল চুপ করিয়া রহিল—শিবপ্রসাদ তাহার নিকটে আসিলেন)

হ্যাঁ, আমি সুখী হতে চাই, আমি সংসার চাই; পুত্র, পুত্রবধূ, পৌত্র-পৌত্রী, কলহাস্যমুখর গৃহাঙ্গন, অভিমান-অধীর দিনরাত্রি চাই। অতুল, তোমাদের ছেলেমেয়েদের পিঠে নিয়ে আবার নূতন করে ঘোড়া সেজে বেড়াতে চাই।

অতুল। আপনি আমাকে মার্জনা করবেন।

[প্রস্থান

রায়। অতুল? অতুল!

(অন্যদিক দিয়া রমার প্রবেশ। তাহার চুল এলানো। বিষণ্ণ মূর্তি)

রমা। জ্যেঠামশাই।

রায়। মা। (মাথায় হাত দিয়া) বল মা, কী হয়েছে বল?

রমা। আমি কাল কলকাতা যেতে চাই। আপনার কাছে আমি বিদায় নিতে এসেছি।

রায়। না। সে হয় না মা। আমি তোমায় বিদায় দিতে পারব না। তোমাকে আমি চাই, আমার প্রয়োজন আছে।

রমা। আপনার কাছে হাত জোড় করে আমি মিনতি করছি।

রায়। আমার দিকে চেয়ে দেখ মা,—নিঃস্ব, রিক্ত, সর্বস্বান্ত।

রমা। জ্যেঠামশাই!

রায়। না—না—না—তোমার কোন কথা আমি শুনব না মা। বিনোদের কন্যা তুমি—আমারও কন্যা। তার অবর্তমানে আমিই তোমার অভিভাবক। আমার সুনন্দাকে বাঁচাতে গিয়েই বিনোদ মারা পড়েছে, তোমাকে সে আমারই হাতে দিয়ে গেছে। তোমায় নিয়ে আবার আমি নূতন করে ঘর বাঁধব। নিখিলেশ, অতুল, বল—কে তোমার প্রিয়তর বল—

রমা। না, জ্যেঠামশাই! না। আমাকে আপনি রেহাই দিন, মুক্তি দিন।

[প্রস্থান

রায়। রমা—রমা। মা! (অনুসরণ করিতে গিয়া ক্ষান্ত হইলেন, ফিরিয়া আসিলেন। সুনন্দার ছবির কাছে গেলেন) তুই কি আমায় অভিসম্পাত করেছিস মা! তুই আমাকে স্নেহবন্ধনে বাঁধতে চেয়েছিলি—সে বাঁধন আমি উপেক্ষা করেছিলাম। আজ আমার অন্তর যখন বন্ধনের জন্য কাঙাল হয়ে উঠল তখন কেউ যে আমার বাঁধন মানতে চায় না—সবাই চাইছে মুক্তি!

(বাহিরে কোলাহল উঠিল। রায়বাহাদুর প্রথমটায় সেই স্থানে দাঁড়াইয়াই ফিরিয়া চাহিলেন)

নেপথ্যে ভক্তা। হুজুর—মালিকবাবু! হুজুর!

নেপথ্যে কুড়া। হুজুর! বাবু!

(রায়বাহাদুর অগ্রসর হইলেন)

রায়। কে? কী চাও?

(কুড়ারাম আসিয়া দাঁড়াইল)

কুড়ারাম!

(ভক্তারামকেও এইবার দেখা গেল)

ভক্তারাম! বল কী চাও তোমরা?

কুড়ারাম। (হাতজোড় করিয়া বলিল) হুজুর!

ভক্তারাম। (নতজানু হইয়া বলিল) মালিকবাবু—অন্নদাতা!

রায়। না—না। পৃথিবীতে কেউ কারও অন্নদাতা নয়—কেউ কারও হুজুর নয়। ওঠ, ভক্তারাম ওঠ। বল কুড়ারাম—বল, জোড়হাত করে নয়—এমনি বল কী বলছ? কী চাও?

কুড়া। হুজুর (রায়বাহাদুর মুখ তুলিয়া চাহিলেন)।

কুড়া। কুলিরা সব কাঁদাকাটা করছে হুজুর, কর্মচারী বাবুরা হাহাকার করছে।

রায়। কেন? কী হল তাদের?

কুড়া। একমাস আজ কুঠি বন্ধ! আজ শুনছি কুঠি চিরকালের লেগে বন্ধ হয়ে যাবে। হুজুর, অন্নদাতা প্রভু আপনি। হুজুর, আমরা খাব কী? যাব কোথায়?

রায়। (উঠিয়া) আমি জানি কুড়ারাম। কিন্তু কী করব বল? কুঠি আমি বন্ধ করে দেওয়াই ঠিক করেছি। ভুল পথ, অশান্তির পথ, ও পথে আমি আর চলতে পারব না। তা ছাড়া এই কুঠির নীচে সম্পদের শয্যায় আমার সুনন্দা ঘুমিয়ে আছে। তার ঘুম কি ভাঙাতে পারি? না। তোমাদের সকলকে আমি তিন মাসের মাইনে দেব। তোমরা আগেকার মত চাষবাস করে খাও। এ বড় অশান্তির পথ—ভুল পথ।

কুড়া। হুজুর, চাষে কুলায় না বলেই তো এখানে এসেছি হুজুর। কুলিগুলার কান্না আপনি একবার নিজের চোখে দেখুন।

রায়। কাঁদতে তাদের বারণ কর। চারিদিকে চেয়ে দেখতে বল। কত গাছ—গাছে কত ফল। নদীতে কত জল। মানুষের জীবন যিনি দিয়েছেন, আহারের ব্যবস্থাও তিনিই করেছেন। কুঠি আমার আর চলবে না, সুনন্দার সমাধির শান্তিভঙ্গ আমি করতে পারব না।

(ভক্তারাম ও কুড়ারাম তবু দাঁড়াইয়া রহিল)

কুড়ারাম—ভক্তারাম তোমরা যাও। আমায় তোমরা রেহাই দাও, মুক্তি দাও। এ সম্পদের বন্ধন আমার অসহ্য হয়ে উঠেছে। কুঠি আর চলবে না।

[প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

(একটি উন্মুক্ত স্থানে দুইটি সমাধি, রাত্রিকাল—আবছা অন্ধকার, আকাশে চাঁদ রহিয়াছে। রমা দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। শুভ্র তাহার পরিচ্ছদ)

(নিখিলেশ প্রবেশ করিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল)

নিখিল। (মৃদু চকিত স্বরে) কে ?

(রমা ঘুরিয়া দাঁড়াইল)

নিখিল। (মৃদু স্বরে) সুনন্দা ?

রমা। না। আমি। আমি রমা।

নিখিল। রমা! রমা দেবী! (ম্লান হাসিয়া মৃদুস্বরে বলিল কৈফিয়ত দেওয়ার মত) আমার ভ্রম হয়ে গেল রমা দেবী। মনে হল—সমাধির তল থেকে সুনন্দা বুঝি উঠে এসে দাঁড়িয়েছে।

রমা। বাবার সমাধির নীচে একটু বসব বলে এসেছিলাম আমি।

নিখিল। আপনার কাছে আমার অপরাধ অনেক। একমাস হয়ে গেল—বৃদ্ধ শিবপ্রসাদবাবুকে নিয়ে এমন অবসর পাই নি যে, আপনার কাছে মার্জনা চাই। সুনন্দা গেল, ডাঃ চ্যাটার্জি গেলেন, কতকগুলি নিরীহ মানুষ গেল, সমস্ত কিছুর জন্যে দায়ী বোধ হয় আমি।

রমা। আপনি খুব আঘাত পেয়েছেন নিখিলেশবাবু—আমি বুঝতে পারছি।

নিখিল। হ্যাঁ। অত্যন্ত কঠিন আঘাত আমি পেয়েছি রমা। পৃথিবীর চেহারা যেন আমার চোখে পালটে গেছে। রমা, আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না যে, এই শোচনীয় দুর্ঘটনার জন্যে আমিই দায়ী। হ্যাঁ, আমিই দায়ী। সুনন্দার মত এমন একটি মেয়ে—নারী যে এমন মধুর, এমন স্বর্গীয়—এ আমি কখনও কল্পনা করতে পারি নি। তারপর ডাঃ চ্যাটার্জি চলে গেছেন—

রমা। না-না-না নিখিলেশবাবু, বাবার কথা আমাকে মনে করিয়ে দেবেন না। তা হলে আপনাদের সঙ্গে আমার কথা বলা পর্যন্ত কষ্টকর হয়ে উঠবে।

নিখিল। এ তিরস্কার আমার প্রাপ্য রমা, আরও অনেক তিরস্কার। সমস্ত

কলিয়ারিতে আজ হাহাকার উঠেছে। রায়বাহাদুর কলিয়ারি বন্ধ করে দিয়েছেন। এ সমস্তর জন্যে আমি দায়ী। সেদিন অতুলবাবুকে বলেছিলাম—মানুষের জন্যেই সম্পদ, সম্পদের জন্যে মানুষ নয়। সে আমার ভুল। জীবনই একমাত্র সত্য নয়। সেই জীবনকে যে শক্তি রক্ষা করে, সেই শক্তি জীবনের মতই সত্য। সম্পদের মধ্যেই সেই শক্তির বাস। এ সমস্তের জন্যে আমিই দায়ী।

রমা। দায়িত্ব আমার কম নয় নিখিলেশবাবু! এই দুর্ঘটনার মধ্যে আমিই টেনে এনেছিলাম আমার বাবাকে। তার শাস্তি আমি পেয়েছি। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে আমি একা!

নিখিল। রমা! রমা দেবী!

রমা। না-না, তার জন্যে আমার আক্ষেপ নাই। কিন্তু ওই বৃদ্ধ রায়বাহাদুরের অবস্থা দেখে আত্মগ্লানির আমার সীমা নেই। তিনি বার বার আমাকে আঁকড়ে ধরতে চাচ্ছেন—আমি শিউরে উঠছি নিখিলেশবাবু!

নিখিল। কেন রমা? তুমি তো তাঁর সুনন্দার অভাব পূর্ণ করতে পার। তুমি যদি অতুলবাবুকে মার্জনা করে—

রমা। কী বলছেন আপনি?

নিখিল। আমার কথা শেষ করতে দাও রমা। আমার জীবন থেকে আমি অতুলবাবুকে বুঝতে পারছি। বলেছি তো সুনন্দার মৃত্যুর পর আমার দৃষ্টিতে পৃথিবীর চেহারা পালটে গেছে। সমস্ত অন্তরাত্মা আজ আমায় বলছে—ওরে, তুই নিজেকে নিজে ফাঁকি দিয়েছিস, মানুষকে তুই ভালবাসিস নি, দয়া করেছিস। দয়া করবার তোর কী অধিকার! সে বলছে—আমি ভালবাসার জন চাই, আপনার জন চাই। আমার বলবার মানবীকে আমি চাই। অতুলবাবুর জীবনে এ বৈরাগ্যও তাই। তুমি তাকে ফেরাতে পার রমা, আমি জানি—তুমি তাকে—

রমা। নিখিলেশবাবু!

নিখিল। আমায় ক্ষমা কর রমা, আমি তোমার বন্ধু, সেই দাবিতেই—

রমা। না, আজ থেকে আমাদের সে বন্ধুত্বের অবসান হোক নিখিলেশবাবু!

[প্রস্থান

(নিখিলেশ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল
বিছে ছুটিয়া প্রবেশ করিল)

বিছে। দাদাবাবু! তুমি এখানে? এস, তুমি চলে এস—পালিয়ে এস।

নিখিল কেন রে? কী হয়েছে?

বিছে। কুলিরা খেপেছে। তোমাকে মারবে। বলছে—ওই বাবুটা আমাদের কুঠি বন্ধ করালে! ওই শোন গোলমাল করছে। সব গিয়েছে বাংলোর সামনে!

নিখিল। সে কি! (সে অগ্রসর হইল)

বিছে। তুমি যাবে? যাচ্ছ দাদাবাবু?

নিখিল। আমাকে যে যেতেই হবে বিছে!

তৃতীয় দৃশ্য

বাংলো

(রায়বাহাদুর, ম্যানেজার, অতুল, কুড়ারাম
বাহিরে জনতা জমিয়া আছে। তাহার আভাস
পাওয়া যাইতেছে)

(নেপথ্যে) কুলি। মালিকবাবু! মালিকবাবু—হুজুর!

রায়। না—না—না। সে হয় না। সে আমি পারব না। ম্যানেজারবাবু, ওদের বলে দিন আপনি, আমি মুক্তি চাই—রেহাই চাই।

ম্যানেজার। আমার কথাও ওরা শুনবে না। ওরা খেপে উঠেছে।

(নেপথ্যে) কুলি। মালিকবাবু! হুজুর!

(ভক্তারাম এবং দু-তিনজন কুলি প্রবেশ করিল)

ভক্তা। মালিকবাবু, কুঠি চালাবার হুকুম দাও। মালিকবাবু!

রায়। সে হয় না। সুনন্দার সমাধির শান্তিভঙ্গ করতে পারব না আমি। তোমাদের ছ-মাসের মজুরি ধরে দিচ্ছি। তোমরা ফিরে যাও। চাষ করে খাও। ভক্তারাম, আমার কথা শোন।

ভক্তা। ছ-মাস পরে কী হবে মালিকবাবু? তখন আমরা কী করব—কী খাব? আর এখনই বা কোথা আমরা ফিরে যাব? কেনে যাব? আমরা লাঙল ভেঙে দিলাম, বলদ বেচে দিলাম, চাষ ভুলে গেলাম। সে আমরা যাব না মালিকবাবু, আমরা যাব না!

সঙ্গের কুলি কয়জন। যাব না—আমরা যাব না!

নেপথ্যে জনতা। ওই—ওই সেই বাবুটো। ওই!

" " মার, মার, উয়াকে মার!

" " ওই আমাদের কুঠি বন্ধ করালে! মার!

(ছুটিয়া রমার প্রবেশ)

রমা। ভক্তারাম—ভক্তারাম।

ভক্তা। ঠাকরুন!

রমা। বাঁচাও তুমি—নিখিলেশবাবুকে বাঁচাও।

ভক্তা। ছেড়ে দে—ছেড়ে দে।

[ছুটিয়া চলিয়া গেল

রমা। ওরা নিখিলেশবাবুকে ধরেছে। মেরে ফেলতে চায়।

রায়। সে কি? আমার রিভলভার! (দ্রুত গিয়া রিভলভার লইলেন টেবিল হইতে)

[অতুল বাহিরে চলিয়া গেল

(ওদিক হইতে ভক্তারাম ও অতুলের সঙ্গে নিখিলেশ প্রবেশ করিল। তাহার মাথা ফাটিয়া গিয়াছে)

রমা। নিখিলেশবাবু!

রায়। নিখিলেশ! উঃ, অকৃতজ্ঞের দল—মৃত্যুর হাত থেকে সেবা করে যারা বাঁচাল—তাকেই করলে আঘাত!

নিখিল। দোষ ওদের নয় কাকাবাবু, দোষ আমার। কিন্তু সে কথা থাক—এখন কলিয়ারি চালাবার হুকুম দিন!

রায়। না নিখিলেশ, না। ওরা ফিরে যাক—গ্রামে ফিরে যাক।

নিখিল। যাবে না, কেন যাবে? যে পথ পিছনে ফেলে এল—সে পথে কেন ফিরবে? ফিরতে বললে এই আঘাত নিতে হবে। পথ আগলে দাঁড়ালে মাড়িয়ে চলে যাবে। অতুলবাবু, আপনি কলিয়ারি চালাবার ব্যবস্থা করুন।

অতুল। আমায় ক্ষমা করবেন নিখিলেশবাবু। আমি পারব না।

নিখিল। অতুলবাবু, সেদিন আপনি কয়লার স্তর দেখিয়ে বলেছিলেন—এর মধ্যে রয়েছে লক্ষ লক্ষ মানুষের অন্ন-বস্ত্র, ঔষধ-পথ্য; অক্ষরে অক্ষরে সে কথা সত্য অতুলবাবু। আমার ভুল আমি স্বীকার করছি। আজ স্বীকার করছি—মানুষের জন্যে সম্পদ হলেও, সেই সম্পদের মধ্যেই রয়েছে তার জীবনীশক্তি। মানুষের দেহে জীবনের বাস, কিন্তু জীবনীশক্তির রস পৃথিবীর বুকে, সে তাকে আহরণ করতেই হবে। কাকাবাবু, কলিয়ারি চালাবার ব্যবস্থা করুন।

রায়। না নিখিলেশ, আমার সুনন্দার সমাধি—

নিখিল। তবু, তবু সে সমাধির শান্তিভঙ্গ করতে হবে। কাকাবাবু, আপনার

সুনন্দা গেছে ; কিন্তু এদের সুনন্দার কথা ভেবে দেখুন। আপনার জাতির কথা ভাবুন কাকাবাবু। যৌবনের সংকল্পের কথা, খিদিরপুর ডকের সেই ছবি মনে করুন।

রায়। খিদিরপুর ডকে কয়লা-বোঝাই জাহাজের সঙ্গে আমার সুনন্দাকে আমি ভাসিয়ে দিয়েছি নিখিলেশ। ও কথা আমায় বোলো না। বলতে পার কেন করব? কার জন্যে করব?

নিখিল। মানুষ করতে বাধ্য বলে করবেন। আপনার জাতির জন্যে করবেন। পৃথিবীর মানুষের জন্যে করবেন। কাকাবাবু, পৃথিবীতে অহরহ মানুষ মরছে, যে মরে গেল—তার জন্যে যারা বেঁচে থাকে তারা যদি পঙ্গু হয়, আত্মহত্যা করতে চায়, তবে সৃষ্টি যে একদিনে শেষ হয়ে যাবে।

ভক্তা। মালিকবাবু—হুজুর।

রায়। পারি, হুকুম দিতে পারি এক শর্তে। আমার পাওনা আমাকে দাও। আমি সংসার চাই, সুখ চাই, শান্তি চাই। রমা, তুমি, অতুল আমার পাশে দাঁড়াও। তোমাদের নিয়ে আমায় নতুন করে ঘর বাঁধতে দাও। তোমরা বিবাহ কর,—অতুল—

নিখিল। রমা দেবী!

রমা। না মার্জনা করবেন আমাকে।

[প্রস্থান

(নেপথ্যে জ্যোতির্ময়ীর কণ্ঠস্বর)

জ্যোতি। (নেপথ্যে) নিখিল! নিখিল!

নিখিল। কে? কে? মা?

(জ্যোতির্ময়ীর প্রবেশ)

জ্যোতি। হাঁ—আমি! এ কি রে, তোর কপালে—

নিখিল। (হাসিয়া) ও একটু কেটে গেছে মা।

রায়। বউদি আপনি?

জ্যোতি। হাঁ, ঠাকুরপো।

নিখিল। কিন্তু তুমি এখন হঠাৎ এলে যে মা?

জ্যোতি। ডাক নিয়ে এসেছি নিখিল। মানুষে মানুষে হানাহানি লেগেছে বাবা। হানাহানির বিরাম নাই। জমিদার-প্রজায় বিরোধ বেধেছে গ্রামে। তোকে যে যেতে হবে নিখিলেশ! এখানকার কাজ কি এখনও তোর শেষ হয় নি? আমি তাদের থামাতে পারি নি। অধিকার নিয়ে বিরোধ। হয়তো কাল সকালেই সর্বনাশ হয়ে যাবে।

নিখিল। (অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে) সত্যি মা, সত্যি?

জ্যোতি। হ্যাঁ। কিন্তু তুই যে এত খুশি হয়ে উঠলি? এ কি খুশির কথা?

নিখিল। খুশির কথা নয় মা? তারা দুর্ভিক্ষে হাহাকার করে আমাদের দয়ার জন্তে হাত পাতে নি। অধিকার নিয়ে লড়াই করবার জন্তে উঠে দাঁড়িয়েছে। খুশির কথা নয় মা? এই তো আমি চাচ্ছিলাম। আমি আসছি মা—আমি আসছি!

[প্রস্থান

রায়। আপনার কাছে আজ আমি ভিক্ষা চাইছি বউদি!

জ্যোতি। (কাপড়ে চোখ মুছিয়া) নিখিলেশ আমাকে সব লিখেছে ঠাকুরপো, আমি সব শুনেছি। কী বলে আপনাকে সান্ত্বনা দেব ঠাকুরপো—আমি খুঁজে পাচ্ছি না।

রায়। সান্ত্বনা আমি পেয়েছি বউদি। আপনি আশীর্বাদ করুন সে সান্ত্বনা যেন আমার অক্ষয় হয়। বউদি, আবার নতুন করে সংসার পাতব। বউদি, অবিনাশদা নিখিলেশকে আমায় দিয়ে গিয়েছিলেন। আপনি নতুন করে আমাকে ভিক্ষে দিন।

(রমার প্রবেশ)

(জ্যোতির্ময়ীকে প্রণাম করিল)

জ্যোতি। রমা! মা!

রায়। আপনি আমার সংসার পেতে দিয়ে যান বউদি! রমা—নিখিল—অতুল—এদের নিয়ে আমি সংসার পাতব। নিখিলেশের সঙ্গে—

(নিখিলেশের প্রবেশ)

(যাত্রীর বেশ)

নিখিল। না কাকাবাবু, আমি অযোগ্য।

রায়। নিখিলেশ! এ কি? তুমি কি—?

নিখিল। (প্রণাম করিয়া) রাত্রের মধ্যে একটি ট্রেন, আর না বেরুলে এ ট্রেন ধরতে পারব না কাকাবাবু। কিন্তু দোহাই, কলিয়ারি চালাবার ব্যবস্থা করুন।

রায়। বলতে পার নিখিলেশ—এই সর্বনাশা সম্পদের সাধনায় মগ্ন থাকতে কী বলে বলছ তুমি? তোমরা হৃদয়হীন, নিষ্ঠুরভাবে হৃদয়হীন। অন্ধের মত দুই হাত বাড়িয়ে ভেসে বেড়াচ্ছি—কেউ হাত বাড়ালে না! কেউ না!

নিখিল। উপায় নেই কাকাবাবু! আমার উপায় নেই! সাক্ষাৎ যোগিনীর মত মা আমার যে ডাক নিয়ে এসেছেন—তাতে আমার না গিয়ে উপায় নেই কাকাবাবু!

(রায়বাহাদুর তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন)

রায়। নিখিল, আমার কাছে থেকে তুমি কি কাজ করতে পার না? আমার সম্পত্তির অর্ধেক তোমার।

নিখিল। যখনই দরকার হবে আপনার কাছে হাত পেতে চেয়ে নেব। কিন্তু সম্পত্তি? সম্পত্তি সম্পদ—কোন মানুষের একার নয়—সকল মানুষের। তবু সমাজ—আইন আজ বলে সম্পত্তি আপনার। সেই বিধানেই সম্পত্তি সুনন্দার—অতুলবাবু তাঁর স্বামী—তিনি কর্মী—এর গৌরব তিনিই রাখতে পারবেন। এ সমস্ত তাঁর।

অতুল। না, সুনন্দার সম্পত্তিতে আমার অধিকার নাই। আমি তাকে—সে আমাকে—

নিখিল। সে আপনাকে জীবনের মধ্যে একান্তভাবে আপনার করে চেয়েছিল। আমাকে বিশ্বাস করুন—তার সে মুগ্ধদৃষ্টি তৃষিতদৃষ্টি আমি দেখেছি। তাই তো তাকে আমার এত ভাল লেগেছিল। ভগ্নীর শ্রদ্ধায় তাকে অন্তরে পূজা করে আমি ধন্য হয়েছি।

রায়। নিখিলেশ!

নিখিল। আমাকে বিশ্বাস করুন কাকাবাবু—

রায়। সেই জন্যেই তো তোমাকে সন্তানের মত পেতে চাচ্ছি, নিখিলেশ—

নিখিল। না কাকাবাবু—আমায় পথ ডাকছে। 'বন্দরে বন্ধন কাল এবারের মত হল শেষ'। আদেশ এসেছে! আপনি অতুলবাবুকে নিয়ে কলিয়ারি চালাবার ব্যবস্থা করুন। অতুলবাবু—পৃথিবী চলছে—এই টুকরোটুকু কি থেমে থাকবে।

অতুল। ম্যানেজারবাবু, বয়লারে আগুন দিতে বলুন।

[ম্যানেজারের প্রস্থান

(ভক্তা কুড়ারামও চলিয়া গেল)

নিখিল। জয় হোক—আপনাদের জয় হোক।

(রায়বাহাদুরকে প্রণাম করিল)

কাকাবাবু, আপনি অতুলবাবু আর রমা দেবীকে নিয়ে ঘর বাঁধুন।

[প্রস্থান

জ্যোতি। (রমাকে) তোমাকে আশীর্বাদ করি মা—

রমা। না—না—না—। আমি যাব।

জ্যোতি। রমা? কী বলছ?

রমা। আমি যাব—ওই ওর সঙ্গে যাব—তুমি ওকে ডাক মা—ডাক।

জ্যোতি। সে কি! কিন্তু—আমি তো ওকে ফেরাতে পারব না মা। পার, তুমি ওকে গিয়ে ধর।

অতুল। এস রমা এস—আমি তোমায় পৌঁছে দি এস। নিখিলেশবাবু—নিখিলেশবাবু!

[রমাকে লইয়া প্রস্থান

জ্যোতি। আশীর্বাদ—তোমাদের আমি আশীর্বাদ করছি। (রায়বাহাদুরের প্রতি) আমি যাই ঠাকুরপো! ওদের বরণ করতে হবে—আশীর্বাদ করতে হবে।

[প্রস্থান

[রায়বাহাদুর একা দাঁড়াইয়া রহিলেন। চারিদিক চাহিলেন। জানালা দিয়া দেখিলেন, ফিরিলেন]

রায়। নিষ্ঠুর পৃথিবী। এখানে আপনার ধন হারালে ফেরে না। সুনন্দা—সুনন্দা! (ছবির দিকে দেখিলেন) তোকে নিজের অবহেলায় হারিয়েছি—আজ সমস্ত পৃথিবী আমাকে অবহেলা করে চলে গেল। কেউ চাইলে না আমাকে। যাবার সময় ফিরেও তাকালে না। আমিও তাকাব না—নিষ্ঠুর পৃথিবী—তোমার দিকে আমিও আর ফিরে তাকাব না। তুমি একদিন আমার উপর অভিমান করেছিলে। আমিও করব তাই। কেন করব না।

(টেবিলের উপর হইতে তুলিয়া লইলেন রিভলভার। আলো নিভাইয়া দিলেন। নিভাইয়া দিতে দিতে বলিলেন)

আঃ চোখে জল আসে কেন? চোখের জল? আঃ ছি!

(মুছিয়া ফেলিয়া আলো নিভাইলেন)

[অন্ধকার মঞ্চের মধ্যে সব কিছু বিলুপ্ত হইয়া গেল। পিস্তলের আওয়াজ হইল। রঙ্গমঞ্চ সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিল।]

চতুর্থ দৃশ্য

প্রান্তরের মধ্যে সমাধি-মন্দির

(নিখিলেশ প্রণাম করিতেছিল)

(রমা ও অতুল প্রবেশ করিল)

অতুল। (মৃদুস্বরে) বিদায় রমা! আমি যাই।

[প্রস্থান

(নিখিলেশ প্রণাম সারিয়া উঠিল)

রমা। দাঁড়াও।

নিখিল। কে? রমা?

রমা। হ্যাঁ আমি।

নিখিল। তুমি আমার সঙ্গে যাবে? রমা, এ যে আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। তুমি আমার সঙ্গে যাবে?

রমা। হাঁ৷ যাব। কিন্তু এক মুহূর্ত দাঁড়াও। বাবাকে প্রণাম করে, সুনন্দাকে প্রণাম করে।

(প্রণাম করিল)

নিখিল। (দাঁড়াইয়া আবৃত্তি করিল)

মা কাঁদিছে পিছে—
প্রেয়সী দাঁড়ায়ে দ্বারে নয়ন মুদিছে—
ঝড়ের গর্জন মাঝে
বিচ্ছেদের হাহাকার বাজে—

রমা। (উঠিয়া) না—না। বাজবে না বিচ্ছেদের হাহাকার। দোরে দাঁড়িয়ে অবগুণ্ঠনের তলে চোখ মার্জনা করব না আমি। তোমার সঙ্গে আমার যাত্রা। দাও—তোমার হাত দাও। আরামের শয্যাতল শূন্য পড়ে থাক—কোন আক্ষেপ নাই আমার চল!

নিখিলেশ। চল রমা, চল।

(নেপথ্যে বয়লারের বাঁশি বাজিয়া উঠিল)

কলিয়ারি চলছে। পৃথিবী চলছে। চল—ওই স্টেশনের আলো দেখা যাচ্ছে। ওই!

(জ্যোতির্ময়ী আসিয়া প্রবেশ করিলেন, সঙ্গে বিছে)

বিছে। ওই যাচ্ছে মা, ওই!

জ্যোতি। (হাত তুলিয়া আশীর্বাদ করিলেন) আশীর্বাদ—আশীর্বাদ! ওরে আমি তোদের আশীর্বাদ করছি।

ছোট গল্প

রসকলি

উৎসর্গ

কবিগুরু

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীচরণেষু

২৫শে বৈশাখ
১৩৪৫

কালাপাহাড়

সংসারে অবুঝকে বুঝাইতে যাওয়ার তুল্য বিরক্তিকর আর কিছু নাই। বয়স্ক অবুঝ শিশুর চেয়ে অনেক বেশি বিপত্তিকর। শিশু চাঁদ চাহিলে তাহাকে চাঁদের পরিবর্তে মিষ্টান্ন দিলে সে শান্ত হয়, তাহা না হইলে প্রহার করিলে সে কাঁদিতে কাঁদিতে ঘুমাইয়া পড়িয়া শান্ত হয়। কিন্তু বয়স্ক অবুঝ কিছুতেই বুঝিতে চায় না, এবং ভবীর মতো ভুলিতেও চায় না।

যশোদানন্দন বহু যুক্তিতর্ক দিয়াও বাপকে বুঝাইতে পারিল না, অবশেষে যাহাকে বলে তিক্ত-বিরক্ত, তাই হইয়া সে বলিল, তবে তুমি যা মন তাই কর গে যাও, দুটো হাতি কিনে আন গে।

কল্পিত হাতি দুইটা বোধ করি শুঁড় ঝাড়িয়া রংলালের গায়ে জল ছিটাইয়া দিল, রংলাল রাগিয়া আগুন হইয়া উঠিল। সে হুঁকা টানিতেছিল, কথাটা শুনিয়া কয়েক মুহূর্ত ছেলের মুখের দিতে চাহিয়া রহিল। তারপর অকস্মাৎ হাতের হুঁকাটা সজোরে মাটির উপর আছাড় মারিয়া ভাঙিয়া ফেলিয়া বলিল, এই নে।

যশোদা অবাক হইয়া বাপের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

রংলাল বলিল, হাতি—হাতি। বলি, ওরে হারামজাদা, কখন আমি হাতি কিনব বলেছি?

যশোদা এ কথারও কোন জবাব দিল না, সেও রাগে ফুলিতেছিল। গুম হইয়া বসিয়া রহিল।

রংলাল এতক্ষণে বোধ হয় 'হাতি কেনা' কথাটার একটা জবাব খুঁজিয়া পাইয়াছিল—সেও এবার শ্লেষপূর্ণ স্বরে বলিল, হাতি কেন? দুটো ছাগল কিনবি বরং, ফলাও চাষ হবে। বাঁশের ঝাড়ের মত ধানের ঝাড় হবে, তিন হাত লম্বা শীষ! চাষার ছেলে নেকাপড়া শিখলে এমনিই মুখ্যুই হয় কিনা! বলি, হাঁ রে মুখ্যু, ভালো গোরু না হলে চাষ হয়? লাঙল মাটিতে ঢুকবে এক হাত করে, এক হেঁটো মাটি হবে গদ্‌গদে মোলাম ময়দার মতো, তবে তো ধান হবে, ফসল হবে।

রংলাল ধরিয়াছে এবার সে গোরু কিনিবে। এই গোরু কেনার ব্যাপার লইয়া মতদ্বৈধহেতু পিতা-পুত্রে কয়েকদিন হইতেই কথা কাটাকাটি চলিতেছে। রংলাল বেশ বড় চাষী, তাহার জোতজমাও মোটা, জমিগুলিও প্রথম শ্রেণীর। চাষের উপর যত্ন অপরিসীম। বলশালী প্রকাণ্ড যেমন তাহার দেহ, চাষের কাজে খাটেও সে তেমনই

অসুরের মত—কার্পণ্য করিয়া একবিন্দু শক্তিও সে কখন অবশিষ্ট রাখে না। বোধ হয়, এই কারণেই গোরুর উপরেও তাহার প্রচণ্ড শখ! তাহার গোরু চাই সর্বাঙ্গসুন্দর,—কাঁচা বয়স, বাহারে রং, সুগঠিত শিং, সাপের মত লেজ এবং আরও অনেক কিছু গুণ না থাকিলে গোরু তাহার পছন্দ হয় না। আরও একটা কথা—এ চাকলার মধ্যে তাহার গোরুর মত গোরু যেন আর কাহারও না থাকে। গোরুর গলায় সে ঘুঙুর ও ঘণ্টার মালা ঝুলাইয়া দেয়, দুইটি বেলা ছেঁড়া চট দিয়া তাহাদের সর্বাঙ্গ ঝাড়িয়া মুছিয়া দেয়, শিং দুইটিতে তেল মাখায়; সময়ে সময়ে তাহাদের পদসেবাও করে, কোন দিন পরিশ্রম বেশি হইলে তাহাদের পা টিপিতে টিপিতে বলে, আহা কেষ্টর জীব?

গত কয়েক বৎসর অজন্মার জন্য এবং পুত্র যশোদাকে স্কুলে পড়াইবার খরচ বহন করিতে হওয়ায় রংলালের অবস্থা ইদানীং একটু অসচ্ছল হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু যশোদা এবার ম্যাট্রিক পাস করিয়াছে, আর গতবার ধানও মন্দ হয় নাই; এই জন্য এবার রংলাল ধরিয়া বসিয়াছে, ভালো গোরু তাহার চাই-ই। একজোড়া গোরু গতবার মাত্র কেনা হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের প্রতি রংলালের মমতা নাই। গরু দুইটি ছোটও নয় এবং মন্দও কোনোমতে বলা চলে না; কিন্তু এ অঞ্চলে তাহাদের চেয়ে ভালো গোরু অনেকের আছে।

যশোদা বলিতেছে, এ বৎসরটা ওতেই চলুক, আমি চাকরি-বাকরি একটা কিছু করি; আর এবারও যদি ধান ভালো হয় তবে কিনো এখন আসছে বছর। কিনতে গেলে দুশো টাকার কম তো হবেই না, সে টাকা তুমি এখন পাবে কোথা?

টাকা কোথা হইতে আসিবে—সে রংলাল জানে না, তবু গোরু তাহার চাই-ই।

অবশেষে রংলালের জিদই বজায় থাকিল। যশোদা রাগ করিয়াই আর কোন আপত্তি করিল না। টাকাও যোগাড় হইয়া গেল। যে গোরু-জোড়াটা তাহার ছিল সে জোড়াটা বেচিয়া হইল এক শত টাকা, বাকি একশত টাকার সংস্থান করিয়া দিল যশোদার মা। সে রংলালকে গোপনে বলিল, ওর সঙ্গে ঝগড়া করে কি হবে? তুমি গোরু কিনে আন না! কিনে আনলে তো কিছু বলতে পারবে।

রংলাল খুশি হইয়া বলিল, বেশ বলেছ, তাই করি। তারপর উ আপনার মাথা ঠুকুক কেনে?

যশোদার মা বলিল, এ গোরু দুটো বেচে দাও, আর এই নাও—এইগুলো বন্ধক দিয়ে গোরু কেনো তুমি। ভালো গোরু নইলে গোয়াল মানায়?

সে আপনার গয়না কয়খানি রংলালের হাতে তুলিয়া দিল। রংলাল আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

যাক, রংলাল টাকা-কড়ি সংগ্রহ করিয়া পাঁচুন্দি গ্রামের গোরু-মহিষের বাজারে যাইবার সংকল্প করিল। বাছিয়া বাছিয়া মনের মতো দুইটি গোরু সংগ্রহ করিবে। হয় দুধের মতো সাদা, নয় দধিমুখো কালো দুইটি। পাঁচুন্দির হাটে প্রবেশ-মুখেই সে অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া গেল। হ-হ! এ যে— ওরে বাস রে—এ যে হাজার হাজার রে বাবা!

হাজার হাজার না হইলে গোরু-মহিষ দুই মিলিয়া হাজারখানেক আমদানি পাঁচুন্দির হাটে হয়। আর মানুষ তেমনই অনুপাতে জুটিয়াছে। গোরু-মহিষের চীৎকারে মানুষের কলরবে—সে অদ্ভুত কোলাহল ধ্বনিত হইতেছে। মাথার উপর সূর্য তখন মধ্যাকাশে। যেখানটায় জানোয়ার কেনা-বেচা হইতেছে, সেখানে এক ফোঁটা ছায়া কোথাও নাই। মানুষের সেদিকে ভ্রূক্ষেপও নাই, তাহারা অক্লান্তভাবে ঘুরিতেছে। রংলাল সেই ভিড়ের মধ্যে মিশিয়া গেল।

গোরুগুলি এক জায়গায় গায়ে গায়ে ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া আছে, চোখে চকিত দৃষ্টি। পাইকারগুলো চীৎকার করিতেছে ফেরিওয়ালার মতো—এই যায়! এই গেল! বাঘবাচ্ছা! আরবী ঘোড়া!

রংলাল তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে আপনার মনের মতো সামগ্রীর সন্ধান করিতেছিল।

ওদিকটায় গোলমাল উঠিতেছে প্রচণ্ডতর। কান পাতা যায় না। মনে হয় যেন দাঙ্গা বাধিয়াছে। রংলাল ওই দিকটার পানেই চলিল। এ দিকটায় মহিষের বাজার। কালো কালো দুর্দান্ত জানোয়ারগুলাকে অবিরাম ছুটাইয়া বেড়াইতেছে। পাইকারদের দল চীৎকার করিয়া বড় বড় বাঁশের লাঠি দিয়া অবিশ্রান্ত পিটিতেছে, আর জানোয়ার-গুলা ছুটিয়া বেড়াইতেছে জ্ঞানশূন্যের মতো। কতকগুলা একটা পুকুরের জলে পড়িয়া আছে। নেহাত কচি বাচ্চা হইতে বুড়া মহিষ পর্যন্ত বিক্রয়ের জন্য আনিয়াছে। কতক-গুলার গায়ের চামড়া উঠিয়া গিয়া রাঙা ঘা থকথক করিতেছে। আরও একটু দূরে আমগাছ-ঘেরা একটা পুকুরের পাড়েও লোকের ভিড়। রংলাল সেখানে কী আছে দেখিবার জন্য চলিল। একটা পাইকার মহিষ তাড়াইয়া আনিতেছিল, সহসা তাহার আস্ফালিত লাঠিগাছটা হাত হইতে খসিয়া রংলালের কাছেই আসিয়া পড়িল। রংলালের একটু রাগ হইল, সে লাঠিগাছটা তুলিয়া লইল।

পাইকারটার অবসর নাই, সে অত্যন্ত ব্যস্ততা প্রকাশ করিয়া বলিল, দাও দাও, লাঠিগাছটা দাও হে!

যদি আমার গায়ে লাগত!

তা তুমার লাগত না হয় খানিক টুকচা রক্ত পড়ত, আর কী হত?

রংলাল অবাক হইয়া গেল, রক্ত পড়ত আর কী হত?

দাও দাও ভাই, দিয়ে দাও। হাত ফসকে হয়ে গেইছে, দাও দাও!

রংলালকে ভালো করিয়া দেখিয়া এবার পাইকারটি বিনয় প্রকাশ করিল।

লাঠিগাছটা দিতে গিয়া রংলাল শিহরিয়া উঠিল, এ কী, লাঠির প্রান্তে যে সুচের অগ্রভাগ বাহির হইয়া রহিয়াছে!

পাইকারটা হাসিয়া বলিল, উ আর দেখে কাজ নাই, দিয়ে দাও ভাই!

রংলাল বেশ করিয়া দেখিল—সুচের অগ্রভাগই বটে; একটা নয়, দুই-তিনটা। হঠাৎ একটা শোনা-কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল—পাইকারেরা লাঠির ডগায় সুচ বসাইয়া রাখে, ওই সুচের খোঁচা খাইয়াই মহিষগুলা এমন জ্ঞানশূন্যের মতো ছুটিয়া বেড়ায়। উঃ!

সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল, পাইকারটা বলিল, কী, কিনবে কী কর্তা? মহিষ কিনবে তো লাও, ভালো মহিষ দিব, সস্তা দিব—অ্যাই—অ্যাই!- বলিয়া রংলালকে দেখাইয়াই সে মহিষগুলাকে ছুটাইতে আরম্ভ করিল।

বাপ রে, বাপ রে, বলিহারি বাপ রে আমার!—মধ্যে মধ্যে আবার আদরও সে করিতেছে।

রংলাল আসিয়া উঠিল বাগানে।

চারি পাশেই মহিষের মেলা; এগুলি বেশ হৃষ্টপুষ্ট আর অযথা তাড়নার ফলে ছুটিয়াও বেড়াইতেছে না। শান্তভাবে কোনটি বসিয়া, কোনটি দাঁড়াইয়া চোখ বুজিয়া বুজিয়া রোমন্থন করিতেছে।

গোরু এ বাগানে নাই। রংলাল সেখান হইতে ফিরিল, কিন্তু একেবারে বাগানের শেষ প্রান্তে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল—এ কি মহিষ, না হাতি? এত প্রকাণ্ড বিপুলকায় মহিষ রংলাল কখনও দেখে নাই। কয়জন লোকও সেখানে দাঁড়াইয়া ছিল। একজন বলিতেছিল, এ মোষ কে লেবে বাবা?

পাইকারটা বলিল, এক লেবে ভাই রাজায় জমিদারে, আর লেবে যার লক্ষ্মী নাই সেই। ঘুরছি তো পাঁচ-সাত হাট; দেখি আবার কোথাও যাব।

অন্য একজন বলিল, এ মোষ গেরস্ততে নিয়ে কী করবে? এর হালের মুঠো ধরবে কে? তার জন্যে এখন লোক খোঁজ!

পাইকার বলিল, আরে ভাই, বুদ্ধিতে মানুষ বাঘ বশ করছে, আর এ তো মোষ। লাঙল বড় করলেই জানোয়ার জব্দ! এর লাঙল মাটিতে ঢুকবে দেড় হাত।

রংলাল তীক্ষ্ণ প্রশংসমান দৃষ্টিতে মহিষজোড়াটার দিকে চাহিয়া ছিল—বলিহারি, বলিহারি! দেহের অনুপাতে পাগুলি খাটো, আবক্ষ পঙ্ক হইতে অন্তত বিশ মণ ওজন তো স্বচ্ছন্দে ওই খাটো পায়ে খুঁটি দিয়া তুলিয়া লইবে! কী কালো রং! নিকষের মতো কালো। শিঙ দুইটির বাহার সবচেয়ে বেশি, আর দুইটিই কি এক ছাঁচে ঢালিয়া গড়িয়াছে—যেন যমজ শিশু!

কিন্তু দামে কি সে পারিবে? আচ্ছা, দেখাই যাক, হাট ভাঙিয়া শেষ লোকটি পর্যন্ত চলিয়া যাক, তখন দেখা যাইবে, পাইকারটাও তো বলিল, পাঁচ-সাতটা হাটে কেহ খরিদ্দার জুটে নাই। কথা তো শুধু টাকাই নয়, সকলের চেয়ে বড় কথা, ওই জানোয়ার দুইটির দুইটি বিপুল উদর।

রংলাল ওই মহিষ দুইটাই কিনিয়া ফেলিল, কিছুতেই সে প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিল না। ঐ টাকাতেই তাহার হইল; পাইকারটাও কয়েকটা হাট ঘুরিয়া বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। অনেকগুলি টাকা তাহার এত দিনে আবদ্ধ হইয়া আছে। সে যখন দেখিল, সত্যই রংলালের আর সম্বল নাই, তখন একশত আটানব্বুই টাকাতেই মহিষ দুইটি রংলালকে দিয়া দিল। রংলালের মুখখানা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে কল্পনানেত্রে দেশের লোকের সপ্রশংস বিস্ফারিত দৃষ্টি যেন প্রত্যক্ষ নিরীক্ষণ করিল। কিন্তু যত সে বাড়ির নিকটবর্তী হইল, ততই তাহার উৎসাহ ক্ষীণ হইয়া অবসাদ প্রবল হইয়া উঠিল। লেখাপড়া-জানা ছেলেকে তাহার বড় ভয়। তাহার কথাবার্তার জবাব দিতে রংলালের হাঁপাইয়া উঠিতে হয়। তা ছাড়া, এত বড় দুইটা জানোয়ারের উদর পূর্ণ করা তো সহজ নয়! এক-একটাতেই দৈনিক এক পোণেরও বেশি খড় নস্যের মতো উদরসাৎ করিয়া ফেলিবে।

গিন্নী—যশোদার মা—কী বলিবে? মহিষের নাম শুনিলে জ্বলিয়া যায়। রংলাল মনে মনে চিন্তা করিয়া ক্লান্ত হইয়া অবশেষে এক-এক সময় বিদ্রোহ করিয়া উঠে। কেন, কিসের ভয়, কাহাকেই বা ভয়? ঘরই বা কাহার? সম্পত্তির মালিকই বা কে? কাহার কথার অপেক্ষা করে সে? চাষ কেমন হইবে সে কথা কেহ জানে? রংলালের মনে হইল—মাটির নীচে ঘুমন্ত লক্ষ্মীর যেন ঘুম ভাঙিতেছে—মাটির নীরন্ধ্র আস্তরণ লাঙলের টানে চৌচির করিয়া দিলেই মা ঝাঁপিখানি কাঁখে করিয়া পৃথিবী আলো করিয়া আসন পাতিয়া বসিবেন। এক হাঁটু দলদলে কাদা, কেমন সোঁদা সোঁদা গন্ধ! ধানের চারা তিন দিনে তিন মূর্তি ধরিয়া বাড়িয়া উঠিবে।

কিন্তু এ ভাবটুকুও তাহার স্থায়ী হয় না, সে আবার ছেলে ও স্ত্রীর মুখ মনে করিয়া স্তিমিত হইয়া পড়ে। মনে মনে সে তাহাদের তুষ্টিসাধনের জন্য তোষামোদ-বাক্য রচনা আরম্ভ করিল।

বাড়িতে আসিয়াই সে যশোদাকে হাসিতে হাসিতে বলিল, হাতিই এক জোড়া কেনলাম, তোর কথাই থাকল।

যশোদা মনে করিল, বাবা বোধ হয় প্রকাণ্ড উঁচু একজোড়া বলদ কিনিয়াছে। সে বলিল, বেশি বড় গোরু ভালো নয় বাপু! বেশ শক্ত শক্ত গিঁঠ-গিঁঠ গড়ন হবে, উঁচুতেও খুব বড় না হয়—সেই তো ভালো।

একমুখ হাসিয়া রংলাল বলিল, গোরুই কিনি নাই আমি, মোষ কিনলাম।

যশোদা সবিস্ময়ে বলিল, মোষ ?

হঁ্যা।

আর এমন করে হেসো না বাপু তুমি, আমার গা জ্বলে যাচ্ছে—যশোদার মা ঝঙ্কার দিয়া উঠিল।

আহা হা, আগে তাই চোখেই একবার দেখ, দেখেই যা হয় বল। লাও লাও, জলের ঘটি লাও, হলুদ লাও, তেল লাও, সিঁদুর লাও—চল দুগ্‌গা বলে ঘরে ঢুকাও তো!

দেখিয়া শুনিয়া যশোদার মুখ আরও ভারী হইয়া উঠিল, সে বলিল, নাও, এইবার চালের খড় ক গোছাও টেনে নিয়ে দিও শেষে। ও কি সোজা পেট। এক-একটির কুম্ভকর্ণের মতো খোরাক চাই। যুগিও কোথা হতে যোগাবে!

যশোদার মা অবাক হইয়া মহিষ দুইটাকে দেখিতেছিল, হোক ভয়ঙ্কর, তবুও একটা রূপ আছে—যাহার আকর্ষণে মানুষকে চাহিয়া দেখিতে হয়। মহিষ দুইটা ঈষৎ মাথা নামাইয়া তির্যক ভঙ্গীতে সকলকে চাহিয়া দেখিতেছিল। চোখের কালো অংশের নীচে রক্তাভ সাদা ক্ষেত্র খানিকটা বাহির হইয়া পড়িয়াছে।—ভীষণ রূপের উপযুক্ত দৃষ্টি।

রংলাল বলিল, দাও, পায়ে জল দাও।

বাবা রে! ওদের কাছে আমি যেতে পারব না।

না না না। এস তুমি, কাছে এস, কোন ভয় নাই, চলে এস তুমি। ভারি ঠাণ্ডা!

যশোদার মা অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে আগাইয়া আসে। মহিষ দুইটি ফোঁস করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া কিছু বোধ করি বলিতে চাহে। রংলাল বলিল, অ্যাই খবরদার! মা হয় তোদের, ফেন দেবে, ভাত দেবে, ভুষি দেবে। বাড়ির গিন্নী, চিনে রাখ!

তবুও যশোদার মা সরিয়া আসিয়া বলিল, না বাপু, এই তেল সিঁদুর হলুদ তুমি দিয়ে দাও, ও আমি পারব না। যে কালাপাহাড়ের মতো চেহারা!

রংলাল বলিয়া উঠিল, বেশ বলেছ। একটার নাম থাকুক কালাপাহাড়।—এইটা, এইটাই বেশি মোটা, এইটাই হল কালাপাহাড়। আর এইটার নাম কী হবে বল দেখি ?

একটু চিন্তা করিয়াই সে আবার বলিল, আর একটার নাম কুম্ভকর্ণ—যশোদা বলেছে। বেশ বলেছে!

যশোদার মাও খুশি হইয়া উঠিল, কিন্তু যশোদা খুশি হইল না।

রংলাল বিরক্ত হইয়া বলিল, গোমড়া মুখ আমি দেখতে লারি।—সে গুরুই হোক আর গোঁসাই হোক।

রংলাল কালাপাহাড়ের পিঠে চড়িয়া কুম্ভকর্ণকে তাড়া দিতে দিতে তাহাদের নদীর ধারে চরাইতে লইয়া যায় সকালেই, ফেরে বেলা তিনটায়। শুধু যে এটা খড় বাঁচাইবার জন্যই সে করে তা নয়; এটা তাহাকে নেশার মতো পাইয়া বসিয়াছে। বাড়ির সমস্ত লোক ইহার জন্য বিরক্ত, এমন কি, যশোদার মা পর্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

রংলাল হাসিয়া বলে, এবার খড় কত টাকার বেচি তা দেখ। খড় বেচেই এবার একখানা গয়না তোমার হবে।

যশোদার মা বলে, গয়নার জন্যে আমার ঘুম হয় না, না তোমাকে দিনরাত আগুনের ছেঁকা দি, বল তো তুমি?

যশোদা বলে, যাবে কোন্ দিন সাপের কামড়ে কিংবা বাঘের পেটে।

সত্য কথা, নদীর ধারে সাপের উপদ্রব খুব এবং বাঘও মাঝে মাঝে দুই-একটা ছটকাইয়া আসিয়া পড়ে। রংলাল সে সব গ্রাহ্যই করে না, সে নদীর ধারে গিয়া একটা গাছতলায় গামছা বিছাইয়া শুইয়া পড়ে। মহিষ দুইটা ঘাস খাইয়া বেড়ায়। উহারা দূরে গিয়া পড়িলে সে মুখে এক বিচিত্র শব্দ করে, আঁ—আঁ! অবিকল মহিষের ডাক! দূর হইতে সে শব্দ শুনিয়া কালাপাহাড় ও কুম্ভকর্ণ ঘাস খাওয়া ছাড়িয়া মুখ উঁচু করিয়া শোনে, তারপর উহারাও ওই আঁ—আঁ শব্দে সাড়া দিতে দিতে দ্রুতবেগে হেলিয়া দুলিয়া চলিয়া আসে; কখনও কখনও বা ছুটিতে আরম্ভ করে! রংলালের কাছে আসিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়ায়, যেন প্রশ্ন করে—ডাকিতেছ কেন?

রংলাল দুইটার গালেই দুই হাতে একটা করিয়া চড় বসাইয়া দিয়া বলে, পেটে তোদের আগুন লাগুক। খেতে খেতে কি বেলাত চলে যাবি না কি? এই কাছে-পিঠে চরে খা।

মহিষ দুইটা আর যায় না, তাহারা সেইখানেই শুইয়া পড়িয়া চোখ বুজিয়া রোমন্থন করে। কখনও বা নদীর জলে আকণ্ঠ ডুবিয়া বসিয়া থাকে; রংলাল ডাকিলে জলসিক্ত গায়ে উঠিয়া আসে।

মাঠে যখন সে লাঙল চালায়, তখন প্রকাণ্ড বড় লাঙলখানা সজোরে মাটির বুকে চাপিয়া ধরে, কালাপাহাড় ও কুম্ভকর্ণ অবলীলাক্রমে টানিয়া চলে, প্রকাণ্ড বড় বড় মাটির চাঁই দুই ধারে উল্টাইয়া পড়ে। এক হাতেরও উপর গভীর তলদেশ উন্মুক্ত হইয়া যায়। প্রকাণ্ড বড় গাড়িটায় একতলা ঘরের সমান উঁচু করিয়া ধানের বোঝা চাপাইয়া দেয়—লোকে সবিস্ময়ে দেখে; রংলাল হাসে।

মধ্যে মধ্যে কালাপাহাড় ও কুম্ভকর্ণকে লইয়া বিষম বিপদ বাধিয়া উঠে। এক-একদিন তাহাদের মধ্যে কী মনান্তর যে ঘটে;—উহারা দুইটা যুধ্যমান অসুরের মতো

সামনাসামনি দাঁড়াইয়া ক্রোধে ফুলিতে থাকে। মাথা নীচু করিয়া আপন আপন শিঙ উদ্যত করিয়া সম্মুখের দুই পা মাটিতে ঠুকিতে আরম্ভ করে, তারপরই যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া যায়। এক রংলাল ছাড়া সে সময় আর কেহ তাহাদের মধ্যে যাইতে সাহস করে না। রংলাল প্রকাণ্ড একগাছা বাঁশের লাঠি হাতে নির্ভয়ে উহাদের মধ্যে পড়িয়া দুর্দান্তভাবে দুইটাকে পিটাইতে আরম্ভ করে। প্রহারের ভয়ে দুইটাই সরিয়া দাঁড়ায়। রংলাল সেদিন দুইটাকেই সাজা দেয়, পৃথক গোয়ালে তাহাদের আবদ্ধ করিয়া অনাহারে রাখে; তারপর পৃথকভাবেই তাহাদের স্নান করাইয়া পেট ভরিয়া খাওয়াইয়া তবে একসঙ্গে মিলিতে দেয়; সঙ্গে সঙ্গে অনেক উপদেশও দেয়, ছিঃ, ঝগড়া করতে নাই। একসঙ্গে মিলে-মিশে থাকবি—তবে তো!

যাক। বৎসর তিনেক পরে অকস্মাৎ একদিন একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়া গেল। গ্রীষ্মের সময় রংলাল নদীর ধারে বেশ একটি কুঞ্জবনের মতো গুল্মাচ্ছাদনের মধ্যে নিশ্চিন্ত নিদ্রায় মগ্ন ছিল। কালাপাহাড় ও কুম্ভকর্ণ অদূরেই ঘাস খাইতেছে। অকস্মাৎ একটা বিজাতীয় ফ্যাঁসফ্যাঁস শব্দে ঘুম ভাঙিয়া চোখ মেলিয়াই রংলালের রক্ত হিম হইয়া গেল। নিবিড় গুল্মবনটার প্রবেশ-পথের মুখেই একটা চিতাবাঘ হিংস্র দৃষ্টিতে তাহারই দিকে চাহিয়া আছে। হিংস্র লোলুপতায় তাহার দাঁতগুলা বাহির হইয়া পড়িয়াছে, সে ফ্যাঁসফ্যাঁস শব্দ করিয়া বোধ হয় আক্রমণের সূচনা করিতেছে। রংলাল ভীরু নয়, সে পূর্বে পূর্বে কয়েকবার চিতাবাঘ শিকারে একা বিশেষ অংশ গ্রহণ করিয়াছে। রংলাল বেশ বুঝিতে পারিল—সঙ্কীর্ণ প্রবেশ-পথের জন্যই বাঘটা ভিতরে প্রবেশ করিতে ইতস্তত করিতেছে। নতুবা ঘুমন্ত অবস্থাতেই সে তাহাকে আক্রমণ করিত। সে দ্রুত হামাগুড়ি দিয়া বিপরীত দিকে পিছাইয়া গিয়া কুঞ্জবনটার মধ্যস্থলে প্রকাণ্ড গাছটাকে আড়াল করিয়া আরম্ভ করিল, আঁ—আঁ—আঁ!

মুহূর্তের মধ্যে উত্তর আসিল, আঁ—আঁ—আঁ!

বাঘটা চকিত হইয়া কুঞ্জবনটার মুখ হইতে সরিয়া আসিয়া চারিদিকে চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিল—উহার দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে কালাপাহাড় ও কুম্ভকর্ণ। সেও দন্ত বিস্তার করিয়া গর্জন করিতে আরম্ভ করিল। রংলাল দেখিল—কালাপাহাড় ও কুম্ভকর্ণের সে এক অদ্ভুত মূর্তি! তাহাদের এমন ভীষণ রূপ সে কখনও দেখে নাই। তাহারা ক্রমশ পরস্পরের নিকট হইতে সরিয়া বিপরীত দিকে চলিতেছিল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই দেখা গেল—বাঘটার এক দিকে কালাপাহাড়, অন্যদিকে কুম্ভকর্ণ, মধ্যে বাঘটা চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। সে নিজের বিপদ বুঝিতে পারিয়াছে। বাঘটা ছোট, তবুও সে বাঘ। সে বোধ হয় অসহিষ্ণু হইয়া অকস্মাৎ একটা লাফ দিয়া কুম্ভকর্ণের উপর পড়িল। পরমুহূর্তেই কালাপাহাড় তাহার উদ্যত শিঙ লইয়া তাহাকে আক্রমণ

করিল। কালাপাহাড়ের শৃঙ্গাঘাতে বাঘটা কুম্ভকর্ণের পিঠ হইতে ছিটকাইয়া দূরে পড়িয়া গেল। আহত কুম্ভকর্ণ উন্মত্তের মতো বাঘটার উপর নতমস্তকে উন্নত শৃঙ্গ লইয়া ঝাঁপাইয়া পড়িল। কুম্ভকর্ণের শিঙ দুইটা ছিল অত্যন্ত তীক্ষ্ণ এবং অপেক্ষাকৃত সোজা—একটা শিঙ বাঘটার তলপেটে সোজা ঢুকিয়া গিয়া বাঘটাকে যেন গাঁথিয়া ফেলিল। মরণযন্ত্রণা-কাতর বাঘটাও দারুণ আক্রোশে তাহার ঘাড়টা কামড়াইয়া ধরিল। ওদিক হইতে কালাপাহাড়ও আসিয়া বাঘটার উপর শৃঙ্গাঘাত আরম্ভ করিল। রংলালও তখন বাহির হইয়া আসিয়াছে, সেও দারুণ উত্তেজনায় জ্ঞানশূন্যের মতো, চালাইতে আরম্ভ করিল তাহার বাঁশের লাঠি। কিছুক্ষণের মধ্যেই যুধ্যমান দুইটা জন্তুই মাটিতে গড়াইয়া পড়িল। বাঘটার প্রাণ তখনও থাকিলেও অত্যন্ত ক্ষীণ, শরীরে শুধু দুই একটা আক্ষেপমাত্র স্পন্দিত হইতেছিল। কুম্ভকর্ণ পড়িয়া শুধু হাঁপাইতেছিল, তাহার দৃষ্টি রংলালের দিকে। চোখ হইতে দরদর ধারে জল গড়াইতেছে।

রংলাল বালকের মতো কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

বিপদ হইল কালাপাহাড়কে লইয়া। সে অবিরাম আঁ—আঁ করিয়া চীৎকার করে আর কাঁদে।

রংলাল বলিল, জোড় নইলে ও থাকতে পারছে না। জোড় একটা এই হাটেই কিনতে হবে।

পর হাটেই সে অনেক দেখিয়া শুনিয়া চড়া দামে কালাপাহাড়ের জোড় কিনিয়া ফেলিল। টাকা লাগিল অনেক। একটারই দাম দিতে হইল দেড়শত টাকা। কিন্তু তবুও কালাপাহাড়ের যোগ্য সাথী হইল না। তবে এটার বয়স এখনও কাঁচা, এখনও বাড়িবে। ভবিষ্যতে দুই-এক বৎসরের মধ্যেই কালাপাহাড়ের সমকক্ষ হইবে বলিয়াই মনে হয়। এই তো সবে চারখানি দাঁত উঠিয়াছে।

কালাপাহাড় কিন্তু তাহাকে দেখিবামাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। সে শিঙ বাঁকাইয়া পা দিয়া মাটি খুঁড়িতে আরম্ভ করিল। রংলাল তাড়াতাড়ি কালাপাহাড়কে শিকলে আবদ্ধ করিয়া দূরে বাঁধিয়া বলিল, পছন্দ হচ্ছে না বুঝি ওকে? না, ওসব হবে না। মারলে হাড় ভেঙে দোব তোমার তা হলে হ্যাঁ!

নূতনটাকেও বাঁধিয়া জাব দিয়া সে বাড়ির ভিতর আসিয়া স্ত্রীকে বলিল, কালাপাহাড় তো খেপে উঠেছে একে দেখে। সে রাগ কত!

যশোদার মা বলিল, আহা বাপু, কুম্ভকর্ণকে বেচারা ভুলতে লারছে। কত দিনের ভাব!—কথাটা বলিয়াই সে স্বামীর দিকে চাহিয়া ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিল।

রংলালও হাসিল। এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিয়া সে ফিসফিস করিয়া বলিল, যেমন তোমাতে আমাতে!

মরণ তোমার, কথার ছিরি দেখ কেনে? ওরা হল বন্ধু।

তা বটে! রংলাল পরাজয় মানিয়াও পুলকিত না হইয়া পারিল না। তারপর বলিল, ওঠ ওঠ চল, জল তেল সিঁদুর হলুদ নিয়ে চল।

ঠিক এই সময়েই বাড়ির রাখালটা ছুটিয়া আসিয়া বলিল, ওগো মোড়ল মাশায়, শীগগির এস গো! কালাপাহাড় নতুনটাকে মেরে ফেলল!

সে কি রে? শেকল দিয়ে বেঁধে এলাম যে!

রংলাল ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। রাখালটাও পিছনে পিছনে আসিতে আসিতে বলিল, গোজ উপুড়ে ফেলালছে মাশায়! আর যে গাঙারছে! এতক্ষণ হয়তো মেরেই ফেলালে!

রংলাল আসিয়া দেখিল রাখালটার কথা একবিন্দুও অতিরঞ্জিত নয়। শিকল সমেত খুঁটিটাকে উপড়াইয়া সে আবদ্ধ নূতন মহিষটাকে দুর্দান্ত ক্রোধে আক্রমণ করিয়া প্রহার করিতেছে। নূতনটা একে কালাপাহাড়ের অপেক্ষা দুর্বল এবং এখনও তাহার বাল্যবয়স উত্তীর্ণ হয় নাই, তাহার উপর আবদ্ধ অবস্থায় একান্ত অসহায়ের মতো পড়িয়া গিয়া সে শুধু কাতর আর্তনাদ করিতেছে। রংলাল লাঠি মারিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু তবু কালাপাহাড়ের গ্রাহ্য নাই; সে নির্মমভাবে নবাগতকে আঘাত করিতেছিল। বহু কষ্টে যখন কালাপাহাড়কে কোনরূপে আয়ত্তাধীন করা গেল, তখন নূতন মহিষটার শেষ অবস্থা। রংলাল মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল।

যশোদা বলিল, ওকে আর ঘরে রাখা হবে না। বেচে দাও ওকে। আবার পর জোট আনলে ও আবার মারামারি করবে। ও মোষ গরম হয়ে গিয়েছে।

রংলাল কথার উত্তর দিতে পারিল না; সে নীরবে ভাবিতেছিল, যশোদার কথার জবাব নাই। সে সত্যই বলিয়াছে, কালাপাহাড়ের মেজাজ খারাপ হইয়া গিয়াছে। মহিষের মেজাজ একবার খারাপ হইলে আর সে শান্ত হয় না, বরং উত্তরোত্তর সে অশান্তই হইয়া উঠে। কিন্তু তবু চোখ দিয়া তাহার জল আসে। দিন কয়েক পর রাখালটা আসিয়া বলিল, আমি কাজ করতে লারব মশায়। কালাপাহাড় যে রকম ফোঁসাইছে, কোন্‌দিন হয়তো মেরেই ফেলাবে আমাকে।

রংলাল বলিল, যাঃ, ফোঁসফোঁস করা মোষের স্বভাব। কই, চল দেখি—দেখি!

রংলাল কালাপাহাড়ের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। রক্তচক্ষু লইয়া রংলালের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কালাপাহাড় তাহার মুখটা রংলালের কোলে তুলিয়া দিল। রংলাল পরম স্নেহে তাহার মাথা চুলকাইতে আরম্ভ করিল।

কিন্তু রাখাল তো অহরহ কালাপাহাড়ের কাছে থাকিতে পারে না যে, তাহাকে শান্ত করিয়া রাখিবে। অন্য কেহ গেলেই কালাপাহাড় অশান্ত স্বভাবের পরিচয় দেয়। মধ্যে মধ্যে মুখ তুলিয়া চীৎকার আরম্ভ করে—আঁ-আঁ-আঁ।

সে উর্ধ্বমুখ হইয়া কুম্ভকর্ণকে খোঁজে। দড়ি ছিঁড়িয়া সে ডাকিতে ডাকিতে ওই নদীর ধারের দিকে চলিয়া যায়। রংলাল ভিন্ন অন্য কেহ তাহাকে ফিরাইতে গেলেই সে রুখিয়া দাঁড়ায়।

সেদিন আবার একটা গোরুর বাছুরকে মারিয়া ফেলিল। এই বাছুরটির সহিত উহাদের বেশ একটি মিষ্ট সম্বন্ধ ছিল। কুম্ভকর্ণ ও কালাপাহাড় যখন পূর্ণ উদরে রোমন্থন করিত, তখন সে আসিয়া তাহাদের ডাবা হইতে জাব খাইয়া যাইত। নিতান্ত অল্প বয়সে বহু দিন অবুঝের মতো সে তাহাদের পেটতলায় মাতৃস্তন্যের সন্ধান করিত। কিন্তু সেদিন কালাপাহাড়ের মেজাজ ভালো ছিল না, বাছুরটা ডাবায় জাব খাইবার জন্য আসিয়া তাহার মুখের সম্মুখ দিয়াই মুখ বাড়াইল। কালাপাহাড় প্রচণ্ড ক্রোধে শিঙ দিয়া আঘাত করিয়া তাহাকে সরাইয়া দিল।

যশোদা আর রংলালের অপেক্ষা করিল না। সে পাইকার ডাকিয়া কালাপাহাড়কে বিক্রয় করিয়া দিল। নিতান্ত অল্প দামেই বেচিতে হইল।

পাইকারটা বলল, ষাট টাকাই হয়তো আমার লোকসান হবে। এ গরম মোষ কি কেউ নেবে মশায়?

যশোদা অনেক কথা কাটাকাটি করিয়া আর পাঁচটি টাকা মাত্র বাড়াইতে সক্ষম হইল। পাইকারটা কালাপাহাড়কে লইয়া চলিয়া গেল।

রংলাল নীরবে মাটির দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

আঁ—আঁ—আঁ!

রংলাল তখনও চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। আঁ—আঁ শব্দ শুনিয়া সে চমকিয়া উঠিল। সত্যই তো কালাপাহাড়! কালাপাহাড় ফিরিয়া আসিয়াছে। রংলাল ছুটিয়া গিয়া তাহার কাছে দাঁড়াইল। কালাপাহাড় তাহার কোলে মাথাটা তুলিয়া দিল।

পাইকারটা আসিয়া বলিল, আমার টাকা ফিরে দেন মশায়। এ মোষ আমি নেব না। বাপ রে, বাপ রে! আমার জান মেরে ফেলাত মশায়!

জানা গেল, খানিকটা পথ কালাপাহাড় বেশ গিয়াছিল, কিন্তু তাহার পরই সে এমন খুঁট লইয়া দাঁড়াইল যে, কার সাধ্য উহাকে এক পা নড়ায়!

পাইকারটা বলিল, লাঠি যদি তুললাম মশায়—ওরে বাপ রে, সে ওর চাউনি কি! তারপর এমন তাড়া আমাকে দিলেক, আমি আধকোশ ছুটে পালাই তবে রক্ষে। তখন

উ আপনার ফিরল, একবারে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলে এল। আমার টাকা কটা ফিরে দেন মশায়।

সে আপনার টাকা ফিরাইয়া লইয়া চলিয়া গেল। যশোদা বলিল, এক কাজ কর তবে, হাটে যাও বরং।

রংলাল বলিল, আমি পারব না।

আর কে নিয়ে যেতে পারবে, তুমি না গেলে?

অগত্যা রংলালই লইয়া গেল। পথে সে অনেক কাঁদিল। এই হাট হইতেই কালাপাহাড়কে সে কিনিয়াছিল।

কিন্তু ফিরিল সে হাসিতে হাসিতে। কালাপাহাড়কে কেহ কেনে নাই। ওই পাইকারটা সেখানে এমন দুর্নাম রটাইয়াছে যে কেহ তাহার কাছ দিয়াও আসে নাই।

যশোদা বলিল, তবে পরের হাটে যাও। এদিককার পাইকার ও হাটে বড় যায় না।

রংলালকে যাইতে হয়। যশোদা লেখাপড়াজানা রোজগেরে ছেলে, সে এখন বড় হইয়াছে, তাহাকে লঙ্ঘন রংলাল করিতে পারে না। আর কালাপাহাড়কে রাখিবার কথা যে সে জোর করিয়া বলিতে পারে না! অনেক ক্ষতিই যে হইয়া গেল! মহিষটার দাম দেড় শত টাকা, তারপর গোহত্যার জন্য প্রায়শ্চিত্তের খরচ সাত-আট টাকা! এই এক মাস চাষ বন্ধ হইয়া আছে, সে ক্ষতির মূল্য হিসাব-নিকাশের বাহিরে। হাটে একজন পাইকার কালাপাহাড়কে দেখিয়া অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিয়া কিনিল, এক বড় জমিদারের এমনই একটি মহিষের বরাত আছে। দামও সে ভালোই দিল—একশো পাঁচ টাকা।

রংলাল বলিল, এই দেখ ভাই, মোষটা আমার ভারি গা-ঘেঁসা। এখন এইখানে যেমন বাঁধা আছে থাক, আমি চলে যাই, তারপর তোমরা নিয়ে যেও। নইলে হয়তো চেঁচাবে, দুষ্টুমি করবে।

তাহার চোখ দিয়া জল পড়িতেছিল। পাইকারটা হাসিয়া বলিল, তা বেশ, থাকুক এইখানেই। তুমি যাও।

রংলাল তাড়াতাড়ি পা চালাইয়া একেবারে শহরের স্টেশনে ট্রেনে চাপিয়া বসিল। হাঁটিয়া ফিরিবার মতো শক্তি তাহার ছিল না।

কিছুক্ষণ পরই পাইকার কালাপাহাড়ের দড়ি ধরিয়া টান দিল। কালাপাহাড় তাহার দিকে চাহিয়া চকিত হইয়া চারিদিকে চাহিতে চাহিতে ডাকিল, আঁা—আঁা—আঁা!

সে রংলালকে খুঁজিতেছিল। কিন্তু কই—সে কই? পাইকারটা লাঠি দিয়া মৃদু আঘাত করিয়া তাড়া দিল, চল চল।

কালাপাহাড় আবার ডাকিল, আঁ—আঁ—আঁ!

সে খুঁট পাতিয়া দাঁড়াইল, যাইবে না।

পাইকারটা আবার তাহাকে আঘাত করিল। কালাপাহাড় পাগলের মত চারিদিকে রংলালকে খুঁজিতেছিল।

কই, সে কই? নাই, সে তো নাই!

কালাপাহাড় দুর্দান্ত টানে পাইকারের হাত হইতে আপন গলার দড়ি ছিনাইয়া লইয়া ছুটিল।

এই পথ! এই পথ দিয়া তাহারা আসিয়াছে। উর্ধ্বমুখে সে ছুটিতেছিল, আর প্রাণপণে ডাকিতেছিল, আঁ—আঁ—আঁ!

পাইকারটা কয়েক জনকে জুটাইয়া লইয়া কালাপাহাড়ের পথরোধ করিল, কিন্তু দুর্দান্ত কালাপাহাড় পিঠের উপর লাঠিবর্ষণ অগ্রাহ্য করিয়া সম্মুখের লোকটাকেই শিঙ দিয়া শূন্যে নিক্ষেপ করিয়া আপন পথ মুক্ত করিয়া লইয়া উন্মত্তের মতো ছুটিল।

কিন্তু এ কি! এ সব যে তাহার সম্পূর্ণ অপরিচিত!

শহরের রাস্তার দুই পাশে সারি সারি দোকান, এত জনতা! ওটা কী?

একখানা ঘোড়ার গাড়ি আসিতেছিল। কালাপাহাড় ভয়ে একটা পাশের রাস্তা দিয়া ছুটিল।

রাস্তার লোকজন হৈ হৈ করিতেছিল, কার মোষ? কার মোষ? ও কি অদ্ভুত আকার—বিকট শব্দ!

একখানা মোটরকার আসিতেছে। কালাপাহাড়ের জ্ঞান লোপ পাইয়া গেল, তাহার মনশ্চক্ষে আপনার বাড়িখানি দেখিতেছিল, আর রংলালকে তারস্বরে ডাকিতেছিল। সে একেবারে একখানা পানের দোকান চুরমার করিয়া দিয়া আবার বিপরীত দিকে ফিরিল।

লোকজন প্রাণভয়ে ছুটিয়া পালাইতেছিল। কালাপাহাড়ও প্রাণভয়েই ছুটিতেছিল। দেখিতে দেখিতে দুইটা লোক জখম হইয়া গেল। কালাপাহাড় ছুটিতেছে, আর রংলালকে ডাকিতেছে, আঁ—আঁ—আঁ! কিন্তু এ কী! ঘুরিয়া ফিরিয়া সে কোথায় যাইতেছে? কোথায় কত দূরে তাহার বাড়ি?

আবার সেই বিকট শব্দ! সেই অপরিচিত জানোয়ার! এবার সে ক্রুদ্ধ বিক্রমে তাহার সহিত লড়িবার জন্য দাঁড়াইল।

মোটরখানাও তাহারই সন্ধানে আসিয়াছে। পুলিস সাহেবের মোটর। পাগলা মহিষের সংবাদ পৌঁছিয়া গিয়াছে।

মোটরখানাও দাঁড়াইল। কালাপাহাড় প্রচণ্ড বিক্রমে অগ্রসর হইল।—কিন্তু

তাহার পূর্বেই ধ্বনিত হইল একটা কঠিন উচ্চ শব্দ। কালাপাহাড় কিছু বুঝিল না, কিন্তু অত্যন্ত কঠিন নিদারুণ যন্ত্রণা—মুহূর্তের জন্য। তারপর সে টলিতে টলিতে মাটিতে লুটাইয়া পড়িল।

সাহেব রিভলবারটা খাপে পুরিয়া সঙ্গের কনেস্টবলকে নামাইয়া দিলেন, বলিলেন, ডোমলোগকো বোলাও।

তাসের ঘর

অমর শখ করিয়া চায়ের বাসনের সেট কিনিয়াছিল। ছয়টা পিরিচ-পেয়ালা, চাদানি ইত্যাদি রং-চং-করা সুদৃশ্য জিনিস, দামও নিতান্ত অল্প নয়,—চার টাকা। চার টাকা মধ্যবিত্ত গৃহস্থের পক্ষে অনেক।

অমরের মায়ের হুকুম ছিল, সেটটি যত্ন করে তুলে রেখো বউমা, কুটুম্বসজ্জন এলে, ভদ্রলোকজন এলে বের কোরো।

কলিকাতা-প্রবাসী হরেন্দ্রবাবুরা দেশে আসিয়াছেন, আজ তাঁহাদের বাড়ির মেয়েরা অমরদের বাড়িতে বেড়াইতে আসিবেন ; তাহারই উদ্যোগ-আয়োজনে বাড়িতে বেশ সমারোহ পড়িয়া গিয়াছে !

মা বলিলেন, চায়ের সেটটা আজ বের কর তো গৌরী !

গৌরী বাড়ির মেয়ে—অমরের অবিবাহিতা ভগ্নী। মা চাবির গোছাটা গৌরীর হাতে দিলেন। গৌরী বাসনের ঘর খুলিয়া জার্মান সিল্‌ভারের ট্রে-সমেত সেটটি বাহির করিয়া আনিয়া বলিল, পাঁচটা কাপ রয়েছে কেন মা, আর একটা কাপ কি হল ? এই দেখ বাপু সবে এই আমি বের করে আনছি, আমার দোষ দিও না যেন !

বিরক্ত হইয়া মা বলিলেন, দেখ না ভালো করে খুঁজে, ঘরেই কোথাও আছে। পাখা হয়ে উড়ে তো যাবে না !

গৌরী সেটটা সেইখানে নামাইয়া আবার ভালো করিয়া ঘর খুঁজিয়া আসিয়া বলিল, পাখাই হল, না কেউ খেয়েই ফেলল, সে আমি জানি না বাপু, তবে ঘরের মধ্যে কোথাও নেই।

দুমদাম করিয়া মা ঘরে প্রবেশ করিতে করিতে বলিলেন, তোমার দোষ কি মা, আমার কপালের দোষ ! তোমরা চোখ কপালের ওপর তুলে কাজ কর, নীচের জিনিস দেখতে পাও না।

গৌরীর চোখ হয়তো কপালের উপরেই উঠিয়া থাকে, কিন্তু এক্ষেত্রে গৌরীর অপরাধ প্রমাণিত হইল না।—পেয়ালাটা খুঁজিয়া পাওয়া গেল না।

মা হাঁকিলেন, বউমা বউমা!

বউমা—অমরের স্ত্রী শৈল—উপরে তখন ঘর-দুয়ার ঝাড়িয়া পরিষ্কার করিয়া অতিথিদের বসিবার স্থান করিতেছিল, সে নীচে আসিয়া শাশুড়ীর কাছে দাঁড়াইয়া বলিল, আমায় ডাকছেন?

শাশুড়ী বাসন-অন্ত-প্রাণ, সিন্দুকের চাবি পুত্রদের দিয়া বাসনের ঘরে চাবি লইয়াই বাঁচিয়া আছেন। পেয়ালাটার খোঁজ না পাইয়া ফুটন্ত তেলে নিক্ষিপ্ত বার্তাকুর মতো সশব্দে জ্বলিতেছিলেন, তিনি বলিলেন, হ্যাঁ গো রাজার কন্যে, নইলে বউমা বলে ডাকা কি ওই বাউড়িদের না ডোমেদের?

শৈল নীরবেই দাঁড়াইয়া রহিল, উত্তর করা তার অভ্যাস নয়।

শাশুড়ী বলিলেন, একটা পেয়ালা পাওয়া যাচ্ছে না কেন, কী হল? একটু নীরব থাকিয়া বধূ বলিল, ওটা আমিই ভেঙে ফেলেছি মা।

শাশুড়ী কিছুক্ষণ বধূর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, বেশ করেছ মা, কী আর বলব বল!

সত্য কথা, এমন অকপটভাবে অপরাধ স্বীকার করিলে অপরাধীকে মার্জনা করা ছাড়া আর উপায় থাকে না। সশব্দে দরজাটা বন্ধ করিয়া দিয়া শাশুড়ী বলিলেন, ও পাঁচটাকেও ফেলে দেব আমি চুরমার করে ভেঙে।

রাগ গিয়া পড়িল চায়ের সেটটার উপর।

শৈল সবই সহ্য করে, সে নীরবেই দাঁড়াইয়া রহিল। শাশুড়ী বলিলেন, ভেঙেছ বলা হল, বেশ হল, আবার চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? যাও, ওপরের কাজ সেরে এস, জলখাবারগুলো করতে হবে।

শৈল উপরে চলিয়া গেল, কিছুক্ষণ পরেই হাসিমুখে আসিয়া রান্নাঘরে শাশুড়ীর কাছে দাঁড়াইল।

শাশুড়ীর মনের উত্তাপ কমিয়া আসিয়াছিল, বলিলেন, নাও, তোমাদের দেশের মতো খাবার তৈরি কর।

শৈল খাবারের সাজ-সরঞ্জাম টানিয়া লইয়া বসিয়া বলিল, সমস্তর ভেতরেই মাছের পুর দোব তো মা?

অ্যাঁ, মাছের পুর? হ্যাঁ, তা দেবে বইকি, বিধবা তো কেউ আসছে না!

ময়দার ঠোঙার ভিতরে মাছের পুর দিতে দিতে শৈল বলিল, জানেন মা, এর সঙ্গে যদি একটুখানি হিং দেওয়া হত—ভারি চমৎকার হত। বাবার আমার হিং

ভিন্ন কোন জিনিস ভালো লাগে না। আর যে-সে হিং আমাদের বাড়িতে ঢুকতে দেন না; আফগানিস্থান থেকে কাবুলী সব আসে, তারাই দিয়ে যায়।

শাশুড়ী বলিলেন, পশ্চিম ভালো জায়গা মা, আমাদের পাড়াগাঁয়ের সঙ্গে কি তুলনা হয়, না সেসব জিনিস পাওয়া যায়?

শৈল বলিল, পশ্চিমেও সে হিং পাওয়া যায় না, মা। কাবুলীরা সেসব নিজেদের জন্যে আনে, শুধু বাবাকে খুব খাতির করে কিনা, টাকা-কড়ি অনেক সময় নেয়—তাই সে জিনিস দেয়। শুধু কি হিং, যখন আসবে তখন প্রত্যেকে আঙুর, বেদানা, নাশপাতি, বাদাম, হিং—এ সব ছোট ছোট ঝুড়ি দিয়ে যায়। পাঁচজনের মিলে সে হয় কত! কাঁচা জিনিস অনেক পচেই যায়।

ও ঘরের বারান্দা হইতে ননদ গৌরী মৃদুস্বরে বলিল, এই আরম্ভ হল এইবার।

অর্থাৎ বাপের বাড়ির গল্প আরম্ভ হইল। সত্য কথা, শৈলর ওই এক দোষ; বিনীত, নম্র, মিষ্টমুখী, সুন্দরী বউটি প্রত্যেক কথায় তাহার বাপের বাড়ির তুলনা না দিয়া থাকিবে না।

পাশের বাড়িতে তুমুল কোলাহল উঠিতেছিল, শাশুড়ী এবং বধূতে কলহ বাধিয়াছে।

শৈলর শাশুড়ী বলিলেন, যা হবে তাই হোক মা। আমার বউ ভালো হয়েছে, উত্তর করতে জানে না; দোষ করলে বকব কি! মুখের দিকে চাইলে মায়া হয়।

শৈল বলিল, ওঁর ছেলে স্ত্রীকে শাসন করেন না কেন? জানেন মা, আমার দাদা হলে আর রক্ষে থাকত না। সঙ্গে সঙ্গে বউকে হয়তো বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিতেন। একবার বউদি কি উত্তর করেছিলেন মায়ের সঙ্গে দাদা তিন মাস বউদির সঙ্গে কথা কন নি। শেষে মা আবার বলেকয়ে কথা বলান। তবে দাদার আমার বড্ড বাতিক—খদ্দর পরবে হাঁটু পর্যন্ত, জামা সেই হাতকাটা—এতটুকু; তামাক না, বিড়ি না, সিগারেট না,—সে এক বাতিকের মানুষ!

শাশুড়ী বোধ হয় মনে মনে একটু বিরক্ত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, নাও নাও, তাড়াতাড়ি হাত চালিয়ে নাও; দেখো, যেন মাছের কাঁটা না থাকে!

শৈল বলিল, ছোট মাছ—কাঁটা বাছতেই হাত চলছে না মা; তবে এই হয়ে গেল।

কড়ায় এক ঝাঁক শিঙাড়া ছাড়িয়া দিয়া, সে আবার বলিল, মা আমার কক্ষনো ছোট মাছ বাড়িতে ঢুকতে দেন না। দু সেরের কম মাছ হলেই, সঙ্গে সঙ্গে ফেরত দেবেন। কুচো-মাছের মধ্যেময়া, আর কাঠ-মাছের মধ্যে মাগুর।

শাশুড়ী বাধা দিয়া বলিলেন, নাও নাও; সেরে নিয়ে চুলটুল বেঁধে ফেল গে।

কেশ প্রসাধন অন্তে শৈল কাপড় ছাড়িতেছিল।

ননদ গৌরী প্রশংসমান দৃষ্টিতে ভ্রাতৃজায়ার দিকে চাহিয়া বলিল, উঃ, রং বটে তোমার বউদি! তুমি যা পরবে, তাতেই তোমাকে সুন্দর লাগবে, আর আমাদের দেখ না, যেন কাঠ পুড়িয়ে—

শৈল বলিল, এ যে দেবার নয় ভাই, নইলে তোমাকে দিতাম। আমার আর কী রং দেখছ! বাবা মা দাদা আমার অন্য বোনেদের যদি দেখতে, তবে দেখতে রং কাকে বলে; ঠিক একেবারে গোলাপ ফুল।

গৌরী বিস্মিত হইয়া বলিল, বল কি বউদি, তোমার চেয়ে ফরসা রং?

হ্যাঁ ভাই, বাড়ির মধ্যে আমিই কালো।

শাশুড়ী আসিয়া চাপা গলায় বলিলেন, আর কত দেরি বউমা, ওঁরা যে সব এসে গেছেন।

শৈল তাড়াতাড়ি মাথার কাপড়টা টানিয়া দিয়া বলিল, এই যে মা হয়ে গেছে আমার।

ধনী কলিকাতা-প্রবাসিনীদের মহার্ঘ উজ্জ্বল সজ্জা ভূষণ রূপ সমস্তকে লজ্জা দিয়া শৈল আবির্ভূতা হইল—নক্ষত্রমণ্ডলে চন্দ্রকলার মতো।

প্রবাসিনীর দল মুগ্ধ হইয়া দেখিতেছিল, শৈল হাসিমুখে প্রণাম করিল।

ও বাড়ির গিন্নী বলিলেন, এ যে চাঁদের মতো বউ হয়েছে তোমার দিদি! লেখাপড়া-টড়াও জানে নাকি?

শৈল মৃদুস্বরে বলিল, স্কুলে তো পড়ি নি, বাবা স্কুলের শিক্ষা বড় পছন্দ করেন না। বাড়িতে পড়েছি, ম্যাট্রিক স্ট্যাণ্ডার্ড শেষ হয়েছিল; তারপরই—

কথাটা অসমাপ্ত থাকিলেও ইঙ্গিতে সমাপ্ত হইয়া গেল।

ও বাড়ির গিন্নী বলিলেন, কে জানে মা, আজকাল কী যে হাল হল দেশের, মেয়েদের আর কলেজে না পড়লে বিয়ে হচ্ছে না! আমার বউরা তো কলেজে পড়ছিল সব; বিয়ের পর আমি ছাড়িয়ে দিলাম।

শৈল উত্তর দিল, কলেজের কোর্স আমিও কিছু পড়েছি। তবে আমার বোনরা সব ভালো করে পড়েছে; বাড়িতে দাদাই পড়ান, পড়াশোনায় দাদার ভয়ানক বাতিক কিনা, জানেন—বছরে পাঁচ-সাত শো টাকার বই কেনেন—বাংলা, ইংরিজী! বিলেত থেকে ইংরিজী বই আনাবেন। কাজকর্ম যদি করতে বলবেন মা,—কাজকর্ম অবিশ্যি বাবারই বিজনেস আছে—সেই বিজ্‌নেস দেখতে বলেন তো বলবেন, সম্মুখে জ্ঞানসমুদ্র মা, চোখ ফেরাবার আমার অবকাশ নেই।

কোথায় তোমার বাপের বাড়ি?

এলাহাবাদ। এলাহাবাদ গেছেন নিশ্চয়ই. আমাদের সেখানে তিন পুরুষ বাস হয়ে গেল। বাবা সেখানে কণ্ট্রাক্টরি করেন।

কী রকম পান-টান ?

আমি তো ঠিক জানি না। তবে মেজ ভাই বলেন মাঝে মাঝে, এ রকম করে আর চলবে না মা, তুমি বাবাকে বল। পাকা বাড়িগুলো ভাড়া দিয়ে নিজে সেই খোলার বাড়িতে থাকবেন, টোঙায় চড়ে কাজ দেখে বেড়াবেন, মটর কিনবেন না, এ করে চলবে না। বাবা বলেন, এ আমার পৈত্রিক বাড়ি, যেমন আছে তেমনই থাকবে, ভাঙবও না, অন্য কোথাও যাবও না। আর গাড়ি। গাড়িও আমি কিনব না, ছেলেরা বিলাসী হবে। আমি রোজগার করছি, তারা যদি না পারে ! জানেন, লোকে বলে—মহেন্দ্রবাবু এক হিসেবে সন্ন্যাসী !

শৈল কথা শেষ করিয়া মৃদু মৃদু মিষ্ট হাসি হাসে।

প্রবাসিনী গিন্নী এবার শৈলর শাশুড়ীকে বলিলেন, তা হলে ছেলের তোমার বেশ বড় ঘরেই বিয়ে হয়েছে দিদি। তোমাদের চেয়ে অনেক বড় ঘর। তত্ত্ব-তল্লাস করেন কেমন বেয়াইরা ?

বিচিত্র সংসার, বিচিত্র মানুষের মন, কোন্ কথায় কে যে আঘাত পায় সে বোঝা, বোধ করি, বিধাতারও সাধ্য নয় ! তোমাদের চেয়ে বড় ঘর—এই কথাটুকুতেই অমরের মা আহত হইয়া উঠিলেন, তিনি মুখ বাঁকাইয়া বলিলেন, কে জানে দিদি, বড় না ছোট সে জানি না। তবে বউমাই বলেন, বাপেদের এই, বাপেদের ওই ; কিন্তু তত্ত্বতল্লাসও দেখি না, আজ দু বছর ওই দুধের মেয়ে এসেছে, নিয়ে যাওয়ার নাম পর্যন্ত নেই !

শৈল মুহূর্তে বলিয়া উঠিল, জানেন তো মা, বাবার আমার অদ্ভুত ধরন ! তিনি বলেন, যে বস্তু আমি দান করলাম, সে আবার আমি কেন 'আমার' বলে আমার ঘরে আনব ! তবে যাকে দান করলাম—সে যদি স্বেচ্ছায় নিয়ে আসে, তখন তাদের আদর করব, সম্মান করব, আমার বলব। আর তত্ত্ব-তল্লাস এত দূর থেকে করা সম্ভব হয়ে ওঠে না ; কিন্তু টাকা তো চাইলেই দেন তিনি, যখন চাইবেন তখনই দেবেন।

শাশুড়ী বলিয়া উঠিলেন, কী বললে বউমা, তোমার বাবা আমাদের টাকা দেন—কখন, কোন্ কালে ?

শৈল বলিল, আপনাদের কথা তো বলি নি মা ; আপনি জিজ্ঞেস করে দেখবেন, একশো পঞ্চাশ আশি—চাইলেই তিনি দেন, কেন দেবেন না ?

শাশুড়ীর মুখ কালো হইয়া উঠিল। শুধু স্বগ্রামবাসী নয়, উপস্থিত মহিলাবৃন্দ প্রবাসিনী—দেশ-দেশান্তরে এ সংবাদ রটিয়া যাইবে। অমরের মায়ের মাথা যেন কাটা গেল।

তিনি বলিলেন, ভালো, অমর আসুক, আমি জিজ্ঞাসা করব। ঘুণাক্ষরেও তো আমি জানি না!

ও বাড়ির গিন্নী বললেন, তোমায় হয়তো বলে নি অমর। দরকার হয়েছে, শ্বশুরের কাছে নিয়েছে।

অমরের মা বলিলেন, সে নেবে কেন ভাই? সে নেওয়া যে তার অন্যায়—নীচ কাজ। ছিঃ, শ্বশুরের কাছে হাত পাতা, ছিঃ!

অমর কাজ করে কলিকাতায়, সেখানে সে অর্ডার সাপ্লাইয়ের ব্যবসা করিয়া থাকে। ব্যবসা হইলেও ক্ষুদ্র তার আয়তন, সঙ্কীর্ণ তার পরিধি, তবুও সে স্বাধীন; তাই মাসে দুইবার করিয়া বাড়ি সে আসিয়া থাকে। অমরের মা রোষকষায়িত নেত্রে পুত্রের আগমনপথের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

ধনী কলিকাতা-প্রবাসিনীদের সম্মুখে যে অপমান তাঁহার হইয়াছে, সে তিনি কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছেন না। শুধু তাঁহার সংসারের অস্বচ্ছলতাই নগ্নভাবে আত্মপ্রকাশ করে নাই; তাঁহাকে মিথ্যাবাদিনী সাজিতে হইয়াছে। এ কয়দিন বধূর সঙ্গেও একরূপ বাক্যালাপ করেন নাই। শৈল অবশ্য সে বিষয়ে দোষী নয়, সে সদাসর্বদাই মুখে হাসিটি মাখিয়া শাশুড়ীর আজ্ঞার জন্য তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকে।

সংসারের নিয়ম—কাল অগ্নির উত্তাপও হরণ করিয়া থাকে, মনের আগুনও নিভিয়া আসে। কিন্তু শৈলর দুর্ভাগ্য, শাশুড়ীর মনের আগুন-শিখা হ্রস্ব হইতে না হইতে ইন্ধনের প্রয়োগে দ্বিগুণ হইয়া উঠিল। পাড়ায় ঘরে ঘাটে এই লইয়া যে কানাকানি চলিতেছিল, সেটা ভালভাবেই ক্রমশ জানাজানি হইয়া গেল।

সেদিন সরকারদের মজলিশে একদফা প্রকাশ্য আলোচনার সংবাদ অমরের মা স্বকর্ণেই শুনিয়া আসিলেন।

দিন দশেক পরেই কিসের একটা ছুটি উপলক্ষ্যে অমর বাড়ি আসিবার কথা জানাইয়া দিল। শৈলর মাথায় যেন আকাশ ভাঙিয়া পড়িল। কথাটা মিথ্যা, বার বার সঙ্কল্প করিয়াও সে এ বিষয়ে স্বামীকে কোন কথা লিখিতে পারে নাই—কোন অনুরোধ জানাইতে কেমন যেন লজ্জা বোধ হইয়াছে, তাহার হাত চলে নাই, ঠোঁট কাঁপিয়াছে, চোখে জলও দেখা দিয়াছে; সে চিঠির কাগজখানা জড়ো করিয়া মুড়িয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছে। শৈল আপনার শয়নকক্ষে স্তব্ধ প্রতীক্ষায় স্বামীর জন্য বসিয়া রহিল, অমর আসিলেই সে তাহার পায়ে আছাড় খাইয়া পড়িবে।

অকস্মাৎ অমরের উচ্চ ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বরে সে চমকিয়া উঠিল, অন্ধকারের আবরণের

মধ্যে চোরের মতো নিঃশব্দে বাহিরে আসিয়া সে আশ্বস্ত হইল। ক্রোধের প্রসঙ্গ তাহাকে লইয়া নয়, অমর বচসা জুড়িয়া দিয়াছে কুলির সহিত।

এই আধ মাইল—মালের ওজন আধ মণ পঁচিশ সের, তোকে দু আনা দিলাম—আবার কত দোব?

লোকটাও ছাড়িবার পাত্র নয়। সে বলিতেছিল, তখন আপনি চুকিয়ে নেন নাই কেন মশায়? তখন যে একেবারে হুকুম ঝাড়লেন—এই—ইধার আও। আমাদের রেট তিন আনা করে, হ্যান, দিতে হবে!

নিকালো বেটা হারামজাদা, নিকালো বলছি—এই নে পয়সা—কিন্তু এখুনি নিকালো সামনে থেকে বলছি।

পয়সা ফেলিয়া দিয়া অমর ক্রুদ্ধ পদক্ষেপে বাড়ি ঢুকিল।

দেখ না. লোকসান যেদিন হয়, সেদিন এমনই করেই হয়। পঞ্চাশটা টাকা মেরে একজন পালাল, তারপর ট্রেন ফেল, আবার বাড়ি এসেও চারটে পয়সা লোকসান!

মাও বোধ করি প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন, তিনি শান্ত অথচ শ্লেষতীক্ষ্ণ কণ্ঠে কহিলেন, তার জন্যে আর তোমার চিন্তা কী বাবা? বড়লোক শ্বশুর রয়েছেন, তাঁকে লেখ, তিনি পাঠিয়ে দেবেন।

অর্থ না বুঝিলেও শ্লেষতীক্ষ্ণ বাক্যশর আঘাত করিতে ছাড়ে নাই। অমর ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল, তার মানে?

মা বলিলেন, সেই জন্যই তো তোমার পথ চেয়ে দাঁড়িয়ে আছি বাবা। আমি শুনব—তুমি আমাকে তোমার রোজগারের অন্ন খাওয়াও, না তোমার শ্বশুরের দানের অন্নে আমাকে পিণ্ডি দাও? তুমি নাকি তোমার শ্বশুরের কাছ থেকে টাকা চাও, আর শ্বশুর তোমায় টাকা পাঠিয়ে দেন—একশো পঞ্চাশ আশি, যখন যেমন তোমার দরকার হয়?

ক্লান্ত তিক্তচিত্ত অমরের মস্তিষ্কে মুহূর্তে যেন আগুন জ্বলিয়া উঠিল। সে বলিয়া উঠিল, কে, কোন্ হারামজাদা হারামজাদী সে কথা বলে?

মা ডাকিলেন, বউমা!

শৈলর চক্ষের সম্মুখে চারিদিক যেন দুলিতেছে—কী করিবে, কী বলিবে কোন নির্ধারণই সে স্থির করিতে পারিল না।

শৈল বিহ্বলের মতো বলিয়া ফেলিল, হ্যাঁ, বাবা দেন তো!

অমর মুহূর্তে উন্মত্তের মতো দেওয়ালে মাথা কুটিতে আরম্ভ করিল। মা তাড়াতাড়ি তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন।

অমর বলিল, ও বাড়িতে থাকলে আমি জলগ্রহণ করব না।

মা বলিলেন, আমার মাথা কাটা গেল—হরেনবাবুর বাড়ির মেয়েদের কাছে। এমন বউ নিয়ে আমিও ঘর করতে পারব না বাবা।

বিচারক যেখানে বিধিবদ্ধ বিধানের মধ্যে আবদ্ধ নয়, সেখানে বিচার হয় না, বিচারের নামে ঘটে স্বেচ্ছাচার। তাই ঐটুকু অপরাধে শৈলর অদৃষ্টে গুরু দণ্ড হইয়া গেল, সেই রাত্রেই তাহার নির্বাসনের ব্যবস্থা হইল। রাত্রি বারোটার ট্রেনে শৈলর দেবর তাহাকে লইয়া এলাহাবাদ রওনা হইয়া গেল।

শৈলকে দেখিয়াই তাহার মা আনন্দে বিস্ময়ে আকুল হইয়া বলিলেন, এ কি শৈল, তুই যে এমন হঠাৎ?

শৈল ঢোঁক গিলিয়া বলিল, কেন মা, আমাকে কি আসতে নেই? তোমরা তো আনলে না, কাজেই নিজেই এলাম।

মেয়েকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া মা বলিলেন, ওরে, আনতে কি অসাধ, না আমার মনেই ব্যথা হয় না, কিন্তু কী করব, বল?

একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আবার বলিলেন, বাবুর রোজগার কমে গেছে, বাজার নাকি বড় মন্দা! তার ওপর হৈমির বিয়ে এসেছে—খরচ যে করতে পারছি না মা।

শৈল অবকাশ পাইয়া অঝোরঝরে কাঁদিয়া বুক ভাসাইয়া দিল।

মা বলিলেন, সঙ্গে কে এসেছে শৈলী, জামাই?

শৈল বিবর্ণমুখে বলিল, না, আমার দেওর এসেছে।

কই সে, ওমা বাইরে কেন সে?—ঘরের ছেলে। ওরে দাই, দেখ তো বড়দিদির দেওর বাইরে আছেন, ডাক তো! বল, মা ডাকছেন। শৈলর বুক দুরদুর করিতেছিল। কনিষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি অমরের আদেশ ছিল, সে যেন এখানে জলগ্রহণ না করে। কঠিন শপথ দিয়া আদেশ দিয়াছে অমর।

দাই ফিরিয়া আসিয়া বলিল, কই, কেউ তো নেই!

মা আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, সে কি? কোথায় গেল সে?

শৈল বলিল, তাকে ট্রেন ধরতে হবে মা, সে চলে গেছে।

বিস্ময়ের উপর বিস্ময়ে মা যেন অভিভূত হইয়া গেলেন। ট্রেন ধরতে হবে—চলে গেছে—সে কি?

শৈল বলিল, তাকে সিমলে যেতে হবে মা—একটা খুব বড় কাজের সন্ধান করতে যাচ্ছে; যে ট্রেনে আমরা নামলাম, এই ট্রেনই সে গিয়ে ধরবে, থাকবার তার উপায় নেই।

মা আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন, ফিরবার সময় নামতে বলে দিয়েছিস তো?

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া শৈল বলিল, বলে তো দিয়েছি মা, কিন্তু নামতে বোধ হয় পারবে না, খুব জরুরী কাজ কিনা! সিমলে থেকে কলকাতায় যাবে একটা কার চিঠি নিয়ে, সময়ে পৌঁছুতে না পারলে তো সব মিছে হবে।

এই সময়েই শৈলর জ্ঞানান্বেষী বড়দাদা বাড়ি ঢুকিল। পরনে তাঁহার খদ্দর সত্য, কিন্তু জরিপাড় শৌখীন খদ্দরের ধুতি, গায়েও শৌখীন খদ্দরের পাঞ্জাবি, মুখে একটা গোল্ডফ্লেক সিগারেট; হাতে কতকগুলি মাছ ধরিবার চারের উপকরণ।

শৈলকে দেখিয়াই সে বলিল, আরে শৈলী কখন, অ্যাঁ?

হাসিমুখে শৈল বলিল, এই সকালে দাদা, ভালো আছেন আপনি?

হ্যাঁ। তা বেশ, কই, তুই নতুন লোক, খাস বাংলা দেশের মানুষ—কই, দে তো এই চারগুলো তৈরি করে, দেখি তোর হাতের কেমন পয়! মাছ ধরতে যাব আজ দেহাতে—এক জমিদারের তালাওয়ে।

শৈল উপকরণগুলি হাতে লইয়া বলিল, চলুন না দাদা, একবার আমাদের ওখানে, কত মাছ ধরতে পারেন একবার দেখব!

তোদের ওখানে পুকুরে খুব মাছ, না রে?

আমাদেরই পুকুরে খুব বড় বড় মাছ;—আধ মণ, পনেরো সের, পঁচিশ সের এক-একটা মাছ।—জানেন দাদা, তখন প্রথম গেছি, একটা আঠারো সের কাতলা মাছ এনে দেওর বললে, বউদিকে কুটতে হবে! ওরে বাপরে, সে যা আমার ভয়! এখন আর ভয় হয় না—আধ মণ, পঁচিশ সের মাছ দিব্যি কেটে ফেলি।

যাবার ইচ্ছে তো হয় রে, হয়ে ওঠে না। কলকাতা যাই, তাও অমরবাবুর সঙ্গে দেখা করতে সময় হয় না। আবার তুই অবিশ্যি যদি কলকাতায় থাকতিস—তবে নিশ্চয় যেতাম।

শৈল বলিল, আচ্ছা দেখব, আমাদেরও কলকাতায় বাড়ি হবে এইবার—

অর্ধপথে বাধা দিয়া দাদা বলিল, কলকাতায় তোদের বাড়ি হচ্ছে নাকি?

শৈল বলিল, জায়গা কিনছেন। ধীরে ধীরে হবে এইবার।

মা পুলকিত হইয়া প্রশ্ন করেন, জামাই এখন বেশ পাচ্ছেন, না রে শৈলী?

শৈল মুখ নত করিয়া বলিল, দেশেও দালান করবেন।

মাস দুয়েক পরই কিন্তু শৈলর মা অনুভব করিলেন, কোথাও একটা অস্বাভাবিক কিছু ঘটিয়াছে, জামাই বা বেয়ান কেহই তো শৈলকে পত্র দেন না, সংবাদ লন না! তিনি স্বামীকে বলিলেন, দেখ, তুমি বেয়ানকে একখানা পত্র লেখ!

মহেন্দ্রবাবু নিরীহ ব্যক্তি, শৈল অন্যের সম্বন্ধে যতই অত্যুক্তি করিয়া থাক, তাহার পিতার উপার্জনকে যতই বাড়াইয়া বলিয়া থাক, পিতার প্রকৃতি সম্বন্ধে অত্যুক্তি সে করে নাই। সত্যই তিনি সাধুপ্রকৃতির নিরীহ ব্যক্তি।

মহেন্দ্রবাবু স্ত্রীর কথায় শঙ্কিত হইয়া পরদিনই বেয়ানকে পত্র দিলেন। লিখিলেন—

আমি আপনার অনুগৃহীত ব্যক্তি, শৈলকে চরণে স্থান দিয়া আপনি আমার প্রতি অশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। আশা করি—প্রার্থনা করি, সে অনুগ্রহ হইতে আমি বা আমার শৈল যেন কখনও বঞ্চিত না হই। আমি বুঝিতে পারিতেছি না, সেখানে কী ঘটিয়াছে, শৈল কী অপরাধ করিয়াছে, কিন্তু অপরাধ যে করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। সে কোন কথা প্রকাশ করে নাই ; তবুও এই দীর্ঘ দুই মাসের মধ্যে কই আপনার কোন আশীর্বাদ তো আসিল না! শ্রীমান অমর বাবাজীবনও তো কোন পত্র দেন না! দয়া করিয়া কী ঘটিয়াছে, আমাকে জানাইবেন ; আমি নিজে শৈলকে আপনার চরণে উপস্থিত করিয়া তাহার শাস্তি দিব।

তারপর শেষে আবার লিখিলেন—

অমর সংবাদ না দিলেও শৈলর নিকট তাহার উন্নতির কথা শুনিয়া বড়ই সুখী হইলাম। কলিকাতায় বাড়ি করিবে শুনিয়া পরম আনন্দ হইল। আপনার মেজছেলের পরীক্ষার সংবাদ শুনিলাম, কয়েক নম্বরের জন্য প্রথম হইতে পারে নাই। আশীর্বাদ করি, বি. এ.-তে সে যোগ্য স্থান লাভ করিবে।

পত্রখানা পড়িয়া অমরের মায়ের চোখে জল আসিল।

মনে তাহার যে ক্রোধবহ্নি জ্বলিতেছিল, ইন্ধনের অভাবে, সময়ক্ষেপে সে বহ্নি নিভিয়া গিয়াছে। প্রতি পদে তাঁহার শৈলর প্রতিমার মতো মুখ মনে পড়িত। বলুক সে মিথ্যা, তবু মিষ্ট কথার সুরটি তাঁহার কানে বাজিত। আজ বেয়াইয়ের পত্র পড়িয়া তাঁহার সকল গ্লানি নিঃশেষে বিদূরিত হইয়া গেল। শুধু বিদূরিত হইয়া গেল নয়, পুত্রবধূর উপর মন তাঁহার প্রসন্ন হইয়া উঠিল, পত্রের শেষভাগটুকু পড়িয়া আবার তিনি সেখানটা পড়িলেন,—কলিকাতায় বাড়ি, ইত্যাদি।

তিনি অমরকে পত্র দিলেন। বেয়াইকে লিখিলেন—

বউমা আমার ঘরের লক্ষ্মী, লক্ষ্মীর কোন অপরাধ হয়? তবে কার্যগতিকে সংবাদ লইতে পারি নাই, সে দোষ আমারই। শীঘ্রই অমর বউমাকে আনিবার জন্য যাইবে।

পত্র পাইবামাত্র শৈল পুলকিত হইয়া স্বামীকে পত্র লিখিতে বসিল।

অমর আসিয়াছে। দশ-বারো সেরের একটা মাছ সে সঙ্গে আনিয়াছে। শৈল তাড়াতাড়ি সেটা কাটিতে বসিল।

বলিল, বড় জাতের মাছ বোধ হয় ধরা পড়েনি। এগুলো মাঝলা জাত।

ওদিক হইতে ভ্রাতৃজায়া বলিল, এই আরম্ভ হল। শ্বশুরবাড়ির অবস্থা ভাল আর কারও হয় না! রাত্রে অমরের নিকট শৈল নতমুখে দাঁড়াইয়া ছিল। অমর একখানা পত্র বাহির করিয়া দেখাইয়া বলিল, এসব কী বল তো? 'একটি বড় মাছ যেমন করিয়া হউক আনিবে, এখানে আমি আমাদের অনেক মাছ আছে বলিয়াছি।' বেশ, আমাদের ষোল আনা একটা পুকুর নেই, অথচ—ছিঃ! আর 'এখানে মুক্তার গহনার চলন হইয়াছে। আমার জন্য ঝুটা মুক্তার মালা একছড়া—' ওকি—ওকি, কাঁদছ কেন শৈল, শৈল?

শৈল বিছানায় মুখ গুঁজিয়া আকুল হইয়া কাঁদিয়া উপাধান সিক্ত করিয়া তুলিল। সেকথা যে তাহার অমরকে মুখ ফুটিয়া বলিবার নয়!

মতিলাল

'চোতপরব' অর্থাৎ গাজনের সং বাহির হইয়াছিল। ঢাকঢোল বাজাইয়া শোভাযাত্রার মধ্যে বাবা বুড়ো শিবের দোলা চলিয়া গেল, তাহার পিছনে পিছনে সঙের দল চলিতেছিল। একজন বাজিকর সাজিয়াছে, সঙ্গে একটা প্রকাণ্ড বড় ভালুক, একটা হনুমান, বাজিকরের বগলে একটা সাপের ঝাঁপি। এই বাজিকরের পিছনেই যত ছেলের ভিড়। কৌতূহলের সীমা নাই, অথচ ভয়ও আছে, একটু দূরে দূরে কোলাহল করিতে করিতে তাহারা চলিয়াছে। ভালুকটা প্রকাণ্ড বড়—বোধ হয় বুড়া—গায়ের রোঁয়াগুলো অনেক স্থলে উঠিয়া গিয়াছে। ছেলের পাল সেটাকে লক্ষ্য করিয়াই বাজিকরের অলক্ষ্যে ক্রমাগত ঢিল ছুঁড়িতেছিল। বুড়া ভালুকটা কয়েকবার এমনিভাবে আঘাত পাইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া গোঁ গোঁ করিয়া উঠিল। সভয় কৌতুকে ছেলের দল এদিকে ওদিকে ছুটিয়া পালাইয়া গেল। ভালুকটা খিলখিল করিয়া হাসিয়া বাজিকরের সঙ্গে চলিতে লাগিল।

ছেলের দলের অগ্রগামী পার্বতী তাহার পার্শ্বচর মদনকে বলিল, মানুষ রে মানুষ—হাসছে! সেজেছে!

মদন বলিল, ধেত! নারানবাবুদের কাছারিতে জ্বরে কাঁপছিল দেখিস নি! ভালুক না হলে জ্বর আসে—কাঁপে! গাঁজা খেলে—

চোটা ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট শ্যামবাবুর বৈঠকখানাটা সম্মুখেই, সেখানে তখন শ্যামগোপালবাবু ইউনিয়ন বোর্ডের খাতাপত্র দেখিতেছিলেন। বাজিকরের

হনুমানটা 'উপ্' শব্দে লাফ দিয়া দাওয়ার উপর উঠিয়া বসিল, ভালুকটাও প্রণাম করিয়া ধপ করিয়া সেইখানে পড়িয়া জ্বরে কাঁপিতে আরম্ভ করিল। হনুমানটা প্রেসিডেণ্টবাবুকে দাঁত দেখাইয়া ঘন ঘন চোখ মিটমিট করিতে আরম্ভ করিল।

শ্যামবাবু অল্প একটু হাসিয়া বলিলেন, বেশ বেশ! ওবেলায় এসে পয়সা নিয়ে যাস।

বাজিকর জোড়হাত করিয়া বলিল, আজ্ঞে, এই বেলাতেই পেলে—

শ্যামবাবু বলিলেন, যা বেটা, দেখছিস না এখন সরকারী কাজ করছি!

বাজিকর আর কিছু বলিতে সাহস করিল না, সে প্রণাম করিয়া ফিরিল।

শ্যামবাবুর খোট্টা চাপরাসীটা পাশে দাঁড়াইয়া ছিল, সে বলিল, আরে ভল্‌কো তো বহুত লড়াই করে রে, দেখে তেরা কেমন ভাল্‌কো।—বলিতে বলিতে সে ধাঁ করিয়া ভালুকটাকে বেশ কায়দা করিয়া জাপটাইয়া ধরিল। অতর্কিত আক্রমণে ভালুকটা বেকায়দায় নীচে পড়িয়া গেল।

বাজিকর চটিয়া উঠিয়াছিল, সে বলিল, ই কী করন তোমার সিংজী? বলেহার বেটা, বলেহার বেটা ভালুক রে।

ভালুকটা নিজের অসতর্ক অবস্থা তখন অনেকটা সামলাইয়া লইয়াছে। চারিদিকে দর্শক জমিয়া গিয়াছিল। সম্মুখেই দাঁড়াইয়া পার্বতী আর মদন যুধ্যমান ভালুক ও চাপরাসীটার প্যাচ-কষাকষির সঙ্গে সঙ্গে আপন আপন দেহ লইয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া উঠিতেছিল, কখনও দাঁতে ঠোঁটে কামড়াইয়া বলিতেছিল, দে—দে—দে!

শুধু মদন আর পার্বতী নয়, ওরূপ ধারায় মুখভঙ্গি করিতেছিল আরও অনেকে, মায় শ্যামগোপালবাবু পর্যন্ত। ভালুকটা যখন চাপরাসীটাকে চিত করিয়া ফেলিয়া দিল তখন তিনি ধনুকের মতো বাঁকিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। দর্শকরা হাসিবার উপক্রম করিতেছিল, এমন সময় হনুমানটা চট করিয়া উঠিয়া পরাজিত চাপরাসীটার মুখের উপর বাঁ পায়ের একটা মৃদু লাথি মারিয়া নিয়া দর্শকদের একবার দাঁত দেখাইয়া দিল। দর্শকের মধ্যে হাসির একটা হাঁড়ি যেন সশব্দে ফাটিয়া পড়িল। পার্বতী পথের উত্তপ্ত ধুলার উপরেই একটা ডিগবাজি মারিয়া দিল।

চাপরাসীটা অপমানে চটিয়া উঠিয়াছিল, শ্যামবাবুও চটিয়াছিলেন; কিন্তু এতগুলি লোকের সহানুভূতির বিরুদ্ধে বিশেষ কিছু বলিতে সাহস করিলেন না। শুধু গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করিলেন, হনুমান সেজেছে ওর নাম কি রে? কানে ধর তো বেটার, এই চৌকিদার!

ভিড়ের মধ্য হইতে কে বলিয়া উঠিল, আসছে'বারে ভোট দোব না কিন্তু!

অত্যন্ত রুষ্টকণ্ঠে শ্যামবাবু কহিলেন, কে?

বক্তা আসিয়া সম্মুখে জোড়হাতে দাঁড়াইয়া বলিলেন, প্রভু, আমি।

শ্যামবাবু ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিলেন, বক্তা তাঁহার এক আত্মীয় এবং বন্ধু—হবুকাকা!

শ্যামবাবু কহিলেন, এস, এস তামাক খাও খুড়ো!

হবুকাকা বলিলেন, যা যা সব, যা এখন!

সঙের দল চলিয়া গেল। সমস্ত গ্রামখানা ঘুরিয়া বাজিকর যখন শিবতলায় ফিরিল তখন বেলা প্রায় চারিটা। দর্শকদলের বেশি কেহ আর তখন সঙ্গে ছিল না, শুধু পার্বতী তখনও পিছন ছাড়ে নাই। গাজনের পাণ্ডা হরিলাল পাত্র দাওয়ায় দাঁড়াইয়া ছিল, বিরক্তিভরে সে বলিল, ওঃ, আমোদ তোদের আর শেষই হয় না! নে বাপু, নৈবিদ্যি নিয়ে যা।

সঙ্গে সঙ্গে হনুমান ভালুক বাজিকর এক-এক গামছা খুলিয়া বসিল। হরিলাল সের খানেক করিয়া চাল, কয়টা কলা ও সামান্য কয়েকখানা বাতাসা বিতরণ করিয়া দিয়া বলিল, এইবারে আমি খালাস বাবা!

পার্বতী আশ্চর্য হইয়া গিয়াছিল, সে আরও আশ্চর্য হইয়া গেল, যখন বাজিকর জানোয়ার দুইটাকে ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া গেল। হনুমানটাও এক দিকে চলিয়া গেল, ভালুকটাও পাশের গ্রামের পথ ধরিল। ভয়ে সে দূরত্ব একটু বাড়াইয়া দিয়া নাচিতে নাচিতে ভালুকটার পিছন ধরিল।

খানিকটা মাঠ পার হইয়াই 'মৌলকিনী' পুকুর, ভালুকটা পুকুরের ঘাটে নামিয়া বসিল, তারপর হাত পা মুখ ও দেহ হইতে একে একে খোলসগুলি ছাড়াইতে আরম্ভ করিল।

পার্বতীর আমোদের সীমা-পরিসীমা ছিল না,—তাহার অনুমানই সত্য হইয়াছে। সে করতালি দিয়া বলিয়া উঠিল, মানুষই বটে, মানুষই বটে, ওরে বাবা রে!

শব্দ শুনিয়া ভালুক তাহার দিকে চাহিয়া পরমানন্দে দাঁত বাহির করিয়া হাসিতেছিল। কিন্তু সে কী ভীষণ মূর্তি! হাঁড়ির মতো প্রকাণ্ড মাথা, মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, আলকাতরার মতো কালো রং, নাকটা থ্যাবড়া, চোখ দুইটা আমড়ার আঁটির মতো গোল এবং মোটা, দুই গালের থলথলে মাংস খানিকটা করিয়া চোয়ালের নীচে ঝুলিয়া পড়িয়াছে, মুখগহ্বরের পরিধি আকর্ণবিস্তৃত। সেই মুখগহ্বর মেলিয়া বড় বড় দাঁত বাহির করিয়া সে হাসিতেছিল, দেখিয়া পার্বতী সভয়ে ছুটিয়া পলাইল। ভালুক তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া ডাকিল, ও খোকাবাবু, ও খোকাবাবু!

পার্বতী একবার দাঁড়াইয়া ফিরিয়া চাহিল। ভয় অপেক্ষা বিস্ময়ের মাত্রা তাহার অনেক গুণ অধিক হইয়া উঠিয়াছিল। এত লম্বা এত মোটা আর এত কালো লোক

সে কখনও দেখে নাই। সমস্ত গা বাহিয়া কালো আঠার মতো কী ঝরিতেছে! বুকও গুরগুর করিতেছিল, ভালুক না ভূত! না, তার চেয়েও বেশি মেলে গয়লাদের কাদামাখা মহিষগুলার সঙ্গে! লোকটা একখানা বাতাসা হাতে তুলিয়া তখনও তেমনই হাসিতে হাসিতে ডাকিতেছিল, পেসাদ, পেসাদ, শিবের পেসাদ!

পার্বতী সভয়ে তাহাকে লক্ষ্য করিতেছিল, ভালুকের কথা শুনিয়া সে দুই পা পিছাইয়া গেল। ভালুক এবার কয় পা তাহার দিকে আগাইয়া আসিয়া আরও খানিকটা বেশি হাসিয়া বলিল, ভয় কী খোকাবাবু, এস!

পার্বতী নিমেষের মধ্যে পিছন ফিরিয়া ছুটিল এবং পথপার্শ্বের জঙ্গলের আড়ালে অদৃশ্য হইয়া গেল। ভালুক হাসিতে হাসিতে ঘাটে ফিরিয়া নৈবেদ্যের পুঁটুলিটা খুলিয়া বসিল। সবসুদ্ধ গামছাটা জলে ভিজাইয়া লইয়া চাল কলা ও বাতাসায় মাখিয়া প্রকাণ্ড বড় বড় গ্রাসে অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে শেষ করিয়া ফেলিল। উচ্ছিষ্টলোভী কয়টা কাক দূরে বসিয়া ছিল, শূন্য গামছাখানা সে বারকয়েক তাহাদের দিকে সজোরে ঝাড়িয়া দিয়া বলিল, ওই লে, ওই লে! তারপর গামছাখানা জলে কাচিয়া লইয়া ভালুকের পোশাক ঘাড়ে ফেলিয়া সে পথ ধরিল। ডোম-পাড়ায় পৌছিয়া একটা বাড়িতে ঢুকিয়া, ডাকিল, ভোবন, আজ যে মজা, বুঝলি কিনা!

'ভোবন' অর্থাৎ ভুবনমোহিনী ঘরের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া বলিল, জ্বালাস না আমাকে আর, আপন জ্বালাতে বলে মলাম আমি। ভাতের হাঁড়িটা নামা দেখি!

ভুবনমোহিনী ওই লোকটিরই যেন ছায়া বা দর্পণের মধ্যের নারীরূপিণী প্রতিবিম্ব। অমনই কালো, অমনই দৈর্ঘ্যে, অমনই পরিধিতে! মাথার সম্মুখেই সিঁথি জুড়িয়া একটা টাক, প্রকাণ্ড বড় মুখের মধ্যে অতি ক্ষুদ্র দুইটা চোখ, লম্বা নাক, তাহার উপর উপরের ঠোঁটের এক পাশের খানিকটা মাংস নাই, সেদিক দিয়া দুইটা দাঁত নীচের ঠোঁটের উপর চাপিয়া বসিয়া আছে।

ভালুকের পোশাকটা ঘাড় হইতে ফেলিয়া পুরুষটি ভাতের হাঁড়ি নামাইতে চলিল।

ভুবন বলিল, আমার মাথা বলে খসে গেল! ওষুদ নাই, পত্তর নাই, আর বাঁচব না আমি!—ও মা!

পুরুষটি কোনো উত্তর দিল না, কোথা হইতে একটা পোড়া বিড়ি বাহির করিয়া উনানের আগুনে সেটাকে ধরাইতে বসিল। ভুবন তাহার কাছে আসিয়া বসিয়া বলিল, তু ঘরে বসে থাকবি কেনে, বল? একা মেয়েমানুষ আমি, কত রোজকার করব?

ভালুক নিজের কনুইটা দেখিতে দেখিতে বলিল, তাই বলি জ্বলছে কেনে! মাস ছেড়ে গিয়েছে দলকাছাড়া হয়ে।

তারপর ভুবনের দিকে চাহিয়া বলিল, বাবুদের ওই খোট্টা চাপরাসী, বেটা আচমকা আমাকে চেপে ধরে কায়দা করে ফেলিয়েছিল আর টুক্‌চে হলে!

ভুবন বলিল, ত্যাল লাগা খানিক।—বলিয়াই সে মাটির উপর শুইয়া পড়িল, আঃ, গা-গতর যেন ঢেঁকিতে কুটছে!—বাবা!

ভালুকের কথা তখনও শেষ হয় নাই, সে বলিতেছিল, তেমনই দিয়েছি বেটাকে ঠিক করে। আমাকে পারবে কেনে বেটা, আমার ক্ষ্যামতায় আর—

মুখের কথা কাড়িয়া ভুবন বলিল, তাই তো বলছি, ওই ক্ষ্যামতায় খাটলে যে রোজকার হয়! আচ্ছা, কেন খাটিস না, বল দেখি।

ভালুক বলিল, উ গাঁয়ে একটি কী সুন্দর ফুটফুটে ছেলে, বুঝলি ভোবন!

ভুবন ভুলিল না, সে বাধা দিয়া বলিল, তোর ভাত আমি যোগাতে পারি? খাটুনিকে এত ভয় কিসের তোর?

ভয় আবার কী?

তবে?

নিজের বিশাল দেহের দিকে চাহিয়া ভালুক কহিল, খাটতে গেলে গতর দেখে সব। বলে, গতর দেখ আর খাটছে দেখ! খুঁড়ে খুঁড়ে আমার গতর কমে গেল। উহুঁ, উ-সব হবে না। দত্তকাকা বলেছে, কলকাতার যাত্রার দলে ঢুকিয়ে দেবে আমাকে।

এ কথা ভুবনের বহুবার শোনা কথা। বহু কাণ্ড এই লইয়া হইয়া গিয়াছে, ভুবন চুপ করিল। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ যেন তাহার কী মনে পড়িয়া গেল, সে উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, সং সাজলি, তার পয়সা কই, নৈবিদ্যি কই?

ভালুক বলিল, পয়সা এখনও ভাগা হয় নাই।

নৈবিদ্যি? বলি, নৈবিদ্যি কী হল?

ভালুক ডাকিল, আয় আয় গোবরা, আয়!

গোবরা এক বিশালকায় কুকুর, এ পরিবারটির উপযুক্ত জীব। শুধু গোবরা নয়, গোবর গণেশ উহার নাম। খায় দায় ঘুমায়, চোর আসুক ডাকাত আসুক—কোনো আপত্তি নাই তাহার, সে কাহাকেও কিছু বলে না।

ভুবন সরোষে বলিল, বলি, নৈবিদ্যি কী হল?

খেয়ে দিয়েছি। যে খিদে, বাবাঃ!

ভুবন আবার শুইয়া পড়িয়া কাতরাইতে লাগিল। ভালুক ভাতের হাঁড়িটা

নামাইয়া ফেলিয়া বলিল, আজ আর খিদে বেশ নাই। নৈবিদ্যি খেয়ে খিদে পড়ে গেল।

ভুবন বলিল, আমি টাকা দোব, তু গোরু কেন একজোড়া, ভাগে চাষ—

ভালুক মধ্যপথেই ভুবনকে বাধা দিয়া বলিল, ধেৎ! টাকা টাকা করেই মরবি তু। ছেলে নাই, পিলে নাই, দুটো পেট শুধু; বেশ তো চলছে!

ভুবন বলিল, হা রে মুখপোড়া গাঁদা মোষ, বলি—খেটে খেটে যে আমার গতর পড়ে গেল!

ভালুক হি-হি করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, তোর গতরের এক শরষেও কমে নি, ভোবন। দাঁড়া, একখানা বড় আরশি এনে দোব তোকে। একটা টাকা দিস দেকি নি!

হাতের কাছেই পড়িয়া ছিল একটা শুকনা গাছের ডাল, ভুবন স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া সজোরে সেটাকে ছুঁড়িয়া মারিল। ভালুক কিন্তু ভুবনের মতলব পূর্বেই বুঝিয়াছিল, সে একটু পাশে সরিয়া দাঁড়াইল। ডালটা বোঁ শব্দে ডাক ছাড়িয়া উঠানের পেয়ারাগাছে প্রতিহত হইল।

ভালুক হি-হি করিয়া হাসিতে হাসিতেই বলিল, ওইটো যদি লাগত, ভোবন! শেষে তো তোকেই ত্যাল মালিশ করতে হত।

ভুবন বলিল, ওই ছিরিতে আর দাঁত বার করে হাসিস নে বাপু। আহা-হা!

ভালুক হা-হা করিয়া হাসিয়া ঘরখানা ভরাইয়া দিল।

ভুবনও না হাসিয়া পারিল না, সেও সলজ্জভাবে ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিল।

কথাটা পুরাতন দিনের কথা।

ভালুকের নাম মতিলাল, জাতিতে সে হাড়ি। এ গ্রামের বাসিন্দা তাহারা নয়; এখান হইতে ক্রোশ পাঁচেক দূরে তাহার পৈতৃক বাস। এ গ্রামে তাহার মাতুলালয়, নিঃসন্তান মাতুলের ভিটায় সে ভুবনকে লইয়া বৎসরখানেক আসিয়া বাস করিতেছে।

ভুবন কিন্তু এই গ্রামের মেয়ে। তাহাদের সামাজিক রীতি অনুযায়ী ভুবনের পাঁচ বৎসর বয়সের সময় প্রথম বিবাহ হয়। তখন তাহার ঠোঁটের পাশটা কাটা ছিল না।

বৎসর দশেক বয়সের সময় গাছে গাছে 'ঝাল্লু' খেলিতে গিয়া ঠোঁট কাটিয়া দাঁত বাহির হইয়া গেল। তখন সে ছিল লম্বা, কিন্তু ছিপছিপে পাতলা। এগারো বৎসর বয়স হইতেই দেহে তার জোয়ার ধরিতে আরম্ভ হইল। তখন তাহার বয়স চৌদ্দ বৎসর। সেবার জামাইষষ্ঠীতে বাপ তাহার জামাই লইয়া আসিল। জামাইটি দেখিতে শুনিতে মন্দ নয়, সচরাচর নিম্নশ্রেণীর জোয়ান যেমন হইয়া থাকে তেমনই। শাশুড়ী

জামাইকে পরমাদরে বসাইয়া পা ধুইতে এক ঘটি জল নামাইয়া দিল। ভুবনের বাপ গিয়াছিল মাছের সন্ধানে। মা-ও তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল তেলের বোতল হাতে, —ভুবনের চুলটা বাঁধিয়া দিতে হইবে। ছেলেটি পা না ধুইয়া এদিক-ওদিক চাহিতেছিল ভুবনের সন্ধানে। ঠিক এই সময়টিতেই ভুবন আসিয়া বাড়ি ঢুকিল। কাঁখে এক প্রকাণ্ড বড় কলসী। গ্রাম হইতে মাইলখানেক দূরে ঝরনার জল আনিতে গিয়াছিল সে।

বাড়ি ঢুকিয়াই সে স্বামীকে প্রশ্ন করিল, কে বটিস রে তু, কোথা বাড়ি ?

বাপের ফিরিবার কথা ছিল সন্ধ্যায়; কিন্তু ঘটনাচক্রে তাহারা দ্বিপ্রহরের পূর্বেই আসিয়া পড়িয়াছে। ভুবনের স্বামী অবাক হইয়া বিপুলকায়া ভুবনের কুৎসিত মুখের দিকে চাহিয়া ছিল।

ভুবন আবার প্রশ্ন করিল, রা করিস না কেনে রে ছোঁড়া, কোথা বাড়ি তোর ?

তেলের বোতল হাতে মা ঘরে ঢুকিয়া বলিল, মাথায় কাপড় দে হারামজাদী, জামাই রয়েছে !

দারুণ লজ্জায় সহাস্যে পুরু জিবটা এতখানি বাহির করিয়া ভুবন দুমদুম শব্দে দ্রুতপদে ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। মাও তাহার পিছন পিছন ঘরে ঢুকিয়া বলিল, চুল বেঁধে দি তোর আগে। ও বাবা কানাই, হাতমুখ ধোও বাবা, শ্বশুর তোমার আইচে বলে।

অল্প কিছুক্ষণ পর ভুবনের বাপ মাছ হাতে বাড়ি ঢুকিয়া বলিল, কই, কোথা গেলি গো ? কানাই কোথা গেল ?

শাশুড়ী বাহিরে আসিয়া বলিল, এই হেথাই তো।

কানাই, অ বাবা !

কেহ কোথাও ছিল না, জলের ঘটিটা পর্যন্ত তেমনই পূর্ণ অবস্থায় সেইখানে পড়িয়া আছে। ধূলা পায়েই কানাই পলাইয়াছে।

সে আর আসে নাই, আবার সে বিবাহ করিয়াছে।

তাহার পর কত সম্বন্ধ যে ভুবনের বাপ করিল, তাহার হিসাব নাই। কিন্তু ভুবনকে দেখিয়া সকলেই একরূপ পলাইয়া গেল।

ভুবনকে দেখিলেই পাড়ার ছেলেরা ফিক করিয়া হাসিত। ভুবন সে ব্যঙ্গ হাসির জ্বালায় জ্বলিয়া উঠিত। একদিন ক্রোধে আপনার কপালে নোড়ার ঘা মারিয়া রক্তে মুখ ভাসাইয়া ফেলিল।

মামার অসুখের সংবাদ পাইয়া মতিলাল সেদিন এই গ্রামে আসিয়াছিল। তখন তাঁহার তিনটি বিবাহ হইয়া গেছে, কিন্তু গৃহ গৃহিণীশূন্য। গ্রামে ঢুকিবার পথেই ভুবনের

সহিত তাহার দেখা হইয়া গেল। তাহার রূপের কারুকার্য দেখিয়া মতিলাল না হাসিয়া থাকিতে পারিল না।

ভুবন ঘৃণার সহিত বলিল, ওই ছিরিতে আর দাঁত বার করে হাসিস নে বাপু!

আ হা হা!

মতিলাল হি-হি করিয়া হাসিয়া উঠিল।

তাহার কয়েক দিন পরই ভুবনের সহিত মতিলালের বিবাহ হইয়া গেল। মতিলাল ভুবনকে লইয়া ধুমধামের সহিত আপনার ভিটায় গিয়া সংসার পাতিয়া বসিল। প্রথম দিনই সন্ধ্যায় সে ভুবনকে ডাকিয়া বলিল, শোন, একটা কথা বলি!

সে আসিয়া বলিল, কী?

বোস, একটা জিনিস এনেছি, দেখ! তোকে কেমন সোন্দর করে দি, দেখ!

মতিলাল খানিকটা খড়ির মতো সাদা গুঁড়া জলে গুলিতে বসিল। ভুবন আশ্চর্য হইয়া প্রশ্ন করিল, উ-কী?

মতিলাল অহঙ্কার ভরে বলিল, যাত্রায় সব মুখে মাখে দেখিস নাই? কালো কুচ্ছিতও এতে সোন্দর হয়!—বলিয়া সে ভুবনকে রং মাখাইতে বসিল। তারপর আয়না মুখের সম্মুখে ধরিয়া বলিল, দেখ!

ভুবন তাহার হাত হইতে আয়নাখানা টানিয়া লইয়া নিবিষ্ট চিত্তে নিজের প্রতিবিম্ব দেখিতে বসিল। তারপর সহসা আয়নাখানা রাখিয়া দিয়া বলিল, আয় তোকে মাখিয়ে দি আমি!

গম্ভীরভাবে মতিলাল বলিল, উঁহু, তু পারবি না। ই সব ভাগমাপ শিখতে হয়। দে, আমি মাখি!—বলিয়া নিজেই রং মাখিতে বসিল।

ভুবন কিন্তু অভিমান করিল। সেটুকু আবিষ্কার করিয়া মতিলাল বলিল, তোকে শিখিয়ে দোব, তু একদিন মাখিয়ে দিস!

ভুবন বলিল, তু কোথায় শিখেছিস, শুনি?

মতিলাল হাসিয়া বলিল, যাত্রার দলে শিখেছি। তা ছাড়া আমি কত রকম সাজতে পারি বলে! দেখবি?

সে তাহার একটা ঝাঁপি খুলিয়া বাহির করিল, বস্তার তৈয়ারি ভালুকের খোলস, পেত্নী সাজিবার ছেঁড়া কাঁথা, আরও কত কি!

তাহার পর ক্রমশ ভুবন আবিষ্কার করিল, মতিলালের ওই পেশা। খাটুনির নাম নাই, খায় দায় ঘুমায়, যাত্রার দলের ভার বয়, তামাক সাজে, আর মাঝে মাঝে সং সাজিয়া বেড়ায়।

ভুবন কিন্তু দারুণ পরিশ্রমী মেয়ে, শরীরে শক্তি তাহার বিপুল; সে ধান ভানিয়া,

ঘুঁটে দিয়া, ঘাস বেচিয়া স্বচ্ছন্দ আহারের প্রাচুর্যে বিপুলকায় মতিলালকে আরও স্ফীত এবং কুৎসিত করিয়া তুলিল, সঙ্গে সঙ্গে নিজেও তাহাই হইয়া উঠিল। মতিলালকে সে অহরহ তিরস্কার করে রোজগারের জন্য। মতিলালের সেই এক উত্তর—খাটতে গেলে গতরে নজর দেয় সব, উ হবে না। যাত্রার দলে এবার মাইনে হবে। আর ছেলেপিলে হোক, তখন না হয়—! ছেলে না হলে কি ঘর!—বলিয়া সে পুলকে হি-হি করিয়া হাসে।

ভুবন বলিল, হবে তো ছেলেপিলে।

মতিলালের মনে পুলক বাড়িয়া গেল, দাঁড়া, আজ মাদুলি এনে দোব তোকে!

মাদুলি সে আনিয়াও দিল, একটা নয়, একটা একটা করিয়া পাঁচছয়টা মাদুলী-ভুবনের বুকে এখন ঝোলে।

বেশ চলিতেছিল। কর্মপরায়ণা ভুবনের কর্মের মধ্যেই দিন কাটিয়া যাইত। সেদিন সহসা তাহার দৃষ্টিতে পড়িল, পুকুরের ধারে মতিলাল বসিয়া হি—হি করিয়া হাসিতেছে, আর যাত্রার দলের কয়েকটা ছেলে তাহাকে কাদা মাখাইতেছে। একজনের কথাও তাহার কানে আসিল, সে মতিলালকে বলিতেছিল, গাঙের পলি যদি মাখতে পারিস, তবে রং ফরসা হবে নিশ্চয়। এতেও হবে, তবে ফিট গোরা হবে না।

সে কথার দিকে মতিলালের মন ছিল না, সে দূরের কতকগুলো ছোট ছেলের কথা শুনিয়া হাসিতেছিল।

তাহারা হাততালি দিয়া নাচিতেছিল আর সুর করিয়া গাহিতেছিল, আয় রে কালো মোষ, কাদা মাখবি বোস!

ভুবনের অঙ্গ জ্বলিয়া গেল। সে মতিলালকেই ডাকিল, ও মুখপোড়া, বলি শোন!

মতিলাল হি-হি করিয়া হাসিতে হাসিতে উঠিয়া আসিল।

যাত্রার দলের একজন বলিল, মাধব তাঁতীর লীলেবতী।

ক্রোধে ভুবনের চোখে জল দেখা দিল, মতিলাল কিন্তু হাসিয়া বলিল, বলুক কেনে; তোরও যেমন!

ইহার পর ক্রমশ ভুবন আবিষ্কার করিল, এ কথা এ গ্রামের সকলেই বলে, কর্মের ব্যস্ততার মধ্যে ভুবন এতদিন শুনে নাই, বা শুনিতে পায় নাই। ভুবন জেদ করিয়া বসিল, সে থাকিবে না। মতিলাল বলিল, মামার ভিটে তো মোটে এইটুকু ছোট ঘর, ছেলেপিলে হলে কুলোবে কেন?

ভুবন বলিল, ঘর করে লিবি, অত বড় হাঁদা মুনিষ!

প্রবল আপত্তি করিয়া মতিলাল বলিল, উঁহু, সি আমি পারব না। বাবা, ঘর তোলা কি সোজা কথা!

ভুবন তবু মানিল না, সে বলিল, ঘরের খরচ আমি দোব। আর বাবা আছে, দাদা আছে!

বাধ্য হইয়া বৎসরখানেক পূর্বে মতিলাল মাতুলালয়ে আসিয়া বাস আরম্ভ করিল। ভুবনের চেষ্টায় ও অর্থে ঘর হইয়াছে। মতিলাল এখানকার পাঁচালির দলে এখন তামাক সাজে। দত্ত-কাকার দরবারে নিয়মিত হাজির দেয়, দত্ত-কাকা তাহাকে কলিকাতার যাত্রার দলে চাকরি করিয়া দিবেন। ভুবন যেমন খাটিত, তেমনই খাটে। তাহার পরিশ্রমে এখানেও স্বচ্ছন্দ সংসার, কোনো অভাব নাই। বলিতে ভুলিয়াছি, এখন ঘরের কাজ, ভাত রাঁধা, জল তোলা এগুলি মতিলালকেই করিতে হয়। বাড়িতে পা দিলেই ভুবনের শরীরে অসুখ দেখা দেয়।

ঐ চৈত্র-সংক্রান্তির দিনই।

মতিলাল রান্নাবান্না শেষ করিয়া স্নান করিয়া আসিল। দুইখানা গামলায় হাঁড়ির ভাত ঢালিয়া ডাকিল, ভোবন, ওঠ!

ভুবন উঠিয়া বসিল। মতিলালের গামলার দিকে চাহিয়া বলিল, এই যে বললি খিদে নাই আজ! চারটি ভিজিয়ে রাখলে কালকের মুড়ি আসান হত।

খাবা ভরিয়া গ্রাস তুলিতে তুলিতে মতিলাল বলিল, আবার লেগেছে খিদে।

ভুবন বলিল, তোর ওই কুকুরের ভাত আমার হেনসেল থেকে দোব না, আজ তোর ভাত থেকে তু দে। লইলে লৈবিদ্যি আন।

মতিলাল হি-হি করিয়া হাসিয়া বলিল, দেখবি, রেতে চেঁচাবে খিদেতে, ঘুম হবে না তোর।

ভুবন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চোখের দৃষ্টিতে যেন অগ্নি বর্ষণ করিয়া বলিল, নেতার মেরে দোব তা হলে আজ ওর।

মতিলাল, সকাতর কণ্ঠে বলিল, আহা-হা ভোবন, কেষ্টের জীব। আর জানিস, তোর যখন ছেলে হবে, তখন দেখবি কত কাজ করে গোবরা!

ভুবন উষ্মাভরেই কহিল, কী করবে কী শুনি?

এই ছেলে শুয়ে থাকবে, গোবরা পাহারা দেবে, কাক তাড়াবে।

সত্য, গোবরগণেশের ওই গুণটি আছে, বাড়িতে কাক নামিতে দেয় না। ভুবন শুধু বলিল, হুঁ।

মতিলালের দৃষ্টিতে পড়িল, পার্বতী ও মদন দুয়ারের পাশে দাঁড়াইয়া উঁকিঝুঁকি

মারিতেছে। সে গাল ভরিয়া হাসিয়া বলিল, এই দেখ ভোবন, এই ছেলেটির কথা বলেছেলাম।

পার্বতী মদনকে বলিতেছিল, ওই দেখ!

ভুবন মুখ ফিরাইয়া তাহাদের দেখিয়া বলিল, এস খোকাবাবুরা, প্যায়রা আছে দোব, বস!

ওরে বাবা রে, ধরবে ভাই!—বলিয়া মদন ছুটিয়া পলাইল।

পার্বতী তখনও দাঁড়াইয়া ছিল। মতিলাল বলিল, প্যায়রা খাবে এস খোকাবাবু! যাবার সময় আমি হাতী সেজে পিঠে করে দিয়ে আসব তোমাকে।—বলিয়াই সে মাটিতে হাত পাড়িয়া চতুষ্পদ সাজিয়া পার্বতীকে দেখাইল।

মদন পিছন হইতে ডাকিল, পালিয়ে আয় রে, ধরবে! পার্বতী আর থাকিতে সাহস করিল না, পলাইল।

পরদিন কিন্তু সকালেই তাহারা আসিয়া হাজির। ঢেঁকিশালে ভুবন দুমদুম শব্দে ধান ভানিতেছিল। মতিলাল দাওয়ায় বসিয়া মুড়ি খাইতেছিল।

দুয়ারের গোড়ায় দাঁড়াইয়া পার্বতী বলিল, ভালুক, প্যায়রা দিবি?

মুখে একমুখ মুড়িসুদ্ধই মতিলাল দাঁত বাহির করিয়া বলিল, এস এস, খোকাবাবু এস!

মদন বলিল, ওখান থেকে ছুঁড়ে দে। তুই ভূত! সে রাক্কুসী কই, সেই দাঁত বার করে?—বলিয়াই সে দাঁত বাহির করিয়া দেখাইয়া দিল।

মতিলাল হা-হা করিয়া হাসিয়াই সারা হইল।

কে রে, খালভরা ছেলে!—ভুবন ঢেঁকিশাল হইতে বাহির হইয়া আসিল।

পার্বতী ও মদন ছুটিয়া পলাইল। ভুবন আপন মনেই বকিতেছিল, ভদ্দনোকের ছেলে, ভদ্দনোক সব, বাক্যি দেখ দেখি! ভূত, রাক্কুসী। অঃ!

মতিলাল তখন সবলে পেয়ারাগাছটাকে নাড়া দিতেছিল। সে হি-হি করিয়া হাসিয়া বলিল, তুও যেমন ভোবন, বলুক কেনে!

ভুবন ঝঙ্কার দিয়া বলিল, না বলবে কেনে, কিসের লেগে? ছেলের কথা দেখ দিকিনি!

গ্রামের ধারে দাঁড়াইয়া মদন তখন পার্বতীকে বলিতেছিল, না, যাস নি ভাই, শুনিস নি রাক্কুসীর গল্প? ওরা ঠিক ভূত আর রাক্কুসী—মানুষ সেজে আছে।

খোকাবাবু, ও খোকাবাবু, প্যায়রা নিয়ে যাও!—আঁচলে করিয়া পেয়ারা লইয়া মতিলাল হাসিতে হাসিতে তাহাদের ডাকিতেছিল।

মদন বলিল, ওইখানে ঢেলে দে! তুই সরে যা!

মতিলাল হাসিয়া পেয়ারাগুলি ঢালিয়া দিয়া সরিয়া গেল।

পেয়ারাগুলি তুলিয়া লইয়া পার্বতী বলিল, ভালুক হয়ে যা দেখি, সেই কালকের মতো!

মতিলাল হি-হি করিয়া হাসিয়া বলিল, দাঁড়াও তোমরা, আসছি আমি।

কয়েক মিনিট পরেই ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ শুনিয়া পেয়ারা খাইতে খাইতে ব্যস্ত মদন ও পার্বতী দেখিল, ভালুক আসিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে মদন প্রচণ্ডবেগে ছুটিল। পার্বতীও তাহার অনুসরণ করিল। ভালুক উঠিয়া দাঁড়াইয়া ডাকিল, অ খোকাবাবু!

ছেলে দুইটির সঙ্গে মতিলালের একটু আত্মীয়তা হইল, কিন্তু আত্মীয়তা নিবিড় হইল না। তাহারা পেয়ারার জন্য রোজ আসে, কিন্তু মতিলালকে ধরা দিল না।

মতিলাল হাসিমুখে ডাকে, তাহারা খানিকটা সরিয়া গিয়া বলে, না।

মতিলাল তাহাদিগকে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করে, কত সাজতে পারি আমি, তোমাদিগে দেখাব।

মদন বলে, ছাই। বস্তা গায়ে দিয়ে!—ভালুকের রোঁয়া নেই, যাঃ! পার্বতী বলে, ভূত সাজতে পার?

হাসিতে হাসিতে মতিলাল বলে, হুঁ। দুধ খাও তো, না খেলে আমি ভূত সেজে ধরব।

কই, সাজ দেখি ভূত!

সেই ধরমপুজোর সময় —আর দেরি নাই।

বাঘ সাজতে পার?

হুঁ।

সব সাজতে পার?

হুঁ।

ভীত অথচ মুগ্ধ-বিস্ময়ে ছেলে দুইটি মতিলালের দিকে চাহিয়া থাকে।

মতিলাল ডাকে, শোন শোন, একটা কথা বলি। সঙ্গে সঙ্গে সে নিজেই আগাইয়া আসে। ছেলে দুইটি সভয়ে ছুটিয়া পলাইয়া যায়।

ভুবন বলে, তোর যেমন আদিখ্যেতা! উ কি তোর স্বভাব?

মতিলাল হি-হি করিয়া হাসিয়া বলে, ওরা ভয় করে, আমার ভারি ভালো লাগে ভোবন। আমি আবার বলি কি জানিস, দুধ খাও তো, না খেলে আমি ধরব। একদিন পেত্নী সাজব, দাঁড়া।

ভুবন বলিল, ভূত তো সেজেই আছিস, আর পেত্নী সাজতে হবে না বাপু, থাম।

মতিলালের হাসি আর থামিতে চায় না।

রাঢ় দেশ। বৈশাখ মাসে বুদ্ধ-পূর্ণিমায় ধর্মরাজের পূজা, নিম্নজাতির এক বিরাট উৎসব। মতিলালের গ্রামে, মহুগ্রামে ধর্মরাজের পূজার উৎসবে প্রচুর ধুমধাম হয়। মহুগ্রামের ধর্মদেবতা নাকি ভারি জাগ্রত। চার-পাঁচখানা গ্রামের নিম্নজাতির সকলেই এই ধর্মরাজের পূজা-অর্চনা করে। এবার উৎসবের আড়ম্বর খুব বেশি। পাশের বর্ধিষ্ণু গ্রামে স্বর্ণকাররা পাল্লা দিয়া নাকি উৎসব করিবে! এবার ঢাক আসিল ত্রিশটা। মহুগ্রামে বরাদ্দ হইয়াছে পঁয়ত্রিশটা। সংবাদটা কিন্তু গোপন রাখা হইয়াছে। ওগ্রামের ভক্তের সংখ্যা পঁয়তাল্লিশ, পঞ্চাশ পূর্ণ করিবার জন্য খুব চেষ্টা হইতেছে। মহুগ্রামের ভক্তের সংখ্যা ষাট ছাড়াইয়া গেছে।

চুলওয়ালা দত্ত-খুড়োর সঙ্গে মতিলাল মহা উৎসাহে তদ্বির-তদারক করিতেছিল। দত্ত-খুড়ো বলিল, তুইও একজন ভক্ত হলি না কেন মতিলাল?

মতিলাল হি-হি করিয়া হাসিয়া বলিল, উপোস করতে লারব খুড়োমশায়। উ হবে না।

দত্ত-খুড়ো হাসিয়া বলিলেন, পেটটি না ভরলে মতিলালের আমার চলবে না, না কি বল মতিলাল?

মতিলাল হাসিয়া বলিল, ভোবন কি বললে জান? বললে, প্যাটে ছুরি মার তু!

দত্ত বলিল, তা বেশ। তোকে কিন্তু ইদিকের কাজ ডাক-হাঁক সব করতে হবে। বোলানের দল সব আনতে হবে। আর, সং এবার কিন্তু খুব আচ্ছা বঁড়িয়া রকমের হওয়া চাই।

মতিলাল একমুখ হাসিয়া বলিল, পাঁচ জুতো খাব উ গাঁকে হারাতে না পারি তো।

সার্ধ দুই সহস্র বৎসরেরও পূর্বে যে তিথিতে অর্ধ জগতের ধর্মগুরু মহামানব বুদ্ধ সুজাতার পায়সান্ন গ্রহণ করিয়া স্নানান্তে মরণ-পণে তপস্যায় বসিয়াছিলেন, সেই পূর্ণিমার ঠিক প্রথম লগ্নে উৎসবের প্রারম্ভ। সেই দিন হয়—মুক্তিস্নান।

দলে দলে ভক্তরা 'মুক্তচান' করিয়া উত্তরী পরিতেছিল। ঢাকের বাজনায় সচকিত পাখির দল কলরব করিয়া আকাশে উড়িয়া বেড়াইতেছিল, কোনো স্থানে বসিতে তাহাদের সাহসই ছিল না। হনুমানের দলও দ্রুতবেগে বিপুল শব্দ করিয়া গ্রাম ছাড়িয়া পলাইতেছিল।

মতিলাল আপনার সঙের পোশাকের থলি বাহির করিয়া বসিয়া ছিল, দুই টুকরা সোলাকে সে ধারালো ছুরি দিয়া চাঁচিতেছিল।

ভুবন বলিল, আ মরণ তোর, দেশের লোক গেল মুক্তচান দেখতে, আর পেটুক রাক্ষসের কাজ দেখ!

সাদা সোলা দুই টুকরা দুই গালে দুই দিকে পুরিয়া মতিলাল হাত বাড়াইয়া ছুটিয়া আসিল, ধঁরব, খাঁব তোঁকে!

ভুবনও দুই পা সরিয়া গিয়া বলিল, এই দেখ, ভালো হবে না বলছি!

মতিলাল হি-হি করিয়া হাসিতে লাগিল।

ভুবন বলিল, দেখ দেখি, মানুষকে ভয় লাগিয়ে দেয়! খোল বাপু, তোর দাঁত খোল!

মতিলাল পরম পরিতুষ্ট হইয়া প্রশ্ন করিল, তোরও ভয় লাগল ভোবন?

ভুবন বলিল, হ্যাঁ, ভয় লাগতে আমার দায়! কিন্তু তু যে বললি ধম্মরাজের মাদুলি এনে দিবি?

ট্যাঁক হইতে খুলিয়া মাদুলি বাহির করিয়া দিয়া মতিলাল বলিল, একটো পাঁঠা কিনে রাখতে হবে আবার। ছেলে হলে পাঁঠা লাগবে—দেবাংশী বলেছে।

পরদিন পূর্ণিমার অবসান-সময়ে ব্রতের উদ্যাপন। ঢাক শিঙা কাঁসি কাঁসর ঘণ্টা শঙ্খ বাজাইয়া শোভাযাত্রা বাহির হইল। প্রথমেই একদল ঢাক ও বাদ্যভাণ্ড, তাহার পরেই শ্রেণীবদ্ধভাবে বারো-চৌদ্দ সারি ভক্তের দল ভাঁড়াল মাথায় করিয়া চলিয়াছে। ভাঁড়াল এক-একটি জলপূর্ণ মঙ্গল-কলস, কলসগুলির গলায় ফুলের মালা; ভক্তের দলেরও প্রত্যেকের গলায় মোটা মোটা কন্ধে আউচ ও গুলঞ্চ ফুলের মালা। ভক্তদলের চারিপাশে সারি সারি ধুপদানি হইতে ধুপের ধোঁয়া উঠিতেছে। তাহারা ঢাকের বাজনার তালে তালে ভক্ত-নাচ নাচিয়া চলিয়াছে। আবার পিছনে একদল ঢাক। তাহার পিছনে দশখানা গ্রামের নিম্নশ্রেণীর নরনারী কাতারে কাতারে চলিয়াছে।

মহুগ্রামের ভাঁড়াল আসিয়া বর্ধিষ্ণু গ্রামখানায় প্রবেশ করিল। মহুগ্রাম এই গ্রামের বাবুদেরই জমিদারি, চিরকাল ভাঁড়াল এ গ্রামে আসে। রাস্তার দুই পাশের ঘরের দাওয়া ভদ্র নরনারীতে পরিপূর্ণ। ভাঁড়ালের দলের ভক্তদের সঙ্গে তালে তালে তাহাদেরই মত নাচিতে নাচিতে চলিয়াছে কত ছেলে, তাহার মধ্যে অগ্রবর্তী পার্বতী ও মদন।

আপনাদের দাওয়া হইতে পার্বতীর মা ডাকিল, ওরে ও হতভাগা, উঠে আয়! এই বোশেখ মাসের দুপুরে রোদ—উঠে আয়!

পার্বতী নাচিতে নাচিতেই মাকে এক ভেংচি কাটিয়া দিল।

সমস্ত দলের পিছনে একখানা ঢাকের বাদ্যধ্বনি অকস্মাৎ শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে এক ভয়ার্ত কলরব। পিছনের দিক হইতে ভিড় ভাঙিয়া চতুর্দিকে সব ছুটিয়া পলাইতেছিল। বামনবুড়ী গুল্‌পী মাত্র হাত দুই লম্বা, সে পলাইতে না পারিয়া একটা বাড়ির দেওয়ালে মুখ গুঁজিয়া মুদিত চোখে কাঠের মতো লাগিয়া গেল।

ভয়েরই কথা! ঢাকের সম্মুখে তালে তালে নাচিতে নাচিতে আসিতেছিল—বিকট এক মূর্তি! মাথায় এক আঁটি খড়ে কালো রং মাখাইয়া পরচুলা পরিয়াছে, বিকটাকার মুখে দুই গালের পাশে গজদন্তের মতো দুই দাঁত, রাজ্যের ছেঁড়া কাঁথা পরা, জানু পর্যন্ত ঝুলিয়া পড়িয়াছে দুই স্তন, সর্বোপরি ভয়াল তাহার দুই হাত—প্রত্যেকটি চার-পাঁচ হাত করিয়া লম্বা। এক হাতে এক ঝাঁটা।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই ভক্তদল ও বাদ্যভাণ্ড ছাড়া রাস্তা পরিষ্কার হইয়া গেল। মদন যে কোথায় পলাইল, তাহার সন্ধান পার্বতী পাইল না। সে ছুটিয়া আসিয়া লুকাইল মায়ের পিছনে।

মাও ভয় পাইয়াছিল, তবু সে বলিল, যাবি, যাবি আর? ডাকব ঝাঁটাবুড়ীকে? শোন শোন, ও ঝাঁটাবুড়ী!

ঝাঁটাবুড়ী ঘুরিয়া দাঁড়াইল। পার্বতীকে ঠেলিয়া সম্মুখে আনিয়া মা বলিল, এই দেখ, রাস্তায় পেলেই ধরবি একে।

ঝাঁটাবুড়ী পরমানন্দে নানা অঙ্গভঙ্গি সহকারে বিচিত্র নৃত্য আরম্ভ করিয়া দিল সেইখানে।

হারুবাবুর মা খপ করিয়া পার্বতীর চোখ ও কপাল আবৃত করিয়া বলিয়া উঠিলেন, পালাও, তুমি পালাও!

নাচিতে নাচিতে ঝাঁটাবুড়ী চলিয়া গেল।

হারুবাবুর মা তখন বলিতেছিলেন, জল—জল—পাখা—পাখা!

মতিলাল বাঁড়ুজ্জে-বাড়িতে বকশিশ পাইল দুই টাকা। বাবু ভারি খুশি হইয়াছিলেন। তিনি নিজে ভয়ে বু-বু করিয়া উঠিয়াছিলেন।

বাড়িতে সে তখন পোশাক ছাড়িতেছে, দত্ত-খুড়ো বাড়ি পর্যন্ত আসিয়া তারিফ করিয়া বলিলেন, খুব ভালো হয়েছে মতিলাল!

সবিনয়ে মতিলাল হি-হি করিয়া হাসিল শুধু।

দত্ত বলিল, বামন গুল্‌পী বুড়ী থাকতে থাকতে ধপাস করে পড়ে গেল। মুখুজ্জেদের পার্বতীর চেতন করাতে তো ডাক্তার ডাকতে হয়েছিল। আর বাঁড়ুজ্জে কত্তা তো—

চমকিয়া উঠিয়া মতিলাল প্রশ্ন করিল, পার্বতীর চেতন হইছে?

দত্ত বলিল, হাঁা, তবে একটু বেগ পেতে হয়েছিল। ওর মায়ের যেমন—

পোশাক-পরিচ্ছদ সব পড়িয়া রহিল, মতিলাল ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

আবার তাড়াতাড়ি ফিরিয়া আসিয়া পেয়ারার গাছ ঝরাইয়া এক কোঁচড় পেয়ারা লইয়া সে বাহির হইয়া গেল। আবার কিছুক্ষণ পরে সে ফিরিয়া আসিয়া কতকগুলা কি লইয়া চলিয়া গেল।

পার্বতী শুইয়া ছিল, তাহার মা শিয়রে বসিয়া বাতাস করিতেছিল। বাপ ফুলু মুখুজ্জে ক্রমাগত আপন মনে তিরস্কার করিতেছিল পত্নীকে, হুঁঃ, আক্কেল দেখ দেখি, হুঁঃ— !

বাহির হইতে কে ডাকিল, বাবু!

কে?—ফুলু মুখুজ্জে বাহিরে আসিয়া আঁতকাইয়া ছুটিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

বাহির হইতে সাড়া আসিল, আজ্ঞে ভয় নাই, আমি মতিলাল। খোকাবাবুকে ডেকে দেন, ভালুক সেজে এসেছি আমি, ভালুক দেখলে তার ভয় ভেঙে যাবে।

দরজা খুলিল এবং সঙ্গে সঙ্গে মতিলালের মাথায় পড়িল এক লাঠি। লাঠি মারিয়া মুখুজ্জে বলিল, বেরো শালা, বেরো!

এক লাঠিতে মতিলালের কিছু হইবার কথা নয়, হয়ও নাই; খানিকটা মাথার চামড়া কাটিয়া গিয়াছিল শুধু। পরদিন সে দত্ত-খুড়ার বাড়িতে বসিয়া প্রশ্ন করিতেছিল, না খেলে শরীর হাঁজবে, কাকামশায়, আর রং ফরসা হয় কি সাবানে বলেন দেখি?

বেণী ডোম—চৌকিদার আসিয়া তাহাকে ডাকিল, তোকে ডাকছে মতিলাল, পেসিডেনবাবু!

কেন?—মতিলাল অবাক হইয়া প্রশ্ন করিল।

বেণী বলিল, কাল তোকে লাঠি মারে নাই ফুলু মুখুজ্জে? তাই লালিশ-টালিশ করতে বলবে তোকে হয়তো।

মতিলাল হাসিয়া বলিল, উ আমার লাগে নাই বেনোজ্জেঠা। লালিশ আবার করে লোক—ওই নিয়ে!

তাই বলে আয় গিয়ে বাপু।

মতিলাল উঠিল। পথে ছেলের পাল সভয়-কৌতুকে দূরে দাঁড়াইয়া বলিতেছিল, ঝাঁটাবুড়ী, ও ঝাঁটাবুড়ী!

মতিলাল হি-হি করিয়া হাসিতেছিল।

পথে নারানবাবুর বাড়ির ভিতর কে বলিতেছিল, দুধ খাও খুকু, ডাকব ঝাঁটাবুড়ীকে!

মতিলাল বিনা দ্বিধায় বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়া একমুখ দাঁত বাহির করিয়া হাসিয়া বলিল, দুধ খাও খোকাবাবু!

ছেলেটা ভয়ে বিবর্ণ হইয়া উঠিল। মা ছেলেকে লইয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়া বলিল, বেরিয়ে যাও তুমি, বেরিয়ে যাও!

মতিলাল বাহির হইয়া আসিতেই বেণী জিজ্ঞাসা করিল, কী, হল কী তোর মতিলাল, অ্যাঁ? মতিলাল—মতে!

মতিলাল বাড়ি ফিরিল প্রহারজর্জরিত দেহে।

ভুবনের চোখে আজ জল দেখা দিল, সে তাড়াতাড়ি তেলের বাটি লইয়া বসিয়া বলিল, কী হল, কে মেলে?

মতিলাল ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া বলিল, ছোট ছেলে আমাকে দেখে প্যাঙাশ-পারা হয়ে গেল ভোবন!

ভুবন প্রশ্ন করিল, কে মেলে কে তোকে?

পেসিডেনবাবুর চাপরাসী। গাঁ ঢুকতে বারণ হয়ে গেল, ছোট ছেলেতে ভয় পাবে আমাকে।—কণ্ঠস্বর তাহার রুদ্ধ হইয়া গেল।

ভুবন চকিত হইয়া বলিল, ও কি, মাদুলি ধরে টানছিস কেনে, ওই?

পট করিয়া মাদুলির সুতা ছিঁড়িয়া লইয়া মতিলাল বলিল, আমাদের ছেলে আমাদেরই মতো কুচ্ছিত হবে তো ভোবন! কাজ নাই।

মুসাফিরখানা

বাঙালীর জীবনে 'মধুচন্দ্রিকা'র স্থান নাই, অন্তত সাধারণ বাঙালীর জীবনে। পল্লীগ্রামে মা, মাসী, পিসী, বোন লইয়া আমাদের সংসার। তাঁহাদের ফেলিয়া স্ত্রীকে লইয়া 'কপোত-কপোতী' সম দুর-দুরান্তরে নীড় বাঁধিবার রেওয়াজ এখনও হয় নাই। কেরানি জীবনে অনেকে অবশ্য স্ত্রীকে বাসায় লইয়া আসেন, কিন্তু সেখানে হাঁড়ি কড়া বেড়িতে বাঁধিয়া রাখে স্ত্রীকে, এবং আপিসের সাহেব বাঁধিয়া রাখে স্বামীকে। রাত্রিতে একই শয্যায় উভয়ের মধ্যে বহে ক্লান্তির বন্যা—ভরা ঘুমের নদী। অবস্থাটা হয় চখা-চখীর মতো। কিন্তু আমার জীবনে বিবাহের পাঁচ বৎসর পরে সহসা এমনই মধুর অবকাশ একবার মিলিয়া গেল।

মা ও পিসীমা গিয়াছিলেন তীর্থভ্রমণে; তবুও পল্লীর মধ্যে মধু জীবনটা বেশ জমিতেছিল না। এমনই সময় গ্রামের আশেপাশে মহামারী দেখা দিল। সংবাদ পাইয়া স্ত্রী ভয়ে যেন বিবর্ণ হইয়া গেলেন। তাঁহার জীবনে ভয় এবং ক্রোধ দুইটি বস্তু সমপরিমাণে বর্তমান। কিসে কিসে তাঁহার ক্রোধ হয়, তাহার ফিরিস্তি আর দিব না, তবে ভয়ের কারণের ফিরিস্তিটা উপভোগ্য হইতে পারে, তাই না দিয়া পারিলাম না। তিনি ফড়িং দেখিয়া ভয় পান, জোঁক দেখিলে ঘরে খিল দেন, গোরুকে ভয় করেন, গাধাকে ভয় করেন, সন্ধ্যা হইলে ছায়া দেখিয়া চমকাইয়া উঠেন, চোরের নাম শুনিলে রাত্রে তাঁহার ঘুম হয় না, রাত্রে বাতাসে জানালা নড়িলে তিনি 'ভুমিকম্প' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠেন। বাঁদরকে ভয় করেন, ইঁদুরকে ভয় করেন, ছুঁচোকে ভয় করেন, আরশোলাকে ভয় করেন, ভয় করেন না শুধু আমাকে।

মহামারীর নাম শুনিবামাত্র তাঁহার মুখ শুকাইয়া গেল।

সাহস দিয়া বলিলাম, ভয় কি? আজকাল বৈজ্ঞানিক উপায়ে কলেরাকে কুকুর-বেড়ালের মতো তাড়ানো যায়, জান?

তিনি সভয়ে বলিয়া উঠিলেন, আচ্ছা, তোমার মুখের কি আগল নেই? কুকুর-বেড়ালের মতো, ও কি কথা?

মধ্যরাত্রে আমাকে ঠেলা দিয়া জাগাইয়া বলিলেন, ওগো, আমার শরীরটা কেমন করছে!

আতঙ্কিত হইয়া উঠিয়া বসিলাম, আলোটা বাড়াইয়া দিয়া বলিলাম, কী রকম হচ্ছে?

এই দেখ, হাত-পাগুলো কেমন সব ঠাণ্ডা হিম হয়ে গিয়েছে। পেটের মধ্যেও কেমন যেন—

নিজেও একটু-আধটু নাড়ি দেখিতে জানি, পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, অসুখ তাঁহার একমাত্র ভয় ছাড়া আর কিছু নয়। সমস্ত রাত্রিটা তাঁহাকে সাহস দিবার জন্য জাগিয়া কাটাইতে হইল।

পরদিন প্রাতেই কিন্তু আমার একটু ভয় হইল। আমাদের গ্রাম ও মহামারী-আক্রান্ত মুসলমানের গ্রামখানি একেবারে পাশাপাশি। শুনিলাম, রাত্রেই রোগ আমাদের গ্রামে প্রবেশ করিয়াছে। অপরাহ্ণে শুনিলাম, আমাদেরই গ্রামে আরও দুই ব্যক্তি আক্রান্ত হইয়াছে।

আর গ্রামে থাকিতে সাহস হইল না। রোগের ভয় নয়, ভয় হইল, আমার স্ত্রীর হৃদ্‌যন্ত্র কখন অকস্মাৎ বিকল হইয়া যাইবে। স্থানীয় ডাক্তার আমার বন্ধু, তিনিও বলিলেন, আপনি ওঁকে নিয়ে সরেই যান, এ রোগে ভয়টা একেবারেই ভাল নয়

অগত্যা গ্রাম ছাড়িতে বাধ্য হইলাম। অনেক চিন্তা করিয়া কলিকাতাই ভালো মনে হইল। আসিয়া প্রথমে এক আত্মীয়ের বাসায় উঠিয়া একটা বাড়ি দেখিয়া লইলাম।

সকালে বাসায় উঠিয়া সন্ধ্যাতেই রিকশা করিয়া সিনেমা দেখিতে গেলাম। জীবনে আকস্মিকতার মধ্য দিয়া 'মধুচন্দ্রিকা' আসিয়া গেল। সমস্ত সংসারটা যেন একটি জ্যোৎস্নালোকিত সুসমতল পথের উপর দিয়া গড়াইয়া গড়াইয়া চলিতেছিল।

উপমা দিয়া এ সময়টুকুর স্বরূপ বুঝাইতে হইলে বলিতে হয়, এ যেন একটি মধুর স্বপ্ন। স্বপ্নের মতোই অকস্মাৎ এ অবস্থার অবসান হইয়া গেল। একদা চিঠি পাইলাম, মা ও পিসীমা দেশে ফিরিয়াছেন, দেশও ভালো আছে, সুতরাং দেশে ফিরিতে হইবে।

স্ত্রী বলিলেন, কালই চল। বাবা, এই দেশে মানুষ থাকে!

অবাক হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। তিনি বলিলেন, একটা ফর্দ করে ফেল দেখি!

কিসের?

কি কি কিনতে হবে, তারই। কড়াই, ডাল-ছাঁকনা দুখানা, ধূপশলাকা, আর একটা বেশ ভালো দেখে শিল নিয়ে যেতে হবে।

বিরক্ত হইয়া বলিলাম, সে সব হবে এখন পরে। আজ সকাল সকাল খাওয়া-দাওয়া সেরে নাও দেখি, বটানিক্যাল গার্ডেন যাব।

প্রশ্ন হইল, সে আবার কি? কোথায়?

বাগান, বাগান। সেখানে নানা রকমের গাছপালা আছে। পৃথিবীর—

গাছপালা! সে আবার কী দেখব? সে আর দেখতে হবে না বাপু, তার চেয়ে বরং জিনিসগুলো কিনে আন!

বাকবিতণ্ডার শেষে তাঁহার কথাই থাকিল, বাজারে শিল কিনিতেই ছুটিলাম। খুব ভারী ওজনেরটাই পছন্দ করিলাম, যেন গলায় ঝুলাইলে একেবারে তলাইয়া যাই, সংসার-সমুদ্রের জলরাশির উপর আর কখনও যেন ভাসিয়া না উঠি। শিলখানা দেখিয়া তিনি খুব খুশি হইয়া উঠিলেন, তারিফ করিয়া বলিলেন, বেশ জিনিস কিনেছ, দু-তিন পুরুষ কেটে যাবে। ওজনসই নইলে জিনিস!

ঘরের দেওয়ালে বিলম্বিত আয়নাখানার মধ্যে প্রতিফলিত আমারই ক্ষীণকায় মূর্তির দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া ছিলাম, আমি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলাম। যাক!

অতঃপর কুঞ্জভঙ্গের পালা! সাধের সাজানো বাসাটি ভাঙিয়া মোটঘাট বাঁধিতে সমস্ত দিনটা কাটিয়া গেল। সন্ধ্যায় সাড়ে সাতটায় ট্রেন। তাড়াতাড়ি গাড়ি

ডাকিয়া আনিলাম; মোটঘাট দেখিয়া সে বলিল, একটা গাড়িতে এত মাল যাবে না বাবু।

প্রথমে ঝগড়া করিলাম। গাড়োয়ানটা গাড়ির মুখ ফিরাইয়া চাবুক ঘুরাইয়া জিভ দিয়া শব্দ করিল, ক্যাঃ—ক্যাঃ—ক্যাঃ!

ঘোড়া দুইটা বার কয়েক নাক ঝাড়িয়া নড়িয়া উঠিল। অগত্যা তখন আরম্ভ করিলাম তোষামোদ। অবশেষে আরও কয়েক আনা ভাড়া অধিক স্বীকার করায় একটা আপোষ হইয়া গেল।

স্টেশনে আসিয়া দেখি, ট্রেনখানি যথাসময়ে চলিয়া গিয়াছে।

স্ত্রী বলিলেন, ঐ ঘোড়া দুটোর অভিসম্পাতে। আহা-হা, জীব, জীব তো বটে! অমনই করেই কি মারে! দেখ, সত্যিই ওদের চোখ দিয়ে জল পড়ছে।

আমার চোখে জল অবশ্য আসে নাই, কিন্তু চোখে আমি অন্ধকার দেখিতেছিলাম। ভাবিতেছিলাম, উপায়!

উপায় একমাত্র লাস্ট ট্রেন। সাড়ে দশটায় হাওড়ায় চাপিয়া রাত্রি দুইটায় বর্ধমানে নামিতে হইবে। দুইটা হইতে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত বর্ধমান মুসাফিরখানায়, ভোর পাঁচটায় ট্রেন মিলিবে বর্ধমানে।

কিন্তু তদ্ভিন্নই বা উপায় কি? অগত্যা ভীরু মনকে উৎসাহ দিয়া বলিলাম, চলো মুসাফের, বাঁধো গাঁঠরি!

যথাসময়ে আসিয়া বর্ধমান পৌঁছিলাম।

স্ত্রী ঘুমাইতেছিলেন, মহা বিরক্ত হইয়া বলিলেন, তোমার হাতে পড়ে আমার আর লাঞ্ছনার শেষ রইল না।

রাত্রির শেষ প্রহরে ক্লান্ত দেহে আর কলহ করিতে প্রবৃত্তি হইল না, রসিকতা তো দূরের কথা। জীবনের রস তখন রস-বিকারে পরিণত হইবার উপক্রম হইয়াছে। ইচ্ছা হইল, ঠাস করিয়া তাঁহার গালে একটি চড় বসাইয়া দিই; অথবা ওই শিলটা নিজের মাথায় মারিয়া মরি।

মুসাফিরখানায় মালপত্র রাখিয়া স্ত্রীকে জেনানা-অন্ধকূপে বসাইয়া দিলাম। একটা ইলেকট্রিক আলো সেখানে জ্বলিতেছিল, দেখিলাম, একটি প্রৌঢ়া সধবা ও একটি তরুণী বিধবা সেখানে রহিয়াছেন। প্রৌঢ়া ঘুমাইতেছেন, বিধবাটি জাগিয়া বসিয়া আছেন।

আমার স্ত্রী ঘরে প্রবেশ করিবামাত্র তরুণীটি বলিয়া উঠিলেন, আসুন ভাই, বাঁচলুম। একা জেগে বসে প্রাণ আনচান করছে।

স্ত্রী বলিলেন, আপনারা বুঝি অনেকক্ষণ এসেছেন?

আমি তাঁহার সম্বন্ধে অন্তত নিশ্চিন্ত হইলাম। একটু চায়ের চেষ্টায় চা-ওয়ালার সন্ধানে চারিদিকে ভালো করিয়া চাহিয়া দেখিলাম। সে এক অবর্ণনীয় দৃশ্য! হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল—দেশে মধ্যে মধ্যে ভেড়াওয়ালারা আসে, তাহাদের আদর করিয়া লোকে আপন আপন খেত-জমিতে বসায়। গায়ে গায়ে ঠেলাঠেলি করিয়া ভেড়ার পাল চোখ বুজিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ঘুমায়; এখানে ওখানে দুই-চারিটা গুঁতোগুঁতিও করে। এও তাই।

ঐ এক কোণে পানওয়ালার দোকানে কনস্টেবলটা লাঠি হাতে ঢুলিতেছে, ওই লোকটাই ভেড়াওয়ালা। আর এক ধার হইতে অন্য ধার পর্যন্ত তন্দ্রাচ্ছন্ন যাত্রীর দল গায়ে গায়ে ঠেস দিয়া ঢুলিতেছে।

বোম শঙ্কর শূলী শম্ভু দুনিয়া তো ঝুটা টুটা, আও ফুটা, মেকী আও, আও ফাঁকি; ভজ কিষণ রাধা—দিল করো সাদা! হর-হর-বোম্!

শব্দ লক্ষ্যে দৃষ্টি ফিরাইয়া দেখিলাম, এই ভিড়ের মধ্যে এক সাধুও জুটিয়া গেছেন; 'চেলা-চামুণ্ডী'রও অভাব নাই। সেখানে গাঁজা চলিতেছে।

পাশের একজন যাত্রী আপত্তি করিয়া উঠিল, আঃ, কি বিপদ, গাঁজা খাবে তো সরে গিয়ে খাও হে বাপু। এখানে নেশা করবার হুকুম নেই।

বাবাজী উর্ধ্বনেত্র হইয়া দম বন্ধ করিয়া গাঁজার ধোঁয়াটা হজম করিতেছেন। জন দুই চেলা একেবারে আগুন হইয়া উঠিল, হুকুম কার রে বাপু? হুকুমের কার ধার ধারি? আমরাও টিকেট করেছি। তোমার গন্ধ লাগে তো তুমি সরে যেতে পার।

প্রতিবাদকারী বলিল, বেশি লোকের সুবিধে অসুবিধে—

Shut up, I say, you shut up, চুপ রও বলছি!—গঞ্জিকাচক্রের একপাশ হইতে একটি ছোকরা এবার চীৎকার করিয়া উঠিল। কনস্টেবলটার তন্দ্রা ভাঙিয়া গিয়াছিল, সে ভালো করিয়া চোখ মেলিয়া দেখিয়া সব বুঝিয়া লইয়া চক্রের নিকট আসিয়া বলিল, পরসাদ তো মিলে সাধু মহারাজজী!

কথার শেষে সে আড়ামোড়া দিয়া হাই তুলিয়া আলস্যটাকে বেশ করিয়া কাটাইয়া লইল।

প্রতিবাদকারী এবার নীরবেই নাকে কাপড় দিয়া মুখ ফিরাইয়া জড়সড় হইয়া শুইল।

অকস্মাৎ নারীকণ্ঠের খিলখিল হাসিতে মুসাফিরখানার টিনের চালাটা গমগম করিয়া উঠিল। একটা সাঁওতালের মেয়ে হাসিতেছে, তাহার পাশে বসিয়া একটি সাঁওতাল যুবা, সেও মৃদু-মৃদু হাসিতেছে।

কে একজন জিজ্ঞাসা করিল, উ তোর কে বটে মাঝি?

মাঝি বোধ হয় চটিয়া উঠিল, সে উত্তর দিল, কেনে ?

না, তাই জিগ্যেস করছি।

কেনে, তা করবি কেনে ?

যা গেল, তা বললে কিছু দোষ আছে নাকি ?

মাঝি গম্ভীর হইয়া রহিল। মেয়েটা বলিল, একটি বিড়ি দে কেনে বাবু! উ আমার—কি বলিস তুরা ?—বর হয়।—বলিয়া সে আবার খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

উপরে আলোটার চারিধারে একটা ফড়িং ক্রমাগত ফরফর করিয়া উড়িতেছে। ছোট ছোট পতঙ্গ সংখ্যাতীত।

ও মশায়, পা দুটো গুটিয়ে নিন না! পা মেলে শুতে হলে, ফার্স্ট সেকেন কেলাসে যেতে হয়! শুয়েছে দেখ না, যেন ঘটোৎকচ!

যে শুইয়াছিল সে ভদ্রলোক, বিনা প্রতিবাদেই পা গুটাইয়া লইল। শুধু গুটাইয়াই লইল না, গায়ে পা দিবার অপরাধ-বোধে সে একটি নমস্কারও করিল।

এ ভদ্রলোক কিন্তু রূঢ় ব্যবহারের উত্তরে এমন বিনীত ব্যবহার পাইয়া আরও চটিয়া গেল, সে আপন মনেই বকিতে আরম্ভ করিল, সব যেন নবাব খাঞ্জা খাঁ! দেখ না, দিলে জামাটায় পায়ের ধুলে লাগিয়ে, হুঁঃ! দেখ না সব কাণ্ডকারখানা!

ঢং—ঢং—ঢং—ঢং—ঢন-ন-ন-ন।

কোনো একটা ট্রেন আসিতেছে। কুলির দল ডাউন প্ল্যাটফর্মের দিকে ছুটিয়াছে। এইবার আমিও সচকিত হইয়া উঠিলাম। এই বিচিত্র রঙ্গমঞ্চের ততোধিক বিচিত্র অভিনয় দেখিয়া সব ভুলিয়া গিয়াছিলাম। চায়ের জন্য প্ল্যাটফর্মের মধ্যে যাইতে হইবে।

জেনানা-অন্ধকূপের দুয়ারে গলার সাড়া দিয়া প্রশ্ন করিলাম, চা খাবে নাকি ?

স্ত্রী উঠিয়া আসিয়া দরজায় দাঁড়াইয়া বলিলেন, দু কাপ এনো।

ভিতর হইতে কথা ভাসিয়া আসিল, আমি তো খাব না।

মুখ ফিরাইয়া স্ত্রী বলিলেন, কেন ? পরক্ষণেই একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, ও!

তারপর বলিলেন, বামুনের তৈরি চা তুমি একটু খুঁজে নিয়ে এসো, দু কাপই এনো।

আবার মৃদুস্বরে আমাকে বলিলেন, আহা-হা, এই কচি বয়েস, এরই মধ্যে সব শেষ করে বাপের বাড়ি চলল।

আমিও একটা দীর্ঘনিশ্বাস না ফেলিয়া পারিলাম না। সাধু বাবাজী তখন

কনস্টেবলপ্রমুখ শিষ্যবর্গকে আধ্যাত্মিক উপদেশ দিতেছিলেন, এই নাভিকুণ্ডমে একঠো শতদল পদ্ম হ্যায়, বক্ষদেশমে—

বুঝিলাম, কনস্টেবলটিই বাবাজীর সর্বাপেক্ষা প্রিয় শিষ্য হইয়া উঠিয়াছে।

হিন্দী ভাষণ চলিতেছে।

যাঁহার গায়ে পা ঠেকিয়াছিল, সেই ভদ্রলোকটি আমাকে লক্ষ্য করিতেছিলেন, তিনি বলিলেন, ও মশাই, আপনি কি প্ল্যাটফর্মে যাচ্ছেন? দেবেন তো একটা চা-ওয়ালাকে বলে, এখানে যেন চা দিয়ে যায়। ও মশাই, আপনার কাছে দেশলাই আছে? একবার দিন তো! দেশলাইটা দিন তো, শুনছেন!—এবার তিনি খোঁচা দিয়া ডাকিতেছিলেন, যে তাঁহার গায়ে পা দিয়াছিল, সেই ভদ্রলোককে।

দেশলাইসুদ্ধ একখানা হাত শুধু বাহির হইয়া আসিল। এ ভদ্রলোক একটা একটা বিড়ি ধরাইয়া দেশলাইটা নিজের পকেটেই পুরিলেন।

প্ল্যাটফর্মে ঢুকিয়া বিস্মিত না হইয়া পারিলাম না।

ইণ্টার ক্লাসের ওয়েটিং-রুমের সম্মুখে দেখি—পরিচিত সাহিত্যিক বন্ধুর দল। আমাকে দেখিয়া কয়েকজন চীৎকার করিয়া উঠিল, এসেছে—এসেছে—এসেছে!

একজন আমার ঘর্মসিক্ত ময়লা জামা ও রুক্ষ চেহারার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিল, দেখুন মশাই, আপনারা বিচার করুন, এই কি কখনও কোন ভদ্রলোকের চেহারা হয়?

হয়ই না তো! কিন্তু তোমরা এখানে কোথায়? ব্যাপার কী?

একজন বলিল, সাহিত্যে যত ইচ্ছে ন্যাকামি কর, কর। কিন্তু সাহিত্যিকের কাছে মুখে ন্যাকামি চলবে না।

এই সময় একজন ওয়েটিং-রুম হইতে বাহির হইয়া আসিয়া বলিল, এই যে, এসেছে! যাক, বেটার লেট দ্যান্ নেভার; কিন্তু রাস্কেল, তোমার ব্যাপার কী? এ কি চেহারা তোমার? তুমি কি স্ত্রীর কাছ থেকে রাত্রে অ্যাব্‌স্কণ্ড করেছ নাকি?

সর তো, সর তো, দেখি আমি একবার ওকে!

সম্মুখস্থ বন্ধুটি সরিয়া দাঁড়াইতেই দেখি, নিখিল বরবেশে দাঁড়াইয়া। এ কি, নিখিলের বিবাহ!

আনন্দের উৎসাহটা এত প্রবল হইয়া গেল যে, সঙ্গে সঙ্গে নিজেই কোমর ঘুরাইয়া নাচিয়া গাহিয়া উঠিলাম, 'এতদিনে ফুটল সখি, সাধের বিয়ের ফুল'!

নিখিল আমার মাথায় একটা চাঁটি মারিয়া বলিল, কিন্তু তোর এত দেরি কেন গাধা?

বলিলাম, আমি তো কোনো খবরই পাই নি!

সে বলিল, বাঃ, আমি নিজে হাতে চিঠি দিয়েছি।

কোথায় ?

কেন, তোমার দেশে !

হরি হরি ! আমি যে আজ এক মাসের ওপর দেশছাড়া।

কোথায় কোন চুলোয় গিয়েছিলি ?

এবার থতমত খাইয়া গেলাম। কলিকাতায় ছিলাম বলিলে আর রক্ষা থাকিবে না আমার। ধাঁ করিয়া মিথ্যা বলিয়া বসিলাম, বলিলাম, সে আর বলিস কেন ভাই ! মেমারিতে নেমে আমার দিদির ওখানে যেতে হয়, সেখানে গিয়েছিলাম, অবশ্য একা নয়, স্ত্রীকে সুদ্ধ সঙ্গে নিয়ে। দিদির অসুখ হয়েছিল। এই আজ বাড়ি চলেছি।

নিখিল প্রশ্ন করিল, তোর স্ত্রী ? তিনিও তোর সঙ্গে রয়েছেন নাকি ?

আবার মিথ্যা বলিলাম, শুধু সঙ্গে, একেবারে শয্যাশায়িনী হয়ে সঙ্গে। তিনি নিয়ে এলেন বর্ধমানের ম্যালেরিয়া।

নিখিল চিন্তিত হইয়া বলিল, তা হলে তুই যাবি কেমন করে ?

বলিলাম, আমার আর যাওয়া হয় না ভাই।

ওদিকে একদল ব্রিজ খেলিতেছিল, তাহাদের এতক্ষণ কথা বলিবার অবসর ছিল না। এইবার তাহারা চীৎকার করিয়া উঠিল, গেম—গেম—রবার হয়ে গেছে। বয় বয়, এই, বোলাও বয়কে !

আমি নিখিলের বিবাহের কথাই ভাবিতেছিলাম।

নিখিল এতদিনে বিবাহ তবে করিল ! নিখিল শুধু সাহিত্যিক নয়, তাহার জীবনের বৈচিত্র্য সত্যই বিচিত্র। সে প্রতিভাবান ছেলে।

অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে সে, বাপ তাহার ছিলেন খাঁটি জমিদার। আট বৎসর বয়সের সময় তাহার বিবাহের সম্বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু এক ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পৌত্রীর সহিত। মেয়েটির বাপও তখন সরকারী চাকুরিতে ঢুকিয়াছেন। তিনি তখন ডি. এস. পি.। তখন হইতেই উভয় ঘরের মধ্যে তত্ত্ব-তল্লাস চলিত।

বাল্যবন্ধুরা নাকি নিখিলকে খেপাইত, 'গাড়ুর ওপর গামছাখানি, নিখিলেশের কুন্দরানী'।

ভাবী বধূর নাম ছিল নাকি কুন্দরানী। বয়স তখন তাহার আট মাস। কন্যাটির অন্নপ্রাশনের সময় নিখিলেশের বাপ সেখানে গিয়াছিলেন, সেই সময় কথা পাকা হইয়া যায়। তারপর নিখিলের বয়স যখন বারো তখন তাহার বাপ হঠাৎ মারা গেলেন। তাহার পিতৃবন্ধু, তাহার ভাবী বধূর পিতামহ ম্যাজিস্ট্রেটপদে উন্নীত হইয়াছেন। তিনি

লিখিলেন, নিখিলকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হউক। তাহার পড়াশুনার ভার তিনি লইবেন।

কিন্তু নিখিলেশের মা ছিলেন, যাহাকে বলে, মর্যাদাময়ী তেজস্বিনী মেয়ে। তিনি উত্তর দিয়াছিলেন—

নিখিলের জন্ম আপনি চিন্তা করিবেন না। সে অমানুষ হইবে না। সন্তানকে মানুষ করিয়া তুলিতে পারে মা, আর আমি এখনও বাঁচিয়া আছি।

উত্তরে তিনি অসন্তুষ্ট হইয়াই পত্র দিয়াছিলেন; কিন্তু নিখিলের মা তাহা গ্রাহ্যই করেন নাই। সে অসন্তোষ আর বাড়িতে পায় নাই, উভয় পক্ষেরই ভদ্রব্যবহারের গুণে চাপা পড়িয়া গিয়াছিল। যেমন তত্ত্ব-তল্লাস চলিতেছিল, চলিতেই থাকিল।

নিখিল যেদিন ম্যাট্রিকুলেশন পাস করিয়া স্কলারশিপ পাইল, সেদিন কিন্তু নিখিলের ভাবী দাদাশ্বশুর ক্ষমা চাহিয়া নিখিলের মাকে পত্র লিখিয়াছিলেন। তারপর নিখিল আই. এ., বি. এ. পাস করিল। এবার কন্যাপক্ষ উতলা হইয়া বিবাহের জন্ম নিখিলের মাকে ধরিয়া বসিলেন। নিখিলের মায়ের আর আপত্তি ছিল না, কিন্তু নিখিল আপত্তি করিল, পড়া শেষ না করিয়া সে বিবাহ করিবে না।

নিখিলের মা বলিয়াছিলেন, বেশ তো, আর দিন কতক অপেক্ষাই করুন না! কুন্দর বয়স তো হল এই তেরো। আর একটা কি দুটো বছর!

ভদ্রলোক নিজে শিক্ষিত ব্যক্তি, তিনি আর আপত্তি করিলেন না। নিখিলের জন্ম একটা বড় চাকুরির ব্যবস্থায় তিনি চেষ্টিত হইয়া রহিলেন।

ইহার পর অকস্মাৎ একদিন দেশে নিখিলেশের মায়ের কাছে সংবাদ আসিল, নিখিলেশ পড়া ছাড়িয়া অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়াছে।

পরদিন প্রাতঃকালেই নিখিলের ভাবী দাদাশ্বশুর নিজে আসিয়া হাজির হইলেন। তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন, বলিলেন, এই ডেঁপোমির ভয়ে আমি তখন আপনাকে লিখেছিলাম, নিখিলকে আমার হাতে দিন।

নিখিলের মা বলেছিলেন, আমি কিন্তু একে ডেঁপোমি বলে মনে করি না।

মনে করেন না? জেল হয়ে যাবে যে!

জানি। কিন্তু তবুও তো একে খারাপ কাজ আমি বলতে পারব না।—নিখিলের মা এই উত্তর দিয়াছিলেন।

এই কথার পর আর কথা চলে না, এবং উত্তরমেরু ও দক্ষিণমেরুতে থাকিয়া পরস্পরের হাত ধরাও চলে না; সুতরাং কুন্দরানী ও নিখিলের বিবাহ-সম্বন্ধ ভাঙিয়া গেল। শুনিয়াছি, মেয়েটি নাকি সেদিন কাঁদিয়াছিল। নিখিলের কাঁদিবার অবসর ছিল না, সে তখন কারা-দ্বারের লৌহকপাটে করাঘাত করিতে ব্যস্ত।

জেল হইতে ফিরিয়া নিখিল হইল সাহিত্যিক। সে সাহিত্য-জগতে প্রবেশ করিল, ক্ষুরধার তরবারি হাতে লইয়া। দেখিতে দেখিতে অগ্রগামিগণকে পশ্চাতে ফেলিয়া সে পুরোভাগে আপন স্থান করিয়া লইয়াছে। আজ বাংলা দেশে নিখিলেশকে না জানে কে?

তবুও নিখিলেশ আজও বিবাহ করে নাই। কত কুমারীর প্রণয় সে উপেক্ষা করিয়াছে। তাই ভাবিতেছি, কে সে ভাগ্যবতী, যে নিখিলকে বন্দী করিল!

সেই প্রশ্নই চুপিচুপি করিলাম, বলিলাম, ভাগ্যবতীটি কে?

নিখিল হাসিয়া বলিল, নিতান্তই অপরিচিতা, চোখে দেখিও নি।

মানে?

মানে, আমাদের অধিকাংশেরই যেমন ধারায় বিয়ে হয়ে আসছে, এও তাই। মা বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক করেছেন, আমি চললাম টোপর মাথায় দিয়ে।

সে কি রে?—বিস্মিত না হইয়া পারিলাম না।

উত্তরে সে শুধু হাসিল।

আমি আবার বলিলাম, তুই সত্যি বলছিস নিখিল?

বিশ্বাস না হয়, জিজ্ঞেস কর সকলকে। মা ধরে বসলেন, এইবার তোমাকে বিয়ে করতেই হবে, আমি নিজে মেয়ে দেখে সম্বন্ধ করে রেখেছি। আমি বললাম, বেশ। দিন স্থির হয়ে গেল, কাল বিয়ে।

জায়গাটা কোথায়?

বর্ধমান-কাটোয়া লাইনে। সকালে ট্রেন। তাই রাত্রে এসে বসে আছি।

দেখ দেখ, ত্নটি মেয়ে আমাদের দেখছে।

পিছন ফিরিয়া দেখিলাম, তাহারা অপর কেহ নন, আমার স্ত্রী আর সেই তরুণীটি। তাঁহারাও কেমন করিয়া বিবাহের বরের সন্ধান পাইয়া ঘরের জানালা হইতে উঁকি মারিয়া বর দেখিতেছেন।

নিখিল বলিল, বাঙালীর মেয়ে চিরদিনই মনে মনে বিয়ের কনে থেকে যায় বোধ হয়। বর দেখলেই তাদের বিয়ের বাসর মনে পড়ে।

হাসিয়া বলিলাম, সত্যি কথা। কিন্তু বোস, আমি আসছি। তাঁর জন্যে চায়ের সন্ধানে বেরিয়েছি।

নিখিল হাঁ-হাঁ করিয়া উঠিল, আরে আরে, এইখান থেকে চা দিয়ে আসছে। সঙ্গে স্টোভ রয়েছে, ঠাকুর রয়েছে, চাকর রয়েছে।

আমারও একটা কথা মনে পড়িয়া গেল, বলিলাম, ভালো কথা, তোদের ঠাকুর আছে, তাকেই একটু চা করতে বল তো! সঙ্গে বিধবা আছেন।

ও প্ল্যাটফর্মে তখন দুইটা কুলিতে মাল লইয়া চরম কলহ বাধাইয়া তুলিয়াছে।

একজন ভদ্রলোক একটি রেলের বাবুর পিছনে পিছনে কাকুতি-মিনতি করিতে করিতে যাইতেছিল, এই দেখুন আট আনা আমি দিচ্ছি। এই নিন।

রেলের বাবুটি তখন পুলিসের ইন্‌স্‌পেক্টর জেনারেল অপেক্ষাও বড়লোক, তিনি গম্ভীরভাবে বলিলেন, ও, নো নো।

শুনছেন, শুনুন শুনুন—তাই নিন দয়া করে! সামান্ত মালের জন্তে আর—

চা লইয়া জেনানা-অন্ধকূপের দিকে যাইতে যাইতে যাইতে শুনিলাম, সেকেণ্ড ক্লাস ওয়েটিং-রুমের মধ্যে এক ভদ্রলোক তারস্বরে চীৎকার করিতেছেন, ইমপসিবল হতে পারে না, হাজার বছরেও না। স্বরাজ, ইন্‌ডিপেণ্ডন্স! অসম্ভব! কই বুঝিয়ে দিন আমাকে কি করে হবে!

কৌতূহল সংবরণ করিতে পারিলাম না, কাটা দরজার নীচে উঁকি মারিয়া দেখিলাম, এক স্থূলকায় স্থবির চীৎকার করিতেছেন, এবং তাঁহার সম্মুখে একজন প্রায়-প্রৌঢ় মুখ লাল করিয়া বসিয়া আছেন।

প্রৌঢ় ভদ্রলোক কি বলিতে গেলেন, কিন্তু স্থবির অকস্মাৎ যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করিয়া দুই হাতে পা ধরিয়া সন্তর্পণে পাখানি নামাইতে নামাইতে বলিলেন, চীৎকার করেছি আর চিড়িক মেরে উঠেছে! উ, বাত যেন কোন মানুষের না হয়! ধর্মরাজ কালী—কত করলাম, উ-হু-হু! বোগাস, সব বোগাস, উ-হু-হু!

দৃশ্যটি আরও কিছুক্ষণ দেখিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু চা-বাহী ঠাকুরটি স্মরণ করাইয়া দিল, চা ঠাণ্ডা হইয়া যাইতেছে। অগত্যা চলিলাম, রাস্তার পাশেই পার্সেল-আপিস, সেখানে দেখিলাম—একটা ফলের ঝুড়ির সামান্ত খানিকটা কাটিয়া এক ভদ্রলোক তাহার মধ্যে হাত পুরিয়াছেন।

জেনানা-অন্ধকূপের সম্মুখে দেখি এক টেরি-কাটা ছোকরা কখন আসিয়া জুটিয়া গিয়াছে, সে একখানা বই বাজাইয়া গান করিতেছে—

'তোমারেই ভালো-বে-সে, সয়েছি কত যাতনা—কত অপমান,

তোমারেই ভালো-বে-সে—'

তাহাকে উৎসাহ দিয়া তানের মাথায় একটা বাহবা দিয়া দিলাম। জেনানা ওয়েটিং-রুমের দরজায় দাঁড়াইয়া ডাকিলাম, চা নাও!

স্ত্রী চা লইয়া গেলেন, শুধু প্রশ্ন করিলেন, বামুনের তৈরি তো?

বলিলাম, একেবারে বামুনঠাকুর, দেখ না, লোকটার গলার পৈতে কত ময়লা!

দরজা হইতে ফিরিয়াই দেখি, গায়ক ছোকরা সরিয়া পড়িয়াছে। আরও

একটু খুঁজিতেই দেখিলাম, ছোকরা সাধুবাবাজীর ধর্মচক্রে গিয়া বসিয়া পড়িয়াছে। সেখানে পুনরায় গাঁজা তৈয়ারি হইতেছে।

ওপাশের পানের দোকানটার তক্তাপোশের উপর বসিয়া এক পাগলী বিড়বিড় করিয়া বকিতেছে। পাগলী নিত্য রাত্রে আসে, বহুবার আমি উহাকে দেখিয়াছি।

কনস্টেবলটা তাহাকে ধমক দিল, এই পাগলী, বকবক মৎ করো।

পাগলী ফিক করিয়া হাসিয়া বলিল, কি যে বলিস, মাইরি? না না, ছি ছি ছি!

বাবু, টিকিস-বাবু!

টিকিট-ঘরের জানালায় ঠকঠক করিয়া শব্দ করিতে করিতে একদল যাত্রী ডাকিতেছিল, টিকিস-বাবু!

নিখিলের ওখানে যাইবার আগেও আমি ইহাদের দেখিয়া গিয়াছি, ওই টিকিট-ঘরের সম্মুখে এমন করিয়াই দাঁড়াইয়া আছে।

ঢং—ঢং—ঢং—ঢন-ন-ন।

আবার কোন গাড়ি আসিতেছে।

একদল যাত্রী মোটঘাট লইয়া উঠিয়া পড়িল।

মসো, ও মসো, ওঠ গো, গাড়ি আইচে! অই অই—ও মসো!

ওই ওই—আমার পোটলা কে নিলে গো! আমার পোটলা!—এক বৃদ্ধার পোটলা চুরি গিয়াছে, সে ব্যাকুল হইয়া চীৎকার করিতেছে।

ওদিকে সশব্দে ট্রেনখানা আসিয়া পড়িল।

চা গ্রোম, হিন্দু চা!

সিগ্রেট পান, সিগ্রেট পান!

এত রাত্রে আর 'লুচি কচৌরি' নাই। যাত্রীরা সব কলরব করিতেছে।

কুলি কুলি! এই চা!

ও মশাই, ও মশাই!

অকস্মাৎ কলরবটা প্রবল হইয়া উঠিল, কিছু অস্বাভাবিক রকমের প্রবল।

উঠিয়া গিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিলাম, একটা কামরার মুখে যাত্রী, রেলকর্মচারী ও পুলিসের ভিড় জমিয়া গিয়াছে।

স্ট্রেচার, স্ট্রেচার! ডাক্তারকে খবর দাও।

না না, একেবারে হাসপাতালে ভেজে দাও বাবা! ও হাঙ্গামা এখানে কেন বাবা?

ব্যাপারটা বুঝিলাম না, তবুও অনুমান করিলাম, যাহার সর্বত্র অবারিত গতি, সেই কোনো অঘটন ঘটাইয়াছে।—মৃত্যু!

হটো হটো হটো!

ভিড় সরিয়া গেল, দেখিলাম—স্ট্রেচারের উপরে শুইয়া একটি কুলি-জাতীয়া স্ত্রীলোক, আর তাহার কোলের কাছে রক্ত-ক্লেদাক্ত একটি শিশু।—মৃত্যু নয়।

ঢং—ঢং—ঢং।

গাড়ি ছাড়িয়া দিল।

বাবু!—ফিরিয়া দেখি আমারই কুলিটা ডাকিতেছে।

গাড়ির সময় হইয়া গিয়াছে।

বাঁচা গেল, সাধুবাবাজীর গঞ্জিকার ধূমে আমারও নেশা ধরিয়া আসিতেছে। স্ত্রীর সঙ্গিনী সদ্যবিধবা তরুণীটি প্ল্যাটফর্মের ফটক পর্যন্ত আগাইয়া আসিলেন।

এবার তাঁহাকে পরিষ্কার দেখিলাম, শ্যামবর্ণা তন্বী তরুণী একটি। সকরুণ মুখশ্রী, চোখের কোণে টানা অশ্রুর দুইটি ক্ষীণ রেখা আলোকচ্ছটায় তখনও চিকচিক করিতেছে। আমার স্ত্রীর চোখেও দেখিলাম জলের রেখা।

বুঝিলাম, সমস্ত রাত্রিই বেদনার কথা হইয়াছে।

নিখিলের কাছে বিদায় লইয়া আসিলাম। তাহারাও বি কে. আর.-এর ট্রেনের দিকে চলিয়াছে; তাহাদের ট্রেনের সময় হইয়াছে।

গাড়িতে বসিয়া দেখিলাম, স্ত্রী তখনও ফটকের দিকে চাহিয়া আছেন। সেখানে দেখিলাম, তরুণী বিধবাটি তখনও দাঁড়াইয়া।

অকস্মাৎ আমার মনে হইল, এই মেয়েটিই যদি কুন্দরানী হয়, নিখিলের যাহার সহিত বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছিল!

ওদিকে নিখিলের বন্ধুর দল হুলুধ্বনি দিতেছে।

মেয়েটি ওই বরযাত্রীর দিকে চাহিয়া আছে, বর দেখিতেছে।

স্ত্রীকে প্রশ্ন করিলাম, মেয়েটির নাম কি?

চোখ মুছিয়া স্ত্রী বলিলেন, অমলা।

মিথ্যা অনুমান, কিন্তু তবু মনে হইল, ওই কুন্দরানী।

নিখিল বিবাহ করিতে চলিয়াছে, কুন্দ বিধবা হইয়া ফিরিতেছে। কেহ কাহাকেও চেনে না। এমন অজানিত বিয়োগান্ত কত দৃশ্যই তো অহরহ অভিনীত হইয়া চলিয়াছে এই সংসার রঙ্গমঞ্চে।

ঢং—ঢং—ঢং—ঢন-ন-ন-ন।

আমাদের গাড়িটা ছাড়িল। প্ল্যাটফর্মের বাহিরে তারের বেড়ার ধারে দাঁড়াইয়া পাগলী গাড়ির লোককে মুখ ভেঙচাইতেছে। মুসাফিরখানায় কলরব করিতেছে নূতন যাত্রীর দল। স্ত্রী তখনও চোখ মুছিতেছিলেন।

শ্মশান-বৈরাগ্য

মহুলার মহিম বাঁড়ুজ্জে এ অঞ্চলে নাম-করা মহাজন।

টাকা নিজের ঘরে বাড়ে না, টাকা বাড়ে পরের ঘাড়ে।—এ নীতিকথাটি বাঁড়ুজ্জে বেশ জানিত এবং মনেপ্রাণে মানিতও। ফলে দাদন বাড়িতে বাড়িতে ছড়াইয়া পড়িল দেশময়; এবং কয়েক বৎসরেই চারিপাশে দশ ক্রোশের মধ্যে প্রায় অধিকাংশ ভূসম্পত্তি বাঁড়ুজ্জের কাছে ছিপে গাঁথা মাছের মতো আটকাইয়া গেল। কিন্তু এত বড় মাছ টানিয়া তোলা সহজ ব্যাপার নয়। দেশ জুড়িয়া দাদন আদায় সুকঠিন হইয়া উঠিল। খাতককে তাগাদা দিলে বলে, কাল যাইব। কিন্তু নিত্য কালের বিনাশ নাই, খাতক আসে না। স্বয়ং দেখা করিতে গেলে, লোকের কুটুম্বিতা ও কাজের হিড়িক পড়িয়া যায়। আত্মীয়বৎসল, কর্মতৎপর খাতকগুলির নাগাল পাইতে বাঁড়ুজ্জের ব্যাধি ধরিবার উপক্রম হইল।

এদিকে কে কোথা হইতে এক বেনামী দরখাস্ত ঝাড়িয়া দিল—ইনকামট্যাক্স আপিসে। বাঁড়ুজ্জের খত-খাতা, সিন্দুক, মায় হাঁড়ির খবর পর্যন্ত তাহাতে ছিল। সঙ্গে সঙ্গে বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মতো, খাতাপত্রসহ হাজির হইবার এক সমন বাঁড়ুজ্জের নামে আসিয়া গেল। রাজার সমনে আর সাক্ষাৎ শমনে তফাত বড় বেশি নয়—এ জ্ঞান বাঁড়ুজ্জের ছিল; নির্দিষ্ট দিনে হাজির সে হইল। কিন্তু সেখানে তাহার শাস্তির আর সীমা রহিল না। কোনোক্রমেই হাকিমকে সে বুঝাইতে পারিল না যে, খাতার অঙ্কগুলা টাকা নয়, কালির আখর মাত্র। শেষ পর্যন্ত নাচার হইয়া সে বলিল, ওসব, হুজুর, আদায় করে নেন গিয়ে। আমি কাগজ-কলমের সুদের উপর ট্যাক্স দিতে পারব না। ভ্রূকুটি করিয়া হাকিম কহিলেন, এখানে চালাকি জোচ্চুরি আরম্ভ করেছ নাকি? তোমাকে আমি প্রসিকিউট করব, জান! 'প্রসিকিউট' কথাটার অর্থ বাঁড়ুজ্জের অজ্ঞাত ছিল না। সে বিবর্ণ মুখে ফ্যালফ্যাল করিয়া হাকিমের দিকে চাহিয়া রহিল। বিনা আপত্তিতে ট্যাক্স ধার্য হইয়া গেল, বাৎসরিক বারোশো টাকা।

বাঁড়ুজ্জে কোনো কথা কহিল না, মনে মনে দাঁত ঘষিতেছিল খাতকগুলার উপর।

হাকিম খুশি হইয়া উঠিতেছিলেন। নথিপত্রে সই করিয়া ফাইলটা বন্ধ করিতে করিতে কহিলেন, আপনি বন্দুক নিয়েছেন? বন্দুক—নেন নি? আচ্ছা, দরখাস্ত করবেন গিয়েই, বন্দুক হয়ে যাবে আপনার।

'না' বলিতে বাঁড়ুজ্জের সাহস হইল না।

মনে মনে মারাত্মক একটা দিব্য গালিয়া বসিল, শালা, আর যদি মহাজনি করি তবে—

বেচারার চোখ ফাটিয়া জল আসিয়া পড়িল।

কয়দিন পরেই বাঁড়ুজ্জে প্রকাণ্ড একটা কাগজের দপ্তরসহ আসিয়া হাজির হইল হরিহরপুরে। হরিহরপুরেই এ অঞ্চলের সব-রেজেস্ট্রী আপিস। বাঁড়ুজ্জের প্রতিজ্ঞা এবার যে-কোনও উপায়ে হউক তাহার দাদন সে গুটাইবে। হয় টাকা নয় জমি,—এই হইল তাহার মূল মন্ত্র। এই মন্ত্র লইয়া সে হরিহরপুরে পাকা রকমের আড্ডা গাড়িতে সঙ্কল্প করিল।

হরিহরপুরে বাঁড়ুজ্জের দূরসম্পর্কীয়া এক দিদির বাড়ি। বাড়িতে মাত্র দিদি ও তাহার বিধবা কন্যা বিভা ছাড়া কেহ নাই। বাড়ির বাহির হইতেই সে ডাকিতে শুরু করিয়াছিল, দিদি, দিদি, দিদি কই গো?

সঙ্গের লোকটি কাগজের প্রকাণ্ড বোঝাটা বহিয়া গলদঘর্ম হইয়া উঠিয়াছিল। সে ধপ করিয়া বোঝাটা দাওয়ার উপর ফেলিয়া দিল।

বাঁড়ুজ্জে অগ্নিমূর্তি হইয়া উঠিল, কহিল, বেতমিজ, বেয়াড়া হারামজাদ, কাগজের দাম বোঝ না, বেটা চাষা! দলিলপত্র সব ফেটে যাবে যে! লোকটা পুরাতন ভৃত্য। কোনো উত্তর না দিয়া ঘাড়ে হাত বুলাইয়া সে তখন ঘাড়ের ব্যথা সারাইতেছিল।

বাঁড়ুজ্জে এদিকে-ওদিক দেখিয়া বিরক্তভরেই কহিল, এরা সব গেল কোথা রে বাপু? মরেছে নাকি সব? দিদি, বলি—ও দিদি! নে রে বেটা নে, তামাক সাজ দেখি একবার! হুঁকোটা বের করে জল ভর!

সম্মুখের মাটির দোতলায় সিঁড়ির দরজা খুলিয়া একটি শ্রীমতী বিধবা মেয়ে বাহির হইয়া আসিল। বাঁড়ুজ্জের পায়ের ধুলা লইয়া সে কহিল, মামা, কখন এলে?

এই মেয়েটিই বিভা, বাঁড়ুজ্জের দিদির মেয়ে।

বাঁড়ুজ্জে স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বলিয়া উঠিল, হ্যাঁ মামাই বটে। তা রাজকন্যে ছিলেন কোথা এতক্ষণে? ডেকে ডেকে যে গলা ফেটে গেল আমার? দিদি কই?

ম্লানকণ্ঠে বিভা বলিল, মায়ের বড় অসুখ মামা।

চোখ দুইটি তাহার ছলছল করিয়া উঠিল।

বাঁড়ুজ্জে চমকাইয়া উঠিল; মনের কথা চাপিয়া রাখিতে পর্যন্ত সে পারিল না, বলিয়া ফেলিল, এই নাও! আচ্ছা বিপদ বটে তো! আমি এলাম কোথা, তা না, যাঃ কচু খেলে, অসুখের হাঙ্গামায় এসে পড়লাম।

বিভাই একটু লজ্জিত হইয়া পড়িল। কুণ্ঠিত মৃদুস্বরে সে বলিল, তা হোক না মামা, আমি তো রয়েছি, কোনো কষ্ট হবে না তোমার।

বাঁড়ুজ্জে ধমক দিয়া উঠিল চাকরটাকে, হঁ্যা রে বেটা শুয়ার, হারামজাদা, ওরে উনোনে যে এখনও ধোঁয়া উঠছে। আর তুমি বেটা উল্লুক, বসেছ টিকে পোড়াতে। বেরো বেটা বেরো, এখুনই বেরো তুই বাড়ি থেকে। ঋণের দায়ে সব ঘুচিয়ে এখনও নবাবি গেল না তোমার।

চাকরটা বাঁড়ুজ্জেকে গ্রাহ্যও করিল না, সে টিকে পোড়াইয়া আগুন করিয়া হুঁকা-কলিকাটা আগাইয়া ধরিল। এতক্ষণে মৃদুস্বরে কহিল, ও আগুনে জুত হবে না।

হুঁকা টানিতে টানিতে বাঁড়ুজ্জে উঠিয়া কহিল, ওরে, বাইরের ঘরটায় কাগজগুলো রাখ। ঘরটা পরিষ্কার করে আমাদের তালাটা লাগিয়ে দে।

বিভা বলিল, পরিষ্কার করাই আছে মামা। তোমাদের চৌকিদার এসে খবর দিয়ে গিয়েছিল যে! সব ঠিক করে রেখেছি আমি।

মামা বলিলেন, তা অসুখের খবরটা দিলেই পারতে বাপু। আমার এখন কাজ কত! টাকা-কড়ি আদায় করতে আমার দু-তিন মাস লেগে যাবে। তা না, কোথা অসুখ-বিসুখ! হুঁঃ, সময়ও পায় না সব অসুখ করতে! চল রে বাপু চল, দেখে আসি, কি হয়েছে! হঁ্যা, আগে ওই বেটা চাষাকে দে তো এক থালা মুড়ি, গিলুক বেটা চাষা। তুই দে, আমি বরঞ্চ দেখে আসি।

হুঁকা হাতে বাঁড়ুজ্জে উপরে উঠিয়া গেল। সিঁড়ির প্রান্ত হইতেই সে ডাকিতে শুরু করিল, দিদি, দিদি, ও দিদি! আচ্ছা কাণ্ড তোমার বাপু!

মেয়েটি মৃদু হাসিয়া একখানা থালা বাহির করিল। সেখানা আঁচল দিয়া মুছিতে মুছিতে কহিল, হাত-পা ধুয়েছ, যোগী?

যোগী মনিবের গমনপথের দিকে চাহিয়া বলিতেছিল, মা তোমার জন্মের সময় মধু মুখে দেয় নাই, দিয়েছিল বিষ!

বিভা আবার ডাকিল, যোগী!

যোগী ধীরে ধীরে উঠিয়া কহিল, এই যে হাত-মুখ ধুয়ে আসি দিদিমণি।

ভাঁড়ার-ঘরের শিকল খুলিতে খুলিতে বিভা কহিল, একবার জেলেপাড়াটা ঘুরে আসবে তো যোগী! পোয়া-টাক মাছ কিনে আনবে তো!

ঠোঁটের ডগায় আওয়াজ করিয়া যোগী কহিল, হুঁঃ, তোমারও যেমন দিদিমণি!

সকালবেলা হইতেই বাঁড়ুজ্জে আসর জমাইয়া বসে। রাধু কামার, গোলাম মোড়ল, জগা নাপিত, রহিম সেখ, সুরেশ মিশ্র, হরাই মজুমদার প্রভৃতি ভিড় করিয়া বসিয়া থাকে। বাঁড়ুজ্জে আরম্ভ করে, আমি আর রাখতে পারব না রাধু। তোমাকে

আমি বার বার করে আজ দু বছর ধরে বলে আসছি, তুমি কর্ণপাতই করছ না। কেন বল দেখি? তুমি আমাকে মনে করেছ কি? দাতাকর্ণ, না গৌরী সেন? কিন্তু যদি আমাকে নালিশ করতে হয় তবে সূচ্যগ্র মেদিনী তোমার রাখব না আমি। তোমাকে ভাঁড় হাতে করে ভিক্ষা করাব আমি—সে বলে রাখছি। যত বেটা বদমাশ বাটপাড়ের পাল্লায় পড়ে মাটি হলাম আমি। সেবার বললে তুমি, এই মাসের মধ্যে টাকা দেবে। তোমার কথায় বিশ্বাস করে—

অকস্মাৎ বাঁড়ুজ্জের গলা উগ্র হইয়া উঠে। সে বলিয়া যায়, এ সংসারে যার বাতের ঠিক নেই, তার জাতের ঠিক নেই, তা জান? যোগে, ওরে বেটা হারামজাদা শুয়ার, তামাক দে রে বাপু। এতগুলো ভদ্রলোক বসে আছে, বেটা, ডেবা-ডেবা চোখে দেখতে পাও না?

মজলিশ গমগম করিতে থাকে। যোগী হুঁকা-কলিকাটা আগাইয়া দেয়। সে তামাকই সাজিতেছিল।

বাঁড়ুজ্জে কহিল, কলার পোটো আন দেখি গোটা তিনেক! ভদ্রলোক কি হাতে তামাক খাবে রে বেটা চাষা?

হুঁকাটা সুরেশ মিশ্রের হাতে দিয়া আপ্যায়িত করিয়া সে কহিল, খান গো মিচ্ছি মশায়, তামাক খান!

তারপর আবার ধরিল রাধুকে, তুমি একটা মানী লোক—ভদ্রলোক। তোমার অপমান আমি করতে পারব না। নালিশ করে যে কাঠগড়ায় দাঁড় করাব তোমাকে, সে আমা হতে হবে না। কিন্তু আমারও তো একটা ব্যবস্থা করতে হবে, না কি মিচ্ছি মশায়?

সুরেশ তামাক টানিতে টানিতে কহিল, তা তো বটেই। আপনার খেয়াও তো ঘর ঢোকাতে হবে। ন্যায্য টাকা। মিষ্টি কুলের আঁটিসুদ্ধ গিললে চলবে না।

রাধু কামারকে চিন্তার অবসর দিয়া বাঁড়ুজ্জে ধরিয়া বসিল গোলাম মোড়লকে। যেন তাহার সহিত অকস্মাৎ দেখা, এমনিই ভঙ্গি করিয়া কহিল, ওই, গোলাম মোড়ল যে হে! অ্যাঁ, এ কি ভাগ্যি আমার! আজ সুয্যি কোন দিকে উঠেছে বল দেখি? তারপর কী মনে করে আসা হল মোড়ল মশাই?

গোলাম নতচক্ষে অকারণে একটা কাগজ লইয়া ভাঁজিতেছিল, সে চুপ করিয়া রহিল। বাঁড়ুজ্জে ঘাড় উঁচু করিয়া চশমাসুদ্ধ দৃষ্টিটা তাহার উপর নিবদ্ধ করিয়া কহিল, কথা কও না যে হে? বলি, কথা কও না যে? কথার উত্তর দিতে হবে না কি? না, তোমার রূপ দেখলেই আমার পেট ভরবে?

গোলাম মৃদু হাসিয়া কহিল, এসে কি করব বলুন? টাকাকড়ি যোগাড় না হলে আমাকে দেখে তো আপনার পেট ভরবে না। আর আমাকে এত তাড়াতুড়িই বা কেন মশাই? আমাকে দেখে তো আপনি টাকা দেন নি, দিয়েছিলেন আমার জমি দেখে। সে জমি তো আপনার খতে বন্ধক দেওয়াই আছে।

বাঁড়ুজ্জে অবাক হইয়া গেল। এমন উত্তর সে প্রত্যাশা করে নাই। বিস্ময়ের ঘোরটুকু কাটাইতেই সে অকস্মাৎ লাফাইয়া উঠিল, কহিল, বলি, খতে থাকলেই আমি বর্তে গেলাম আর কি! জমি তুমি আমাকে কবলা করে দাও হে বাপু। তুমি যে দিব্যি জমি ভোগ করে যাচ্ছ, তার কি?

গোলাম কহিল, তা আজ্ঞে যদ্দিন খেয়ে নিতে পারি সেই আমার লাভ। আপনি জমি দখলে নেবার ব্যবস্থা করুন, তাতে আইনে আমি যদ্দিন সময় পাই।

বাঁড়ুজ্জে গর্জিয়া উঠিল, বডি ওয়ারেণ্ট করব তোমায় আমি।

ততক্ষণে গোলাম রাস্তায় নামিয়া পড়িয়াছে।

ইহার পরই একটা প্রলয় ঘটিবার কথা। কিন্তু তাহার পূর্বেই ওপাশের দরজার পাশ হইতে ডাক আসিল, মামা!

সমস্ত রাগটা তৎক্ষণাৎ বিভার উপর গিয়া পড়িল, দাঁত-মুখ খিঁচাইয়া বীভৎস ভঙ্গিতে বাঁড়ুজ্জে কহিল, কি? বলছ কি? মামা! মামা! শুভকর্মেও পেছু থেকে—মামা! মন্দেও তাই! ভালা বিপদে পড়েছি আমি!

এতগুলা লোকের সমক্ষে এমন ধারা বীভৎস অপমানে বিভার মাথাটা হেঁট হইয়া গেল। অবরুদ্ধ কান্নায় তাহার ঠোঁট দুইটি থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল। উত্তর দিতে সে পারিল না।

উপস্থিত লোকগুলিও বোধ করি এখানে উপস্থিতির জন্য মৌনভাবেই অপরাধ বোধ করিতেছিল। তাহারা যে যাহার চোখের নীচের মাটিটুকুর উপরেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বসিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বাঁড়ুজ্জে আবার খিঁচাইয়া উঠিল, বলি, বলছ কি শুনি?

বিভা কোনোরূপে বলিয়া ফেলিল, মা কেমন করছেন।

কেমন করছে? বলি, কী করছে, অ্যাঁ?

অসুখ বেড়েছে মনে হচ্ছে। কথা কইতে পারছেন না।

বিভার চোখ দিয়া জল গড়াইতেছিল। বাঁড়ুজ্জে বিবর্ণ মুখে বলিয়া উঠিল, সে কি রে বাপু? কথা কইতে পারছে না কি রে বাপু? তোর সব তাতেই বাড়াবাড়ি। ঘুমিয়েছে হয়তো। ডেকে দেখেছিস?

ডেকে দেখেছি। উত্তর দিতে পারলেন না। ইশারা করে দেখালেন বড় কষ্ট হচ্ছে।

অ্যাঁ, সে কি রে বাপু? এ আমি কি করি বল দেখি? যোগে, ও যোগে, যা তো ডাক্তারের কাছে একবার। ওগো, তোমরা এস বাপু এখন। আমার বিপদ তো দেখছ! যোগে, গেলি রে, ও যোগে!

বিভার মায়ের অসুখ সত্যসত্যই কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল। ডাক্তার দেখিয়া চিন্তিত হইয়া পড়িলেন, কহিলেন, তাই তো, এ যে দেখছি নিউমোনিয়া ডবল সাইড নিয়ে বসে আছে।

বাঁড়ুজ্জে ডাক্তারের পাশে দাঁড়াইয়া মনের চাঞ্চল্যে ক্রমাগত দুলিতেছিল!

সে মৃদুস্বরে বারবার প্রশ্ন করিতেছিল, হ্যাঁ ডাক্তার, বলি, বাঁচবে তো? ডাক্তার, বলি বাঁচবে, না কি, বল না হে?

ডাক্তার কহিল, বলা তো যায় না। অবস্থা বড় খারাপ হয়ে পড়েছে। এখন তাড়াতাড়ি ওষুধ আনতে লোক পাঠিয়ে দিন। বুকে দেবার জন্যে এক কৌটো অ্যান্টিফ্লজেস্টিন।

বাধা দিয়া বাঁড়ুজ্জে বলিল, কেন, আমাদের মসনের পুলটিস?

ডাক্তার প্রতিবাদ করিয়া বলিল, মসনের পুলটিসও ভালো জিনিস; কিন্তু এ অবস্থায় অ্যান্টিফ্লজেস্টিন দেওয়াই ভালো।

ঘরের ভিতর হইতে ডাক আসিল, মামা!

দরজার গোড়ায় গিয়া বাঁড়ুজ্জে কহিল, কী?

দুইটি টাকা হাতে দিয়া বিভা বলিল, ডাক্তারের ফী।

বাঁড়ুজ্জে বাহিরে আসিয়া ডাক্তারকে বলিল, এস ডাক্তার, এস। তা হলে ওষুধটা ভাই, তাড়াতাড়ি দিও যেন!

বাড়ির বাহিরে আসিয়া ডাক্তারের হাতে একটি টাকা গুঁজিয়া দিয়া বলিল, কিছু বলতে পাবে না ভাই, বড় গরিব, আমাকে নিজে থেকে, হেঁ-হেঁ, বুঝতেই তো পারছ?

ডাক্তার আপত্তি করিল না। নমস্কার করিয়া বলিল, ওষুধের জন্যে লোক পাঠিয়ে দিন। আর যদি দরকার হয়, তবে আবার ডাকবেন আমায়, বুঝলেন?

বাঁড়ুজ্জে সবিনয়ে কহিল, মঙ্গল হবে ভাই, মঙ্গল হবে তোমার।

বিভা দরজার পাশেই দাঁড়াইয়া ছিল, মামা বাড়ি ঢুকিতেই সে উৎকণ্ঠিতভাবে কহিল, ডাক্তার কি বললে মামা?

বাঁড়ুজ্জের জিভের আগায় আসিয়া পড়িয়াছিল স্বভাবসিদ্ধ একটা কটু কথা— বলবে আবার কি? বলছিল আমার মাথা, শিঙে ফুঁকবে আর কি! কিন্তু বিভার

মুখের দিকে চাহিয়া সে কেমন হইয়া গেল। আশঙ্কায় তাহার মুখখানি ম্লান হইয়া গেছে, বড় বড় চোখ দুইটি আসন্ন অশ্রুভারে ছলছল করিতেছিল।

বাঁড়ুজ্জে চেষ্টা করিল স্বাভাবিকভাবে হুড়মুড় করিয়া একটা জবাব দিতে; কিন্তু তাও সে পারিল না। অবশেষে যাহা সে কহিল তাহা তাহার পক্ষে অতি অস্বাভাবিক। অতি মিষ্ট ভাষায় বলিয়া উঠিল, ভয় কি রে আমি থাকতে? ভালো হয়ে যাবে দিদি। কেন, বুকে কি সর্দি বসে না কারু?

বিভা কিন্তু আকুল হইয়া উঠিল। মামার এই অস্বাভাবিক সান্ত্বনার স্বরে বুক তাহার কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। সে বুঝিল, অতি বড় দুর্ভাগ্য মাথায় করিয়া পৃথিবীর বুকে সে আজ করুণার পাত্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাই এই অযাচিত সান্ত্বনা তাহার ভাগ্যে মিলিল।

রুদ্ধ রোদন সংবরণ করিতে করিতে উপরে ছুটিয়া উঠিয়া গেল। মায়ের মুখের কাছে ঝুঁকিয়া পড়িয়া বারবার সে ডাকিল, মা মা—মাগো—মা!

মা তখন বিড়বিড় করিয়া আপনার কথা কহিতেছিল, সে কথার অর্থও হয় না, বোঝাও যায় না। চোখের জলে বিভার মুখ বুক ভাসিয়া গেল। কতক্ষণ পর বাঁড়ুজ্জে আসিয়া সন্তর্পণে ডাকিল, বিভা!

আঁচলে চোখ মুছিয়া বিভা মামার দিকে চাহিল।

মৃদুস্বরে মামা বলিল, ওষুধ।

একটা শিশি ও অ্যান্টিফ্লজিস্টিনের কৌটাটা নামাইয়া দিল। তারপর আবার কহিল, এক দাগ ওষুধ দে, পেটে পড়ুক। আর এই কৌটোটার ওষুধ কি করে লাগাতে হবে জানিস তুই?

বিভা ঔষধ ঢালিতে ঢালিতে কহিল, জানি, জল গরম করতে হবে। তুমি একটু এখানে বসবে মামা? আমি জলটা—

তাড়াতাড়ি বাঁড়ুজ্জে বলিল, জল গরম যোগে করবে। আমি বলে দিচ্ছি, বেটা হারামজাদা চাষা খাবে আর দিনরাত বসে থাকবে!

বিভা বলিল, তা বেশ। তুমি একবার ধরে দেবে তা হলে বাঁধবার সময়?

সিঁড়ির মুখে পা বাড়াইয়া মামা কহিল, আমি ওই কুসুম-ঠাকরুনকে ডেকে দিচ্ছি, সেই ধরে দেবে, বুঝলি?

তাড়াতাড়ি সে নামিয়া আসিল, হাত-পা তাহার থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল।

যোগীকে ডাকিয়া জল গরম করিতে বলিয়া অকস্মাৎ সে বলিয়া ফেলিল, কি করি বল দেখি যোগী? আমার হাত-পা থরথর করে কাঁপছে। আমি বাপু, মানুষ মরে তাই শুনেছি, চোখে কখনও দেখি নি।

খবর পাইয়া পাড়া-প্রতিবেশীর দল ভিড় করিয়া আসিয়াছিল। জনকতক পুরুষমানুষ বাঁড়ুজ্জেকে লইয়া বাহিরের দাওয়ার উপর ভিড় করিয়া বসিয়া ছিল।

উপরে আর একদল প্রতিবেশিনী নিঃশব্দে রোগিণীকে ঘিরিয়া বসিয়া ছিল। বিবর্ণ কঙ্কালাবশেষ নারীদেহখানি বিছানার উপর অসাড় হইয়া পড়িয়া আছে। অতি-শীর্ণতায় সম্মুখের দাঁতগুলি প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। চোখের দৃষ্টি অস্থির, অর্থহীন।

বিভা শুধু মৃদুরবে কাঁদিতেছিল, আর মাঝে মাঝে কাতর স্বরে সংজ্ঞাহীনা মাকে প্রশ্ন করিতেছিল, মা মা, কোথা চললে মা? মাগো!

বর্ষীয়সী মেয়েদের মধ্যে সরকার-গিন্নী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, আর কোথা চললে মা! মা চলেছে পথে, মা!

কুসুম-ঠাকরুন চোখ মুছিয়া কহিলেন, আহা-হা, কি যে তোর হল মা!

সরকার-গিন্নী বলিলেন, উপায় কি মা! এ এড়াবার তো পথ নেই। থাকলে কি মানুষ ছাড়ত!

নিদারুণ আক্ষেপ সহকারে শ্যামা পিসী কহিলেন, এ-ই—তা হলে কি মানুষ ছাড়ত? ছাড়ত না। মানুষের বেঁচে আশ মেটে না। এই আমাকে দেখ, স্বামী গেছে, পুত্তুর গেছে, কে আছে মা সংসারে আমার? তবু তো মরতে পারি না। রোগ হলে ওষুধ খাই। সাপ দেখে ভয় হয়।

বিভা মায়ের মুখে বড় সমাদরে হাত বুলাইতেছিল।

সহসা রোগিণীর গলার ডাকটা অন্যরূপ ধারণ করিল। নাভির প্রান্ত হইতে গোটা বুকটা স্পন্দিত হইতে আরম্ভ হইল। বেনেদের গিন্নী এক কোণে বসিয়া ছিল, সে পার্শ্ববর্তিনীর গা টিপিয়া কহিল, মহাশ্বাস আরম্ভ হল।

পার্শ্ববর্তিনী মনোযোগসহকারে দেখিতেছিল, সে কহিল, না।

না? দেখ ভালো করে তুমি।

সরকার-গিন্নী মৃদু গম্ভীর স্বরে বলিলেন, দাও মা বিভা, মায়ের মুখে দুধ গঙ্গাজল দাও। কেঁদো না মা, কেঁদো না। এ সময়ে সন্তানের যা কাজ তাই কর। তারপর কাঁদবে বইকি, গোটা জীবনই যে তোমার কাঁদবার জন্যে রইল।

টপটপ করিয়া কয় ফোঁটা জল সরকার-গিন্নীর গাল বহিয়া ঝরিয়া পড়িল।

বাহিরের ঘরে বাঁড়ুজ্জে চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। উপস্থিত ভদ্রলোকের একজন বলিলেন, একবার দেখে এলে না কেন মহিম?

বাঁড়ুজ্জে চমকিয়া উঠিল, এরূপ আদেশ সে প্রত্যাশা করে নাই। কহিল, আমাকে বলছেন?

হ্যাঁ। তুমি বই আর কে আছে, বল?

সকাতর ব্যগ্রতায় বাঁড়ুজ্জে বলিয়া উঠিল, আপনারা আছেন। কে আছেন বলছেন কেন ?

তা বটে, সে একশো বার, মানুষ ছাড়া মানুষের কে আছে বল ? তবে তোমার সঙ্গে রক্তের সম্বন্ধ।

বাঁড়ুজ্জেকে আর দেখিতে হইল না। বিভার মর্মভেদী আর্তনাদ ধ্বনিত হইয়া উঠিল, মা, কোথায় গেলে গো মা !

বাঁড়ুজ্জে ব্যাকুলভাবে বলিয়া উঠিল, যাঃ, হয়ে গেল !

নিমেষে মৃত্যুর অনিবার্যতা সকলের কাছেই সুপ্রত্যক্ষ হইয়া উঠিল। একজন গভীর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া একান্ত আন্তরিকতার সহিত বলিয়া উঠিল, এই মানুষের জীবন !

একজন বলিল, পদ্মপত্রে জল রে ভাই, এই আছে এই নাই।

মনের চিন্তা এমন ক্ষেত্রে গোপন থাকে না, একজন বলিয়া ফেলিল, কোথায় যে যায় মানুষ !

ওই চিন্তাটাই বোধ হয় সকলকে পাইয়া বসিল, সকলেই নীরব হইয়া গেল।

অকস্মাৎ একজন কহিল, এই ক দিনের জন্যে মানুষ মারামারি, কাটাকাটি, ঝগড়া-ঝাঁটি, আমার ঘর, আমার দোর, আমার ছেলে, কতই না করে !

সুগভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া একজন বলিয়া উঠিল, হরিবোল—হরিবোল !

বৃদ্ধ একজন বলিলেন, ওই সত্যি রে ভাই, হরিনামই সত্য। হরিবোল! হরিবোল !

আবার কিছুক্ষণ সব নীরব। বোধ হয় ওই নামকেই জড়াইয়া ধরিতে সকলে চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু ধরা যায় না।

একজন বলিয়া উঠিল, এদিকের যোগাড় করুন সব। বেলাও আর বেশি নেই।

বাঁড়ুজ্জে জোড় হাত করিয়া বলিল, যা করতে হয় করুন আপনারা। আমি তো বিদেশী, আর ওরা তো আপনাদের চিরকালের আশ্রিত।

যা যা কিনতে কাটতে হবে, সেগুলো সব—তারপর বাঁশ, কাঠ—

বাঁড়ুজ্জে বলিয়া উঠিল, যা লাগবে বলুন। আমি টাকা দিচ্ছি। আমি তো রয়েছি, আমার দিদি।

একশো বার। লোকে আত্মীয় বন্ধু কামনা করে কেন তবে ? টাকাপয়সার প্রয়োজন কি ? সে কি সঙ্গে যায় ?

বাঁড়ুজ্জে আপনার মনে কত চিন্তাই করিতেছিল, অভিভূতের মতো সে বলিয়া উঠিল, এই তো মানুষের জীবন ! অ্যাঁ ? এর জন্য এত ? টাকা বিষয়, ধন দৌলত, আত্মীয় স্বজন, কিছুই না, কিছুই সঙ্গে যায় না ! হায় ! হায় ! হায় !

ওদিকে বিভা বুক ফাটাইয়া কাঁদিতেছিল, মা মা, কোথায় গেলে মাগো!

স্থিরচক্ষু, বিবর্ণ, নিস্পন্দ শবের বুকে সে বার বার আছাড় খাইয়া পড়িতেছিল। উপস্থিত সকলের মুখ ম্লান, চোখ ছলছল করিতেছে। এইটুকু মিথ্যা নয়, ক্ষণিকের জন্যও এ সত্য।

সরকার-গিন্নী সুগভীর আক্ষেপের স্বরে কহিলেন, মা আর উত্তর দেবে না, মা। এ জীবনে মা বলা তোর হয়ে গেল।

শ্যামা পিসী বলিলেন, নাই বললে আর নাই, মা। বিশ্ব-বেহ্মাণ্ড খুঁজে আর মিলবে না। আর মানুষ কেমন পাষাণ দেখ, দু দিন পরে আবার খাবে, মাখবে, হাসবে, যে-কে-সেই।

কুসুম-ঠাকরুন কহিলেন, মায়া, মায়া, মহামায়ার মায়া।

নীচে দাওয়ার উপর বসিয়া মেয়েগুলি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছিল। অনেকের চক্ষে জলও দেখা দিয়াছে। ওপাশে রান্নাঘরের দাওয়ায় যাহারা ছোঁয়াচ বাঁচাইয়া বসিয়া ছিল, তাহাদের মুখেও ম্লান ছায়া।

দূরের কোলাহল যেমন ভাসিয়া আসিতেছিল, তেমনই আসিতেছে। এ ঠিক যেন একখানি ভাসা মেঘের ছায়া। মেঘখানির প্রান্তসীমা বহিয়া সূর্যালোক চারিপাশে ঝক-মক করিতেছে।

জনকয়েক পুরুষ আসিয়া বাড়ি ঢুকিল। ইহারা শববাহক। অপরাধীর মতো তাহারা চলিয়াছিল। এ উহাকে আগাইয়া দেয়, সে পিছাইয়া আসিতে চেষ্টা করে, অপর একজনকে সম্মুখে ঠেলিয়া দেয়।

অল্পক্ষণ পরেই বিভার আর্তনাদ মর্মান্তিক হইয়া উঠিল। উপরের মেয়েরা দ্রুতপদে নামিয়া আসিয়া একপাশে দাঁড়াইল। নীচের মেয়েরা পথ পরিসর করিয়া দিয়া সরিয়া গেল।

উপরে ধ্বনিত হইয়া উঠিল, বল হরি, হরিবোল।

বিভা বুক ফাটাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, ওগো, মাকে আমার নিয়ে যেও না গো! ওগো, মাগো!

কে কহিল, শেকল দিয়ে দাও, দরজায় শেকল দিয়ে দাও।

শিকল দেওয়ার শব্দের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শববাহকেরা শব লইয়া নীচে নামিয়া আসিল। ঘরের মধ্যে বিভা তখন আর্তনাদ করিতেছিল, ওগো, আমাকে আর একবার দেখতে দাও গো! আর তো দেখতে পাব না আমি মাকে।

বাঁড়ুজ্জের বুকটা কেমন করিয়া উঠিল, সে দ্রুতপদে উপরে উঠিয়া গেল। শিকল খুলিয়া বিভাকে সঙ্গে লইয়া নীচে নামিয়া আসিল, কহিল, দেখ, দেখে নে। কী করবি বল, এ তো তোর নতুন নয় মা!

বিভা কাঁদিয়া কহিল, মা, আমাকে কার কাছে রেখে গেলে মাগো ?

নিবিড় স্নেহে তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া বাঁড়ুজ্জে বলিল, ভয় কি মা বিভা ! আমি রইলাম, আমি তোর ছেলে, আমি তোর মা হব।

তাহারও চোখ দিয়া দরদর ধারে জল ঝরিতেছিল।

শব কাঁধে লইয়া বাহকেরা হরিবোল দিয়া উঠিল। সমবেত সকলেই বলিয়া উঠিল, হরিবোল—বল হরি।

একজন বাহক কহিল, বাঁড়ুজ্জে, জিনিসপত্র সব নিয়ে এস।

অপর একজন মনে পড়াইয়া দিল, পাঁজির পাতা এন, মন্তর আছে যে পাতায়।

কাঠ নিয়েছ ? খড় ?

আমাদের কাপড় আর জলখাবার ?

আর একজন কহিল, শোন হে, আর একটা কথা বলে দিই।

বাঁড়ুজ্জে অগ্রসর হইয়া আসিল। বক্তা ফিসফিস করিয়া বলিয়া দিল, আধ ভরি গাঁজা আর একটা বোতল—বুঝেছ ? শ্মশানে না হলে চলে না। কথাটা শেষ করিয়াই হাঁকিয়া উঠিল, বল—হ—রি—

অপর সকলে সমস্বরে হরিধ্বনি করিয়া উঠিল, হ—রি—বোল।

শব চলিয়া গেল।

মেয়ের দল সন্তর্পণে বাহির হইয়া গেলেন। শ্যামা পিসী অকস্মাৎ সরকার-গিন্নীকে ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, মড়ার খড় পড়ে রয়েছে যে !

সরকার-গিন্নী কহিলেন, ছোঁয়া তো পড়েছেই—

শ্যামা পিসী চমকিয়া উঠিল, তুমি ছুঁয়েছ নাকি ? তোমার বাপু সবই বাড়াবাড়ি। আমি ছুঁই নি। এই অবেলায় চান করে অসুখ-বিসুখ হলে কে দেখবে মা আমাকে ? দেখ দেখি হাঙ্গামা !

বেনে-গিন্নী বলিল, মরণের পেহার দেখলে ?

শ্যামা পিসী শিহরিয়া উঠিল, আমরা যে কি করে যাব মা, তাই ভাবি !

বিভার আর্তনাদ শোনা যাইতেছিল। কুসুম-ঠাকরুন মুখ বাঁকাইয়া কহিল, আবার কেন ? ঢের কেঁদেছিস বাপু, আর কাঁদা আদিখ্যেতা।

অল্পবয়সী একজন অকস্মাৎ বলিল, এক কুঁদুলী গেল কিন্তু !

জনকতকের মুখে অল্প মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল।

পরদিন সকালে উঠিয়া বাঁড়ুজ্জে ভট্টাচার্যকে লইয়া শ্রাদ্ধের ফর্দ করিতেছিল। ত্রিরাত্রির শ্রাদ্ধ, সময় আর মাত্র দুইটি দিন। অবসন্ন শরীরে বাঁড়ুজ্জে শুইয়া ছিল। ওদিকে বিভার মৃদু ক্রন্দনধ্বনি শোনা যাইতেছিল।

ভট্টাচার্য বলিলেন, যেমন করবেন, তিলকাঞ্চনে শ্রাদ্ধ করলে অল্পেই হবে।

বাঁড়ুজ্জে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, নাঃ, খরচ কম-বেশিতে কি যায় আসে! বৃষোৎসর্গই হবে। একটা মানুষই গেল জন্মের মতো, আর কটা টাকা!

ভট্টাচার্য বাঁড়ুজ্জেকে জানিত, সে তাহার মুখের দিকে চাহিল, অবশেষে কহিল, দেখুন মেয়েমানুষ, তার মতটা একবার—। আর সে পাবেই বা কোথায়?

মহিম চটিয়া উঠিল, সে খবরে আপনার দরকার কি মশাই? টাকা? টাকার ভাবনা তাকে ভাবতে হবে কেন শুনি? যে মরেছে সে তো শুধু মেয়েটিকে রেখে মরে নি। আমি তার ভাই, আমি দেব, আমি করব সব।

ভট্টাচার্য অবাক হইয়া গেল।

বাঁড়ুজ্জে কহিল, এ কি একটা বালিকা মরেছে যে তিলপাত্র কাজ হবে? টাকা, কত টাকা লাগবে শুনি? টাকা নিয়ে করব কি? এ সময়ে যদি কাজে না লাগে, সে টাকার দাম কি?

ভট্টাচার্য বলিল, তা তো বটেই।

বাঁড়ুজ্জের মনের আবেগ তখনও শেষ হয় নাই, ভট্টাচার্যের কথায় বাধা দিয়া সে বলিয়া গেল, এই তো মানুষের জীবন! এর মধ্যেও যদি ধর্মকর্ম—

বাহির হইতে কে ডাকিল, বাঁড়ুজ্জেমশায়!

বিরক্তিভরে বাঁড়ুজ্জে কহিল, কে?

যোগী বলিল, রাধানগরের মুকুন্দ পাল।

বাঁড়ুজ্জে বলিয়া দিল, বলে দে আমার শরীর ভালো নেই আজ। আঃ, লোকেও যে দুদিন অবসর দেবে না! সেই পঙ্কে টেনে ফেলবেই।

তবুও মুকুন্দ ঘরে আসিয়া বসিল, কহিল, আমার কাজটা—

এক রকম বাধা দিয়া বাঁড়ুজ্জে বলিল, গতকাল আমার দিদি মারা গেলেন বাপু, কথাবার্তা কইবার মতো মনের অবস্থা নয় আমার আজ। আজ এস তুমি।

সবিনয়ে মুকুন্দ কহিল, আজ্ঞে, টাকাটা আমি যোগাড় করে এনেছি, বাড়িতে রাখলে ভেঙে যায়, কিছু হয়—

অগত্যা বাঁড়ুজ্জে উঠিয়া কহিল, টাকা এনেছ? তা হলে দিয়ে যাও!

মুকুন্দ কতকগুলি টাকা শতরঞ্জির উপর নামাইয়া দিল। টাকাগুলি না গুনিয়া বাঁড়ুজ্জে মুকুন্দের মুখের দিকে চাহিয়া কিছুক্ষণ পরে বলিল, আর?

বাঁড়ুজ্জের পা দুইটি জড়াইয়া মুকুন্দ কহিল, পঞ্চাশ টাকা আর আমি দিতে পারব না। এই নিয়ে আমাকে রেহাই দিতে হবে।

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বাঁড়ুজ্জে কহিল, পা ছাড় মুকুন্দ, তাই হল। তোমাকে দলিলখানা ফেরত দিই, নিয়ে যাও।

যোগী ভট্টাচার্যকে একান্তে প্রশ্ন করিল, আচ্ছা ভট্‌চাজ মশাই, মরবার আগে শুনেছি নাকি মানুষের মতিগতি সব পালটিয়ে যায়, এ কি সত্যি ?

ভট্টাচার্য কহিল, কত রকম হয়। কারু নাক বেঁকে যায়, কেউ অরুন্ধতী দেখতে পায় না ; কেউ চোখের নীলতারা দেখতে পায় না ; আরও কত লক্ষণ আছে।

শ্রাদ্ধশান্তি সমারোহের সহিতই হইয়া গেল। বাঁড়ুজ্জের সুযশে গ্রামখানা ভরিয়া গেল, শত্রুতেও সবিস্ময়ে কহিল, ব্যবহার না করলে মানুষ চেনা যায় না। এই তো মহিম বাঁড়ুজ্জের নাম সকালে কেউ করত না, তার কাজ দেখ !

দিন যায়।

ক্রমশ আবার বাঁড়ুজ্জের মজলিশ জমিয়া উঠে।

কিন্তু কে জানে কেন অতি মাত্রায় সে রুক্ষ হইয়া উঠিয়াছে।

সেদিন জগাই মজুমদার দশটি টাকা কম দিয়া কহিল, আর আমি পারব না ভাই, এতেই আমাকে মাপ দিতে হবে। ভিক্ষে চাইছি আমি।—সকাতরে সে বাঁড়ুজ্জের হাতটি জড়াইয়া ধরিল।

অতি রূঢ়ভাবে বাঁড়ুজ্জে হাতখানা টানিয়া লইল। টাকাগুলা ঝনঝন শব্দে ঘরময় ছড়াইয়া পড়িল। বিকৃত ভঙ্গিতে ব্যঙ্গ করিয়া কহিল, এতেই আমাকে মাপ দিতে হবে ? মাইরি আর কি ! কেন, কেন, দশ টাকা কম নেব কেন আমি, শুনি ? আমি কি মাগনা চাইছি, না ভিক্ষে চাইছি হে বাপু ? ও সব হবে না, এক কপর্দক আমি ছাড়ব না।—বলিয়া সে নিজেই আবার টাকাগুলি কুড়াইয়া লইল। অপমানে ক্ষোভে মজুমদারের চোখ ফাটিয়া মুহুর্মুহু জল আসিতেছিল, সর্বংসহা ধরিত্রীর বুকের দিকে চাহিয়া সে আত্মসংবরণের চেষ্টা করিতেছিল।

বাঁড়ুজ্জে খতখানা বাহির করিয়া দিয়া কহিল, উসুল দিয়ে দিন পিঠে। দশ টাকা বাকি থাকছে, টাকা দিয়ে খত নিয়ে যাবেন।

মজলিশ ক্রমে ক্রমে চুকিয়া গেল। কাগজপত্র গুটাইয়া রাখিয়া বাঁড়ুজ্জে শতরঞ্জির উপর শুইয়া পড়ল। অকস্মাৎ আবার উঠিল, একখানা কাগজ টানিয়া লইয়া আবার দেখিতে বসিল। যোগীকে ডাকিয়া বলিল, তামাক দে তো যোগে !

ফর্দখানা বিভার মায়ের শ্রাদ্ধের।

সমস্ত অঙ্ক যোগ করিয়া পরিশেষে সর্বমোট খরচের দিকে চাহিয়া ছিল। সে অঙ্কটার পরিমাণ হইতেছে—পাঁচ শত পঞ্চাশ টাকা কয়েক আনা।

যোগী হুঁকা-কলিকা আগাইয়া দিল। হুঁকাটা লইয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বাঁড়ুজ্জে কহিল, ঘাড়ে ভূত চেপেছিল আমার, অনর্থক এই পাঁচ-পাঁচশো টাকা—

যোগী চুপ করিয়া রহিল।

বাঁড়ুজ্জে আবার কহিল, এদের খেয়েছি আর কত? জোর না হয় দশ-পনেরো টাকা! তুই তো আমাকে কিছু বললি না যোগী? কি যে তখন হল আমার!

হুঁকায় কয়েকটা টান দিয়া আবার কহিল, তুই একবার বলিস কেন যোগী, বিভাকে। ওদের গয়না-টয়নাও তো আছে। সব আমাকে লাগানো কি—। হ্যাঁ। একবার রাধানগরের মুকুন্দকে ডাকবি তো! বেটার কাছে পঞ্চাশ টাকা পেতে হবে এখনও।

ভিতরের পাশের দরজার কাছে কিসের শব্দ শুনিয়া বাঁড়ুজ্জে চুপ করিয়া গেল।

বিভা ডাকিল, মামা, খাবে এস।

রাত্রে বাঁড়ুজ্জের আসনের সম্মুখে ভাতের থালা নামাইয়া দিয়া বিভা কহিল, মামা!

বিরক্তিপূর্ণ স্বরে বাড়ুজ্জে কহিল, কি?

কোনোমতেই সে এই হতভাগা মেয়েটাকে ক্ষমা করিতে পারিতেছিল না।

বিভা কহিল, মা তাঁর শ্রাদ্ধের জন্যে কখানা গয়না রেখেছিলেন। সে কখানা তো তাঁরই শ্রাদ্ধে দিতে হয়। এ কখানা বেচে যা হয়—

ছোট একটি পুঁটুলি কাপড়ের আঁচল হইতে বাহির করিয়া সে সম্মুখে নামাইয়া দিল। বাঁড়ুজ্জে তাড়াতাড়ি বাঁ হাতে তুলিয়া সেটার ওজন অনুমান করিয়া খুশি না হইয়া পারিল না।

ও বারান্দায় বিভা যোগীকে ভাত দিতেছিল।

যোগী মৃদুস্বরে ভর্ৎসনা করিয়া কহিল, কি ছেলেমানুষি করলে দিদিমণি?

বিভা কোনো উত্তর দিল না, শুধু একটা সকরুণ হাসি তাহার অধরে ফুটিয়া উঠিল।

যোগী কহিল, শোক চিরদিন থাকে না দিদিমণি।

নুটু মোক্তারের সওয়াল

ইন্দ্রপ্রস্থে রাজসূয় যজ্ঞের সমারোহের মধ্যে কুরুক্ষেত্রের সূচনা হইয়াছিল, ত্রেতায় লঙ্কাকাণ্ডের সূচনাও রামচন্দ্রের যৌবরাজ্যে অভিষেকের সমারোহের মধ্যে। পুষ্পদলের মর্মস্থলনিবাসী কীটের মতো এক-একটা সমারোহের আনন্দকোলাহলের অন্তরালে লুকাইয়া থাকে অশান্তির সূচনা। কঙ্কণা গ্রামেও একটি অনুরূপ ঘটনা ঘটিয়া গেল। কঙ্কণা গ্রামের ধনী অধিবাসীদের দানে দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হইল, তাহারই উদ্বোধন-অনুষ্ঠানের সমারোহ উপলক্ষে নুটু মোক্তারের সহিত কঙ্কণার বাবুদের বিবাদ ঘটিয়া উঠিল।

বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম কঙ্কণার ধনের প্রসিদ্ধি এ দেশে বহুবিস্তৃত এবং বহুপ্রসিদ্ধ। দূর হইতে কঙ্কণার দিকে তাকাইলে কঙ্কণাকে পল্লীগ্রাম বলিয়া মনে হয় না, কোনো বিশিষ্ট শহরের অভিজাত পল্লী বলিয়া মনে হয়। বহুকাল হইতে প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে যে কঙ্কণায় মা-লক্ষ্মী বাঁধা আছেন। কোন অতীতকালে মা-লক্ষ্মী ঐ পথ দিয়া যাইতেছিলেন; সহসা তাঁহার হাতের কঙ্কণ খসিয়া পথের ধূলার মধ্যে পড়িয়া যায়, সেই কঙ্কণের মমতায় আজও তিনি কঙ্কণা গ্রামের মধ্যে ঘুরিতেছেন। কঙ্কণ হইতেই গ্রামের নাম কঙ্কণা।

প্রবাদ চিরকাল প্রবাদই, কিন্তু প্রবাদ রটিবার একটা হেতু সর্বত্রই থাকে, এ ক্ষেত্রেও হেতু একটা আছে। কঙ্কণা গ্রামের মুখুজ্জেরা বাংলা দেশের মধ্যে খ্যাতিমান ধনী। বাংলার বহু স্থানেই তাঁহাদের টাকা ছড়ানো আছে। বহু জমিদার-পরিবারই মুখুজ্জেদের ঋণদায়ে আবদ্ধ। তাহার উপর মুখুজ্জেরা নিজেরাও জমিদার।

মুখুজ্জে-পরিবার এখন জনে বহুবিস্তৃত, কিন্তু তাহাতেও তাহাদের ধনের পরিমাণ কমে নাই। সন্ততিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সুদও সমানে বাড়িয়া চলিয়াছে। লোকে অবশ্য বলে, মুখুজ্জেদের সিন্দুকে টাকার বাচ্চা হয়, কিন্তু সেটাও প্রবাদ। কঙ্কণার বাবুদের সুদের কারবার লক্ষ লক্ষ টাকার।

কিন্তু আশ্চর্যের কথা, এমন একখানি ধনীর গ্রাম, তবুও গ্রামের মধ্যে না আছে স্কুল, না আছে ডাক্তারখানা, এমন কি হাট-বাজার পর্যন্ত নাই। থাকিবার মধ্যে আছে খান দুই মিষ্টির দোকান, কিন্তু মুড়ি-মুড়কি মণ্ডা-বাতাসা ছাড়া আর কোনো কিছু দোকানে পাওয়া যায় না। অন্য কোনো মিষ্টান্ন রাখিতে বাবুদের নিষেধ আছে, দোকানীরাও রাখে না।

বাবুরা বলেন, মিষ্টি থাকলেই ছেলেরা খাবে, আর মিষ্টি খেলেই ছেলেদের পেটে কৃমি হবে।

দোকানী বলে, আজ্ঞে, সবই ধার, রেখে কী করব বলুন? খাজনায় আর কত কত কাটানো যাবে। তা ছাড়া আমার দোকানে বাকি বাড়লে বাবুদের খাতায় খাজনার সুদ বাড়বে।

হাটের কথায় কঙ্কণার বাবুরা বলেন, হাট তো হল লক্ষ্মী নিয়ে বেসাতি! মা-লক্ষ্মী চঞ্চলা হবেন যে! স্কুলের কথায় তাঁহারা শিহরিয়া উঠেন, বলেন, সর্বনাশ! মায়ের সতীন ঘরে আনব? ছেলেরা বাইরে লেখাপড়া শিখে আসুক, কিন্তু কঙ্কণায় সরস্বতীর আসন বসানো হবে না।

ডাক্তারখানার বিরুদ্ধেও এমনই ধারা যুক্তিতর্ক নিশ্চয় প্রচলিত ছিল, কিন্তু সে যুক্তি-তর্ক জেলার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের নিকট টিকিল না। সাহেবের আদেশে বাবুদের চাঁদায় কঙ্কণায় এক দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হইল।

সেই দাতব্য চিকিৎসালয় উদ্বোধনের দিন। সে এক মহাসমারোহের অনুষ্ঠান। ডাক্তারখানার নূতন বাড়িখানির সম্মুখেই চাঁদোয়া খাটাইয়া দেবদারুপাতা ও রঙিন কাগজের মালায় মণ্ডপ সাজানো হইয়াছে। থানার জমাদারবাবু হইতে জেলার জজ-ম্যাজিস্ট্রেট পর্যন্ত সকলেই আসিয়াছেন। সদরের ও মহকুমার উকিল-মোক্তারও অনেকে উপস্থিত আছেন। ভালকুটি গ্রামের মুচিদের ব্যাণ্ড-বাজনা পর্যন্ত ভাড়া করা হইয়াছে। আবাহন, বরণ, পুষ্পবর্ষণ, মাল্যদান, স্তবগান শেষ হইতে হইতেই করতালি-ধ্বনিতে আসর বেশ জমিয়া উঠিল। সভামণ্ডপের একটা দিক অধিকার করিয়া সারি সারি চেয়ারে চোগা চাপকান পাগড়ি আংটি চেন ঘড়িতে সুশোভিত হইয়া মুখুজ্জে-কর্তারা বসিয়া আছেন। কয়জন তরুণবয়স্কের পরিধানে হ্যাট কোট টাই, চোখে চশমা। কর্তারা প্রত্যেক অনুষ্ঠানের শেষে ঘাড় নাড়িয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছিলেন।

অতঃপর আসিল বক্তৃতা-পর্ব। এইবার আসরটা যেন ঝিমাইয়া পড়িল। দেখা গেল, সকলেই হাততালি দিবার লোক—বক্তৃতা দিবার লোক কেহ নাই। অবশেষে জেলার ফৌজদারী আদালতের একজন উকিল উঠিয়া এই কমলাশ্রিত বংশটিকে কল্প-তরুর সহিত তুলনা করিয়া বেশ খানিকটা বলিয়া আসরের মানরক্ষা করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে করতালিধ্বনিতে আসর যেন ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম হইল।

তারপর সভা আবার নিস্তব্ধ। সভাপতি জেলার জজসাহেব চারিদিকে চাহিয়া বলিলেন, বলুন, কেউ যদি কিছু বলবেন!

কেহ সাড়া দিল না॥

আবার সভাপতি বলিলেন, বলুন, বলুন, যদি কেউ বলতে চান!

রামপুর মহকুমার বৃদ্ধ মুন্সেফবাবু এবার হুটুবাবুকে অনুরোধ করিলেন, হুটুবাবু, আপনি কিছু বলুন!

হুটুবাবু—হুটবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, রামপুর মহকুমার মোক্তার। সমবয়সী না হইলেও হুটুবাবুর সহিত মুন্সেফবাবুর ঘনিষ্ঠ হৃদ্যতা। হুটুবাবু হাতজোড় করিয়া বলিলেন, মাফ করবেন আমাকে।

সভাপতি কিন্তু মাফ করিলেন না, তিনি অনুরোধ করিয়া বলিলেন, না না, বলুন না কিছু আপনি!

হুটুবাবু এবার মোটা ঢুস্‌তী চাদরখানা খুলিয়া চেয়ারের হাতলের উপর রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তারপর আরম্ভ করিলেন, সভাপতি মহাশয়, এবং মহাশয়গণ, আপনারা সকলেই বোধ হয় জানেন যে, শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তার মুখে প্রথমে দেয় মধু। লোকে বলে, আমার মা নাকি আমার মুখে নিমফুলের মধু দিয়েছিলেন। আমার কথাগুলো বড় তেতো। সেইজন্যেই আমি কোনো কিছু বলতে নারাজ ছিলাম। তবে ভরসা আছে, ব্যঞ্জনের মধ্যে উচ্ছেরও একটা স্থান আছে এবং দেহে রসাধিক্য হলে তিক্তভক্ষণই বিধেয়, সেইজন্যেই বসন্তে নিম্বভক্ষণের ব্যবস্থা। কঙ্কণা গ্রামে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হল আমাদের ধনী মুখুজ্জে বাবুদের দানে, খুব সুখের কথা, আনন্দের কথা—ভালো অবশ্য বলতেই হবে। কিন্তু আমার বার বার মনে হচ্ছে, এ হল গোরু মেরে জুতো দান, আর জুতো-জোড়াটা ঐ মরা গোরুর চামড়াতেই তৈরি। এ অঞ্চলের সেচের পুকুরের সেচ বন্ধ করেছেন এই বাবুরা, ফলে অজন্মাহেতু অনাহারে চাষী আজ দুর্বল রোগের সহজ শিকার হয়েছে। সুদের সুদ তস্য সুদ তাদের কাছ থেকে আদায় করে তাদের পথে বসিয়ে—

সমস্ত সভাটা চঞ্চল হইয়া উঠিল। সভায় উপস্থিত মুখুজ্জে-বাবুরা বসিয়া বসিয়া ঘামিতে আরম্ভ করিলেন, তাঁহাদের হাসি তখন কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে, পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহারা পাষাণ-মূর্তির মতো নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁহাদের দিকে চাহিয়া সভাস্থ ভদ্রমণ্ডলীও কেমন অস্বস্তি অনুভব করিতেছিলেন।

হুটুবাবু তখন অনেকটা অগ্রসর হইয়াছেন, তিনি বলিতেছিলেন, আমার পূর্বের বক্তা মহাশয় এঁদের কল্পতরুর সঙ্গে তুলনা করলেন। আমার মনে হয়, তিনি এঁদের সঙ্গে কিঞ্চিৎ রসিকতা করেছেন, কারণ বাস্তব সংসারে কল্পতরু অলীক বস্তু—আকাশ-কুসুমের পুষ্পাঞ্জলির মতোই হাস্যকর। আমার মনে হয়, এঁদের তুলনা হয় একমাত্র খেজুরগাছের সঙ্গে। মেসোপটেমিয়ার খেজুরগাছ নয়, আমাদের খাঁটি দেশী আঁটিসার খেজুরগাছের সঙ্গে। তলায় বসে ছায়া কেউ কখনও পায় না, ফল—তাও আঁটিসার, আর আলিঙ্গন করলে তো কথাই নেই, একেবারে শরশয্যা। এঁদের সুদের হার

চক্রবৃদ্ধিহারে, এঁদের প্রজার জন্যে বরাদ্দ দোকানে বরাত—আধ পয়সার মুড়ি, আধ পয়সার বাতাসা, আর কেউ যদি কাকুতি-মিনতি করে সুদ মাফের জন্যে জড়িয়ে ধরে, তবে কথার কাঁটায় তার শরশয্যাই হয়। তবে ভরসার মধ্যে আমাদের হেঁসো—খেজুর গাছের গলা কাটবার জন্যে খাঁটি ইস্পাতে তৈরি অস্ত্র—এই এঁরা।

ন্টুবাবু এবার সরকারী কর্মচারীবৃন্দের দিকে হস্ত প্রসারিত করিয়া বুঝাইয়া দিলেন, এটা বলা হইতেছে তাঁহাদিগকে।

খেজুরগাছের কাছে রস আদায় করতে হলে হেঁসো না হলে হয় না। হেঁসো চালালে গলগল করে মিষ্ট রসে খেজুরগাছ কলসী পূর্ণ করে দেয়। আজ তেমনই এক কলসী রস আমাদের বিলাতী পান-দেওয়া কাঞ্চননগরী হেঁসো এই ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বাহাদুরের কল্যাণে এ চাকলার লোকে পেয়েছে, তাতে তাদের বুকফাটা তৃষ্ণার খানিকটা নিবারণ হবে। এজন্যে হেঁসো এবং খেজুরগাছ দু তরফকেই ধন্যবাদ দিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

ন্টুবাবু বসিলেন। কিন্তু করতালিধ্বনি বিশেষ উঠিল না, মাত্র কয়টা অবোধ ছেলে সোৎসাহে হাততালি দিয়া উঠিল। এতক্ষণে সভাস্থ সকলে হাতের উপর বারকয়েক হাত নাড়িলেন, কিন্তু শব্দ তাহাতে উঠিল না। তারপর সভা-প্রাঙ্গণ নিস্তব্ধ, সকলেই কেমন অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিতেছিলেন। সমস্ত সভাটা বায়ুপ্রবাহহীন মেঘাচ্ছন্ন বর্ষারাত্রির মতো ক্লেশকর হইয়া উঠিয়াছে। মুখুজ্জে-বাবুরা মাথা হেঁট করিয়া রুদ্ধ রোষে অজগরের মতো ফুলিতেছিলেন।

কোনোমতে সভা শেষ হইয়া গেল, অভ্যাগতরা সকলে বিদায় হইয়া গেলেন, তারপর মুখুজ্জেরাও মাথা তুলিলেন। মাথা তুলিলেন বিষধর অজগরের মতোই, ন্টু মোক্তারকে ধ্বংস করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া তো তাঁহারা আপন আপন অন্দরে প্রবেশ করিলেন।

সংবাদটা কিন্তু ন্টুবাবুর নিকট অজ্ঞাত রহিল না, যথাসময়ে রামপুরে বসিয়াই তিনি কঙ্কণার সংবাদ পাইলেন। বৃদ্ধ মুন্সেফবাবুই তাঁহাকে সংবাদটা দিলেন, কথাটা তাঁহারই কানে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। সংবাদ শুনিয়া ন্টুবাবু হাসিয়া হাতজোড় করিয়া কাহাকে প্রণাম জানাইলেন।

মুন্সেফবাবু বলিলেন, বাবুদের প্রণাম জানাচ্ছেন নাকি ?

না, মহর্ষি দুর্বাসাকে প্রণাম জানালাম।

তা হলে বলুন নিজেকেই নিজে প্রণাম করলেন, লোকে তো আপনাকেই বলে—কলিযুগের দুর্বাসা।

ন্টুবাবু বলিলেন, না, তা হলে কোনো দিন লক্ষ্মীর দম্ভ চূর্ণ করবার জন্য সাগরতলে তাঁকে আবার একবার নির্বাসনে পাঠাতাম।

ন্টু মোক্তার ওই এক ধারার মানুষ। তিনি যে সেদিন বলিয়াছিলেন, আমার মা আমার মুখে নিমের মধু দিয়েছিলেন, সে কথাটা তাঁহার অতিরঞ্জন নয়, কথাটা না হউক তাঁহার ইঙ্গিতটা নির্জলা সত্য। বাল্যকাল হইতেই ওই তাঁহার স্বভাব।

প্রথম জীবনে বি. এ. পাস করিয়া ন্টুবাবু স্কুল-মাস্টারি গ্রহণ করিয়াছিলেন। মনে মনে কামনা ছিল, শিক্ষকতার একটি আদর্শ তিনি স্থাপন করিয়া যাইবেন। কিন্তু ওই স্বভাবের জন্যই তাঁহার সে কামনা পূর্ণ হয় নাই, শিক্ষকতা পরিত্যাগ করিয়া মোক্তারি ব্যবসায় অবলম্বনে বাধ্য হইয়াছেন।

ঘটনাটা ঘটিয়াছিল এইরূপ।—সেবার পূজার সময় তাঁহার গ্রামের ধনী এবং জমিদার চাটুজ্জেদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ খাইয়া আসিয়া তাহার স্ত্রী কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, আর আমি কোথাও নেমন্তন্ন খেতে যাব না।

ন্টুবাবু কি একখানা বই পড়িতেছিলেন, তিনি মুখ তুলিয়া প্রশ্ন করিলেন, কেন?

এ 'কেন'র উত্তর তাহার স্ত্রী সহজে দিতে পারিল না, বলিতে গিয়া বার বার সে কাঁদিয়া ফেলিল। বিরক্ত হইয়া ন্টুবাবু বই বন্ধ করিয়া ভালো করিয়া উঠিয়া বসিলেন। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া বহুকষ্টে অবশেষে জানিলেন, তাঁহার স্ত্রী দুর্ভাগ্যক্রমে গ্রামের বর্দ্ধিষ্ণু ঘরের সালঙ্কারা বধূদের পঙ্‌ক্তিতে খাইতে বসিয়াছিল, ফলে পরিবেশনের প্রতিটি দফাতেই সে অপমানিত হইয়াছে। যে ভাবে গৃহকর্ত্রী ও দাসীর প্রতি প্রত্যক্ষেই দুই ধারার ব্যবহার হইয়া থাকে, সেইভাবেই সে দাসীর মতো ব্যবহারই পাইয়াছে।

ন্টুবাবু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, আরপর আপন মনেই বলিলেন, দুর্বাসা মিথ্যে তোমায় অভিসম্পাত দেয় নি! সে ঠিক করেছিল।

তাঁহার স্ত্রী কিছু বুঝিতে না পারিয়া স্বামীর মুখের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল। ন্টুবাবুর দৃষ্টি তাহার মুখের উপর নিবদ্ধ হইতেই সে আবার কাঁদিয়া ফেলিল।

ন্টুবাবু বলিলেন, আচ্ছা, দুটো বছর সময় আমাকে দাও। এর প্রতিকার আমি করব।

তাহার পরই তিনি মোক্তারি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে আরম্ভ করিলেন। এক বৎসরেই মোক্তারি পাস করিয়া তিনি রামপুর মহকুমায় প্র্যাকৃটিস আরম্ভ করিয়া দিলেন। তৃতীয় বৎসরের পূজায় সধবা-ভোজনের সময় একটা অভাবনীয় কাণ্ড ঘটিয়া গেল। মাছ

পরিবেশন চলিতেছিল, পরিবেশক মুটুবাবু স্ত্রীর পাতার নিকট আসিতেই সে প্রকাণ্ড একটা টাকার তোড়া কাপড়ের ভিতর হইতে বাহির করিয়া সশব্দে নামাইয়া দিয়া বলিল, এই এঁদের সমান গহনাই আমার হবে, এই তার টাকা। এখন ওঁদের সমান মাছ আমাকে না দাও, একখানার চেয়ে কম আমাকে দিও না।

পরিবেশকের হাত হইতে মাছের বালতিটা খসিয়া পড়িয়া গেল। তারপর গ্রাম জুড়িয়া দেশ জুড়িয়া সে এক তুমুল আন্দোলন। লোকে মুটুবাবুকেই দোষ দিয়া ক্ষান্ত হয় নাই, তাঁহার ঊর্ধ্বতন পুরুষগণকেও দোষ দিয়া বলিয়াছিল, বিছুটির ঝাড়, গোড়া থেকে আগা পর্যন্ত সর্বাঙ্গে হুল। জ্বালা-ধরানো ওদের স্বভাব।

মুটুবাবাবুর পিতামহ ছিলেন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত লোক, কিন্তু পাণ্ডিত্যের খ্যাতির তুলনায় অপ্রিয় সত্যভাষণের অখ্যাতি ছিল বেশি। সে আমলের কোনো-এক রাজ-বাড়িতে শ্রাদ্ধ উপলক্ষে শাস্ত্র-বিচারের আসরে যুবরাজ তাঁহার নাসিকাগ্র প্রবেশ করাইয়া ফোড়ন দিতে দিতে গীতার একটা শ্লোক আওড়াইয়া উঠিয়াছিলেন, মশায়, স্বয়ং ভগবান বলে গেছেন, যদা যদাহি ধর্মস্য—

মুটুবাবুর পিতামহ বাধা দিয়া বলিয়াছিলেন, জিহ্বার জড়তা দূর হয় নি আপনার, আরও মার্জনা দরকার, জদা জদা নয়, যদা যদা।

মুটুবাবুর পিতার নাম ছিল—কুনো কালীপ্রসাদ। তিনি বিদ্যায় বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন না বা অন্য কোনো বিশেষত্বও তাঁহার ছিল না। সমাজে তাঁহার কোনো প্রতিষ্ঠাও হয় নাই, সেজন্য দাবিও কোনোদিন তিনি করেন নাই। কিন্তু সমস্ত জীবনটা তিনি ঘরের কোণে বসিয়াই কাটাইয়া গিয়াছেন। শত্রুতা তিনি কাহারও সহিত কোনোদিন করেন নাই, কিন্তু তবু লোকে বলিত, কি অহঙ্কার লোকটার!

যাক, ওসব পুরাতন কথা।

মুটুবাবু কঙ্কণার জমিদারদের শপথের কথা শুনিয়া বিচলিত হইলেন না। এদিকে কঙ্কণার বাবুরা তাঁহাদের চিরাচরিত প্রথায় প্রতিশোধ-গ্রহণের পন্থা অবলম্বন করিলেন, কিন্তু তাঁহাদের চর বিফলমনোরথ হইয়া হইয়া ফিরিয়া সংবাদ দিল, মুটুবাবুর ঋণ কোথাও নাই। বাবুরা সংবাদ লইতেছিলেন, কোথায় কাহার কাছে মুটু-মোক্তারের হ্যাণ্ডনোট বা তমসুক আছে। থাকিলে সেগুলি কিনিয়া ঋণজালে আবদ্ধ মুটুকে আয়ত্ত করিয়া তাঁহাকে বধ করিতেন।

মুখুজ্জেদের বড়কর্তা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া তাঁহার কর্মচারীকে প্রশ্ন করিলেন, লাট কমলপুরের জমিদারদের এখন অবস্থা কেমন?

কমলপুরেই মুটুবাবুর বাড়ি, তাঁহার জমিজমা; পুকুর, বাগান যাহা কিছু সম্পত্তি সমস্তই কমলপুরের এলাকার মধ্যে।

সরকার উত্তর দিল, অবস্থা অবিশ্যি তেমন ভালো নয়, তবে ওই চলে যায় কোনো রকমে সব। দু এক ঘরের অবস্থা একেবারেই ভালো নয়।

কর্তা বলিলেন, তবে কিনে ফেল তাদের অংশ। টাকা বেশি লাগে লাগুক। হ্যাঁ, তবে আমাদের সকল শরিককে একবার জিজ্ঞাসা কর।

মাস চারেক পর।

সন্ধ্যার সময় নুটুবাবু সন্ধ্যা-উপাসনা করিতেছিলেন। তাঁহার স্ত্রী আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। নুটুবাবু কিন্তু দেখিয়াও দেখিলেন না। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া স্ত্রী বলিল, ওগো, কমলপুর থেকে আমাদের মহাভারত মোড়ল এসেছে।

নুটুবাবু চোখ বুজিয়া ধ্যানে বসিলেন।

স্ত্রী বলিল, তাকে নাকি কঙ্কণার বাবুরা মারধর করেছে, তার পুকুর থেকে মাছ ধরিয়ে নিয়েছে, গোরুগুলো খোঁয়াড়ে দিয়েছে!

নুটুবাবু মুদ্রিত নেত্রেই নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁহার স্ত্রী এবার বিরক্ত হইয়া বাহির হইয়া গেল। নিয়মমতো সন্ধ্যা-উপাসনা শেষ করিয়া নুটুবাবু উঠিলেন। বাহিরে আসিয়া স্ত্রীকে বলিলেন, কই দুধ গরম হয়েছে?

স্ত্রী আসিয়া দুধের বাটি নামাইয়া দিল, নুটুবাবু বলিলেন, দেখ, ভগবানকে যখন মানুষ ডাকে, তখন তাকে চঞ্চল করতে নেই।

স্ত্রী বলিল, বেচারার যে হাপুস নয়নে কান্না, আমি আর থাকতে পারলাম না বাপু। মুখের খাবার বেচারার চোখের জলে নোন্তা হয়ে গেল।

মুখ ধুইয়া পান মুখে দিয়া নুটুবাবু বাহিরের ঘরে আসিতেই মহাভারত তাঁহার পায়ে আছাড় খাইয়া পড়িল। নুটুবাবু তাহার হাত ধরিয়া আকর্ষণ করিয়া বলিলেন, ওঠ ওঠ কী করেছে আগে বল, তারপর কাঁদবে।

মহাভারতের কান্না আরও বাড়িয়া গেল।

নুটুবাবু এবার অত্যন্ত কঠিন স্বরে বলিলেন, বলি, উঠবে না কি?

কণ্ঠস্বরের রূঢ়তায় ও কথার ভঙ্গিমায় মহাভারত এবার সসঙ্কোচে উঠিয়া বসিয়া করুণভাবে চোখের জল মুছিতে আরম্ভ করিল।

নুটুবাবু আবার প্রশ্ন করিলেন, কী হয়েছে বল!

আজ্ঞে, কঙ্কণার বাবুরা আমার পুকুরের সমস্ত মাছ—এই হালি পোনা তিন ছটাক এক পো করে—

তিন ছটাক এক পো এখন বাদ দাও। তোমার পুকুরের সমস্ত মাছ কী হল, তাই বল!

আজ্ঞে, জোর করে বাবুরা ধরিয়ে নিলেন।

তারপর?

এ প্রশ্নে মহাভারত অবাক হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। মুটুবাবু আবার প্রশ্ন করিলেন, আর কি করেছেন?

আজ্ঞে, আমার গোরু-বাছুর সব জোর করে ধরে খোঁয়াড়ে দিয়েছেন।

আর?

এবার মহাভারত আবার ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল, কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, চাপরাসী দিয়ে ধরে বেঁধে আমাকে--

আর সে বলিতে পারিল না।

মুটুবাবু বলিলেন, হুঁ। কিন্তু কারণ কি? কিসের জন্যে তোমার ওপর বাবুরা এমন করলেন?

কোনোরূপে আত্মসংবরণ করিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে মহাভারত বলিল, আজ্ঞে, আমাকে ডেকে বাবুরা বললেন, মুটু মোক্তারের জমিজমা সব তুমিই ভাগে কর শুনেছি। তা তোমাকে ওসব জমি ছেড়ে দিতে হবে। মুটু মোক্তারের জমি এ চাকলায় কেউ চষতে পাবে না।

মুটুবাবু বলিলেন, হুঁ, তারপর?

আজ্ঞে, আমি তাইতে জোড়হাত করে বললাম, হুজুর, তা আমি পারব না। তিনি বেরামভন—ভালো লোক—আমরা তিন পুরুষ ওনাদের জমি করছি—পুরনো মুনিব। তাতেই আজ্ঞে—

কান্নার আবেগে তাহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল, সে নীরবে রুদ্ধবাক হইয়া মাটির দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

মুটুবাবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, হু, তোমাকে মামলা করতে হবে মহাভারত। খরচপত্র সমস্ত আমার, আসা-যাওয়া আদালত-খরচা সব আমি দেব, তুমি মামলা কর। দেখ, ভেবে দেখ। কাল সকালে আমাকে জবাব দিও। আর সে যদি না পার, তুমি আমার জমি ছেড়ে দাও। তাতে আমি একটুও দুঃখ করব না। ক্ষতি যা হয়েছে, তা আমি তোমার পূরণ করে দেব।

তারপর তিনি লণ্ঠনের আলোটা বাড়াইয়া দিয়া খানকয়েক বই টানিয়া লইয়া বসিলেন। গভীর মনোযোগের সহিত আইনগুলি দেখিয়া বই বন্ধ করিয়া যখন উঠিলেন, তখন মহকুমা শহরটিও প্রায় নিস্তব্ধ হইয়া আসিয়াছে, অদূরবর্তী জংশন

স্টেশন-ইয়ার্ডে মালগাড়ির শান্টিঙের শব্দ গম্ভীর এবং উচ্চতর হইয়া উঠিয়াছে। মহাভারত তখনও পর্যন্ত নির্বাক হইয়া নুটুবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া ছিল। তাহার দিকে দৃষ্টি পড়িতেই নুটুবাবু বলিলেন, তুমি তখন থেকে বসে আছ মহাভারত? জল তো খেয়েছ, কই তামাক-টামাক তো খাও নি?

মহাভারতের চোখ তখনও ছলছল করিতেছিল, সে তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া ঈষৎ লজ্জিতভাবে বলিল, আজ্ঞে, এই যাই।

নুটুবাবু বলিলেন, তোমার ক্ষতি যা হয়েছে, সে আমি পূরণ করে দেব, কিন্তু অপমানের ক্ষতিপূরণ তো করতে পারব না। সেজন্যে তোমাকে মামলা করতে হবে, রাজার দোরে দাঁড়াতে হবে।

মহাভারত এবার আবার কাঁদিয়া ফেলিল, নুটুবাবুর কণ্ঠস্বরের স্নেহস্পর্শে তাহার শোক যেন উথলিয়া উঠিল, বলিল, আজ্ঞে বাবু, ছোট কচি মাছ, এই বছরের হালি-পোনা, একপো-তিন ছটাকের বেশি নয়।

নুটুবাবু এবার বিরক্ত হইলেন না, ক্রোধ প্রকাশ করিলেন না, হাসিলেন না, বলিলেন, যাও, তামাক-টামাক খেয়ে ভাত খেয়ে নাও গিয়ে।

মহাভারত চোখ মুছিতে মুছিতে চলিয়া গেল।

ভিতরে গিয়া নুটুবাবু স্ত্রীকে বলিলেন, আজ থেকে আর আমার বাড়িতে লক্ষ্মীপুজো হবে না।

সবিস্ময়ে স্ত্রী বলিয়া উঠিল, সেকি! ও কি সব্বনেশে কথা!

নুটুবাবু বলিলেন, না, হবে না।

স্ত্রী প্রতিবাদ করিতে সাহস করিল না।

মোকদ্দমা দায়ের হইয়া গেল।

নুটুবাবুর পরিচালনাগুণে, তাঁহার তীক্ষ্ণধার প্রশ্নে প্রশ্নে সমগ্র ঘটনাটার উপরের সাজানো আবরণ খান-খান হইয়া খসিয়া পড়িয়া সত্যের নগ্নমূর্তি প্রকাশিত হইয়া পড়িল। তাহার উপর তাঁহার সূক্ষ্ম এবং দৃঢ় যুক্তিতর্কের প্রভাবে কঙ্কণার বাবুদের গোমস্তা ও চাপরাসীকে বিচারক দোষী স্থির না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি তাহাদের প্রতি কঠিন দণ্ডবিধান করিলেন। দেশময় একটা সাড়া পড়িয়া গেল। কিন্তু এইখানেই শেষ হইল না, কঙ্কণার বাবুরা জজ-আদালতে আপীল করিলেন।

সেদিন সন্ধ্যার সময় বৃদ্ধ মুন্সেফবাবু আসিয়া বলিলেন, নুটুবাবু, যথেষ্ট হয়েছে, এইবার ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলুন।

সবিস্ময়ে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া নুটুবাবু বলিলেন, বলছেন কী আপনি?

ভালোই বলছি। বিরোধের তো এইখানেই শেষ নয়, ধরুন জজ-আদালতেও যদি এই সাক্ষাই বাহাল থাকে, তবে ওঁরা হাইকোর্ট যাবেন। তারপর ধরুন নতুন বিরোধও বাধতে পারে। ওঁদের তো পয়সার অভাব নেই। লোকে বলে কঙ্কণায় লক্ষ্মী বাঁধা আছেন।

মুটুবাবু বলিলেন বিরোধ তো আমার ওই লক্ষ্মীর সঙ্গে। ওই দেবতাটির অভ্যাস হল লোকের মাথার ওপর পা দিয়ে চলা। তাঁর পা দুটি আমি মাটির ধুলোয় নামিয়ে দেব।

মুন্সেফবাবু বলিলেন, ছি-ছি কি যে বলেন আপনি মুটুবাবু!

মুটুবাবু উত্তর দিলেন, ঠিকই বলি আমি মুন্সেফবাবু, কিন্তু আপনার ভালো লাগছে না।

তারপর হাসিয়া আবার বলিলেন, না লাগবারই কথা। লক্ষ্মীর পা যে আপনার মাথায় চেপেছে; পায়ের পথ তো সঙ্কীর্ণ, রথ চলবার মতো রাজপথ তৈরি হয়ে গিয়েছে। টাকটি আপনার বেশ প্রশস্ত!

মুন্সেফবাবু হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন, কথাটা বলেছেন বড় ভালো! উঃ, বড্ড বলেছেন মশাই!

তারপর কিন্তু আর ও প্রসঙ্গে তিনি কোন কথা বলিলেন না। হাস্য-পরিহাসের মধ্যে সন্ধ্যাটা কাটিয়া গেল?

কিন্তু লক্ষ্মীর পরাজয় এত সহজে হয় না, জজ-আদালতের আপীলে মামলাটা ডিসমিস হইয়া গেল। মুটুবাবু মুখ রাঙা করিয়া আদালত হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। সত্যের অপমানে পরাজয়ে ক্ষোভ লজ্জার তাঁহার আর সীমা ছিল না। কিন্তু বিস্মিত তিনি হন নাই। জজ-আদালতের উকিলের সওয়াল শুনিয়াই তিনি এ পরিণতি বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

সদর হইতে রামপুরে ফিরিয়া আসিয়া সন্ধ্যায় নিয়মিত সন্ধ্যা উপাসনায় বসিয়াছেন, এমন সময় বাড়ির বাহিরে বোধ করি খানদশেক ঢাক একসঙ্গে তুমুল শব্দে বাজিয়া উঠিল। কয়েক মুহূর্ত পরেই তাঁহার স্ত্রী বিস্ময়বিহ্বলের মতো আসিয়া বলিল, ওগো, কঙ্কণার বাবুরা দোরের সামনে ঢাক বাজাতে হুকুম দিয়েছে। ধেই-ধেই ক'রে নাচছে গো সব। মুটুবাবু কিছুমাত্র চাঞ্চল্য প্রকাশ করিলেন না, যেমন ধ্যানে বসিয়াছিলেন তেমনই ভাবে বসিয়া রহিলেন।

মাসখানেক পর কঙ্কণায় বাবুদের বাড়িতে আবার একটা সমারোহ হইয়া গেল। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে দুর্যোধন দ্বৈপায়ন হ্রদে আত্মগোপন করিলে পাণ্ডবেরা সমারোহ করেন নাই কিন্তু মুটু মোক্তার পরাজয়ের লজ্জায় মোক্তারি ছাড়িয়া দিয়া কলিকাতায়

পলাইয়া গেলে কঙ্কণার বাবুরা বেশ একটি সমারোহ করিলেন। সেই সমারোহের মধ্যে তাঁহারা ঘোষণা করিলেন, বেটাকে ঢাক বাজিয়ে মোক্তারি ছাড়ালাম, এইবার টিন বাজিয়ে গাঁ থেকে তাড়াতে হবে।

বড়কর্তা বলিলেন, তার আগে ওই বেটা মহাভারতকে শেষ কর, আঠারো পর্বের এক পর্বও যেন বেটার না থাকে।

বৎসর তিনেকের মধ্যেই কঙ্কণার বাবুদের সে প্রতিজ্ঞাও প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল। মহাভারত সর্বস্বান্ত হইয়া মনে মনে নিষ্কৃতির একটা সহজ উপায় অনুসন্ধান করিতে লাগিল। কিন্তু আশ্চর্য গোঁয়ার মহাভারত, কিছুতেই বাবুদের পায়ে গড়াইয়া পড়িল না। দুটু মোক্তার সেই দেশ ছাড়িয়াছেন, আজও ফেরেন নাই। স্ত্রী আছে তাহার পিত্রালয়ে।

সেদিন জমিদারের হিতৈষী গ্রাম্য মণ্ডল আসিয়া মহাভারতকে বলিল, ওরে বাবুদের পায়ে গিয়ে গড়িয়ে পড়। জলে বাস করে কি কুমিরের সঙ্গে বাদ করা চলে?

ছন্নমতি মহাভারত উত্তর দিল, কুমিরে বাদ করলেও খায়, না করলেও খায়। তার চেয়ে বাদ করে মরাই ভালো।

মণ্ডল বিরক্ত হইয়া বলিল, আলক্ষ্মী ঘাড়ে ভর করলে মানুষের এমনই মতিই হয় কিনা!

মহাভারত বলিল, আলক্ষ্মীই আমার ভালো দাদা, উনি কাউকে ছেড়ে যান না।

মণ্ডল অবাক হইয়া গেল, অবশেষে বলিল, তোর দোষ কী বল? নইলে ব্রাহ্মণ জমিদার—

মহাভারত অকস্মাৎ যেন ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল, সে চীৎকার করিয়া হাত-পা নাড়িয়া ভঙ্গি করিয়া বলিল, চণ্ডাল কসাই।

দিন দুই পরই মহাভারতের ঘরের জীর্ণ চালে আগুন জ্বলিয়া উঠিল। নারী ও বালকের আর্ত চীৎকারে লোকজন আসিয়া দেখিল, মহাভারতের ঘর জ্বলিতেছে, কিন্তু মহাভারতের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই, সে একজন দীর্ঘকায় কালো জোয়ানের বুকে নির্মমভাবে চাপিয়া বসিয়া আছে। বহুকষ্টে লোকটাকেই সর্বাগ্রে মহাভারতের কবলমুক্ত করা হইল। সে হাঁপাইতে হাঁপাইতে ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল, জল!

মহাভারত লাফ দিয়া গিয়া জ্বলন্ত চালের একগোছা খড় টানিয়া আনিয়া বলিল, খা!

ওই লোকটাই মহাভারতের ঘরে আগুন দিয়াছে, লোকটা কঙ্কণার বাবুদের চাপরাসী। মহাভারত তাহাকে পুলিসের হাতে সমর্পণ করিল। পরদিন সে অত্যন্ত

ভালোই বলছি। বিরোধের তো এইখানেই শেষ নয়, ধরুন জজ-আদালতেও যদি এই সাজাই বাহাল থাকে, তবে ওঁরা হাইকোর্ট যাবেন। তারপর ধরুন নতুন বিরোধও বাধতে পারে। ওঁদের তো পয়সার অভাব নেই। লোকে বলে কঙ্কণায় লক্ষ্মী বাঁধা আছেন।

মুটুবাবু বলিলেন বিরোধ তো আমার ওই লক্ষ্মীর সঙ্গে। ওই দেবতাটির অভ্যাস হল লোকের মাথার ওপর পা দিয়ে চলা। তাঁর পা দুটি আমি মাটির ধুলোয় নামিয়ে দেব।

মুন্সেফবাবু বলিলেন, ছি-ছি কি যে বলেন আপনি মুটুবাবু!

মুটুবাবু উত্তর দিলেন, ঠিকই বলি আমি মুন্সেফবাবু, কিন্তু আপনার ভালো লাগছে না।

তারপর হাসিয়া আবার বলিলেন, না লাগবারই কথা। লক্ষ্মীর পা যে আপনার মাথায় চেপেছে; পায়ের পথ তো সঙ্কীর্ণ, রথ চলবার মতো রাজপথ তৈরি হয়ে গিয়েছে। টাকটি আপনার বেশ প্রশস্ত!

মুন্সেফবাবু হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন, কথাটা বলেছেন বড় ভালো! উঃ, বড্ড বলেছেন মশাই!

তারপর কিন্তু আর ও প্রসঙ্গে তিনি কোন কথা বলিলেন না। হাস্য-পরিহাসের মধ্যে সন্ধ্যাটা কাটিয়া গেল?

কিন্তু লক্ষ্মীর পরাজয় এত সহজে হয় না, জজ-আদালতের আপীলে মামলাটা ডিসমিস হইয়া গেল। মুটুবাবু মুখ রাঙা করিয়া আদালত হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। সত্যের অপমানে পরাজয়ে ক্ষোভ লজ্জার তাঁহার আর সীমা ছিল না। কিন্তু বিস্মিত তিনি হন নাই। জজ-আদালতের উকিলের সওয়াল শুনিয়াই তিনি এ পরিণতি বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

সদর হইতে রামপুরে ফিরিয়া আসিয়া সন্ধ্যায় নিয়মিত সন্ধ্যা উপাসনায় বসিয়াছেন, এমন সময় বাড়ির বাহিরে বোধ করি খানদশেক ঢাক একসঙ্গে তুমুল শব্দে বাজিয়া উঠিল। কয়েক মুহূর্ত পরেই তাঁহার স্ত্রী বিস্ময়বিহ্বলের মতো আসিয়া বলিল, ওগো, কঙ্কণার বাবুরা দোরের সামনে ঢাক বাজাতে হুকুম দিয়েছে। ধেই-ধেই ক'রে নাচছে গো সব। মুটুবাবু কিছুমাত্র চাঞ্চল্য প্রকাশ করিলেন না, যেমন ধ্যানে বসিয়া-ছিলেন তেমনই ভাবে বসিয়া রহিলেন।

মাসখানেক পর কঙ্কণার বাবুদের বাড়িতে আবার একটা সমারোহ হইয়া গেল। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে দুর্যোধন দ্বৈপায়ন হ্রদে আত্মগোপন করিলে পাণ্ডবেরা সমারোহ করেন নাই কিন্তু মুটু মোক্তার পরাজয়ের লজ্জায় মোক্তারি ছাড়িয়া দিয়া কলিকাতায়

পলাইয়া গেলে কঙ্কণার বাবুরা বেশ একটি সমারোহ করিলেন। সেই সমারোহের মধ্যে তাঁহারা ঘোষণা করিলেন, বেটাকে ঢাক বাজিয়ে মোক্তারি ছাড়ালাম, এইবার টিন বাজিয়ে গাঁ থেকে তাড়াতে হবে।

বড়কর্তা বলিলেন, তার আগে ওই বেটা মহাভারতকে শেষ কর, আঠারো পর্বের এক পর্বও যেন বেটার না থাকে।

বৎসর তিনেকের মধ্যেই কঙ্কণার বাবুদের সে প্রতিজ্ঞাও প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল। মহাভারত সর্বস্বান্ত হইয়া মনে মনে নিষ্কৃতির একটা সহজ উপায় অনুসন্ধান করিতে লাগিল। কিন্তু আশ্চর্য গোঁয়ার মহাভারত, কিছুতেই বাবুদের পায়ে গড়াইয়া পড়িল না। নুটু মোক্তার সেই দেশ ছাড়িয়াছেন, আজও ফেরেন নাই। স্ত্রী আছে তাহার পিত্রালয়ে।

সেদিন জমিদারের হিতৈষী গ্রাম্য মণ্ডল আসিয়া মহাভারতকে বলিল, ওরে বাবুদের পায়ে গিয়ে গড়িয়ে পড়। জলে বাস করে কি কুমিরের সঙ্গে বাদ করা চলে?

ছন্নমতি মহাভারত উত্তর দিল, কুমিরে বাদ করলেও খায়, না করলেও খায়। তার চেয়ে বাদ করে মরাই ভালো।

মণ্ডল বিরক্ত হইয়া বলিল, আলক্ষী ঘাড়ে ভর করলে মানুষের এমনই মতিই হয় কিনা!

মহাভারত বলিল, আলক্ষীই আমার ভালো দাদা, উনি কাউকে ছেড়ে যান না।

মণ্ডল অবাক হইয়া গেল, অবশেষে বলিল, তোর দোষ কী বল? নইলে ব্রাহ্মণ জমিদার—

মহাভারত অকস্মাৎ যেন ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল, সে চীৎকার করিয়া হাত-পা নাড়িয়া ভঙ্গি করিয়া বলিল, চণ্ডাল কসাই।

দিন দুই পরই মহাভারতের ঘরের জীর্ণ চালে আগুন জ্বলিয়া উঠিল। নারী ও বালকের আর্ত চীৎকারে লোকজন আসিয়া দেখিল, মহাভারতের ঘর জ্বলিতেছে, কিন্তু মহাভারতের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই, সে একজন দীর্ঘকায় কালো জোয়ানের বুকে নির্মম-ভাবে চাপিয়া বসিয়া আছে। বহুকষ্টে লোকটাকেই সর্বাগ্রে মহাভারতের কবলমুক্ত করা হইল। সে হাঁপাইতে হাঁপাইতে ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল, জল!

মহাভারত লাফ দিয়া গিয়া জ্বলন্ত চালের একগোছা খড় টানিয়া আনিয়া বলিল, খা!

ওই লোকটাই মহাভারতের ঘরে আগুন দিয়াছে, লোকটা কঙ্কণার বাবুদের চাপরাসী। মহাভারত তাহাকে পুলিসের হাতে সমর্পণ করিল। পরদিন সে অত্যন্ত

হৃষ্টচিত্তে দগ্ধ গৃহের অঙ্গার লইয়া তামাক সাজিয়া পরম তৃপ্তি সহকারে তামাক টানিতেছিল, এমন সময় কে তাহাকে ডাকিল, মহাভারত!

মহাভারত বাহিরে আসিয়া দেখিল, জমিদারের গোমস্তা দাঁড়াইয়া আছে। সে চীৎকার করিয়া উঠিল, মিটমাট আমি করব না হে। কি করতে এসেছ তুমি?

গোমস্তা হাসিয়া বলিল, আরে শোন, শোন।

কোনো কিছু না শুনিয়াই তাহার মুখের কাছে দুই হাতের বুড়া আঙুল ঘন ঘন নাড়িয়া মহাভারত বলিল, খটখট লবডঙ্কা, খটখট লবডঙ্কা, আর আমার করবি কী।

গোমস্তা মুখ লাল করিয়া ফিরিয়া গেল, যাইবার সময় কিন্তু বলিয়া গেল, জানিস বেটা চাষা, পৃথিবীটা কার বশ?

দিন দুয়েক পরেই রামপুর হইতে সুটুবাবুর পুরাতন মুহুরীটি আসিয়া মহাভারতকে লইয়া চলিয়া গেল।

সেইদিনই দ্বিপ্রহরে রামপুরের ফৌজদারী আদালতে মহাভারতকে সঙ্গে লইয়া সুটুবাবু উকিলের গাউন পরিয়া আদালতে প্রথম প্রবেশ করিলেন। তিনি উকিল হইয়া ফিরিয়াছেন। তিনি এতদিন কলিকাতায় আইন পড়িতেছিলেন।

এবার কঙ্কণার বাবুরা একটু চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। সুটুবাবুর তদ্বিরে তদারকে স্বয়ং এস-ডি-ও ঘটনাস্থল পরিদর্শন করিয়া গেলেন এবং শেষ পর্যন্ত কঙ্কণার বাবুদের নায়েব গোমস্তাকে পর্যন্ত আসামী-শ্রেণীভুক্ত করিয়া মামলাটা দায়রা আদালতে বিচারার্থ পাঠাইয়া দিলেন। সুটুবাবু নিজেও সদরে গিয়া বসিলেন, শুধু বসিলেন নয়, সরকারী উকিলের সহযোগে নিজেই মামলা চালাইতে আরম্ভ করিলেন। কয়েকদিনের মধ্যেই নানা জনে বহু বিনীত অনুরোধ এবং বহু প্রকার লোভনীয় প্রস্তাব লইয়া সুটুবাবুকে আসিয়া ধরিয়া বলিল, মিটিয়ে ফেলুন, তাতে আপনারই মর্যাদা বাড়বে।

সুটুবাবু বলিলেন, বড়লোকের সঙ্গে গরিবের ঝগড়া কি আপোষে মেটে? কোনো কালে মেটে নি, মিটবেও না।

শেষ পর্যন্ত বলিলেন, বাবুরা যদি ঢাক কাঁধে করে আদালতের সামনে বাজাতে পারে, কি মহাভারতের ঘরের চালে উঠে নিজেরা চাল ছাওয়াতে পারে, তবে না হয় দেখি।

প্রস্তাবকারীরা মুখ কালো করিয়া উঠিয়া গেল, বিচার চলিতে লাগিল। সাক্ষী-সাবুদ শেষ হইয়া গেলে সরকারী উকিলের সম্মতিক্রমে সুটুবাবু প্রথমে সাওয়াল আরম্ভ করিলেন। সে যেন অকস্মাৎ আগ্নেয়গিরির মুখ খুলিয়া গেল। গভীর আন্তরিকতাপূর্ণ প্রদীপ্ত ভাষায় সমগ্র ঘটনা যেন চোখের সম্মুখে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিল, প্রবলের অত্যাচারে

দুর্বলের হাহাকার যেন রূপ পরিগ্রহ করিল। বিবাদের মূলসূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া এই অগ্নিদাহ পর্যন্ত প্রতিটি ঘটনা সাক্ষীদের উক্তির সহিত মিলাইয়া দেখাইয়া অবশেষে বলিলেন, আজ সমস্ত পৃথিবীময় ধনের মত্ততায় মত্ত ধনীর অত্যাচারে পৃথিবী জর্জরিত হয়ে উঠেছে। এই বিচারাধীন ঘটনাটি তার একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। কিন্তু একান্ত দুঃখের বিষয় যে, ধনীর অনুগ্রহপুষ্ট দুর্বলের উপর দণ্ডবিধান করা ছাড়া আজ ধর্মাধিকরণের গত্যন্তর নাই। কিন্তু সে বিচার একজন করবেন— যিনি সর্বজ্ঞ, সর্বত্র বিরাজমান, সর্বনিয়ন্তা—তিনি এর বিচার অবশ্যই করবেন। সে বিচারের রায়ের সামান্য একটু অংশ আমরা জানি, ঈশ্বরের পুত্র মহামানব যীশুখ্রীষ্ট জানিয়ে দিয়ে গেছেন ; তিনি বলেছেন, “It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter into the Kingdom of God.” [ধনীর স্বর্গরাজ্যে প্রবেশের অপেক্ষা সূচীমুখে উটের প্রবেশও সহজ।]

তাঁহার সওয়ালের পর সরকারী উকিল আর কিছু বলিবার প্রয়োজন বোধ করিলেন না। বিচারে অপরাধীদের কঠিন দণ্ড হইয়া গেল। বিচারশেষে স্তুটুবাবু বাহিরে আসিতেই তাঁহার মুহুরী বলিল, তিনটে মামলার কাগজ নিয়ে মক্কেল বসে আছে।

স্তুটুবাবুর মাথায় তখনও ঐ মোকদ্দমার কথাই ঘুরিতেছিল, তিনি ললাট কুঞ্চিত করিয়া মুহুরীর দিকে চাহিলেন।

সে বলিল, একটা দায়রা, আর দুটো এস. ডি. ও.-র কোর্টের মামলা, ফী বলেছি চার টাকা করে।

পিছন হইতে একজন পুরাতন মোক্তার-বন্ধু আসিয়া অভিনন্দন জানাইয়া বলিল, চমৎকার আর্গুমেণ্ট হয়েছে! এবার কিন্তু ছেঁড়া জুতো জামা পালটাও ভাই। আমার হাতে একটা কেস আছে, তোমাকেই ওকালত-নামা দেব। মক্কেল কিন্তু গরিব।

স্তুটুবাবু সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন, পাঠিয়ে দিও। পয়সার জন্যে কিছু এসে যাবে না। বিচিত্র পৃথিবী, কিন্তু সে বৈচিত্র্য অপেক্ষাও পৃথিবীর বুকের ঘটনাপ্রবাহের ধারা বিচিত্রতর এবং বিস্ময়কর। সেই বিচিত্র ধারার গতিতেই কঙ্কণার বাবুদের সহিত স্তুটুবাবুর বিরোধ অকস্মাৎ একটা অসম্ভব পরিণতিতে আসিয়া শেষ হইয়া গেল।

পনেরো বৎসর পর। সেদিন হঠাৎ কঙ্কণার বাবুদের জুড়িটা আসিয়া স্তুটুবাবুর বাড়িতে প্রবেশ করিয়া গাড়িবারান্দায় দাঁড়াইল। গাড়ির ভিতর হইতে নামিলেন কঙ্কণার বৃদ্ধ বড়কর্তা, তাঁহার পুত্র এবং সেজ তরফের কর্তা। স্তুটুবার দারোয়ান কায়দা-মাফিক সেলাম করিয়া দরজা খুলিয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে দুইজন খানসামা আসিয়া সসম্ভ্রমে

অভিবাদন করিয়া ঝাড়ন দিয়া আসনগুলি ঝাড়িয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। বৃদ্ধ কর্তা ঘরের চারিদিক চাহিয়া বলিলেন, তাই তো হে, স্নটু যে আমাদের ইন্দ্রপুরী বানিয়ে ফেলেছে, অ্যাঁ! বাঃ বাঃ বাঃ, বলিহারি, বলিহারি!

কর্তার পুত্র একজন খানসামাকে বলিলেন, একবার উকিলবাবুকে খবর দাও দেখি, বল কঙ্কণার বড়কর্তা সেজকর্তা এসেছেন।

স্নটুবাবু বিস্মিত হইলেন, এবং অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া নীচে নামিয়া আসিয়া বলিলেন, আসুন, আসুন, আসুন! মহাভাগ্য আমার আজ!

বড়কর্তা বলিলেন, সে তো না বলতেই এসেছি হে, এখন বসতে দেবে কি না বল, না তাড়িয়ে দেবে?

স্নটুবাবু একটু অস্তপ্রস্ত হইয়া বলিলেন, দেখুন দেখি, তাই কি আমি পারি, না কোনো মানুষে পারে?

বড়কর্তা মুচকি হাসিয়া বলিলেন, আজ তোমার সঙ্গে সওয়াল করব, দাঁড়াও। দেশের মধ্যে তো তুমি এখন সবচেয়ে বড় উকিল, এ জেলা ও জেলা থেকেও তোমাকে নিয়ে যায়। দেখি কে হারে!

স্নটুবাবু ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, বেশ, এখন বসুন।

বড়কর্তা বলিলেন, ধর, তোমার বাড়ি ভিখারী এসেছে, তাকে বসতে বলে আর কি আপ্যাইত করবে, যদি ভিক্ষেই তাকে না দাও!

স্নটুবাবু জোড়হাত করিয়া বলিলেন, আমার কাছে আপনারা ভিক্ষে চাইবেন, এ যে অসম্ভব কথা, আশঙ্কার কথা! এ যে বলির দ্বারে বামনের ভিক্ষে চাওয়া! বেশ, আগে বসুন।

বড়কর্তা বার বার ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, উঁহু। আগে তুমি বল যে দেবে, তবে বসি, নইলে যাই।

স্নটুবাবু বলিলেন, বেশ, বলুন, সাধ্যের মধ্যে যদি হয় তবে দেব আমি।

বড়কর্তা বলিলেন, তোমার ছেলেটিকে আমায় ভিক্ষে দিতে হবে, আমার নাতনীটিকে তোমায় আশ্রয় দিতে হবে।

তাঁহার পুত্র আসিয়া স্নটুবাবুর হাত দুইটি চাপিয়া ধরিল, স্নটুবাবুর বিস্মিত হইয়া তাঁহাদের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

সেজকর্তা বলিলেন, তোমার এ ছেলে খুব ভালো বি. এ.তে. এম. এ.-তে ফার্স্ট হয়েছে; তুমিও এখন মস্ত ধনী, বড় বড় জায়গা থেকে তোমার ছেলের সম্বন্ধ আসছে সবই ঠিক। কিন্তু কঙ্কণার মুখুজ্জেদের বাড়ির মেয়ে ধনে কুলে মানে অযোগ্য হবে না। রূপের কথা বলব না, সে তুমি নিজে দেখবে।

হুটুবাবু বড়কর্তার এবং সেজকর্তার পায়ের ধুলা লইয়া বলিলেন, আপনাদের নাতনী আমার বাড়ি আসবে সত্যিই সে আমার সৌভাগ্য।

সমারোহের মধ্যেই যে বিরোধের সূত্রপাত হইয়াছিল সমারোহের মধ্যেই তাহার অবসান হইয়া গেল।

বিবাহ শেষ হইয়া গেল।

অনুষ্ঠান শেষ হইলেও উৎসবের শেষ তখনও হয় নাই। সমাগত আত্মীয় স্বজনদের সকলে এখনও বিদায় হয় নাই। কয়েকটি হাভাতে অতিলোভী আত্মীয় বিদায় লইবে বলিয়া বোধ হয় না। তাহাদের ছেলেগুলার জ্বালায় ছবি ফুলদানি-গুলি ভাঙিয়া প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে।

হুটুবাবু প্রাতঃকালে একখানা ইজি-চেয়ারে শুইয়া তামাক টানিতে টানিতে ঐ কথাই ভাবিতেছিলেন। নিয়মের ব্যতিক্রমে, অপরিমিত পরিশ্রমে শরীর তাঁহার অসুস্থ, বেশ একটু জ্বরও যেন হইয়াছে। চাকরটা আসিয়া সংবাদ দিল তাঁহার ফাউণ্টেনপেনটা পাওয়া যাইতেছে না। হুটুবাবুর রক্ত যেন মাথায় চড়িয়া গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ গৃহিণীকে ডাকিতে বলিলেন। গৃহিণী আসিতেই তিনি বলিলেন, রতনপুরের কালীর মাকে, পারুলের শ্যামা-ঠাকরুনকে আজই বাড়ি যেতে বলে দাও।

সবিস্ময়ে গৃহিণী বলিল, তাই কি হয়? নিজে থেকে না গেলে কি যেতে বলা যায়? আপনার লোক!

হুটুবাবু বলিলেন, আপনার জনের হাত থেকে আমি নিস্তার পেতে চাই বাপু, দোহাই তোমার, বিদেয় কর ওদের। বরং কিছু দিয়ে-থুয়ে দাও, চলে যাক ওরা, নইলে ঘর দোর পর্যন্ত ভেঙে চুরমার করে দেবে।

গৃহিণী একটু বিব্রতভাবেই অন্দরের দিকে চলিয়া গেলেন। হুটুবাবু ক্লান্তভাবেই চেয়ারে শুইয়া, বোধ করি, পরিত্রাণেরই উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে মুহুরী আসিয়া রায়ের নথি সম্মুখের টেবিলটার উপর নামাইয়া দিয়া বলিল, রায়ের নকলটা কাল চেয়েছিলেন। কিন্তু বাজে খরচ কিছু বেশি হয়ে গেল।

হুটুবাবু সজাগ হইয়া উঠিয়া বসিলেন। একটা দায়রা মোকদ্দমার রায়ের নকল। মোকদ্দমাটায় হুটুবাবুর অপ্রত্যাশিতভাবে পরাজয় ঘটিয়াছে। তাঁহার কয়েকটি সূক্ষ্ম যুক্তি বিচারক অন্যায়ভাবে অগ্রাহ্য করিয়াছেন। ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তিনি রায়খানা তুলিয়া লইলেন। মুহুরীটি চলিয়া গেল। রায়খানা পড়িতে পড়িতে হুটুবাবুর মুখ চোখ রাঙা হইয়া উঠিল। বিচারকের মন্তব্য এবং বিচারপদ্ধতির বক্রগতি দেখিয়া তাঁহার ক্রোধের আর পরিসীমা রহিল না। দারুণ উত্তেজনাবশে রায়খানা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া উঠিয়া

ঘরের মধ্যে পায়চারি আরম্ভ করিলেন। উপরের ঘরটাতেই দুমদাম হুটপাট শব্দে ঐ আত্মীয়দের ছেলেগুলি যেন মগের উপদ্রব আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। হুটুবাবু অত্যন্ত বিরক্তিভরে উপরের দিকে চাহিয়া বলিলেন, ভগবান, রক্ষে কর! চাকরটা ঘরের মধ্যে আসিয়া কতকগুল চিঠি টেবিলের উপর রাখিয়া দিল। চিঠিগুলা দেখিতে দেখিতে একখানা অতি-পরিচিত হাতের লেখা খাম দেখিয়া সাগ্রহে খুলিয়া ফেলিলেন। হাঁ, পুরাতন বন্ধু সেই বৃদ্ধ মুন্সেফবাবুর চিঠি। এই বিবাহে আসিতে অক্ষমতার জন্য ক্ষমা চাহিয়া তিনি লিখিয়াছেন—

যাবার বাতিক অসম্ভবরূপে প্রবল হলেও বাতের সঙ্গে যুঝে উঠতে পারলাম না, পরাজয় মানতে হল। বিছানায় শুয়ে শুয়েই আপনার ছেলে ও বউমাকে আশীর্বাদ করছি। ডাকযোগে আশীর্বাদীও কিছু পাঠালাম, গ্রহণ করবেন।

পরিশেষে লিখিয়াছেন—

আজ একটা কথা বলব, রাগ করবেন না। একদিন আপনি বলেছিলেন, মা-লক্ষ্মীর অভ্যেস হল লোকের মাথার ওপর দিয়ে পথ করে চলা। তাঁর চরণ দুখানি আপনি পথের ধুলোয় নামাব বলেছিলেন। কিন্তু টেনে টেনে নিজের মাথাতেই চাপালেন যে! লজ্জা পাবেন না, চরণ দুখানি এমনই লোভনীয়ই বটে, মাথায় না ধরে পারা যায় না! মাথায় কি দেবীর রজত-রথের উপযোগী রাজপথ তৈরি হয়েছে, বলি—টাক পড়েছে, টাক?

চিঠিখানার কথাগুলি যেন তীরের মতো তাঁহার মস্তিষ্কে গিয়া বিঁধিল। উত্তেজিত অসুস্থ মনের মধ্যে অকস্মাৎ একটি অদ্ভুত মুহূর্ত আসিয়া গেল। সমগ্র জীবনটা এই মুহূর্তের মধ্যে ছায়াছবির মতো তাঁহার মনশ্চক্ষুর সম্মুখ দিয়া ভাসিয়া গেল। এই ঘর এই ঐশ্বর্য সমস্ত যেন কুৎসিত ব্যঙ্গে হিহি করিয়া হাসিতেছে। আবার মনে হইল, ঘরের দেওয়ালে ঝুলানো ছবিগুলির মধ্যে সমস্তগুলিতেই মুন্সেফবাবুর ব্যঙ্গহাস্য-বক্র মুখ ভাসিয়া উঠিয়াছে। রতনপুরের কালীর মা, পারুলের শ্যামা-ঠাকরুন উপরতলায় বিজয়োল্লাসে কি তাণ্ডব নৃত্য জুড়িয়া দিয়াছে!

তিনি থরথর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে একখানা আসনে বসিয়া পড়িলেন। মহাভারত আসিয়া প্রণাম করিয়া বলিল, আজ্ঞে, পারুলের শ্যামা-ঠাকরুন বাড়ি যাচ্ছেন, আমিও যাই ওই সঙ্গে।

হুটুবাবু কোনো উত্তর দিতে পারিলেন না, তাঁহার শ্বাস যেন বন্ধ হইয়া আসিতেছে। বিহ্বল দৃষ্টিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইবার দরজাটা খুঁজিতেছিলেন, কিন্তু কই, দরজা কই?

অগ্রদানী

একটা ছয় ফুট সাড়ে ছয় ফুট লম্বা কাঠিকে মাঝামাঝি মচকাইয়া নোয়াইয়া দিলে যেমন হয়, দীর্ঘ শীর্ণ পূর্ণ চক্রবর্তীর অবস্থাও এখন তেমনই। কিন্তু ত্রিশ বৎসর পূর্বে সে এমন ছিল না, তখন সে বত্রিশ বৎসরের জোয়ান, খাড়া সোজা। লোকে বলিত, মই আসছে, মই আসছে। কিন্তু ছোট ছেলেদের সে ছিল মহা প্রিয়পাত্র।

বয়স্ক ব্যক্তিদের হাসি দেখিয়া সে গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করিত, হুঁ। কি রকম, হাসছ যে?

এই দাদা, একটা রসের কথা হচ্ছিল।

হুঁ। তা বটে, তা তোমার রসের কথা—ও তোমার রস খাওয়ারই সমান।

একজন হয়তো বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া বলিয়া দিত, না দাদা, তোমাকে দেখেই সব হাসছিল, বলছিল, মই আসছে।

চক্রবর্তী আকর্ণ দাঁত মেলিয়া হাসিয়া উত্তর দিত, হুঁ, তা বটে। তা কাঁধে চড়লে স্বর্গে যাওয়া যায়। বেশ পেট ভরে খাইয়ে দিলেই, বাস, স্বর্গে পাঠিয়ে দোব।

আর পতনে রসাতল, কি বল দাদা?

চক্রবর্তী মনে মনে উত্তর খুঁজিত। কিন্তু তাহার পূর্বেই চক্রবর্তীর নজরে পড়িত, অল্প দূরে একটা গলির মুখে ছেলের দল তাহাকে ইশারা করিয়া ডাকিতেছে। আর চক্রবর্তীর উত্তর দেওয়া হইত না। সে কাজের ছুতা করিয়া সরিয়া পড়িত।

কোনোদিন রায়েদের বাগানে, কোনোদিন মিশ্রদের বাগানে ছেলেদের দলের সঙ্গে গিয়া হাজির হইয়া আম জাম বা পেয়ারা আহরণে মত্ত থাকিত। সরস পরিপক্ব ফলগুলির মিষ্ট গন্ধে সমবেত মৌমাছি বোলতার দল ঝাঁক বাঁধিয়া চারিদিক হইতে আক্রমণের ভয় দেখাইলেও সে নিরস্ত হইত না; টুপটাপ করিয়া মুখে ফেলিয়া চোখ বুজিয়া রসাস্বাদনে নিযুক্ত থাকিত।

ছেলেরা কলরব করিত, ওই, অ্যাঁ—তুমি যে সব খেয়ে দিলে, অ্যাঁ! সে তাড়াতাড়ি ডালটা নাড়া দিয়া কতকগুলা ঝরাইয়া দিয়া আবার গোটা দুই মুখে পুরিয়া বলিত, আঃ!

কেহ হয়তো বলিত, বাঃ পুন্ন কাকা, তুমি যে খেতে লেগেছ? ঠাকুরপুজো করবে না?

পূর্ণ উত্তর দিত, ফল ফল, ভাত মুড়ি তো নয়, ফল ফল।

ত্রিশ বৎসর পূর্বে যেদিন এ কাহিনীর আরম্ভ, সেদিন স্থানীয় ধনী শ্যামাদাসবাবুর বাড়িতে এক বিরাট শান্তি-স্বস্ত্যয়ন উপলক্ষে ছিল ব্রাহ্মণ-ভোজন। শ্যামাদাসবাবু সন্তানহীন, একে একে পাঁচ-পাঁচটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াই মারা গিয়াছে। ইহার পূর্বেও বহু অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে, কোনো ফল হয় নাই। এবার শ্যামাদাসবাবু বিবাহ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন; কিন্তু স্ত্রী শিবরানী সজল চক্ষে অনুরোধ করিল, আর কিছুদিন অপেক্ষা করে দেখ; তারপর আমি বারণ করব না, নিজে আমি তোমার বিয়ে দেব।

শিবরানী তখন আবার সন্তানসম্ভবা। শ্যামাদাসবাবু সে অনুরোধ রক্ষা করিলেন। শুধু তাই নয়, এবার তিনি এমন ধারা ব্যবস্থা করিলেন যে, সে ব্যবস্থা যদি নিষ্ফল হয় তবে যেন শিবরানীর পুনরায় অনুরোধের উপায় আর না থাকে। কাশী, বৈদ্যনাথ, তারকেশ্বর এবং স্বগৃহে একসঙ্গে স্বস্ত্যয়ন আরম্ভ হইল। স্বস্ত্যয়ন বলিলে ঠিক হয় না, পুত্রেষ্টিযজ্ঞই বোধ হয় বলা উচিত।

ব্রাহ্মণ-ভোজনের আয়োজনও বিপুল। শ্যামাদাসবাবু গলবস্ত্র হইয়া প্রতি পঙ্‌ক্তির প্রত্যেক ব্রাহ্মণটির নিকট গিয়া দেখিতেছেন—কি নাই, কি চাই। একপাশে পূর্ণ চক্রবর্তীও বসিয়া গিয়াছে, সঙ্গে তাহার তিনটি ছেলে। কিন্তু পাতা অধিকার করিয়া আছে পাঁচটি। বাড়তি পাতাটিতে অন্ন ব্যঞ্জন মাছ স্তূপীকৃত হইয়া আছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পাতাটি তাহার ছাঁদা; তাহার নাকি এটিতে দাবি আছে। সে-ই শ্যামদাসবাবু প্রতিনিধি হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে নিমন্ত্রণ জানাইয়া আসিয়াছে, আবার আহারের সময় আহ্বান জানাইয়াও আসিয়াছে। তাহারই পারিশ্রমিক এটি। শুধু শ্যামাদাসবাবুর বাড়িতে এবং এই ক্ষেত্র-বিশেষটিতেই নয়, এই কাজটি তাহার যেন নির্দিষ্ট কাজ, এখানে পঞ্চ গ্রামের মধ্যে যেখানে যে বাড়িতেই হউক এবং যত সামান্য আয়োজনের ব্রাহ্মণ-ভোজন হউক না কেন, পূর্ণ চক্রবর্তী আপনিই সেখানে গিয়া হাজির হয়; হাঁটু পর্যন্ত কোনোরূপে ঢাকে এমনই বহরের তাহার পোশাকী কাপড়খানি পরিয়া এবং বাপ-পিতামহের আমলের রেশমের একখানি কালী-নামাবলী গায়ে দিয়া হাজির হইয়া বলে, হুঁ, তা কর্তা কই গো, নেমন্তন্ন কি রকম হবে একবার বলে দেন? ওঃ, মাছগুলো যে বেশ তেলুক-তেলুক ঠেকছে! হুই হুই! নিয়েছিল এক্ষুনি চিলে!

চিলটা উড়িতেছে দূর আকাশের গায়, পূর্ণ চক্রবর্তী সেটাকেই তাড়াইয়া গৃহস্থের হিতাকাঙ্ক্ষার পরিচয় দেয়। দুর্দান্ত শীতের গভীর রাত্রি পর্যন্ত গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ফিরিয়া সে সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া ফেরে; প্রচণ্ড গ্রীষ্মের দ্বিপ্রহরেও আহারের আহ্বান জানাইতে চক্রবর্তী ছেঁড়া চটি পায়ে, মাথায় ভিজা গামছাখানি চাপাইয়া কর্তব্য সারিয়া আসে; সেই কর্মের বিনিময়ে এটি তাহার পারিশ্রমিক। যাক।

শ্যামাদাসবাবু আসিয়া পূর্ণকে বলিলেন, আর কয়েকখানা মাছ দিক চক্রবর্তী?

চক্রবর্তীর তখন খানবিশেক মাছ শেষ হইয়া গিয়াছে; সে একটা মাছের কাঁটা চুষিতেছিল, বলিল, আজ্ঞে না, মিষ্টি-টিষ্টি আবার আছে তো। হরে ময়রার রসের কড়াইয়ে ইয়া-ইয়া ছানাবড়া ভাসছে, আমি দেখে এসেছি।

শ্যামাদাসবাবু বলিলেন, সে তো হবেই; একটা মাছের মুড়ো?

পূর্ণ পাতাখানা পরিষ্কার করিতে করিতে বলিল, ছোট দেখে।

মাছের মুড়াটা শেষ করিতে করিতে ওপাশে তখন মিষ্টি আসিয়া পড়িল।

চক্রবর্তী ছেলেদের বলিল, হুঁ, বেশ করে পাতা পরিষ্কার কর সব, হুঁ। নইলে নোন্তা ঝোল লেগে খারাপ লাগবে খেতে। এঃ, তুই যে কিছুই খেতে পারলি না, মাছসুদ্ধ পড়ে আছে!—বলিয়া ছোট ছেলেটার পাতার আধখানা মাছও সে নিজের পাতে উঠাইয়া লইল। মাছখানা শেষ করিয়া সে গলাটা ঈষৎ উঁচু করিয়া মিষ্টি পরিবেশনের দিকে চাহিয়া রহিল। মধ্যে মধ্যে হাঁকিতেছিল, এই দিকে।

ওপাশে সকলে তাহাকে দেখিয়া টেপাটেপি করিয়া হাসিতেছিল, একজন বলিল, চোখ দুটো দেখ, চোখ দুটো দেখ!

উঃ, যেন চোখ দিয়ে গিলছে!

আমি তো ভাই, কখনও ওর পাশে খেতে বসি না। উঃ, কি দৃষ্টি?

ততক্ষণে মিষ্টান্ন চক্রবর্তীর পাতার সম্মুখে গিয়া হাজির হইয়াছে।

চক্রবর্তী মিষ্টান্ন-পরিবেশকের সহিত ঝগড়া আরম্ভ করিয়া দিল, ছাঁদার পাতে আমি আটটা মিষ্টি পাব।

বাঃ, সে তো চারটে করে মিষ্টি পান মশায়।

সে দুটো করে যদি পাতে পড়ে, তবে চারটে। আর চারটে যখন পাতে পড়ছে, তখন আটটা পাব না, বাঃ!

শ্যামাদাসবাবু আসিয়া বলিলেন, ষোলোটা দাও ওঁর ছাঁদার পাতে। ভদ্রলোক বিনি-মাইনেতে নেমন্তন্ন করে আসেন; দাও দাও, ষোলোটা দাও।

পূর্ণ চক্রবর্তী আঁচল খুলিতে খুলিতে বলিল, আঁচলে দাও, আমার আঁচলে দাও।

শ্যামাদাসবাবু বলিলেন, চক্রবর্তী, কাল সকালে একবার আসবে তো? কেমন, এখানে এসেই জল খাবে!

যে আজ্ঞে, তা আসব।

ওপাশ হইতে কে বলিল, চক্রবর্তী বাবুকে ধরে পড়ে তুমি বিদূষক হয়ে যাও—আগেকার রাজাদের যেমন বিদূষক থাকত।

চক্রবর্তী গামছায় ছাঁদার পাতাটা বাঁধিতে বাঁধিতে বলিল, হুঁ। তা তোমার

হলে তো ভালোই হয়; আর তোমার, ব্রাহ্মণের লজ্জাই বা কি? রাজা-জমিদারের বিদূষক হয়ে যদি ভালোমন্দটা—

বলিতে বলিতেই হাসিয়া উঠিল।

বাড়িতে আসিয়া ছাঁদা-বাঁধা গামছাটা বড় ছেলের হাতে দিয়া চক্রবর্তী বলিল, যা, বাড়িতে দিগে যা।

ছেলেটা গামছা হাতে লইতেই মেজমেয়েটা বলিল, মিষ্টিগুলো?

সে আমি নিয়ে যাচ্ছি, যা।

অ্যাঁ, তুমি লুকিয়ে রাখবে। ষোলোটা মিষ্টি কিন্তু গুনে নোব, হ্যাঁ।

আরে আরে, এ বলছে কি! ষোলোটা কোথা রে বাপু! দিলে তো আটটা, তাও কত ঝগড়া করে।

মা, মা! দেখ, বাবা মিষ্টিগুলো লুকিয়ে রেখেছে, অ্যাঁ।

চক্রবর্তী-গৃহিণী যাহাকে বলে রূপসী মেয়ে। দারিদ্র্যের শতমুখী আক্রমণেও সে রূপকে জীর্ণ করিতে পারে নাই। দেহ শীর্ণ, চুল রুক্ষ, পরিধানে ছিন্ন মলিন বস্ত্র; তবুও হৈমবতী যেন সত্যিই হৈমবতী। কাঞ্চননিভ দেহবর্ণ দেখিয়া সোনার প্রতিমা বলিতেই ইচ্ছা করে। চোখ দুইটি আয়ত সুন্দর, কিন্তু দৃষ্টি তাহার নিষ্ঠুর মায়াহীন। মায়াহীন অন্তর ও রূপময়ী কায়া লইয়া হৈম যেন উজ্জ্বল বালুস্তরময়ী মরুভূমি; প্রভাতের পর হইতেই দিবসের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মরুর মতোই প্রখর হইতে প্রখরতর হইয়া উঠে।

হৈমবতী আসিয়া দাঁড়াইতেই চক্রবর্তী সভয়ে মেয়েকে বলিল, বলছি, তুই নিয়ে যেতে পারবি না; না, মেয়ে চেঁচাতে—

হৈমবতী কঠোর স্বরে বলিল, দাও।

চক্রবর্তী আঁচলের খুঁটটি খুলিয়া হৈমর সম্মুখে ধরিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল।

ছেলেটা বলিল, বাবাকে আর দিও না, মা। আজ যা খেয়েছে বাবা, উঃ! আবার কাল সকালে বাবু নেমন্তন্ন করেছে বাবাকে, মিষ্টি খাওয়াবে।

হৈম কঠিন স্বরে বলিল, বেরো বলছি আমার সুমুখ থেকে, হতভাগা ছেলে! বাপের প্রতি ভক্তি দেখ! তোরা সব মরিস না কেন, আমি যে বাঁচি!

পূর্ণ এবার সাহস করিয়া বলিল, দেখ না, ছেলের তরিবত যেন চাষার তরিবত!

হৈম বলিল, বাপ যে চামার, লোভী চামারের ছেলে চাষাও যে হয়েছে সেটুকুও ভাগ্যি মেনো। লেখাপড়া শেখাবার পয়সা নেই, রোগে ওষুধ নেই, গায়ে জামা নেই, তবু মরে না ওরা! রাক্ষসের ঝাড়, অখণ্ড পেরমাই!

চক্রবর্তী চুপ করিয়া রহিল। হৈম যেন আগুন ছড়াইতে চলিয়া গেল। চক্রবর্তী ছেলেটাকে বলিল, দেখ দেখিরে, এক টুকরো হত্তুকি কি সুপুরি এককুচি যদি পাস। তোর মার কাছে যেন চাস নি বাবা।

সন্ধ্যার পর চক্রবর্তী হৈমর কাছে বসিয়া ক্রমাগত তাহার তোষামোদ করিতে আরম্ভ করিল। হৈম কোলের ছেলেটাকে ঘুম পাড়াইতেছিল। চক্রবর্তী এবং ছেলেরা আজ নিমন্ত্রণ খাইয়াছে, রাত্রে আর রান্নার হাঙ্গামা নাই, যে ছাঁদাটা আসিয়াছে তাহাতে হৈম এবং কোলের ছেলেটারও চলিয়া গিয়াছে।

বহু তোষামোদেও হৈম যেন তেমন প্রসন্ন হইল না, অন্তত চক্রবর্তীর তাই মনে হইল; সে মনের কথা বলিতে সাহস পাইল না। তাহার একান্ত ইচ্ছা যে, রাত্রে কয়েকটা ছানাবড়া সে খায়। তাহার তৃপ্তি হয় নাই, বুকের মধ্যে লালসা ক্রমবর্ধমান বহ্নি-শিখার মতো জ্বলিতেছে।

ধীরে ধীরে হৈমবতী ঘুমাইয়া পড়িল। শীর্ণ দুর্বল দেহ, তাহার উপর আবার সে সন্তানসম্ভবা, সন্ধ্যার পরই শরীর যেন তাহার ভাঙিয়া পড়ে। ছেলেগুলাও ঘুমাইয়াছে। চক্রবর্তী হৈমর দিকে ভালো করিয়া চাহিয়া দেখিল, হাঁ, হৈম ঘুমাইয়াছে। চক্রবর্তী আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া, হৈমর আঁচল হইতে বাঁধা কয়টা চাবির গোছা খুলিয়া লইয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

পরদিন প্রভাতে উঠিয়াই ছেলেরা নাচিতে নাচিতে চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল, ছানাবড়া খাব। বড়ছেলেটা ঘুর-ঘুর করিয়া বার বার মায়ের কাছে আসিয়া বলিতেছিল, আমাকে কিন্তু একটা গোটা দিতে হবে মা।

হৈম বিরক্ত হইয়া বলিল, সব—সব—সবগুলো বের করে দিচ্ছি, একটা কেন?

সে চাবি খুলিয়া ঘরে ঢুকিয়াই একটা রূঢ় বিস্ময়ের আঘাতে স্তব্ধ ও নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। যে শিকাটাতে মিষ্টিগুলি ঝুলানো ছিল, সেটা কিসে কাটিয়া ফেলিয়াছে, মিষ্টান্নগুলির অধিকাংশই কিসে খাইয়া গিয়াছে; মাত্র গোটা তিনচার মেঝের উপর পড়িয়া আছে, তাও সেগুলি রসহীন শুষ্ক, নিঃশেষে রস শোষণ করিয়া লইয়া ছাড়িয়াছে। ছেঁড়া শিকটাকে সে একবার তুলিয়া ধরিয়া দেখিল, কাটা নয়, টানিয়া কিসে ছিঁড়িয়াছে। অতি নিষ্ঠুর কঠিন হাসি তাহার মুখে ফুটিয়া উঠিল।

বাবু বলিলেন, চক্রবর্তী, গিন্নীর একান্ত ইচ্ছে যে, তুমি এবার তাঁর আঁতুড়-দোরে থাকবে।

এখানকার প্রচলিত প্রথায় সূতিকা-গৃহের দুয়ারের সম্মুখে রাত্রে ব্রাহ্মণ রাখিতে

হয়। চক্রবর্তীর সন্তানদের মধ্যে সব কটিই জীবিত, চক্রবর্তী-গৃহিণী নিখুঁত প্রসূতি ; তাহার সূতিকা-গৃহের দুয়ারে চক্রবর্তীই শুইয়া থাকে। তাই শিবরানী এবার এই ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে, কল্যাণের এমনই সংস্র খুঁটিনাটি লইয়া সে অহরহ ব্যস্ত। শ্যামদাস বাবুও তাহার কোনো ইচ্ছা অপূর্ণ রাখিবেন না।

চক্রবর্তী বলিল, হুঁ, তা আজ্ঞে—

একজন মোসায়েব বলিয়া উঠিল, তা, না না—কিছু নেই চক্রবর্তী। দিব্যি এখানে এসে রাজভোগ খাবে রাত্রে, ইয়া পুরু বিছানা, তোফা ভরা পেটে, বুঝেছ ?—বলিয়া সে ঘড়-ঘড় করিয়া নাক ডাকাইয়া ফেলিল।

আহার ও আরামের বর্ণনায় পুলকিত চক্রবর্তী হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, হুঁ, তা হুজুর যখন বলছেন, তখন না পারলে হবে কেন ?

শ্যামাদাসবাবু বলিলেন, বোসো তুমি, আমি জল খেয়ে আসছি। তোমারও জলখাবার আসছে।—বলিয়া তিনি পাশের ঘরে চলিয়া গেলেন।

একজন চাকর একখানা আসন পাতিয়া দিয়া মিষ্টান্নপরিপূর্ণ একখানা থালা নামাইয়া দিল।

একজন বলিল, খাও চক্রবর্তী।

হুঁ। তা একটু জল, হাতটা ধুয়ে ফেলতে হবে।

আর একজন পারিষদ বলিল, গঙ্গা গঙ্গা বলে বসে পড় চক্রবর্তী। অপবিত্র পবিত্রো বা, ওঁ বিষ্ণু স্মরণ করিলেই সব শুদ্ধ, বসে পড়।

গ্লাসের জলেই একটা কুলকুচা করিয়া খানিকটা হাতে বুলাইয়া লইয়া চক্রবর্তী লোলুপভাবে থালার সম্মুখে বসিয়া পড়িল।

পাশের ঘরে জলযোগ শেষ করিয়া আসিয়া শ্যামাদাসবাবু বলিলেন, পেট ভরল চক্রবর্তী?

চক্রবর্তীর মুখে তখন গোটা একটা ছানাবড়া। একজন বলিয়া উঠিল, আজ্ঞে, কথা বলবার অবসর নেই চক্রবর্তীর এখন।

সেটা শেষ করিয়া চক্রবর্তী বলিল, আজ্ঞে পরিপূন্ন। তিল ধরবার জায়গা নেই আর পেটে।

সে উঠিয়া পড়িল।

শ্যামাদাসবাবু বলিলেন, তোমার কল্যাণে যদি মনস্কামনা আমার সিদ্ধ হয় চক্রবর্তী, তবে দশ বিঘে জমি আমি তোমাকে দোব। আর আজীবন তুমি সিংহবাহিনীর একটা প্রসাদ পাবে। তা হলে তোমার কথা তো পাকা, কেমন ?

সিংহবাহিনীর প্রসাদ কল্পনা করিয়া চক্রবর্তী পুলকিত হইয়া উঠিল। সিংহবাহিনীর ভোগের প্রসাদ—সে যে রাজভোগ!

হুঁ, তা পাকা বইকি! হুজুরের—

কথা অর্ধসমাপ্ত রাখিয়া সে বলিয়া উঠিল, দেখি, দেখি, ওহে, দেখি! চোখ তাহার যেন জলজল করিয়া উঠিল।

খানসামাটা শ্যামাদাসবাবুর উচ্ছিষ্ট জলখাবারের থালাটা লইয়া সম্মুখ দিয়া পার হইয়া যাইতেছিল। একটা অভুক্ত ক্ষীরের সন্দেশ ও মালপোয়া থালাটার উপর পড়িয়া ছিল। চক্রবর্তীর লোলুপতা অকস্মাৎ যেন সাপের মতো বিবর হইতে ফণা বিস্তার করিয়া বাহির হইয়া বিষ উদ্গার করিল। চক্রবর্তী স্থান কাল সমস্ত ভুলিয়া বলিয়া উঠিল, দেখি দেখি, ওহে, দেখি দেখি!

শ্যামাদাসবাবু হাঁ হাঁ করিয়া উঠিলেন, কর কি, কর কি, এঁটো, ওটা এঁটো! নতুন এনে দিক!

চক্রবর্তী তখন থালাটা টানিয়া লইয়াছে। ক্ষীরের সন্দেশটা মুখে পুরিয়া বলিল, আজ্ঞে, রাজার প্রসাদ!

আর সে বলিতে পারিল না, আপনার অন্যায়টা মুহূর্তে তাহার বোধগম্য হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু আর উপায় ছিল না, বাকিটাও আর ফেলিয়া রাখা চলে না। লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া সেটাও কোনোরূপে গলাধঃকরণ করিয়া তাড়াতাড়ি কাজের ছুতা করিয়া সে পালাইয়া আসিল।

বাড়িতে তখন মরুতে যেন ঝড় বহিতেছে। হৈম মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া আছে, ছোট ছেলেগুলা কাঁদিতেছে। বড়টা কোথায় পলাইয়াছে।

মেজমেয়েটা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, মিষ্টিগুলো কিসে খেয়ে দিয়েছে, তাই দাদা ঝগড়া করে মাকে মেরে পালাল। মা পড়ে গিয়ে—

কথার শেষাংশ তাহার কান্নায় ঢাকিয়া গেল। চক্রবর্তীর চোখে জল আসিল; জলের ঘটি ও পাখা লইয়া সে হৈমর পাশে বসিয়া শুশ্রূষা করিতে করিতে সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে হৈমর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

চেতনা হইতেই হৈম স্বামীকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল, ছি ছি ছি! তোমাকে কি বলব আমি, ছিঃ!

চক্রবর্তী হৈমর পায়ে জড়াইয়া ধরিয়া কি বলিতে গেল, কিন্তু হৈম চীৎকার করিয়া উঠিল, মাথা ঠুকে মরব আমি, ছাড়, পা ছাড়।

সমস্ত দিন হৈম নির্জীবের মত পড়িয়া রহিল। সন্ধ্যার দিকে সে সুস্থ হইয়া উঠিলে চক্রবর্তী সমস্ত কথা বলিয়া কহিল, তোমার বলছ আবার ওই সময়েই! তা হলে না হয় কাল বলে দেব যে পারব না আমি।

হৈম চীৎকার করিয়া উঠিল, না না না। মরুক, মরুক, হয়ে মরুক আমার। আমি খালাস পাব। জমি পেলে অন্যগুলো তো বাঁচবে।

শ্রাবণ মাসের প্রথম সপ্তাহেই। সেদিন সন্ধ্যায় শ্যামাদাসবাবুর লোক আসিয়া চক্রবর্তীকে ডাকিল, চলুন আপনি, গিন্নীমায়ের প্রসববেদনা উঠেছে।

চক্রবর্তী বিব্রত হইয়া উঠিল ; হৈমরও শরীর আজ কেমন করিতেছে।

হৈম বলিল, যাও তুমি।

কিন্তু—

আমাকে আর জ্বালিও না বাপু, যাও। বাড়িতে বড় খোকা রয়েছে, যাও তুমি।

চক্রবর্তী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বাহির হইয়া গেল। জমিদার-বাড়ি তখন লোকজনে ভরিয়া গিয়াছে। শ্যামাদাসবাবু বলিলেন, এস চক্রবর্তী, এস। আমি বড় ব্যস্ত এখন। তুমি রান্নাবাড়িতে গিয়ে খাওয়া-দাওয়া সেরে নিও।

চক্রবর্তী সটান গিয়া তখনই রান্নাশালাতে উঠিল।

হুঁ, ঠাকুর, কী রান্না হচ্ছে আজ? বাঃ, খোসবুই তো খুব উঠেছে! কী হে ওটা, মাছের কালিয়া না মাংস?

মাংস। মায়ের পুজো দিয়ে বলি দেওয়া হয়েছে কিনা।

হুঁ, তা তোমার রান্নাও খুব ভালো। তার ওপর তোমার বাদলার দিন। কত দুর, বলি দেরি কত? দাও না, দেখি একটু চেখে।

সে একখানা শালপাতা ছিঁড়িয়া ঠোঙা করিয়া একেবারে কড়াই ঘেঁষিয়া বসিয়া পড়িল। ঠাকুর বিরক্ত হইয়া বলিল, আচ্ছা লোভ তোমার কিন্তু চক্রবর্তী!

হুঁ, তা বলেছ ঠিক। তা একটু বেশি। তা বটে।

একটুখানি নীরব থাকিয়া বলিল, সিদ্ধ হতে দেরি আছে নাকি?

হাতাতে করিয়া খানিকটা অর্ধসিদ্ধ মাংস তাহার ঠোঙাতে দিয়া ঠাকুর বলিল, এই দেখ, বললে তো বিশ্বাস করবে না। নাও, হুঃ।

সেই গরম ঝোলই খানিকটা সড়াত করিয়া টানিয়া লইয়া চক্রবর্তী বলিল, হুঁ। বাঃ, ঝোলটা বেড়ে হয়েছে! হুঁ, তা তোমার রান্না যাকে বলে উৎকৃষ্ট।

ঠাকুর আপন মনেই কাজ করিতেছিল, সে কোনো উত্তর দিল না। চক্রবর্তী আবার বলিল, হুঁ। তা তোমার, এ চাকলায় তো কাউকে তোমার জুড়ি দেখলাম না। মাংসটা সিদ্ধ এখনও হয় নি, তবে তোমার গিয়ে খাওয়া চলছে।

ঠাকুর বলিল, চক্রবর্তী, তুমি এখন যাও এখান্ থেকে। খাবার হলে খবর দেবে চাকররা। আমাকে কাজ করতে দাও। যাও, ওঠ।

চক্রবর্তী উঠিল কিনা সন্দেহ। কিন্তু এই সময়েই তাহার বড় ছেলেটা আসিয়া ডাকিল, বাবা!

চক্রবর্তী উঠিয়া আসিয়া প্রশ্ন করিল, কি রে?

একবার বাড়ি এস। ছেলে হয়েছে।

তোর মা, তোর মা কেমন আছে?

ভালোই আছে গো। তবে দাই-টাই কেউ নেই, দাই এসেছে বাবুদের বাড়ি; নাড়ী কাটতে লোক চাই।

চক্রবর্তী তাড়াতাড়ি ছেলের সঙ্গে বাহির হইয়া গেল।

হৈম!

ভয় নেই, ভালোই আছি। তুমি শুদ্দুরদের দাইকে ডাক দেখি, নাড়ী কেটে দিয়ে যাক। আমাদের দাইকে তো পাওয়া যাবে না।

তাহাই হইল। দাইটা নাড়ী কাটিয়া বলিল, সোন্দর খোকা হইচে বাপু, মা-বাপ সোন্দর না হলে কি ছেলে সোন্দর হয়! মা কেমন—তা দেখতে হবে!

হৈম বলিল, যা যা, বকিস নি বাপু; কাজ হল তোর, তুই যা।

চক্রবর্তী বলিল, হুঁ, তা হলে, তাই তো! খোকা যাক, বলে আসুক বাবুকে, অন্য লোক দেখুন ওঁরা।

হৈম বলিল, দেখ, জ্বালিও না আমাকে। যাও বলছি, যাও।

চক্রবর্তী আবার অন্ধকারের মধ্যে বাবুদের বাড়ির দিকে চলিল।

মধ্যরাত্রে জমিদার-বাড়ি শঙ্খধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠিল। শিবরানী একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিয়াছে।

পূর্ব হইতেই ডাক্তার আসিয়া উপস্থিত ছিল, সে-ই যতদূর সম্ভব সাবধানতা অবলম্বন করিয়া নাড়ী কাটিল। গরম জলে শিশুর শরীরের ক্লেদাদি ধুইয়া মুছিয়া দাইয়ের কোলে শিশুটিকে সমর্পণ করিয়া সে যখন বিদায় লইল, তখন রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে।

প্রভাতে চক্রবর্তী বাড়ি আসিতেই হৈম বলিল, ওগো, ছেলেটার ভোররাত্রে যেন জ্বর হয়েছে মনে হচ্ছে।

চক্রবর্তী চমকিয়া উঠিল, বলিল, হুঁ, তা—

অবশেষে অনুযোগ করিয়া বলিল, বললাম তখন, যাব না আমি। তা তুমি একেবারে আগুন হয়ে উঠলে! কিসে যে কি হয়—হুঁ!

হৈম বলিল, ও কিছু না, আপনি সেরে যাবে। এখন পয়সা-টাকের সাবু কি দুধ

দুধ যদি একটু পাও তো দেখ দেখি। আমাকে কাটলেও তো এক ফোঁটা দুধ বেরবে না।

পয়সা ছিল না, চক্রবর্তী প্রাতঃকৃত্য সারিয়া বাবুদের বাড়ির দিকেই চলিল, দুধের জন্য। কাছারি-বাড়িতে ঘটিটি হাতে দাঁড়াইয়া সে বাবুকে খুঁজিতেছিল। বাবু ছিলেন না। লোকজনও সব ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া চলাফেরা করিতেছে। কেহ চক্রবর্তীকে লক্ষ্যই করিল না।

খানসামাটা বাড়ির ভিতর হইতে বাহির হইয়া কোথায় যাইতেছিল, সে চক্রবর্তীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, আজ আর পেসাদ-টেসাদ মিলবে না ঠাকুর; যাও, বাড়ি যাও।

চক্রবর্তী ম্লানমুখে ধীরে ধীরে বারান্দা হইতে নামিয়া আসিল। একজন নিম্ন-শ্রেণীর ভৃত্য একটা আড়াল দেখিয়া বসিয়া তামাক টানিতেছিল, চক্রবর্তী তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিল, হ্যাঁ বাবা, ছেলের জন্যে গাই দোয়া হয় নি?

সে উত্তর দিল, কেন ঠাকুর, ধারস্ন খাবে নাকি? আচ্ছা পেটুক ঠাকুর যা হোক! না, গাই দোয়া হয় নি; বাড়িতে ছেলের অসুখ, ওসব হবে না এখন, যাও।

শিশুর অসুখ বোধ হয় শেষরাত্রেই আরম্ভ হইয়াছিল, কিন্তু বোঝা যায় নাই। সারারাত্রিব্যাপী যন্ত্রণা ভোগ করিয়া শিবরানীও এলাইয়া পড়িয়াছিল, রাত্রি-জাগরণক্লিষ্টা দাইটাও ঘুমাইয়াছিল।

প্রভাতে, বেশ একটু বেলা হইলে, শিবরানী উঠিয়া বসিয়া ছেলে কোলে লইয়াই আশঙ্কায় চমকিয়া উঠিলেন। এ কি, ছেলে যে কেমন করিতেছে! তাহার পূর্বের সন্তানগুলিও তো এমনই ভাবেই—! চোখের জলে শিবরানীর বুক ভাসিয়া গেল। শিশুর শুভ্রপুষ্পতুল্য দেহবর্ণ যেন ঈষৎ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে।

শিবরানী আর্তস্বরে ডাকিল, যমুনা, একবার বাবুকে ডেকে দে তো!

শ্যামাদাসবাবু আসিতেই সে বলিল, ডাক্তার ডাকাও, ছেলে কেমন হয়ে গেছে! সেই অসুখ!

শ্যামাদাসবাবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, দুর্গা দুর্গা!

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি ডাক্তার আনিতে পাঠাইলেন। স্থানীয় ডাক্তার তৎক্ষণাৎ আসিল এবং তাহার পরামর্শমতো শহরেও লোক পাঠানো হইল বিচক্ষণ চিকিৎসকের জন্য। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, শিবরানীর আশঙ্কা সত্য; সত্যই শিশু অসুস্থ। ধীরে ধীরে শিশুর দেহবর্ণ হইতে আকৃতি পর্যন্ত যেন কেমন অস্বাভাবিক হইয়া

আসিতেছে। এই সর্বনাশা রোগেই শিবরানীর শিশুগুলি এমনই করিয়াই সূতিকা-গৃহে একে একে বিনষ্ট হইয়াছে।

অপরাহ্ণে সদর হইতে বড় ডাক্তার আসিয়া শিশুকে কিছুক্ষণ দেখিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, চলুন, আমার দেখা হয়েছে।

দাইটা বলিয়া উঠিল, ডাক্তারবাবু, ছেলে—

তাহার প্রশ্ন শেষ হইবার পূর্বেই ডাক্তার বলিল, ওষুধ দিচ্ছি।

শ্যামাদাসবাবুর সঙ্গে ডাক্তার বাহির হইয়া গেল।

শ্যামাদাসবাবুর মাসীমা সূতিকা-গৃহের সম্মুখে দাঁড়াইয়া দাইকে বলিলেন, কই, ছেলে নিয়ে আয় তো দেখি!

ছেলের অবস্থা দেখিয়া তিনি একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, আ আমার কপাল রে!—বলিয়া ললাটে করাঘাত করিলেন। ঘরের মধ্যে শিবরানী ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছিল।

মাসীমা আপন মনেই বলিলেন, আর ও বার করে দিতে হয়েছে। কি করেই বা বলি! আর পোয়াতীর কোলেই বা—

ডাক্তার শ্যামাদাসবাবুকে বলিল, কিছু মনে করবেন না শ্যামাদাসবাবু, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?

বলুন।

ডাক্তার শ্যামাদাসবাবুর যৌবনের ইতিহাস প্রশ্ন করিয়া সংগ্রহ করিয়া বলিল, আমিও তাই ভেবেছিলাম। ওই হল আপনার সন্তানদের অকাল-মৃত্যুর কারণ।

তা হলে ছেলেটা কি—

না, আশা আমি দেখি না।—বলিয়া ডাক্তার বিদায় হইল।

শ্যামাদাসবাবু বাড়ির মধ্যে আসিতেই মাসীমা আপনার মনের কথাটা ব্যক্ত করিয়া বলিলেন, নইলে কি পোয়াতীর কোলে ছেলে মরবে? সে যে দারুণ দোষ হবে বাবা। আচার-আচরণগুলোও মানতে হবে তো।

আচার রক্ষা করিতে হইলে বিচার করার কোনো প্রয়োজন হয় না; এবং হিন্দুর সংসারে আচারের উপরেই নাকি ধর্ম প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং শিবরানীর কোল শূন্য করিয়া দিয়া শিশুকে সূতিকা-গৃহের বাহিরে বারান্দায় মৃত্যু-প্রতীক্ষায় শোয়াইয়া দেওয়া হইল। তাহার কাছে রহিল দাই, এবং প্রহরায় রহিল ব্রাহ্মণ, আর মাথার শিয়রে রহিল দেবতার নির্মাল্যের রাশি। ঘরের মধ্যে পুত্রশোকাতুরা শিবরানীর সেবা ও সান্ত্বনার জন্য রহিল যমুনা-ঝি।

শ্রাবণের মেঘাচ্ছন্ন অন্ধকার রাত্রি। চক্রবর্তী বসিয়া ঘন ঘন তামাক খাইতেছিল। তাহার ঘরেও শিশুটি অসুস্থ ; কিন্তু সে সারিয়া উঠিবে। চক্রবর্তী মধ্যে মধ্যে আপন মনেই বিদ্রূপের হাসি হাসিতেছিল। সে ভাবিতেছিল, বিধিলিপি! তাহার শিশুটি মরিয়া যদি এটি বাঁচিত, তবে চক্রবর্তী অন্তত বাঁচিত। দশ বিঘা জমি আর সিংহবাহিনীর প্রসাদ নিত্য একথালা! ভাগ্যের চিকিৎসা কি আর ডাক্তারে করিতে পারে!

শিশুটি মধ্যে মধ্যে ক্ষীণ কণ্ঠে অসহ্য যন্ত্রণায় আর্তনাদ করিতেছে।

চক্রবর্তী দাইটাকে বলিল, একটু জল-টল মুখে দে রে-বাপু!

নিদ্রাকাতর দাইটা বলিল, জল কি যাবে গো ঠাকুর? তা বলছ, দিই।

সে উঠিয়া ফোঁটা দুই জল দিয়া শিশুর অধর ভিজাইয়া দিল। তারপর শুইতে শুইতে বলিল, ঘুমোও ঠাকুর, তোমার কি আর ঘুম-টুম নাই!

চক্রবর্তীর চক্ষে সত্যই ঘুম নাই। সে বসিয়া আকাশজোড়া অন্ধকারের দিকে চাহিয়া আপন ভাগ্যের কথা ভাবিতেছিল। তাহার ভাগ্যাকাশও এমনই অন্ধকার। আঃ, ছেলেটা যদি জাদুমন্ত্রে বাঁচিয়া উঠে! চক্রবর্তী পৈতা ধরিয়া শিশুর ললাটখানি একবার স্পর্শ করিল। অকস্মাৎ সে শিহরিয়া উঠিল। ভয়ে সর্বাঙ্গ তাহার থরথর করিয়া কাঁপে।

না না, সে হয় না। জানিতে পারিলে সর্বনাশ হইবে। দেখিতে দেখিতে তাহার সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজিয়া উঠিল। সে আবার তামাক খাইতে বসিল।

দাইটা নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেছে। ঘরের মধ্যেও শিবরানীর মৃদু ক্রন্দনধ্বনি আর শোনা যায় না। কলিকার আগুনে ফুঁ দিতে দিতে চক্রবর্তী আবার চঞ্চল হইয়া উঠিল ; জ্বলন্ত অঙ্গারের প্রভায় চোখের মধ্যেও যেন তাহার আগুন জ্বলিতেছে।

উঃ, চিরদিনের জন্য তাহার দুঃখ ঘুচিয়া যাইবে! এ শিশুর প্রভাত হইতেই বিকৃত মূর্তি, তাহার শিশুও কুৎসিত নয়, দারিদ্রের সন্তান হইলেও জননীর কল্যাণে সে রূপ লইয়া জন্মিয়াছে। সমস্ত সম্পত্তি তাহার সন্তানের হইবে! উঃ!

পাপ যেন সম্মুখে অদৃশ্য কায়া লইয়া দাঁড়াইয়া তাহাকে ডাকিতেছিল। গভীর অন্ধকারের মধ্যেও আলোকিত উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ চক্রবর্তীর চোখের সম্মুখে ঝলমল করিতেছে। চক্রবর্তী উঠিয়া দাঁড়াইল। শিশুর নিকট আসিয়া কিন্তু আবার তাহার ভয় হইল। কিন্তু সে এক মুহূর্ত। পরমুহূর্তে সে মৃতপ্রায় শিশুকে বস্ত্রাবৃত করিয়া লইয়া খিড়কির দরজা দিয়া সন্তর্পণে বাহির হইয়া পড়িল।

অদ্ভুত, সে যেন চলিয়াছে অদৃশ্য বায়ুপ্রবাহের মতো!—নিঃশব্দে লঘু দ্রুত গতিতে। অন্ধকার পথেও আজ সরীসৃপ, কীট, পতঙ্গ কেহ তাহার সম্মুখে দাঁড়াইতে সাহস করে না, তাহারও সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নাই। ভাঙা ঘর। চারিদিকে প্রাচীরও সর্বত্র নাই।

হৈমর সূতিকাগৃহের দরজাও নাই, একটা আগড় দিয়া কোনোরূপে আগলানো আছে। হৈমও গাঢ় নিদ্রায় আচ্ছন্ন।

চক্রবর্তী আবার বাতাসের মতো লঘু ক্ষিপ্র গতিতে ফিরিল।

দাইটা তখনও নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেছে।

রোগগ্রস্ত শিশু, মৃত্যু-রোগগ্রস্ত নয়। সে থাকিতে থাকিতে অপেক্ষাকৃত সবল ক্রন্দনে আপনার অভিযোগ জানাইল। দাইটার কিন্তু ঘুম ভাঙিল না। চক্রবর্তী ঘুমের ভান করিয়া কাঠ মারিয়া পড়িয়া রহিল।

শিশু আবার কাঁদিল।

ঘরের মধ্যে শিবরানীর অস্ফুট ক্রন্দন এবার যেন শোনা গেল।

শিশু আবার কাঁদিল।

এবার যমুনা ঈষৎ দরজা খুলিয়া বলিল, দাই, ও দাই! ওমা, নাক ডাকছে যে! ঠাকুরও দেখছি মড়ার মতো ঘুমিয়েছে! ও দাই!

দাইটা ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। যমুনা বলিল, এই বুঝি তোর ছেলে আগলানো! ছেলে যে কাতরাচ্ছে, মুখে একটু করে জল দে।

দাইটা তাড়াতাড়ি শিশুর মুখে জল দিল; শুষ্ককণ্ঠ শিশু ঠোঁট চাটিয়া জলটুকু পান করিয়া আবার যেন চাহিল। দাই আবার দিল।

এবার সে সাগ্রহে বলিয়া উঠিল, ওগো, জল খাচ্ছে গো ঠোঁট চেটে চেটে!

শিবরানী দুর্বল দেহে উঠিয়া পড়িয়া বলিল, নিয়ে আয়, ঘরে নিয়ে আয় আমার ছেলে, কারও কথা আমি শুনব না।

প্রভাতে আবার লোক ছুটিল সদরে। এবার অন্য ডাক্তার আসিবে। মৃত্যুদ্বার হইতে শিশু ফিরিয়াছে। দেবতার দান, ব্রাহ্মণের প্রসাদ! চক্রবর্তী নাকি আপন শিশুর পরমায়ু রাজার শিশুকে দিয়াছে! হতভাগ্যের সন্তানটি মারা গিয়াছে। প্রায়ান্ধকার সূতিকা-গৃহে শিবরানী জ্বর-কাতর শিশুকে কোলে করিয়া বসিয়া আছে। তাহার ভাগ্য-দেবতা, তাহার হারানো মানিক!

দশ বিঘা জমি চক্রবর্তী পাইল। সিংহবাহিনীর প্রসাদও এক থালা করিয়া নিত্য সে পায়। হৈম অপেক্ষাকৃত শান্ত হইয়াছে। কিন্তু চক্রবর্তী সেই তেমনই করিয়াই বেড়ায়।

লোকে বলে, স্বভাব যায় না মলে।

চক্রবর্তী বলে, হুঁ, তা বটে। কিন্তু ছেলের দল দেখেছ, এক-একটা ছেলে যে একটা হাতির সমান।

হৈম ছেলেগুলিকে ইস্কুলে দিয়াছে। বড়ছেলেটি এখন ইতরের মতো কথা বলে না, কিন্তু বড় বড় কথা বলে, বাবার ব্যবহারে ইস্কুলে আমার মুখ দেখানো ভার মা। ছেলেরা যা-তা বলে। কেউ বলে, ভাঁড়ের বেটা খুরি। কেউ আবার দেখলেই সড়াত করে মুখে ঝোল টানে। তুমি বাপু, বারণ করে দিও বাবাকে।

হৈম সে কথা বলিতেই চক্রবর্তী সহসা যেন আগুনের মতো জ্বলিয়া উঠিল। তাহার অস্বাভাবিক রূপ দেখিয়া হৈমও চমকিয়া উঠিল।

চক্রবর্তী বলিল, চলে যাব, চলে যাব আমি সন্নেসী হয়ে।

ব্যাপারটা আরও অগ্রসর হইত। কিন্তু বাহির হইতে কে ডাকিল, চক্রবর্তী!

কে?

বাঁড়ুজ্জেরা পাঠালে হে। ওদের মেয়ের বাড়ি তত্ত্ব যাবে, তোমাকে সঙ্গে যেতে হবে; ওরা কেউ যেতে পারবে না। লাভ আছে হে, ভালোমন্দ খাবে, বিদেয়টাও পাবে।

আচ্ছা, চল যাই।

চক্রবর্তী বাহির হইয়া পড়িল। বাঁড়ুজ্জেদের বাড়ি গিয়া যেথানে মিষ্টি তৈয়ারি হইতেছিল সেখানে চাপিয়া বসিয়া বলিল, ব্রাহ্মণস্য ব্রাহ্মণং গতি। হুঁ, তা যেতে হবে বইকি! উনোনের আঁচটা একটু ঠেলে দিই, কি বল হে মোদকমশায়?

সে সতৃষ্ণ নয়নে কড়াইয়ের পাকের দিকে চাহিয়া রহিল।

বৎসর দশেক পর। শিবরানী হঠাৎ মারা গেলেন। লোকে বলিল, ভাগ্যবতী! স্বামী-পুত্তুর রেখে ডঙ্কা মেরে চলে গেল!

শ্যামাদাসবাবু শ্রাদ্ধোপলক্ষে বিপুল আয়োজন আরম্ভ করিলেন। চক্রবর্তীর এখন ওইখানেই বাসা হইয়াছে। সকালবেলাতেই ঠুকঠুক করিয়া গিয়া হাজির হয়, বসিয়া বসিয়া আয়োজনের বিলি-বন্দোবস্ত দেখে, মধ্যে মধ্যে ব্রাহ্মণ-ভোজনের আয়োজন সম্বন্ধে দুই-একটা কথা বলে।

সেদিন বলিল, হুঁ, ছাঁদা একটা করে তো দেওয়া হবে। তা তোমার লুচিই বা কখানা আর তোমার মিষ্টিই বা কি রকম হবে?

একজন উত্তর দিল, হবে হবে। একখানা করে লুচি, এই চালুনের মতো। আর মিষ্টি একটা করে, তোমার লেডিকেনি, এই পাশ-বালিশের মতো, বুঝলে!

সকলে মৃদু মৃদু হাসিতে আরম্ভ করিল। শ্যামাদাসবাবু ঈষৎ বিরক্ত হইয়া বলিলেন, একটু থাম তো সব। হ্যাঁ, কি হল, পাওয়া গেল না?

একজন কর্মচারীর সঙ্গে তিনি কথা কহিতেছিলেন। কর্মচারীটি বলিল, আজ্ঞে, তাদের বংশই নির্বংশ হয়ে গিয়েছে।

তা হলে অন্য জায়গায় লোক পাঠাও। অগ্রদানী না হলে তো শ্রাদ্ধ হয় না।

আচ্ছা, তাই দেখি। অগ্রদানী তো বড় বেশী নেই, দশ-বিশ ক্রোশ অন্তর একঘর আধঘর।

কে একজন বলিয়া উঠিল, তা আমাদের চক্রবর্তী রয়েছে, চক্রবর্তী, নাও না কেন দান, ক্ষতি কি? পতিত করে আর কে কি করবে তোমার?

শ্যামাদাসবাবুও ঈষৎ উৎসুক হইয়া বলিয়া উঠিলেন, মন্দ কি চক্রবর্তী! শুধু দান-সামগ্রী নয়, ভূ-সম্পত্তিও কিছু পাবে; পঁচিশ বিঘে জমি দেব আমি, আর তুমি যদি রাজী হও, তবে বছরে পঞ্চাশ টাকা জমিদারী সম্পত্তির মুনাফা দেব আমি, দেখ।—বলিয়াই তিনি এদিক ওদিক চাহিয়া চাকরকে ডাকিলেন, ওরে, চক্রবর্তীকে জলখাবার এনে দে। কলকাতার মিষ্টি কি আছে, নিয়ে আয়।

শ্রাদ্ধের দিন সকলে দেখিল, শ্যামাদাসবাবুর বংশধর শিবরানীর শ্রাদ্ধ করিতেছে আর তাহার সম্মুখে অগ্রদান গ্রহণ করিবার জন্য দীর্ঘ হস্ত প্রসারিত করিয়া বসিয়া আছে পূর্ণ চক্রবর্তী।

তারপর গোশালায় বসিয়া তাহারই হাত হইতে গ্রহণ করিয়া চক্রবর্তী গোগ্রাসে পিণ্ড ভোজন করিল।

গল্পের এখানেই শেষ, কিন্তু চক্রবর্তীর কাহিনী এখানে শেষ নয়। সেটুকু না বলিলে অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে।

লোভী, আহার-লোলুপ চক্রবর্তীর আপন সন্তানের হাতে পিণ্ড ভোজন করিয়াও তৃপ্তি হয় নাই। লুব্ধ দৃষ্টি লোলুপ রসনা লইয়া সে তেমনই করিয়াই ফিরিতেছিল। এই শ্রাদ্ধের চোদ্দ বৎসর পর সে একদিন শ্যামাদাসবাবুর পায়ে আসিয়া গড়াইয়া পড়িল। শ্যামাদাসবাবু তাঁহার দুই বৎসরের পৌত্রকে কোলে করিয়া শুষ্ক অশ্বত্থতরুর মতো দাঁড়াইয়া ছিলেন।

চক্রবর্তী তাঁহার দুইটি পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, পারব না বাবু, আমি পারব না।

শ্যামাদাসবাবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, না পারলে উপায় কি, চক্রবর্তী? আমি বাপ হয়ে তার শ্রাদ্ধের আয়োজন করছি, কচি মেয়ে—তার বিধবা স্ত্রী শ্রাদ্ধ করতে পারবে, আর তুমি পারবে না বললে চলবে কেন, বল? দশ বিঘে জমি তুমি এতেও পাবে।

শ্যামাদাসবাবুর বংশধর শিশু-পুত্র ও পত্নী রাখিয়া মারা গিয়াছে, তাহারই শ্রাদ্ধ হইবে।

চক্রবর্তী নিরুপায় হইয়া উঠিয়া চলিয়া আসিল।

শ্রাদ্ধের দিন, গোশালায় বসিয়া বিধবা বধূ পিণ্ডপাত্র চক্রবর্তীর হাতে তুলিয়া দিল।

পুরোহিত বলিল, খাও হে চক্রবর্তী!

প্রতিমা

ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি সময়। আকাশে মেঘে বর্ষার সে ঘনঘোর রূপ আর নাই। মেঘের রঙও ফিরিতে আরম্ভ হইয়াছে, রৌদ্রের রঙেও পরিবর্তন দেখা দিয়াছে। গত বৎসরের অনাবৃষ্টি ও অজন্মার পর এবার বর্ষা হইয়াছে ভালো, মাঠে ধানের রং কসকসে কালো, আর ঝাড়ে গোছেও সুন্দর পরিপুষ্ট। দেশে একটা প্রশান্ত ভাব। গৃহস্থবাড়িতে পূজার কাজ পড়িয়া গেছে, মাটির গোলা গুলিয়া ঘর নিকানোর কাজটাই প্রথমে আরম্ভ হইয়াছে, ওইটাই হইল মোটা কাজ এবং হাঙ্গামার কাজ। তাহার পর খড়ি ও গিরিমাটি দিয়া দুয়ারের মাথায় আলপনা দেওয়া আছে, খই মুড়ি ভাজা আছে, মুড়কি নাড়ুর ভিয়ান আছে। পূজার কাজের কি অন্ত আছে।

চাটুজ্জে-বাড়ির গিন্নী বলেন, মা ও মেয়ের হল দশ হাত, তারপর সঙ্গে আছে মেয়ে ছেলে সাঙ্গোপাঙ্গ, আমরা দু হাতে উদ্‌যুগ করে কি কুলিয়ে উঠতে পারি?

আজ চাটুজ্জে-বাড়িতে প্রথম মাটির 'ছোঁচ' পড়িবে। চণ্ডীমণ্ডপে কারিগর আসিয়া গেছে, প্রতিমাতে আজ প্রথম মাটি পড়িবে।

বালতিতে করিয়া রাঙা মাটি গোলা হইয়াছে। বাড়ির বউ এবং ঝিউড়ি মেয়েরা গাছকোমর বাঁধিয়া হাতে সোনার অলঙ্কারের উপর ন্যাকড়া জড়াইয়া বসিয়া আছে, প্রতিমাতে মাটি পড়িলে হয়।

গিন্নী বলিলেন, ওরে, যা তো কেউ, দেখে আয় তো দেরি কত? ছেলেগুলো সব গেল কোথায়?

একটি মেয়ে বলিল, সব গিয়ে ঠাকুর-বাড়িতে বসে আছে।

সত্যই, সব ছেলে তখন চণ্ডীমণ্ডপে ভিড় জমাইয়া বসিয়া ছিল। বুড়া মিস্ত্রী কুমারীশ তখন লম্ফঝম্ফ করিয়া চৌকিদারের সঙ্গে বকাবকি করিতেছিল, বলি, তোর বিত্তিগুলো আমাকে দিবি? তোর কাজ আমি করব কেন শুনি?

চৌকিদার কালাচাঁদ বলিল, ওই দেখ, আগ কর কেন গো! উ মাটি আনতে গেলে কেউ দেয় নাকি? বলে, গাল দিয়ে ভূত ভাগিয়ে দেবে না?

বলি, রাত্তিরে হাঁক দিতে বেরিয়ে লুকিয়ে খানিকটে আনতে পার নাই? না, হাঁকই দাও না রাত্তিরে?

ওই দেখ, কি বলে দেখ, হাঁক না দিলে হয়? একবার করে তো বেরুতেই হয়। তা তুমি যে আজ আসবে, তা কি করে জানব বল? ভুল হয়ে গেইছে।

চাটুজ্জে-গিন্নী বাহির দরজায় দাঁড়াইয়া বলিলেন, অ কুমারীশ, বলি, হল তোমার ? মেয়েরা যে গোলা গুলে বসে আছে গো ! আর বকাবকি—

শীর্ণ খর্বাকৃতি মানুষ কুমারীশ, হাত-পাগুলি পুতুল-নাচের পুতুলের মত সরু এবং তেমনি দ্রুত ক্ষিপ্র ভঙ্গিতে নড়ে। আর চলেও সে তেমনই খরগতিতে। কুমারীশ, গিন্নীমায়ের কথা শেষ হইবার পূর্বেই, তারস্বরে চীৎকার করিয়া আরম্ভ করিল, আর বলেন কেন মা, কালাচাঁদকে নিয়ে আমি আর কাজ করতে পারব না। কোনো উয্যুগ নাই, মাথা নাই, মুণ্ডু নাই, হাত নাই, পা নাই—আমি আর কি করব বলুন ?

বলিতে বলিতেই সে গিন্নীমায়ের নিকটে আসিয়া গড় হইয়া একটি প্রণাম করিয়া একেবারে প্রশান্ত কণ্ঠস্বরে বলিল, তারপরে ভালো আছেন মা ? ছেলেপিলেরা সব ভালো ? বাবুরা সব ভালো আছেন ? দিদিরা, বউমারা সব ভালো আছেন ?

গিন্নীমা হাসিয়া বলিলেন, হ্যাঁ, সব ভালো আছে। তোমার বাড়ির সব ছেলেপিলে—

কথা কাড়িয়া বলা কুমারীশের অভ্যাস, সে আক্ষেপপূর্ণ কণ্ঠে আরম্ভ করিল, আর বলেন কেন মা, হাম, পেটের অসুখ, জ্বর—সব 'পইলট্ট' খেলছে মা। ডাক্তার-বদ্যিতে ফকির করে দিলে।

তারপর আবার অত্যন্ত প্রশান্তভাবে সে বলিল, শুনলাম, ছোটবাবু এসেছেন ফিরে—বড় আনন্দ হল। তা এইবার বউমাকে নিয়ে আসুন, সব ঠিক হয়ে যাবে। ছেলেমানুষ, বুদ্ধির দোষে একটা—তা, সব ঠিক হয়ে যাবে।

গিন্নীমা সমস্ত প্রসঙ্গটা চাপা দিয়া বলিলেন, তোমার আর দেরি কিসের শুনি ? বউরা মেয়েরা গোলা দিয়ে চানই করবে বা কখন, খাবেই বা কখন ?

কুমারীশ বলিল, আর দেরি কি ! সব ঠিক হয়ে গিয়েছে, কেবল এই বেশ্যের আগনের মাটি লাগে কিনা, তাই—

সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠস্বর তাহার পঞ্চমে উঠিয়া গেল, তাই শুধুন কেন ওই বেটা বাউড়িকে যে, মাটি কই ? বাবু ভুলে গিয়েছেন। এ আমি কি করি বলুন দেখি, যাই, আমি আবার দেখে নিয়ে আসি। হুঁঃ, উয্যুগ নাই, আয়োজন নাই, আমারই হয়েছে এক মরণ! বলিয়া সে অত্যন্ত দ্রুতবেগে এবং অনুরূপ দ্রুতকণ্ঠে বকিতে বকিতে ওই মাটির সন্ধানে পথ ধরিল।—আমারই হয়েছে এক দায়, যাই, এখন কোথা পাই বেশ্যের বাড়ি, দেখি! হারামজাদা বাউড়ি বলে, গাল দেবে! আরে, গাল দেবে কেন ? কই, আমাকে গাল দেয় না কেন ? যত সব-! দক্ষিণে তো সেই মামুলি বারো টাকা, বারো টাকায় কি মাথা কিনে নিয়েছে আমার ? পারব না, জবাব দিয়ে দেব। অঃ, খাতির কিসের রে বাপু ?

গণ্ডগ্রাম হইলেও পল্লীগ্রাম, এখানে শহর-বাজারের মতো প্রকাশ্যভাবে ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া কোনো রূপোপজীবিনী বাস করে না, তবে নীচ শ্রেণীর জাতির মধ্যে কলঙ্কিনীর অভাব নাই। গ্রামের পূর্ব-উত্তর কোণাংশে ডোমপল্লী, এই ডোমেদের পুরুষেরা করে চুরি, মেয়েরা করে দেহ লইয়া বেসাতি। মা-বাপ লইয়া সংসারের গৃহাচ্ছাদনের আবরণ দিয়া প্রকাশ্যেই তাহারা সব করিয়া থাকে। কুমারীশ এই ডোমপল্লীতে প্রবেশ করিয়া ডাকিল, বলি কই গো সব, দিদিরা সব কই, গেলি কোথা গো সব ?

অদূরে একটা গাছতলায় চার-পাঁচটি মেয়ে জটলা করিয়া বসিয়া হি-হি করিয়া হাসিয়া এ উহার গায়ে ঢলিয়া পড়িতেছিল। কুমারীশের কণ্ঠস্বরে, ধ্বনিতে সকলে চকিত হইয়া ফিরিয়া চাহিল।

একজন বলিয়া উঠিল, ওলো, সেই পোড়ামুখো আইচে লো, সেই মিস্ত্রী, মাটি নিতে আইচে মুখপোড়া।—বলিতে বলিতে সে হাসিয়া ভাঙিয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে অপর সকলেও উচ্ছ্বসিত কৌতুকে হাসিয়া একটা মত্ত কলরোল তুলিয়া দিল।

এই যে, এই যে সব বসে রয়েছিস। তারপর সব ভালো আছিস তো দিদিরা ? রং নিয়ে আসিস, যাস সব, যাস। এবার ভাদু কেমন গড়ে দিয়েছিলাম, তা-বল ?

কুমারীশ এক মুঠা মাটি সংগ্রহ করিয়া লইয়াই তাহাদের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

একটা মেয়ে কৃত্রিম রাগ দেখাইয়া বলিয়া উঠিল, মাটি নিতে আইচ বুঝি তুমি ? কেনে, কেনে তুমি লিবে, শুনি ?

লে লে, কেড়ে লে মুখপোড়ার হাত হুতে। লে, কেড়ে লে।

কুমারীশ একরূপ ছুটিয়াই পথে নামিয়া অত্যন্ত খরবেগে চলিতে আরম্ভ করিয়া বলিল, প্রতিমে হবে দিদি, প্রতিমে হবে। যেও, যেও সব, রং দেব তুলি দেব, যেও সব। পদ্ম আঁকবে দোরে !

মেয়েরা আবার হাসিয়া ভাঙিয়া পড়িল।

একজন বলিল, ধর ধর, বুড়োকে ধর।

একজন বলিল, সবাইকে রং দিতে হবে কিন্তুক।

কুমারীশ চলিতে চলিতেই ঘন ঘন ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে বলিল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই রং দেবার সময়, সেই—

সে একটা বাঁকের মুখে অদৃশ্য হইয়া গেল।

চাটুজ্জে-বাড়িতে মেয়েরা হুলুধ্বনি দিয়া গোলা দেওয়া আরম্ভ করিল। মেয়েদের মধ্যে সে এক আনন্দের খেলা। গোলা দেওয়ার নাম করিয়া এ উহাকে কাদা মাখাইবে, নিজেও ইচ্ছা করিয়া মাখিবে। বেলা দুই প্রহর, আড়াই প্রহর পর্যন্ত কাদা-মাখামাখি করিয়া ঘাটে গিয়া মাথা ঘষিয়া জল তোলপাড় করিয়া তবে ফিরিবে। সমস্ত বৎসরের মধ্যে তাহাদের এ একটা পরম প্রত্যাশিত উৎসব।

বাড়ির বড়মেয়ে একটা টুলের উপর দাঁড়াইয়া গোলার প্রথম ছাপটা দেওয়ালে টানিয়া দিবার সঙ্গে সঙ্গে মেজমেয়ে বড়-ভ্রাতৃজায়ার গায়ে কাদা ছিটাইয়া দিয়া বলিল, তোমার মুখে গোলা দিয়ে নিকুতে হবে আগে—তুমি বাড়ির বড়বউ।

বড়বউ কিন্তু প্রতিশোধে মেজ-ননদের গায়ে কাদা দিল না, সে বড়-ননদের গায়ে গোলা দিয়া বলিল, তারপর ভাই বাড়ির বড়মেয়ে!

বড়মেয়ে হাতের কাদা-গোলা ন্যাকড়ার ন্যাতাটা থপ করিয়া মেজ-বউয়ের-মুখের উপর ফেলিয়া দিয়া বলিল, তারপর আমাদের মেজগিন্নী।

মেজবউ টুলের উপর বড়-ননদের দিকে মুখ করিয়া মুখখানি বেশ উঁচু করিয়াই ছিল, ন্যাকড়ার ন্যাতাটা থপ করিয়া আসিয়া তাহার মুখের উপর সাটিয়া বসিয়া গেল। পরম কৌতুকে সকলে হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। ঠিক এই সময়েই একটি সুন্দরী তরুণী আসিয়া কাদা-গোলা লইয়া মেজ-ননদের গায়ে ছিটাইয়া দিয়া বলিল, তোমায় কেউ দেয় নি বুঝি?

মেয়েদের হাসি কলরোল থামিয়া গেল, পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া সকলে যেন বিব্রত হইয়া উঠিল।

মেয়েটি বলিল, আমায় বুঝি ডাকতে নেই বড়দি! আমি বলে কত সাধ করে বসে আছি!

বড়বউ বলিল, ছোটবউ, তুমি ভাই মাকে জিজ্ঞেস করে কাদায় হাত দাও।

মাকে জিজ্ঞাসা করিতে হইল না, চাটুজ্জে-গিন্নী নিজেই আসিয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি ছোটবউকে সেখানে দেখিয়া বলিলেন, তুমি কাদায় হাত দিও না বউমা। অমূল্য দেখলে অনর্থ করবে মা, কেলেঙ্কারির আর বাকি রাখবে না। তুমি সরে এস।

ছোটবউয়ের মুখখানি ম্লান হইয়া গেল, সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সরিয়া আসিয়া একপাশে দাঁড়াইয়া রহিল। মেয়েদের কলরবের উচ্ছ্বাসে পূর্বেই ভাঁটা পড়িয়াছিল, তাহারা এবার কাজ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। বড়মেয়ে অত্যন্ত বিরক্তিভরে বলিল, সেই থেকে একটা ন্যাতা দেওয়ালে উঠল না! নে নে, ন্যাতা দে না, অ বড় বউ!

ঠিক এই সময়েই কুমারীশ চিৎকার করিতে করিতে আসিয়া বলিল, টুল নাই, মোড়া নাই, আমি কি তালগাছে চড়ে মাটি দেব? কই, গিন্নীমা কই? একটা টুল চাই যে মা, একটা টুল না হলে—আমি তো এই দেড়হাত মানুষ!

বাড়ির চারিদিকে অনুসন্ধান করিয়া গিন্নীমা বলিলেন, আর একটা টুল আবার গেল কোথা? তুমি জান বড়বউমা?

কুমারীশ বিস্ময়বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে ছোটবউয়ের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, এ বউটি কে গিন্নীমা?

গিন্নীমা বিরক্ত হইয়া বলিলেন, ছোটবউমা, তুমি এখনও দাঁড়িয়ে আছ মা! ছি, বার বার বলে তোমাকে পারলাম না! যাও, ওপরে যাও।

ছোটবউ ঘোমটাটা টানিয়া দিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। কুমারীশ বলিল, ইনিই আমাদের ছোটবউমা? আহা-হা, এ যে সাক্ষাৎ দুগগা-ঠাকরুন গো, অঁ্যা, এমন চেহারা তো আমি দেখি নাই! আহা-হা! অঁ্যা, এমন লক্ষ্মী ঘরে থাকতে, ছোটবাবু আমাদের অঁ্যা—ছি ছি ছি!

গিন্নীমা অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিলেন, কুমারীশ, তুমি এসেছ প্রতিমে গড়তে, তোমার ওসব কথায় কাজ কি বাপু? অ বড়বউমা, টুল আর একটা গেল কোথায়?

কুমারীশ বার বার ঘাড় নাড়িয়া অপরাধ স্বীকার করিয়া বলিল, তা বটে; আপনি ঠিক বলেছেন। হ্যাঁ, তা বটে, আমাদের ও কথায় কাজ কি? হ্যাঁ, তা বটে, তা আপনি ভাববেন না—সব ঠিক হয়ে যাবে। আহা-হা, এমন মুখ তো আমি—

বাধা দিয়া গিন্নীমা বলিলেন, তুমিও যাও কুমারীশ, আমি টুল পাঠিয়ে দিচ্ছি। দাঁড়িয়ে গল্প কোরো না, যাও, আপনার কাজ কর গে।

আজ্ঞে হ্যাঁ, এই যে—আমার বলে কত কাজ পড়ে আছে! সাতাশখানা প্রতিমে নিয়েছি। আমার বলে মরবার অবসর নাই!

কুমারীশ যে উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিয়াছিল, আহা, এ যে সাক্ষাৎ দুগগা-ঠাকরুন গো! —সে কথাটা অতিরঞ্জন নয়। তবে উচ্ছ্বাসটা হয়তো অশোভন হইয়াছিল। চাটুজ্জে বাড়ির ছোটবধূটি সত্যই অতি সুন্দরী মেয়ে। সকলের চেয়ে সুন্দর তাহার মুখশ্রী। বড় বড় চোখ, বাঁশির মতো নাক, নিটোল দুইটি গাল, ছোট্ট কপালখানি। কিন্তু চিবুকের গঠন-ভঙ্গিটিই সর্বোত্তম, ওই চিবুকটিই মুখখানিকে অপরূপ শোভন করিয়া তুলিতেছে। কিন্তু এত রূপের অন্তরালে লুকানো ছিল মেয়েটির দগ্ধ ললাট। তাহার এমন শুভ্র স্বচ্ছ রূপের অন্তরালে নির্মল জলতলের পঙ্কস্তরের মতো সে ললাট যেন চোখে দেখা যাইত।

পাঁচ বৎসর পূর্বে, ছোটবধূ যমুনার বয়স তখন বারো, সে তখন সবে বাল্যজীবনের অনাবৃত সবুজ খেলার মাঠ হইতে কৈশোরের কুঞ্জবনে প্রবেশ করিয়াছে, তখনই তাহার এ বাড়ির ছোটছেলে অমূল্যের সহিত বিবাহ হয়। অমূল্যের বয়স তখন চব্বিশ। বাড়ির অবস্থা স্বচ্ছল, খানিকটা জমিদারি আছে, তাহার উপর মায়ের সর্বকনিষ্ঠ সন্তান, সুতরাং স্বেচ্ছাচারী হইবার পক্ষে কোনো বাধা ছিল না। সকাল হইতে সে কুস্তি, মুগুর, লাঠি লইয়া কাটাইয়া খান দশেক রুটি অথবা পরোটা খাইয়া বাহির হইত স্নানে। পথে সাহাদের দোকানে খানিকটা খাঁটি গিলিয়া স্নানান্তে বাড়ি ফিরিত বেলা দুইটায়। তার-পর আহার ও নিদ্রা। সন্ধ্যায় আবার বাহির হইয়া ফিরিত বারোটায় অথবা আরও খানিকটা পরে, তখন সে আর বাড়ির দুয়ার খুঁজিয়া পাইত না। মা তাহার জাগিয়া বসিয়া থাকিতেন। গ্রামেও তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগের অন্ত ছিল না, আজ ইহাকে প্রহার, কাল তাহার মাথা ফাটাইয়া দেওয়া, কোনোদিন বা কাহারও গৃহে অনধিকার-প্রবেশ প্রভৃতি নানা ধরনের বহু অভিযোগ। এই সময়েই প্রথম পক্ষ বিয়োগের পর খুঁজিয়া পাতিয়া এই সুন্দরী যমুনার সহিত তাহার বিবাহ হইল। কিন্তু ফুলশয্যার রাত্রেই সে যমুনাকে নির্মমভাবে প্রহার করিয়া বাড়ি হইতে বাহির হইয়া গেল। কয়দিন পরই গেল গঙ্গাস্নান করিতে। সেখানে এক যাত্রিনীর উপর পাশবিক অত্যাচার করার জন্য অত্যাচারীকে হত্যা করার অপরাধে তাহার কয় বৎসর জেল হইয়া যায়। তারপর এই মাসখানেক পূর্বে অমূল্য বাড়ি ফিরিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে যমুনাকেও আনা হইয়াছে। পাঁচ বৎসর পূর্বে সেদিন এজন্য চাটুজ্জে-বাড়ির মাথাটা লজ্জায় মাটিতে নত হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু ধীরে ধীরে সে লজ্জা বেশ সহিয়া গিয়াছে; মাটিতে যে মাথা ঠেকিয়াছিল, সে মাথা আবার ধীরে ধীরে উঠিয়াছে। এখন অমূল্যকে লইয়া শুধু অশান্তি আর আশঙ্কা। অশান্তি সহ্য হয়, কিন্তু আশঙ্কার উদ্বেগ অসহনীয়, পাছে সে আবার কিছু করিয়া বসে, এই আশঙ্কাতেই সকলে সারা হইয়া গেল। সকলে আশঙ্কা করিয়াই খালাস, কিন্তু সে আশঙ্কা নিবারণের দায়িত্ব ঐ বধূটির উপর আসিয়া পড়িয়াছে। তাই বধূটির প্রতি সতর্কবাণীর অন্ত নাই, অহরহ তাহাকে সকলে সে কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। যমুনা ভয়ে ঠকঠক করিয়া কাঁপে।

কুমারীশ রাত্রেও প্রতিমার গায়ে মাটি ধরাইতেছিল, তাহার ভাইপো যোগেশ হ্যারিকেনের লণ্ঠনটি উঁচু করিয়া ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। কুমারীশ প্রতিমার গায়ে মাটি দিতে দিতেও ভাবিতেছিল ওই বধূটির কথা। মেয়েটিকে তাহার বড় ভাল লাগিয়াছে। আহা, এমন সুন্দর মেয়ে, আর তাহার স্বামী কিনা এমন! সে এ বাড়িতে বহু দিন প্রতিমা গড়িতেছে, ওই ছোটবাবুকে সে ছোট ছেলেটি দেখিয়াছে। এইখানেই সে এমনই করিয়া প্রতিমাতে মাটি দিত, আর ছোট ছেলেটি বলিত, দেবে না মিস্ত্রী, দেবে না।

সে বলিত, দেব গো, দেব।

কবে দেবে?

কাল।

না আজই দাও, ও মিস্ত্রী!

হ্যাঁ বাবু, এই ঠাকুরই তো তোমার, আবার কাত্তিক দিয়ে কি হবে?

না, আমায় কাত্তিক গড়ে দাও।

সে হাসিয়া বলিত, বাবু আমাদের খ্যাপা বাবু।

সেই ছেলে এমন হইয়া গেল! গেল গেল, কিন্তু এমন সুন্দর মেয়ে—! মিস্ত্রীর চোখের সম্মুখে প্রতিমার মতো মুখখানি যেন জলজল করিতেছে। সে স্থির করি ছোটবাবুর সঙ্গে দেখা হইলে হয়, সে তাহাকে বেশ করিয়া বলিবে।

যোগেশ বলিল, কাকা, রাত হল অনেক, আজ আর থাকুক।

কুমারীশ অত্যন্ত চটিয়া উঠিল, থাকুক! কালও একবেলা এইখানেই কাটুক, না কি? প্রতিমে যে সাতাশখান, তা মনে আছে?

যোগেশ ক্লান্তভাবে বলিল, তা হোক কেন। ওই দেখ, চৌকিদার হাঁক দিচ্ছে।

হাতের কাদার তালটা থপ করিয়া ফেলিয়া দিয়া কুমারীশ বলিল, ওই নে, ওই নে। মরগা যেয়ে তোরা, দেখে নিগে, বুঝে নিগে সব, আমি আর কিছু পারব না।

সে উঠিয়া আসিয়া বালতির জলে হাত ডুবাইয়া খলখল করিয়া ধুইতে আরম্ভ করিল।

অপ অপ, অ্যাও, অপ!

রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া শব্দ উঠিতেছিল, দৃপ্ত এবং উচ্চ কণ্ঠে শাসন বাক্য ধ্বনিত হইতেছে। কুমারীশ অকস্মাৎ অত্যন্ত খুশি হইয়া উঠিল, বলিল, তাই তো রে, চৌকিদারই বটে! উঃ, খুব বলেছিস বাবা! রাত অনেক হয়েছে রে! হুঁ, রাত একেবারে সনসন করছে! নে, একবার তামুক সাজ দেখি।

যোগেশ তামাক সাজিতে বসিল।

অপ অপ, কোন হ্যায়? অ্যাও উল্লুক!

কুমারীশ চমকিয়া উঠিল। লণ্ঠনের আলোকে সভয়ে দেখিল, অসুরের মতো দৃঢ় শক্তিশালী এক জোয়ান সম্মুখে দাঁড়াইয়া। চোখ দুইটা অস্থির, পা টলিতেছে, হাতের শক্ত বাঁশের লাঠিগাছাটা মাটিতে ঠুকিয়া সে প্রশ্ন করিতেছে, অ্যাও, উল্লুক!

মুহূর্তে সে চিনিল, চাটুজ্জে-বাড়ির ছোটবাবু। কিন্তু তাহার সে মূর্তি দেখিয়া ভয়ে তাহার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। সে অতি ভক্তিভয়ে প্রণাম করিয়া বলিল, ছোটবাবু, পেনাম, ভালো আছেন?

লণ্ঠন, প্রতিমা, মাটি এবং কুমারীশকে একসঙ্গে দেখিয়া ছোটবাবুর মনে পড়িল। সে বলিল, মিস্তিরী, তুমি মিস্তিরী?

কৃতার্থ হইয়া কুমারীশ বলিল, আজ্ঞে হাঁ্যা, কুমারীশ মিস্ত্রী।

লণ্ঠনের আলোটা তুলিয়া ধরিয়া বেশ করিয়া কুমারীশকে দেখিয়া বলিল, এ প্লাই ফক্স মেট এ হেন।—প্লাই ফক্স মানে খ্যাঁকশেয়ালি। মাটি দিচ্ছ, বেশ, মা জগদম্বা, মাগো মা!

মিস্ত্রী তাহাকে খুশি করিবার জন্যই আবার বলিল, শরীর ভালো আছে ছোটবাবু?

শরীর, নশ্বর শরীর। আইয়ন মেন—লোহার শরীর। দেখ, দেখ!—বলিয়া সে এবার তাহার ব্যায়ামপুষ্ট দৃঢ়পেশী একখানা হাত বাহির করিয়া মুঠি বাঁধিয়া আরও শক্ত করিয়া মিস্ত্রীর সম্মুখে ধরিল।

দেখ, টিপে দেখ।—অপ!

মিস্ত্রী সভয়ে শিহরিয়া উঠিল। অমূল্য নিজের হাতের লাঠিটা প্রসারিত হাতখানায় আঘাত করিয়া বলিল, টমটম চালা দেগা—টমটম। এই পেতে দিলাম হাত, চালিয়ে দাও টমটম।

কুমারীশ অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। ওদিকে পুকুরটার পাড়ে বাঁশবনে বাতাসের বেগে বাঁশগুলি দুলিয়া পরস্পরের সহিত ঘর্ষণ করিয়া শব্দ তুলিতেছিল, ক্যাঁক্যাঁ—ক্যাঁটক্যাঁট। নানা-প্রকার শব্দ।

অমূল্য লাফ দিয়া হাঁকিয়া উঠিল, অপ! কোন হ্যায়! অ্যাও!

বাঁশবনের শব্দ থামিল না, বায়ুপ্রবাহ তখনও সমানভাবে বহিতেছিল। অমূল্য হাতের লাঠিগাছটা আস্ফালন করিয়া বলিল, ভূত।

মিস্ত্রী বলিল, আজ্ঞে না, বাঁশ।

আলবত ভূত, কিংবা ছেনাল লোক ইশারা করছে।

তারপর অত্যন্ত আস্তে সে বলিল, সব খারাপ হয়ে গিয়েছে। সব চরিত্র খারাপ। ওই শালা যদো শালা বাঁশি বাজায়, শালা কেষ্টো হবে! শালা, মারে ডাঙ্গা!

বাতাসের প্রবাহটা প্রবলতর হইয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে বাঁশের শব্দও বিচিত্রতর এবং উচ্চতর হইয়া বাজিতে আরম্ভ করিল। অমূল্য ক্ষিপ্ত হইয়া লাঠিখানা লইয়া সেই দিকে চলিল, অপ অপ অপ, আমাকে ভয় দেখাও শালা? শালা ভূত, আও আও, চলা আও—অপ।

মিস্ত্রী অবাক হইয়া অমূল্যকেই দেখিতেছিল। সহসা সে এক সময় ঊর্ধ্বলোকে, বোধ করি, দেবতার উদ্দেশ্যেই দৃষ্টি তুলিতে গিয়া দেখিল, শূন্যলোকের অন্ধকারের মধ্যে

আলোকের দীর্ঘ ধারা ভাসিতেছে। সে দেখিল, সম্মুখেই চাটুজ্জে-বাড়ির কোঠার জানালায় আলো জ্বালিয়া জানালার শিক ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছোট বধূটি। আলোকচ্ছটায় তাহাকে যে কেহ দেখিতে পাইবে, সে খেয়াল বোধ করি তাহার নাই। সে উপরে আলোক-শিখা জ্বালিয়া নীচে অমূল্যের সন্ধান করিতেছে। কুমারীশ বিষণ্ণ অথচ বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে বধূটির দিকে চাহিয়া রহিল।

বাঁশের বনে তখন অমূল্য যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। অপ অপ—আও আও আও—অপ!—বলিয়া হাঁক মারিতে মারিতে ঠকাঠক শব্দে বাঁশের উপর লাঠি দিয়া আঘাত আরম্ভ করিল।

যোগেশ আসিয়া কুমারীশের হাতে হুঁকাটি দিয়া বলিল, চল, টানতে টানতেই চল বাপু। যে মশা, বাবা, এ যেন চাক ভেঙেছে! গা হাত পা ফুলে উঠল।

কুমারীশ চকিত হইয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, ওগো বউমা, গিন্নীমাকে ডেকে দাও বরং, ও কি!

অত্যন্ত ক্ষিপ্রবেগে আলোটা সরিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে জানালাটাও বন্ধ হইয়া গেল।

কুমারীশ বলিল ওগো, ও ছোটবাবু, ও ছোটবাবু!

ছোটবাবুর কানে সে কথার শব্দ প্রবেশই করিল না, সে তখনও সমানে বাঁশবনের সহিত যুদ্ধ করিতেছে।

যমুনার জীবন নিজের কাছে যে কতখানি অসহনীয়—সে যমুনাই জানে, কিন্তু তাহার বহিঃপ্রকাশ দেখিয়া কিছু বোঝা যায় না। শরতের চঞ্চল চাঁদের মতো তখনই তাহার মুখ মেঘে ঢাকিয়া যায়, আবার তখনই সে উজ্জ্বল চাঞ্চল্যে হাসিয়া উঠে।

কিন্তু কুমারীশ মিস্ত্রীর তাহার জন্য বেদনার সীমা রহিল না। সে মনে মনে 'হায় হায়' করিয়া সারা হইল। দিন বিশেক পরে প্রতিমাতে 'দুমৃত্তিকা' অর্থাৎ তুষ-মাটির উপরে কালো মাটি ও ন্যাকড়ার প্রলেপ লাগাইয়া, মুখ বসাইয়া, হাতে পায়ে আঙুল জুড়িয়া মাটির কাজ সারিবার জন্য কুমারীশ আসিয়া হাজির হইল। চাটুজ্জে-বাড়িতে তখন পূজার কাজ লইয়া ব্যস্ততার আর সীমা ছিল না। মুড়ি ভাজার কাজ তখন আরম্ভ হইয়া গেছে। পূজার কয়দিনের খরচ আছে, তাহার উপর বিজয়া-দশমী ও একাদশীর দিনের খরচ একটা প্রকাণ্ড খরচ;—অন্তত পাঁচ শত লোক আসিয়া আঁচল পাতিয়া দাঁড়াইবে। বড়বউ, বড় মেয়ে, মেজবউ প্রকাণ্ড বড় বড় ধামায় মুড়ি ভরিয়া ঘরের মধ্যে তুলিতেছে। মেজমেয়ে ভাঁড়ারের হাঁড়িগুলি বাহির করিয়া ঝাড়িয়া মুছিয়া আবার তুলিয়া রাখিতেছে, নূতন মসলাপাতি ভাণ্ডারজাত হইবে। ছোটবধূটিকে

পর্যন্ত কাজে লাগানো হইয়াছে, সে বারান্দার এক কোণে বসিয়া সুপারি কাটিতেছে।

কুমারীশ প্রতিমার গায়ে লাগাইবার জন্য পুরানো কাপড়ের জন্য আসিয়া উঠানে দাঁড়াইয়া কলরব করিতে আরম্ভ করিল, কই, গিন্নীমা গেলেন কোথায়? এ কি বিপদ দেখ দেখি! গিন্নীমা গেলেন কোথা গো? ও গিন্নীমা!

মুড়ির ধামাটা কাঁধে করিয়া যাইতে যাইতে বড়বউ বলিল, না বাপু, মিস্ত্রী দেখছি বাড়ি মাথায় করলে! তোমার কি আস্তে কথা হয় না নাকি?

বড়মেয়ে বলিল, মিস্ত্রী আমাদের পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে আসে কিনা, ঘোড়া দাঁড়ায় না।

কুমারীশ ঈষৎ লজ্জিত হইয়া বলিল, দিদি-ঠাকরুন বলেছেন বেশ। ওটা আমার অভ্যেস। আমার শাশুড়ী কী বলত জানেন? বলত, কুমারীশকে নিয়ে পরামর্শ করা বিপদ, পরামর্শ করবে তো লোকে মনে করবে, কুমারীশ আমার ঝগড়া করছে।

বড়বউ অল্প হাসিয়া বলিল, তা যেন হল। এখন কী চাই বল দেখি তোমার?

পাচিকা পাঁচুদাসী বলিল, চেঁচিয়ে গাঁ মাথায় করে কুমারীশ।

কুমারীশ অত্যন্ত চটিয়া গেল। তোমার, ঠাকরুন বড় ট্যাকটেকে কথা! না চেঁচালে এ বাড়িতে জিনিস পাওয়া যায়? পুরানো কাপড় চাই, তা ঠাকরুনরা জানে না নাকি? আমার তো বাপু, এক জায়গায় বসে হাঁড়ি ঠেলা নয়! সাতাশখানা—

বাধা দিয়া বড়বউ বলিল, সব ঠিক করে রেখেছি বাবা, গোছানো পাট করা সব ঠিক হয়ে আছে।

তারপর চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়া বলিল, কাকেই বা বলি! ও ছোটবউ, দাও তো ভাই, ওই কাঠের সিন্দুকের ওপর ভাঁজ করা আছে এক পুঁটলি কাপড়।

কুমারীশ তাড়াতাড়ি বড়বধূর নিকট আসিয়া চুপি চুপি কহিল, বড়বউমা, আমাদের ছোটবাবু এখনও তেমনই রাত করে আসে?

বড়বধূ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তাহার দিকে চাহিতেই অর্ধপথে সে নীরব হইয়া গেল।

বড়বধূ বলিল, কেন বল তো?

এই—না, বলি, ঘরথাই হল নাকি, মানে, ছোটবউমা আমাদের সোনার পুতুল। আহা মা, চোখে জল আসে আমার।

বড়বউ চুপিচুপিই বলিল, আমাকে যা বললে বেশ করলে, কিন্তু ও কথা আর কাউকে শুধিও না মিস্ত্রী। মা শুনলে রাগ করবেন, ছোটবাবু শুনলে তো রক্ষে থাকবে না।—বলিয়াই সে খালি ধামাটা সেইখানেই নামাইয়া নিজেই কাপড় আনিতে অগ্রসর হইল। ইতিমধ্যে ছোটবউই কাপড়ের পুঁটলিটা বাহির করিয়া আনিয়া

দাঁড়াইল। বড়বউ তাহার হাত হইতে পুঁটলিটা লইয়া কুমারীশের হাতে দিয়া বলিল, আর যদি লাগে তো মার কাছে এসে চাইবে, আমরা আর দিতে-টিতে পারব না।

ছোটবউ মৃদুস্বরে বলিল, আমাকে মেজদিদির মতো একটা হাতি গড়ে দিতে বল না দিদি!

কুমারীশ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, সে তো আমি দিয়েছি মেজদিদিমণিকে। দেব, দেব, দুটো হাতি গড়ে এনে দেব। হাতির ওপর মাহুত সুদ্ধ।

বড়বউ বলিল, ছোটবউ, তুমি ঘরের ভেতর যাও। কুমারীশ, যাও বাবা, কাপড় তো পেলে, এইবার যাও।

কুমারীশ কাপড়ের পুঁটলিটা বগলে করিয়া বাহির হইয়া গেল। চণ্ডীমণ্ডপে তখন ছেলের দল এমন ভিড় জমাইয়া তুলিয়াছে যে, যোগেশ এবং আর একজন অত্যন্ত বিব্রত হইয়া উঠিয়াছে। কে একজন মহিষের মুণ্ডটা তুলিয়া লইয়া পলাইয়াছে। কুমারীশ পিছন হইতে বলিল, মাটি করলে রে বাবা, মাটি করলে! কই কই, বিষকাদা কই, দে দে, সব লাগিয়ে দে। ধর ধর, যোগেশ, ধর সব।

বিষকাদাকে ছেলেদের বড় ভয়, বিষকাদা গায়ে লাগিলে নাকি ঘা হয়। আর যে বিশ্রী গন্ধ! ছেলের দল ছুটিয়া সরিয়া গেল। কুমারীশ একটা মোটা তুলিতে গোবর ও মাটির তরল গোলা ছিটাইতে ছিটাইতে বলিল, পালা সব, পালা এখন। সেই হয়ে গেলে আসবি সব।

কিন্তু কিছুক্ষণ পরই আবার একটি দুইটি করিয়া জমিতে আরম্ভ করিল।

কুমারীশ একজনকে বলিল, কই, তামুক আন দেখি খানিক।

রাত্রে জানালার উপর আলোটি রাখিয়া যমুনা একা বসিয়া ছিল। সমস্ত বাড়ি নিস্তব্ধ। পূজার কাজে সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া যে যাহার ঘরে শুইয়া পড়িয়াছে। বোধ হয় ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। একা ঘরে যমুনার শুইতে বড় ভয় করে। অমূল্য মদ খাইয়া ভীষণ মূর্তিতে আসিলেও সে আশ্বস্ত হয়, মানুষের সাহস পাইয়া শুইবামাত্র ঘুমাইয়া পড়ে। অমূল্যের অত্যাচার প্রায় তাহার সহিয়া আসিয়াছে। অমূল্যের প্রহারের চেয়ে আদরকে তাহার প্রথম প্রথম বেশি ভয় হইত, সেও তাহার সহিয়া গিয়াছে। কিন্তু রাত্রির প্রথম দিকের এই নিঃসঙ্গ অবস্থায় তাহার ভয়ের আর অন্ত থাকে না। কেবল মনে হয়, যদি ভূত আসে! ঘরের দরজা জানালা সমস্ত বন্ধ করিয়া প্রাণপণে চোখ বুজিয়া সে পড়িয়া থাকে, ঘরের মধ্যে আলোটা দপদপ করিয়া জ্বালিয়া দেয়।

আজ চণ্ডীমণ্ডপে মিস্ত্রীরা প্রতিমা গড়িতেছে, খানিকটা দূরেও জাগ্রত মানুষের আশ্বাসে সে জানালা খুলিয়া তাহাদের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছে। লাগিতেছেও

বেশ। উহারা গুজগুজ করিয়া কথা কহিতেছে, কাজ করিতেছে, একজন ছোট মিস্ত্রী কাঠের পিঁড়ার উপর মাটির নেচি দ্রুত পাক দিয়া লম্বা লম্বা আঙুলগুলি গড়িতেছে, একজন ছাঁচে ফেলিয়া মাটির গয়না গড়িতেছে আর কুমারীশ প্রতিমার মুখগুলি গড়িতেছে। বাঁশের পাতলা টুকরা দিয়া নিপুণ ক্ষিপ্রতার সহিত ভ্রূ চোখ মাটির তালের উপর ফুটাইয়া তুলিতেছে। ইহার পর মুখের উপর গঙ্গামাটির প্রলেপ দিয়া মাজিবে। যমুনা ছেলেবেলায় কত দেখিয়াছে। সিমেণ্ট-করা মেঝের মতো পালিশ হইবে।

বউমা, জেগে রয়েছেন মা!

যমুনা চকিত হইয়া উঠিল, মাথার ঘোমটাটা টানিয়া দিয়া সে একটু পাশে সরিয়া দাঁড়াইল। নিজেই একটু জিভ কাটিল, মিস্ত্রী দেখিয়া ফেলিয়াছে!

আমি খুব ভালো হাতি গড়ে এনে দেব এক জোড়া। দুটো মাটির বেরাকেটও এনে দেব। তারই ওপর রেখে দেবেন।

যমুনা সসঙ্কোচে আবার আসিয়া জানলায় দাঁড়াইল, তারপর মৃদুকণ্ঠে বলিল, ব্র্যাকেট দুটোর নীচে দুটো পরী গড়ে দিও। যেন তারাই মাথায় করে ধরে আছে।

কুমারীশ বলিল, না, দুটো পাখি করে দেব? পাখি উড়ছে, তারই পাখার ওপর বেরাকেট থাকবে।

যমুনা ভাবিতে বসিল, কোনটা ভালো হইবে।

কুমারীশও নীরবে কাজ করিতে আরম্ভ করিল, কয়েক মিনিট পরেই আবার সে বলিল, আর দুটো ঘোড়াও গড়ে এনে দেব বউমা।

যমুনা পুলকিত হইয়া বলিল, না, তার চেয়ে বরং দুটো চিংড়ি মাছ গড়ে দিও।

এবার সে ঘোমটাটা সরাইয়া ফেলিল। যে গরম!

চিংড়ি-মাছ? আচ্ছা, ঘোড়াও আনব, চিংড়ি-মাছও আনব। কিন্তু শিরোপা দিতে হবে মা।

যমুনার মুখ ম্লান হইয়া গেল, সে তাড়াতাড়ি বলিল, তুমি দুটো হাতিই এনে দিও শুধু।

কেন মা, শিরোপার কথা শুনে ভয় পেলে নাকি? সব এনে দেব মা, একখানি তোমার পুরোনো কাপড় দিও শুধু। আর কিছু লাগবে না।

অন্ধকার নিশুতি রাত্রে ধীরে ধীরে ভীত তরুণী বধূটির সহিত মিস্ত্রীর এক সহৃদয় আত্মীয়তা গড়িয়া উঠিতেছিল—ওই দেবীপ্রতিমাটির মতোই।

অপ অপ, চলে আও, বাপকো বেটা হোয় তো চলে আও!

অমূল্য আসিতেছে। ভীত হইয়া মিস্ত্রী উপরের দিকে চাহিয়া বধূটিকে সাবধান

করিতে গিয়া দেখিল, অত্যন্ত সন্তর্পণে জানালাটি বন্ধ হইয়া আসিতেছে। সে আপন মনে কাজ করিতে বসিল।

অ্যাই মিস্ত্রী!

ছোটবাবু, পেনাম!

ওই শালা রমনা, শালা পেসিডেনবাবু হইছে শালা! শালা, মারব এক ঘুঁষি, শালা ট্যাক্সো লিবে। শালা ফিষ্টি করে খাচ্ছে পাঁঠা মাছ পোলাও, শালা! হাম দেখ লেঙ্গে!

কুমারীশ চুপ করিয়া রহিল।

আজ সটান বাড়ির দরজায় গিয়া অমূল্য বন্ধ দ্বারে লাথি মারিয়া ডাকিল, অ্যাও, কোন হ্যায়? খোল কেয়াড়ি!

কিছুক্ষণ পরই যমুনার অবরুদ্ধ ক্রন্দনধ্বনি শোনা যায়। অমূল্য মারে এবং শাসন করে, চোপ, চোপ বলছি চোপ!

পূজার দিন চারেক পূর্বে কুমারীশ আবার আসিয়া প্রতিমায় রং লাগাইয়া দিয়া গেল। যমুনার আনন্দের আর সীমা রহিল না; কুমারীশ একটা প্রকাণ্ড ডালায় করিয়া ব্রাকেট, হাতি, ঘোড়া, চিংড়ি-মাছ, এক জোড়া টিয়াপাখি পর্যন্ত আনিয়া তাহাকে দিয়া গিয়াছে।

মা কিন্তু মুখ ভার করিয়া বলিলেন, অমূল্যকে না বলে এই সব কেন বাপু? তা এখন দাম কি নেবে বল?

কুমারীশ পুলকিত হইয়া বলিল, দাম? এর আবার দাম লাগে নাকি মা? দেখুন দেখি! আমারও তো বউমা উনি।

বড় মেয়ে হাসিয়া বলিল, সুন্দর মানুষকেই সবাই সব দেয়, আমরা কালো মানুষ—

কুমারীশ প্রচণ্ড কলরব করিয়া উঠিল, আপনাকেও এনে দেব দিদিমণি। দেখুন দেখি, দেখুন দেখি, আপনি হলেন বড়দিদি!

সে দ্রুতপথে পলাইয়া গেল।

মা আবার বলিলেন, অমূল্যকে বোলো না যেন বউমা। যে মানুষ!

রাত্রে সেদিনও যমুনা জানালায় বসিয়া মিস্ত্রীকে বলিল, ভারি সুন্দর হয়েছে মিস্ত্রী! ভারি সুন্দর!

উচ্ছ্বসিত কুমারীশ বলিল, পছন্দ হয়েছে মা?

যমুনা পুলকিত মুখে আবার ঘাড় নাড়িয়া বলিল, খুব পছন্দ হয়েছে। হাতি দুটো মেজদির চেয়ে অনেক ভালো হয়েছে।

তুমি একটু বোসো মা, আমি চক্ষুদানটা করে আসি। লক্ষ্মীর হয়েছে, সরস্বতীর হয়েছে, এইবার ঠাকরুনের চোখ, মা।

যমুনা ওই স্থানটির দিকেই চাহিয়া বসিয়া রহিল।

অ্যাও, কোন হ্যায়? চুরি—চুরি করেগা? ছেনালি করেগা? শালা, মারে গা ডাণ্ডা! অপ অপ!

কোনো কল্পিত ব্যক্তিকে শাসন করিতে করিতে আজ একটু সকালেই অমূল্য আসিয়া উপস্থিত হইল।

মা নিষেধ করিয়াছিলেন, কিন্তু যমুনা তাহাকে খেলনাগুলি না দেখাইয়া পারিল না। তাহার অন্তর ছিল পুলকিত, তাহার উপর আজ অমূল্য আসিয়া তাহাকে আদর করিয়া বুকে টানিয়া লইল। যমুনা উচ্ছ্বসিত আনন্দে ডালার কাপড়খানা খুলিয়া তাহাকে পুতুলগুলি দেখাইয়া বলিল, কেমন বল দেখি? খুব সুন্দর নয়?

চিংড়ি-মাছটা তুলিয়া ধরিয়া অমূল্য বলিল, গলদা হ্যায়, মারে গা কামড়?

যমুনা খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

ঘোড়াটা দেখিয়া অমূল্য বলিল, কেয়াবাত রে পক্ষীরাজ—চিঁ হিহি!

যমুনা বলিল, মিস্ত্রী আমাকে এনে দিয়েছে।

মিস্তিরী—শ্লাই ফক্স—ওই খ্যাঁকশেয়ালি? অ্যাই মিস্তিরী!--সঙ্গে সঙ্গে সে জানালাটা খুলিয়া বলিল, গুড ম্যান, দি শ্লাই ফক্স ইজ এ গুড ম্যান, আচ্ছা আদমী।

সঙ্গে সঙ্গেই আবার জানালাটা বন্ধ করিয়া দিয়া যমুনাকে কাছে টানিয়া লইল।

* * *

লজ্জায় আক্ষেপে আশঙ্কায় মায়ের অবস্থাটা হইল অবর্ণনীয়। দারুণ লজ্জায় চণ্ডীমণ্ডপে সমবেত প্রতিবেশীদের সম্মুখে আর মাথা তুলিয়া কথা কহিতে পারিলেন না। কোনোরূপে দেবকার্য শেষ করিয়া পলাইয়া আসিয়া বাঁচিলেন, কিন্তু বাড়িতেও তখন মৃদু গুঞ্জনে ঐ আলোচনাই চলিতেছিল। বড়মেয়ে গালে হাত দিয়া ফিসফিস করিয়া বলিতেছিল, বড়বউ দুই চোখ বিস্ফারিত করিয়া শুনিতেছিল।

মা জোড়হাত করিয়া বলিলেন, তোমাদের পায়ে পড়ি মা, ওকথা আর ঘেঁটো না। ছি ছি ছি রে আমার কপাল!

বড়বউ বলিল, আমরা চুপ করলে আর কি হবে মা, পাড়াপড়শী তো গা টেপাটিপি করছে!

বড়মেয়ে বলিল, মেয়েমানুষের যার একটুকুন রূপ থাকে তাকে একটুকুন সারধানে থাকতেও হয়, বাড়ির গিন্নীকেও সাবধানে রাখতে হয়। রামায়ণ পড়, মহাভারত পড়—

বাধা দিয়া মা বলিলেন, দোহাই মা, চুপ কর. তোমাদের পায়ে ধরছি। অমূল্য শুনলে আর রক্ষে থাকবে না।

ছোটবধূটি তখন উপরে বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে আয়নাখানার সম্মুখে দাঁড়াইয়া ভয়ে ঠকঠক করিয়া কাঁপিতেছিল। মিথ্যা তো নয়, দেবী-প্রতিমার মুখে যে তাহারই মুখের প্রতিবিম্ব!

মেয়ে-মহলে সেই কথারই আলোচনা চলিতেছে। প্রতিচ্ছবি এত সুস্পষ্ট যে, কাহারও চোখ এড়ায় নাই।

দেবতার কাছে অপরাধ, মানুষের কাছে অপরাধ, অপরাধের বোঝা যমুনার মাথায় পাহাড়ের মতো চাপিয়া বসিয়াছে। তাহার উপর তাহার স্বামী! ভয়ে সে থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল।

কিন্তু যমুনার ভাগ্য ভালো যে, অমূল্য পূজার কয়দিন বাড়িমুখোই হইল না। গ্রামে পূজা-বাড়িগুলির বলিদানের খবরাদি করিতেই তাহার কাটিয়া গেল। হাড়িকাঠে পাঁঠা লাগাইলে সে ঘাড়টা সোজা করিয়া দেয়, খানিকটা ঘি ডলিয়া একটা থাপ্পড় মারিয়া বলে, লাগাও—অপ!

বলিদান হইলে ঢাকী ও ঢুলীদের মধ্যে লাঠি লইয়া পাঁয়তাড়া নাচ নাচে। রাত্রে কোনোদিন লোকজনে ধরারবির করিয়া তুলিয়া লইয়া আসে, কোনো দিন কোথায় পড়িয়া থাকে, তাহার ঠিকানা কেহ জানিতে পারে না।

বিজয়া-দশমীর দিন কিন্তু কথাটা তাহার কানে উঠিল। কানে উঠিল নয়, সে সেদিন স্বচক্ষেই দেখিল। গ্রামেও সেদিন এই আলোচনাটা ওই ঢাক-ঢোলের বাদ্যের মতোই প্রবল হইয়া উঠিল।

চাটুজ্জে-বাড়ির বাউড়ী ঝি মাঝপথ হইতে ছুটিয়া আসিয়া বলিল, ওগো মা, দাদাবাবু আজ খেপে গেইছে! লাঠি নিয়ে সে যা করছে আর বলছে, 'আমার বউয়ের মতো অ্যা—,' আর 'অপ অপ' করছে।

বাড়িসুদ্ধ শিহরিয়া উঠিলেন। সমস্ত বাড়িতে যেন একটা আতঙ্কের ছায়া নামিয়া আসিল। অমূল্যের এই কয়েকদিন অনুপস্থিতিতে ও চৈতন্যজ্ঞানহীনতার অবকাশে যমুনা খানিকটা সুস্থ হইয়াছিল, কিন্তু আজ আবার সেই আতঙ্কের আকস্মিক আগমন সম্ভাবনায় সে দিশাহারার মতো খুঁজিতেছিল—পরিত্রাণের পথ। তাহার উপর সমস্ত গ্রামটা নাকি তাহার কথা লইয়া মুখর। এ লজ্জা সে রাখিবে কোথায়? আপনার ঘরে সে লুকাইয়া গিয়া বসিল দুইটা বাক্সের আড়ালের মধ্যে। নীচে বাড়ির মধ্যে ওই আলোচনাই চলিতেছে। পাশের বাড়িতেও ওই কথা। খোলা জানালাটা দিয়া যমুনা স্পষ্ট শুনিতে পাইল, ছি ছি ছি!

কিছুক্ষণ পরেই অমূল্য ফিরিল নাচিতে নাচিতে। অপ অপ! মা কই, মা, পেনাম করি, আচ্ছা বউ করেছ মা, ফাস্ট, চাকলার মধ্যে ফাস্ট! দুগগা-মায়ের মুখ ঠিক বউয়ের মতো মা! দুগগা-প্রতিমে! অ্যাই ছোটবউ, অ্যাই! কই ছোটবউ!

কিন্তু কোথায় ছোটবউ? সমস্ত বাড়ির মধ্যে ছোটবউয়ের সন্ধান মিলিল না। সমস্ত রাত্রি অমূল্য পাগলের মতো চীৎকার করিয়া ফিরিল।

পরদিন চণ্ডীমণ্ডপে পূজার খরচের জন্য রাজ্যের লোক আসিয়া জমিতেছিল। সকলে বৃত্তি পাইবে। নানা বৃত্তি—কাপড়, পিলসুজ, ঘড়া, গামছা পূজার যত কিছু সামগ্রী যায় নৈবেদ্য পর্যন্ত বৃত্তি বিলি হইবে। কুমারীশও এই গ্রামের মুখে আসিতেছিল, তাহারও পাওনা অনেক। পরনে তাহার নতুন লালপেড়ে কোরা কাপড়, গলায় কোরা চাদর, বগলে ছাতা, হাতে একটা পুঁটলিতে বাঁধা কয়টি মাটির পুতুল ও খেলনা। সে হনহন করিয়া গ্রামে প্রবেশ করিল।

প্রতিমা-বাহকেরা জল হইতে দেবী-প্রতিমার খড়ের ঠাট তুলিয়া আনিয়া চণ্ডীমণ্ডপে নামাইয়া দিয়া বিদায়ের জন্য দাঁড়াইল। তাহারা চাহিল, মা, বেসজ্জনের বিদেয় আমাদের—মুড়কি নাড়ু!

ঠিক এই সময়েই বাড়ির ঝিটা দেখিল, বাড়ির খিড়কির ঘাটেই যমুনার দেহ ভাসিতেছে। তাড়াতাড়ি তোলা হইল—বিবর্ণ শবদেহ। অমূল্য আছাড় খাইয়া কাঁদিয়া পড়িল।

কুমারীশ বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিয়া বজ্রাহতের মতো দাঁড়াইয়া গেল।

রসকলি

পাল-পুকুরের ঘাটের উপরেই প্রকাণ্ড বটগাছটার একটা শিকড় বিশাল অজগরের মতো কুণ্ডলী পাকাইয়া গর্তের ভিতর মুখ সেঁধাইয়া যেন পিঠে রোদ পোহাইতেছে। পুলিন দাস তাহার উপর হাঁটুভাঙা দয়ের মতো উবু হইয়া বসিয়া জলে খোলামকুচি ছুঁড়িয়া 'ব্যাং-ছুড়ছুড়ি' খেলিতেছিল; তাহার কাঁধে গামছা, কানে একটা পোড়া বিড়ি।

মিতে বলাই দাস আসিয়া ডাকিল, এই যে পেলা, উঠে আয়, ওরে ও খেপাচণ্ডী, উঠে আয়! খুড়ো যে—

পুলিন হাতের খোলামকুচিটা জলের পরিবর্তে মাটিতে আছড়াইয়া কহিল, টেঁসেছে বেটা বুড়ো?

বলাই সোৎসাহে কহিল, আর দেরি নাই, উঠে আয়।

উভয়েই গ্রামের পথ ধরিল, বলাই আগে, পুলিন পিছনে।

পুলিন সহসা কহিল, বউটা খুব কাঁদছে, নয় রে বলা?

বলা কহিল, খু-উ-ব, আছাড়-বিছেড় করছে।

মাথাটা তাহার প্রায় ঘাড়ের নিকটে হেলিয়া পড়িল, ঠোঁট দুইটা চিবুক পর্যন্ত বাঁকিয়া গেল।

আবার উভয়েই নীরব, রাস্তা ধরিয়া চলিয়াছে। একটা গাই রাস্তার ধারে পতিত জমিতে লম্বা দড়িতে বাঁধা, ঘাস খাইতেছিল। জানি না, পুলিন কোন্ কৌতুকে চট করিয়া বাঁ হাতের দুইটা আঙুলে গাইটার পিঠটা টিপিয়া টিপিয়া ঘড়-ড়-ঘোঁত শব্দে নাসিকা-গর্জন করিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে গাইটাও মাথা নাড়িয়া লাফাইয়া উঠিল।

পুলিন সলম্ফে হাত দুই সরিয়া আসিয়া কহিল, মাইরি, কী ত্যাজ রে! আমার বউটাও ঠিক এমনই, মাথা নেড়েই আছে।

পুলিনচন্দ্রের এক দেহশ্রী ভিন্ন আর কিছুই প্রশংসা করিবার মতো ছিল না।

তাহার দেহখানি সুন্দর, দীর্ঘ আকার, সবল দেহ, বর্ণ গৌর, কোঁকড়া চুল, আর সর্বাঙ্গ বেড়িয়া বেশ একটি মিষ্ট লাবণ্য। এ ছাড়া আর কোনো গুণই ছিল না। বুদ্ধির খ্যাতি তো কোনো কালেই নাই, বাল্যকালেই পাঠশালায় গুরুমহাশয়, 'এক পয়সায় তিনটে আম, তা তিনটে আমের কত দাম' ঝাড়া তিনটি ঘণ্টাতেও বুঝাইতে না পারিয়া নিজেই তাহার বই-দপ্তর গুছাইয়া বগলে পুরিয়া দিয়া কহিয়াছিলেন, বাবা, শুভঙ্কর যে এ জন্মে বৈরাগী-কুলে জন্ম নিয়ে হিসেবে পর্যন্ত বৈরাগ্য করেছেন, তা জানতাম না। তোমায় পড়ানো আমার কর্ম নয়।

ইহার উপর সে ছিল যেন মূর্তিমান বে-তাল।

মজলিশে হয়তো লঙ্কাকাণ্ডের মতো ভীষণ গম্ভীর আলোচনা চলিতেছে, বুড়া জাম্বুবান হয়তো মন্ত্রণা দিতেছে, মজলিশসুদ্ধ লোক স্তম্ভিত, নিস্তব্ধ, সহসা সেখানে পুলিনচন্দ্র যেন কৌতুকের কাতুকুতুতে গুলগুল করিয়া হাসিয়া উঠে—হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ, এ মাইরি আমার খুড়োকে লিখেছে, তেমুণ্ডে বুড়ো—ইয়া চুল, ইয়া দাড়ি, ঠিক ঠিক, জাম্বুবান, জাম্বুবান—হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ!

আবার হয়তো হনু-ভাম্বুর মিতালির রঙ্গে মজলিশ তো মজলিশ, দেবগণ পর্যন্ত হাসিয়া আকুল, সেখানে পুলিন বিস্ময়ে হতবাক, চক্ষু দুইটা ছানাবড়ার মতো বিস্ফারিত, পাশের লোককে বলে, কি মাইরি যে হাসিস, তার ঠিক নাই। তারপর

সোৎসাহে বাহবা দেয়, বলিহারি বাপ হনু, বাবুদের প্যায়দার চেয়েও তুমি জিন্দে পালোয়ান।

গ্রন্থকারও বাদ যান না, পুলিন কহে, বইটার কিন্তু ভারি চহট মাইরি, এ একবারে অবাক-জলপান লাগিয়ে দিয়েছে !

আবার রাবণ-বধে সীতা-উদ্ধারে আনন্দিত শ্রোতৃমণ্ডলী আবেগে জয়ধ্বনি করিয়া উঠে। বিচিত্র পুলিন, বিচিত্র তাহার রসবোধ, সে সজল চক্ষে বলে, আহা-হা এতগুলো বেধবা হল, আহা হা !

আবার সঙ্গে সঙ্গেই ব্যগ্র অনুসন্ধানে কহে, আচ্ছা, লঙ্কায় তা হলে মাছের সের কত করে হল ? এক পয়সা, না দু পয়সা ?—তা লেখে নাই ?

লোকে তাই বুদ্ধিহীনের উপর রং চড়াইয়া কহে, ক্যাপা।

পুলিন রাগে না, হাস্যমুখে উত্তর দেয়, অঁ্যা।

রাগে একজন, আর লজ্জায় দুঃখে মরিয়া যায় আর একজন। দুই জনের প্রথমটি পুলিনের স্ত্রী, বয়স আঠারো-উনিশ, গোলগাল আঁট-সাঁট দেহ, নাম গোপিনী।

কিন্তু পুলিন কহে, সাপিনী। পুলিনের নির্বুদ্ধিতার লজ্জায়, খোঁচায় গোপিনী রাগে সাপিনীর মতোই গর্জায়; কথাগুলিও বাহির হয় সাপিনীর জিহ্বার মতোই, লকলকে তীক্ষ্ণ ভয়াবহ। নির্বোধ, সর্বজনের হাস্যাস্পদ স্বামীর ঘরে শত লজ্জার মধ্যেও সান্ত্বনার একটি আশ্রয় গোপিনীর মিলিয়াছিল, সে ওই দ্বিতীয় ব্যক্তিটি, যে পুলিনের জন্য লজ্জায় দুঃখে মরমে মরিয়া থাকিত ; সে পুলিনের বৃদ্ধ খুড়ো রামদাস মোহান্ত, যাহার সহিত পুলিন জাম্বুবানের সাদৃশ্য দেখিতে পায়।

রামদাসের অবস্থা বেশ ভালোই, মোটা জোতজমা, উঠানে বড় বড় মরাই, ঘরে দুগ্ধবতী গাভী, গ্রামে দু-দশ টাকার তেজারতি।

তবে তাহার চেহারাটা আজ শুধু চুল-দাড়ির জন্যই নয়, চিরকালই কেমন বেয়াড়া বিশ্রী ; তাই যৌবনে যখন সে শ্রীমতীকে লইয়া পরম আগ্রহে সংসার পাতিয়াছিল, তখন শ্রীমতী রামদাসের ওই বদ চেহারার জন্যই নাকি তাহার পাতানো সংসারে লাথি মারিয়া কোথায় একদিন উধাও হইয়া গিয়াছিল।

গৃহী-বৈরাগীর বংশধর রামদাস শ্রীমতীর সন্ধানে হরেক রকম তালি দেওয়া আলখাল্লা পরিয়া ঝোলা কাঁধে ভবঘুরে ভিখারী বৈরাগী সাজিল, লোকে সংসারকে ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিল, কিন্তু সংসার তাহাকে ছাড়িল না।

শ্রীমতীর সন্ধান মিলিল না, কিন্তু তাহার ভিক্ষার ঝুলির মধ্যে কোন্ দিন শ্রী

আসিয়া প্রবেশ করিয়া তাহাকে সংসারের দিকে ফিরাইল; তখন ভিক্ষার সঞ্চয়েই তাহার তিনশো টাকা পুঁজি, আর বাড়ির জোতজমার ধান ঠিকাদার-ভাগদারের কাছে বেশ মোটা হইয়াই জমিয়াছিল। শ্রীমতীর অভাবে রামদাস শ্রীকে লইয়া বেশ আঁটালো করিয়া সংসার বাঁধিল।

পাঁচজনে কহিল, মোহান্ত, এইবার ভালো করে সংসার পাতো, একটি ভালো দেখে বোষ্টমী।

রামদাস কহিল, রাধে, রাধে, ও কথা ছাড়ান দাও দাদা। রাধারানী আমার মনেই ভালো, ধ্যানেই সোজা, বাইরে বেজায় বাঁকা। বাঁকা রায়ের লাঞ্ছনাটাই দেখ না! জয় রাধে, শ্রীমতী শ্রীমতী!

কে একজন স্ত্রী-জাতির কী-একটা নিন্দা করিল, মোহান্ত মাথা নাড়িয়া জিভ কাটিয়া সবিনয়ে প্রতিবাদ করিল, রাধে রাধে, ও কথা বোলো না, বলতে নাই। শ্রীমতীর জাত, ওরা সবাই ভালো।

একজন ঠোঁটকাটা কঠোর রসিকতা করিয়া ফেলিল, তা তোমার শ্রীমতী—

মোহান্ত হাসিয়া কহিল, বললাম যে দাদা, শ্রীমতীর জাত ওরা, সুন্দর নিয়েই যে কারবার ওদের। অসুন্দরকে কে কবে পছন্দ করে দাদা?

এই সময় রামদাসের বড় ভাই শ্যামদাস বছর আষ্টেকের ফুটফুটে মাতৃহীন পুলিনকে রাখিয়া মারা গেল। রামদাস পুলিনকে বুকে করিয়া 'না বিইয়াই শ্যামের মা' হইয়া উঠিল।

সুন্দর পুলিন বড় হইল। বৈষ্ণবের ছেলে, কীর্তনের আখড়ায় খোল-করতাল ছাড়িয়া লাঠির আখড়ায় লাঠি ধরিতে শিখিল। বলা সঙ্গী হইল, গাঁজা ধরিল। রামদাস শাসন করিতে পারিল না, শুধু দুঃখই করিল; তবু মনে মনে নিজেই সান্ত্বনা খুঁজিয়া হইল, বেশ একটি গোছালো বউ আসিলেই পুলিন মানুষ হইবে, বোকা বুদ্ধিমান হইবে, ঘর বুঝিবে, না বুঝে ঘর ঘাড়ে চাপিয়া পরিচয় করিয়া লইবে।

রামদাস পুলিনের জন্য পাত্রী খুঁজিতে লাগিল।

সৌরভী বৈষ্ণবী আসিয়া কহিল, মোহান্ত, তা আমার মঞ্জরীর সঙ্গে পুলিনের বিয়ে দাও না কেন? ছেলেবেলার সাথী দুটি, ভাবও খুব—

রামদাস কহিল, রাধে রাধে, তা যে হয় না সৌরভী, আমরা হলাম জাত-বোষ্টম, আর তোমরা ভেকধারী।

সৌরভী ছিল ধোপার মেয়ে, ভেক লইয়া বৈষ্ণবী হইয়াছে। তাহার মেয়ের সঙ্গে ভাইপোর বিবাহ দিতে রামদাসের রুচি হইল না। না হইলে সৌরভীর মেয়ে মঞ্জরী বেশ সুশ্রী, বেশ নজরে-ধরা মেয়ে। তবে একটু রসোচ্ছলা, যাকে বলে 'ডগমগ' ভাব,

সেই ভাবে সে চঞ্চল। চলিতে তাহার দেহে হিল্লোল খেলিয়া যায়, কথা বলিতে হাসি উপচিয়া পড়ে। হাসিতে নিটোল গালে টোল পড়ে, সে গ্রীবাটি ঈষৎ বাঁকাইয়া দাঁড়ায়। নাকে রসকলি কাটে, চূড়া বাঁধিয়া চুল বাঁধে, কথার ধরনটাও তাহার কেমন বাঁকা। লোকে কত কি বলে, কিন্তু তাহাতে তাহার কিছু আসে যায় না। নদীর বুকে লোহার চিরেও দাগ আঁকে না, স্রোতও বন্ধ হয় না।

মঞ্জরী পুলিনের চেয়ে বছর চারেকের ছোট, বাল্যসাথী, দুইজনের ভাবও খুব। পুলিন সময়ে-অসময়ে মঞ্জরীদের বাড়ি যায়, মঞ্জরী সাদরে অভ্যর্থনা করে, মুখে দীপ্তি ফুটিয়া উঠে, রসোচ্ছলা আরও উচ্ছল হইয়া উঠে।

পুলিন বলে, কী হে রসকলি, করছ কী?

দুইজনে 'রসকলি' পাতাইয়াছে।

মঞ্জরী মুচকি হাসিয়া সুরে বলে—

"তোমায় আঁকছি হে অঙ্গে যতন করে।"

পুলিন এ কথার উত্তর খুঁজিয়া পায় না।

অভাব-অভিযোগে কত দিন মঞ্জরীর মা সৌরভী আসিয়া কহে, দেখ লো মঞ্জরী, দুটো টাকা কারু কাছে পাওয়া যায় কিনা, নইলে তোর খাড়ুটা বাঁধা দিতে হবে।

মঞ্জরী বলে, খাড়ু আমি বাঁধা দেব না রসকলি। তুমি টাকা এনে দাও।

পুলিন শশব্যস্তে বলে, সে কি রসকলির মা, খাড়ু বাঁধা দেবে কি? আমি টাকা এনে দিই।

সৌরভী আপত্তি করিলে মঞ্জরী কহে, কেন, রসকলি কি আমার পর?

খুড়ার তহবিল সন্ধান করিয়া না পাইলে চাউল বিক্রয় করিয়া সে টাকা আনিয়া দেয়।

আবার মঞ্জরী কখনও কখনও পুলিনের হাত চাপিয়া ধরিয়া বলে, না, তুমি দিতে পাবে না, ও মায়ের চালাকি।

মায়ে ঝিয়ে ঝগড়া হয়, পুলিন ব্যস্ত হইয়া উঠে, কিন্তু মঞ্জরী কহে, খবরদার, আড়ি করব।

দশ বছর বয়সেই মঞ্জরীর একবার বিবাহ হইয়াছিল, কিন্তু পাত্রটিকে মঞ্জরীর পছন্দ হয় নাই, তাই তাহাকে সে নাকচ করিয়া দিয়াছে। সে বেচারী বহুবার মঞ্জরীর জন্য হাঁটাহাঁটি করিয়া শেষে অন্যত্র বিবাহ করিয়া সংসার পাতিয়াছে। মঞ্জরীকে ছাড়পত্র করিয়াছে।

নানা কারণে রামদাস সৌরভীকে প্রত্যাখ্যান করিল।

রামদাস সৌরভীকে ফিরাইয়া দিল; সৌরভীও ঘরে গিয়া পুলিনকে ফিরাইয়া

দিল, কহিল বাবা, মেয়ের আমার সোমত্ত বয়েস, তুমি আর এস না। একেই তো পাঁচজনে পাঁচ কথা বলে। মনে ভেবেছিলাম, তোমরা দুটি ছেলেবয়সের সাথী, দু হাত এক করে দিয়ে দেখে চোখ জুড়োব, তোমার কাকা তা দেবে না। আমাকে তো আমার মেয়ের বিয়ে দিতে হবে!

কথাটা পুলিনের বড় বাজিল, সে দুই দিন খাইল না, শুইল না, মাঠে মাঠে ঘুরিয়া বেড়াইল।

রামদাস শেষে রাজী হইল, বেশ মঞ্জরীর সঙ্গেই পুলিনের বিবাহ হোক।

সময়টা হোলির, রামদাস শ্রীধাম বৃন্দাবন যাইবে। তাই স্থির হইল যে, রামদাস ফিরিলে বিবাহ হইবে।

কিন্তু উপর-ওয়ালার অভিপ্রায় অন্যরূপ।

শ্রীধামে সহসা একদিন রামদাসের সঙ্গে হারানো শ্রীমতীর দেখা হইয়া গেল। শ্রীমতী তখন গাছতলায় কলেরায় ছটফট করিতেছে, পাশে বারো-তেরো বছরের মেয়ে গোপিনী বসিয়া বসিয়া অঝোর-ঝরে কাঁদিতেছিল।

স্ত্রীলোকটির কাতরানিতে আর বালিকাটির কান্নায় দয়াপরবশ হইয়া রামদাস সাহায্যে অগ্রসর হইয়া রোগিণীর পাশে বসিল, ক্ষণেক তাহার মুখপানে চাহিয়া সাগ্রহে ডাকিল, শ্রীমতী!

রোগযন্ত্রণায় কাতর শ্রীমতী রামদাসের মুখপানে চাহিয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল, রামদাস উত্তরীয়-প্রান্ত দিয়া চোখ মুছাইয়া দিল। শ্রীমতী তাহার পা দুইটা চাপিয়া ধরিয়া কহিল, আমার যাবার সময়, পায়ের ধুলো দাও। আর এই মেয়েটিকে নাও। বড় ভালো মেয়ে, মায়ের মতো নয়, পার তো পুলিনের সঙ্গে বিয়ে দিও। ভয় নেই, অজাতের মেয়ে নয়। সেই যে, বাউল প্রেমদাসকে মনে পড়ে, সেও জাত-বোষ্টম, তারই মেয়ে।

রামদাস কাতর কণ্ঠে কহিল, শ্রীমতী, রাধারানী, আমি যে তোমার তরে আজও শূন্য ঘর বেঁধে বসে আছি।

শ্রীমতী সে কথার কোনো উত্তর দিল না, শুধু কন্যা গোপিনীকে কহিল, মা, এই তোর বাপ, এঁর সঙ্গে যা, আমার চেয়েও আদরে রাখবে। আর একটা কথা গোপিনী, কখনও যেন স্বামী ছাড়িস নি, হই বোষ্টম, থাকুক নিয়ম, তবু ওতে সুখ নেই।

শ্রীমতীকে বৃন্দাবনে বিসর্জন দিয়া গোপিনীকে লইয়া রামদাস বাড়ি ফিরিল।

সৌরভীকে ডাকিয়া পঞ্চাশ, একশো, শেষে দুইশোটি টাকা হাতে দিয়া কহিল, সৌরভী, আমায় বাকি্য থেকে খালাস দাও।

একমুঠা টাকা খুঁটে বাঁধিয়া সৌরভী হাসিমুখেই বাড়ি ফিরিল।

সৌরভী মঞ্জরীর জন্য পাত্র ঠিক করিল, কিন্তু মঞ্জরী কহিল, না।

মা শেষে রাগ করিয়া রামদাসের টাকা লইয়া বৃন্দাবন চলিয়া গেল।

মঞ্জরী দুই দিন কাঁদিল; তারপর আবার উঠিল, ক্রমে হাসিল, রসকলি কাটিল, কিন্তু বিবাহ করিল না।

এদিকে পুলিনের সঙ্গে গোপিনীর বিবাহ হইয়া গেল। পুলিন যেন মঞ্জরীর নেশা ভুলিল। সে দিন-রাত্রি ঘরেই থাকে, বাড়ির বাহির হয় না, দেখিয়া রামদাস সুখে হাসিল। মঞ্জরী দুই-চারি দিন পুলিনের অপেক্ষা করিয়া শেষে একদিন চূড়া করিয়া চুল বাঁধিয়া, নাকে রসকলি কাটিয়া, পান চিবাইতে চিবাইতে রামদাসের বাড়িতে আসিয়া উঠিল। রামদাস তখন বাড়িতে ছিল না; উঠানে দাঁড়াইয়া মঞ্জরী মুচকি হাসিয়া ঘরের রুদ্ধ দ্বারকে উদ্দেশ করিয়াই বলিল, কই হে রসকলি, বউ দেখাও হে!

পুলিন ঘরের ভিতর গোপিনীর সহিত কথা কহিতেছিল, মঞ্জরীর আওয়াজ পাইয়া অন্য দুয়ার সে দিয়া ছুটিয়া পলাইয়া গেল। গোপিনী নতমুখে ঘরের মধ্যেই দাঁড়াইয়া রহিল। মঞ্জরী ঘরে ঢুকিয়া গোপিনীর ঘোমটা তুলিয়া দেখিয়া ঠোঁটের আগায় পিচ কাটিয়া কহিল, তুমি বউ?

গোপিনী মুখ তুলিয়া চাহিল।

মঞ্জরী আবার কহিল, তা হ্যাঁ বউ, রসকলির তোমাকে পছন্দ হয়েছে?

গোপিনী এবার কথা কহিল, যেন চিমটি কাটিয়া কহিল, না।

মঞ্জরী বলিল, বাঃ, এই যে পাখি পড়ে বেশ! তা হ্যাঁ বউ, কেন পছন্দ হয় নি, কিছু জেনেছ?

গোপিনী সেই চিমটি কাটার মতোই কহিল, রসকলি কাটতে জানি না কিনা, তাই।

মঞ্জরী সব বুঝিল, এবার সে হাসিয়া বিস্ময়ের ভঙ্গিতে গালে হাত দিয়া কহিল, ওমা, তাই নাকি? তা আমার কাছে রসকলি কাটা শিখবে বউ?

গোপিনী কহিল, শেখাবে? দেখো, ঠিক তোমার মতনটি হওয়া চাই।

মঞ্জরী কহিল, তাই শেখাব, কিন্তু ধৈরয ধরে থাকা চাই। পারবে তো?

গোপিনী কহিল, পারব, কিন্তু তোমার সময় হবে তো? বলি, আসবে কখন? রসময়রা ছাড়বে তো?

মঞ্জরী এবার ঠেকার দিয়া কহিল, আমার রসময়রা নয় অসময়ে এসে সময় দেবে। তোমার রসময় যে এক দণ্ড ছাড়ে না দেখি!

গোপিনী কহিল, ও ছুদিন, এখন নতুন নতুন নালতের শাক হে। তারপর বুড়ো গোরু ঠিক দামে গিয়ে পড়বে, ভয় নাই।

মঞ্জরী একটু ঝঙ্কার দিয়া কহিল, তা ভাই, বুড়ো গোরু বেঁধে রাখলেই হয়! যার দড়ি নাই, তার আবার গোরু পোষার শখ কেন?

গোপিনীও এবার একটু ঝঙ্কার দিয়া কহিল, ঘোড়া হলে কি চাবুকের অভাব হয় হে, তা হয় না। যখন গোরু পুষেছি তখন দড়ি কি না জুটবে? বলি, পরনের কাপড়ে আঁচল তো আছে, তাতেই বাঁধব।

মঞ্জরী হাসিয়া কহিল, যদি ছিঁড়ে পালিয়ে যায়?

গোপিনী কহিল, ইস, সাধ্যি কি!

মঞ্জরী কহিল, দেখো।

গোপিনী সেই দম্ভভরেই কহিল, তখন না হয় ছেঁড়া আঁচল গলায় দিয়ে ঝুলব হে, তা বলে জ্যান্তে তো আর ভাগাড়ে দিতে পারি না!

ইহার পর মঞ্জরী আর কথা কহিল না, আচমকাই যেন বাড়ি ফিরিল, তখন মুখখানায় হাসি ছিল না, যেন থমথমে জলভরা মেঘ।

পরদিন হইতে রসকলির বাড়িতে পুলিনের আদর যেন বাড়িয়া গেল। লোক পাঠাইয়া পুলিনকে আনাইল, তাহার লজ্জা ভাঙিয়া দিল। এখন আর পুলিনের গাঁজার আড্ডায় মঞ্জরী ঝঙ্কার দেয় না। সঙ্গী বলাকে দেখিয়া বিরক্ত হয় না। এখন কথায় কথায় মঞ্জরী যেন ঢলিয়া পড়ে। পান দেয়। পুলিন আবার বাড়ি ছাড়িল, পূর্বের চেয়ে যেন বেশি শক্ত করিয়া মঞ্জরীর বাড়িতে আড্ডা গাড়িল।

মঞ্জরী মাঝে মাঝে আবার এও বল্লে, রসকলি, এ তো ভালো কাজ হচ্ছে না।

পুলিন হোঁতকার মতো কহে, কি!

মঞ্জরী মুচকি হাসিয়া বলে, এই—আমার বাড়িতে এমন করে চব্বিশ ঘণ্টা পড়ে থাকা।

পুলিন তেমনি ভাবেই বলে, কেন?

মঞ্জরী সুর করিয়া গান ধরে—

"পাঁচ সিকের বোষ্টুমি তোমার,
ওহে গোসা করেছে, গোসা করেছে।"

পুলিন কহে, ধ্যেত।

গোপিনী সত্য সত্যই রাগ করিল, কিন্তু ভাঙায় কে? যাহার উপর মান, সেই যে

মানের মুখে ছাই দিয়া দিল। সে খাবার সময় আসে, দুইটা খায়, দেশের দশের হাস্যাস্পদ হইয়া ফেরে, মঞ্জরীর বাড়ি আড্ডা জমায়, ঘরের পয়সা পর্যন্ত মঞ্জরীর ঘরে তুলিয়া দিয়া আসে। মঞ্জরীর না-কি সোনার নথ হইতেছে. গোপিনী জ্বলিয়া গেল। পুলিন যা দুই-চারিটা কথা গোপিনীর সহিত কয়, তা পর্যন্ত মঞ্জরী-বিশোভিত। সেদিন রাত্রে কথায় কথায় নির্বোধ কহিল, রসকলি তোমার কি নাম দিয়েছে জান গা? গোপিনী নয়, সাপিনী। তা সত্যি, সবেতেই তোমার ফোঁস।

গোপিনী একটা জলন্ত অগ্নিবর্ষী কটাক্ষ হানিয়া ছুটিয়া পলাইল। রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্যন্ত বাহিরে কাঁদিতে কাঁদিতে মনে পড়িল, সে বলিয়াছিল. যদি আঁচল ছেঁড়ে তবে ছেঁড়া আঁচল গলায় দিয়া ঝুলিবে। উদ্‌ভ্রান্ত ব্যথাহত নারী সত্যই আঁচল ছিঁড়িয়া দড়ি পাকাইতে বসিল। ঘরে পুলিন তখন অঘোরে নিদ্রা যাইতেছে, বুঝি বা রসকলিকে স্বপ্ন দেখিতেছিল।

পাশের ঘরের দরজা খুলিয়া বৃদ্ধ মোহান্ত বাহির হইল. শ্বেতবস্ত্রা গোপিনীকে দেখিয়া চমকিয়া কহিল, কে? কে? একি মা? বাইরে কেন, মা আমার?

গোপিনী ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল, বৃদ্ধের স্নেহস্পর্শে তাহার হাতের পাকানো আঁচল এলাইয়া খুলিয়া গেল।

মোহান্ত গোপিনীকে বুকে লইয়া কাঁদিয়া কহিল, মা, বুড়ো ছেলের মুখের দিকে চেয়ে ধৈর্য ধর, মা আমার, আমি আশীর্বাদ করছি—ভালো হবে, ভালো হবে তোর।

পুলিনের ব্যবহারে শান্ত স্নেহ-দুর্বল বৃদ্ধ মরমে মরিয়া গেল। কঠোর হইতে চেষ্টা করিল, পয়সায় টান দিল, কথা বন্ধ করিল. কিন্তু তবুও যে পুলিন সেই পুলিনই রহিয়া গেল। অন্ধের কিবা রাত্রি কিবা দিন!

শুধু রসকলির বাড়িতে বসিয়া বলার সহিত খুড়ার আয়ুর দিন গণনা করিতে লাগিল।

রামদাস কিন্তু বাঁচিতে চাহিয়াছিল. মরমে মরিয়াও গোপিনীর জন্য বাঁচিতে চাহিত। সর্বদা তাহার ভাবনা হইত, সে মরিলে গোপিনীর দশা কি হইবে?

কিন্তু মানুষ অমর নয়, মরণের পরোয়ানা সঙ্গে লইয়াই জন্ম লওয়া। সহসা একদিন রামদাসের তলব আসিল। মোহান্তের বয়স হইয়াছিল, হাঁপানি ছিল, হঠাৎ একদিন হাঁপানি মৃত্যুর মূর্তিতে বুকে চাপিয়া বসিল।

গোপিনী চোখের জলে বুক ভাসাইয়া সেবা করিতে বসিল। পাড়া-পড়শী

আসিয়া জমিল। মোহান্ত যেন কার অনুসন্ধান করিতেছিল, কিন্তু সে তখন পাল-পুকুরের ঘাটে বসিয়া 'ব্যাং-ছুড়ছুড়ি' খেলিতেছিল।

পাড়াপড়শী ভিড় জমাইয়া বসিয়া আছে. কেহ বলে, মোহান্ত, হরি বল, বল—জয় রাধারানী!

রাধারানীর জয়গানে চিরমুখরকণ্ঠ চারণ কিন্তু আজ এ সময়ে রাধারানীর ধ্যান করিতে পারিল না। মৃগমায়াচ্ছন্ন রাজা ভরতের মতো শুধু বলিল, মা গোপিনী, কিছু করতে পারলাম না মা।

গোপিনী শেষে আছাড় খাইয়া পড়িল। হায়, তাহার নীড় যে ভাঙিয়া যায়! ভ্রষ্টনীড় বিহঙ্গিনীর ক্রন্দন ছাড়া আর উপায় কী? পাড়ার মেয়েরা দূরে দাঁড়াইয়া ছিল, কিন্তু কেহ এই গোপিনীকে ধরিতে সাহস করিল না। বুড়া রোগী, কখন শেষ নিশ্বাস পড়িবে, খাবি খাইয়া মরিবার নোটিসও হয়তো দিবে না। মড়া ছুঁইয়া কে অশুচি হইবে!

ধরিল শেষে একজন। সে মঞ্জরী।

মঞ্জরী আসিয়াই শোকবিহ্বলা গোপিনীকে ধরিল। কহিল, ভয় কী?

মুমূর্ষু মোহান্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া টানিয়া টানিয়া কহিল, গ্রামের পাঁচজন আছেন, আমার শেষ ইচ্ছা বলে যাই। আমার স্থাবর সম্পত্তির মালিক হল গোপিনী। আর সকলের কাছে এই ভিক্ষে, ছেলেটাকে যেন ওই বেশ্যের হাত হতে বাঁচিও।

কথাটায় সকলের চক্ষু গিয়া পড়িল মঞ্জরীর উপর। সকলেই ভাবিতেছিল, সে কী করিয়া বসে, সে কী করিয়া বসে! কিন্তু মঞ্জরী গোপিনীর এলানো দেহখানি পরম সান্ত্বনাভরে জড়াইয়া বসিয়া ছিল। বসিয়াই রহিল, চাঞ্চল্য দেখা গেল না।

মোহান্ত যখন কথাটা আরম্ভ করে, তখনই বলার সঙ্গে পুলিন আসিয়া পৌছিয়া ছিল, সেও কথাটা শুনিল।

কথাটা আজ তাহাকে প্রথম আঘাত দিল, মান-অপমানের স্বাদ আজ সে বুঝি প্রথম বুঝিল।

লোকে তখন মোহান্তের শেষ ইচ্ছার সমালোচনায় ব্যস্ত। পুলিন দাওয়া হইতে নামিয়া পড়িল, কেহ লক্ষ্য করিল না; কিন্তু মঞ্জরী ডাকিল, যাচ্ছ কোথা?

পুলিন কহিল, আর এ বাড়িতে নয়।

মঞ্জরী কহিল, ছিঃ এই কি রাগের সময়! এসো, খুড়োর মুখে জল দাও, কানে নাম শোনাও।

পাড়াসুদ্ধ লোক এই বেহায়া মেয়েটার সীমাহীন নির্লজ্জতায় অবাক হইয়া তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিল। মেয়েরা গালে হাত দিল। পুলিনও মঞ্জরীর মুখপানে চাহিল,

তারপর ধীরে ধীরে খুড়োর শিয়রে বসিয়া মুখে গঙ্গাজল দিল, ডাকিয়া কহিল, বল কাকা, জয় রাধারানী!

বৃদ্ধ কহিল, জয় রাধারানী। দয়া কর মা, অনাথিনী দুঃখিনীকে দয়া কর মা!

বেলা আড়াই প্রহরের সময় রামদাস মরিল, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ হইতে রাত্রি এক প্রহর হইয়া গেল।

তখন মঞ্জরী গোপিনীকে কহিল, তবে আমি আসি।

গোপিনী বলিল, এসো।

মঞ্জরী চারিদিক চাহিয়া সরলভাবেই কহিল, কত্তা কই? একাটি থাকতে ভয় করবে না তো?

গোপিনীর মনে হইল, মঞ্জরী বুঝি তাহাকে ঠাট্টা করিল। সে উত্তর করিল, আসা-যাওয়া যখন একা, তখন একা থাকতে ভয় করলে চলবে কেন? আর একাই তো থাকা এক রকম।

মঞ্জরী কথাটা গায়ে না লইয়া কহিল, আমি কিন্তু ভাই, একা থাকতে পারতাম না।

গোপিনী কহিল, আমি হলে একা থাকতে যদি না পারতাম, গলায় দড়ি দিতাম, তবু—

মঞ্জরী এবার একটু ঝাঁঝিয়া উত্তর দিল, বালাই, ষাট, মরব কেন? আসি ভাই, কিন্তু রসকলি গেল কোথা?

গোপিনী ক্ষিপ্তের মতো কহিল, রসকলি নাকেই আছে, ঘরে গিয়ে আয়না নিয়ে দেখ, পোড়া মুখের উপরেই ঝলমল করছে।

মঞ্জরী এই আকস্মিক আঘাতে যেন বিহ্বল হইয়া পড়িল। বহুকষ্টে আত্মসংবরণ করিয়াও কিন্তু শেষটা উত্তরের বেলায় বলিয়া ফেলিল, রসকলি তো নিজের নাকেই থাকে বউ, এ যে কেড়ে নেওয়া যায় না! তা তুমি যদি চাও তো না হয় দেবার চেষ্টা করি।

গোপিনী ফোঁস করিয়া বলিয়া দিল, কী বললে তুমি? তোমার কাছ থেকে ভিক্ষে আমি চাই নে, চাই নে। যাও তুমি, যাও।

কথাগুলি ক্রুদ্ধ এক-নিশ্বাসে বলিয়াই সে ঘরে ঢুকিয়া মঞ্জরীর মুখের উপরেই দরজাটা দড়াম করিয়া বন্ধ করিয়া দিল।

মঞ্জরী ধীরে ধীরে বাড়ি ফিরিল, বুকের ভিতর তাহার যেন আগুন জ্বলিতেছিল। সাপিনীর এত বিষ! আপনার বিষে হতভাগিনী আপনি জর্জর হইয়া মরুক।

আপন বাড়ি ঢুকিতেই মঞ্জরী দেখিল, পুলিন তাহার দাওয়ার উপর বসিয়া।

মঞ্জরীর দেহ ব্যাপিয়া একটা হিল্লোল বহিয়া গেল। হাসিতে তাহার মুখ ভরিয়া

পুলিন উঠিয়া কহিল, রসকলি!

মঞ্জরী হাসিয়া উত্তর দিল, বোসো, বলি।

পুলিন বসিল।

ঘরের তালা খুলিতে খুলিতে মঞ্জরী বলিল, রসকলি, তুমি ভাই সোনাকপালে পুরুষ। স্ত্রী-ভাগ্যে ধন।

পুলিন খুব রাগিয়াই কহিল, ও ধন আমার ভাদ্দর-বউ, ছুঁতে পাপ।

মঞ্জরী খিলখিল করিয়া হাসিয়া কহিল, আর বউটি? কি গো, চুপ করে রইলে যে? উত্তর দিতে পারলে না? আচ্ছা, আমিই বলে দিই, সে তোমার গলার মালা, ঠোঁটের হাসি।

পুলিন কহিল, না রসকলি, হল না, সে আমার গলার ফাঁসি। ঠাট্টা নয় রসকলি, একটা কথা তোমায় বলতে এসেছি, আমি কাল থেকে নিজের বাড়িতে যাব। ও বাড়িতে আর থাকব না।

নিজের বাড়ি অর্থে পুলিনের পৈতৃক বাড়ি। বাস্তব চক্ষে বাড়িটি একটি মূর্তিমন্ত বিভীষিকা, কিন্তু কল্পনায় বাড়িটি বেশ, অর্থাৎ উঠানভরা বনফুল, প্রাচীর ভাঙিয়া সীমা অসীমে মিশিয়াছে, ঘরের ভিতরেও চাঁদের আলো খেলে।

মঞ্জরী কহিল, বেশ, তা ভালো, তারপর খাবে কি করে?

পুলিন চট করিয়াই কহিল, বোষ্টমের ছেলে, ভিক্ষে করে খাব।

মঞ্জরী কহিল, আরও ভালো; কিন্তু ভিক্ষেতে মেলে তো চাল, তা রাঁধবে কে? বউকে নিয়ে যাও।

পুলিন প্রবল প্রতিবাদে মাথা নাড়িয়া কহিল, না।

মঞ্জরী কহিল, কেন? আর তুমি 'না' বললেও সে যদি না ছাড়ে?

পুলিন কহিল, ছাড়বে না? মারের চোটে ভূত ছাড়ে, তা জান? হুঁ হুঁ, কথায় আছে, 'পড়লে পরে দুধু ভাতু, না পড়লে ঠেঙার গুঁতু'।

মঞ্জরী কহিল, বেশ। রসকলি আমার বলে ভালো, এ যেন সেই, 'ও পারেতে ধান পেকেছে লম্বা লম্বা শীষ, টুকুস করে মরে গেল লঙ্কার রাবণ'। তা যেন হল, আজ রাত্রের মতো তো বাড়ি যাও।

পুলিন বলিল, না, আর নয়।

মঞ্জরী পরিহাস-ছলেই কহিল, তবে আজ রাতটা পাল-পুকুরের বটগাছেই কাটাবে নাকি ?

পুলিন কহিল, না, তোমার দাওয়াতেই পড়ে থাকব।

মঞ্জরী হাসিল, দুই আর দুইয়ে চার হয়—এ কথাটা যে বুঝে না, সে চারের গুরুত্ব না বুঝিলে তাহার উপর রাগ করিয়া লাভ কি ?

তবু সে বলিল, লোকে বলবে কী ?

পুলিন বাহির-দরজার দিকে ফিরিল।

মঞ্জরী কহিল, যাও কোথা ?

পুলিন কহিল, দেখি, কোথাও—

মঞ্জরী আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিল, যেতে হবে না, এসো, শোবে এসো।

পুলিন ব্যস্ত হইয়া বলিল, না না, লোকে বলবে কী ?

মঞ্জরী কহিল, যা বলবার তারা বলেই নিয়েছে, আবার বলবে কী ? শোন নি, আজই তোমার কাকা বললে, ওই—

পুলিন তাহার মুখ চাপিয়া ধরিয়া কহিল, তোমার পায়ে ধরি রসকলি, ছি, ও কথা তুমি বোলো না।

মঞ্জরী হাসিয়া মৃদুস্বরে গান ধরিল।—

'লোকে কয় আমি কৃষ্ণ-কলঙ্কিনী,
সখি, সেই গরবে আমি গরবিনী।'

পুলিন তাহার হাতখানা চাপিয়া ধরিল, স্পর্শে তাহার সে কি উত্তাপ ! মঞ্জরী মৃদু আকর্ষণে হাতখানি ছাড়াইয়া শান্ত মধুর কণ্ঠে কহিল, ছাড়ো, বিছানা করি।

তকতকে ঘরখানি, লাল মাটি দিয়া নিকানো, আলপনার বিচিত্র ছাঁদে চিত্রিত ; দেওয়ালে খান-কয়েক পট—সেই পুরানো গোরাচাঁদ, জগন্নাথ, যুগল-মিলন ; সবগুলির পায়ে চন্দনের চিহ্ন। মেঝের উপর একখানি তক্তাপোশ, এক দিকে পরিষ্কার বেদীর উপর ঝকঝকে বাসনগুলি সাজানো।

তক্তাপোশের উপর গুটানো বিছানা বিছাইয়া দিয়া একটি ছোট চৌকির উপর রক্ষিত তোলা বিছানার গাদা হইতে দেখিয়া দেখিয়া একখানা 'সিজুনি' আনিয়া পুরাতন বিছানার উপর বিছাইয়া দিল। সিজুনিটি মঞ্জরীর নিজের হাতে অতি যত্নে প্রস্তুত, চারুশিল্পের অপরূপ ছাঁদ বিচিত্রিত। বিছানাটি বেশ করিয়া কয়বার ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিয়া ডাকিল, এসো।

পুলিন ঘরে আসিয়া তক্তাপোশে বসিল। দেখিল, মঞ্জরী অভ্যাসমতো ঈষৎ

বাঁকাইয়া দাঁড়াইয়া।—সেই হাসি, সেই সব ; শুধু দৃষ্টিটুকু নূতন। সে তখন মুগ্ধ, আবিষ্ট, একাগ্র।

পুলিন কথা কহিল, ভাবটা গদগদ কিন্তু সঙ্কুচিত, রসকলি !

মঞ্জরী চমক ভাঙিয়া কহিল, কি গো ?

পুলিন কহিল, তুমি—তুমি—আমার—আমার—আমার—

কথাটা শেষ করিতে পারিল না, প্রতিবারই বাধিয়া যায়, আর পুলিন রাঙা হইয়া উঠে।

মঞ্জরী খিলখিল করিয়া হাসিয়া কহিল, তোমার—তোমার—তোমার কি গো ?

কৌতুকে গ্রীবা বাঁকাইয়া খানিকক্ষণ পুলিনের নত লজ্জিত মুখের উপর উজ্জ্বল দৃষ্টি হানিয়া সহসা মঞ্জরী তাহার মুখ পুলিনের কানের কাছে লইয়া গিয়া বলিল, আমি তো তোমারই গো।

কথাটা বলিয়াই সে চট করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল, চঞ্চল লঘু গতিতে, ছোট ত্বরিতগতি ঝরনাটির মতোই। বাহিরে গিয়াই দরজা টানিয়া শিকল আঁটিয়া দিল। একরাশ দমকা দখিনা বাতাস আসিয়া যেন পুলিনকে তৃপ্ত করিয়া অন্তরকে দীপ্ত করিয়া আচমকাই চলিয়া গেল।

শিকল টানিয়া দিয়া আঁচলে চোখ মুছিতে মুছিতে ঢেঁকিশালায় আসিয়া মঞ্জরী আঁচল পাতিয়া শুইয়া পড়িল।

রাত্রিতে পুলিন আসে নাই, বেলা এক-প্রহর হইয়া গেল, তবুও দেখা নাই। গোপিনী অপেক্ষায় বসিয়া ছিল, সহসা সে সব ঝাড়িয়া ফেলিয়া উঠিল, স্নান সারিয়া রান্না চড়াইল।

খুট করিয়া শব্দ হইল, ওই বুঝি আসিল ! প্রবল অভিমানে ব্যগ্র দৃষ্টিকে রান্নার কড়ায় সে নিবিষ্ট করিল, হাতের খুন্তি প্রয়োজনাতিরিক্ত অতি বিক্রমে ঘুরিয়া উঠিল, খন—খন—খন।

এই বুঝি ডাকে, সাপিনী হে !

পোষা বিড়ালটা দাওয়ায় লাফাইয়া উঠিয়া ডাকিল, ম্যাও—ম্যাও—ম্যাও।

আর দৃষ্টি মানিল না, ফিরিল ; কিন্তু কই ? শূন্য অঙ্গন, ভেজানো বহির্দ্বার— মানুষের বার্তা তো দিল না !

হাতের খুন্তিটা সজোরে বিড়ালটার পিঠে হানিয়া গোপিনী গালি পাড়িল, বেরো, বেরো, বেরো, আপদ বেরো।

কতক্ষণ কাটিয়া গেল, গোপিনীর মনে হইল, বুঝি বা একটা যুগ।

সহসা বহির্দ্বার খুলিয়া বলাই আসিয়া দাওয়ায় বসিল। হাতের হুকা টানিতে টানিতে কহিল, শুনেছ মিতেনী, কাল রেতে মিতে যে মঞ্জরীর বাড়িতে—

বলাই পুলিনের মিতে, তাই গোপিনীকে ডাকিত—মিতেনী, গোপিনী ডাকিত—মিতে।

গোপিনী কহিল, শুনি নাই, তবে জানি।

বলাই বলিল, আবার নিজের ঘর সাফ হচ্ছে, সেইখানেই থাকবে, এ বাড়িতে থাকবে না।

একটা লজ্জা ঢাকিতে পাঁচটা লজ্জা মাথায় লইতে হয়। গোপিনী কহিল, আমিই যে থাকতে দেব না, সে আমি কাল বলে দিয়েছি, বাড়ি ঢুকলে ঝাঁটার বাড়ি দেব।

বলাই বিজ্ঞের মতো মাথা নাড়িয়া বলিল, ও, তাই বুঝি এত! আবার মঞ্জরীকে পত্র করবে!

বুকে পাথর চাপা দিলেও মানুষ কাতরাইতে পারে, কিন্তু এই কথাটা এমন স্থানে গোপিনীকে আঘাত করিল যে, সে আর কথা কহিতে পারিল না।

বলাই কহিল, কাল রেতে জমিদার গাঁয়ে এসেছেন, তুমি নালিশ কর।

গোপিনী দীপ্ত প্রতিবাদে কহিল, না।

তারপর উভয়েই নীরব; গোপিনীর হাতের খুন্তি নড়ে না, চোখ কড়ার উপর কিন্তু দৃষ্টি নয়, পলকও পড়ে না।

বলাই মনে মনে কি যেন মক্স করিতেছিল, শেষে দালালির ভঙ্গিতে রসান দিয়া কহিল, বেশ বলেছ, সেই ভালো, ও 'দুষ্টু গোরুর চেয়ে শূন্য গোয়ালই ভালো'।

তারপর আবার হুঁকায় টান পড়িল—ফড়ক ফড়ক। একমুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া কহিল, আমাদের তো ছিঁড়লে মালা গাঁথতে আছে, ভাবনাই বা কি! ভাত থাকলে কি কাকের অভাব হয়, কি বল মিতেনী? আমি রয়েছি, সব ঠিক করে দেব তোমার।

পরিশেষে সম্মতির আশায় মিতেনীর মুখপানে চাহিল।

মিতেনী কোনো কথার উত্তর না দিয়া ঘরে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল। রান্না পুড়িতে লাগিল।

পুলিন কোদালি হাতে বাড়ি সাফ করিতেছিল। 'অনভ্যাসের ফোঁটায় কপাল চড়চড় করে', পুলিন ঘামিয়া যেন নাহিয়া উঠিয়াছে। হাত টাটাইয়া উঠিয়াছে, শিরদাঁড়া টনটন করিতেছে, তবু কাজ সারা চাই। স্ত্রীলোকের অন্নদাস, ছিঃ—তার বড় লজ্জা আর কি!

মিতে বলাই আসিয়া কহিল, ভ্যালা রে মিতে, তা ভালো।

পুলিন কোদালি নামাইয়া বলিল, কল্কেতে কিছু আছে? হুঁকো নয়, অশুচ আমার।

বলা কলিকাটা খসাইয়া পুলিনকে দিল। ধুতরো-ফুলি ছাঁদে হাত কাঁদিয়া পুলিন টান মারিল—হুশ, হুশ হু—শ।

বলাই কহিল, তা এক কাজ করলি না কেন মিতে? জমিদার এসেছেন, তাঁর কাছে পাড়লে একবার হত না। তোর হল সোদর খুড়ো, আর ওর সৎবাবা, ওয়ারিশ হলি তুই, ও মাগী সম্পত্তির কে? চল তু একবার, দেখবি এখুনি তোর সম্পত্তি তোর হবে।

অদ্ভুত পুলিন, বিচিত্র তার সংসার-বোধ, সে কহিল, ওর কী হবে?

বলাই বলিল, তোর বউ—তুই খেতে দিবি।

পুলিন কহিল, না, না, আমি যে রসকলিকে—

বলাই সোৎসাহে কহিল, রসকলিকে পত্র করবি, ও মরুক গে—যা মন করুক গে। তোর কি?

সে যে নেহাত অমানুষী হয়, হাজার হউক সে স্ত্রী। মনটা পুলিনের মোচড় দিয়া উঠিল। পূর্বে তাহার সান্ত্বনা ছিল, তাহার প্রাপ্য ধনমূল্যে গোপিনীর নিকট মুক্তি পাইবার হকদার সে।

পুলিন বলিল, না মিতে, তা হয় না।

যেমন দেবা, তেমনই দেবী!—বলাই বিরক্তভাবে উঠিল, রাস্তা ধরিল জমিদারের কাছারির পানে।

পুলিন ভাঙা দাওয়াটার উপর ভাবিতে বসিল।

জমিদারের পশ্চিমা চাপরাসী আসিয়া ভাঙা কাঁসরের মতো খনখন করিয়া কহিল, আরে পুলিয়া, আসো আসো, বাবুর্‌ তলব আসে।

পুলিন চমকাইয়া বলিল, ক্যানে, ক্যানে, কাহেসে দারোয়ানজী?

পশ্চিমা কহিল, সো হামি জানে না।

জমিদারের কাছারিতে পুলিন আসিয়া প্রণাম করিল।

বাবু করসিতে তামাক টানিতেছিলেন, গোমস্তা কলম পিষিতেছে। কয়জন মাতব্বর এধারে বসিয়া ছিল, আর ওধারে এক পাশে আবক্ষ ঘোমটা টানিয়া দাঁড়াইয়া ছিল সঙ্কুচিতা গোপিনী।

বাবু পুলিনের দিকে চাহিয়া কাছারিকে উদ্দেশ করিয়াই কহিলেন, সে হারামজাদী কই ?

রাখাল পাইক বসিয়া ছিল, কহিল, আজ্ঞে, তিনি চানে গেল, আসছেন।

বাবু পুলিনকে বলিলেন, পুলিন, তোমার খুড়োর সম্পত্তি খারিজ করতে হবে।

পুলিন শশব্যস্তে কহিল, আজ্ঞে, সম্পত্তি আমার নয়, ওরই।

জোড়হস্তে অঙ্গুলি-নির্দেশে গোপিনীকে দেখাইয়া দিল।

বাবু কহিলেন, ওই হল হে, ওই হল, স্বামী আর স্ত্রী। মুখ থাকতে নাকে ভাত খায় কে হে ? আর তুমি থাকতে সম্পত্তির ও কে ? ও সম্পত্তি পেলে কি করে ? কথা কও গো, চুপ করে থাকলে চলবে না।

অগত্যা গোপিনী মৃদু কণ্ঠে বলিল, আজ্ঞে, তিনি আমায় দিয়ে গিয়েছেন।

বাবু কহিলেন, তোমাকেই তবে খারিজ করতে হবে, পাঁচশো টাকা লাগবে।

পুলিন বলিল, আজ্ঞে, ও মেয়েমানুষ—

বাবু ধমক দিয়া কহিলেন, তুই থাম বেটা। বল গো, তুমি বল। আবার চুপ করলে যে, উত্তর দাও, পাঁচশো টাকা চাই আমার।

পথভ্রান্তকে যে পথ দেখাইয়া দেয়, সেই পথেই সে চলে। কিংকর্তব্যবিমূঢ়া গোপিনী পুলিনের কথা ধরিয়াই বলিল, আজ্ঞে, আমি যে মেয়েমানুষ—

বাবু কহিলেন, আরে, সম্পত্তি তো মেয়েমানুষ নয়। আচ্ছা, না পার, সম্পত্তি তুমি পুলিনকে ছেড়ে দাও।

পুলিন শশব্যস্তে বলিল, আজ্ঞে না।

গোপিনীও বলিল, আজ্ঞে না।

বাবু চটিয়া কহিলেন, আচ্ছা, সম্পত্তি সদরে বাজেয়াপ্ত হবে। আর পুলিন, তুই বেটা ওই মঞ্জরীকে নিয়ে গাঁয়ে ঢলাঢলি করছিস কেন ? ও সব হবে না, পরিবার নিয়েই থাকতে হবে।

অভিমান অনবুঝ, স্থানকাল জ্ঞান নাই ; পুলিন কিছু না বলিতেই গোপিনী মাথা নাড়িয়া বলিল, না।

প্রতিবাদে বাবু চটিয়া দীপ্ত কণ্ঠে কহিলেন, চোপরাও হারামজাদী, ওই পুলিনকে নিয়েই তোকে থাকতে হবে।

গোপিনী আঁতকাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

ঠিক তখনই মঞ্জরী আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া কহিল, বাবু, আমায় তলব করেছেন ?

বাবু মুখ ফিরাইয়া আর কথা কহিতে পারিলেন না। সম্মুখে রসোচ্ছলা মেয়েটি

—চূড়ার মতো চুল বাঁধা, নাকে রসকলি আঁকা, মুখে মিষ্ট হাসি, গালে দুইটি ঈষৎ টোল। মঞ্জরীকে দেখিয়া ক্ষণেক তাঁহার কথা সরিল না।

মঞ্জরী পুনরায় বলিল, হুজুর !

চমক ভাঙিয়া বাবু কহিলেন, হ্যাঁ, এসো। শুনছ গো, ওসব চলবে না, পুলিনের সঙ্গেই ঘর করতে হবে।

শেষটা কহিলেন গোপিনীকে। কথার নির্দেশে মঞ্জরীর দৃষ্টি পড়িল ভয়ত্রস্তা গোপিনীর উপর, সে ত্বরিত পদে নিকটে গিয়া গোপিনীকে কাছে টানিয়া লইল।

আশ্বাস লোকে কথাতেও পায়, দৃষ্টিতেও পায়, স্পর্শেও পায় ; গোপিনী মঞ্জরীকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, রসকলি !

উজ্জ্বল হাসিতে মঞ্জরীর মুখখানি দীপ্ত হইয়া উঠিল, বলিল, ভয় কি রসকলি ?

বাবু পুনরায় কহিলেন, বুঝলে, এই আমার হুকুম। উত্তর দাও, রাজী কি না ? শুনছিস পুলিন ?

পুলিন, গোপিনী উভয়েই নীরব। উত্তর দিল মঞ্জরী, তেমনই হাসিয়া, হুজুর, স্বামী স্ত্রীর ঝগড়া কি ধমকে মেটে ?

বাবু কহিলেন, আলবাত মিটবে, না মিটলে চলবে না।

মঞ্জরী বলিল, নাই যদি মেটে হুজুর, তাই বা কি ? আমরা জাতে বোষ্টম, ছিঁড়লে মালা আমার নতুন গাঁথি।

বাবু কহিলেন, বেশ, তবে ও বলাকে পত্র করুক।

ওপাশে বসিয়া বলা মুচকি হাসিল।

গোপিনী প্রবল প্রতিবাদে বলিল, না না।

বাবু কহিলেন, তবে কী মতলব শুনি ? কিন্তু আমার রাজ্যে ওসব বদমায়েশি চলবে না।

পুলিন কি একটা প্রতিবাদ করিল, কিন্তু এত ক্ষীণ যে কাহারও খেয়ালে আসিল না। সে নড়িয়া চড়িয়া বসিল, যেন ধৈর্য আর থাকে না। গর্তের সাপ ধরা পড়িবার পূর্বে যেমনতর বাহির হইতেও পারে না, অথচ ক্রোধে গর্তের ভিতরে কুণ্ডলী পাকাইয়া যেমন ঘোরে, তেমনই ভাবেই তাহার মনটা পাক খাইতেছিল।

মঞ্জরী কিন্তু বেশ সবিনয়ে সবল প্রতিবাদ করিল, জিভ কাটিয়া সে বলিল, ছি ছি, বাবু, আপনাকে ওসব কথা বলতে নাই।

বাবু অপ্রস্তুত হইয়া মঞ্জরীকে ধমক দিয়া কহিলেন, আচ্ছা আচ্ছা, তোমারও এখানে থাকা চলছে না, পাঁচজনে তোমার নামে পাঁচ কথা বলছে, তোমায় গ্রাম ছেড়ে যেতে হবে।

মঞ্জরী সবিনয়ে বলিল, আজ্ঞে, কোথায় যাব ? মেয়েমানুষ আমি—

বাবু তাহার মুখপানে চাহিয়া কহিলেন, আচ্ছা, আমার সঙ্গে চল তুমি, আমার বাড়িতে থাকবে।

মঞ্জরী বলিল, আজ্ঞে, ঝি-গিরি আমি করতে পারব না।

বাবু কহিলেন, আচ্ছা, কাজ তোমায় করতে হবে না।

মঞ্জরী হাসিয়া বলিল, বাপরে ! রানীমা তা হলে ভাত দেবেন কেন ?

বাবু এবার বেশ রস দিয়া কহিলেন, সে ভাবনা তোমায় ভাবতে হবে না। আমাদের বাগানে তোমার কুঞ্জ করে দেব, এখানে যেমন আছ তেমনই থাকবে।—বলিয়া বাবু হাসিলেন, হাসিটি গেঁজলা রসের মতো, কেমন যেন বিশ্রী কুৎসিত গন্ধের আভাস দেয়।

মঞ্জরী কহিল, আমার পোড়ার মুখকে কী আর বলব !—সত্যি সত্যিই এ মুখে আগুন দিতে হয়। আপনি রাজা, আপনিও শেষ—। না হুজুর, আমি এ গাঁ ছেড়ে কোথাও যাব না, সে যে যা বলবে বলুক।

বাবু মেয়েটার স্পর্ধা দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন, সহসা তিনি উন্মত্তের মতো চীৎকার করিয়া কহিলেন, কেয়া হারামজাদী ? ভূতসিং, লাগাও জুত্তি হারামজাদীকো।

বদ্ধ লৌহদ্বার মত্ত হস্তীও ঠেলিয়া খুলিতে পারে না, আবার অর্গল খুলিলে আঘাতের অপেক্ষাও সয় না, খুলিয়া যায়। পুলিনের মনের দরজার ঠিক অর্গলটিতে হাত পড়িতেই সে খুলিয়া গেল, ভিতরের মানুষটি বাহিরে আসিল, সে একটা ভীষণ দাপে হাঁকিয়া উঠিল, খবরদার।

রাখাল পাইকের শিথিল মুষ্টির লাঠিগাছটা কাড়িয়া লইয়া মাটিতে ঠুকিয়া পুলিন বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইল।

ব্যাপারটা গড়াইত কতদূর কে জানে, কিন্তু লোকে ব্যাপারটা গোটা বুঝিতে না বুঝিতে মঞ্জরী ত্বরিত পদে পুলিন ও গোপিনীর হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া বাহির হইয়া গেল।

স্তম্ভিত ভাবটা কাটিতেই বাবু কহিলেন, ভূতসিং !

বলা মৃদুকণ্ঠে কহিল, হুজুর, ওই মঞ্জরীর সঙ্গে গোকুলবাটীর থানার দারোগার পরিবারের সঙ্গে খুব সুখ, একটু বুঝে—

বলার কথাটা ঢাকিয়া দিয়া লাঠি হস্তে ভূতসিং ঘ্যানঘ্যান করিয়া বলিল, হজৌর, হুকুম !

বাবু কহিলেন, কুছ নেহি, যাও।

মঞ্জরী দুই জনের হাত ধরিয়া আসিয়া উঠিল একেবারে রামদাসের বাড়িতে। সারাটা পথ সে যেন সে কি ভাবনায় ভোর হইয়াছিল,—ভাবনা বলিলে ঠিক হয় না, সে যেন একটা আবেশ, একটা নেশা।

বাড়িতে প্রবেশ করিয়াই মঞ্জরী দরজাটা বন্ধ করিয়া দিয়া, একগাছা মোটা লাঠি আনিয়া পুলিনের হাতে দিয়া খিলখিল করিয়া হাসিয়া বলিল, বাইরে বোসো পাহারাওলা।

পুলিন লাঠি হাতে বাহিরে বসিল, আর ঘরের মেঝেতে বসিয়া নীরবে চোখের জল ফেলিতেছিল দুইটি নারী। গোপিনী নত দৃষ্টিতে, আর মঞ্জরী তাহার মুখের পানে চাহিয়া যেন নেশায় ভোর হইয়া বসিয়া ছিল।

সহসা হাসিয়া সে কহিল, রসকলি!

গোপিনী মুখ তুলিয়া হাসিল, বড় বিষাদের হাসি, যেন মলিন ফুলটি।

মঞ্জরী বলিল, এক কাছারি লোকের সামনে রসকলি পাতিয়েছ, 'না' বললে তো চলবে না।

গোপিনী কহিল, হ্যাঁ।

মঞ্জরী বলিল, তা ভাই, অনুষ্ঠানটা হয়ে যাক, তুমি আমার নাকে রসকলি এঁকে দাও, আমি তোমার দিই,—যা নিয়ম তা তো করতে হবে।—বলিয়াই খুঁজিয়া পাতিয়া সব সরঞ্জাম বাহির করিয়া তিলক মাটি ঘষিতে বসিল।

তারপর গোপিনীর কোল ঘেঁসিয়া বসিয়া কহিল, তুমি ভাই আগে বলেছ, আগে তোমার পালা। দাও, আমার নাকে রসকলি এঁকে দাও।—বলিয়া নিজের আঁকা রসকলিটি মুছিয়া ফেলিল।

হতভম্ব গোপিনী কম্পিত করে মঞ্জরীর নাকে রসকলি আঁকিয়া দিল।

মঞ্জরী বলিল, দাঁড়াও, সাক্ষী ডাকি।—বলিয়া বাহিরে পুলিনকে ডাকিল, সেই মধুভরা কণ্ঠে, রসকলি, এসো বলি।

পুলিনকে লইয়া গোপিনীর হাতে হাতে নিজের হস্তবন্ধনে বাঁধিয়া দিয়া কহিল, এই নাও রসকলি, আমার রসকলি তোমায় দিলাম।

পুলিনের কথা সরিল না।

তারপর পুলিনকে বলিল, আমি দিচ্ছি, 'না' বোলো না।

গোপিনী ও পুলিন বিস্মিত নির্বাক।

সহসা গোপিনী মঞ্জরীর হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল, না না, তুমি সুদ্ধ এসো, আমরা দু বোনে—

রসোচ্ছলা রসোচ্ছলার মতোই কহিল, দূর, আমি যে রসকলি!

বৈকালের মুখে মঞ্জরী কহিল, দাঁড়াও, আমি একবার গাঁয়ের হালচাল দেখে আসি।

পুলিন বাধা দিয়া কহিল, সে কি, একলা ?

মঞ্জরী হাসিয়া ঢলিয়া পড়িল, বলিল, ভয় কি ! আমার রসকলি যে সঙ্গে।—বলিয়া নাকের রসকলি দেখাইয়া দিল। তারপর আবার কহিল, ভয় নাই, আমি বাইরে বাইরে খবর নেব, তেমন তেমন বুঝলে আমি গোকুলঘাটা থানায় যাব। আজ রাত্রে না ফিরতেও পারি, বুঝলে ? খবরদার, তোমরা বেরিও না, দিব্যি রইল, মাথা খাও।

সে কণ্ঠস্বরে পরিহাসের বিন্দুও ছিল না, পুলিন সে কথা অবহেলা করিতে পারিল না।

মঞ্জরী চলিয়া গেল, রাত্রে ফিরিল না।

পরদিন প্রাতে বলাই আসিয়া ডাকিল, মিতে !

মঞ্জরীর সংবাদের আশায় নিজের বিপদের আশঙ্কা তুচ্ছ করিয়া দরজা খুলিয়া কহিল, এসো।

বলাই বলিল, বেশ বেশ, তা মঞ্জরীকে দিয়ে টাকাটা পাঠালি কেন ? নিজে গেলেই তো হত। তা ও বেশ ভালোই হল। বাবুও বললেন, বলাই, পুলিন যখন পঞ্চাশ টাকা জরিমানাই দিলে, তখন আর তার উপর রাগ নাই আমার। তা পুলিন বোধ হয় ভয়ে আসে নাই, তাই মঞ্জরীকে দিয়ে পাঠিয়েছে। মঞ্জরীকেও মাপ হয়ে গিয়েছে। তা একবার আজ যাস, বাবুকে পেন্নাম করে আসিস। ভয় নাই, আমিও সব বলে করে দিয়েছি।

পুলিনের কথা সরিল না।

জমিল না দেখিয়া বারকয়েক হুঁকা টানিয়া বলাই চলিয়া গেল। পুলিন স্তম্ভিতের মতো দাঁড়াইয়া রহিল। কে জানে—কতক্ষণ। একটি পুঁটলি কাঁখে মঞ্জরী আসিয়া হাসিমুখে অভ্যাসমতো হেলিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া ডাকিল, রসকলি !

পুলিন কথা কহিল না।

হাসিয়া মঞ্জরী বলিল, রসকলি, রাগ করেছ ?

পুলিন অভিমানভরে বলিল, তুমি জমিদারকে—

মঞ্জরী কহিল, জলে বাস করে কুমিরের সঙ্গে বাদ করা কি চলে গো ? তাই মিটিয়ে ফেললাম।

পুলিন কহিল, টাকা—

মঞ্জরী কথা কাড়িয়া বলিল, সে তো তোমারই গো, আমি কি তোমার পর ?

তারপর পুলিনের হাত দুইটি ধরিয়া কহিল, তবে আসি।

উদ্‌ভ্রান্তের মতো পুলিন বলিল, কোথায় ?

মঞ্জরী কহিল, বৃন্দাবন।

পুলিন অভিমান করিয়া বলিল, রসকলি !

মঞ্জরী কহিল, আমি তো তোমারই গো।

গোপিনী দ্বারের পিছনে ছিল, সম্মুখে আসিয়া যেন দাবি করিল, না যেতে পাবে না।

মঞ্জরী বলিল, তীর্থের সাজ খুলে কুকুর হব ?

গোপিনী কহিল, বল তবে, ফিরে আসবে ?

মঞ্জরী বলিল, আসব।

গোপিনী কহিল, আসবে ? দেখো।

উত্তর না দিয়া মঞ্জরী হাসিয়া পুঁটলিটি তুলিয়া লইয়া রাস্তায় নামিয়া পড়িল। বিচিত্র সে হাসি, রহস্যের মায়া-মাধুরীতে ভরা, কে জানে তার অর্থ !

চলিতে চলিতে গান ধরিল—

"লোকে কয় আমি কৃষ্ণ-কলঙ্কিনী
সখি, সেই গরবে আমি গরবিনী গো,
আমি গরবিনী।"

নাকে তাহার রসকলি, মুখে তাহার হাসি, চলনে সে কী হিল্লোল, রসধারা যেন সর্বাঙ্গ ছাপাইয়া ঝরিতেছিল।

সমাপ্ত

গ্রন্থ-পরিচয়

ধাত্রীদেবতা

'ধাত্রীদেবতা' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ১৩৪৬ সনে, আশ্বিন মাসে। তার পূর্বে শ্রীসজনীকান্ত দাস-সম্পাদিত 'বঙ্গশ্রী' মাসিক পত্রিকায় 'জমিদারের মেয়ে' নামে একখানি উপন্যাসের পত্তন লেখক করেছিলেন। ১৩৪১ সনে 'বঙ্গশ্রী'র মাঘ ও ফাল্গুন দুই সংখ্যায় মাত্র 'জমিদারের মেয়ে' প্রকাশিত হয়, তারপর উপন্যাসটির প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। তার বেশ কিছুদিন পর 'জমিদারের মেয়ে' নব পরিকল্পনায় ও নব কলেবরে 'ধাত্রীদেবতা' নামে 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত হতে আরম্ভ করে। ধারাবাহিক ভাবে ১৩৪৫ সনের শ্রাবণ সংখ্যা থেকে ১৩৪৬ সনের ভাদ্র সংখ্যা পর্যন্ত প্রকাশিত হয়ে সমাপ্ত হয়। পুস্তকাকারে প্রকাশের সময় কোন পরিবর্তন, পরিবর্জন বা সংযোজন হয় নি। পরবর্তী কোন সংস্করণেও পরিবর্তন হয় নি।

পথের ডাক

'কালিন্দী' ও 'দুই পুরুষ' নাট্যমঞ্চে অভিনীত হবার পর 'পথের ডাক' রচিত ও অভিনীত হয়। 'পথের ডাক' অধুনালুপ্ত 'নাট্যভারতী' নাট্যমঞ্চে প্রথম ২৩শে পৌষ, ১৩৪৯ তারিখে অভিনীত হয় এবং ১৩৪৯ সনে ফাল্গুন মাসে নাট্যমঞ্চে অভিনীত পাণ্ডুলিপি থেকে পুস্তকারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

রসকলি

'রসকলি' নয়টি ছোট গল্পের সংকলন। ১৩৪৫ সনে বৈশাখ মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। সংকলনটি অবিকৃত অবস্থায় প্রকাশিত হল। গল্পগুলি তার পূর্বে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়েছিল। নীচে গল্পগুলির প্রকাশকাল দেওয়া গেল :

কালাপাহাড়—দেশ, ১৩৪৪

তাসের ঘর—দেশ, ১৩৪৩

ছটু মোক্তারের সওয়াল—প্রবাসী, ভাদ্র ১৩৪৪

অগ্রদানী—প্রবাসী, চৈত্র ১৩৪৩

প্রতিমা—শারদীয় সংখ্যা আনন্দবাজার, ১৩৪৩

শ্মশান-বৈরাগ্য—বঙ্গশ্রী, ১৩৪২

রসকলি—কল্লোল, ফাল্গুন ১৩৩৪

মতিলাল—প্রবাসী, কার্তিক ১৩৪২

মুশাফিরখানা—সাপ্তাহিক নাগরিক, ১৩৪২

'রসকলি'র ভূমিকা

নিছক বন্ধু-প্রীতির দাবিতে আমাকে দিয়া তারাশঙ্কর যাহা করাইয়া লইতেছেন অদূর ভবিষ্যতে তাহা আমার স্পর্ধা বলিয়া বিবেচিত হইবে, এই বিশ্বাস আমার আছে বলিয়াই আনন্দের সঙ্গে লিখিতে বসিয়াছি। ভূমিকার সূত্রে অদ্যকার 'তারাশঙ্করে'র সঙ্গে অদ্যকার 'পাঠকে'র পরিচয় সাধনের ভার লইয়া এই ভাবিয়া মনে মনে হাসিতেছি যে, এইরূপ কৌতুক নূতন ঘটিতেছে না; ইতিপূর্বে মধুসূদন, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে ঘটিয়াছে এবং সাময়িক-পত্রের মহিমা যতদিন বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন আরও ঘটিবে।

সাহিত্যের আর কোনও বিভাগে না পারুক, ছোটগল্প লইয়া বাংলাদেশ গর্ব করিতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্রের ইন্দিরা, লোক-রহস্য, যুগলাঙ্গুরীয়, রাধারানীতে যাহার সূত্রপাত, রবীন্দ্রনাথের গল্প-সপ্তকেই তাহার সমাপ্তি ঘটে নাই, ইহা পরম বিস্ময়ের কথা। কাব্যে, উপন্যাসে মধুসূদন-বঙ্কিমের ধারা রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করিয়া খুব বেশি দূর অগ্রসর হয় নাই, এ কথা মর্মান্তিক হইলেও সত্য। কিন্তু ছোটগল্পের স্রোত রবীন্দ্রনাথকেও ছাপাইয়া অনেক দূর পর্যন্ত গড়াইয়াছে; প্রভাতকুমার, সুরেন্দ্রনাথ, কেদারনাথ, পরশুরামের পরেও তাহার ইতিহাস আছে, এবং সে ইতিহাস লুপ্ত ঐশ্বর্যের স্মৃতিজাত দীর্ঘশ্বাস মাত্র নয়; গতিশীল তাজা প্রাণেরই ইতিহাস। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, বনফুল, মনোজ বসু, এবং সর্বশেষ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়—পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প-লেখক-দলে ইঁহারা কেহই অনধিকার প্রবেশ করেন নাই। বস্তুত, বর্তমানে বাংলা সাহিত্যে গৌরব বলিতে ছোটগল্পের গৌরবই বোঝায়।

এই কীর্তিমান লেখক সমাজে তারাশঙ্করের স্থান একটু স্বতন্ত্র। অন্য সকলের ক্ষেত্রে গল্প বলিবার আর্ট-বস্তুটা মুখ্য, বিষয়বস্তু গৌণ; তারাশঙ্করের আর্ট বিষয়বস্তুকে অনুসরণ করিয়া চলে, বিষয়কে প্রকাশ করিয়া আর্ট গৌরবান্বিত হয়। এই বাস্তব-প্রাধান্য তারাশঙ্করের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য। মনের উপর দৃষ্ট বস্তু ও ঘটনার আঘাত-জনিত স্পন্দনে তাঁহার গল্পগুলি স্পন্দিত। তাঁহার সকল রচনায় একটা অমোঘ নিয়তি ও একটা বিশ্বগ্রাসী নীতির জয়-ঘোষণা আছে, কিন্তু তাহা লেখকের ইচ্ছাকৃত নয়; ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে ধূমের পরে অগ্নির মত তাহা অনিবার্যরূপে স্বভাবতই প্রকাশ পায়, —টহলদার চুরি করে, চৌকিদার চাকুরিতে ইস্তফা দিয়া আত্মরক্ষা করে এবং অগ্রদানী ব্রাহ্মণ আপন আত্মজের পিণ্ড আহার করিয়া দুর্নিবার ক্ষুধার জ্বালা নিবারণ করে।

তারাশঙ্করের সাহিত্য-সৃষ্টির প্রধান অবলম্বন তাঁহার অকৃত্রিমতা, গল্প লেখা তাঁহার আত্মপ্রকাশের একটা ভঙ্গিমাত্র নয়। তাঁহার রচনায় বিষয়বস্তু প্রধান এবং এ বিষয়বস্তু বাংলাদেশের বৃহত্তম সমাজকে কেন্দ্র করিয়া; পল্লীগ্রাম লইয়া। বাংলার পল্লী সুখ দুঃখ, অভাব অভিযোগ, নীচতা দীনতা তিনি নিজে পল্লীবাসীর মতই অনুভব করেন এবং যাহা অনুভব করেন, তাহা প্রকাশ করিতে তাঁহার দ্বিধা নাই। তাঁহার সৃষ্টির অন্তরালে তাঁহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা কাজ করিতেছে বলিয়া বর্তমানে বাংলাদেশের গল্প-লেখকদের মধ্যে তিনিই সকলের চাইতে বেশি টাইপ-চরিত্র সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

তারাশঙ্করের ফর্ম বা লিখন-রীতির সহিত তাঁহার গল্পের বিষয়বস্তুর অন্তরঙ্গ সামঞ্জস্য আছে; তাহা একাধারে গম্ভীর ও সহজ; খুটিনাটি বর্ণনা সর্বদাই নিখুঁত এবং ধোঁকা দিবার চেষ্টা কুত্রাপি নাই। তাঁহার ভাষা অনাড়ম্বর হইয়াও হৃদয়গ্রাহী।

টলস্টয়ের মতামত এ যুগে গ্রাহ্য না হইবারই কথা। তথাপি তাঁহার 'On Art' প্রবন্ধে তিনি 'perfect work of art' সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তারাশঙ্করের গল্পগুলি পড়িবার সময় সেই কথাগুলিই মনে পড়ে—

"A perfect work of art will be one in which the content is important and significant to all men, and therefore it will be *moral*. The expression will be quite clear, intelligible to all, and therefore *beautiful*; the author's relation to his work will be altogether sincere and heartfelt, and therefore *true*."

তারাশঙ্করের রচনায় এই শিব, সুন্দর ও সত্যকে কদাচিৎ ব্যাহত হইতে দেখি।

শ্রীসজনীকান্ত দাস